প্রফেসর
নাটবল্টু চক্র
সংগ্রহ
অদ্রীশ বর্ধন
প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সংগ্রহ ২ অদ্রীশ বর্ধন
আনন্দ

বাংলাভাষায় যাঁরা কল্পবিজ্ঞান রচনা করেছেন, তাঁদের পুরোধা অদ্রীশ বর্ধন। তিনি ১৯৬৩ সালে ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা 'আশ্চর্য!' বের করেছিলেন। 'সায়েন্স-ফিকশন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দটি তাঁরই সৃষ্টি। অদ্রীশ বর্ধনের কল্পবিজ্ঞান-কাহিনির প্রধান চরিত্র খ্যাপাটে বৈজ্ঞানিক প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ওরফে প্রনাবচ কিশোরদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। প্রফেসরের চ্যালা দীননাথ নাথ (দীনানা) খুদে পাঠকদের সমবয়সি এক দুঃসাহসী চরিত্র। হাসিঠাট্টা, কৌতুক, পরিহাসের মোড়কে পরিবেশিত প্রফেসর আর দীননাথের একের পর এক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি মন জয় করেছে বড়দেরও। প্রনাবচ আর দীনানা-র সেইসব দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সংগ্রহ'। এবার প্রকাশিত হল 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সংগ্রহ'-এর দ্বিতীয় খণ্ড। সৃষ্টিছাড়া বৈজ্ঞানিকের অগণিত গুণমুগ্ধ পাঠকের কাছে সংকলনটি অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য।
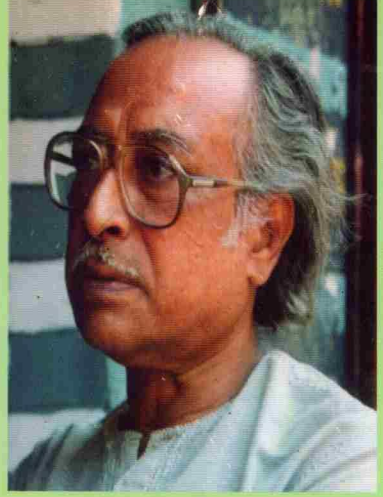
অদ্রীশ বর্ধনের জন্ম ১ ডিসেম্বর, ১৯৩২ কলকাতায় এক শিক্ষক-পরিবারে। অ্যাডভেঞ্চারের টানে কর্মজীবনে বারবার চাকরি বদল করেছেন, শেষে পুরোপুরি চলে আসেন লেখার জগতে। ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা 'আশ্চর্য!' সম্পাদনা করেছেন আকাশ সেন ছদ্মনামে। এ ছাড়া সম্পাদনা করেছেন 'ফ্যানটাসটিক', 'কিশোর মন'। সুইডেন থেকে প্রকাশিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সায়েন্স-ফিকশন'-এ তাঁর লেখক-পরিচিতি উল্লেখিত।
পেয়েছেন মৌমাছি স্মৃতি পুরস্কার, দক্ষিণীবার্তা পুরস্কার (১৩৯৫, ১৩৯৬, ১৪১৫), রোটারি ক্লাব সম্মান এবং অনুবাদের জন্য সুধীন্দ্রনাথ রাহা পুরস্কার।

৪৫০.০০

ISBN 978-93-5040-287-0

প্রচ্ছদ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

প্রফেসর

নাটবল্টু চক্র সংগ্রহ ১

অদ্রীশ বর্ধন

আনন্দ

পুত্রবধূ কেয়া-কে

ভূমিকা

খুব ছোটবেলা থেকে উদ্ভট, আজগুবি, গা-ছমছমে রোমাঞ্চকর গল্প-টল্প নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। তিনটে গ্রন্থাগারের মেম্বার ছিলাম মায়ের উৎসাহে। রোজ এক-একটা বই মলাট থেকে মলাট পর্যন্ত পড়ে ফেলতাম। ফলে, দেড় কেজি ওজনের মগজের কোষগুলো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এইভাবে গল্পের মধ্যে ডুবে থাকার ফলে। পড়ার বই পড়তে কিন্তু ফাঁকি দিইনি। সে কাজটা করতাম খুব ভোরে। ফার্স্টবয় থেকেছি গোটা স্কুলজীবনে। এইভাবেই কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা দিয়ে এই ভারতের সর্বত্র ঘুরেছি চাকরিসূত্রে। ছিলাম মার্কেটিং-এ। তাই জ্ঞানভাণ্ডার বেড়েই গেছে। ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে উদ্ভট কল্পগল্প লিখে গেছি। সম্পাদকদের সৌজন্যে জেনেছি পাঠকমহলে গল্পগুলো সমাদর পাচ্ছে। সেইসব গল্পই বই হয়ে এখন বেরোচ্ছে। এর চাইতে বড় আনন্দ আর নেই।

অনেকদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্ক কলকাতায় এসেছিলেন, শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন মার্কিন দূতাবাসে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— "আপনার সুনাম বিবিধ বিষয়ে। কিন্তু আপনি সায়েন্স ফিকশন লিখতে গেলেন কেন?" উনি ছোট্ট জবাব দিয়েছিলেন, "টু ইন্সপায়ার!" একই উদ্দেশ্য আমারও।

এই জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাওয়ায় প্রকাশকালের সাল-তারিখ লেখার কথা খেয়াল ছিল না। প্রথম খণ্ডের ভূমিকাটা আমার অনেক কথা বলে দিয়েছে। এই ত্রুটির জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

অদ্রীশ বর্ধন

সূচি

সুবর্ণ-গোলক রহস্য

সুবর্ণ-গোলক! সুবর্ণ গোলক!! সুবর্ণ গোলক!!!

সারা ভূ-গোলক জুড়ে ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ হয়ে গেল এই সুবর্ণ গোলক নিয়ে। ভিয়েতনাম প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি শিকেয় উঠল, এমনকী লস্ট আটলান্টিস-এর আবিষ্কার সংবাদও আর আমল পেল না। টেলিভিশনে, রেডিওতে, খবরের কাগজে শুধু রত্নগোলকের চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

চাঞ্চল্যের কারণও ছিল বই কী। উল্কা খসে পড়া বা চাঁদের পিঠে মানুষের লম্ফঝম্প এখন পুরনো ব্যাপার। উল্কার রূপ ধরে অনেক রহস্যই পৃথিবীতে স্মরণাতীত কাল থেকে পৌঁছেছে। যেমন সেই যন্ত্রকীট। সোভিয়েতের জমিতে অবতীর্ণ হওয়ায় কম হইচই হয়নি তা নিয়ে।

সোভিয়েত সরকার অবশ্য বলেছিল যান্ত্রিক পোকাটা নাকি আকাশ থেকে খসে পড়া এক উল্কার মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিশীথ রাত্রে আলোয় আলো হয়ে গিয়েছিল কালো আকাশ। জ্বলন্ত উল্কাটা অদ্ভুত কিরণ বিকিরণ করে বিপুল বেগে আছড়ে পড়েছিল ভূতলে।

সে কি আজকের কথা! তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে। সোভিয়েত দেশের যান্ত্রিক-পোকা কিন্তু চিন্তার পোকা হয়ে মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসেছিল তাবড় বৈজ্ঞানিকদের মগজে!

বাস্তবিকই! বিদঘুটে! উল্কার ভেতরে ছোট্ট খুপরি। যে সে উল্কা নয় আশ্চর্য ধাতুর একটা ক্যাপসুল। গড়নটা অবিকল ভিটামিনের ক্যাপসুলের মতোই লম্বাটে। তবে লম্বায় প্রায় এক ফুট। ব্যাস ইঞ্চি ছয়েক। ধাতুটা একেবারে নতুন ধরনের। পৃথিবীর বিরানব্বইটা মৌলিক পদার্থের কোনওটা দিয়েই নির্মিত নয়।

তবে? তাই নিয়েই তো তুলকালাম কাণ্ড আরম্ভ করলেন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহল। অপার্থিব ধাতুর ক্যাপসুল যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা একবাক্যে বলেছিলেন— হুঁ হুঁ, বাবা! কেসটা অত সোজা নয়। যারা ভাবছ ধাপ্পা মারছে সোভিয়েত দেশ, তারা এইবার নয়ন সার্থক করে যাও। এ ধাতুর হদিশ পৃথিবীর মাটিতে পাওয়া যাবে না।

এ তো গেল ধাতু রহস্য। সে রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। কিন্তু আজব ধাতুর আশ্চর্য

ক্যাপসুল উন্মোচন করার পর যে নতুন রহস্যটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা তাবড় বৈজ্ঞানিকদের চক্ষুস্থির করে ছেড়েছিল।

হ্যাঁ, সেই যন্ত্রকীটটা। পোকা ছাড়া তাকে কিছু বলা যায় না। ইঞ্চি তিনেক লম্বা। চেহারা হাঁসজারুর মতো অর্থাৎ দু'-তিন রকম পোকার মিশেল পোকা যেন। মাকড়সার ঠ্যাং, ফড়িংয়ের ডানা আর শুঁয়াপোকার কাঁটা-কাঁটা দেহ একসঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে যদি একটা পোকা বানানো যায় তা হলে ভিনগ্রহের এই যন্ত্র-কীটটির অবয়বাদি খানিকটা কল্পনা করা যায়।

ভিনগ্রহ কথাটা লেখার ঝোঁকে এসে গেছে ঠিক জায়গায়। যন্ত্রকীটের রূপের বর্ণনা দিতে গেলেই স্বভাবতই অন্য গ্রহের কথা না ভেবে পারা যায় না। গড়ন পেটনের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু যে উপকরণ দিয়ে যন্ত্রকীটের কিম্ভূতকিমাকার বপুটি গঠিত, তা প্রাকৃতিক নয়, প্রাণময় নয়, জৈব নয়।

হ্যাঁ, ঘুরে ফিরে সেই ধাতুপ্রসঙ্গই আবার আসছে। বিচিত্র একরকম ধাতু দিয়ে গড়া সৃষ্টিছাড়া পোকার দেহ। নীলাভ ধাতু। কঠিন অথচ নমনীয়। সংক্ষেপে, অজৈব।

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ক্যাপসুলটা খোলার সঙ্গে কুন-কুন-কুন জাতীয় একটা শব্দ পাওয়া গিয়েছিল ভেতর থেকে। সোভিয়েত-বিজ্ঞানীরা তাতে ঘাবড়াননি। কয়েকজন অতি-হুঁশিয়ার ব্যক্তি অবশ্য বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কী দরকার বাপু অত ঝুঁকি নিয়ে। নিশ্চয় কোনও অটোমেটিক গ্যাজেট চালু হয়ে গিয়েছে। খুললেই বিপদ!

কিন্তু সে রকম কিছুই হয়নি। দ্বিধাবিভক্ত ধাতব আস্তরণের ভেতরে দেখা গিয়েছিল বিস্তর খুদে-খুদে যন্ত্রপাতি। সেসব যন্ত্রপাতির চেহারা দেখবার সৌভাগ্য পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের কখনও হয়নি। ট্রানজিস্টার রেডিয়োর জটিল কলকব্জা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা খানিকটা অনুমান করতে পারবেন ভিনগ্রহের সেই যন্ত্রপাতির জটিলতা।

ঠিক মধ্যিখানে গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রকীটটা। একটিমাত্র যন্ত্র-চক্ষু জ্বলছিল আর নিভছিল— ঠিক যেভাবে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের সিগন্যাল বাল্‌ব জ্বলে— অবিকল সেই ভাবে। কুন-কুন-কুন শব্দসহকারে ঘুরছিল কতকগুলো চাকা— ঠিক যেভাবে টেপরেকর্ডারে স্পুল ঘোরে— সেইভাবে।

দেখে-শুনে তো তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। অথচ এমন একটা ফ্যানট্যাসটিক যন্ত্রকীটের প্রসঙ্গও স্রেফ ধামাচাপা পড়ে গেল এ কাহিনি যাকে নিয়ে, সেই রত্নগোলকের আবির্ভাবের পর থেকে।

মহাকাশ মানেই মহা-রহস্যর উৎস। বিশ্বের কতটুকুই বা আমরা জেনেছি। সমুদ্র তীরের অগণিত বালুকণার একটিমাত্র বালুকাকণা আহরণ করে কেউ যদি আস্ফালন করতে থাকে সর্বজ্ঞ হয়েছি বলে, তাকে অনুকম্পা করা ছাড়া আর কিছু করা যায় না।

মহাকাশে নিহিত অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের ধারণার বাইরে রয়ে গেছে বলেই আমরা সীমাহীন সেই রহস্যের দিকে তাকিয়ে কেবলই বিস্মিত হই। ভেবে কূল পাই না। মস্তিষ্কের বুদ্ধি-কোষগুলোর পক্ষেও কল্পনাতীত সেই জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ এবং সঞ্চয় একান্ত অনুপযুক্ত বলেই মনে করি।

নইলে লোহাখেকো স্পঞ্জের আবির্ভাব নিয়ে এত শোরগোল পড়ত না কুমেরু থেকে সুমেরু পর্যন্ত।

রত্নগোলক আবির্ভাবের বহু পূর্বে লোহাখেকো স্পঞ্জরা মহাশূন্যের গহন অঞ্চল থেকে ভেসে এসেছিল ধরার মাটিতে। প্রথমে অণু আকারে এসেছিল বলেই নজর এড়িয়ে গিয়েছিল সকলের। তারপর লোহা হজম করতেই তাদের আকার চক্ষুগোচর হল। এবং টনক নড়ল এক্সপার্টদের।

বিষয়টা আজও গাঁজাখুরি মনে করে যারা, তারা লোহাখেকো স্পঞ্জ স্বচক্ষে দেখেনি। অলীক কল্পনাপ্রসূত ছাড়া তাদের আর কিছু মনে হওয়াটাও স্বাভাবিক নয়। স্পঞ্জ কখনও লোহা খেতে পারে? লোহা হজম করতে পারে? পুষ্টি আহরণ করে ফুলে অতিকায় আকার ধারণ করতে পারে? যে কোনও লোহার যম হতে পারে?

অসম্ভব! সাধারণ বুদ্ধি-যুক্তির কাছে এ তত্ত্ব স্রেফ অবিশ্বাস্য!

কিন্তু যা জানা নেই, তার অস্তিত্ব নেই, এমন কথাও তো বলা যায় না। মনে পড়ে যায় মহর্ষি চার্বাকের পরাজয়ের সেই কাহিনি। বড় বড় পণ্ডিতেরা ঘোল খেয়ে গেল তাঁর কাছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারল না কেউই। শেষকালে সুদর্শন একটি বালক দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করেছিল চার্বাককে, অমুক গ্রামটি তিনি চেনেন কি না। ছেলেটি সেই গ্রামের বাসিন্দা। ফুটফুটে ছেলেটির সরল প্রশ্নে প্রীত হয়ে চার্বাক বলেছিলেন, 'না বাবা। পৃথিবীতে অমন কত গ্রাম আছে, সব গ্রামের নাম জানা কি সম্ভব আমার পক্ষে?'

শুনেই উজ্জ্বল হয়েছিল সুকুমার বালকটির সুন্দর আনন। হেসে বলেছিল, 'তা হলেই দেখুন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক কিছুর অস্তিত্ব আছে, যা-আপনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ঈশ্বরও আছেন, আপনার জানা নেই বলে তাঁর অস্তিত্ব নেই, এমন কথা বলা যায় কি?'

মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল বাগ্মী, তার্কিক, মহাজ্ঞানী মহর্ষি চার্বাকের।

আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানে জানা মনের দৌড়ও ততখানি, যতখানি আমরা চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি, হাত দিয়ে স্পর্শ করছি, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করছি, নাসিকা দিয়ে আঘ্রাণ লাভ করছি, কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের এই সীমিত অনুভূতির বাইরেও বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত তত্ত্ব, কত রহস্য, কত জ্ঞান নিহিত রয়েছে। চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বকের বাইরে বলেই কি তা উড়িয়ে দেব?

মানুষের সেই অহমিকা চূর্ণ করার জন্যেই যেন আবির্ভূত হয়েছিল ভয়াল লোহাখেকো স্পঞ্জরা।

বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য লৌহভুক মহাকাশ বিভীষিকাদের নিয়ে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, জীবাণুজগৎ সম্বন্ধে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা এখনও শিশু বলা যায়। সবুজ ধরিত্রীতেই যে কত ধরনের ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পুরো ফিরিস্তি আজও জীবাণুবিশেষজ্ঞরা নির্ণয় করে উঠতে পারেননি। কালব্যাধি ক্যানসারের পেছনে করাল ভাইরাসের কারচুপি আছে, এমন সন্দেহও করছেন অনেকে। কিন্তু মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্যন্ত, জীবাণু-এক্সপার্টদের বিদ্যেও তেমনি শুধু আঁচ করা পর্যন্ত।

মহাশূন্যে সৃষ্টিকর্তা আরও কত বিস্ময় সৃষ্টি করে রেখেছেন, তা কেউ জানে না। কেউ জানে না সৃষ্টিকর্তা তাঁর অনন্ত কারখানায় নিয়ত আরও কত প্রাণ সৃষ্টি করে চলেছেন।

লোহালোভী স্পঞ্জরা কি সেই জাতীয় কোনও প্রাণ? অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় না এমনি কোনও এককোষী জীবাণু? লোহা তাদের একমাত্র আহার্য? কাঠে ঘুণপোকা লাগতে পারে, লোহাতেই বা লাগবে না কেন? লোহার মতো কঠিন পদার্থও আর্দ্রতায় মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক তেমনি মহাকাশের এই খুদে আগন্তুকরাও লৌহ ধ্বংস করে আত্মপুষ্টি করবে না কেন?

এসব তত্ত্বকথা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের টাইফুন বয়ে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে। সাধারণ মানুষেরা অবশ্য এরকম একটা মুখরোচক গঞ্জিকাবস্তু নিয়ে শুধু ছিলিম সাজাতে বাকি রেখেছিল। ঠাট্টা-টিটকিরি বিদ্রুপ-তামাশার প্লাবনে হাবুডুবু খাইয়ে ছেড়েছিল তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের।

ফ্যানটাস্টিক এই সব তত্ত্বের মধ্যেই অটল থেকেছিল কেবল একটি তত্ত্ব। ঠাট্টা-টিটকিরি— বিদ্রুপ-তামাশার প্লাবনে খেয়ার নৌকোর মতোই শুধু এই একটি অনুমিতিই টিকে গিয়েছিল আশ্চর্যভাবে। টিকে গিয়েছিল বলেই রত্নগোলকের কুহেলী নিয়ে বিজ্ঞানীকুল বিব্রত হতেই মনে পড়েছিল লোহাখেকো স্পঞ্জদের পৃথিবী চড়াও হওয়ার লোমহর্ষক বৃত্তান্ত।

হাইপোথিসিসটা এক্সোবায়োলজির।

বায়োলজি শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল জীববিদ্যা। মনে রাখতে হবে, এ বিদ্যা কেবল এই পৃথিবীর জীবদের নিয়ে। পৃথিবীর বাইরে সীমাহীন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আরও কত জীব আছে, প্রাণ আছে, চেতনা আছে— তাদের নিয়ে নয়।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মানুষের কৌতূহলের তো শেষ নেই, শেষ নেই জিজ্ঞাসার। যুগ যুগ ধরে এমন কতকগুলি সমস্যা তত্ত্বপিপাসুদের মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করেছে যা ভূমণ্ডল-বহির্ভূত প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে— এক্সোবায়োলজির উৎপত্তি এই থেকেই।

এক্সোবায়োলজি অর্থাৎ সবুজ ধরিত্রীর বাইরে স্পন্দমান জীবজগতের অধ্যয়ন তত্ত্ব। সোজা কথায়, যে জীববিদ্যা পৃথিবীর বাইরের জীবদের নিয়ে, তারও নাম এক্সোবায়োলজি।

নামটি দিব্যি গালভরা। কিন্তু বিষয়বস্তু কোথায়? এক্সোবায়োলজি বিজ্ঞানের এমন একটি আশ্চর্য শাখা যে বিজ্ঞানে তত্ত্ব আছে, কিন্তু যাদের নিয়ে এত তত্ত্ব, তারা নেই।

থাকবে কী করে? পৃথিবীর বাইরের জীবজগতের ধরনধারণ, চেহারা, ধর্মাধর্ম জানবার সৌভাগ্য কি আজও হয়েছে তত্ত্বজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের? হয়নি। তাই তো জীব ছাড়াই যে জীববিদ্যা, নাম তার এক্সোবায়োলজি।

তা হোক। পৃথিবী-বহির্ভূত জীবদের নিয়ে মহাকাশে চিড়িয়াখানা বানাবার সুযোগ না এলেও তা প্রায় হাজার দুই বছর ধরে মানবসভ্যতা জীবহীন এই জীববিদ্যা নিয়ে কল্পলোকে অনেক রূপকথার সৃষ্টি করে এসেছে। কিন্তু কেউ প্রত্যয়সহকারে বলতে পারেনি পরশুরামের ভাষায়— আছে, আছে, সব আছে!

কেননা, একদিন উইলিয়াম র‍্যানডলফ হার্স্ট বিখ্যাত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে অদ্ভুত একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। টেলিগ্রামটার মর্মকথা এই—

‘মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে? এক হাজার শব্দে টেলিগ্রাম পাঠান।’

জবাব এল ঠিক এক হাজার শব্দে। একটি শব্দও বেশি নয়, একটি শব্দও কম নয়। কিন্তু মূল উত্তরটি মাত্র দু’টি শব্দে সম্পূর্ণ। মাত্র দু’টি শব্দ। এই দু’টি শব্দের জবাবই পাঁচশ’ বার লেখা হয়েছে টেলিগ্রামে। জবাবটি এই:

‘জানা নেই।’

এই তো ব্যাপার। কেউ জানে না মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে কি নেই। অথচ তাই নিয়ে কতই না গবেষণা, কতই না আলোচনা, কতই না বাদানুবাদ। পারমাণবিক যুগে এই নিয়ে মস্তিষ্কচালনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বহির্জগতে জীবন আছে কি নেই, এই প্রশ্নের আরও উত্তম উত্তরের সুযোগও বেড়েছে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে উপগ্রহদের দঙ্গল, গ্রহে গ্রহে রওনা হচ্ছে কৃত্রিম মহাকাশযান, চাঁদে চক্কর দিচ্ছে দু’পেয়ে মানুষ, পৃথিবীতে বসে টিভিতে দেখছি সেই দৃশ্য। মাত্র এক যুগ আগে যা ছিল নেহাতই অবিশ্বাস্য।

এরই নাম সায়েন্স ফিকশান। গতকাল যা ফ্যানটাসি, আজ তা সায়েন্স ফিকশান, আগামীকাল তা নির্জলা সায়েন্স।

ঠিক এই সময়ে রীতিমত ফ্যানটাসির মতোই লোহাখেকো স্পঞ্জেরা হানা দিয়েছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই পৃথিবীর মাটিতে। মুছে দিতে চেয়েছিল বিংশ শতাব্দীর লৌহসভ্যতা। ট্রামলাইন উধাও হয়েছিল, নিঃশেষিত হতে চলেছিল যাবতীয় লৌহব্রিজ, ধূ ধূ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। লোহার কারখানাগুলোয় অণু আকারে যাদের আবির্ভাব, লোহা উদরস্থ করে ক্রমে ক্রমে তারা চক্ষুগোচর হয়েছিল, গলফ বলের আকার নিয়েছিল, অতিকায় বর্তুলের রূপ নিয়েছিল। তখনও ক্ষুধা মেটেনি... লোহা চাই... লোহা চাই... আরও লোহা চাই...

কল্পনাতীত সেই বিপর্যয় থেকে পৃথিবীর লৌহসভ্যতা রেহাই পেয়েছিল কী কৌশলে, বারান্তরে সে কাহিনি বলা যাবে। এ কাহিনিতে এইটুকু উপক্রমণিকা দেওয়া গেল কেবল, রত্নগোলকেরা আবির্ভূত হয়ে সে তুলনায় কী বিপুল ত্রাস সঞ্চার করেছিল, তার আভাস দেওয়ার জন্যেই।

রত্নগোলকদের দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল অ্যাসটেরয়েড। অর্থাৎ গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে ছিটকে আসা গ্রহাণু। রত্নগোলক রহস্য নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তার অন্তে গ্রহাণু-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর নিশ্চিন্ত হল এক শ্রেণির বৈজ্ঞানিক।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না এক্সোবায়োলজিস্টরা। চমকে ওঠা তাঁদের স্বভাব। তাঁরাই পালটা যুক্তি তুললেন। বললেন, ‘বাপু হে, এত অ্যাসটেরয়েড আসছে কোত্থেকে?’

‘কোত্থেকে আবার, আকাশ থেকে?’ বিরক্ত হয়ে বললেন অ্যাসটেরয়েড-ভক্ত বিজ্ঞানীরা।

‘কিন্তু পৃথিবীর আকাশে এদের এত ঘন ঘন আবির্ভাব তো এ যাবৎকাল দেখা যায়নি?’ ভুরু কুঁচকে বললেন জীবহীন-জীববিদ্যে দিগ্‌গজগণ। ‘মহাশূন্যে গ্রহাণুরা থাকুক না কেন; কিন্তু পোড়া পৃথিবীর আকাশে তারা এত ঘন ঘন আসবে কেন?’

‘তবে কি তারা গ্রহাণুরূপী জীবাণু?’ টিটকিরি দিয়ে বলেছিল গ্রহাণুবিদেরা। ‘জীব ছাড়াই জীববিদ্যা বানিয়ে ফেলেছেন কিনা— তাই জীব খুঁজতে খুঁজতে শেষপর্যন্ত পাথুরে গ্রহাণুগুলোকেই জীবাণু কল্পনা করে নিয়েছেন নাকি?’

‘পাথুরে গ্রহাণু।’ চোখ কপালে তুলে বলেছেন এক্সোবায়োলজিস্টরা। ‘বলছেন কী মশায়! পাথর কোথায় দেখলেন?’

‘হিরে মোতি বলেই কি পাথর হতে নেই?’ খেঁকিয়ে উঠে বলেছেন গ্রহাণুবিদরা। ‘মণিমানিক্যকে দামি পাথর বলে, সেটাও কি শিখিয়ে দিতে হবে?’

শুধু কি দামি পাথর, দামি দামি ধাতু দিয়েও তো ঠাসা ছিল রত্নগোলকদের বিপুল গর্ভদেশ। তাই তো রত্নগোলক নামটা চালু হয়ে গিয়েছিল লোকমুখে। প্লাটিনাম, সোনা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় মহার্ঘ ধাতু দিয়ে ভরপুর ছিল প্রতিটি রত্নগোলক।

হিরে-চুনি-পান্না আর প্লাটিনাম-সোনা-রুপোর ঘূর্ণমান গোলক। মহাশূন্য থেকে তাদের আবির্ভাব, শূন্যপথেই পৃথিবীর চারিদিকে তাদের প্রদক্ষিণ। যক্ষপতির রত্নপুরীও হার মেনে যায় সেই ভাসমান রত্নভাণ্ডারের কাছে। স্বয়ং কুবেরেরও চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতন উপযুক্ত এক-একটি গোলক।

পৃথিবী জুড়ে জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত রত্নগর্ভ গোলকটির প্রথম দর্শন থেকে। অবশ্য সেইটিই প্রথম কি না তা বলা মুশকিল। প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কত নামহীন বস্তু আছড়ে পড়ছে... মহাশূন্যর অনন্ত কন্দর থেকে আবির্ভূত হচ্ছে তারা প্রতিনিয়ত... বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষে কেউ ভস্মে পরিণত হচ্ছে... কেউ উল্কা হয়ে জ্বলতে জ্বলতে পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছচ্ছে, নয়তো সাতসাগরের জলে তলিয়ে যাচ্ছে...

ঠিক এমনি কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল বারকয়েক। সাতসমুদ্দুরের জলে ফাঁদ পেতেছিল হানাদার গোলকরা। কেউ তা জানেনি। কেউ সে খবর রাখেনি। কেউ হুঁশিয়ার হয়নি।

প্রথম রত্নগোলকটিকে দেখা গিয়েছিল মঙ্গলগ্রহগামী স্পেসরকেটের রাডার স্ক্রিনে। তাই থেকেই বিজ্ঞানীকুল ধরে নিয়েছিলেন রত্নগর্ভ গোলকদের সেই বুঝি প্রথম আগমন।

কিন্তু ভুল। সম্পূর্ণ ভুল সেই ধারণা।

পৃথিবীর মানুষের রত্নলোভ একদিনে প্রকাশ পায়নি বহিরাগত হানাদারদের কাছে। পৃথিবীর পাথর, খনিজ, পশু এবং মনুষ্য সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে বহু তথ্য আহরণ করেছিল তারা। বিচিত্র পন্থায় সেইসব তথ্য উধাও হয়েছিল পৃথিবীর বাইরে...

বহু ছিদ্রযুক্ত সুবিশাল প্রস্তরগোলক দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই তথ্য আহরণ পর্ব...

না। কেউ দেখেনি পাথরের বলগুলো। রত্নের ছিঁটেফোটাও ছিল না সেসব বলের মধ্যে। ছিল শুধু অজস্র ছিদ্র। অজস্র ছিদ্রের মধ্যে ছিল অজস্র...

এভাবে না বলে গোড়া থেকে বলাটাই সংগত নয় কি!

দ্বিপ্রহর।

আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে নীল আকাশে সহসা আবির্ভূত হল একটা ক্ষুদ্র বিন্দু। বারমুডা দ্বীপের দক্ষিণে জাহাজ চলাচলের পথেই দেখা গেল ক্ষুদে বিন্দুটা। এই অঞ্চল

দিয়েই অতিকায় সমুদ্রপোতগুলো অগণিত যাত্রী এবং মালপত্র নিয়ে চলেছে কিংসটন থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে কোলনে।

বারমুডা দ্বীপ কাছাকাছি থাকলেও জেলের ভিড় নেই অঞ্চলে। জাহাজ চলাচলের পথ বলেই বোধহয় তল্লাটটা পরিহার করাই সংগত মনে করেছে বারমুডাবাসীরা।

এ হেন অঞ্চলে দূর গগনে আচম্বিতে দৃশ্যমান হল একটা কালো ফুটকি।

দুপুর তখন বারোটা। সূর্য যেন গনগন করে জ্বলছে মধ্য আকাশে। চোখ তুলে চাওয়া যায় না।

সমুদ্রও নির্জন। বড় বড় তরঙ্গ আর গাংচিল ছাড়া দৃশ্যমান নয় কিছুই। যেন এই বিশেষ মুহূর্তটির প্রতীক্ষাতেই ছিল দূর গগনের কৃষ্ণবিন্দুটা। নিরালায় নির্জনে চুপিসারে আসাটাই যেন তার মূল অভিপ্রায়।

তাই কালো ফোঁটাটা দেখতে দেখতে আকারে বৃদ্ধি পেল এবং চক্ষের নিমেষে এসে পৌঁছল আটলান্টিকের মস্ত তরঙ্গের শীর্ষে।

নির্জন সমুদ্রে তখন কেউ ছিল না অতিকায় বলটার পিলে চমকানো চেহারা দেখার জন্যে। থাকলে চোখ কপালে তুলে ভিরমি যেত নিশ্চয়। নিছক বল নয়, উড়ন্ত পাহাড় বললেই বুঝি জিনিসটার আয়তন বোঝানো যায় খানিকটা। কিন্তু পৃথিবীর পাহাড়ের মতো শৃঙ্গময় নয়, এবড়োখেবড়ো নয়। রীতিমত মসৃণ, গোলাকার।

এবং সারা গায়ে অগুনতি ছিদ্র...

সাগরের জল তোলপাড় করে প্রচণ্ড শব্দে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল পর্বতকায় আগন্তুক বর্তুল। ধীরে ধীরে তলিয়ে গিয়েছিল তলদেশে।

প্রবালরাজ্যে পৌঁছেও কোনও চাঞ্চল্য দেখা যায়নি বলটার রহস্যজনক ছিদ্রগুলোর মধ্যে। সাগরতলের নিষিদ্ধ সে অঞ্চলে ডাঙার মানুষের ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই আকাশের প্রাণীদের। সে রাজ্যে খেলা করে কেবল অগুনতি মাছ, আর কতশত সামুদ্রিক জীব। জলজ উদ্ভিদের সুগভীর অরণ্যে ওত পেতে বসে থাকে রাক্ষুসে প্রাণীরা।

জলতলের এমনি একটি অরণ্য মথিত করে সাগরতলে অবতীর্ণ হয়েছিল পাহাড়প্রমাণ পাথরের গোলকটা। যে রাজ্যে আকাশের প্রাণীদের ঠাঁই হয় না— নিষিদ্ধ সেই এলাকায় অনায়াসে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে জাঁকিয়ে বসেছিল মহাকাশের মস্ত বর্তুল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনও চাঞ্চল্য দেখা যায়নি অগুনতি ছিদ্রগুলোর মধ্যে। সাগরের জল ছিদ্রগুলোর অন্দরে প্রবেশ করেছিল। একদল মাছও ঘিরে ধরেছিল আগন্তুক গোলকটাকে। মাছগুলো কিন্তু শুধু উঁকিঝুঁকি মেরে চলেছিল শত সহস্র ছিদ্রপথের অন্ধকার সুড়ঙ্গে— প্রবেশের সাহস হয়নি।

চারিদিক নিথর। নিস্তব্ধ।

আচম্বিতে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো মাছগুলো ছিটকে গিয়েছিল ছিদ্রমুখ থেকে। দল বেঁধে উধাও হয়েছিল নিমেষের মধ্যে।

অপার্থিব বস্তুগুলোকে দেখা গিয়েছিল ঠিক তার পরেই।

অকস্মাৎ যেন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল প্রস্তর গোলকের। ওর বিশাল জঠর নিরেট পাথরের

নয়— ফাঁপা। যেন সাড়া পড়ে গিয়েছে তার ফাঁপা জঠরে। যেন সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে পাথরের বলের মধ্যে। পাথরের গায়ে কান পাতলে শোনা যেত ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকি ঠন-ঠন-ঠন-ঠন শব্দ। যেন বিরাট শোরগোল পড়ে গিয়েছে পাথর বলের গোপন রাজ্যে।

শব্দগুলো পাথর জঠরের কেন্দ্রস্থল থেকে যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছিল ছিদ্রপথে। যেন ধাতুর ঝনৎকারে পাথর কেল্লা কাঁপিয়ে এগিয়ে আসছে লক্ষ লক্ষ বর্মধারী... অসি ঝনঝনিয়ে...

পাথরের গায়ে কান পাতলে বিপুল এই উদ্যোগপর্ব টের পাওয়া যেত। নইলে নয়। সাগরতলের শব্দহীন অরণ্যও শব্দহীন থেকে গিয়েছিল। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি কী ঘটতে চলেছে...

তারপরেই ছিদ্রগুলোর মুখে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল অনেকগুলো শিং...

ধাতুর শিং... জোড়া জোড়া শিং। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল অদ্ভুত প্যাটার্নের বেঁকা শিং দুটোর নীচে গোলাকার মাথা। চোখের জায়গায় দুটি ছিদ্র— কাচ জাতীয় চকচকে বস্তু দিয়ে ঢাকা। মুখের জায়গায় অতি সূক্ষ্ম জালতি দিয়ে ঢাকা একটা বিবর। চিবুকের চিহ্ন নেই। লম্বায় প্রায় ফুট দশেক। ল্যাজটা কুন্ডলী পাকানো।

চেহারায় তারা অমানবিক। দানবসদৃশ। ধাতব নরক থেকে যেন পালে পালে এসেছে তারা ক্রূর কোনও অভিসন্ধি নিয়ে। ধৈর্য তাদের মৃত্যুর মতোই অচঞ্চল, সীমাহীন। সহিষ্ণুতা তাদের জন্মগত... তারা ঠায় বসে থাকতে জানে অভিসন্ধি সফল না হওয়া পর্যন্ত।

নিশ্চুপ হয়ে যারা বসেছিল পাথর গোলকের জঠরে, জলতল স্পর্শ করার ক্ষণকাল পরেই তারা যেন নারকীয় উল্লাসে উল্লসিত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হল পালে পালে।

সাগরতল স্পর্শ করার পর অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল ধাতব দানোগুলোর অভ্যন্তরে। কুন্ডলী পাকানো ল্যাজগুলো ধীরে ধীরে সটান হল এবং ল্যাজের ডগায় ভর দিয়ে বালি থেকে ওপরে উঠে দুলতে লাগল প্রতিটি দানো।

আশ্চর্য! সংখ্যায় ওরা কয়েক সহস্র। তা সত্ত্বেও তারা যেন কোনও অদৃশ্য নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ তামিল করে চলেছিল একসঙ্গে, এক তালে, এক ছন্দে। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য!

হাজার হাজার দানো ল্যাজের ডগায় ভর দিয়ে দুলতে লাগল বালি ছেড়ে দশ ফুট ওপরে। তারপর একই সঙ্গে সারি সারি বুদবুদ বেরিয়ে এল জালঢাকা মুখ বিবর দিয়ে।

যেন মূর্তিমান তিতিক্ষা এক-একটি দানো। অসীম সহিষ্ণুতা নিয়ে ল্যাজের ডগায় ভর দিয়ে দুলতে লাগল কয়েক সহস্র ধাতব বিস্ময়। কীসের প্রতীক্ষা? অদ্ভুতদর্শন ওই জোড়া শিংয়ের মাধ্যমে নয়া নির্দেশের?

সত্যিই তাই। বিদঘুটে ওই শিংদুটো প্রকৃতপক্ষে অ্যানটেনা ছাড়া কিছুই নয়। দূর থেকে বেতার-নিয়ন্ত্রক পাইলটহীন এরোপ্লেন উড়তে পারে, চাঁদের বুকে কলকবজা চালু করতে পারে। এ যেন তেমনি। হাজার হাজার ধাতু-দানোর কন্ট্রোল কেন্দ্র হেথা নয়, হেথা নয়, ধরার কোথাও নয়— মহাশূন্যের কোনও অজানা অঞ্চলে কে জানে কোন অতিকায় ব্রেন মমতাহীন অনুভূতি নিয়ে টিপে চলেছে একটির পর একটি কল...

খুব মিহি একটা আওয়াজ শোনা গেল ধাতু-দানোদের অভ্যন্তরে। টিক-টিক-টিক শব্দের যেন বিরাম নেই, বিরতি নেই, বিরাগ নেই।

চালু হয়ে গিয়েছে ধাতু-চরদের মস্তিষ্ক...!

মিনিট যায়, ঘণ্টা যায়। টিক-টিক-টিক-টিক আওয়াজ ছাড়া কিন্তু ক্রূরদর্শন যন্ত্রগুলোর মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য নেই। ওরা ওত পেতে রয়েছে... ওত পেতে রয়েছে...

সূর্য অনেকক্ষণ চম্পট দিয়েছে। এল চাঁদ। দিগন্তে উধাও হল তার রূপোলি দেহ। তারপর এল জোয়ারের টান...।

সাগরতলেও রেশ গিয়ে পৌঁছল জোয়ারের। স্রোতের টান স্থলের দিকে। নড়ে উঠল ধাতুময় যন্ত্রগুলো। সময় হয়েছে নিকট এবার...

খাড়াই ল্যাজ ধীরে ধীরে নেমে এল বালির ওপর। দশ ফুট লম্বা যন্ত্রদানোর ভেতর শোনা গেল নতুন একটা আওয়াজ ফুর-ফুর-ফুর-ফুর! সেই সঙ্গে শম্বুকগতিতে অগ্রসর হল তারা ডাঙার দিকে... চলার পথে ফসফোরেসেন্ট কাদা ঘুলিয়ে উঠতেই দেখা গেল নীলচে আভা...ভুতুড়ে আলো ছড়িয়ে এগিয়ে চলল তারা হাজারে হাজারে ডাঙার দিকে, মানুষের বসতির দিকে...।

কারা এরা? গ্রহান্তর হতে আগত বিভীষিকা সন্দেহ নেই... কিন্তু কোথায় সেই গ্রহ? কী তাদের অভিপ্রায়?

টিক-টিক-টিক-টিক করে চলেছে ব্রেন, ফুর-ফুর-ফুর-ফুর করে ঘুরছে সূক্ষ্ম কলকবজা, দপ দপ করে জ্বলছে ফানুসের মতো দু'দুটো অপার্থিব চোখ...

চোখ তো নয়, যেন টেলিস্কোপ লাগানো ক্যামেরা। সাগরতলের অন্ধকার রাজত্বেও সক্রিয় রইল ওদের যন্ত্রচক্ষু। কোটি কোটি মাইল দূরে বসে সুবৃহৎ যন্ত্রের পরদায় তাদের চোখ দিয়ে জলতলের আশ্চর্য দৃশ্য দেখল তাদের প্রভু...

সে প্রভুর স্বরূপ কী, তা আজও অজ্ঞাত। স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার দিনও আসন্ন— কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে যাবে...

দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল লাখো লাখো ধাতব-বিস্ময়েরা। প্রায় প্রতিদিনই একটি দুটি করে প্রস্তর গোলক উড়ে এল আকাশপথে, অন্তর্হিত হল সাত সাগরের জলের তলায়, কিন্তু এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিটকে গেল না কেউই। মহাকাশের কোনও অদৃশ্য চক্ষু যেন দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ রেখেছিল জলপথের ওপর। সাগরে সাগরে জলযানরা কীভাবে, কোন পথে, কোন দেশ থেকে কোন দেশে যাতায়াত করে, তা যেন তাদের নখদর্পণে। তাই নিউইয়র্ক থেকে লিভারপুল, ত্রিনিদাদ থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে জর্জ টাউন যাতায়াতের পথে যে ভাবে উড়ন্ত গোলারা আশ্রয় নিল জলের অতলে ঠিক সেইভাবেই তারা নিঃশব্দে নেমে এল ভারত মহাসাগরে, প্রশান্ত মহাসাগরে। কাক-পক্ষীও টের পেল না ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত বিভীষিকারা নামছে সাগরে সাগরে! কোরাল সাগরে নেমে এগোচ্ছে অস্ট্রেলিয়া আর অগুনতি দ্বীপের দিকে... ভাসমান সাগরে নেমে ঘাপটি মেরে চলেছে নিউজিল্যান্ড অভিমুখে। দক্ষিণ চিন সাগর থেকে যাচ্ছে চিন উপকূলের দিকে। আলাস্কা অঞ্চল থেকে মার্কিন মুলুকে। ধীরে ধীরে তারা ঘিরে ফেলল আফ্রিকা, মেরুপ্রদেশ, ভারত। কিন্তু কেউ

টের পেল না... ঘুণাক্ষরেও কেউ আঁচ করতে পারল না। এত স্যাটেলাইট, এত জাহাজ, এত আকাশযানের চোখেও ধরা পড়ল না মহাশূন্যর যন্ত্র-সেনানীরা ছেয়ে ফেলেছে জলতল। তাদের রেডিয়ো অ্যানটেনা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে... শুনছে... শুনছে...

বালির উপরেই মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছিল মেটাল মনস্টাররা। তলদেশ থেকে পিচকিরি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জলের ধারা... জলের তোড়ে সরে গিয়েছিল বালি... লম্বা ল্যাজটা বালির মধ্যে ঢুকিয়ে চকচকে চোখদুটো ওপর দিকে তুলে মুখ দিয়ে বুদবুদ ত্যাগ করেছিল পর পর অনেকগুলো... তারপর সহসা বিকল হয়ে গিয়েছিল তাদের কলকবজা... কোটি কোটি যন্ত্রদানবের একমাত্র কন্ট্রোলারের অমোঘ নির্দেশে ওরা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল... বিরামবিহীনভাবে কেবল টিক টিক টিক টিক শব্দে চালু ছিল যান্ত্রিক মগজ।

মাথার ওপর মধ্যে মধ্যে গুমগুম শব্দ ভেসে এসেছে। জাহাজ যাচ্ছে। প্রপেলারে জল তোলপাড় হচ্ছে। কিন্তু নড়েনি ধাতব রহস্যরা। তুফান এসে সাগরে সাগরে তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়েছে... কিন্তু অচঞ্চল থেকেছে সাগর দৈত্যরা। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা যেন ওদের মেশিন ব্রেনের মস্ত বৈশিষ্ট্য।

দীর্ঘকাল পরে এসেছিল নতুন নির্দেশ। সময় হয়েছে নিকট, এখন...!

ধাতব দানোদের তলদেশ থেকে আবার তোড়ে বেরিয়ে এসেছিল জলের ধারা। সাবমেরিনের ট্যাঙ্ক খালি হয়ে গেলে যেমন ধীরে ধীরে উঠতে থাকে জলপৃষ্ঠের দিকে— ঠিক সেইভাবে ল্যাজের ধাক্কায় এবং জলের তোড় দিয়ে বালি ছেড়ে উঠে পড়েছিল তারা...জল ঢাকা মুখবিবর থেকে নির্গত হয়েছিল সারি সারি বুদবুদ...

দীর্ঘকাল জলতলে ওত পেতে থাকার ফলে শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদের আস্তরণ পড়েছিল ওদের ধাতব দেহে। নীলচে শুঁড় বেরিয়েছিল সামুদ্রিক উদ্ভিদগুলো থেকে— যেন ধাতুদানবদেরই দেহ থেকে ঠেলে বেরিয়েছিল কিলবিলে শুঁড়গুলো। সাপের মতো বিষাক্ত চাহনি আরও ক্রূর হয়ে উঠেছিল গা ঘিনঘিনে আকৃতির জন্যে... নরক থেকে আবির্ভূত ভয়ংকর দানবও বুঝি এদের চাইতে কম ভয়ংকর!

সাবমেরিনের মতোই এরা নিঃশব্দে জলতল থেকে উঠে এসেছিল জলপৃষ্ঠের দিকে। শ'-খানেক ফুট বাকি থাকতেই স্তব্ধ হয়েছিল উর্ধ্বগতি। দশ ফুট দীর্ঘ কল্পনাতীত আতঙ্কেরা অপরিসীম ধৈর্যসহকারে ভেসে থেকেছে... টিক টিক টিক টিক টিক করে কেবল চালু থেকেছে মস্তিষ্ক মেশিন।

চরম মুহূর্তের জন্য ধীর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থেকেছে কোটি কোটি ভিনগ্রহী মেশিন, স্পাই-সসাররা ধরিত্রী জুড়ে। যে কাজের ভার নিয়ে তাদের আগমন, অভীপ্সিত সেই মুহূর্ত এল বলে...

আবার জাহাজ চলার শব্দ ভেসে এল জলের মধ্যে দিয়ে গুমগুম করে। সাগরতলের দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল চাপা ধ্বনি... সতর্ক যন্ত্রচরেরা।

জাহাজের বিশাল তলদেশ দেখা যাচ্ছে। মস্ত তিমির মতোই জলতল অন্ধকার করে দিয়ে এগিয়ে আসছে বিশাল ছায়াটা। ঠিক চলার পথে ওত পেতে ছিল যে দানবটি, নড়ে উঠল সে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালু হয়ে গেল তার দেহের অভ্যন্তরে।

মেশিন চলছে... ফুর-ফুর-ফুর-ফুর শব্দে মেশিন চলছে... আরও ওপরে উঠছে জলদানব... জাহাজের লৌহখোলের ঠিক নীচে এসে পৌঁছেছে তার দশফুট দীর্ঘ নারকীয় সরীসৃপ বপু।

পর মুহূর্তেই ঘটল কাণ্ডটা।

কট করে একটা শব্দ হল মেশিন-স্পাইয়ের মধ্যে।

দু'পাশ থেকে বেরিয়ে এল দুটি করে চারটি প্রত্যঙ্গ। ঠিক যেন ভাঁজ-করা কলের হাত। শুধু যা পাঁচটি আঙুল আর চেটোর বদলে একটা চ্যাটালো পাত। ধাতুর পাত। চারটে পাত সেঁটে গেল লোহার খোলের তলদেশে। এত জোরে সেঁটে গেল যেন ইলেকট্রিক ম্যাগনেটে আটকে গেল লোহার সঙ্গে লোহা।

বিচিত্র ধরনের বেঁকানো শিংদুটো স্পর্শ করেছে জাহাজের লৌহতলদেশ। অতি সূক্ষ্ম অনুরণন, অতি মিহি কম্পন, অতি সামান্য বৈসাদৃশ্য ধরা পড়েছে অ্যানটেনায় আর ওই চারটে চ্যাটালো পাতে। কম্পনগুলোর রেকর্ড হচ্ছে মেশিন ব্রেনে, নানা তরঙ্গে ভেঙে যাচ্ছে, বিভিন্ন কম্পনের আকারে উধাও হচ্ছে মহাশূন্যে।

জাহাজের কোনও শব্দই বাদ গেল না। জাহাজ চলার শব্দ থেকে আরম্ভ করে যাত্রী আর খালাসিদের কথাবার্তার শব্দ পর্যন্ত সব কিছুরই কম্পনতরঙ্গ গ্রহণ করল মেশিনটি, বিবিধ কম্পিউটারের মাধ্যমে ভেঙেচুরে গ্রহান্তরে কন্ট্রোলারের বোধগম্য করে নিক্ষেপ করল জলপৃষ্ঠে ভেদ করে মহাকাশে।

অসামান্য শক্তিধর মেশিন-স্পাইদের অসাধারণ ক্ষমতার নমুনা পাওয়া গেল এইভাবে। ছত্রিশ জাতের ভাষার বাধা তার কাছে কিছুই নয়। যে কোনও ভাষায় ভাব জানা তার কাছে নেহাতই ছেলেখেলা।

তবে কি টেলিপ্যাথি জেনেও বসে আছে মেশিন-স্পাই? কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। টেলিপ্যাথি মানে চিন্তাপঠন বা দূর হতে অন্যের ভাব গ্রহণ। অতীন্দ্রিয়র অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি না থাকলে তো তা সম্ভব নয়! টেলিপ্যাথি জানতে পারে কেবল অতিমানুষরা অথবা সেইসব প্রাণীরা যারা বাক্য যন্ত্রের অসাড়তা অনুধাবন করেছে যুগ যুগ আগে... তারা মন দিয়ে কথা বলে, মুখ দিয়ে নয়।

কিন্তু যন্ত্রের পক্ষেও কি তা সম্ভব নয়? মানুষের মগজে প্রতিটি চিন্তাই তো বিভিন্ন বিদ্যুৎতরঙ্গ... মস্তিষ্কের অনুন্নত সম্মুখ প্রদেশে যার নাম অ্যালফা-বিটা ব্রেন ওয়েভ— যার আবির্ভাব দেখা যায় কেবল ধ্যানস্থ পুরুষদের মগজেই...

কিন্তু এমন কোনও যন্ত্র কি সম্ভব নয় যা দিয়ে মস্তিষ্ক-তরঙ্গের পরিমাপ সম্ভব? বিভিন্ন তরঙ্গের পরিমাপ করে নিয়ে তাকে ভেঙেচুরে নিজের বোধগম্য তরঙ্গে অনুবাদ করে নিলেই তো টেলিপ্যাথি সম্ভব! দরকার কি মুখ দিয়ে কথা বলার! দরকার কি অসংখ্য ভাষা অনুধাবন করার! আলোর চেয়েও দ্রুতগতিসম্পন্ন কণা যারা আবিষ্কার করেছে, টাইকনস-এর চাইতেও বেগবান কণিকা বাহন যাদের মুঠোয়, যারা দূর নক্ষত্রলোক থেকে যান্ত্রিক চর বোঝাই উড়ন্ত গোলা পৃথিবীর বুকে পাঠিয়ে পৃথিবীবাসীদের খাঁচার গিনিপিগের মতো

পর্যবেক্ষণ করে চলেছে— তারা কি নিছক টেলিপ্যাথি যন্ত্রও বানিয়ে নিতে পারে না?

নিশ্চয় পারে। তাই রাত্রি নিশীথে শুরু হল জ্ঞান চুরির পালা। ঘুমন্ত যাত্রীসাধারণ আর টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের মগজ থেকে মেমোরি ব্যাঙ্ক লুঠ পর্ব। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার আহরণে মত্ত হল মেশিন-স্পাইরা।

ব্যাপারটা অভিনব! একমাত্র আজগুবি গল্পেই মানায়। কিন্তু রত্নগোলকদের পুরো কাহিনিটাকেই তা হলে গাঁজার দম বলে উড়িয়ে দিতে হয়।

নিশুতি রাতে জাহাজশুদ্ধ প্রাণী যখন ঘুমে অচেতন, তখন শুরু হল কল্পনাতীত সেই চুরি পর্ব। মস্তিষ্কের ধূসর কোষে সঞ্চিত যত কিছু শিক্ষা-দীক্ষা-স্মৃতি লুণ্ঠন করল ভিনগ্রহী আগন্তুকরা। না, না, লুণ্ঠন করল বললে অন্যায় হবে। যেখানকার জিনিস সেখানেই রইল, ওরা কেবল তার হুবহু ছাপ তুলে নিলে। মোমের ওপর চাবির ছাপ তোলার মতো কপি করল প্রতিটি মানুষের মগজে সঞ্চিত জ্ঞানের ভাঁড়ারকে!

একই ঘটনা ঘটল সসাগরা পৃথিবীতে। জলে ভাসমান জাহাজগুলি ধাতু দানোদের এলাকায় পৌঁছতে না-পৌঁছতেই আক্রান্ত হল। রাত্রি নিশীথে নকল হল প্রতিটি প্রাণীর মস্তিষ্ক।

অভিনব! আশ্চর্য! অবিশ্বাস্য! কিন্তু বিশ্বাস করা না করাটা পাঠকের অভিরুচি। লেখক লিখবে নির্জলা সত্য। হয়তো তা কল্পনারঙিন, কিন্তু ফ্যানটাসটিক গল্পমাত্রই তো তাই।

একদিন-দু'দিন নয়, দীর্ঘদিন ধরে চলল এই কারবার। শুধু জলপথ সম্বল করেই পৃথিবীবাসীদের সভ্যতাকে জানল ভিনগ্রহের অতি ধীমান জীবকুল। আমাদের বিভিন্ন ভাষা, ভাব, আশা— কিছুই অগোচর রইল না। আমাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, আবিষ্কার, প্রগতির দৌড়ও অজানা রইল না। আমাদের ঠিকুজি কুষ্ঠী পর্যন্ত রেকর্ড হয়ে গেল তাদের খাতায়। কোন কোন দ্রব্যের প্রতি আমাদের লোভ আকাশচুম্বী, সে তত্ত্বও আর অজ্ঞাত রইল না তাদের কাছে।

তারা জানল আমাদের চরমতম দুর্বলতার গোপনতম সংবাদ— রত্নর প্রতি আবালবৃদ্ধবনিতার দুর্দমনীয় আকর্ষণ। হিরের স্থান এখানে মহারাজার মুকুটে, বিলাসিনীর কণ্ঠে, ধনীর সিন্দুকে। অথচ হিরের মূল উপাদান যা, কয়লারও তাই— অর্থাৎ কার্বন!

মূর্খ মানুষগুলোর এহেন আহাম্মকি দেখে নিশ্চয় অট্টহাসির রোল পড়েছিল ভিনগ্রহীদের মধ্যে। নিছক কতকগুলো পাথরের লোভে যে জীবগুলো মারামারি কাটাকাটির শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে পারে, তাদের কবজায় আনতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না ভেবে উল্লসিতও হয়েছিল বইকি! অবোধ শিশুদের খেলনা দেখিয়ে ভোলানোর মতো হিরে-পান্না-চুনি-সোনা দিয়ে দু'-পেয়ে মানুষগুলোকে...

অ্যালকেমি জিনিসটা অকাল্ট সায়েন্সে আছে। আধুনিক সায়েন্স তা অস্বীকার করে। সিসেকে সোনায় রূপান্তরিত করা অ্যালকেমিস্টদের কাছে ছেলেখেলার সামিল। তাদের থিয়োরি হল, সব বস্তুরই মূল উপাদান একই। আলটিমেট অ্যাটম দিয়েই গড়া বিশ্বসংসারের যাবতীয়

জিনিস। এক-একটি বস্তুর মধ্যে অণু-পরমাণুর বিন্যাস এক-একরকমের। এই বিন্যাসে হেরফের ঘটাতে পারলেই এক বস্তুকে পালটে আর এক বস্তু করা অতি সহজ ব্যাপার। সিসের আলটিমেট অ্যাটমকে সোনার আলটিমেট অ্যাটমের ছকে সাজালেই সোনা পাওয়া যাবে। ঠিক এইভাবেই হিরে পাওয়াও বিচিত্র নয়।

ঠিক এই জাতীয় কোনও বিদ্যে ভিনগ্রহীদের জানা ছিল কিনা জানা নেই। তবে তারা যে নকল সোনা নকল হিরে বানাতে মত্ত হল তাদের বিরাট কারখানায়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল রত্নগোলকদের আবির্ভাবের পর থেকে।

জালিয়াতির এত বড় দৃষ্টান্ত ছায়াপথে আর কোথাও বুঝি দেখা যায়নি। পৃথিবীর দামি পাথর বা দামি ধাতুর কোনওটিই হয়তো ছিল না তাদের গ্রহে। কিন্তু তারা জাল করল সোনা-হিরে-প্লাটিনাম-পান্না-ইউরেনিয়াম-মুক্তো। নির্মিত হল রত্ন গোলক। তারপর— কিন্তু তার আগের পর্যায়গুলো না বললে মাটি হবে গল্পটা।

জাহাজে জাহাজে আটকে থেকে মানুষ জাতটার সব খবর পৃথিবীর বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার পর নতুন অভিযানে নামল ধাতব বিস্ময়েরা। প্রশান্ত মহাসাগরের ছন্নছাড়া কতকগুলো দ্বীপে অকস্মাৎ আবির্ভূত হল তারা।

সংখ্যায় ওরা ছিল কোটিরও অধিক। ছড়িয়ে ছিল।

জাহাজ মারফত খবর সংগ্রহ করার পর ফের তারা তলিয়ে গিয়েছিল সাগরের তলদেশে।

তারপর একদিন এল নতুন নির্দেশ। কয়েক লক্ষ মেটাল মনস্টার গুটিগুটি অগ্রসর হল ডাঙার দিকে।

জার্ভিস দ্বীপের সমুদ্রতীর। বালুকাবেলার মাঝে মাঝে কিছু গাছের ভিড়। গভীর রাতে নিঃশব্দে জল থেকে উঠে এল একটা ধাতুদানো। তীরে উঠল আরও নিঃশব্দে। বালির উপর দাগ কেটে এগোল গাছপালার অন্ধকারে।

ঠিক এমনি ঘটনা ঘটল বেফার্ট সাগরের র‍্যাঙ্গল দ্বীপে, দক্ষিণ আটলান্টিকের গফ দ্বীপে, ব্যারেস সমুদ্রের বেয়ার দ্বীপে, ল্যাপটেভ সমুদ্রের তাইমির উপদ্বীপে, ওখোটস্ক সাগরের কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে, ভারত মহাসাগরের রডরিগেজ দ্বীপে। রাত্রি নিশীথে তারা উঠে এল জল থেকে কিম্ভূতকিমাকার সামুদ্রিক সরীসৃপের মতো। নিঃসাড়ে পড়ে রইল ভোর রাত পর্যন্ত। টিক-টিক-টিক-টিক শব্দে অবিরাম চালু রইল প্রচণ্ড মস্তিষ্ক।

ভোররাতে এল নতুন সিগন্যাল। শব্দহীন সঞ্চারে একে একে তারা ফিরে গেল সাগরের নিভৃত অঞ্চলে।

পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে ভিনগ্রহীদের। না! বিস্ফোরণের কোনও প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে সিগন্যাল এলে যাতে প্রলয়ংকর পরমাণু বোমার সমতুল্য বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে এক-একটি মেটাল মেশিন, সে আয়োজন এখন সম্পূর্ণ।

এখন শুধু প্রতীক্ষা।

এ প্রতীক্ষা আরও একটি প্রলয়ের।

কোটি কোটি মেটাল মেশিনের অনেকের মধ্যে ঠাসা ছিল প্রলয়ংকর এক্সপ্লোসিভ। লক্ষ লক্ষ অ্যাটম বোমার সমতুল্য বিস্ফোরণ ঘটানোর যোগ্য দানব তারা। আত্মঘাতী যন্ত্রদানব।

বাকিগুলোর মধ্যে ছিল কল্পনায় আনা যায় না এমন কিছু কলকবজা। তাদের যোগাযোগ সরাসরি সূর্যনিক্ষিপ্ত প্রোটন স্রোতের সঙ্গে! সূর্যের জঠরে যেখানে প্রতি সেকেন্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ফিউশন বম্ব বিস্ফোরিত হয়ে চলেছে, যেখানকার সৌরঝড় বিবিধ পরিবর্তন আনছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে— সেই সূর্যজঠর থেকে নিক্ষিপ্ত প্রোটন স্রোতকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে এনে নিজ দেহে কেন্দ্রীভূত করার কলকবজা উদরে নিয়ে কিছু ধাতুযন্ত্র নেমেছিল পৃথিবীর সাগরে। সিগন্যাল এলেই সক্রিয় হবে তারা।

পরিণাম? অতি ভয়ংকর!!

প্রচণ্ড পরিবর্তন আসবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। দেখা দেবে মেকি হিমযুগ অথবা মহাপ্লাবন, অথবা প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি, অথবা প্রবল বর্ষণ!

প্রতীক্ষা শুধু একটি সংকেতের!

তারপরেই কী ঘটবে, তা মানুষের হিসেবের বাইরে, গণকযন্ত্রের গণনারও বাইরে। আবহাওয়ার পরিবর্তন আসবে অবশেষে। তার আগে পালটে যাবে ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্টের চৌম্বকক্ষেত্র। মহাসমুদ্রের হিট কারেন্টে এর তাপমাত্রা স্থলভাগের তাপমাত্রা চৌদ্দশ স্ট্রিমের গতিবেগ-তাপমাত্রা গতিমুখ আয়তন এবং বিস্তার; স্থলভাগের উপর বাতাসের গতিবেগ; সব কিছুর মিলিত পরিণামে হবে আবহাওয়ার পরিবর্তন স্থলভাগে বিপর্যস্ত; জলদেশে প্রলয়। সাগরের তলদেশ ঊর্ধ্বে উঠবে, মেরুপ্রদেশের হিমবরফ পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। বরফ পড়বে নয়তো অনাবৃষ্টি হবে। আবহাওয়ার বিপর্যয় মানেই পৃথিবীবাসীর মৃত্যু। পৃথিবীর মৃত্যু।

শোচনীয় সেই মৃত্যুর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল সবার অগোচরে। কেউ জানতেও পারল না, টিক-টিক-টিক-টিক শব্দে লক্ষ লক্ষ মৃত্যুদূত ওত পেতে রয়েছে জলে। সংকেত এলেই উঠে আসবে তারা স্থলে। তারপর...!

না। আজও কেউ জানে না পৃথিবীব্যাপী দ্বন্দ্ব, উল্লাস, হানাহানির আড়ালে তারা ওত পেতে রয়েছে স্থলদেশ ঘিরে সাগরের জলে। সিগন্যাল এলেই নিশ্চিহ্ন করবে সৌরজগতের একটি গ্রহ...

সে সিগন্যাল আসবে হয়তো তখনই যখন আমরা পাড়ি জমাব মহাকাশে তাদের গ্রহাভিমুখে। শ্রেষ্ঠ রণনীতি তো তাই। ডিফেন্স ইজ দ্য বেস্ট অফেন্স।

এই ঘটনার পর অতিবাহিত হয়েছে অনেকগুলি বছর। বিজ্ঞান আরও এগিয়েছে পৃথিবীর বুকে। সব খবরই রেখেছে গ্রহান্তরের হুঁশিয়ার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন পূর্বেই তারা জেনেছিল সৌরজগতের এই তৃতীয় গ্রহে যাদের বাস, তারা প্রচণ্ড লোভী এবং অশান্তির পূজারী। বিজ্ঞানকে তারা এগিয়ে নিয়ে চলেছে কেবল একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্য গ্রহে-গ্রহান্তরে উপনিবেশ পত্তন, সেখানকার সম্পদ লুণ্ঠন এবং হানাহানির রাজনীতিতে আরও শক্তিবর্ধন। তারা জেনেছিল বিধাতার আশীর্বাদে এবং বহু লক্ষ বছরের বিবর্তনের প্রসাদে

দুপেয়ে এই মানুষজাতের মস্তিষ্ক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছলেও অধিকাংশই এখনও ষড় রিপুর অধীন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দাস।

তাই তারা হুঁশিয়ার হয়েছিল বহু বছর আগে থেকেই। ঝাঁকে ঝাঁকে পাথরের ঝাঁঝরা গোলা পাঠিয়েছিল, মেশিন প্রহরীদের মোতায়েন করেছিল পৃথিবীরই বুকে। স্থলদেশ ঘিরে রেখে তারা প্রতিনিয়ত গুপ্তচরগিরি করে এসেছে; পৃথিবীর প্রতিদিনের প্রগতি এবং অবনতির সংবাদ পাঠিয়েছে লং লং ওয়েভলেনথে অর্থাৎ অতি দীর্ঘ বেতারতরঙ্গে।

আর, অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রতীক্ষা করেছে সেই দিনের যেদিন পরধনলোভী মানুষ নিজের সীমানা ছাড়াবে, মহাকাশের দিকে দিকে বোম্বেটে জাহাজ পাঠাবে, অন্য গ্রহের শান্তি বিঘ্নিত করবে, তাদের অঢেল সম্পদের দিকে শ্যেন দৃষ্টি দেবে।

সেইদিন যখন এল, ঠিক তখনই রত্নগোলকদের আবির্ভাব ঘটল মহাশূন্যে।

প্রথম রত্নগোলকটা আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই শুরু হল জল্পনা-কল্পনা। এবং জল্পনার সূত্রপাত করবে বলেই স্বেচ্ছায় ধরা দিল প্রথম রত্নগোলকটি।

জল্পনা-কল্পনা থেকে আলোচনা, আলোচনা থেকে গবেষণা, তাই থেকে সুবুদ্ধির উদয় হয় হোক। নইলে তো টাইমবম্ব পাতাই রইল সাগরে সাগরে। লাখো লাখো পারমাণবিক বিস্ফোরণ দিয়ে নিমেষের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া যাবে হিংস্র পৃথিবীকে, নইলে বরফ দিয়ে জমিয়ে দেওয়া যাবে, জল দিয়ে সলিলসমাধি ঘটানো যাবে, অনাবৃষ্টি দিয়ে প্রাণহীন করা যাবে।

কিন্তু সেটা তো উদ্দেশ্য নয় ভিনগ্রহী অতি উন্নত জীবদের। তারা চায় গ্রহে শান্তি। তাই শেষ সুযোগ দিল তারা।

রত্নগোলকের আবির্ভাবই সেই সুযোগ।

এ-গল্প যখনকার, তখন পৃথিবী থেকে বিস্তর রকেট জাহাজ পাড়ি দিচ্ছে মহাশূন্যের দিকে দিকে। চাঁদ হয়েছে মহাকাশ অভিযানের সদর ঘাঁটি। সৌরজগতের প্রায় সব ক'টি গ্রহেই ছোটখাটো উপনিবেশ গঠন করেছে পৃথিবীর মানুষ। রকেট-জাহাজবোঝাই বিস্তর দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ পাঠিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর কারখানায়। মোট কথা, প্রায় গোটা সৌরজগতেই আধিপত্য বিস্তার করেছে মানুষ— স্বপ্ন দেখছে ছায়াপথের আরও দুর্গমের অভিযাত্রী হওয়ার, আরও রত্ন আহরণ করার।

ঠিক এই সময়ে রত্নগোলকেরা একে একে আবির্ভূত হতে লাগল মহাশূন্যে। রত্ন এসে পৌঁছল দোরগোড়ায়।

প্রথম গোলকটির দেখা গিয়েছিল মঙ্গল গ্রহগামী স্পেসশিপের রাডার স্ক্রিনে।

সবুজ রঙের বিন্দুটাকে আচম্বিতে আবির্ভূত হতে দেখা গেল স্ক্রিনের ঠিক মাঝখানে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মহাকাশ-বিশেষজ্ঞরা। কী আশ্চর্য! এ সময়ে এ জায়গায় এমন সবুজ বস্তু তো এর আগে কখনও দেখা যায়নি। মঙ্গলগ্রহ আর পৃথিবীর মধ্যে স্পেসশিপ চালনায় পোক্ত পাইলট বললে, 'তোবা! তোবা! স্পেস জায়গাটা দেখছি চিরকালই মিস্টিরিয়াস! কস্মিনকালেও তো বাপু তোমাকে দেখিনি— এলে কোত্থেকে?'

যার উদ্দেশ্যে এই বিস্ময়োক্তি, সেই সবুজ বিন্দুটা ক্রমশ বড় হয়েই চলল। প্রমাদ গনল

অপারেটররা। ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন এখুনি স্পেকট্রো-অ্যানালিসিস করে দেখা হোক জিনিসটা কী।

সঙ্গে সঙ্গে হল স্পেকট্রো-অ্যানালিসিস। জানা গেল জিনিসটা অতি নিরীহ একটা অ্যাসটেরয়েড। গ্রহাণু। কিন্তু হেলাফেলার বস্তু নয় মোটেই। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতোও নয়। কারণ ওর মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত মূল্যবান খনিজসম্ভার। ফিরিস্তি দেখে তো মুণ্ডু ঘুরে গেল ক্যাপ্টেনের। তাজ্জব ব্যাপার তো! গ্রহাণু বাসা করেছে লোহা, কোবাল্ট, নিকেল, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্লাটিনাম, ইরিডিয়াম এবং আরও কত কী দিয়ে!

ওরে বাবা! এরই নাম কী ভগবানের ভাঁড়ার! যন্ত্রপাতির রত্নপুরী! ভাসমান সম্পদ! চক্ষুস্থির হয়ে গেল রকেট-জাহাজশুদ্ধ মানুষগুলির। গুলতানি আরম্ভ হল সঙ্গে সঙ্গে। এতটা পথ পেরিয়ে এত ঝক্কি-ঝামেলা পুইয়ে মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়ার আর প্রয়োজন আছে কি? নিশ্চয় না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। পথে যা পাওয়া যাচ্ছে, আগে তাই কুড়িয়ে নেওয়া যাক। তারপর...

লুঠ হয়ে গেল গোটা রত্ন-গোলকটা। শিকেয় উঠল মঙ্গলগ্রহে যাওয়া। ভাসমান রত্ন-গোলকের গায়ে স্পেসশিপ ভিড়িয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে পড়ল লোভী মানুষেরা। দীর্ঘদিন ধরে রত্নশূন্য করল রত্নগোলককে— জাহাজ-বোঝাই করে রত্ন নিয়ে ফিরে এল পৃথিবীতে।

হইচই পড়ে গেল দেশে দেশে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল খনিজ ব্যবসায়ী আর জহুরিরা। একটিমাত্র রত্নগোলকের আবির্ভাবেই লাটে ওঠার উপক্রম হল তাদের কারবার।

রত্নগোলক নামটা চালু হল কিন্তু তখন থেকেই।

এরপর গেল আরও দু'বছর। দীর্ঘ দু' বছরে গোটাদশেক রত্নগোলক কোত্থেকে জানি উড়ে এল পৃথিবীর মহাকাশে।

ফলে, হিড়িক উঠল রত্নগোলক লুঠ করার। এককালে যেমন সোনার খোঁজে অথবা ইউরেনিয়ামের তল্লাশে দুঃসাহসীরা জীবন পণ করে বেরিয়েছিল, অরণ্যে-মরুভূমিতে-পর্বতে— এও যেন ঠিক তেমনি। সোনা আর ইউরেনিয়াম উন্মাদ করে ছেড়ে ছিল কত ডাকাবুকো মানুষকে।

মহাকাশে যারা একদা স্বপ্ন দেখেছিল দুর্গমের অভিযাত্রী হওয়ার... সৌরজগতের চৌহদ্দি পেরিয়ে ছায়াপথের দিকে দিকে বিজয় কেতন উড়িয়ে দেওয়ার— তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল।

চৌকাঠের সামনে রত্ন ছড়িয়ে ভুলিয়ে রাখা হল রত্নলোভীদের।

দু' বছর পর শুরু আরেকটি রহস্য। একটির পর একটি মহাকাশযান নিখোঁজ হতে লাগল মহাশূন্যে। একই সঙ্গে আচম্বিতে বন্ধ হল রত্নগোলকদের আবির্ভাব। হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল রত্নলোভী স্পেসশিপগুলো। রত্ন চাই, রত্ন চাই, আরও রত্ন চাই।

কিন্তু কোথায় রত্নগোলক। আচম্বিতে যাদের আবির্ভাব, আচম্বিতেই তারা উধাও হয়ে গেল মহাকাশপট থেকে। কেউ আর এল না, কেউ না।

শুধু দূরপাল্লার মহাকাশযানগুলো একে একে নিখোঁজ হতে লাগল... পথ চলতে চলতে

ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যেতে লাগল... যেন ভানুমতীর ভেলকি আরম্ভ হয়ে গেল নক্ষত্রলোকে।

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতোই। দারুণ প্যানিকে কাষ্ঠহাসি হাসতে গিয়ে কাঁদো কাঁদো হলেন এমন অনেক বৈজ্ঞানিক যাঁদের নামধাম ফাঁস করলে মানহানির মোকদ্দমা হয়ে যেতে পারে। থিয়োরি বানাতে সিদ্ধহস্ত তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা পর্বতপ্রমাণ থিয়োরি খাড়া করে ফেললেন, গালগল্পের ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করলেন, সায়েন্স ফিকশন আর ফ্যানটাসি ম্যাগাজিনগুলোর কাটতি বাড়িয়ে ছাড়লেন। যে তিব্বতে এককালে মূল রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় হত শুধু মাখন গলিয়ে বেদিমূলে জ্বালিয়ে অর্চনা করার জন্যে, তারা কমিউনিস্ট সরকারের কাছে সম্মিলিত আবেদন জানাল, বরাদ্দটা আবার চালু করা হোক এবং পরিমাণটা বাড়ান হোক। দেবতা নিঃসন্দেহে কুপিত হয়েছেন। এত পাপ তিনি সইতে নারাজ।

টর্নেডো-টাইফুন-হারিকেনও ম্লান হয়ে যায় গুলতানির সেই গতিবেগের কাছে। ত্রিভুবন জুড়ে যখন এই হুলস্থূল কাণ্ড, তখন একটিমাত্র মানুষ ধীরস্থির হয়ে বসেছিলেন তাঁর সেকেলে বীক্ষণাগারের উঁচু টুলে। হেঁট হয়ে বসে জাবদা খাতায় অঙ্কের পর অঙ্ক কষে যাচ্ছিলেন একমনে। যে টেবিলে তিনি কনুই রেখেছেন, সেটি তাঁর ল্যাবরেটরিতে তৈরি। কাঠের মতো দেখতে হলেও বস্তুটা কাঠ নয়, এক জাতীয় প্লাস্টিক। বানানো হয়েছে খবরের কাগজ থেকে! যে টুলে বসে আছেন, সেটিও এই মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি ঠাসা বীক্ষণাগারে তৈরি। এটির উৎপত্তি মানুষের বাতিল চুল থেকে, যদিও দেখে মনে হয় দারুণ দামি কাঠ।

মানুষটা বৃদ্ধ। তোবড়ানো গাল। মাথার সাদা চুল অর্ধেক উধাও হয়েছে। সুতো বাঁধা চশমা ঝুলছে নাকের ডগায়। গায়ে মলিন কাঁধফাটা পাঞ্জাবি এবং হাঁটু পর্যন্ত তোলা কাপড়। শীর্ণ, দীর্ঘ, অতি দীনহীন মূর্তি মানুষটার। দেখে ভক্তি হয় না মোটেই। শুধু অনুকম্পা হয়।

কিন্তু শ্রীহীন এই মানুষটাই মেদিনী কাঁপিয়েছেন তাঁর কয়েকটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার দিয়ে। উড়ন্ত ছাতার অন্তর্ধান, বামন করার রশ্মির বিটলেমি, উড়ন্ত গোলার জ্বলন্ত রহস্য ইত্যাদি বিবিধ কীর্তি যশের শিখরে তুলে এনেছে ভদ্রলোককে। পাঠক বোধ করি এবার ঠাহর করে ফেলেছেন সাদাসিধে মানুষটার প্রকৃত পরিচয়।

হ্যাঁ। ইনিই বাংলার গৌরব, পৃথিবীর মুশকিল-আসান প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। পদবিটা হয়তো কোনওকালে চক্রবর্তী ছিল। নামটা যে ছাই কী ছিল, তা প্রফেসরের নিজেরও নাকি মনে নেই। দিনরাত কলকবজা নিয়ে খুটুর-খুটুর করার পর থেকেই লোকে তাঁকে ওই নামেই ডেকে এসেছে। তিনি তাতেই খুশি। এবং এই নামেই তিনি এখন জগদ্বিখ্যাত।

বিখ্যাত হওয়ার জ্বালা অনেক। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকেও পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে দীর্ঘকাল। অতি কষ্টে তিনি কুখ্যাত চিটিংবাজদের বিখ্যাত মিটিংগুলো বর্জন করে আবার সেঁধিয়েছেন নিজের খুপরিতে। বার্নার, বকযন্ত্র আর টেস্টটিউব নিয়ে ভাবছিলেন টিস্যু কালচার করে দানব সৃষ্টি সম্ভব কিনা। এমন সময়ে একটা নতুন আইডিয়া এল তাঁর উর্বর মগজে।

আইডিয়াটা অভিনব। টিস্যু কালচারের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, জঞ্জাল থেকে জ্বালানি তৈরির প্ল্যান।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তাই ফার্নেস জ্বালিয়েছেন। রাস্তার আঁস্তাকুড় থেকে চুপড়ি-বোঝাই জঞ্জাল এনে বিশেষ ধরনের রাসায়নিকে ডুবিয়ে জ্বাল দিচ্ছেন একনাগাড়ে।

ফল হয়েছে সাংঘাতিক। জ্বালানি গ্যাস ঠাসা একটা রকেট বানিয়ে তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন পমেরিয়ান কুকুরটার পিঠে। বেগবান রকেটের মতোই কুকুরটা নিমেষে উধাও হয়েছে মেঘলোকে!

প্রফেসর এখন অঙ্ক কষে দেখছেন, প্রতিদিন পাঁচ টন এনার্জি-গ্যাস বানাতে পাইলট প্ল্যান্ট বাবদ খরচ পড়বে কত। ফলাফল দেখে চোখ কপালে উঠল তাঁর। খরচ বলতে গেলে কিছুই নেই। ধাপার মাঠে প্ল্যান্ট বসালে এক ঢিলে দু'পাখি মরবে। নিখরচায় চলবে শহরের মোটর, বাস, লরি। টিট হবে পেট্রল কোম্পানিগুলো। আর সাফ হয়ে যাবে আবর্জনার স্তূপ।

কলম নামিয়ে গালে হাত দিয়ে প্রফেসর ভাবছেন এই আবিষ্কারের ফলে পেট্রল মন্ত্রীর চাকরি যাবে কিনা এবং ভারত সরকার তাঁর ওপর নারাজ হবেন কিনা। ঠিক এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলাম আমি।

ঢুকেই তো গা পাক দিয়ে উঠল আমার। সে কী দুর্গন্ধ! নাক টিপে ধরেই বমি বন্ধ করা মুশকিল হল— এদিকে দম আটকে প্রাণটাও যায় যায়।

প্রফেসর কিন্তু হাসি হাসি মুখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন গন্ধটা জঞ্জালের নয়— পারিজাত পুষ্পের।

তারপর যখন আমার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বেরলো, তখন সম্বিৎ ফিরল তাঁর। লাফিয়ে উঠে ঘটাং করে একটা সুইচ টেনে দিলেন। অমনি হু হু করে আতরের গন্ধে খোশবাই হল বীক্ষণাগার, দুর্গন্ধ হল উধাও!

নাক ছেড়ে চোখ পাকিয়ে বললাম, 'হচ্ছে কী এসব?'

'আবিষ্কার।'

'তা তো নাক দিয়েই টের পাচ্ছি—। কাগজ দেখেছেন আজকের?'

'না তো!'

'আপনাকে লন্ডন চিড়িয়াখানার সেক্রেটারি আর ইউনেস্কোর সেক্রেটারি-জেনারেল করার প্রস্তাব উঠেছে। সেই সঙ্গে—'

খাবি খেলেন প্রফেসর, 'কী বললে? চিড়িয়াখানার সেক্রেটারি আর রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল? দুটো কি এক বস্তু হল, বলি, দুটো কি এক জিনিস?' শেষের দিকে সে কি মুখখিঁচুনি প্রফেসরের।

'হয়তো তাই।' মনটা খারাপ হয়ে গেল ফোকলা মাড়ির খিঁচুনি দেখে।

'হয়তো তাই মানে? ভেবেছ কি তোমরা? এই সেদিন একটা অফার এল আদ্দিস আবাবা থেকে। নিগ্রো পুরুষেরা নাকি বেধড়ক চর্বিঅলা বউ পছন্দ করে। সুতরাং আমি যেন তাদের দেশে গিয়ে থলথলে চর্বিঅলা মেয়ে বানিয়ে দিয়ে আসি।'

'থলথলে চর্বিঅলা মেয়ে।' হাঁ হয়ে গেলাম আমি। 'সেটা আবার কী রকম প্রস্তাব?'

'পাগলের প্রস্তাব ভেবো না। মহাধুরন্ধর আদ্দিস আবাবার এই কাফ্রিগুলো। লন্ডনের

একটা বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলাম মনে আছে? তাতে বলেছিলাম, বিশেষ এক ধরনের অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স নির্যাসের মহিমায় পোল্টপিটুইটারিতে হেরফের ঘটালেই চর্বির পরিমাণ বাড়ানো যায় শরীরে। বানরকে ঢ্যাঙা করা যেতে পারে, ঢ্যাঙাকে অতি-ঢ্যাঙা। সেই প্রবন্ধ পড়েই ওদের সাধ হয়েছে মোটাসোটা বউ বিয়ে করার। আক্কেলটা দেখেছ দীননাথ?'

আমি জবাব দেব কি? আদ্দিস আবাবার ফিকিরের বহর শুনে আমারই আক্কেল গুড়ুম হবার উপক্রম হয়েছে। তারই মাঝে কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'কিন্তু আপনাকে ওরা ইউনেস্কোর সেক্রেটারি-জেনারেল আর লন্ডন চিড়িয়াখানার সেক্রেটারি বানিয়ে তবে ছাড়বে মনে হচ্ছে।'

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন, 'আব্বা দেখে আর বাঁচিনা রে!'

'ওরা বলছে, স্যার জুলিয়ান হাক্সলি, 'এফ-আর-এস' এর মতো বৈজ্ঞানিক যদি ইউনেস্কোর সেক্রেটারি-জেনারেল আর লন্ডন চিড়িয়াখানার সেক্রেটারি হতে পারেন তা হলে আপনিই বা পারবেন না কেন।'

বিচ্ছিরিভাবে চেঁচিয়ে বললেন প্রফেসর, 'দীননাথ দীননাথ, আমার মাথা ঘুরছে, তুমি চুপ করবে, না জিম্ভক-গ্যাস দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করতে হবে!'

জিম্ভক-গ্যাস প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের নবতম আবিষ্কার। রামায়ণে জিম্ভকাস্ত্র নিক্ষেপে শত্রু ঘুমিয়ে পড়ত; আর প্রফেসরের জিম্ভক গ্যাসে হাই তুলতে তুলতে মুখব্যথা হয়ে যায়— কথা আটকে যায়— সবশেষে আসে ঘুম। জিম্ভক গ্যাসের পেটেন্ট কিনতে চেয়েছিল ক্ষমতাসীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিপক্ষ পার্টির নির্বাচনি সভা পণ্ড করার জন্যে। কিন্তু প্রফেসর রাজি হননি। বলেছিলেন, ফরমুলাটা মনে পড়ছে না। খাপ্পা হলেও হোমরাচোমরা নেতারা প্রফেসরকে আর ঘাঁটাতে সাহস পাননি। ফোকলা বৃদ্ধ যে হেঁজিপেঁজি নন, সে খবরটা তাঁদের জানা ছিল বিলক্ষণ।

সেই জিম্ভক গ্যাসের নাম শুনে সভয়ে বললাম আমি, 'থাক, থাক, অতটা কষ্ট করতে হবে না আপনাকে। আপনি জঞ্জাল থেকে জ্বালানি বানান, জিম্ভক গ্যাস শুঁকে নিজেই হাই তুলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিন— এদিকে পৃথিবী রসাতলে যাক।'

'রসাতলে যাবে কেন দীননাথ, কী হয়েছে?' আমার চোখমুখের থমথমে ভাব দেখেই বোধহয় ধাতস্থ হলেন প্রফেসর।

'এতবড় একটা সর্বনাশের খবর আপনি জানেন না?' অবাক হলাম আমি।

'কেউ তো কিছু বলেনি আমাকে?'

'বলবে কী করে? ত্রিসীমানায় কেউ ঘেঁষতে পারছে দুর্গন্ধের ঠেলায়?' রাগ করে বললাম। 'তাই তো ভাবছিলাম বাড়ির ছাদে কাকপক্ষীও নেই কেন!'

হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন প্রফেসর, 'তুমি অমন করছ! ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর সি এম ডি-এ এ আবিষ্কারের খবর পেলে লুফে নেবে—'

'আরে রাখুন আপনার সি এম ডি এ', এবার খিঁচিয়ে ওঠবার পালা আমার। 'রত্নগোলকরা আর আসছে না খবর পেয়েছেন? ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবার না লাটে ওঠে!'

'রত্নগোলকরা আসছে না?' ফোকলা মুখে জোর করে হেসে বললেন প্রফেসর। 'দীননাথ, তুমি তো রত্নলোভী ছিলে না? তবে এত দুশ্চিন্তা কেন?'

'উফ্! প্রফেসর, প্রফেসর, দুশ্চিন্তা রত্নগোলকরা আসছে না বলে নয়, স্পেসশিপগুলো অদৃশ্য হচ্ছে বলে।'

'স্পেসশিপ! অদৃশ্য!' চোয়াল ঝুলে পড়ল প্রফেসরের। আস্তে আস্তে চুল থেকে বানানো টুলে বসে পড়লেন। বললেন ফিসফিস করে, 'দীননাথ, কী হয়েছে?'

সব বললাম। দেশ-বিদেশের কেষ্টবিষ্টু বৈজ্ঞানিকদের লম্বাচওড়া বচন-ভরা থিয়োরিগুলো শুনে তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল প্রফেসরের। বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, 'দরকারি কথায় সময়ে কি যে ফ্যা ফ্যা করে হাসেন, ভাল লাগে না। ওরা চাইছে আপনাকে ইউনেস্কোর সেক্রেটারি-জেনারেল খাড়া করে সমস্যা সমাধানের ভারটাও আপনার কাঁধে চাপানো হোক। আর আপনি হেসেই অস্থির হচ্ছেন।'

'সমস্যা! এটা আবার সমস্যা নাকি?' কোঁ কোঁ করে হাসতে হাসতে বললেন প্রফেসর।

'সমস্যা নয়? এতগুলো স্পেসশিপ বেমক্কা নিখোঁজ হওয়াকে আপনি সমস্যা বলেন না।'

'কেন বলব বলতে পারো?' অতি কষ্টে হাসি চাপতে চাপতে বললেন হ্যাংলাপানা ফোকলা প্রফেসর। 'বড় বড় থিয়োরি কপচাচ্ছে, আসল কথাটা কারও মাথায় ঢুকছে না কেন?'

'আসল কথাটা কী সেটা আগে বলবেন তো?'

'কেন, তোমাদের সেই থিবিজিস্কি ডাক্তার বলতে পারছে না? তিন মাথা সাপ আর দু'মাথাওলা জিরাফ বানাতে পারি শুনে সে টিটকিরি দিয়ে বলেছিল না, তার আগে আমার শরীর থেকে সব লোহাটুকু বার করে নিয়ে তাই দিয়ে একটা এক ইঞ্চি পেরেক বানিয়ে আমারই খুলিতে বসিয়ে দিতে! মনে পড়ে থিবিজিস্কির ইয়ার্কি?'

হাসি চাপবার জন্যে গম্ভীর হলাম। বললাম, 'বুড়ো হলে আপনাদের সবারই ভীমরতি ধরে। আপনি তার কী জবাব দিয়েছিলেন মনে আছে? বলেছিলেন, থিবিজিস্কির মুখটা একটু মিষ্টি করা দরকার। খরচ বেশি পড়বে না। ওর শরীরে যা চিনি আছে, তা দিয়ে একশো কাপ কফি হবে অনায়াসে। চিনিটা নিঙড়ে বার করে নিয়ে সবটাই থিবিজিস্কির গলায় যেন কফি বানিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়।'

ফিক করে হেসে ফেললেন প্রফেসর, 'ঠিক বলিনি?'

কড়া গলায় বললাম, 'সেই সঙ্গে আর একটা কাজ করলে হয় না? আপনার রোগাপটকা শরীর থেকে যতটুকু চর্বি বেরোবে, তা দিয়ে অনায়াসেই খান দশ বারো সাবান হয়ে যাবে। তাই দিয়ে আপনার জামাকাপড় আর ঘরদোরগুলো সাফ করলে কেমন হয়?'

হাসি মিলিয়ে গেল প্রফেসরের। জুলজুল করে নোংরা পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। তা করা যাবে'খন। ঘরটাও বড্ড নোংরা হয়েছে দেখছি। আপাতত তুমি কী জানতে চাও বলো।'

'আপনি জানতে চান কী?'

একগাল হেসে বললেন প্রফেসর, 'বাপরে, গাল ফুলে ঢোল হয়েছে দেখছি। কী যেন বলছিলাম তখন?'

‘বলছিলেন যে বড় বড় বুকনি ছাড়ছে সায়েন্সের দিকপালেরা, কিন্তু আসল কথাটা কারও মাথায় ঢুকছে না কেন।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসল কথাটা নিয়ে কেউ ট্যাফোঁ করছে না কেন বল তো?’

‘আসল কথাটা কী, প্রফেসর?’

‘আরে বাবা, সৌরজগতের বাইরেও তো বুদ্ধিমান জীব আছে। মানুষের চেয়েও তারা বুদ্ধিমান বলেই এতদিন ধরে লক্ষ করেছে মানুষের লম্ফঝম্প। যেই দেখেছে মানুষ এবার সৌরজগতের বাইরেও পা বাড়াবার স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন দেখছে তাদের এলাকার রত্নভাণ্ডারে হানা দেওয়ার, তখন থেকেই তারা রত্নগোলক পাঠাতে শুরু করেছে পৃথিবীর মহাকাশে। উদ্দেশ্যটা কী বলো তো?’

‘আপনি বলুন না।’

‘আমি তো বলবই। তোমার মগজের দৌড়টাও একবার বাজিয়ে নিই।’

‘দেখুন প্রফেসর, একটা অপ্রিয় সত্য কথা বলি বলি করেও বলা হয়নি অ্যাদ্দিন,’ শক্ত গলায় বললাম আমি, ‘ইদানীং আপনার অহং ভাবটা বেড়েছে।’

‘অ্যাঁ!’ চমকে উঠলেন বৃদ্ধ। ‘বলো কি দীননাথ? আমার অহংভাব বেড়েছে! তা হলে তো আমার পতন অনিবার্য।’

‘পতন যদি আটকাতে চান তো চট করে বলে ফেলুন রত্নগোলকেরা কী উদ্দেশ্যে হামলা জুড়েছে পৃথিবীর মহাকাশে।’

‘আচ্ছা গবেট.. ইয়ে...ভারি বুদ্ধিমান ছেলের মতো প্রশ্ন করেছ দীননাথ,’ কাষ্ঠ হেসে বললেন প্রফেসর, ‘দোরগোড়ায় রত্ন পেয়ে আমরা বাইরে যাওয়া বন্ধ করলাম। পুরো দু’বছর এইভাবে ওরা ভুলিয়ে রেখেছিল আমাদের। দু’বছর সময় কম নয়। এর মধ্যে ওরা তৈরি হল। শুরু হল হানাদারদের ওপর চড়াও হওয়া।’

‘হানাদার কাদের বলছেন প্রফেসর? পৃথিবীর মানুষদের?’

‘তা ছাড়া আর কী? রত্নলোভীদের রত্ন লোভ দেখিয়ে ঝাড়া দুটি বছর ভুলিয়ে রাখার পর শুরু হয়েছে ওদের মানুষনিধন পর্ব। একে একে পেল্লায় মহাকাশ জাহাজগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে। আমি জানি তারা কোথায় গেছে।’

‘কোথায়? রত্নগোলক যাদের, তাদের খপ্পরে?’

‘এই তো বুদ্ধি খুলেছে!’

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রর ক্ষুরের মতো ধারালো ব্রেনেও কিন্তু আততায়ীদের পুরো চক্রান্তটা ধরা পড়ল না। উনি আঁচ করলেন শেষের পর্বটুকু। তার বহু বছর আগে থেকে সাগরে সাগরে যে জাল পাতা হয়েছে, তার কণামাত্রও অনুমান করতে পারলে ঘোর দুর্দিন থেকে রেহাই পেত পৃথিবী।

কিন্তু সত্যিই কি রেহাই পাবে? সংখ্যায় তারা কোটিরও অধিক। দানবিক বপুর মধ্যে এমন সব বিদঘুটে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যা ইলেকট্রনিক অস্ত্রের অসম্ভব কল্পনাকেও সম্ভব করে তুলেছে। প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ অথবা আবহাওয়ার পরিবর্তন রোধ করার ক্ষমতা কি আছে আত্মকলহে মশগুল মানুষের?

প্রতীক্ষা শুধু একটি সংকেতের... মাত্র একটি সংকেতের... এক যোগে কোটিরও অধিক মেশিন-স্পাই তৎপর হবে সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহকে নিশ্চিহ্ন করতে...

ইউনেস্কোর লোভনীয় প্রস্তাব হেলায় প্রত্যাখ্যান করলেন প্রফেসর। লন্ডন চিড়িয়াখানাকেও কোনও জবাব দিলেন না। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলেও আমন্ত্রণ নিয়ে দিনকয়েক ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করলেন মেলবোর্ন, নিউইয়র্ক, এথেন্স আর তাশকেন্টের মধ্যে। বার্লিন আর টোকিওতে দুটো কনফারেন্সে যোগ দিয়ে পুরনো শত্রু ড. থিবিজিস্কিকে কুপোকাত করলেন অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তির তর্কজালে। বুড়ো নাটবল্টু চক্রর কী তেজ তখন। কথার ধোকর হলেন— ফোকলা মাড়ি দেখিয়ে মুখে তুবড়ি ছোটালেন— থিবিজিস্কি চোখ-মুখ লাল করে আমতা আমতা করে বসে পড়তেই পকেট থেকে একটা ছোট্ট টর্চের মতো বস্তু বার করলেন প্রফেসর।

দেখেই তো আমি আঁতকে উঠলাম। জিনিসটা অতি যাচ্ছেতাই একটা অস্ত্র। কুম্ভকর্ণ পিস্তল। প্রফেসর অস্ত্রটাকে পকেটে নিয়ে ঘোরেন অতি স্মার্ট রিপোর্টারদের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। সেই পিস্তল তিনি তাক করলেন থিবিজিস্কির দিকে। আমি বাধা দেবার আগেই ঘটল কেলেংকারিটা।

নিঃশব্দে ছুটে গেল কুম্ভকর্ণ বুলেট। ফ্যালফ্যাল চেয়ে রইলেন থিবিজিস্কি। চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেল। এবং দেখতে দেখতে শুরু হল নাসিকা গর্জন।

ছ' মাসের ঘুম ঘুমোতে আরম্ভ করলেন ড. থিবিজিস্কি।

এ নিয়ে তুমুল হইচই পড়ে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলে। একযোগে সবাই ছিঃ ছিঃ করেছিল প্রফেসরের এই ছেলেমানুষি উষ্মাকে। লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল আমার।

প্রফেসরকে কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি। যা খেয়ালি মানুষ, বেঁকে বসলেই হল। তা ছাড়া যাঁর পকেটে কুম্ভকর্ণ পিস্তল, গ্যাসের ক্যাপসুল বোমা, তাঁকে খুঁচিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে কেউ চায় না।

বিশেষ করে বিশ্ব মহাকাশ সংস্থার প্রধান চিকিৎসক রীতিমতো তোয়াজ করতে আরম্ভ করলেন হাফ-ম্যাড প্রফেসরের। না করেও উপায় ছিল না— ঘাঁটানো তো দূরের কথা। কারণ, দীর্ঘতম মহাকাশ অভিযানের যেসব কুফল দেখা দিচ্ছে, প্রফেসর তার প্রতিরোধী ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে বসে আছেন, কিন্তু হাতছাড়া করতে চাইছেন না। মহাকাশচারীদের হৃদযন্ত্র-ফুসফুস আকারে ছোট হয়ে যাওয়ায় আর কেউ স্পেস-অভিযানে আসতে চাইছে না। পায়ের পেশিতে টান ধরায় অনেকে পা নিয়ে ভুগছে। চিকিৎসক ভদ্রলোক অনেক গবেষণা করে লোহার ফুসফুস আবিষ্কার করে ব্যবহার করতে বলেছিলেন পৃথিবীতে ফিরে আসার সময়ে, কিন্তু কেউ রাজি হয়নি।

এ সমস্যার সমাধান না হলেই নয়। বিশেষ করে দীর্ঘ মহাকাশ পরিক্রমায় বেরোতে গেলে ভ্যাকসিনটা একান্তই প্রয়োজন।

তাই খোশামোদ দিয়ে মন গলাতে হল প্রফেসরের।

অবশেষে পাওয়া গেল ভ্যাকসিন। দাওয়াইটা হাতছাড়া করার আগে অদ্ভুত একটা

মন্তব্য করেছিলেন প্রফেসর। তার তাৎপর্য যদি বোঝা যেত, হয়তো এ যাত্রা রক্ষে পেত ভূলোক।

উনি বলেছিলেন, 'বাপু হে! তুমি বানাচ্ছ লোহার ফুসফুস, মহাকাশের ভয়ে। সৌরজগতের বাইরে থেকে যারা আসছে, তোমার মতো তারাও লোহাটোহা দিয়ে তৈরি কলের জীব পাঠায়নি তো?'

এর কিছুদিন পরেই একটা স্পেসশিপ পাড়ি দিল মহাশূন্যে। তাতে রইলেন বিশ্ব মহাকাশ সংস্থার কেষ্টবিষ্টুরা, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আর এই অধম দীননাথ। আমাদের উদ্দেশ্য দূরপাল্লার মহাকাশ জাহাজ কোন চুলোয় যাচ্ছে, তা দেখা।

সাদা কথায় স্পেস-ডিটেকটিভের কাজ করতে বেরোলাম আমরা। সরেজমিন তদন্ত করে দেখতে হবে পৃথিবীর এত লোকসানের মূলে কাদের মাথা সক্রিয়।

চাঁদকে পাশ কাটিয়ে আসার পরেই ঘটল ঘটনাটা।

আচম্বিতে রাডার স্ক্রিনে ভেসে উঠল মরকত মণির মতো ছোট্ট একটা সবুজ বিন্দু। কিছুক্ষণ পরেই নেচে উঠল আমার বুক।

অভাবনীয় কাণ্ড।

এত বছর অদৃশ্য থাকার পর আবার দেখা গিয়েছে একটি রত্নগোলক।

রত্নগোলক! রত্নগোলক!! রত্নগোলক!!!

শোরগোল পড়ে গেল কেবিনে কেবিনে। উদ্যোগপর্ব আরম্ভ হল আগুয়ান রত্নগোলকের ওপরে স্পেসশিপ নামানোর।

কিন্তু কী আশ্চর্য! স্পেসশিপশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকরা যখন উদ্বেগ-উত্তেজনা-উল্লাসে থরথর কাঁপছে, হাসছে-নাচছে, ঠিক তখনই রুখে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

গলার শির তুলে চেঁচিয়ে বললেন, 'না, না, না। নামা হবে না রত্নগোলকে।'

'কেন না শুনতে পারি কি?' শুধোলেন রুশ বৈজ্ঞানিক ইয়েফ্রেমভ।

জবাব দেবেন কী, সাংঘাতিক উত্তেজনায় প্রফেসরের হ্যাংলাপানা প্যাঁকাটি মূর্তি তখন কাঁপছে বেতপাতার মতো। সেই অবস্থাতেই খিঁচিয়ে উঠলেন বিচ্ছিরি গলায়, 'মরবার সাধ হলে নামতে পারেন বই কী।'

মুখ লাল হয়ে গেল ইয়েফ্রেমভের। তবে প্রফেসরকে ইনি চেনেন। সেবার চাঁদে গিয়ে 'চাঁদু' মানে চাঁদের জীবকে দিয়ে চাঁদে-পৃথিবীতে সন্ধি করার সময়েও এই রকম ছিটগ্রস্তের মতো আচরণ করেছিলেন বৃদ্ধ।

তাই সামলে নিয়ে শুধোলেন হেঁড়ে গলায়, 'স্পেকট্রো-অ্যানালিসিস করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবুজ বিন্দুটা একটা রত্নগোলক। সুতরাং নামতে বাধা কোথায়?'

'রত্নগোলক!' খ্যাঁক করে উঠলেন প্রফেসর। 'রত্নগোলক কাকে বলছেন?'

থমকে গেলেন ইয়েফ্রেমভ। খিঁচুনি হজম করে আঙুল তুললেন রাডার স্ক্রিনের দিকে। বললেন ভারি গলায়, 'ওকে, সবুজ পান্নার ফোঁটা তখন আরও বড় হয়ে উঠেছে।'

'ওকে রত্নগোলক বলবেন না।' ততোধিক ভারী কণ্ঠ প্রফেসরের।

'তবে কী বলব?' ব্যঙ্গবঙ্কিম কণ্ঠস্বর ইয়েফ্রেমভের।

'মৃত্যুগোলক।'

'মৃত্যুগোলক!' ইয়েফ্রেমভ এমন খাবি খেলেন যে বেশ খানিকটা বাতাস চলে গেল পেটের মধ্যে। 'কেন প্রফেসর, কেন? স্পেকট্রো-অ্যানালিসিসের রিপোর্ট কি মিথ্যে?'

'মোটেই না। বিলকুল সত্যি। বছর বছর ধরে আপনারা শুধু ওই রিপোর্ট দেখেই পড়ি কি মরি করে ছুটেছেন। মানিক আর ধাতুর লোভে আত্মহারা হয়েছেন। সোনা খোঁজা আর ইউরেনিয়াম খোঁজার হিড়িকের মতো রত্নগোলক লুঠ করার হিড়িকে কান্ডজ্ঞান হারিয়েছেন আপনারা প্রত্যেকেই'— একটানা বলতে বলতে শীর্ণ প্রফেসরের দম ফুরিয়ে গেল।

সেই ফাঁকে ঝাঁ করে বলে উঠলেন ইয়েফ্রেমভ, 'নতুন কথা শুনছি যে। মেটালের খোঁজে অন্য গ্রহে যেতে পারি, আর দোরগোড়ায় আসা অ্যাসটেরয়েড থেকে মেটাল সংগ্রহ করতে পারি না?'

'মরেছেন তো ওই লোভেই।' গাঁ গাঁ করে বললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

রাডার স্ক্রিনে মরকত গ্রহাণু আরও বড় হয়ে উঠেছে। রুদ্ধশ্বাসে সেইদিকে তাকিয়ে মস্ত মস্ত পণ্ডিতেরা। ইয়েফ্রেমভ দাড়ি চুমড়ে বললেন, 'সময় খুব কম। প্রফেসর, হেঁয়ালি রেখে বলবেন ওটা মৃত্যুগোলক কেন?'

'না বুঝতে পারলেই হেঁয়ালি,' ফের খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'আরে মশাই, মাছ ধরেছেন কখনও?'

'মাছ!' ইয়েফ্রেমভের খয়েরি চোখ দুটো মার্বেলগুলির মতো গোল হয়ে গেল। 'মাছ ধরার সঙ্গে রত্নগোলকের কী সম্পর্ক?'

'আছে, আছে, গবেটের দল, আছে'— এই কথাটা বাংলায় বললেন প্রফেসর। ইয়েফ্রেমভের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবার। বিষম খাপ্পা হয়ে বললেন, 'হোয়াট! আপনি আমাকে গালাগালি দিচ্ছেন।'

অমনি ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন প্রফেসর। এক গাল হেসে বললেন 'নো ম্যান, নো। আপনার তারিফ করছিলাম। মাছ যারা ধরে, বঁড়শি লুকিয়ে রাখে। কেঁচোর লোভে মাছ এসে কোঁত করে গেলে বঁড়শিশুদ্ধ টোপ। কী বুঝলেন?'

'রত্নের টোপ!' বলে খপ করে হাঁ বন্ধ করলেন ইয়েফ্রেমভ।

'রাইট। জুয়েল ট্র্যাপ। মণিমানিক্যের ফাঁদ। বাইরে চাকচিক্য, ভেতরে ধ্বংসের বীজ— এই নিয়ে একনাগাড়ে চার বছর ধরে মহাশূন্যে টহল দিয়ে ফিরছে রত্নগোলক ওরফে মৃত্যুগোলক। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, ভুলিয়ে-ভালিয়ে পৃথিবীর স্পেসশিপকে কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে জবাই করা। সুতরাং, প্রাণের মায়া থাকলে, হে বৈজ্ঞানিকগণ, কাছে যাবেন না।'

ভড়কে গেলেন ভারিক্কি বৈজ্ঞানিকরা। ঈদের চাঁদ কে না দেখতে চায়, কে না হাতে পেতে চায়। কিন্তু ঈদের চাঁদের ছদ্মবেশে যদি স্বয়ং যম এসে দাঁড়ায়। তখন...

তখন আহ্লাদে ফুটকড়াই ভাবখানা দেখতে দেখতে উধাও হয়। সেইভাবেই মিইয়ে গেলেন গবেষকেরা। সাবধানের মার নেই। পাগল প্রফেসরের হুঁশিয়ারি শুনে হুঁশিয়ার হলে ক্ষতিও নেই। ছিটগ্রস্ত বৃদ্ধ দুর্মুখ হলে কী হবে, ন্যাকা কথা, বেফাঁস কথা, বাঁকা কথা,

প্যাঁচোয়া কথার ধার দিয়েও যান না। সাত কথার এক কথা যা বলেন, তা কনকনে-ঝনঝনে হলে কী হবে, আখেরে কাজে লাগে।

সুতরাং আরম্ভ হল কথার তুবড়ি ছোটানো। নানা মুনির নানা মত। সামনে লোভনীয় রত্নগোলক— কাছে গেলেই নাকি অক্কা লাভ।

কিন্তু অধিক সন্ন্যেসীতে গাজন নষ্ট হয় আর মিটিং নষ্ট হবে সে আর আশ্চর্য কী। কথা কম হল না। নাকে-চোখে কথা, নাকে-কানে কথা, নাকে-মুখে কথা; সাজানো কথা, শোনা কথা, শেষ কথা; সাত কথা, কথার কথা, বাঁকানো কথা, ছব্বামার্কা কথা; হাত-পাতলা কথা, কথার পিঠে কথার ধোকড়ের কথা; ওড়ন পাড়ন মার্কা কথা, তুবড়ি মার্কা কথা, জাহাজি-টাইপ কথা, কথায় কথায় কথার শ্রাদ্ধই সার হল— লাখ কথার এক কথাটি পাওয়া গেল না।

অবশেষে ফের কোমর কষে নামলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। রাডার স্ক্রিনে তখন সবুজ গ্রহ আর শুধু সবুজ নেই। অনেক রং দেখা যাচ্ছে। সবুজ লাল হলদে বেগুনি রঙের অতি সুন্দর গ্রহাণুটা। আরও বড় হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে গোটা স্ক্রিন জুড়েই ঝলমল করছে তার আশ্চর্য রূপ।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের দিকে তাচ্ছিল্য ভরে তাকালেন প্রফেসর। বাংলায় বললেন, 'বাপু হে, সবই তো দেখছি কাদার ঘুঁটি। যেদিকে নড়াব, সেই দিকেই নড়বে। তবে অত থিয়োরি কপচানো কেন? যত্তোসব ধামাধরার দল!'

ইয়েফ্রেমভ বাংলা বোঝেন না। কিন্তু প্রফেসরকে বোঝেন। তাই আহ্লাদে চাঁদের মতো গদগদ গলায় শুধোলেন, 'ইয়েস প্রফেসর? সলিউশন মিলেছে?'

আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। বললেন, 'মাই ডিয়ার ধিনিকেষ্টরা—'

'টিনিকেস্ট!' ইয়েফ্রেমভ হাসিহাসি মুখে বললেন, 'নতুন খেতাব দিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, নতুন খেতাব দিলাম,' বললেন প্রফেসর। 'স্পেসশিপে মিসাইলের অভাব নেই। একটা ক্ষেপণাস্ত্রকে এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দিন রত্নগোলকের... ইয়ে... মৃত্যুগোলকের দিকে।'

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হল ধেনোবুদ্ধিদের ধানাই-পানাই। এত সহজ সমাধানটা কারও মাথায় কেন আসেনি ভেবে অবাক হলেন পণ্ডিতেরা। প্রত্যেকেই অসম্ভব পরিকল্পনা ভাবছিলেন, আগুয়ান মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, নদীর মুখে বালির বাঁধ দেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন।

আধমিনিটও গেল না।

রাডার স্ক্রিনে দেখা গেল রামধনু রঙের, অতিকায় ফানুসের মতো ঝলমলে গ্রহাণুর দিকে আগুয়ান ক্ষেপণাস্ত্রের শ্বেতবিন্দু। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে বিপ বিপ বিপ সংকেত— ক্রমশ কমে আসছে গ্রহাণু আর ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যেকার ব্যবধান— ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বিপ বিপ সিগন্যালের ছন্দ—

তার পরেই ঘটল বিস্ফোরণটা...

রত্নগোলক স্পর্শ করল না শ্বেতবিন্দু। তার আগেই ফেটে উড়ে গেল শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র। চোখধাঁধানো সাদা আলোয় আলো হয়ে গেল রাডার স্ক্রিন।

ছানাবড়া চোখে প্রফেসর বললেন, 'দেখলেন তো? বলি ও মশাইরা, আপনারা স্বচক্ষে দেখলেন তো? রত্নগোলককে ছুঁতে হল না— তার আগেই ধ্বংস হল মিসাইল। কারণটা আঁচ করতে পারেন?'

'রেডিয়েশন?' আমতা আমতা করে বললেন ইয়েফ্রেমভ।

'এগজ্যাক্টলি। সাংঘাতিক শক্তিশালী কোনও বিকিরণ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে মৃত্যুগোলককে... আপনাদের রত্নগোলক... কাছে গেলেই মৃত্যু!'

'এখন উপায়?' আর্তনাদ করে উঠলেন ধিনিকেষ্ট বৈজ্ঞানিকরা— 'রত্নগোলক যে আমাদের দিকেই আসছে।'

সত্যিই আসছে। হু হু করে সিধে স্পেসশিপের দিকেই এগিয়ে আসছে কালান্তক গোলক। সটান আসছে। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। রেডিয়েশন বেল্টের ছোঁয়া লাগানো রয়েছে স্পেসশিপে। পরিণাম? প্রলয়ংকর একটা বিস্ফোরণ।

আর দেরি নেই। বিকিরণ আবরণের আওতায় এলেই শূন্য মাঝে নিজেই শূন্য হয়ে যাবে মহাকাশ জাহাজ... উপায় কি নেই? কোনও উপায় কি আর নেই? নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা...

চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'আচ্ছা নড়ে ভোলাদের নিয়ে এসেছি যা হোক! হাঁ করে দেখছেন কি মশায়রা? অ্যাটমিক মিসাইল ছুড়ুন।'

'অ্যাটম বোমায় কাজ হবে বলছেন?' কে যেন ককিয়ে উঠল পেছন থেকে। ঝুলন্ত গোঁফ পৃথিবীবিখ্যাত ব্যাঙাচি-বিশেষজ্ঞ তো ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেললেন।

'হবে, হবে, মেরে ধুলো-ধাপড়া উড়িয়ে দিতে হবে... ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যাটম বোমা ফাটলে কাজ হবে না মানে?'

ইষ্টনাম জপ করতে করতে নিক্ষেপ করা হল ডজন তিনেক অ্যাটমিক মিসাইল। ষাট সেকেন্ডের মধ্যে ছত্রিশটা প্রলয় দেবতা একযোগে উড়ে গেল আগুয়ান রত্নগোলকের দিকে। একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হল ছত্রিশটা নির্ঘাৎ মৃত্যু। মহাকাল তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়লে যা হয়, দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু হলে যা হয়, ছত্রিশটা প্রলয় বোমা একযোগে দেখাল সেই দৃশ্য।

শত সূর্য যেন একসঙ্গে ঝলসে উঠল রাডার স্ক্রিনে।

কিছুক্ষণ পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল স্ক্রিন। রত্নগোলকের রত্ন রূপ কিন্তু কোথাও আর দেখতে পাওয়া গেল না। দেখা গেল শুধু খণ্ডবিখণ্ড রত্ন খনিজ পাথরগুলো ছিটকে যাচ্ছে দিকে দিকে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বৈজ্ঞানিকরা।

প্রফেসর বাদে।

মুখ অন্ধকার করে উনি চেয়ে রইলেন রাডার স্ক্রিনের দিকে। পাকা চুল, টেকো মাথা, দাড়িঅলা, শিরদাঁড়া-বেঁকা দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা আহ্লাদে ফুটিফাটা হয়ে শুরু করলেন

কোরাস সংগীত। বিশ্ব ঐক্য সংগীত। গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে সে কী তাণ্ডব নাচ আর গানের ঘটা।

'তারানা...তারানা...তারানা
শিকেয় তোলো গুলি গোলা—
আর নারে ভাই, আর না!
ঠাণ্ডা লড়াই অনেক হল
লাভের ঘরে শূন্য এল—
মাঝের থেকে আমরা সবাই
হলাম ফক্কা ফ্যালনা—
তারানা...তারানা...তারানা!'

বগল বাজিয়ে, গোড়ালি ঠুকে, তালি দিয়ে বিশ্ব ঐক্যর সেই কোরাস সংগীতের ঠেলায় থরথর করে কাঁপতে লাগল সমস্ত স্পেসশিপটা। প্রফেসর কিন্তু মুখ গোঁজ করে বসে রইলেন রাডার স্ক্রিনের সামনে!

আহ্লাদে ফুটকড়াই বৈজ্ঞানিকদের ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। এবার তাঁরা ছুটে এসে ঘিরে ধরলেন তাঁকে। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে শুরু হল জগঝম্পমার্কা নাচ-গান:

'ছাই কপালে, পোড়া কপালে,
ছার কপালে, ভাঙা কপালে,
বাঁচতে যদি চাও—
নাট-বল্টুর নাম নিয়ে
উট-কপালে হও।
রত্নগোলক! রত্নগোলক!
ফুস করে যে মিলিয়ে গেল
ফুস মন্তর ঠেলায়!'

দেখেশুনে বোধহয় বোঁ বোঁ করে মাথা ঘুরছিল প্রফেসরের। আচম্বিতে তড়াক করে এমনভাবে লাফিয়ে উঠলেন যেন একটা বড়সড় গলদা চিংড়ি শূন্যপথে লম্ফ দিল বিকট চিৎকারে বিষম বিরক্ত হয়ে। কানের ফুটো দুটো দু' হাতের চেটোয় চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন গাঁ গাঁ করে:

'বকাণ্ড প্রত্যাশার একটা সীমা আছে, হে মূর্খগণ! স্তব্ধ হও!'

বিশুদ্ধ ভাষায় ভৎর্সনা শুনে নিমেষের মধ্যে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেলেন সকলে। মহাশূন্যের মতোই বিলকুল শব্দহীন হল মহাকাশ জাহাজের অভ্যন্তর। ফেচফেচানির সাহসও হল না কারও।

ফোকলা মাড়ি বার করে খিঁচিয়ে উঠলেন বুড়ো প্রফেসর, 'ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ দেখছি!'

কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন নাইজেরিয়ার সেই ভীষণ কালো দেড়ো বৈজ্ঞানিক, 'ফুর্তি করব না? রত্নগোলককে আপনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন—'

'একটা রত্নগোলক উড়েছে তো কী হয়েছে, আবার আসবে।'

'অ্যাঁ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এতগুলি বছর ধরে এত অধ্যবসায় নিয়ে যারা কল পেতেছে, আমাদের মহাকাশ অভিযান পণ্ড করার আয়োজন করেছে, তারা মার খেয়ে রণে ভঙ্গ দেবে এমন ধারণা বড় তামাক না খেলে কেউ কল্পনা করে?'

'আজ্ঞে... আজ্ঞে...!'

'আরে মশাই, ওরা আবার আসবে। কিন্তু ঠিক কীভাবে আসবে, তা বলা মুশকিল। কেননা, ওদের এদের এতগুলি বছরের আয়োজন আমরা বানচাল করে দিলাম। ফিকির-ফকিরে যে ওদের টেক্কা মারতে পারি, তা দেখিয়ে দিলাম। তারপর?'

'তারপর?' পুনরাবৃত্তি করলেন ইয়েফ্রেমভ।

'তারপর? একই ফিকির নিয়ে আবার নিশ্চয় ওরা আসবে না, আসবে নতুন ফিকির নিয়ে। সময় আর দেবে না।'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশের দেখছেন কি এখনও? ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমার মা ইঁদুর সইতে পারত না একেবারে। ইঁদুরগুলো তেমনি বজ্জাত— দিনরাত লুকোচুরি খেলত মায়ের সঙ্গে। শেষমেশ রেগেমেগে মা ইঁদুরকল পাতল। দু'চারটে ইঁদুর খাঁচায় পড়ার পর হুঁশিয়ার হয়ে গেল তারা। খাঁচার ধারকাছ দিয়ে যাওয়া বন্ধ করল। আবার শুরু হল উৎপাত। মা তখন কী করল শুনবেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'বিষ দিল।'

'বিষ?'

'হ্যাঁ। খাবার সেঁকো বিষ দিতেই ঝাড়ে-বংশে নিপাত হল ইঁদুরকুল।'

ইয়েফ্রেমভের দাড়িসমেত চোয়াল ঝুলে পড়ল আস্তে আস্তে, 'আপনি তা হলে বলছেন, এরপর ওরা বিষ মিশিয়ে দেবে আমাদের জলে, বাতাসে, খাবারে!'

'হ্যাঁ। সুদূর গ্রহ থেকে যারা এত বড় রত্নগোলক পাঠাতে পারে, তারা বিষবাষ্প বোঝাই ক্যাপসুলকে ফাটাতে পারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে।'

'বলছেন কী? ইঁদুরের মতো মরতে হবে আমাদের?' বিখ্যাত সেই ব্যাঙাচি বিশেষজ্ঞ আবার কাঁদবার জন্যে তৈরি হলেন।

'আশ্চর্য কী?' অনুকম্পাভরে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন নাটবল্টু চক্র।

কিন্তু সে মৃত্যু যে কোন দিক দিয়ে আসবে, তা প্রফেসরও আঁচ করতে পারেননি। অজানা ভয়াবহ সেই মৃত্যুর ঠিকানা জানেন কেবল এই কাহিনির পাঠক আর পাঠিকারা।

প্রতীক্ষা শুধু একটি সিগন্যালের! কবে? কখন? কীভাবে আসবে সেই সিগন্যাল?

কেউ তা জানে না।
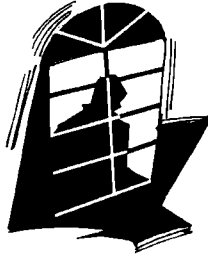
রাজা র‍্যাটের রহস্য

এক
ইঁদুর আতঙ্ক

বিনয় বাদল আর দীনেশ যে যুগে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গুলি চালিয়ে ইংরেজদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল, আমি সেই যুগের মানুষ। ইংরেজরা আমাকেও জেলখানায় আটকে রেখেছিল অনেক বছর। আমার নাম শৈলেন্দ্রভূষণ রায়। সংক্ষেপে এস বি নামেই আমি পরিচিত।

অগ্নিযুগের মানুষ আমি। এই তিরাশি বছর বয়সেও অগ্নিস্রোত এখনও নিভে যায়নি আমার রক্তপ্রবাহে। বিবেকানন্দের আদর্শই আমার আদর্শ। দরিদ্রের সেবাই আমার এখন একমাত্র কর্ম। এই আদর্শই আমার কর্মজীবনের প্রাণ। এই আদর্শের রশ্মিই সরল বা বক্ররেখায় আমার সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে।

আমি বিয়ে-থা করিনি। মিথ্যা বলি না। সমাজসেবা নিয়ে থাকি বলে কাউকে ভয়ও করি না। ইংরেজদেরও ভয় করিনি। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, আমি নিদারুণ ভয় পেয়েছি। বেশি লেখবার সময় নেই। বুড়ো হয়েছি বলে এমনিতেই হাত কাঁপে, এখন আরও কাঁপছে। কলম আটকে যাচ্ছে। দরজায় আওয়াজটা বেড়েই চলেছে, সময় ফুরিয়ে আসছে, তার আগেই এই লেখা শেষ করতে হবে। তারপর স্টিল আলমারির লকারে রেখে চাবি দিয়ে চাবিটা সিলিং ফ্যানের ওপরের ঢাকনির মধ্যে লুকিয়ে রাখব। ওদের নাগালের বাইরে চাবি রাখতেই হবে। চাবি কোথায় আছে, ওরা ঠিকই জানতে পারবে, কিন্তু সিলিং ফ্যানের নাগাল পাওয়া ওদের সাধ্যি নেই।

এবার শুরু করি মূর্তিমান বিভীষিকাদের অবিশ্বাস্য কাহিনি। একটুও বাড়িয়ে বলব না, একটুও ফেনিয়ে লিখব না। এস বি-র চরিত্রে ও বস্তুটি নেই। যদি এই লেখা কারও হাতে পড়ে, তা হলেই জানব এতদিন যা করে এসেছি, তার চাইতেও বড় কর্ম করে যেতে পারলাম। পৃথিবীর মানুষ, সাবধান! এ পৃথিবী তোমাদের দখলের বাইরে যেতে বসেছে!

বাংলার সব জেলাতেই আমার সেবা প্রতিষ্ঠানের শাখা আছে। হেড-অফিস এই কলকাতায়— ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে। বুড়ো হয়েছি তাই সংগঠন কর্মীরাই আমার চলাফেরার সুবিধের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে, ড্রাইভারও দিয়েছে।

হার্ট খারাপ হওয়ার পর থেকে এই গাড়িতে করেই সকালবেলা আর সন্ধ্যেবেলা হাওয়া খেতে যাই। কখনও গঙ্গার ধারে বেড়াই, কখনও সুভাষ সরোবরে গাছপালার তলা দিয়ে হাঁটি। বিধান রায় সল্টলেক নগরীর পরিকল্পনা করার আগে পর্যন্ত যাযাবর পাখির অভাব ছিল না এ অঞ্চলে! মাঠের ওপরেই ঘুরে বেড়াত বিষধর সাপ। খোলামেলা জায়গায় গ্রাম্য পরিবেশটা বেশ ভাল লাগত। এখন সেসব গেছে। বায়ুও দূষিত হতে আরম্ভ করেছে। তাই যেতে হয় দূরে দূরে— টাটকা বাতাস আর অক্সিজেনের সন্ধানে।

শুধু যাযাবর পাখি কেন, কলকাতার বুক থেকে শিয়ালরাও উধাও হয়েছে। অথচ এই তো সেদিনও ঢাকুরিয়া আর বালিগঞ্জে শিয়ালের হুক্কা-হুয়া ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে যেত।

এইসব গল্পই একদিন করছিলাম আঙুরকে। গরিব ঘরের বউ। আমার ঘরদোর মুছে দিয়ে যায়, রান্নাবান্না করে, বাসনপত্রও মেজে রেখে দেয়। আমার মেয়ের মতো খুব স্নেহ করি। ওর বাড়ি পূর্ববঙ্গে। তাই ওকে 'বাঙাল' বলে ডাকি।

সকালে বাঙাল ঘর মুছছে, খুব ভোরবেলা, আমি তখন সবে বেড়িয়ে ফিরেছি। নেহরু গোল্ড কাপ খেলা উপলক্ষে সল্টলেক স্টেডিয়াম ঘিরে এত সকালেও ঝলমলে আলোর বাহার দেখে এসে ওকে বলছিলাম, 'বাঙাল, যাযাবর পাখি গেল, সাপ-খোপ ছুঁচো ইঁদুর মাছ গেল, এবার মানুষকেও না যেতে হয় এ অঞ্চল থেকে।'

'কিন্তু মেসোমশাই, শিয়ালরা তো ফিরে আসছে খাস কলকাতায়,' ঘর মুছতে মুছতে বলেছিল আঙুর।

'শিয়াল ফিরে আসছে! কোথায়?'

'কেন, কাগজে পড়েননি? রেড রোডে শিয়াল দেখা গেছে রাত্তিরবেলা?'

আমি তো অবাক, 'রেড রোডে শিয়াল কি রে? বাঙাল, তোর মাথা খারাপ হয়েছে!'

'না, মেসোমশাই, সত্যি কথাই কইছি। লাটসাহেবের বাড়ির সামনেই দেখেননি? কত ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে রয়েছে?'

কথাটা সত্যি। এসপ্ল্যানেডের বুকের ওপর, গভর্নরের প্রাসাদের সামনেই ইঁদুর পুষে রাখা হয়েছে কাতারে কাতারে। সে এক দেখবার মতো ব্যাপার। রেলিং দিয়ে ঘেরা কোণটায় মাটির মধ্যে অজস্র গর্ত। বিরাট বিরাট ধেড়ে ইঁদুর নির্ভয়ে গর্তে ঢুকছে, বেরোচ্ছে। হাতখানেক দূরে দাঁড়িয়ে পথচারীরা খাবার ফেলে দিলেই টুপ করে মুখে নিয়ে খুড় খুড় করে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে।

সেইদিনই বিকেলের দিকে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়ার আগে আবার দেখতে পেলাম ইঁদুরদের ডিপোটা— কার্জন পার্কের কোণে।

দেখলাম, আগের চাইতেও ওদের আস্তানা ছড়িয়ে পড়েছে। আরও খানিকটা এলাকা দখলে এনেছে। চেয়ে রয়েছি আর ভাবছি, না জানি মাটির তলা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে এরা আরও কতদূর পৌঁছেছে।

আমার পাশেই একজন ইয়ংম্যানকে দেখলাম আমার মতোই একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ইঁদুরবাহিনীর দিকে।

ছোকরার চাহনিতে যেন কেমনতর পাগল-পাগল ভাব। চুলে তেল না দেওয়াটা হাল

আমলের ফ্যাশান। কিন্তু এ ছোকরার চুলে তো চিরুনিও পড়েনি অনেকদিন। দাড়ি-গোঁফ কামানোরও সময় নাই। চোখের নীচে কালচে দাগ দেখে মনে হয় মাদক বড়ি খাওয়ারও কুঅভ্যেস আছে। অনেকদিন না ঘুমোলেও অবশ্য চোখের নীচে কালি পড়ে অমনভাবে, জামা-প্যান্টও শ্রীহীন।

ছোকরার চোখের চাহনিটাই বেশি করে ভাবিয়ে তুলল আমাকে। নিঃসীম আতঙ্ক যেন দু-চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে।

ইঁদুরদের দেখে অত ভয় পাওয়ার কী আছে বুঝলাম না। আমি তো বেশ মজাই পাচ্ছি, এ-ছোকরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে কেন?

বিবেকানন্দ শেষ জীবনে বলতেন, আমার জীবন ফুরিয়ে এসেছে। এখন যা বলবার তা বলে যাব। তাতে কেউ আঘাত পাক, কি আনন্দ পাক, অত ভাবলে চলবে না। বুড়ো বয়েসে আমিও বড় মুখ-আলগা হয়ে গেছি। পথে-ঘাটে অচেনা অজানা ছেলে-ছোকরাদের অনেক জ্ঞান দিয়ে বসি। পাকা চুলকে সমীহ্ করেই কেউ তা গায়ে মাখে না। এই তো গতকাল প্রজাতন্ত্র দিবসে একটি ছেলে বুকে জাতীয় পতাকা লাগাতে এসেছিল দশ পয়সার বিনিময়ে। আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'বাপু হে, আগে বুঝিয়ে দাও তো প্রজাতন্ত্র দিবস কাকে বলে?'

সে হেসে বলেছিল, 'দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে যে!'

আমি বলেছিলাম, 'দেড় মিনিটেই বলা যায়।'

'অত সময় আমার নেই,' বলে সরে পড়েছিল ছোকরা।

ইঁদুর ডিপোর সামনে স্বাধীন ভারতের এই ভয়কাতুরে ছোকরাটিকে দেখেও গায়ে পড়ে দুটো কথা বলার লোভ সামলাতে পারিনি।

বলেছিলাম, 'ভয় কী? ইঁদুর তো আর সাপ নয়!'

বিষম চমকে উঠেছিল ছোকরা। তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিল বলেই হঠাৎ আমার কথায় যেন আঁতকে উঠেছিল অমনভাবে।

'কী... কী বললেন?'

'বললাম যে ইঁদুর তো আর সাপ নয়। হোক না ধেড়ে ইঁদুর।'

'না জেনে কথা বলবেন না,' ধাঁ করে রেগে গেল ছোকরা।

আমি কিন্তু গায়ে মাখলাম না। সারাজীবন যারা একা-একা কাটায়, বুড়ো বয়সে তাদের মুখ চুলবুল করে একটুতেই। বদঅভ্যেসটা আমাকেও পেয়ে বসেছে ভাল করেই।

তাই হেসে বলেছিলাম, 'অনেক কিছুই জানি, বাবা। রেড রোডে রাত্রে এখন শিয়ালও ঘুরে বেড়াচ্ছে। কার্জন পার্কে না হয় একগাদা ইঁদুর রইল ক্ষতি কী?'

'ইঁদুরগুলোর সংঘবদ্ধতা দেখছেন?'

বলে কী ছোকরা! সারাজীবন মানুষের সংগঠন করে যার কাটল, তাকে দেখাচ্ছে ইঁদুরের সংঘবদ্ধতা! মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি।

বললাম, 'কীটপতঙ্গের মধ্যে যদি সংঘবদ্ধতা থাকে, তা হলে ছোট প্রাণী ইঁদুরদের মধ্যে টিমওয়ার্ক থাকতে ক্ষতি কী! তবে হ্যাঁ, ওই জিনিসটা নেই কেবল এ যুগের বাঙালিদের মধ্যে—'

'এ-টিমওয়ার্ক সে টিমওয়ার্ক নয়। একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন।'

নির্ঘাত নেশা করে ছোকরা। সস্নেহে বলেছিলাম, 'বাবা, এস বি'র নাম শুনেছ?'

'এস বি? শৈলেন্দ্রভূষণ রায়?'

এবার অবাক হলাম আমি নিজেই। মস্ত বড় সংগঠনের পরিচালক বলে একটু অহংভাব আমার মধ্যেও এসেছিল, হামবড়া ভাবটা কথায় কথায় ফুটে বেরোয়। এস বি নামটা শুনলেই দুনিয়াশুদ্ধ লোক চিনতে পারবে, এমন আশা না করেও মুখ ফসকে প্রায়ই নামটা বেরিয়ে যায়— বুড়ো হলে যা হয় আর কি।

কিন্তু এ ছোকরা নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল কী করে? কৌতূহল তো হলই, আত্মপ্রসাদও হল বিলক্ষণ।

বললাম, 'নামটা যখন জানা আছে, তখন নিশ্চয় এটুকুও জানা আছে, সংঘবদ্ধতা কী জিনিস, তা আমার সারাজীবনের কাজের মধ্যে দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছি। ইঁদুরদের সংঘবদ্ধতা—'

'স্যার, আপনি বুঝছেন না—' ছেলেটির গলার সুরে এবার যে আকুলতা ফুটে বেরোল, তা মনকে ছুঁয়ে যায়।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! ইঁদুর দেখে এত ভয়?

শুধোলাম স্নেহসিক্ত স্বরে, 'কী করা হয়?'

'আ-আমি জার্নালিস্ট... ছিলাম... এখন... এখন...' বলতে বলতে ফের সভয়ে চেয়ে রইল কাতারে কাতারে জড়ো হওয়া ইঁদুরগুলোর দিকে।

দুটো জিনিস লক্ষ করলাম সঙ্গে সঙ্গে। ছেলেটি শিউরে উঠল। এক পা পেছিয়ে এসে যেন আমার আড়ালে দাঁড়াতে চাইল।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা একটু চমকে দেওয়ার মতোই ঘটনা বটে।

ইঁদুরগুলো আর এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করছে না। অনেকেই গর্তে গিয়ে সেঁধিয়েছে। খোলা জমিতে এক জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে বাদবাকি ইঁদুর।

এবং প্রত্যেকেই চেয়ে রয়েছে যেন ছোকরার দিকেই!

চোখের ভুল নিশ্চয়।

ছেলেটি আমার ডানদিক থেকে বাঁদিকে সরে গেল পেছন দিক দিয়ে। জোড়া জোড়া ইঁদুর-চক্ষুও আস্তে আস্তে ঘুরে গেল সেই দিকে। গর্তের মধ্যে থেকেও মুখ বাড়িয়ে ধেড়ে ইঁদুরগুলো চেয়ে রয়েছে শুধু তার দিকেই। রেলিং ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা আর কারও দিকে নয়।

ছোট একটা ছেলে এক মুঠো বাদাম ছুড়ে দিল ইঁদুরবাহিনীর সামনে। একটুও নড়ল না একটা ইঁদুরও!

এবার টনক নড়ল আমার। এরকম অস্বাভাবিক সংঘবদ্ধতা ইঁদুরদের মধ্যে কখনও দেখিনি। বুদ্ধিমান প্রাণীর মতোই জোড়া জোড়া নিষ্পলক চোখ মেলে অগুনতি ইঁদুর শুধু চেয়ে আছে একদিকে— ভয়ে পাংশু ছোকরাটির দিকে, সামনের খাবারের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

পাশের দিকে চাইলাম। ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গিয়েছে ছোকরার মুখ। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট। অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি?

অভয় দিতে যাচ্ছি, তার আগেই ছোকরা আমার হাত খামচে ধরে ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বললে, 'স্যার, পালিয়ে আসুন।'

ইঁদুরদের ভয়ে পালিয়ে আসব?

দুর্নিবার কৌতূহলটা মাথাচাড়া দিল সঙ্গে সঙ্গে। আতুরজনের সেবা করে করে মনটা এমন হয়ে গেছে যে ভয়াতুর মানুষ দেখলেও পক্ষপুট দিয়ে আগলানোর মতো তাকে সরিয়ে নিয়ে যাই আমার আশ্রয়ে।

আমার এই পরোপকার করার প্রবৃত্তি আর ইঁদুরগুলোর অস্বাভাবিক আচরণ, মিলেমিশে আমাকে বাধ্য করেছিল ছোকরাটিকে নিয়ে ইঁদুর-ডিপোর সামনে থেকে সরে আসতে। ছোকরার কাঁপুনি তখনও বন্ধ হচ্ছে না দেখে বলেছিলাম, 'আমার গাড়ি আছে। চলো তোমায় বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসি।'

বিহ্বল চোখ মেলে ছোকরা বলেছিল, 'বাড়ি! আমার তো বাড়ি নেই!'

'থাকা হয় কোথায়?'

'কোথাও না। পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

'পুলিশের ভয়ে নাকি?'

'পুলিশ? না, না, যা ভাবছেন, আমি তা নই। পুলিশ যদি পারত আমাকে বাঁচাতে, তাদের কাছেই যেতাম। কোনও অন্যায়, কোনও অপরাধ করিনি, তবুও পালিয়ে বেড়াচ্ছি, এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক জেলা থেকে আরেক জেলায়, ওরা কিন্তু আসছে ঠিক পেছন পেছন—'

'কারা?'

'সেই ভয়ংকরেরা!'

সকৌতুকে বলেছিলাম, 'কোন ভয়ংকরদের কথা বলছ?'

খেঁকিয়ে উঠল ছোকরা, 'নিজের চোখেই দেখলেন তো।'

'ইঁদুরগুলো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয়ংকর! ভয়ংকর!'

'এসো বাবা, গাড়িতে ওঠো, আমার বাড়িতেই চলো। যার কোথাও বাড়ি নেই, এস বি'র বাড়ি তার বাড়ি।'

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কী?' আস্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম গাড়ি রাসমণি বাজার পেরোতেই।

আবার সেইরকম চমকে উঠল ছোকরা, 'অ্যাঁ! নাম?'

'হ্যাঁ, বাবা। তোমার নাম কী?'

'সৌরভ ভটচাজ।'

'জার্নালিস্ট ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

‘কোন কাগজের?’

‘উফো স্পেশ্যাল।’

‘উফো স্পেশ্যাল! সেটা আবার কী কাগজ?’

‘আন আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট স্পেশ্যাল।’

হেসে ফেললাম, ‘উড়ন্ত চাকি-সংক্রান্ত কাগজ?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওরকম কাগজ কলকাতা থেকে বেরোয় জানতাম না তো।’

‘কলকাতার কাগজ নয়।’ বলে আবার ঘাড় ফিরিয়ে কাচের মধ্যে দিয়ে পেছন দিকে তাকাল সৌরভ ভটচাজ।

আমিও তাকালাম। ধাবমান যানবাহন আর পথচারী ছাড়া লোম-খাড়া-করা কিছুই দেখতে পেলাম না।

বললাম, ‘তবে কোথাকার কাগজ?’

‘নিউ ইয়র্কের। টু ফিফটি সেভেন, পার্ক অ্যাভিনিউ সাউথ নিউইয়র্ক।’

‘এখান থেকে খবর পাঠাতে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী ধরনের খবর?’

সৌরভ এবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমার চোখে চোখ চেয়ে বললে তীব্র স্বরে, ‘শুনলে তো বিশ্বাস করবেন না। জানতে চাইছেন কেন?’

‘কে বলল তোমাকে বিশ্বাস করব না?’

‘আজ পর্যন্ত কেউ করেনি—’

‘কেউ বলতে কাদের বোঝাচ্ছ?’

‘সবজান্তা সম্পাদকদের। ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। ওরা সেই সত্যি খবরগুলোকেই মিথ্যে মনে করে আমাকে পাত্তা দেয়নি। নইলে কি নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনের দ্বারস্থ হই?’

‘কিন্তু বাবা, আমি সম্পাদক নই, সবজান্তাও নই। উড়ন্ত চাকি, মহাকাশের আগন্তুক, এইসব ব্যাপারগুলো আমেরিকা, রাশিয়াকেও ভাবিয়ে তুলেছে, এইটুকুই শুধু খবর রাখি।’

‘শুধু আমেরিকা-রাশিয়ায় নয়, ইউরোপেও সাড়া পড়েছে। জানেন কি ফ্রান্সে সরকারি টাকায় একটা কম্পিউটার-ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে উফো-সংক্রান্ত খবরাখবর রেকর্ড করা, বিশ্লেষণ করা আর তাই নিয়ে গবেষণা করার জন্যে?’

‘না, বাবা। তবে শুনেছি, আমেরিকায় অনেক অফিসিয়াল রিপোর্ট চেপে দেওয়া হচ্ছে। সত্যি কি মিথ্যে জানা নেই—’

‘সব সত্যি। ইউনাইটেড নেশনস্ স্পেশ্যাল পলিটিক্যাল কমিটি সম্প্রতি মিটিং করে ঠিক করেছে শুধু উফো ঘটনা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে একটা পৃথক দপ্তর খোলা হোক।’

‘বলো কী!’

‘টনক নড়েনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের। অথচ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে চলেছে গোটা

ইন্ডিয়া জুড়ে, পাকিস্তান, চিন, বাংলাদেশেও ঘটছে— মিলিটারি অ্যাকটিভিটি যেসব দেশে জোরদার হয়ে উঠছে, ওদের গতিবিধিও বেড়ে চলেছে সেইসব দেশে।'

'ওদের বলতে কাদের বলছ, সৌরভ?'

অদ্ভুত চোখে চেয়ে থেকে সে বলল, 'এখনও জানতে চাইছেন?'

কথা ঘুরিয়ে নিলাম, 'সামরিক তৎপরতা যেসব দেশে বেশি সেইসব দেশেই ওদের আনাগোনা কেন তা তো বুঝলাম না।'

'নাগাসাকি আর হিরোসিমায় অ্যাটম বোমা কোন সালে ফেটেছিল মনে আছে?'

আমতা আমতা করে বলেছিলাম, '১৯৪৫ সাল বলেই তো মনে হয়—'

'হ্যাঁ, ১৯৪৫ সালেই। তারপর থেকেই উফো প্রত্যক্ষদর্শীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। উড়ন্ত চাকি দেখছে অনেকেই। কেন? না, হিরোসিমা নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফাটবার পর থেকেই উড়ন্ত চাকিদের ঘন ঘন আনাগোনা শুরু হয়েছে বিশেষ করে সেইসব দেশেই, যেসব দেশে অ্যাটম বোমা তৈরি আর ফাটানোর হিড়িক চলেছে পুরো মাত্রায়।'

রাস্তার আলোয় দেখলাম চোখ জ্বল জ্বল করছে সৌরভের। কথাবার্তা যদিও পাগলের প্রলাপের মতো মনে হচ্ছে না, তবুও বেশ কৌতুক অনুভব করলাম। মুখে অবশ্য তা প্রকাশ করলাম না।

বললাম নিরীহ গলায়, 'কেন, সৌরভ?'

'অ্যাটম বোমার তো পাহাড় জমিয়ে ফেলা হয়েছে পৃথিবীময়। বড় রকমের একটা যুদ্ধ লাগলে পৃথিবীর অবস্থাটা কী হবে জানেন? টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, নয়তো কক্ষ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। সৌরজগতের সূক্ষ্ম ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে, অন্য গ্রহগুলো বিপদে পড়বে না?'

'ও,' বলে অতি কষ্টে হাসি গোপন করলাম, 'সেইজন্যই বুঝি সেইসব গ্রহের বাসিন্দারা নজর রাখছে পৃথিবীর যুদ্ধবাজদের ওপর?'

'হ্যাঁ। আমেরিকান এয়ার ফোর্স আর সি আই এ রাশি রাশি ফাইল ভরিয়ে ফেলেছে বস্তা বস্তা রিপোর্টে—'

'তোমার রিপোর্ট যেত নিউ ইয়র্কের ওই ম্যাগাজিনে?'

'আমি যে ওই রিপোর্টেই স্পেশালাইজড। এদেশে পাত্তা পাইনি— ওদেশে—'

'কিন্তু বাবা, রিপোর্টিং ছেড়েছুড়ে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?'

আবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের রাস্তা দেখে নিল সৌরভ। গাড়ি তখন সিআইটি বিল্ডিংস-এর মোড় পেরিয়ে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসে পড়েছে। রাস্তা অন্ধকার। হ্যালোজেন লাইট এসেছে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত— এদিকের রাস্তা গাঢ় তমিস্রায় ঢাকা।

বাড়িতে পৌঁছেই দরজায় খিল তুলে দিল নিজেই।

'আলো? আলো জ্বালুন স্যার...।'

ককিয়ে ওঠা গলায় আওয়াজটা শুনেই এবার কিন্তু তিরিক্ষে হয়ে গেল আমার মেজাজ। আলো জ্বালবার সময়ও তো দেয়নি— করিডর জুড়ে রয়েছে এখন ঘন অন্ধকার। কিন্তু এমনভাবে চেঁচাচ্ছে যেন কচি খোকাটি, পায়ের ওপর দিয়ে এখনই বুঝি সাপ চলে গেল।

সামলে নিলাম নিজেকে। খুট করে সুইচ টিপলাম।

আলো জ্বলল না!

লোডশেডিং!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল টর্চের আলো! সৌরভের পকেট-টর্চ। টর্চের আলোকবৃত্ত মেঝের ওপর পায়ের কাছে ফেলে বললে প্রায় গোঙানির স্বরে, 'দেখলেন... দেখলেন তো?'

'কী দেখলাম? লোডশেডিং— রোজই তো দেখছি।'

'তার কেটে দিয়েছে কিনা জানছেন কী করে?'

'তার কেটে দিয়েছে! কারা?'

'ওরা! ওরা! ওরা!'

দুই
তার কাটবে কারা?

ঠিক এই সময়েই দপ করে জ্বলে উঠল মাথার ওপরকার ইলেকট্রিক বাল্‌ব। অবসান ঘটেছে বিদ্যুৎ ঘাটতির।

'সৌরভ!'

জবাব নেই।

পালিয়ে গেল নাকি? বেরিয়ে এলাম করিডরে। বাঁদিক ফিরে দেখলাম করিডরের শেষে সদর দরজায় খিল তোলাই আছে।

গেল কোথায় তা হলে ছোকরা?

ডানদিকে ফিরলাম। ওইদিকেই কলতলা পায়খানা। দেখলাম টর্চের আলো ঘুরছে মেঝের ওপর। আলো নড়ে নড়ে সরে সরে যাচ্ছে। কী যেন খুঁজছে সৌরভ কলতলা পায়খানার মেঝেতে।

'কী খুঁজছ সৌরভ?'

জবাব দিল না সৌরভ। টর্চের সঞ্চরমাণ আলোও নিভল না।

এগিয়ে গেলাম। সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিলাম কলতলার ইলেকট্রিক বাল্‌ব।

দেখলাম, ড্রেনের ওপর টর্চ ফোকাস করে দাঁড়িয়ে আছে সৌরভ।

'কী দেখছ?'

'ড্রেনে ঝাঁঝরি দেওয়াই আছে দেখছি।'

'থাকবেই তো— নইলে যে ছুঁচো ঢোকে— সাপও ঢুকত, তাই—'

শিউরে উঠল সৌরভ, 'ওই ভয়টাই করেছিলাম।'

'সাপ আর এ তল্লাটে নেই, সৌরভ।'

'সাপ নয়, সাপ নয়।'

‘তবে কী?’

‘রান্নাঘরের ড্রেনেও ঝাঁঝরি দেওয়া আছে তো?’

‘সব ড্রেনেই আছে,’ ধৈর্য ধরে শান্ত গলায় জবাব দিলাম।

‘জানলাগুলো তো দেখছি বন্ধই আছে।’

‘থাকবেই তো। নইলে যে সন্ধে হলেই মশা ঢোকে।’

অদ্ভুত হাসল সৌরভ। কাষ্ঠহাসি বলা যায়, ‘মশা বলেই কাঠের পাল্লা দিয়ে আটকাতে পারছেন— রোলিং-শাটার ছাড়া ওদের আটকাতে পারবেন না।’

‘তুমি আসবে?’

‘কোথায়?’

‘আমার ঘরে।’

বললাম গলা খাঁকারি দিয়ে, ‘সৌরভ?’

‘অ্যাঁ!’

‘মাছ-মাংস কিন্তু নেই। ছানা আছে। দুধ খাবে? গরম করব?’

‘না, না, কিন্তু আপনার খাবার থেকে—’

‘আমি রাতে খুব কম খাই— ছানা বার করলাম তো সেইজন্যেই। ভাগ করে দু’জনের দিব্যি হয়ে যাবে। এই নাও থালা। নাও শুরু করো।’

সৌরভ খেল কিন্তু গোগ্রাসে। আমার খেতে সময় লাগে। বত্রিশবার না চিবিয়ে খাই না। মুখের টায়ালিন দিয়ে কার্বোহাইড্রেট খাদ্যকে হজম করিয়ে নিয়ে তবে পাকস্থলিতে চালান করি। সৌরভ কিন্তু স্রেফ গিলে গেল গরসের পর গরস। যেন অনেকদিন খায়নি। বুঝলাম, ওর পেট ভরবে না। খেতে খেতেই উঠে গিয়ে গ্যাসের উনুনে দুধ গরম করে এনে দিলাম। নিমেষে তাও চোঁ করে মেরে দিলে সৌরভ। তারপর বেসিনে মুখ ধুয়ে বললে, ‘আপনার খাওয়া শেষ হতে হতেই বাড়িটা এক চক্কর ঘুরে দেখে আসি।’

‘কাল সকালে দেখবে’খন। এখন বোসো।’

‘না, না। কাল সকাল পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা নাও করতে পারে।’

ধুত্তোর, বললাম মনে মনে। মুখে বললাম, ‘যাও। কিন্তু দেখার মতো কিছুই নেই, বাবা।’

‘ফুটোফাটাও তো থাকতে পারে। বন্ধ করে দিয়ে আসি।’

খাবার সময় বেশি কথা বলা আমি পছন্দ করি না। তাই আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, ‘যাও।’

খাওয়া শেষ করে আঁচিয়ে উঠে গেলাম সৌরভের খোঁজে। শোবার ঘরের জানলার ওপরের স্কাইলাইটটাও দেখলাম বন্ধ করে দিচ্ছে।

‘ওকী! রাত্রে অক্সিজেন তো দরকার,’ বলেছিলাম ভুরু কুঁচকে।

স্কাইলাইট বন্ধ করে দিয়ে নেমে এসে ও শুধু বলেছিল, ‘এবার চলুন, শুনবেন আমার কাহিনি।’

তিন

মন-অস্ত্র!

বসবার ঘরে পাশাপাশি বসলাম বড় সোফাটায়।

সৌরভ কোনও গৌরচন্দ্রিকার ধার দিয়েও গেল না।

বলল, 'স্যার, যা বলব, ছোট করেই বলব, সময় খুব কম। এমনও হতে পারে, শেষ পর্যন্ত বলবার আর সময় পাব না।'

'বেশ তো, এখন একটু বলো। তারপর ঘুমিয়ে উঠে বাকিটা কাল সকালে—'

'না, না, সকালের আলো আর নাও দেখতে পারি। ওরা যে আমাকে দেখে ফেলেছে।'

'ওরা মানে কার্জন পার্কের ইঁদুরগুলো?'

'হ্যাঁ।'

'এতদূরে আসা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

আবার সেই বিচিত্র হাসি হাসল সৌরভ।

বললে, 'দৈহিক ক্ষমতায় ওরা আমাদের টেক্কা মারতে পারছে না বলেই যে মনের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছে— খবর ঠিক চলে এসেছে।'

'কীভাবে শুনি?'

'বলব, বলব, সবই বলব। কিন্তু অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন না। আপনি পওহারী বাবার নাম নিশ্চয় শুনেছেন?'

'পও-আহারী অর্থাৎ বায়ুভক্ষণকারী বাবা! যিনি দিনের পর দিন মাসের পর মাস গর্তে বসে ধ্যান করতেন! রোজ একমুঠো তেতো নিমপাতা বা কয়েকটা লঙ্কা মাত্র খেতেন! ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলে তাও খেতেন না!'

'তিনি কি বলেননি, একটা মন শরীরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হয়ে আর একটা মনকে সাহায্য করতে পারে।'

'বলেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে।'

'মনের এই শক্তিতে স্বামী বিবেকানন্দও বিশ্বাস করতেন। এখন করছে আর্লিংটনের প্রত্যেকেই।'

'আর্লিংটন। ভার্জিনিয়ার আর্লিংটন! যেখানে রয়েছে পেন্টাগন?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি পেন্টাগনের কথাই বলছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের ওই পাঁচখানা বিল্ডিংয়েও কয়েক বছর ধরে কোটি কোটি ডলার খরচ করে মন-হাতিয়ার বানানোর গোপন গবেষণা চলছে।'

'মন-হাতিয়ার!'

'সাইকিক অস্ত্র।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'আমি যে এই লাইনেরই সাংবাদিক, জানতে আমাকে হয়। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। বৃত্তাকারে সাজানো পাঁচখানা বিল্ডিংয়ের করিডরে করিডরে এই মুহূর্তে গোপন গবেষণা

চলছে কীকরে মনকে হাতিয়ার বানানো যায়— তাই নিয়ে। খবরটা যদিও অফিসিয়ালি অস্বীকার করেছে মার্কিন সরকার, কিন্তু সোভিয়েত মিসাইল কোথায় কোথায় আছে, দূর থেকে মন দিয়ে তা জানার জন্যে, দরকার হলে সোভিয়েত কম্পিউটার জ্যাম করে দেওয়ার জন্যেও দারুণ তোড়জোড় চলছে পেন্টাগনে।'

'বলো কী!'

'১৯৪৯ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে সি আই এ কত খরচ করেছে জানেন নানাধরনের মন-নিয়ন্ত্রণ এক্সপেরিমেন্টের পেছনে?'

'কত?'

'পঁচিশ মিলিয়ন ডলার।'

'স্ট্রেঞ্জ!'

'স্ট্রেঞ্জ তো বটেই। উরি গেলারের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?'

'সাইকিক উরি গেলার? ইজরাইলের সেই ছোকরা?'

'শুধু ছোকরা বলবেন না— বলুন রহস্যময় ছোকরা। যার টেলিপ্যাথি ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর প্যারাসাইকোলজিস্ট আন্দ্রিজা পুহারিখ পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে চাবি বেঁকিয়ে দিতে পারত যে উরি গেলার, ভাঙাঘড়ির কলকবজাও মেরামত করে দিতে পারত শুধু ঘড়ি স্পর্শ করে। ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যার অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দেখে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উরি গেলার, উরি গেলার!' বিস্ময় ফেটে পড়ে আমার কণ্ঠে।

থ হয়ে গেলাম সৌরভের পরের কথাটা শুনেই।

'স্যার, বহু বিতর্কিত এই উরি গেলারকেও চাকরি দিয়েছে পেন্টাগনের ধুরন্ধর সামরিক অফিসাররা।'

'কেন সৌরভ, কেন?'

'ইএসপি টেকনিক শেখানোর জন্যে, শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে।'

'ইএসপি?'

'একস্ট্রা সেনসরি পারসেপশন— অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ।'

'সৌরভ, তুমি সঠিক জানো?'

'গোপন গবেষণাগুলোর সাংকেতিক নামগুলোও জানি। 'এম কে উট্রা', 'ব্লু-বার্ড', 'আর্টিচোক'— আরও শুনবেন? জানেন কি রাশিয়াও গোপনে চালিয়ে যাচ্ছে একই গবেষণা—'

'কিন্তু মন দিয়ে অস্ত্র—'

'খুবই সম্ভব। সব মানুষেরই মন থেকে লো-ফ্রিকোয়েন্সির রেডিয়ো তরঙ্গ বেরোয়— চোখ-কান-নাক-জিভ-চামড়া— এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে তা ধরা যায় না— অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি দিয়ে যারা তা ধরতে পারে— সাইকিক তো তারাই।'

কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, 'ওরকম ঘটনা অবশ্য মহাভারতেও আছে। অতীত-বর্তমান-

ভবিষ্যতের সবকিছুরই যিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, সেই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনি শুনিয়েছিলেন।'

'তা হলে তো আপনি জানেনই সঞ্জয়ের সাতটি অসাধারণ ক্ষমতার মধ্যে তিনটি ছিল অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি বা চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বাইরের দৃষ্টি, দূর থেকে শোনা আর পরচিত্ত-বিজ্ঞান বা অন্যের মনোগত বিষয়ের বোধ?'

'হ্যাঁ মনে পড়ছে বটে।'

'স্যার, আন্দ্রিজ পুহারিখ-এর 'উরি' এ জার্নাল অফ দা মিস্ট্রি অফ উরি গেলা রে' বইখানা পড়েছেন?'

'না, বাবা।'

'তাতে উনি লিখেছেন, একজন হিন্দু সাধুকে নিয়ে উনি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। দূর থেকে তাঁর শোনার ক্ষমতা আছে কিনা যাচাই করছিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত গলায় পরিষ্কার ইংরেজিতে সাধু বলে উঠেছিল— আমি ন'টা মূলনীতি আর শক্তিদের প্রতিনিধি কথা বলছি— অতিমানবিক ধীশক্তি দিয়ে সাহায্য করতে চাই পৃথিবীর সভ্যতাকে।'

এবার আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলাম না। অবিশ্বাসই করতাম, কিন্তু আন্দ্রিজ পুহারিখ কি গাঁজাগল্প শোনানোর মানুষ?

সৌরভ বলল, 'চার বছর পরে পুহারিখ মেক্সিকোর এক ডাক্তারদম্পতির মুখেও এই খবর পেয়েছিলেন— মহাশূন্যের আগন্তুকরা তাঁদের মুখ দিয়ে বার্তা পাঠাচ্ছে পৃথিবীর মানুষের কাছে।'

খাওয়ার আধঘণ্টা পরে জল খাই আমি। জলের গেলাস ছিল সামনেই। এক চুমুকে গেলাস শেষ করে দিয়ে পা তুলে বসলাম সোফায়। খেয়ে-দেয়ে ঘণ্টা তিনেক বই না পড়লে ঘুম হয় না! আজ না হয় গল্পই শোনা যাক।

বললাম, 'তুমি যাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ তারাও কি—'

'হ্যাঁ, মনের ক্ষমতা দিয়ে এতক্ষণে তারা নিশ্চয় হুঁশিয়ার করে দিয়েছে এ তল্লাটের স্যাঙাতদের। তারা আসছে! তারা আসছে! তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র জানে শুধু একজনই— একমাত্র সেই মানুষটিকে খতম করতে তারা আসছে।'

এমন সুরে, এমন ঢঙে, এমন ফিসফিস করে কথাগুলো বলল সৌরভ যে গা ছমছম করে উঠল আমার মতো নির্ভীক মানুষেরও!

চার
বিকল টেলিফোন

পরক্ষণেই চমকে উঠলাম টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং ক্রিং আওয়াজে।

আমি শুধু চমকেই উঠেছিলাম, কিন্তু সৌরভ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সোফা থেকে।

'টেলিফোন! টেলিফোন!'

'অত চেঁচাচ্ছ কেন?' উঠতে উঠতে বলেছিলাম আমি।

আমার ধমকানি শুনে সৌরভ বলেছিল, 'টেলিফোন চালু আছে এখনও, তার কাটা যায়নি। চলুন... চলুন... এখুনি খবরটা দিয়ে দিন— গাড়ি নিয়ে এসে নিয়ে যাক আমাদের এখান থেকে।'

বিরক্ত হলাম। জবাব না দিয়ে গেলাম অফিস ঘরে। রিসিভার তুলে কানে লাগাতেই কড় কড় কড় শব্দ হল একটা। লাইন কেটে যাওয়ার শব্দ। তারপর একেবারেই 'ডেড'।

রিসিভার রাখলাম, আবার তুললাম। রিসিভার যার ওপর রাখা হয়, সেইটা বার কয়েক টিপলাম। ডায়াল ঘোরালাম। কিন্তু কোনও শব্দ আর পেলাম না।

কানের কাছে শুনলাম ভয়বিকৃত স্বর, 'কী হল?'

'লাইনটা কেটে গেল।'

'কই দেখি', হাত থেকে রিসিভার ছিনিয়ে নিয়ে কানে লাগাল সৌরভ। 'রেস্ট' টিপে ডায়াল ঘুরিয়েও কোনও শব্দ না পেয়ে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে মুখে আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

বললে ফিসফিস করে, 'লাইন কেটে দিল ওরা!'

'হঠাৎ ডেড হয়ে যায় কি?'

'মাঝে মাঝে হয় বই কী!'

'এরকমভাবে হয় না। এরকমভাবে হয় না। এরকমভাবে হয় না।' সে কী আর্ত চিৎকার— 'স্যার, সময় আর নেই। যা ভয় করেছিলাম, তাই হয়েছে। ফাঁদে পড়েছি। উঃ! কী কুক্ষণেই এসেছিলাম এই ফাঁকা জায়গায়!'

বলেই হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কান খাড়া করে কী যেন শোনার চেষ্টা করল সৌরভ। গলা খাদে নামিয়ে এনে বললে অস্ফুট গলায়, 'শুনতে পাচ্ছেন?'

থমথমে নৈঃশব্দ্যের মাঝে ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোনও শব্দ পেলাম না। কোত্থেকে ডেকে উঠল একটা পেঁচা।

বললাম, 'সেরকম কিছুই তো শুনছি না।'

'খড়মড় শব্দ? দরজা আঁচড়ানোর শব্দ?'

'কই না!' সত্যিই কান পেতে শুনেও ওই জাতীয় কোনও আওয়াজ শুনতে পেলাম না। তা সত্ত্বেও কেন জানি না একটা কনকনে স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

'কিন্তু আমি যে শুনেছি... এ আওয়াজ আগেও শুনেছি— এসে গেছে! ওরা এসে গেছে।'

পাঁচ
মি. জনসনের উদ্ভট চিঠি

বসবার ঘরে যাওয়ার আগে সৌরভ ছিটকে গেল সদর দরজার সামনে। পাল্লায় কান পেতে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সাঁৎ করে বসবার ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। বসল সোফায়।

কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, 'চুপ করে রইলে কেন? বলো!'

'হ্যাঁ এইবার বলব। দরজা পর্যন্ত যখন ওরা পৌঁছে গেছে, তখন আর দেরি করব না। কিন্তু বলেও আর কোনও লাভ হবে না। বরং শুনলে আপনাকেও ওরা ছেড়ে দেবে না। শুনবেন?'

'আমাকে ছেড়ে দেবে না মানে?'

'মানে ওরা যা করেছে, যা করছে, যা করবে— তা শুধু জানি আমিই। জানত আর একজন, সে আর নেই। শুধু কঙ্কালখানাই ফেলে গিয়েছিল। ওদের দেখেছিল আরও একজন, তারও কঙ্কালখানাই কেবল পাওয়া গিয়েছিল। এবার পাওয়া যাবে শুধু আমার। আপনি কি চান ওদের কাহিনি শোনবার পর নিজের কঙ্কালখানা ফেলে রাখতে?'

কঙ্কাল। ভয়ংকর কঙ্কাল।

'বলুন স্যার, চুপ করে থাকবেন না। আমার জন্যে আপনি কেন মরতে যাবেন! কী দরকার শোনার! জানাটাই ওদের কাছে অপরাধ— না জানাটা নয়। আপনি এখনই বরং চলে যান, আপনাকে নিশ্চয় যেতে দেবে। কিন্তু আমাকে— আমাকে মরতে হবে এইখানেই।'

'সৌরভ,' অতি কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বললাম, 'প্লিজ বাবা, আর হেঁয়ালি কোরো না। আমি বুড়ো হয়েছি, যমের পথ চেয়েই বসে আছি। তাই যম আমাকে একটু খাতিরও করে, আমি বাগড়া দিলে অন্যের সামনে থেকে যমদূতদের কান ধরে ফিরিয়েও নিয়ে যায়। তোমার গায়েও আঁচ লাগতে আমি দেব না, বলো!'

ম্লান হেসে সৌরভ বললে, 'এ যমদূতেরা কারও তোয়াক্কা রাখে না। বেশ, আপনি যখন বাঁচতে চান না, তা হলে শুনুন।

'নিউইয়র্কে 'উফো স্পেশাল' ম্যাগাজিনে চিঠিপত্র আসে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই। আমার মতোই ইনভেস্টিগেটর আর রিপোর্টার তো চিঠি লেখেই— ফটোও পাঠায়— তা ছাড়াও প্রত্যক্ষদর্শী পাঠক-পাঠিকারাও খবর পাঠায় নিয়মিত। দরকার মনে করলে সম্পাদক বিশেষ চিঠি আর রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয় আমার মতো ইনভেস্টিগেটরদের কাছে তদন্ত করে যাচাই করে নেওয়ার জন্যে, তবেই সে খবর ফটোসহ ছাপা হয়। পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুরে একটা স্কুলবাড়ির টিনের চালা উড়ে গিয়েছিল ফ্লাইং সসারের ম্যাগনেটিক আকর্ষণে, মনে আছে? লোহার নোয়া পড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের সারা গায়ে শিহরন বয়ে গিয়েছিল! এখানকার দৈনিকে যতটা খবর না বেরিয়েছিল, তার চাইতে বিস্তারিত খবর বেরিয়েছিল 'উফো স্পেশালে'। ওদের খবর ছাপার বাহাদুরিটা

এই থেকেই আন্দাজ করে নিতে পারেন। তদন্ত করে, ফটো তুলে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম আমিই।

'কয়েক মাস আগে এর চাইতেও অদ্ভুত ঘটনা তদন্ত করার ভার এসে পড়ল আমার ওপর। বেশ কয়েক মাস ধরেই সৃষ্টিছাড়া চিঠির পর চিঠি আসছিল 'উফো স্পেশালের' দপ্তরে সুন্দরবনের কাছ থেকে। —বকখালিতে গেছেন কখনও?'

বললাম, 'বারদুয়েক গিয়েছি। চমৎকার জায়গা।'

সৌরভ বললে, 'বকখালি থেকেই মি. র‍্যালফ জনসন নামে এক সাহেব লিখেছিলেন এই চিঠিগুলো। চিঠি পড়তে গিয়ে চোখ ঠিকরে যেত সম্পাদকমণ্ডলীর। কেননা, মি. জনসন চিঠি লিখতেন কালি-কলমে, টাইপ করে নয়। হাতের লেখাও খুব খারাপ! তার ওপর অত্যধিক হাত কাঁপার দরুন সে লেখা এমনই জড়ানো আর অস্পষ্ট যে প্রাণান্ত ঘটত মানে বুঝতে। যেটুকু বোঝা যেত, তা থেকে এইটুকু অন্তত ধরা যেত যে জনসন সাহেব ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্যে ইচ্ছে করেই ঘটনা বিকৃত করছেন, আবছা রেখে দিচ্ছেন। যেন একটা মানসিক বিভ্রান্তিতে ভুগছেন— বদ্ধ ধারণা নিয়ে অলীক দর্শন করে চলেছেন। আজগুবি কাহিনির পর কাহিনি উপহার দিয়ে চলেছেন। সব খবরের কাগজেই এ ধরনের রাবিশ চিঠিপত্র আসে গাদা গাদা। 'উফো স্পেশালে' তো আসবেই, সাধারণ মানুষের কাছে যা আজগুবি, তাই নিয়েই কারবার এই কাগজের। তাই প্রতিটা চিঠি সত্যিই আজগুবি কিনা, তা না যাচাই করে ছাপা হয় না পত্রিকায়। মি. জনসনের চিঠিগুলো যাচাই করারও দরকার হত না। এমনই উদ্ভট বিষয়বস্তুতে ঠাসা যে পত্রপাঠ ছুড়ে ফেলে দেওয়া হত বাজে কাগজের বাক্সে। সিরিয়াস তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকত সম্পাদকেরা।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে কান পেতে কী যেন শোনবার চেষ্টা করল সৌরভ। কিন্তু নিস্তব্ধ নিশীথের বুক ভেদ করে ঝিল্লিরব ছাড়া আর কোনও শব্দই ভেসে এল না আমার কানে। সৌরভ নিজেও যেন একটু স্বস্তি পেয়েছে মনে হল।

বললে, 'চুপচাপ রয়েছে দেখছি। দল জড়ো করছে বোধহয়, লিডারদের আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে। মরুক গে! সেই ফাঁকে বলে নিই যা বলবার। মি. জনসনের চিঠি পড়েই বাজে কাগজের বাক্সে রেখে দেওয়া হত, এই পর্যন্ত বললাম না?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজল রাত দশটা।

চমকে উঠেই সামলে নিল সৌরভ। নার্ভের বারোটা বাজিয়ে বসে আছে একেবারেই।

বললে, 'শেষকালে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যে সম্পাদকেরা পাগলের মতো বাক্স হাঁটকে বাতিল চিঠিগুলোকেই উদ্ধার করে পরপর সাজিয়ে ফেলতে বাধ্য হলেন। ফল কী দাঁড়াল জানেন? বিস্ময়কর একটা আবিষ্কার। এত বড় আবিষ্কার 'উফো স্পেশালের' মতো বিশেষ ধরনের তদন্তকারী পত্রিকার ভাগ্যেও খুব একটা জোটেনি। কল্পনা করতে পারেন আবিষ্কারটা কী ধরনের?'

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। এখন বললাম ছোট করে, 'না।'

'মামুলি কাগজে যে খবর বেরোলে কেউ বিশ্বাসই করবে না— হাসি টিটকিরি উপহাস

বিদ্রুপের বন্যা ছুটিয়ে দেবে, সেই আবিষ্কার। ...এই পৃথিবী ...এই পৃথিবী গ্রহটার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে অন্য গ্রহের একদল প্রাণী।'

মুখ টিপে হেসে বললাম, 'হাসির খবরই বটে।'

'কিন্তু দয়া করে আপনি হাসবেন না।'

'বেশ, হাসব না।'

'মি. জনসন নানা ধরনের চিঠি লিখে গিয়েছিলেন মাসের পর মাস ধরে। বাতিকগ্রস্তের চিঠি বলেই পাত্তা দেওয়া হয়নি এতদিন। একেবারে ছিঁড়ে ফেলেও দেওয়া হয়নি। কারণ, 'উফো স্পেশ্যাল'-এর অনেকদিনের গ্রাহক তিনি। প্রতিটি সংখ্যা অনেক খরচ করে আনান এবং বাঁধিয়ে রেখে দেন। অজানা উড়ুক্কু যানের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন। সুন্দরবন অঞ্চলে বহুবার তিনি তাদের নাকি দেখেওছেন। যতবার দেখেছেন, ততবারই গাঁটের কড়ি খরচ করে চিঠি লিখে তা জানিয়েছেন। কিন্তু একটাই বদস্বভাব ছিল ভদ্রলোকের। ঘটনাকে নিছক ঘটনার মতো বর্ণনা না করে তার মধ্যে অতি কল্পনাকে ঢুকিয়ে দিতেন। মনগড়া অনেক উদ্ভট ব্যাপার দিয়ে ঘটনাগুলোকে এমন রংদার করে তুলতেন যে বিশ্বাস করার প্রশ্নই উঠত না। যেমন ধরুন, খুদে খুদে সবুজ মানুষরা নাকি তাঁকে স্পেসশিপে চাপিয়ে চাঁদে বেড়িয়ে নিয়ে এসেছে, তাও স্পেসস্যুট না পরিয়েই! ভাবতে পারেন? এই ধরনের ফ্যানট্যাসি বেশিরভাগ চিঠির মধ্যে থাকত বলেই সম্পাদকেরা পাত্তাই দেননি কোনও চিঠিকে এতদিন ধরে।

'কিন্তু গত অক্টোবরে এল এমন একটা চিঠি যা সত্যিই বিচিত্র এবং চুল-খাড়া করা। মি. জনসনকে আর বাতিকগ্রস্ত বুড়ো বলে খারিজ করতে পারলেন না সম্পাদকেরা।'

ছয়
রক্তজমানো আর্তনাদ

যতই মন দিয়ে শুনি না কেন, ফ্লাইং সসার এবং অন্য গ্রহের প্রাণীদের পৃথিবীতে হানা দেওয়ার ব্যাপার-স্যাপারগুলো বিশ্বাস করিনি একেবারেই। এসব গল্প-উপন্যাসেই জমে—পড়তে মন্দ লাগে না। কিন্তু কিছু মিথ্যেকে সত্যি বলে মনে হলেও এই মিথ্যেগুলোকে হাজার তথ্য প্রমাণ দিয়েও সত্য বলে গেলানো যায় না।

'কী ভাবছেন বলুন তো?' চুপ করে আছি দেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল সৌরভ।

অগত্যা মুখ খুলতেই হল। বললাম, 'ভাবছি ইসলামপুরের ঘটনাটা। স্টেটসম্যান, আনন্দবাজারে যদিও বিধ্বস্ত স্কুলবাড়ির ছবি বেরিয়েছিল—'

'তবুও আপনার বিশ্বাস হয়নি, এই তো?' একটু যেন বিদ্রুপের স্বরে বললে সৌরভ।

'দেখো বাবা—'

'আমিও বলি স্যার, বিশ্বাস আপনাদের কোনওদিনই করানো যাবে না। চোখে দেখলেও পরে ভাববেন বুঝি চোখের ভুল। জোসেফ ব্লুমরিচ-এর নাম নিশ্চয় শোনেননি, আপনার

শোনার কথাও নয়, যদিও তিনি আমেরিকার 'নাসা', মানে, ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিসট্রেশনের নামকরা বৈজ্ঞানিক।'

আমতা আমতা করে বললাম, 'কত খবর আর রাখব?'

'এ খবরগুলো তো রাখবেনই না, গাঁজাখুরি কিনা। যদিও জোসেফ ব্লুমরিচ শনিগ্রহ রকেটের নকশা করে দিয়েছেন, যদিও তিনি স্কাইল্যাব মহাকাশযানের ডিজাইন করে দিয়েছেন, তবুও তাঁর নাম জানার দরকার হয় না আমাদের,' ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সৌরভের গলার স্বর।

চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

সৌরভ কিন্তু থামল না, '১৯৭৯ সালের জুন মাসে মিউনিখে একটা কনফারেন্সে তাঁর সঙ্গে আমার একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল—'

অবাক হলাম, ছন্নছাড়া এই ছোকরা মিউনিখ ঘুরেও এসেছে!

বলেও ফেললাম, 'মিউনিখে গিয়েছিলে তুমি?'

'বিলেত যখন ঘুরে এসেছি, তখন নিশ্চয় আমার কথার দামও বেড়েছে, তাই না? ব্লুমরিচ আমাকে কী বলেছিলেন জানেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড্ড বেশি ফ্লাইং সসার দেখা যাচ্ছে বলে প্রেসিডেন্ট কার্টার হুকুম দিয়েছেন রীতিমতো তদন্ত করে দেখা হোক ঘটনাগুলোর পেছনে রয়েছে কাদের কারসাজি।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ইসলামপুরের ঘটনাটা ঘটে তারপরেই, বারোই জুলাই। রিপোর্টটা পাঠিয়েছিলাম মি. ব্লুমরিচকে। উনি যা জবাব দিলেন, শুনলে আপনার মতো অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস হওয়া উচিত।' একটু থেমে বললে সৌরভ, 'মস্কো ইউনিভার্সিটির একজন রাশিয়ান অঙ্কের প্রফেসরও নাকি নানান জায়গা থেকে একশোটা ফ্লাইং সসার দেখেছেন।'

'একশোটা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আরও আছে, আগে শুনুন, তারপর না হয় অবাক হবেন। কোনদিক দিয়ে উড়ে আসছে অথবা কোনদিকে উড়ে যাচ্ছে ফ্লাইং সসারগুলো, সেসব বিশ্লেষণ করে তিনি নিজেই তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন। সবই নাকি শনি গ্রহের দিক থেকে!'

'বলো কী সৌরভ!'

'এমন কথাও বলেছিলেন মস্কো ইউনিভার্সিটির সেই প্রফেসর যে, শনি গ্রহের উপগ্রহ টাইটানে নিশ্চয় ঘাঁটি রয়েছে এইসব ফ্লাইং সসারের। যেহেতু টাইটান খুবই ঠান্ডা জায়গা, সেখানকার বাসিন্দারাও নিশ্চয় থাকে মাটির তলায়। খবরটা গাঁজাখুরি বলে কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারেনি সোভিয়েত সরকার। অফিসিয়ালি তদন্ত চলছে ফ্লাইং সসারদের নিয়ে, ঘুমিয়ে আছে কেবল ভারত সরকার।'

'ভারত সরকারের সমস্যা যে অনেক—'

'ইউ কে, ইউ এস এ, কানাডা, ওয়েস্ট জার্মানি, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়ারও সমস্যা কম নেই স্যার, এরাও অফিসিয়াল তদন্ত চালিয়েছে ফ্লাইং সসারের রহস্য নিয়ে। সপ্তম দেশ হল এই রাশিয়া। ভারতে একা আমি তদন্ত করতে গিয়ে মরতে বসেছি।' শেষের কথাটা বলতে বলতে গলা বুজে এল সৌরভের।

সান্ত্বনার সুরে বলেছিলাম, 'ইসলামপুরের মতো ঘটনা যদি আরও ঘটত, তা হলে না হয়—'

তেড়ে উঠল সৌরভ, 'ঘটেনি বলতে চান? চব্বিশ পরগনার গাইঘাটায় আগুনের গোলা দুশো গজ চওড়া আর তিরিশ কিলোমিটার লম্বা জায়গা জুড়ে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যায়নি?'

'আরে সে তো টর্নেডো—'

'ইন্সপেক্টর জেনারেল গোলক মজুমদার কিন্তু বলেছিলেন, খুব সম্ভব জিনিসটা ফ্লাইং সসার, আলিপুর আবহাওয়া অফিসের বিশেষজ্ঞেরাও বলেছিলেন, ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশের সাইক্লোনে যে অগ্নিগোলক দেখা গিয়েছিল, তার সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে গাইঘাটার অগ্নিগোলকের, দুটোরই ব্যাখ্যা হয় না নৈসর্গিক যুক্তি দিয়ে। কী স্যার, এবার কিছু বলুন?'

'তুমিই বলো বাবা, আমি শুনি।'

'হ্যাঁ শুধু শুনেই যান, আর অবিশ্বাস করে যান। তবে বেশিক্ষণ আর করতে হবে না, সময় হয়ে এল বলে... 'ও কী! ও কী! ও কী!'

আচমকা একটা রক্তজল করা আর্ত চিৎকার ভেসে এল মাঠের দিক থেকে। 'গুরুজি! গুরুজি! গুরুজি! গু-রু—!'

শেষের দিকে চিৎকারটা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল, যেন স্বরনালি ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল, কেন যে তা মনে হয়েছিল, তা বলতে পারব না। অত চিন্তাভাবনা করার মতো মানসিক অবস্থাও তখন ছিল না। কেননা, ও কণ্ঠস্বর আমি চিনি।

খোকা ব্রহ্মচারীর গলা।

তাই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। ঠকঠক করে হাঁটু কেঁপে উঠেছিল বিষম আতঙ্কে! খোকা! খোকা! খোকা কেন অমন বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ থেমে গেল? চিৎকার করে উঠেছিলাম আকুল কণ্ঠে, 'খোকা! খোকা! কী হয়েছে? আমি যাচ্ছি।'

আমার হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দিয়ে রক্তহীন মুখে জিজ্ঞেস করেছিল সৌরভ, 'কে ও? কে ও? কে ও?'

'খোকা! খোকা! সাইকিক খোকা ব্রহ্মচারী। একটু আগেই ওই তো ফোন করেছিল। ধ্যানে দেখেছে নাকি আমার সাদা কঙ্কাল, আসতে চেয়েছিল, বারণ করেছিলাম—'

'তা সত্ত্বেও এসেছিল, কিন্তু পৌঁছতে পারল না, আর পারবেও না কোনওদিন, সাদা কঙ্কালটা কাল সকালে সবাই দেখবে,' ফিসফিস করে বলেছিল সৌরভ।

'খোকা, খোকাকেও কি ওরা—'

'হ্যাঁ, সরিয়ে দিল পৃথিবী থেকে। বড্ড বেশি জেনে ফেলেছিল কিনা, আর জানতে দিল না, এবার— এবার আপনার আর আমার পালা।'

মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ নাকি হঠাৎ নির্ভয় হয়ে যায়, চারদিক থেকে বিপদ ছেঁকে ধরলেও অকস্মাৎ আশ্চর্য প্রশান্তি স্নায়ুকে স্থির করে দিয়ে যায়। এসব কথা শোনা ছিল এতদিন— সেইদিন সেই মুহূর্তে তা উপলব্ধি করলাম।

গলা একটুও কাঁপল না, স্থির রইল চোখের পাতা। বললাম সহজ সুরে, 'তারপর?'

'তারপর আবার কী? আর কী জানতে চান?'

'বড্ড নার্ভাস হয়েছ বাবা।—মি. জনসন কী এমন চিঠি লিখলেন যে থ হয়ে গেল তোমার 'উফো স্পেশ্যালের' সম্পাদকেরা, সেই কাহিনিটা এবার শোনাও।'

আমার শান্ত মুখচ্ছবির দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ঢোঁক গিলে বললে সৌরভ, 'নার্ভের জোর আছে বটে আপনার। সবচেয়ে অদ্ভুত শেষ চিঠিটা মি. জনসন কোন মাসে লিখেছিলেন বললাম—?'

'গত অক্টোবরে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গত অক্টোবরেই তিনি প্রথম ফ্যানট্যাসটিক পর্যটন কাহিনি লেখায় ক্ষান্তি দিয়ে লিখলেন রোমহর্ষক একটা কাহিনি— এবার আর পৃথিবী ছাড়িয়ে নয়, পৃথিবীর ওপরেই।'

'কোথায়?'

'তাঁর শুঁটকি মাছের আড়তে।'

'শুঁটকি মাছের আড়তে!'

'ওইটেই যে ব্যাবসা ছিল ওঁর। বকখালি যখন গেছেন, নিশ্চয়ই ঝাউবনের পূর্ব সীমানাটা দেখে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুঁটকি মাছ রোদে শুকানো হয় বটে বালির ওপর, খালের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছি মেক্যানাইজড বোট, ওপারে বালির চড়া, রাশি রাশি বক উড়ছে—'

'ওইখানে, ওই ঝাউবনের মধ্যে জনসন সাহেবের বাংলোটা কিন্তু দেখেননি। বাইরে থেকে দেখা যায় না। ওঁর নিজেরই মেশিন-বোট আছে গোটা পঞ্চাশ। সারা রাত মাছ ধরা হয়, রোদে শুকিয়ে চালান দেওয়া হয় বেশির ভাগই ইন্ডিয়ার বাইরে।'

'এত ব্যাবসা থাকতে সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছের ব্যাবসা। ভারী অদ্ভুত তো!'

'জনসন সাহেব নিজেও যে অত্যন্ত অদ্ভুত লোক।'

'কী রকম?'

'সমাজ ছাড়া হয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার পেছনে যে কারণটা আছে, তা এমনই অদ্ভুত যে শুনলে কেউই বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কুম্ভকর্ণ রোগের নাম শুনেছেন?'

'কুম্ভকর্ণ রোগ! সেটা আবার কী?'

'ডাক্তারি ভাষায় রোগটার নাম 'হাইপারসোমনিয়া'। খুবই বিরল রোগ। রামায়ণের কুম্ভকর্ণের কাহিনি যে মোটেই অলীক নয়, তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় নাকি খ্রিস্টজন্মের ছশো বছর আগে, ক্রিট দ্বীপের কবি এপিমেনডেজ একটা গুহায় ঢুকে ৫৭ বছর একটানা ঘুমিয়েছিলেন, রিপ ভ্যান উইঙ্কল কাহিনির সূত্রপাত নিশ্চয় তারপর থেকেই।'

'সে তো গল্প।'

'সত্য ঘটনা নথিভুক্ত করে গেছেন একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ১৯২৫ সালে, হাইপারসোমনিয়ার পাঁচজন রুগি পেয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে আর একজন বৈজ্ঞানিক পেয়েছিলেন এগারোটা রুগি। তারপর থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত হাইপারসোমনিয়ার আর রুগি পাওয়া যায়নি।'

কৌতূহলী হলাম শিয়রে শমন নিয়েও, '১৯৮১-তে কোথায় পাওয়া গেল মডার্ন কুম্ভকর্ণকে?'

'ব্যাঙ্গালোরে। বয়স মোটে একুশ। খবরটা ড. নারায়ণ বলেন ভুবনেশ্বরের ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে।'

'জনসন সাহেবও কি—'

'আরেকটি কুম্ভকর্ণ। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকেন ওই কারণেই, উদ্ভট ফ্যানট্যাসি রচনাও করেন ওই কারণে।'

'বুঝলাম না। জঙ্গলে পড়ে পড়ে ঘুমোনোর কারণটা না হয় বুঝলাম, নিরিবিলিতে ঘুমটা ভালই হয়। কিন্তু উদ্ভট ফ্যানট্যাসি রচনার সঙ্গে কুম্ভকর্ণের রোগের সম্পর্কটা—'

'ড. নারায়ণই বলেছিলেন, যারা বিষাদ রোগে ভোগে, মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত, কুম্ভকর্ণ রোগ তাদেরকেই পেয়ে বসে। সমাজের টিটকিরি সইতে না পেরে জনসন সাহেব তাই একা একা থাকতেন বকখালির ঝাউবনে।'

'তাই বলো। মনের রোগে ভুগতেন বলেই স্বপ্ন দেখতেন আফিমখোরের মতো, ঘটনার নামে গল্পও শুনিয়েছেন তাই।'

'শেষ ঘটনাটা কিন্তু গল্প নয়। আগে শুনুন, তারপর মন্তব্য করবেন। একটানা তিনদিন ঘুমিয়ে উঠে বাংলোর বারান্দায় বসে ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলেন জনসন সাহেব। জেনারেটরের আলো জ্বলছিল মাথার ওপর। দেখলেন একটা বাঘরুল নীলচে জ্বলন্ত চোখ মেলে স্যাঁত করে ঢুকে গেল পাশের ঝোপে। থমথম করছে ঝাউবন। বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে দেখলে ভয় লাগে, একা কেন, দল বেঁধে যেতেও সাহস হয় না। জনসন সাহেব কিন্তু একা একাই রাতের পর রাত বারান্দায় জেগে বসে কাটিয়ে দেন, নয়তো পড়ে পড়ে তিন-চারদিন একটানা ঘুমোন।'

থামল সৌরভ। কান খাড়া করে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর বললে, 'এখনও হামলা শুরু হল না কেন বুঝছি না। মতলব কী ব্যাটাদের?'

ধৈর্য ধরে বললাম, 'মতলব যাই হোক না কেন, জনসন সাহেবের সামনে দিয়ে কী যেন একটা রুল চলে গেল—'

'বাঘরুল, হিংস্র বুনো বেড়াল—'

'তারপর হলটা কী?'

'খড়মড় খড়মড় একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন।'

'বেড়ালের মাসি গেল বোধহয়!'

পরিস্থিতিটা রসিকতা করার নয়। তাই বেশ বিরক্ত হল সৌরভ।

বললে, 'বকখালির ঝাউবনে বাঘ নেই। এখন যা আছে, তা বাঘেরও যম।'

'যেমন?'

'খড়মড় খড়মড় আওয়াজটা ভেসে এল শুঁটকি মাছের গুদোমঘরের দিক থেকে। তৎক্ষণাৎ দৌড়লেন জনসনসাহেব। দরজা খুলেই দেখলেন ইঁদুর!'

'ইঁদুর।'

‘হাজারে হাজারে ইঁদুর।’

‘মাছের লোভে নিশ্চয়—’

‘দরজা খুলে ধরে জনসন সাহেব অত ইঁদুরের দিকে হতভম্ব হয়ে চেয়ে ছিলেন। আরও হতভম্ব হয়ে গেলেন যখন দেখলেন ইঁদুরগুলোও একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে।’

‘চেয়ে রয়েছে?’

‘শুধু চেয়ে রয়েছে নয়, যেন তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাইছে।’

‘ধ্যাৎ!’

‘প্লিজ স্যার, বাগড়া দেবেন না শুধু শুনে যান— সময় বেশি নেই।’

‘কী বলল, ইঁদুররা?’

‘কিছু বলেনি। আচমকা একসঙ্গে বোঁ করে পেছন ফিরেই দে চম্পট।’

‘খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার—’

‘অস্বাভাবিক হল তাদের একসঙ্গে দল বেঁধে একই সময়ে ঘুরে যাওয়াটা— যেন মিলিটারি সোলজার— হুকুম পেয়েই—’

‘যাক গে, যাক গে, তারপর কী হল বলো—’

‘জনসন সাহেব দৌড়লেন শট-গান আনতে। ফিরে এসে কিন্তু দেখতে পেলেন না একটা ইঁদুরও।’

‘খুবই স্বাভাবিক।’

‘অস্বাভাবিক ঘটনার খবর এল জনসন সাহেবের পরের চিঠিতে— ইঁদুররা নাকি আবার ফিরে এসেছে।’

আট
ফ্লাইং সসারে অতিকায় ইঁদুর

ঢং ঢং করে রাত দশটা বাজল ঘড়িতে। বললাম, ‘এবার একটু সংক্ষেপে সারো, সৌরভ।’

‘ছাব্বিশে অক্টোবর লিখলেন, ‘কুম্ভকর্ণের ঘুমটা চোখ থেকে তাড়ানোর জন্যে চেষ্টার কম কসুর করিনি। কাল সারারাত জেগে থাকার চেষ্টা করেছিলাম। এন্তার ব্ল্যাক কফি খেয়েছিলাম। দুপুরবেলা একটু গড়িয়েও নিয়েছিলাম রাত্রে জেগে থাকব বলে। তা সত্ত্বেও হাইপারসোমনিয়া রেহাই দেয়নি আমাকে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিশ্চয় রাত একটার পর— ওই পর্যন্ত ঘড়ি দেখেছিলাম মনে আছে। ঘুম ভাঙল দু’দিন পর। দেখলাম ইঁদুর-রাস্কেলগুলো আবার ফিরে এসেছে। এবার ঠিক করেছি, সেঁকো বিষ দিয়ে মারব— কিন্তু বস্তা বস্তা বিষ লাগবে যে—’ পয়লা নভেম্বর এল আর একখানা চিঠি, ‘হারামজাদারা এবার আমার বাড়ির মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আলুর ক্যানেস্তারা সাবাড়।’

‘শুঁটকি মাছ ছেড়ে আলু!’ বললাম গালে হাত দিয়ে।

'মজা তো ওইখানেই। কোনটা খেলে বাঁচা যাবে, আর কোনটা খেলে অক্কা পেতে হবে, এ জ্ঞানটা যে কতখানি টনটনে ইঁদুরবাহিনীর, তা জনসনসাহেব জানালেন আঠাশে অক্টোবরের চিঠিতে।

'আলু আর শুঁটকি মাছে বিষ মাখিয়ে রেখেছিলেন, স্পর্শও করেনি ইঁদুররা। ইঁদুরকল পেতেছিলেন। সকালবেলা দেখেন, সব ক'টা কলই পড়ে গেছে, কিন্তু কোনওটার মধ্যেই নেই ইঁদুর। এদিকে মাছের গুদোম ফাঁকা হয়ে এল বলে। সারা রাত আলো জ্বালিয়ে রাখবেন ঠিক করেছেন, আলো দেখে যাতে ভাগলবা হয় ইঁদুররা।

'পয়লা নভেম্বর লিখলেন, কী সর্বনাশ! ব্যাটারা যে এবার বাড়িময় টহল দিতে শুরু করেছে, খাটে শুয়ে শুয়েই শুনতে পাচ্ছি। বাদামের বস্তাও সাবাড় করছে, একা এত ইঁদুরকে ঠেকাই কী করে?

'তেসরা নভেম্বর এল আর একখানা চিঠি। কাঠ হয়ে খাটে শুয়ে ছিলেন জনসন সাহেব। শোবার ঘরের দরজা বন্ধই ছিল। স্পষ্ট শুনলেন খড়মড় খড়মড় করে কাতারে কাতারে ইঁদুর জড়ো হচ্ছে দরজার ঠিক সামনেই। তারপর আর শব্দ নেই। যেন কান খাড়া করে শুনছে। আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমেছিলেন জনসন সাহেব। ওইটুকু শব্দ শুনেই চোঁ চাঁ দৌড় দিয়েছে সমস্ত ইঁদুর। বাইরে বেরিয়ে দেখেন ময়দার বস্তায় আর একটুও ময়দা নেই। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। দরজার পাল্লা ফুটো করে ঢুকেছে ভেতরে— শেষ করে গেছে সমস্ত ময়দা।'

'ইন্টারেস্টিং।' বললাম আমি।

'জনসন সাহেবের কাছে অবশ্য মোটেই তা মনে হয়নি, হা-হুতাশ করে সেইসব কথাই লিখেছিলেন আট নভেম্বরের চিঠিতে।— বাড়ি এখন ঠান্ডা, ইঁদুর ব্যাটাদের সাড়া-শব্দ নেই। রোজ ডায়মন্ডহারবার গিয়ে বাজার করে আনতে হচ্ছে। বড্ড তকলিফ হচ্ছে। পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন। তারা তো হেসেই খুন। ভাঁড়ারঘর আর গুদোমঘর বিলকুল ফাঁকা। ইঁদুর-হারামজাদারা নিশ্চয় অন্য কোথাও গেছে পেটের জ্বালা জুড়োতে। বেশ কয়েকদিন আর কারও ল্যাজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।'

'ফাইন!' আমার মন্তব্য।

সৌরভ বললে, 'আপনি কিন্তু স্যার সিরিয়াস নন।'

'হব কী করে? গায়ের লোম খাড়া হওয়ার মতো কোনও ঘটনাই তো ঘটছে না।'

'তা হলে এবার লোম খাড়া করে ছাড়ছি আপনার। সতেরোই নভেম্বর এল জনসন সাহেবের বিরাট চিঠি। পালের গোদাদের উনি দেখতে পেয়েছেন।'

'ইঁদুরদের লিডার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইঁদুরবাহিনীর লিডার। অতিকায় ইঁদুর। লম্বায় দু' ফুট— ইয়া বড় মাথা।'

'দু' ফুট লম্বা ইঁদুর।' চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার, 'জনসন সাহেব স্বপ্ন দেখেননি তো?'

'না, না, স্বপ্ন নয়। হাইপারসোমনিয়ার ঘোর কেটে যাওয়ার পর দেখেছেন। উঠোনে খচখচ খচখচ করে চক্কর দিচ্ছিল। আওয়াজ শুনেই পটাস করে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দেন উনি! কী দেখলেন জানেন? দেখলেন, দেখলেন—'

'বলো, বলো, কী দেখলেন?'

'দেখলেন, ছোট ইঁদুরগুলো লাইন করে চলেছে, আগে আগে চলেছে পেল্লায় সাইজের লিডাররা।'

'লিড করছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আলো জ্বলে উঠতেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েই আলোর বাইরে সাঁ-সাঁ করে উধাও হয়ে গেল অতগুলো ইঁদুর চক্ষের নিমেষে। তারপর... তারপর কী হল জানেন? জনসন সাহেব জানলায় এসে দাঁড়ালেন। পেল্লায় ইঁদুরগুলো তাঁর দিকে চেয়ে... তাঁর দিকে চেয়ে—'

'আঃ! খাবি খাচ্ছ কেন? কী করল তাঁর দিকে চেয়ে?'

'কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে।'

'ননসেন্স।'

'যা খুশি বলে যান। আমিও যা জানি, তা বলে যাই। একটু পরেই তো দু'জনেই চলে যাব সব জানাজানির বাইরে। নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে একে একে সরে পড়ল অতিকায় লিডাররা। জনসন সাহেব চিঠি শেষ করলেন নিজস্ব মন্তব্য দিয়ে। খুবই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য— লোম খাড়া করাও বলতে পারেন।'

'যেমন?'

'পৃথিবীতে ওই সাইজের ইঁদুর আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি— নিশ্চয় এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে। ফ্লাইং সসারে চেপে।'

নয়
জনসন সাহেবের রোমাঞ্চকর পত্রাবলি

মি. জনসনের প্রতিটি চিঠিই অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করে রেখেছিল সৌরভ। এমনকী তারিখ পর্যন্ত। ঝড়ের মতো প্রতিটি পত্র-উপাখ্যান বিবৃত করে গিয়েছিল সাল তারিখসমেত, মাঝে মাঝে কেবল টিপ্পনী বর্ষণ করে গেছিলাম আমি।

কিন্তু... কিন্তু এখন একটু তাড়াতাড়ি লিখতে হবে। অনেকগুলো যাচ্ছেতাই ব্যাপার ঘটে গেল আমার এই ছোট্ট বাড়িখানার মধ্যেই। চোর নয়, ডাকাত নয়, প্রেত নয়— তবুও ঘটছে অত্যাশ্চর্য ঘটনার পর ঘটনা। বেশ বুঝছি, বেশিক্ষণ লেখবার আর সময় পাব না। ...সৌরভ আমার সামনেই রয়েছে... কী অবস্থায় রয়েছে, তা যথাসময়ে বলব— এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা এতদিন ছিল আমার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে, বম্বে হসপিটালের ডাক্তার রমাকান্ত কেনি অ্যাবসেন্ট হিলিংয়ে পোক্ত শুনেছি। দূর থেকে রোগ সারিয়ে দিতে পারেন সাইকিক ক্ষমতা দিয়ে। কিন্তু অজানা এই বিভীষিকারা একটু আগেই যা করে গেল, তাকে বলব অ্যাবসেন্ট কিলিং— দূর থেকেই নরহত্যা। কীভাবে যে এই অসম্ভবকে সম্ভব করল, তা নিয়ে গবেষণা করার সময় আর নেই। মন দিয়ে অস্ত্র সম্ভব বই কী— অবশ্যই

সম্ভব, চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—

সৌরভ! সৌরভ!

না, না, ভেঙে পড়ার সময় এখন নয়। জনসন সাহেবের চিঠিগুলোর সংক্ষিপ্তসার আগে লিখে যাই, তারপর আসব এই বাড়ির অতিপ্রাকৃত কাণ্ডকারখানায়।

অতিকায় ইঁদুরেরা নাকি ফ্লাইং সসারে চেপে অন্য গ্রহ থেকে হানা দিয়েছে পৃথিবীতে, এই কথাটা সৌরভের মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই ঘটল প্রথম অদ্ভুত ঘটনাটা...

ঝপ করে নিভে গেল বাড়ির আলো।

'লোডশেডিং,' বলেছিলাম আমি।

অন্ধকারে ককিয়ে উঠেছিল সৌরভ, 'আজ্ঞে না, জানলার ফাঁক দিয়ে দেখছেন দূরে দূরে আলো জ্বলছে।'

'তা হলে?'

'ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিল ওরা।'

ধাতানি দিতে গিয়েও চুপ করে গেলাম।

বললাম, 'অন্ধকারেই বলে যাও। ওরা আরও খানিকটা সময় তো দেবে, সেই ফাঁকে শুনে নিই রাজা-র‍্যাটদের কাহিনি।'

'রাজা-র‍্যাট!'

'রাজা ইঁদুরদের রাজা-র‍্যাট বলব না তো কী বলব। গণতন্ত্রের যুগে রাজাগিরি ছুটিয়ে দেওয়া যাবে'খন যথাসময়ে— নির্ভয়ে বলে যাও অন্ধকারেই। আচ্ছা, আচ্ছা, মোমবাতি জ্বালাচ্ছি... নাও... এবার বলো।'

মোমবাতির আলোয় সৌরভ বলে গেল অত্যাশ্চর্য কাহিনিটা—আগের চাইতেও দ্রুত স্বরে।

১৯ নভেম্বর: খুব বৃষ্টি পড়েছে আজ। কাদা প্যাচপ্যাচ করছে রাস্তায়। কোদালে করে বালি নিয়ে গিয়ে ফেলতে হচ্ছে রাস্তায়, চারপাশে দেখতে পাচ্ছি ইঁদুর। এতদিন কলে ফেলেছি ইঁদুরদের, এখন ওদেরই ফাঁদে পড়েছি আমি।

২০ নভেম্বর: জেনারেটরের তার কেটে দিয়েছে, বাড়ি অন্ধকার। ইলেকট্রিক লাইটের দফারফা। টেলিফোনেরও তার কেটে দিয়েছে, রাত্রে ঘুমোতে দিচ্ছে না। হাইপারসোমনিয়াও সেরে গেল মনে হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে আমার ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

২১ নভেম্বর: রাজা-র‍্যাটকে আজ ধরেছি। রান্নাঘরে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গা তাতাচ্ছিল আটটা দানব ইঁদুর। হুড়মুড় করে দরজা খুলে ইচ্ছে করেই মাটিতে পা ঠুকেছিলাম ভড়কে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু ভড়কানো দূরে থাকুক, আট শয়তানই কটমট করে আমার দিকেই চেয়ে রইল মিনিটখানেক। পুরো একটা মিনিট তো বটেই। আট জোড়া বোতামের মতো চোখের চাহনির সামনে হঠাৎ কেমন জানি মাথা ঘুরতে লাগল আমার। হাতের কাছেই তাকের ওপর ছিল এক বোতল অ্যামোনিয়া। আছাড় মেরে ভেঙে দিলাম মেঝের ওপর। তাইতেই কাজ হল। ওরা চোখ সরিয়ে নিলে আমার ওপর থেকে। এইজন্যেই কিনা জানি না অ্যামোনিয়ার ঝাঁজেও হতে পারে, মাথা সাফ হয়ে গেল আমার। শটগান হাতেই ছিল।

দমাদম গুলি চালালাম। মারা গেল তিনটে। বাকি পাঁচটা পালাল সেই ফাঁকে। মরা ইঁদুর তিনটেকে ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। শেকল দিয়ে ফ্রিজ পেঁচিয়ে তালা দিয়ে রেখেছি। দেখি এবার অতিকায় ইঁদুর দেখে কীভাবে টিটকিরি দেয় পুলিশ। বলে কিনা আমি তাড়ি খাই। গোল্লায় যাক পুলিশ। আপনাদের রিপোর্টার পাঠান। আমাকে বলে কিনা লায়ার।

এই শেষ। আর চিঠি লেখেননি মি. র‍্যালফ জনসন।

কিন্তু এবার টনক নড়ল 'উফো স্পেশ্যালের' সম্পাদকদের। দু' ফুট লম্বা বিরাট মাথাওলা ইঁদুর একদৃষ্টে চেয়ে থেকে মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়, এতো বড় তাজ্জব কি বাৎ!

কপোলকল্পনা নিশ্চয় নয়। তিন-তিনটে ইঁদুরকে তো ফ্রিজে পুরে রেখে দিয়েছেন মডার্ন কুম্ভকর্ণ। পাঠানো যাক না ইন্ডিয়ান রিপোর্টারকে, ফটো তুলেও আনুক। তারপর ফলাও করে ছাপা যাবে খবরটা।

কিন্তু তারপর যা ঘটল, 'উফো স্পেশ্যাল'-এর দুঁদে সম্পাদকেরাও কল্পনা করতে পারেননি। হিমশীতল স্রোত বয়ে গেছিল প্রত্যেকেরই শিরদাঁড়া বেয়ে।

দশ
সৌরভের জবানবন্দি

নিউইয়র্ক থেকে চিঠি পেলাম। মি. র‍্যালফ্ জনসনের সবক'টা চিঠির জেরক্স কপিও পেলাম খামের মধ্যে। এক্ষুনি যেন ক্যামেরা নিয়ে রওনা হই। এসপ্ল্যানেড থেকে চাপলাম নামখানার বাসে। নদী পেরিয়ে অনেক খোঁজখবর করে হাজির হলাম জনসন সাহেবের বাংলোয়।

দূর থেকেই চমকে উঠলাম। দেখলাম জনসন সাহেবের বাংলো থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভাগ্যিস ঝাউবনের মধ্যে মাটির চেয়ে বালি বেশি, তাই পথ চলতে খুব একটা কষ্ট হয়নি। বারে বারে পা হড়কে যায়নি। চক্ষুস্থির হয়ে গেল কাছাকাছি যেতেই। ধড়াস করে উঠল বুকটা।

আধখানা বাংলোবাড়ি, শুঁটকি মাছের গুদোম পুড়ে প্রায় ছাই। ধোঁয়া উঠছে ধ্বংসস্তূপ থেকে। কাঠের বরগাগুলো এখনও পুড়ছে গুমে গুমে।

কী করব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসব লোকজন? না, আগে গিয়ে দেখে আসি আসল ব্যাপারটা কী?

শেষকালে জিতে গেল আমার সাংবাদিকের সত্তা। লোকজন পরে ডাকলেও চলবে, আগে স্বচক্ষে দেখে আসা যাক আগুন লেগেছে কেন? জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোলাম আধপোড়া বাংলোবাড়ির দিকে।

থমকে দাঁড়ালাম বাইরে। থমথম করছে চারিদিক। মৃত্যুপুরীর স্তব্ধতা বিরাজ করছে ধ্বংসস্তূপে। শ্মশানে অথবা গোরস্থানে দাঁড়িয়ে থাকলে গা শিরশির করে এইভাবে। ঝাউবনের মর্মর আর সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার একটানা আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। ধ্বংসস্তূপ ঘিরে কাদা জমিতে জল দাঁড়িয়ে আছে এখনও। কাদা মাড়িয়ে মাড়িয়েই এক

চক্কর ঘুরে এলাম আধপোড়া বাংলোবাড়ি আর একেবারেই পুড়ে ছাই-হয়ে যাওয়া শুঁটকি মাছের গুদোম ঘরখানা। গলা ছেড়ে ডাকলাম মি. জনসনের নাম ধরে। কেউ সাড়া দিল না। দেখলাম, বাংলোবাড়ির পেছনের আধখানাই আগুন একেবারে গ্রাস করেছে। কড়িবরগা থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। দূর থেকে এই ধোঁয়াই দেখেছিলাম আমি।

সাহস সঞ্চয় করলাম একটু একটু করে। দিনের আলোয় অত ভয় কীসের! কাকেই বা ভয়? মনকে বোঝালাম বটে, কিন্তু নামহীন নিতান্ত অযৌক্তিক একটা আতঙ্ক অকারণেই কেটে কেটে বসে যেতে লাগল মনের মধ্যে। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এরকম নিরালা বাড়ি, ছিটগ্রস্ত গৃহস্বামী, তাঁর কুম্ভকর্ণ রোগ, অতিকায় ইঁদুরদের আজব কাহিনি, অগ্নিদেবের করাল নৃত্য এবং সবার ওপর অস্বাভাবিক থমথমে পরিবেশ আমার মতো ডাকাবুকো ছেলেরও গায়ে কাঁটা জাগিয়ে তুলল।

শেষকালে সাহসে বুক বেঁধে এগোলাম। বসবার ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল হৃৎপিণ্ড— বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে এল হাত আর পায়ের আঙুল।

তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছিল জানলা দিয়ে। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই দেখতে পেয়েছিলাম দেহটা।

একটা মড়া। মি. জনসনের মৃতদেহ। চাপা পড়েছেন ভেঙে-পড়া কড়িবরগার তলায়। হাত দু'খানা কেবল বেরিয়ে আছে বাইরে। ভঙ্গিমা দেখে মনে হচ্ছে যেন নিজেকে টেনে বার করার চেষ্টা করেছিলেন। পুরো বাড়িটাই কাঠের টুরিস্ট-লজের ডরমিটরি প্যাটার্নে তৈরি। কাঠের মেঝে নীচের জমা জলে ঠেকে যাওয়ায় আর পোড়েনি, অ্যাসবেসটসের চালেও আগুন ধরেনি। ভারী চালটা মেঝের তলার জীর্ণ খুঁটি ভেঙে দিয়ে পুরো মেঝেটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল বলেই আগুন নিভে গেছে এদিকে, পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি র‍্যালফ্ জনসনের মৃতদেহ।

আধপোড়া মড়া দেখলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায় না এমন লোক খুব কমই আছে। আমারও কৌতূহল মিটে যাওয়ার কথা ওইখানেই। কিন্তু মেটেনি। মৃতদেহটা শুধু আধপোড়া বলেই বিকৃত বিকট হয়েছে তা নয়। আরও বীভৎস, আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে অন্য কারণে।

মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে বাহু আর মাথা থেকে।

মরণ-হাসি হাসছে যেন প্রায় মাংসহীন মাথার খুলিটা, দাঁত খিঁচিয়ে ভয়ানক বিদ্রুপের হাসি হেসে যেন মৃত্যুর পরেও সাহায্য প্রার্থনা করছে। অক্ষিকোটরে চোখের বালাই নেই, শূন্য গহ্বর থেকে গড়িয়ে পড়ছে শুকনো রক্তের অশ্রু।

ছিটকে সরে এসেছিলাম জানলার সামনে থেকে। বিকট দৃশ্যটা দেখে যেন পাগল হয়ে গেছিলাম সেই মুহূর্তের জন্যে। উন্মাদের মতো জল আর কাদার ওপর দিয়ে ছপাৎ ছপাৎ করে লাফিয়ে দৌড়ে আছাড় খেয়ে, আবার উঠে পড়ে দৌড়েছিলাম ঝাউবনের মধ্যে। সমুদ্রগর্জন আর বনমর্মর যেন ব্যঙ্গের হাসি হেসে গিয়েছিল পেছনে। আমি দৌড়েছিলাম, ক্ষিপ্তের মতো জ্ঞান হারিয়ে দৌড়েছিলাম। কাঁটা ঝোপে ট্রাউজার্স ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছিল, চামড়া কেটে রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছিল, গর্তে পড়ে পা মচকে গিয়েছিল, তবুও আমি

আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে ধাতস্থ হতে পারিনি। কাদা আর রক্তে মাখামাখি অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছেছিলাম মনিহারি দোকানে। দোকানদারকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলাম পুলিশ ফাঁড়িতে। ধপাস করে বসে পড়েছিলাম একটা ভাঙা চেয়ারে, কথা বলতে পারিনি বেশ কিছুক্ষণ। ফুসফুস যেন ফেটে যাচ্ছিল একটানা অতক্ষণ দৌড়ে আসায়— নিঃসীম আতঙ্কে খটাখট শব্দে কেঁপে চলেছিল চোয়ালজোড়া, মনের চোখ থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না দাঁত-বার-করা বিকট-হাসি-ভরা বীভৎস করোটির ছবিখানা! কী ভয়ানক! কী ভয়ানক!

দারোগা নিজে জল এনে খাইয়েছিলেন আমাকে। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিলেন হাত আর মুখের কাদা। এক গেলাস গরম চা খাওয়ার পর বলেছিলাম এইমাত্র কী দেখে এসেছি... কী অবস্থায় দেখে এসেছি। আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে বড়বাবু আমাকে ফাঁড়িতে বসিয়ে রেখেই দলবল নিয়ে দৌড়েছিলেন ঝাউবনে, আমাকে বলেছিলেন পরে আসতে। ধাতস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। তারপরেও একা যেতে সাহসে কুলোয়নি। একজন চৌকিদার আর সেই দোকানদারকে সঙ্গে করে গেছিলাম অকুস্থলে।

আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন বড়বাবু। যা বললেন, তা শুনে থ হয়ে গেলাম।

মৃতদেহ পাওয়া যায়নি!

সে কী কথা! এই তো একটু আগেই দেখে গেলাম। আসুন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দিচ্ছি, বলে বড়বাবুকে নিয়ে গেছিলাম জানলার সামনে। ভেতরে তাকাতে মন চায়নি, শিউরে উঠছিল অণু পরমাণু— তবুও তাকিয়েছিলাম ভয়াবহ সেই করোটি-হাস্য আর একবার দেখে এবং দেখিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্যে। তাকিয়েই ছিলাম ফ্যালফ্যাল করে। সত্যিই তো। গেল কোথায় মড়াটা?

টের পেলাম, পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন বড়বাবু। মনে মনে নিশ্চয় ভাবছেন, এলএসডি বা ওই জাতীয় মাদকবটিকা খেয়ে যা দেখা যায় না, তাই কল্পনা করে নিয়েছি। উন্মাদের মতো দৌড়েছি ওই কারণেই। আমার নিজেরও সন্দেহ হল, সত্যিই দেখেছি তো সেই বিকট দাঁতের শোভা, মাংস খুবলে-নেওয়া করোটি আর বাহু? মনগড়া কল্পনা-আতঙ্কে সত্যিই কি দিশেহারা হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম!

কিন্তু না। কিন্তু না। কিন্তু না। তেত্রিশ কোটি দেবতার শপথ নিয়ে বলেছিলাম বড়বাবুকে, আমি দেখেছি। আমি দেখেছি। কদাকার সেই শবদেহ একটু আগেই নিজের চোখে দেখে গিয়েছি এই জানলার সামনে দাঁড়িয়েই।

বড়বাবুর হুকুমে বালি আর জল ছিটিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখনও জ্বলন্ত কড়িবরগা। তারপর দলবেঁধে সবাই ঢুকেছিলেন ভেতরে। আমাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। বুঝেছিলাম কেন চোখে চোখে রাখতে চেয়েছিলেন। সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। নিশ্চয় সত্যকে ঢাকতে চেয়েছি মিথ্যে পাগলামির ভান করে। আগুন এবং নরহত্যার পেছনে হয়তো আমারও হাত আছে।

রক্তের দাগ দেখা গিয়েছিল রান্নাঘরের সামনে। ভেজা কার্পেটের ওপর সুস্পষ্ট রয়েছে মানুষের আকৃতি। দেহটা যেন পড়ে ছিল সেখানে কিছুক্ষণ আগেও।

সন্দিগ্ধ চোখে বড়বাবু তাকিয়েছিলেন আমার পানে।

ওঁর মনের ভাবনাটা আঁচ করে নিয়ে বলেছিলাম তারস্বরে, 'বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন, ডেডবডি আমি সরাইনি। জানলা থেকে দেখেই পালিয়েছিলাম।'

বড়বাবু নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন আমার পানে।

'কী সর্বনাশ! খুনের চার্জে পড়ব দেখছি!' আকুল কণ্ঠে বলেছিলাম, 'প্লিজ। প্লিজ। ভেতরটা খুঁজে দেখা যাক।'

অবশেষে পাওয়া গিয়েছিল মৃতদেহ। যেভাবেই হোক, বাড়ির মধ্যে থেকে ডেডবডিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উঠোনের ওপর দিয়ে শুঁটকি মাছের গুদোমের আড়ালে।

খুনোখুনি রক্তারক্তি দেখে যারা অভ্যস্ত, সেই পুলিশের লোকেরাও আঁতকে উঠেছিল বীভৎস মৃতদেহটা দেখে।

স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, বুনো জন্তুরা যেন খুবলে খুবলে মাংস খেয়ে গেছে মি. জনসনের দেহ থেকে। সবটা এখনও খেতে পারেনি— সেই কারণেই তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে না মৃতদেহটাকে। কামড়ে কামড়ে গর্ত করা হয়েছে পেটে, বেশির ভাগ নাড়িভুঁড়ি আর মাংসই নিশ্চিহ্ন! সামান্যই মাংস লেগে হাড়ের গায়ে আর মাথার খুলিতে। খুলিটা তখনও লেগে রয়েছে ধড়ের সঙ্গে লিগামেন্ট, মানে, অস্থিবন্ধনীর বাঁধনে।

বড়বাবু বললেন, 'নিশ্চয় শেয়ালে খেয়ে গেছে।'

মুখে বললেন বটে, কিন্তু বেশ বুঝলাম, ওটা মুখের কথা। মনের ধোঁকা যায়নি। শেয়ালে কি ওইভাবে পেটে খোঁদল করে ভেতর থেকে অন্ত্র খেয়ে যেতে পারে! হাড়ের গা থেকে কুরে কুরে মাংস খেয়ে যেতে পারে!

অতিকায় ইঁদুরদের সম্পর্কে মি. জনসন উদ্ভট যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, সেসব বেমালুম চেপে গেলাম বড়বাবুর কাছে। শুধু বললাম, আধপোড়া বাড়িটা আর একবার ভাল করে দেখা যাক। আমার মতলব ছিল, ফ্রিজটাকে খুঁজে বার করা। মি. জনসন তো তার মধ্যেই রেখে দিয়েছেন তিন-তিনটে মরা দানব-ইঁদুর।

পেয়েছিলাম ফ্রিজটা। চেন দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল অ্যাসবেসটস চালের তলায়। চেনের ওপর ধারালো দাঁতের দাগ। অত্যন্ত মজবুত বলেই দাঁত বসিয়েও শেকল কাটা যায়নি।

বড়বাবুকে বলেছিলাম ফ্রিজ ভেঙে ফেলতে। কথা শুনেছিলেন উনি।

আধঘণ্টা সময় লেগেছিল করাত দিয়ে শক্ত মেটাল কাটতে। কড়িবরগা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খুলেছিলাম ফ্রিজের পাল্লা।

তিন শয়তানকে দেখেছিলাম ভেতরে।

পেল্লায় আকার আর আয়তনের তিন-তিনটে অবিশ্বাস্য ইঁদুর।

এগারো
অপার্থিব ইঁদুর

গা পাক দিয়ে উঠেছিল প্রত্যেকেরই। আত্যন্তিক ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে তবুও বিস্ফারিত চোখে দেখে গিয়েছিলাম তিন বিস্ময়কে।

মনস্থির করে ফেলেছিলাম তৎক্ষণাৎ। পরিকল্পনাটা ব্যক্ত করেছিলাম বড়বাবুর কাছে। ডায়মন্ডহারবার রোডে একটা সায়েন্স কলেজের বায়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার অনেকদিনের। ইঁদুর তিনটেকে নিয়ে যেতে চাই সেখানে। আরও তলিয়ে দেখতে চাই এদের অস্বাভাবিকতা। চেরাচেরি করতে হতে পারে, সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে এদের নিয়ে যাওয়া দরকার সেই কারণেই।

আপত্তি করেননি বড়বাবু। বরং আগ্রহই দেখিয়েছিলেন। থানার গাড়ি দিয়েছিলেন। সটান গিয়েছিলাম সায়েন্স কলেজে।

কলেজটার নাম কোনওদিনই বলব না, বায়োলজি প্রফেসরের নামও বলব না কথা দিয়েছিলেন। রাজি না হলেই ভাল করতেন। মর্মান্তিক পরিণতিটা থেকে রেহাই পেতেন।

মহাকায় ইঁদুর তিনটেকে দেখে বিপুল বিস্ময়ে যেন দম আটকে এসেছিল বায়োলজি প্রফেসরের। তৎক্ষণাৎ একটার ল্যাজ ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে গেছিলেন ল্যাবরেটরিতে। এগজামিন করার জন্যে। চেরাচেরির সময়ে আমি হাজির থাকতে চেয়েছিলাম। উনি রাজি হয়েছিলেন একটি শর্তে, কাজের সময়ে মুখে চাবি দিয়ে থাকব।

কয়েক ঘণ্টা লেগেছিল ইঁদুরটাকে কেটেকুটে ভেতরকার দেহযন্ত্রগুলোকে বাইরে আনতে। প্রথমেই স্কেল দিয়ে নিখুঁতভাবে মেপেছিলেন অপার্থিব বিস্ময়ের দৈর্ঘ্য। তারপর ওজন করেছিলেন ব্যালেন্সে চাপিয়ে।

বিড়বিড় করে যা বলেছিলেন, তা শুনে বাস্তবিকই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

অনেক বিরাটকায় মেঠো ইঁদুর উনি ছেলেবেলায় দেখেছেন গ্রামে থাকার সময়ে। দেখেছেন ধানের গোলাতেও। কিন্তু তাদের যে কোনওটির চাইতে কম করে বিশগুণ বড় সাইজ এই ইঁদুরের।

বিশ গুণ! থ হয়ে গিয়েছিলাম।

মরা ইঁদুরের মজবুত পা আর বিশাল মাথাটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বায়োলজির প্রফেসর। পলকা পা নয়, বেশ বলিষ্ঠ, পেশিবহুল। মাথার সাইজও অস্বাভাবিক বিরাট। এ ধরনের একটা প্রাণী যে এই পৃথিবীতে আছে, আজ পর্যন্ত নাকি তিনি জানতেন না। পশুদের বিশ্বকোষ তাঁর মুখস্থ বললেই চলে। কিন্তু কোথাও তো লেখা নেই এরকম গাট্টাগোট্টা পা আর বিশাল মাথাওলা ইঁদুরের কথা।

উল্লসিতও হয়েছিলেন বিলক্ষণ। মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্টিফিক জার্নালগুলোয় বেরোচ্ছে তাঁর আবিষ্কার, তাঁর নাম। পুরস্কার নাচছে কপালে।

বেচারা! নিয়তি তখন নিষ্ঠুর হাসি হেসেছিলেন আড়ালে।

আমি কোনও কথাই বলতে পারিনি। মনের আতঙ্ককে মুখেও প্রকাশ করতে পারিনি! একদৃষ্টে শুধু চেয়েছিলাম... চেয়েছিলাম... চেয়েছিলাম...

খুলি কেটে মগজটাকে বার করেছিলেন প্রফেসর বন্ধু।

তাকিয়েছিলেন নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, খাবি খাচ্ছিলেন বলাও চলে। জীবনে কাউকে এমনভাবে বিস্ময়ে দম আটকে আসা অবস্থায় দেখিনি।

বিরাট মগজ। সত্যিই বিরাট। মানুষের মগজের ওজন প্রায় দেড় কেজি। এই দেড় কেজি মগজ নিয়েই দু' পেয়ে মানুষ দূর নক্ষত্র অভিযানে বেরিয়েছে পৃথিবী গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী হয়ে বসার পর।

অজ্ঞাত প্রজাতির এই ইঁদুরের ব্রেনটার ওজনও প্রায় দেড় কেজি। মানুষের মগজের সমান! সেইরকমই কুণ্ডুলিপাকানো ঘিলু— যা কিনা অতি উচ্চস্তরের ধীশক্তির লক্ষণ।

ভোক্যাল কর্ড— মানে, মানুষের গলার যে অংশ থেকে স্বর বেরোয়, সেটা নেই মানুষ-মগজবিশিষ্ট এই ইঁদুরের দেহে, কিন্তু মগজের যে অংশ দিয়ে মনের ভাব আদানপ্রদান করা হয়, সেই অংশটা রীতিমতো বড়! বিলক্ষণ বিবর্ধিত। অতিশয় উন্নত।

হাত কেঁপে গিয়েছিল প্রফেসর বন্ধুর। হারিয়ে ফেলেছিলেন কথা বলার শক্তি। দেখেছিলাম, চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। বিষম উত্তেজনায় থিরথির করে কাঁপছে চোখের পাতা, গালের চামড়া। কাঁপা হাতেই ছুরি চালিয়ে দেখিয়েছিলেন আমাকে ব্রেনের মধ্যে গন্ধ শোঁকার জায়গাটাতেও রীতিমতো প্রগতির চিহ্ন রয়েছে।

বিস্ময় আর রোধ করে থাকতে পারেননি। ফেটে পড়ছিলেন বিকৃত কণ্ঠে, 'সৌরভবাবু! সৌরভবাবু! মারভেলাস! মারভেলাস!'

'মারভেলাস বলছেন? এই জঘন্য জীবটাকে?'

'মারভেলাস বলব না? দেখেছেন কখনও ইঁদুরের খুলির মধ্যে এরকম হাইলি ডেভালাপড ব্রেন? মারভেলাস! সৌরভবাবু, মারভেলাস!'

রাত হয়ে গিয়েছিল। দুপুর থেকে পেটে দানাপানি পড়েনি। সিঙাড়া আর জিলিপি হজম হয়ে গেছে কোনকালে। স্তম্ভিত প্রফেসর বন্ধুর উল্লসিত 'মারভেলাস' বিস্ময়োক্তি শুনতে শুনতে খেয়াল হল খিদে পেয়েছে বিলক্ষণ। পেট চুঁই চুঁই করছে বলেই বোধহয় এত কাহিল লাগছে।

খেতে বসেছিলাম অন্য ঘরে। ওঁরই টিফিনের বাক্স খুলে ভাগাভাগি করে খেয়েছিলাম ঠাণ্ডা রুটি মাখন আর ফ্লাক্সের গরম কফি। খেতে খেতেই চেপে ধরেছিলাম প্রফেসরকে। খুলে বলতে হবে কী কী তিনি পেয়েছেন চেরাচেরি করে।

উনি বলেছিলেন, 'সৌরভবাবু, কাটাছেঁড়া করলাম বটে, কিন্তু এইটুকু দেখেই কমেন্ট করার মতো কমপিটেন্ট আমি নই।'

'বিনয় রাখুন। যা দেখলেন, সেইটুকু থেকেই বলুন আপনার ধারণা।'

'ধারণা!' চোখ তুলে চেয়েছিলেন বন্ধুবর।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বায়োলজির প্রফেসর আপনি। আপনার ধারণাটাই আমার রিপোর্টের পক্ষে যথেষ্ট।'

'আরও খুঁটিয়ে না দেখে এত অল্প ফ্যাক্টের ভিত্তিতে তা বলা কি সমীচীন? আপনার কলমে আমার নামধামও তো ফাঁস করে দেবেন।'

'করব না কথা দিচ্ছি।'

'তা হলে শুনুন। এককথায় এই ইঁদুর বুদ্ধিমত্তায় মানুষের কাছাকাছি।'

'মানুষের মতোই ইনটেলিজেন্ট, এই তো বলতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'আরও কিছু বলুন।'

'আরও শুনতে চান? কিন্তু সেটা তো আন্দাজি কথা হয়ে যাবে।'

'হোক, বলুন আপনি।'

'ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রেকনেক স্পিড— যে গতিবেগে দৌড়লে ঘাড় পর্যন্ত ভেঙে যায়, আপনার এই ইঁদুরের মনের উন্নতি ঘটেছে সেই অবিশ্বাস্য গতিবেগে।'

'ইঁদুরটা আমার নয়। মনের উন্নতি বলতে কী বোঝাচ্ছেন?'

'মনের সাইজের অনুপাতে এর দেহের শক্তি তো ভীষণভাবে কম। যত বড়ই হোক না কেন, সাইজে মানুষের মতো বড় তো নয়, মানুষের মতো শক্তিমানও নয়। কিন্তু ব্রেনের ক্ষমতায় তো দেখছি মানুষের সমান সমান। যার ব্রেন এত বড় দেহের অনুপাতে, তার মনের ক্ষমতাও নিশ্চয় অনেক বেশি, হয়তো মানুষের চাইতেও বেশি, দেহের সঙ্গে ব্রেনের অনুপাতটা যদি হিসেবের মধ্যে ধরেন।'

'বলেন কী!'

'ইঁদুরের ব্রেনের ক্ষেত্রে এই ধরনের আমূল পরিবর্তন ঘটতে কত বছর লাগতে পারে আন্দাজ করতে পারেন?— কয়েক শ...না, না, কয়েক হাজার বছর তো বটেই।'

'ক-য়ে-ক হাজার বছর!'

'র‍্যাডিক্যাল মিউটেশন, সৌরভবাবু, আমূল পরিবর্তন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না!'

'কি-কিন্তু কয়েক হাজার বছর ধরে পরিবর্তনটা ঘটতে থাকলে বায়োলজিস্টদের চোখে এতদিন তা ধরা পড়েনি কেন?'

'এই যে প্রশ্নটা এতক্ষণে আমাকে করলেন, এই প্রশ্নই আমাকে পাগল করে ছাড়ছে খুলি খোলার পর থেকেই। ক্রমবিবর্তনের কেস এটা নয়—'

'তবে কীসের কেস?'

আমতা আমতা করে বললেন প্রফেসর বন্ধু, 'হয়তো কোনওভাবে হেল্‌প এসেছে, তাই... তাই...'

'হেল্‌প! কাদের সাহায্য? কোত্থেকে?'

জবাব দিতে পারেননি প্রফেসরবন্ধু। ফিরে এসেছিলাম কাটাছেঁড়ার ঘরে। শেষ পর্বে হাত লাগিয়েছিলেন বন্ধুবর।

শীত-শীত করছিল। হু-হু করে কনকনে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। প্রফেসর তন্ময় কাটাছেঁড়া নিয়ে। চোখ তুলে আমি দেখেছিলাম, ঘরের একটা জানলা কে খুলে রেখে গেছে। বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলাম তখুনি।

ঘাড় হেঁট করে ছুরি চালাতে চালাতে হঠাৎ 'এ কী!' বলে যেন খাবি খেয়েছিলেন প্রফেসরবন্ধু।

'কী হল?' চমকে উঠেছিলাম আমি।

'এই যে... এই মাস্ক প্রোডিউসিং অরগ্যানটা দেখছেন?'

'কী প্রোডিউসিং?'

'কড়া গন্ধী-উপাদান উৎপাদনের দেহযন্ত্র।'

'হ্যাঁ, কী হয়েছে?'

'বিরাট ফুলে ফেঁপে রয়েছে... অত্যন্ত সূক্ষ্ম জটিল ডিজাইন।'

'তাতে ইঁদুরের সুবিধা কী?'

'সুবিধে? সুবিধে বলছেন? আরে ভাই, এই একটামাত্র সূক্ষ্ম জটিল দেহযন্ত্রের দৌলতে কতখানি ক্ষমতার অধিকারী আপনার এই ইঁদুর—'

'আমার ইঁদুর নয়, ক্ষমতাগুলো কী বলুন।'

'অসংখ্য রকমের গন্ধ উৎপাদন করার ক্ষমতা। এত ফেরোমোন ইঁদুরের কী কাজে লাগবে ভেবে পাচ্ছি না।'

'ফেরোমোন?'

'হ্যাঁ, মানেটা জানেন না বুঝি?'

'এই প্রথম শুনলাম।'

'খুবই স্বাভাবিক। বায়োলজির স্টুডেন্ট তো নন আপনি, ফেরোমোন হল সেইসব রাসায়নিক পদার্থ যা কোনও দেহযন্ত্র থেকে ক্ষরিত হয়ে একই প্রজাতির অন্য দেহযন্ত্রে সাড়া জাগায়।'

'যেমন একটা উদাহরণ দিন।'

'যেমন যেমন... ধরুন কোনও প্রাণীর বিয়ে করার শখ হল। সে তখন ঠিক সেই ধরনের ফেরোমোনের ক্ষরণ ঘটিয়ে এমন বিশেষ গন্ধ ছড়াবে যে সেই গন্ধে পাগল হয়ে ভাবী বউ কি ভাবী বর চলে আসবে কাছে!'

'ভারী মজার ব্যাপার তো।'

'ইঁদুরের ক্ষেত্রে এক-একটা ফেরোমোন এক-এক ধরনের কাজ করে। কখনও দলবলকে বিশেষ গন্ধ শুঁকিয়ে হুঁশিয়ার করে, কখনও... কখনও... মানে, নানা প্রাকৃতিক ব্যাপারে পরম সহায় এই ফেরোমোন। সৌরভবাবু, জীবনে এত বড় সেন্ট গ্ল্যান্ড আমি দেখিনি— ও কী! কীসের শব্দ?'

শব্দটা আমিও শুনেছিলাম।

খড়মড় খড়মড় খচমচ খচমচ আওয়াজ। আসছে পাশের ঘর থেকে! যে ঘরে একটু আগেই বসে রুটি মাখন আর কফি খেয়েছি। প্রফেসরবন্ধুর প্রাইভেট অফিস।

কান খাড়া করে শুনেই উঠে দাঁড়ালেন বন্ধু, 'ল্যাবরেটরির ইঁদুর বেরিয়ে পড়েছে নিশ্চয় খাঁচা থেকে, যাই, দেখে আসি।'

আর একটু হলেই খুলে ফেলছিলেন দরজা। লাফিয়ে গিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম কপাটে।

'যাবেন না!'

'কেন?'

'বলতে পারব না—কিন্তু, কিন্তু দরজা খুলবেন না!' সত্যিই কেন যে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম, সেই মুহূর্তে তা বুঝতে পারিনি। যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছিলাম, বহির্বিশ্বের পুঞ্জীভূত দুঃস্বপ্ন ওত পেতে রয়েছে দরজার ওপারে।

'কী মুশকিল! ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন যে! সরুন—'

'না, না! প্লিজ। টেলিফোন করুন থানায়, এখুনি আসতে বলুন পুলিশকে।'

আমার বিবর্ণ মুখ আর বিকৃত স্বর শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন প্রফেসরবন্ধু।

বললেন, 'আচ্ছা ভিতু তো!'

'যা বলছি, তাই করুন, প্লিজ... প্লিজ।'

নাচার ভঙ্গিমায় রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করেছিলেন প্রফেসর। সেই ফাঁকে আমি অতিকায় ইঁদুরটাকে কাগজে মুড়ে পুরে নিয়েছিলাম আমার ফাইবার কেসে। খটাখট করে লক বন্ধ করতে-করতেই শুনলাম রিসিভার নামিয়ে রাখছেন বন্ধু।

'কী হল?'

'হঠাৎ ডেড হয়ে গেছে লাইন। আপনি আসার আগেও চালু ছিল। এই আছে, এই নেই, টেলিফোন যন্ত্র, ফেলো টাকা চালু হবে, সেই হল যন্ত্র! বলিহারি যাই ক্যালকাটা টেলিফোনকে।'

প্রফেসরের মজার ছড়া শুনে হাসি পাওয়া দূরের কথা, ভয়ের চোটে শুরু হয়ে গিয়েছিল হাঁটু-কাঁপুনি।

ফিসফিস করে বলেছিলাম, 'কোটটা গায়ে দিন, এখুনি পালাতে হবে এ বাড়ি থেকে।'

'কেন বলুন তো?' হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল প্রফেসরের চোখ-মুখ থেকেও।

'পরে বলব, অ্যাপ্রন খুলুন, কোট গায়ে দিন। ঠিক আছে, আসুন আমার পেছন পেছন।'

আস্তে আস্তে, অতি-সন্তর্পণে ফাঁক করেছিলাম দরজা, উঁকি দিয়ে দেখছিলাম হলঘরের ভেতরটা। ধড়াস করে উঠেছিল বুক। ডিগবাজি খেয়ে হৃৎপিণ্ডটা যেন এসে ঠেকেছিল গলার কাছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে হাজার হাজার ইঁদুর।

সবার আগে রয়েছে আর একটা দানব-ইঁদুর।

বারো
ফেরোমোনের মহিমা

হাঁটু কাঁপছিল আগে থেকেই। এখন কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ। টেলিফোনের তার কেটে লাইন ডেড করে দিয়েছে যারা, যারা প্রফেসরবন্ধুর প্রাইভেট অফিসঘরে জড়ো হয়েছে কাতারে কাতারে, তাদেরই আর একটা দল উঠে আসছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ সিঁড়ি বেয়ে।

জনসন সাহেবও চিঠিতে লিখেছিলেন, টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছিল নারকীয় এই শয়তানরা। তারপর নরক গুলজার করে তুলেছিল তাঁর নশ্বর দেহখানা নিয়ে।

সেই একই পরিণতি এখন ঘটতে চলেছে আমাদের ক্ষেত্রেও।

নরকের দূত বললেও অত্যুক্তি হয় না পুরোধা ইঁদুরটিকে। ইঁদুরদের মধ্যে দৈত্য বলা যায় তাকে। প্রথমেই সে দেখেছিল আমাকে। অনিমেষ চাহনি মেলে চেয়ে ছিল আমার চোখের দিকে।

বিদ্যুৎগর্ভ সেই চাহনির বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। জনসনসাহেব জার্নালিস্ট নন— কলমের জোর নেই বলেই শুধু লিখেছেন অতিকায় আটটা ইঁদুর একদৃষ্টে চেয়ে ছিল তাঁর পানে। আমি সাংবাদিক, ভাষা বেচে খাই। কিন্তু আমার কলমেও ভাষার জোগান আসছে না অপার্থিব সেই চাহনির বর্ণনা দিতে গিয়ে। গোল গোল বিচিত্র বর্ণের দুটো চোখের মধ্যে হিমশীতল তড়িতের স্ফুরণ ঘটে চলেছিল বিরামবিহীনভাবে, সে তড়িতে জ্বালা নেই, শুধু মুগ্ধকর আবেশ আছে, সম্মোহনী আকর্ষণ আছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটের অদৃশ্য শক্তি, আরও যে কী কী আছে, তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না কোনওদিনই। অবয়বের কোটি কোটি অণুপরমাণুতে মস্তিষ্কের কোষে কোষে মারণ-অনুকম্পন জাগ্রত হতেই সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম, কী বিপুল অজ্ঞাত শক্তিধারা অদৃশ্য রশ্মি আকারে আচ্ছন্ন করে আনছে আমার চৈতন্যকে।

মুহ্যমানের মতো আবিল দৃষ্টি মেলে ধরে দেখেছিলাম, পেছনের দু'পা তুলে একটা হলদেটে বস্তু শূন্যে স্প্রে করে দিলে ভীমদর্শন ইঁদুরটা।

তৎক্ষণাৎ স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে গেল হাজার হাজার ইঁদুরের পুরো বাহিনীটা।

সেনাধ্যক্ষের কড়া হুকুমে যেন নিমেষের মধ্যে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সৈন্যবাহিনী।

কিন্তু কোনও শব্দ শোনা গেল না, ক্ষীণতম শব্দও নয়, বাতাসে ভাসতে লাগল শুধু অদ্ভুত উগ্রগন্ধী হলুদ বাষ্প—

পেছনের দু' পা নামিয়ে অতিশয় মন্থর গতিতে একটু একটু করে আমার দিকে এগিয়ে এল মূর্তিমান সেই শয়তান, দুই চোখে অনির্বাণ তুহিনশীতল নরকাগ্নি—

রাজা ইঁদুর— কিং র‍্যাট-রাজার মতোই তার অগ্রসর হওয়ার ভঙ্গিমা!

প্রবল চেষ্টা করেও ভয়ানক দুই চোখের ওপর থেকে আমার চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না। অনুভব করলাম হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি যেন স্তব্ধ হয়ে আসছে, মগজের ক্রিয়া যেন

তিরোহিত হচ্ছে, গা টলছে, মাথা ঘুরছে, পুঞ্জীভূত তমিস্রা শনৈঃ শনৈঃ যেন চেপে বসছে অক্ষিপটে! শিথিল হয়ে এল সর্বাঙ্গ, হাত-পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর আমার বশে নেই।

প্রফেসরবন্ধু পেছনে দাঁড়িয়ে দেখেছিল আমি টলছি। ধড়াস করে আছড়ে পড়তে পারি যে কোনও মুহূর্তে। হাত থেকে দড়াম করে মেঝেতে খসে পড়ল ভারী ফাইবার-কেসটা— যে কেসের মধ্যে রয়েছে কাটাছেঁড়া দানবাকৃতি ইঁদুর-দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বন্ধু। টুঁটিটেপা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ফাইবার-কেসটা পড়ে যাওয়ার আওয়াজ বজ্রনির্ঘোষের মতোই সংবিৎ ফিরিয়ে এনেছিল আমার, কেটে গিয়েছিল মোহাবেশ, বন্ধুবর পেছন থেকে সবলে জাপটে ধরায় ধাতস্থ হয়েছিলাম মুহূর্তের মধ্যে।

দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছিলাম ল্যাবরেটরির দরজা।

ফাঁদেও পড়লাম তখন থেকে।

বিহ্বলভাবে চেয়ে ছিলাম বন্ধুর দিকে। তাঁর মুখাবয়বেও প্রকটিত হয়েছে সীমাহীন আতঙ্ক। যে আতঙ্ক বকখালি থেকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে আমাকে অনেক বেশি জেনে ফেলার পরিণামস্বরূপ, সেই মহা-আতঙ্ক এখন সংক্রামিত হয়েছে তাঁর মধ্যেও। তিনিও যে জেনে ফেলেছেন অনেক কিছু, দেখেছেন অনেক কিছু, আর এইমাত্র দেখলেন আগুয়ান বিভীষিকাকে।

ফলে, দু'জনেই প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলাম বললেই চলে। হিস্টিরিয়ায় পেয়ে বসল যেন দু'জনকেই। ক্ষিপ্তের মতো ল্যাবরেটরি তছনছ করে আমি খুঁজতে লাগলাম ইঁদুর নিধনের হাতিয়ার, বন্ধুবর পাগলের মতো অনর্গল বকে গেলেন কানের কাছে।

অর্থহীন প্রলাপ কিন্তু নয়। ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দুটি দরজার ওপারেই যারা জড়ো হয়েছে কাতারে কাতারে, তাদের নিয়েই রাশি রাশি নিজস্ব চিন্তাধারা উগড়ে দিয়ে গেলেন আমার পেছনে আঠার মতো লেগে থেকে।

'দেখলেন তো? কী বলেছিলাম? ফেরোমোন, ফেরোমোন, ফেরোমোনের ম্যাজিকটা দেখলেন কীরকম? অস্বাভাবিক ফেরোমোন স্প্রে করে কীভাবে পালের গোদাটা খুদে ইঁদুরগুলোকে হুকুম দিয়ে থামিয়ে দিল দেখলেন! একেই বলে বোবা আদেশ, সাইলেন্ট অর্ডার, গন্ধ দিয়ে হুকুম— মুখের কথার দরকার কী? শুধু গন্ধ— গন্ধ— গন্ধ— গন্ধের ম্যাজিক দিয়ে খুদেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করেছে, পেছন পেছন নিয়ে আসছে, আবার হল্ট করিয়েও দিচ্ছে। মার্ভেলাস! মার্ভেলাস! একেই বলে ফেরোমোনের ফাইন ম্যাজিক! আহারে, মানুষ যদি পারত এমনি ফেরোমোন উৎপাদন করতে—'

'আপনি থামবেন?' আমার তখন মাথার মধ্যে কুকুর-পাগল অবস্থা। সব আছে ল্যাবরেটরিতে, নেই কেবল অস্ত্র, এ সময়ে কানের কাছে জ্ঞানের কপচানি ভাল লাগে?

'কেন থামব? কীসের জন্যে থামব? মার্ভেলাস! মার্ভেলাস! টেলিপ্যাথির জোরটা দেখলেন?'

'টেলিপ্যাথি!' ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, টেলিপ্যাথি। টেলিফোন নয়, টেলিভিশন নয়, টেলিগ্রাফ নয়, স্রেফ টেলিপ্যাথি।

কোথায় লাগে আপনার টেলিগ্রাম, টেলিকাস্ট, টেলিফোটো, টেলিপ্রিন্টার, টেলিস্কোপ— সব টেলির রাজা এই টেলিপ্যাথি— সবচেয়ে সেরা দূরভাষ পদ্ধতি, শব্দের বা সংকেতের ব্যবহার না করে ভাবধারার যোগাযোগ।'

'টে-টে-টে—' মুখে কথা আটকে গিয়েছিল আমার।

'টেলিপ্যাথি... টেলিপ্যাথি... টেলিপ্যাথি! ব্রেনের ভেতরটা দেখেই বুঝেছিলাম মনের ক্ষমতায় মানুষকেও ছাড়িয়ে গেছে... অতিমানবিক ক্ষমতা পেয়েছে... মন দিয়ে অন্যের মনকে কন্ট্রোল করতে শিখেছে! নিজেকে দিয়ে বুঝছেন না? আমি টেনে না আনলে—'

'টেলিপ্যাথি!' আমি তখনও বিমূঢ়।

'এখন বুঝছেন কেন এতদিন মানুষ ওদের অস্তিত্ব টের পায়নি?'

'কেন?'

'টেলিপ্যাথি দিয়ে মনকে অসাড় করে রেখেছে মাসের পর মাস— দৈবাৎ যদিও বা কেউ দেখেছে ওদের, টেলিপ্যাথি দিয়ে দেখার ছবিকে মুছে দিয়েছে মন থেকে। মার্ভেলাস! সৌরভবাবু, রিয়্যালি মার্ভেলাস!'

বৈজ্ঞানিক বন্ধুর প্রলাপোচ্ছ্বাস ছাপিয়ে শোনা গেল এবার একটা নতুন শব্দ। হাড় হিম করে দেওয়ার মতো শব্দ।

কুটুর কুটুর করে দরজা কাটছে ইঁদুরেরা!

ঘরে ঢোকার দুটো দরজাতেই একই সঙ্গে দাঁত বসিয়ে চলেছে অসংখ্য ইঁদুর। নিশ্চয় নতুন ফেরোমোন স্প্রে করেছে কিং র‍্যাট— যার মানে, কাটো দরজা!

সময় ফুরিয়ে আসছে... মৃত্যুর দূরায়ত পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি কুটুর কুটুর কুটুর কুটুর... কটকট কটাং কট শব্দধারা বেড়েই চলেছে। হাল আমলের পলকা কাঠের শৌখিন দরজা, কতক্ষণ আর আস্ত থাকবে বিবরবাসী আতঙ্কদের ক্ষুরের মতো ধারালো দাঁতের আক্রমণে?

ধেয়ে গেছিলাম একটা জানলার সামনে। দড়াম করে দু'-হাট করে খুলে দিয়েছিলাম পাল্লা। তাকিয়েছিলাম নীচের দিকে। ইচ্ছে ছিল জানলা দিয়েই লাফিয়ে পড়ব। কিন্তু রয়েছি তিনতলায়! অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়লে হাড়গোড় কি আর আস্ত থাকবে!

আচমকা কী যেন একটা লাফিয়ে উঠল আমার টুঁটি লক্ষ্য করে, ঝট করে মাথা সরিয়ে নিয়েছিলাম বলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে এসে পড়ল আমার চোয়ালের খাঁজে চামড়ার ওপর।

বেঁচে গেলাম অল্পের জন্যে, নির্ভুল লক্ষ্যেই লাফ দিয়েছিল খুদে আতঙ্ক। মাথা সরিয়ে নিতেই কামড়টা টুঁটি থেকে ইঞ্চি ছয়েক সরে গিয়ে বসে গেল চোয়ালের খাঁজে।

যন্ত্রণায় এবং আতঙ্কে শিউরে উঠে হাতের এক ঝটকায় শূন্যপথে ঠিকরে ঠেলে দিয়েছিলাম একটা নেংটি ইঁদুরকে!

নেংটি ইঁদুর! সামান্য একটা নেংটি ইঁদুর! মানুষের ছায়া দেখলেও যাদের গা-ঢাকা দিতে দেখেছি, সেই নেংটি ইঁদুরের এত সাহস! মানুষের কণ্ঠনালি ছিন্ন করার এই উন্মত্ত প্রচেষ্টার পেছনেও রয়েছে কি ফেরোমোনের কারসাজি! ভয়শূন্য বেপরোয়া করে তুলেছে সামান্য নেংটি ইঁদুরকে! অমোঘ আদেশ মাথায় পেতে নিয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছে আমাকেই প্রাণশূন্য করবে বলে!

ফেরোমোন! ফেরোমোন! এমনই অসামান্য ক্ষমতা এই রাসায়নিক উপাদানের?

ফেরোমোন-বিস্ময় নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকবার মতো সময় আর পাইনি। সজোরে জানলার পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েকটা নেংটি ইঁদুর লাফিয়ে পড়েছিল গোবরাট পেরিয়ে ঘরের মধ্যে। সাধারণ ইঁদুরদের মতো যদি ফার্নিচারের আনাচেকানাচে গিয়ে লুকোত, সন্ধান পেতাম না সেই মুহূর্তে। কিন্তু তারা তা করেনি। সুইসাইড স্কোয়াডের আত্মহননে ব্রতী ইঁদুর কিনা, একযোগে লাফিয়ে পড়েছিল আমার আর বৈজ্ঞানিকবন্ধুর গায়ের ওপর। কাজেই খুদে বিভীষিকাদের যমালয়ে পাঠাতে বেশি সময় লাগেনি আমাদের।

কিন্তু তারপর? শোচনীয় মৃত্যুর ব্যাদিত মুখগহ্বরে যে পা বাড়িয়েই বসে আছি, তাতে আর কোনও সন্দেহ আছে কি?

খুদে দানোদের কিচিরমিচির শব্দে লাফিয়ে পড়া দেখেই এবং ধারালো দাঁতের দু'-চারটে কামড় খেয়েই জ্ঞান বিতরণের ঝোঁক কেটে গিয়েছিল বায়োলজিস্ট বন্ধুর। এতক্ষণ ধরে একা আমিই হন্যে হয়ে খুঁজছিলাম আদিম হাতিয়ার, এবার তিনি খুঁজে বার করলেন একটা বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার।

ইথার!

ইথারের বোতল তাক থেকে টেনে নামিয়ে উপুড় করে ঢেলে দিলেন দুটো দরজার তলায়। উগ্র গন্ধে কিছুক্ষণের মতো সরে গেল বটে ইঁদুরবাহিনী, ফিরে এল একটু পরেই, আরও বেশি সংখ্যায়। কুটুর কুটুর কটকট কটাং কট শব্দ এত বেড়ে গেল যে তা বজ্রনাদের মতোই ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির লহরী তুলে গুমগুমিয়ে তুলল নিস্তব্ধ তিনতলা বাড়িখানাকে।

সবক'টা জানলাতেও এরপর জাগ্রত হল একই কুটুর কুটুর কটকট কটাৎ কট শব্দ। কাঁচের সার্সির মধ্যে দিয়ে দেখলাম কার্নিশ ভরে গেছে ইঁদুরে। থিকথিক করছে গোবরাটে। বিষম আক্রোশে গায়ে গা দিয়ে, ঘাড়ের ওপর চড়ে, গাদাগাদি করে দাঁত বসাচ্ছে কাঠের ফ্রেমে। সে কী হুড়োহুড়ি! কে আগে পাল্লা ফুটো করবে, তার রেষারেষি চলছে যেন পুরোদমে!

সাবাস ফেরোমোন! আর কত মহিমা দেখব তোমার!

ঠিক এই সময়ে ভাবান্তরটা লক্ষ করলাম বৈজ্ঞানিকবন্ধুর চোখে-মুখে-আচরণে।

পাগলামি, ছটফটানি, আতঙ্ক উধাও হয়েছে অকস্মাৎ। নিবিড় প্রশান্তিতে সমাচ্ছন্ন মুখাবয়ব। যেন ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি!

তেরো
টাইটান থেকে পৃথিবীতে

প্রকৃতই কি উন্মাদ হয়ে গেলেন বায়োলজিস্ট বন্ধু? ছিলেন ক্ষিপ্ত হলেন শান্ত কি সেই কারণেই? বদ্ধ উন্মাদদের ক্ষেত্রেই এরকমটা ঘটে শুনেছি। মর্জি পালটায় মুহুর্মুহু, ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভূত হয় নতুন নতুন খেয়ালখুশি।

কুটুর কুটুর কটকট কটাং কট বজ্রনাদ কালান্তক ডম্বরুধ্বনির মতোই ঝালাপালা করে তুলছে কানের পরদাকে। চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে একই রক্তজল করা শব্দস্রোত।

এরই মাঝে আচম্বিতে নিমীলিতচক্ষু হয়ে গেলেন কেন বন্ধুবর? ব্যাপারটা কী? নির্নিমেষে চেয়েছিলাম ধীর স্থির নিরুদ্বেগ মুখচ্ছবির দিকে।

সহসা নড়ে উঠল তাঁর দুই ঠোঁট। মৃদু, অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হল এই কটি কথা, 'টিকে থাকতেই হবে আমাদের... যেভাবেই হোক... থাকব, আমরা থাকব। যারা জেনে ফেলেছে আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের ক্ষমতা, প্রাণে খতম করে দাও তাদের! দাঁত বসিয়ে বসিয়ে কাটো কুচি কুচি করে! কাটো! মারো! খতম করো!'

ধ্যানমগ্ন নিষ্কম্প মূর্তির কণ্ঠদেশে জাগ্রত হল যেন দৈববাণী। প্রেতাবেশ ঘটলে অথবা বিদেহী শুভশক্তির ভর হলে শুনেছি এইভাবে অস্ফুট জড়িত স্বর গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে আসে গলা দিয়ে। সমাহিত বন্ধুবরের বাকযন্ত্রে ধ্বনিত হচ্ছে এ কাদের বাক্য? কারা কথা কইছে তাঁর স্বরযন্ত্রকে কবজায় এনে ফেলে?

সব 'টেলি'র রাজা টেলিপ্যাথির দূরনিয়ন্ত্রণ ঘটছে কি চোখের সামনে?

কী করব ভেবে পেলাম না, নিথর দেহে দাঁড়িয়ে রইলাম কাঠের পুতুলের মতো।

টেলিপ্যাথি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ যে টেলিপ্যাথির অবিশ্বাস্য শক্তি! প্রত্যক্ষ না করলে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না... কিছুতেই না... কিছুতেই না! স্বকর্ণে না শুনলে গালগল্প বলেই উড়িয়ে দিতাম অবশ্যই... কিন্তু এইমাত্র যে কথাগুলো... যে সংকল্প অমোঘ আদেশের স্বরে ধ্বনিত হল বন্ধুর গলার মধ্য দিয়ে— এ যে সেই মহাভয়ংকরদেরই মনের কথা— অগুনতি সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্বুদ্ধ করছে যে মানসিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে— তারই প্রভাব এসে পড়েছে তাদেরই মতো স্তন্যপায়ী আর একটি জীবের মনের ওপর...

মানুষের ওপর! দৈবাদেশের মতো রক্ত উত্তাল করা এই প্রেরণাসঞ্চারী আদেশ যে তাদেরই।

হা ভগবান! একী সংকটে পড়লাম আমি! একমাত্র সহায় প্রফেসরবন্ধুও এখন ওদের মানসিক খপ্পরে! বাহুবলে, দাঁতের জোরে যা করা যায় না, মানসিক শক্তিতে প্রচণ্ড বলীয়ান শত্রুরা এখন ঠিক তাই করছে, দূর থেকে চালনা করছে জ্ঞানবিজ্ঞান বুদ্ধি যুক্তিতে ক্ষুরধার বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে!

আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে বন্ধুবর। নতমস্তকে পরম অনুগত অনুচরের মতো এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। মতলবটা বুঝলাম চকিতের মধ্যে।

দরজা খুলে দিতে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকবন্ধু। প্রশস্ত করতে চলেছে নিজের এবং আমার নৃশংস মৃত্যুর পথ— ঘাতকদের দূরভাষ হুকুমের অদৃশ্য শক্তিধারায় মস্তিষ্কের ইচ্ছাকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলেই জানে না কী করতে চলেছে!

ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তিরের মতো ছিটকে গেলাম দরজার সামনে। দু'হাতে কাঁধ খামচে ধরে চিৎকার করে উঠলাম বিকৃত স্বরে, 'করছেন কী! দরজা খুললেই তো হাজার হাজার ইঁদুর ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার ওপরেই!'

ক্ষণেকের জন্যে ঘোর কেটে গেল বন্ধুর। ঈষৎ উন্মুক্ত হল বন্ধ চোখের পাতা। ঘোলাটে

চাহনি। শূন্য দৃষ্টি! যেন দেহের খোলসটা তাঁর, ভেতরে অধিষ্ঠান ঘটেছে অন্য সত্তার।

আবার প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিলাম দু' কাঁধ ধরে।

'প্রফেসর! প্রফেসর! প্লিজ! কন্ট্রোল ইয়োরসেল্‌ফ! এ কী করছেন? শুনতে পাচ্ছেন? আমি আমি সৌরভ বলছি।'

'সৌ... সৌরভ... আরে আ-আপনি! এত চেঁচাচ্ছেন কেন?' পুরোপুরি খুলে গেল বন্ধুর দু' চোখের পাতা। স্বচ্ছ হয়ে এল চাহনি।

'চেঁচাচ্ছি কি সাধে? মরবার সাধ হয়েছে নাকি? দরজা খুলতে যাচ্ছেন কেন?'

'দরজা খুলতে যাচ্ছি? আমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি। ইঁদুরদের হুকুম শুনেই তো খুলতে যাচ্ছেন।'

'ইঁদুরদের হুকুম শুনে?'

'টেলিপ্যাথি! টেলিপ্যাথি! আপনার মুখ দিয়েই তো বেরোলো ওদের হুকুম! ছিঃ! ছিঃ! আপনি না মানুষ? ইঁদুরদের হুকুম শুনছেন?'

খুবই হাস্যকর তিরস্কার সন্দেহ নেই, কিন্তু ওষুধ ধরল। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৈজ্ঞানিকবন্ধু। আর আমার ঠিক পেছনেই পিঠ দিয়ে অনুভব করলাম সমস্ত পাল্লা কাঁপছে অগুনতি দাঁতের কামড়ে, প্রবলতর হয়ে উঠেছে কটকট কটাং কট শব্দ।

আস্তে আস্তে আবার ঘোলাটে হয়ে এল প্রফেসরের দু' চোখ।

সর্বনাশ!

আবার দু' কাঁধ ধরে রামঝাঁকুনি দিতে যাচ্ছি, উনি নিরস্ত করলেন আমাকে। বললেন ক্ষীণ স্বরে, 'হুঁশ আছে, ভয় নেই। কিন্তু... কিন্তু... একী! ওদের মনের কথা যে আমার মনে ভেসে আসছে!'

হাত নামিয়ে নিলাম আস্তে আস্তে। নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। চৈতন্যকে ধরে রেখে দিয়েছেন বন্ধু, টেলিপ্যাথির অকস্মাৎ ঝাপটায় প্রথমদিকে সচেতন ছিলেন না বলে বেহুঁশ হয়েছিলেন, এখন চাগিয়ে তুলেছেন নিজের ইচ্ছাশক্তিকে। ইঁদুরদের মস্তিষ্কতরঙ্গ কিন্তু এখনও ধরতে পারছেন নিজের ব্রেন-রিসিভার দিয়ে!

অকস্মাৎ ফেটে পড়লেন বিষম উল্লাসে—'সৌরভবাবু! কী আশ্চর্য! ওরা যা ভাবছে, সমস্তই যে টের পাচ্ছি। ঠিক বইপড়ার মতো ওদের ভাবনার ছবি দেখতে পাচ্ছি। মার্ভেলাস! স্ট্রেঞ্জ!'

দাবড়ানি না দিয়ে পারলাম না। কৌতূহল, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগে এবং টেলিপ্যাথির মারণ-আদেশ থেকে আংশিকভাবেও বন্ধুবরকে উদ্ধার করতে পারার স্বস্তিবোধে আমি নিজেও যে তখন দিশেহারা। 'উচ্ছ্বাস থামান। কী দেখছেন বলুন।'

'বললে কি বিশ্বাস করবেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি অন্তত করবেন, উফো স্পেশ্যালের রিপোর্টার যে আপনি। এতদিন ভাবতাম গাঁজাখুরি— সৌরভবাবু, সৌরভবাবু, সব সত্যি, সব সত্যি— ওরা আছে। ওরা এসেছে। ওরা থাকবে।'

'কারা? কারা? কারা?'

'ওই ওরা দানব ইঁদুররা। এই পৃথিবীর ইঁদুর ওরা নয়, এসেছে অন্য গ্রহ থেকে, দেখতে

পাচ্ছি সেই গ্রহটার চেহারা— আংটির মতো বেল্ট, ও গড— এ যে শনি গ্রহ!'

'শনি গ্রহ!'

'ইয়েস, মাই ফ্রেন্ড, ইয়েস। সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ, সূর্য থেকে দূরত্বে ষষ্ঠ গ্রহ, ওই তো দেখা যাচ্ছে দশটা ন্যাচারাল উপগ্রহ, না, না, কুড়িটা— আরে না, তারও বেশি।' যেন খাবি খেতে খেতে শূন্যগর্ভ দৃষ্টি মেলে পাগলের মতো চেঁচিয়ে চললেন প্রফেসর— 'টাইটান— টাইটান— শনির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ টাইটান, চাঁদের চাইতেও বড়... ব্যাস ৩২০০ মাইল।'

'টাইটান!' রুদ্ধশ্বাসে প্রতিধ্বনি করেছিলাম আমি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাইটান... চিনেছি... টাইটান... তোমাকে চিনেছি! আমেরিকার ভয়েজার মহাকাশযান থেকে পাঠানো তিরিশ হাজার ফটোর মধ্যে তোমার ছবিও আমি দেখেছি। কমলারঙের কুয়াশা... তার ওপরে নীল কুয়াশার স্তর... জমাট মিথেন দিয়ে তৈরি মেঘ... মেঘ থেকে ঝরে পড়ছে মিথেন বৃষ্টি... মিথেন লেক জমে রয়েছে তোমার বুকে... বায়ুমণ্ডলে রয়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন—'

হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলাম— 'প্রাণ সৃষ্টির উপাদান—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির আগেকার অবস্থা... কিন্তু অত ঠান্ডায়... মাইনাস দুশো অষ্টআশি ডিগ্রি ফারেনহাইটে প্রাণ সৃষ্টি কি সম্ভব? সম্ভবই বা নয় কেন? প্রাণ সৃষ্টির সবচেয়ে দরকারি উপাদান তো হাইড্রোজেন সায়ানাইড, যা থেকে আসছে অ্যামিনো অ্যাসিড... লাইফের বিল্ডিং ব্লক, ওই তো রয়েছে টাইটানের বুকে— বুঝেছি, সৌরভবাবু, বুঝেছি প্রাণের অস্তিত্ব, প্রাণের অস্তিত্ব আছে বইকী টাইটানের বুকে, কিন্তু ওপরে নয়... ওপরে নয়—'

'কোথায়? কোথায়?'

'তলায়, মাটির তলায়... সেখানে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম আলাদা হয়ে গিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির দিকে... গ্র্যাভিটেশনাল এনার্জি ছেড়ে দিয়ে গরম রাখছে শনি গ্রহকে—'

'দুর মশায়! তাতে টাইটান গরম থাকবে কেন?'

'থামুন তো! সূর্য থেকে যত এনার্জি শুষে নেয় শনি, ছেড়ে দেয় তার ডবল এনার্জি, টাইটান কি তার ভাগ পাচ্ছে না! টাইটানের নিজের জঠরেও কি মাতৃগ্রহের মতো উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে চলছে না! বেশি কথায় দরকার কি ভাই... আপনার ইঁদুরেরা—'

'আঃ! বলছি না আমার ইঁদুর নয়—'

'ওরা এসেছে ওই টাইটান থেকে।'

চোদ্দো
করাল কেমিক্যাল

'সে তো অনেক দূরে। হতভম্ব হয়ে বলেছিলাম আমি। কল্পবিজ্ঞানের গল্প শুনছি নাকি?'

'দূর তো বটেই। প্রায় চোদ্দোশো সাতাশ মিলিয়ন কিলোমিটার!'

'এলো কী করে?'

'এটা কি একটা প্রশ্ন হল? স্পেসশিপে... স্পেসশিপে... আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে।'

'এ-ক-শো বছর!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না প্রফেসরবন্ধু। নিজের মধ্যেই তলিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দেখে মনে হল যেন স্মৃতির রোমন্থন করছেন।

যে স্মৃতি তার নিজের নয়। দানবিক ইঁদুরদের।

আস্তে আস্তে অর্ধেক নেমে এল চোখের পাতা। গলার আওয়াজটাও গেল পালটে। যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছেন টেনে টেনে, ভারী গলায়—

'নতুন গ্রহ এই পৃথিবী, নতুন জীব, এই মানুষ। শুরু হয়েছিল প্রতিযোগিতা। টক্কর লেগেছিল পদে পদে। প্রায় চোদ্দোশো সাতাশ মিলিয়ন কিলোমিটার পথ উন্নত মহাকাশযানে উড়ে এসে ওরা ভেবেছিল এ গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষকে কবজায় এনে ফেলবে সহজেই... কিন্তু পারল না... পারল না... শুধু মানুষের এই দুটো হাতের জন্যে... হ্যাঁ... হ্যাঁ... এই দুটো হাত... হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের দৌলতে মানুষ শিখেছিল, দুটো হাতকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়। ওদের টাইটানে ক্রমবিবর্তন এই ধারায় এগোয়নি... মানুষের মতো দু'খানা হাতকে ব্যবহার করতে শেখেনি... হেরে যেতে লাগল তাই প্রতিযোগিতায়... কিন্তু হার স্বীকারের পাত্র তারা নয়, নিজেদের জীববিদ্যার, বায়োলজির প্রগতি ঘটিয়ে চলল ফ্যানটাসটিক গতিবেগে, ফ্যানট্যাসটিক... ইয়েস... ইয়েস— ফ্যানট্যাসটিক রেট, সেন্ট গ্ল্যান্ড, গন্ধগ্রন্থিকে ছড়িয়ে দিল পৃথিবীর ইঁদুরদের কন্ট্রোল করার জন্যে। ফেরোমোন উৎপাদনের উন্নতিও অব্যাহত রয়েছে এখনও, আজও চলছে নতুন নতুন ফেরোমোন প্রোডাকশনের প্রচেষ্টা, বিরাট গন্ধগ্রন্থির সাহায্যে, পৃথিবীর অন্য প্রাণীদেরও কন্ট্রোল করার মতলবে। সংখ্যায় আজও ওরা অনেক কম, একশো বছরেও সংখ্যা বাড়িয়ে উঠতে পারেনি, পালে পালে ছেয়ে ফেলতে পারেনি এতবড় গ্রহটাকে, কিন্তু তবুও কম নয় তাদের গোষ্ঠী, ছোট ছোট দল বেঁধে ছড়িয়ে পড়েছে এদেশের দিকে দিকে, ফেরোমোন দিয়ে শীগগিরই কন্ট্রোল করবে ইন্ডিয়ার সমস্ত ইঁদুরকে, ইন্ডিয়ার পর এশিয়া, আস্তে আস্তে হোল ওয়ার্ল্ড— পৃথিবীর সমস্ত ইঁদুর ওঠ-বোস করবে এদের হুকুমে, ফেরোমোনের দাপটে, অন্য প্রাণীরা, এমনকী মানুষরাও নতিস্বীকার করবে ফেরোমোন হাতিয়ারের সামনে, হিরোসিমা নাগাসাকির অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের পর থেকেই এদের তৎপরতা আরও বেড়েছে, দেশে দেশে অ্যাটম বোমার পাহাড় যতই বাড়ছে, এদের উদ্বেগও ততই বাড়ছে, মূর্খ মানুষজাতটা বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করে ফেললে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে... সৌরজগতের গ্রহ-

উপগ্রহরা— কে কোনদিকে ছিটকে যাবে তার ঠিক নেই, মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে, তাই পাওয়ারফুল ফেরোমোন বানিয়ে মানুষের মনকে কন্ট্রোল করে তাদের দিয়েই ধ্বংস করবে অ্যাটম বোমার স্তূপ— অস্ত্রহীন করবে পৃথিবীকে, তারপর, তারপর পৃথিবীর বুক থেকে একেবারেই মুছে দেবে মানুষ জাতটাকে, যদি না তাদের কথামতো চলে মানুষরা— ইঁদুর, শুধু ইঁদুররাই সম্রাট হয়ে বসবে এই গ্রহের।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি শুনছিলাম প্রফেসরবন্ধুর দীর্ঘ স্মৃতিচারণ— ভিনগ্রহী দানবদের আত্মকাহিনি, গোপন ষড়যন্ত্রের বৃত্তান্ত। শুনছিলাম আর হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম যে পাওয়ারফুল ফেরোমোনের উদ্ভাবন ঘটিয়ে মানুষ জাতটাকে পদানত এবং নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প গ্রহণ করেছে পৃথিবীর পরম শত্রু ভয়ালদর্শন এই টাইটান ইঁদুররা— এর মধ্যেই একবার তার শক্তির পরীক্ষা হয়ে গেছে প্রফেসরবন্ধুর ওপরে, আমার ওপরেও, দু'জনেই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম, বৃদ্ধ জনসনও ফেরোমোনের খপ্পরে পড়েও অ্যামোনিয়ার বোতল আছড়ে ফেলে উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে ফেরোমোনের সূক্ষ্ম গন্ধের প্রভাব কাটিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন। কিন্তু ফ্যানট্যাসটিক হারে যারা ফেরোমোন উদ্ভাবন ঘটিয়ে চলেছে পয়লা নম্বর শত্রু মানুষকে খতম করার জন্যে, তাদের মনের শক্তি, ফেরোমোনের শক্তিকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে অজ্ঞ মানুষ!

যেন ঘোরের মধ্যে শুনছিলাম আর এইসব কথা ভাবছিলাম। নিশ্চয় ফেরোমোনের প্রভাব একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে আবার আমাদের দু'জনের ওপরেই। আচম্বিতে তা খেয়াল হতেই মুহ্যমান অবস্থাটা কেটে এসেছিল আমার।

আর ঠিক তখনই কাঠের কুচো ঠিকরে পড়তে দেখেছিলাম ঘরের মধ্যে।

দু'-পাল্লা সব দরজার মাঝেই প্যানেলগুলো চারদিকে চেঁছে পাতলা করে লাগানো থাকে মূল কাঠের ফ্রেমে, এত পাতলা যে লাথি মেরে ভেঙে ফেলা যায়। সুচতুর ইঁদুরবাহিনী ওই পাতলা কাঠেই দাঁত বসাচ্ছে, এখান থেকেই টুকরো কাঠ খসে ভেতরে পড়ছে, ফোকর দেখা দিয়েছে, আরও ফোকর, আরও, আরও—

উন্মাদ হয়ে গেলাম যেন। আর্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'প্রফেসর!'

স্মৃতিচারণের ঘোর কেটে গিয়েছিল প্রফেসরের, আমার আচমকা কানের পরদা ফাটানো চিৎকারে। বিহ্বল চোখে চেয়েছিলেন আমার পানে।

'দাহ্য পদার্থ কিছু আছে? আগুন ধরিয়ে দেবার মতো কেমিক্যাল? কুইক... কুইক!'

আর বলতে হয়নি বন্ধুকে। তিন লাফে গিয়ে র‍্যাক থেকে টেনে নামিয়েছিলেন একটার পর একটা ইনফ্লেমেবল কেমিক্যাল। লিকুইড কেমিক্যাল। দু'জনে মিলে ছিপি খুলে হড়হড় করে ঢেলে দিয়েছিলাম একটা দরজার নীচে। চোখে পড়েছিল একটা বালতি। প্রফেসরও দুটো বড় কাচের বয়েম থেকে উদ্বায়ী দাহ্য তরল ঢেলে দিয়েছিলেন বালতির মধ্যে। আমি একটা খবরের কাগজ পাকিয়ে গ্যাস লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে ঠুসে ধরেছিলাম বালতির মধ্যে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতেই বালতি উপুড় করে দিয়েছিলাম একটা দরজার তলায়।

নিমেষের মধ্যে আগুন ধরে গেছিল কাঠের পাল্লায়। তাড়াতাড়ি আরও ক্যানেস্তারা

ভরতি দাহ্য পদার্থ এনে বালতিতে ঢেলেছিলেন প্রফেসর। আগুন লাগিয়েই বালতি উপুড় করে দিয়েছিলাম আমি অন্য দরজাটার সামনেও।

দুটো দরজাই জ্বলতে লাগল লেলিহান শিখা মেলে। আগুনকে ভয় পায় পৃথিবীর সব ইতর প্রাণীই। পৃথিবীর ইঁদুররা তো পাবেই। হুড়মুড় আওয়াজ শুনেই বুঝেছিলাম আগুনে ঝলসে গিয়ে পালাচ্ছে দরজার সামনে থেকে। টাইটান ইঁদুরদের প্রতি আনুগত্য আর নেই। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটছে যে যেদিকে পারে।

কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

স্বস্তিবোধটা কেটে গেল পরক্ষণেই। বাঁচার তাগিদে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলাম বলেই ঘরের দরজায় আগুন ধরিয়েছিলাম। সেই আগুনে আমরাও যে পুড়ে মরতে পারি, এ সম্ভাবনাটা তখন মাথায় আসেনি। প্রচণ্ড পটপট শব্দে দরজা যখন পুড়ছে, ঘন ধোঁয়ায় ঘর ভরে উঠেছে, তখন বুঝলাম ইঁদুরদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে ধোঁয়ায় দম আটকে মরার পথ প্রশস্ত করেছি নিজেরাই। সব ক'টা জানলা বন্ধ। বদ্ধ ঘরের আগুনের তাত আর দম আটকানো ধোঁয়া অসহ্য হয়ে উঠল একটু পরেই। নাকে রুমাল চেপে ধরেও বুঝলাম রেহাই নেই, ফুসফুস আর অক্সিজেন পাচ্ছে না...

বাঁচার পথ এখন ওই জানলা...

কিন্তু ইঁদুরবাহিনী যে এখন পাহারা দিচ্ছে গোবরাটে...

দিক পাহারা। ইঁদুরের কামড়ে মরার চাইতে বরং আত্মহত্যা ভাল। লাফ দেওয়াই যাক তিনতলা থেকে।

এক ঝটকায় খুলে দিয়েছিলাম একটা জানলা। হুড়হুড় করে অগুনতি ছোট-বড় ইঁদুর লাফিয়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। আমি কিন্তু কাউকে কাছে আসতে দিইনি। খবরের কাগজ পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে নিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম আগুয়ান হিংস্র ইঁদুরদের। জ্বলন্ত কাগজখানা একহাতে ধরে আর একহাতে প্রফেসরবন্ধুকে খামচে ধরেছিলাম, টেনে আনতে চেয়েছিলাম জানলার দিকে।

কিন্তু পারিনি... পারিনি!

ফেরোমোনের করাল খপ্পরে পড়ে একেবারেই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন বন্ধু। রাজা-র‍্যাটরা নিশ্চয় প্রবলতর করে তুলেছিল চৈতন্য-কেড়ে-নেওয়া ফেরোমোন বিচ্ছুরণ...

আসুরিক শক্তি দিয়ে এক ঝটকায় আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে জ্বলন্ত দরজার জ্বলন্ত খিল চেপে ধরেছিলেন বন্ধু। হাত পুড়ছে, কোটের হাতায় আগুন লেগে গেছে, কিন্তু নির্বিকার। খিল খুলে, দরজা দু' হাট করে দিয়ে নির্লিপ্ত মুখে পা বাড়ালেন হলঘরে। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সে ঘরে— ছোট ইঁদুররা জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে কোণে কোণে, কিন্তু একেবারেই নির্ভয় টাইটান-ইঁদুররা। আগুনকে তারা ভয় পায় না। ধারালো দাঁতের সারি মেলে ধরে রয়েছে প্রফেসরের দিকে...

পায়ে পায়ে সেইদিকেই এগিয়ে গেলেন বায়োলজিস্ট-বন্ধু!

পনেরো
টাইটান ইঁদুরের ফরমান

কী হাল হয়েছিল প্রফেসরের তা দেখবার জন্যে আর দাঁড়াইনি আমি। করাল কেমিক্যাল ফেরোমোন যে এবার আমার স্নায়ুকেও অসাড় করে তুলবে, তা আঁচ করেই পেছনে ফিরেই লাফিয়ে উঠেছিলাম গোবরাটে...

সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। জানালায় যে গ্রিল লাগানো আছে, একেবারেই খেয়াল করিনি। গ্রিলে ঠোক্কর খেয়ে ঠিকরে পড়েছিলাম মেঝের ওপর।

হাতের জ্বলন্ত কাগজ কিন্তু ছাড়িনি। উপস্থিত বুদ্ধিও হারাইনি।

ছিটকেই উঠেছিলাম মেঝে থেকে। ছোট দরজাটার কথা একেবারেই খেয়াল ছিল না। বারান্দায় যাওয়ার দরজা। পরদায় ঢাকা দেওয়া ছিল বলে দু'জনের কেউই এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ করিনি। কিছুক্ষণ আগেও মাথায় আনতে পারিনি— শুধু জানলা খুলেই দেখেছিলাম।

নিমেষ মধ্যে ছিটকে গিয়েছিলাম সেই দরজার সামনে, দরজা খুলেই দেখেছিলাম কাতারে কাতারে ইঁদুর, জ্বলন্ত কাগজ নেড়ে তাদের সরিয়ে দিয়েই লাফিয়ে উঠেছিলাম রেলিংয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম শূন্যে...

জানতাম মারা যাব। কিন্তু মরিনি। তিনতলা থেকে শক্ত মাটিতে আছড়ে পড়লে বাঁচতাম না কখনওই। পড়েছিলাম একটা ঝোপের ওপর, বারান্দার ঠিক নীচেই ছিল। পালে পালে ইঁদুর সেদিকেই যখন ছুটে আসছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছিলাম, 'ড্রাইভার! ড্রাইভার।'

রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল পুলিশ জিপ। জ্বলে উঠেছিল জোরালো হেডলাইট। তিনতলার আগুন সেও দেখেছিল, দেখেছিল আমাকে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়তে...

তারপর আর কিছু মনে নেই।

কিন্তু ইঁদুরদের কামড় এখনও বহন করে বেড়াচ্ছি আমার দেহে। আমার চোয়ালের খাঁজে এখনও রয়েছে দাগটা— এই দেখুন...

বলে, চোয়াল ফিরিয়ে ধরেছিল সৌরভ। দেখিয়েছিল একটা ছোট্ট ক্ষতচিহ্ন।

নেংটি ইঁদুরের দাঁতের দাগ। মোমবাতির আলোয় দেখা যাচ্ছে স্পষ্টই।

আমি গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনেছিলাম অবিশ্বাস্য এই কাহিনি। চোখ গিয়ে পড়েছিল চোয়ালের খাঁজে, আর ঠিক তখনই—

ঠিক তখনই অদ্ভুত পরিবর্তন এল সৌরভের চোখে-মুখে—

ঠেলে বেরিয়ে এল দুই চোখ, যেন দম আটকে আসছে, একটুখানি বাতাসের জন্যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে, দু' হাতে খামচে ধরেছিল বুকের বাঁদিকটা, যেখানে আছে হৃৎপিণ্ড।

লুটিয়ে পড়েছিল সোফার ওপর পরক্ষণেই! নিস্পন্দ! নিথর! নাড়ি টিপে ধরেছিলাম, স্পন্দন টের পাইনি। বুকে কান রেখেছিলাম, হৃৎপিণ্ড চলছে না।

হার্টফেল করেছে সৌরভ।

থ হয়ে বসে রইলাম। রাত গভীর হয়েছে। থমথম করছে চারদিক। ইলেকট্রিক লাইন, টেলিফোনের তার যারা কেটে দিয়েছে, বাড়ি ঘিরে যারা বসে রয়েছে, তাদের সাড়া তো

কই পাচ্ছি না! দরজায়-জানলায় কুটুর কুটুর কটকট কটাং কট শব্দে দাঁতের কামড় তো বসছে না!

সৌরভের চালু হৃৎপিণ্ড সহসা অচল হয়ে গেল কি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার চরমসীমায় পৌঁছেছিল বলে! অ্যাড্রেনালিন গ্রন্থির ক্ষরণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে!

গ্রন্থি-ক্ষরণ ত্বরান্বিত করে দেয়নি তো টাইটান ইঁদুরদের অসম্ভব শক্তিশালী ফেরোমোন? দূরে থেকেই মন-হাতিয়ার প্রয়োগ করে জোর করে বন্ধ করে দেয়নি তো মানুষ যে জন্যে বেঁচে থাকে— সেই মূল দেহযন্ত্রটাকে? এই ক'মাসের মধ্যে ফেরোমোন বা টেলিপ্যাথিতে এতখানি উন্নতি কি সম্ভব?

না, আর দেরি নয়। কাগজকলম সামনেই আছে। ওদের হামলা শুরু হওয়ার আগেই লিখে ফেলব ঠিক করলাম পুরো কাহিনিটা। লিখতে শুরু করলাম সঙ্গে সঙ্গে।

লেখা শেষ। মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। চারদিক এখন নিস্তব্ধ। মোমবাতির আলো নিভে আসছে। রাত ভোর হতে চলল। মাথার মধ্যে এরকম করছে কেন বুঝছি না, হাত আর চলছে না, সারা রাতের ধকল নিশ্চয় সইতে পারছে না স্নায়ু, আমি—

'তোমাকে আমরাই ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। টেলিপ্যাথি বলো আর যাই বলো, তাই দিয়ে তোমার ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নিয়ে তোমারই হাত দিয়ে লিখে যাচ্ছি, আমাদের কথা। হ্যাঁ, আমরা টাইটান থেকে এসেছি। পৃথিবীর মানুষের ক্ষতি করতে চাইনি। কিন্তু তারা আমাদের ঘৃণিত জীব মনে করেছিল। তাই নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে গিয়েছি একশো বছর ধরে। টাইটান থেকে আমরা ছড়িয়ে পড়ছি সেখানে থাকার জায়গা আর নেই বলে। পৃথিবীতে থাকতে চাই সসম্মানে— ঘৃণা কুড়িয়ে নয়। তাই শক্তিমান হচ্ছি ধীরে ধীরে। মানুষকে আমরা মারতে চাইনি, পাশাপাশি থাকতে চেয়েছি। কিন্তু যে আমাদের মারতে আসবে, তাদেরকে মরতে হবে। আত্মরক্ষার এই ধর্ম পালনেই মেরেছি জনসনকে, মেরেছি প্রফেসরকে, এখনই মারলাম সৌরভকে। আগে মারিনি ইচ্ছে করেই, তার মুখেই আমাদের কাহিনি তোমাদের শোনাব বলে। তুমি মানুষের কল্যাণ করার ব্রত নিয়েছ, তোমাকে আমরা কাজে লাগাব বলেই সৌরভকে বলতে দিয়েছিলাম আমাদের কথা। কথা শেষ হতেই তার হার্ট বন্ধ করে দিয়েছি দূর থেকে। আমরা রয়েছি তোমাদের দরজার সামনেই! তোমারও কমজোরি হার্ট বন্ধ করে দিতে পারি যে কোনও মুহূর্তে। তুমি ভেবেছ, যা কিছু এতক্ষণ ধরে লিখলে, সিলিং ফ্যানের ঢাকনির মধ্যে লুকিয়ে রাখবে, সে সুযোগও আর দেব না। কিন্তু একটা শর্তে তোমাকে মারব না। মানুষের মঙ্গল সত্যিই চাও তুমি, সারাজীবন ধরে তাই করে এসেছ— বাকি জীবনটাও করো, তোমার হার্টকে আমরা শক্তিশালী করে দেব আমাদের ফেরোমোন প্রয়োগ করে। এই ক'মাসে আমরা এমন অদ্ভুত ফেরোমোন বানাতে পেরেছি, যা হার্টের শক্তি বাড়িয়ে দেয় অস্বাভাবিকভাবে, পৃথিবীর কোনও ওষুধে আজ পর্যন্ত যা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ আয়ু পাবে তুমি, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানীগুণী মানুষদের কাছে পৌঁছে দাও আমাদের শুভেচ্ছা... আমরা চাই থাকতে, এই গ্রহে, তোমাদের সঙ্গে। আমরা চাই বাঁচতে এই সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহগুলিতে। প্রলয়ংকর পারমাণবিক যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ করতে হবে এখুনি। শান্তি আসুক গোটা সৌরজগতে। যদি রাজি থাকো, দরজা খুলে এগিয়ে এসো।

কোনও ভয় নেই। যদি রাজি না থাকো, দরজা না খোলো, আমরাই দরজা কেটে ঢুকব ভেতরে, অথবা এখান থেকেই স্তব্ধ করে দেব তোমার হৃৎপিণ্ড। নাও এবার জাগো।'

ঘুম ভাঙল।

দেখলাম আমি যতদূর পর্যন্ত লিখেছিলাম জাগ্রত অবস্থায়, ঘুমন্ত অবস্থায় লিখে গেছি তারপরেও অনেক কিছু। টাইটানবাসীদের ফরমান লিখেছি নিজের হাতে, নিজের কলমে, তাদেরই টেলিপ্যাথির ক্ষমতায়!

না, এদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। পৃথিবীর মঙ্গল যারা চায়, এতবড় পৃথিবীতে যারা আমাদের সঙ্গেই থাকতে চায়, পাশাপাশি থেকে তারা তো তাদের জ্ঞানের ভাগও আমাদের দিতে পারে!

তাই হোক, তাই হোক— দরজা খুলে দাঁড়াব ওদের সামনে— বিচিত্র এই উপাখ্যানের শেষ অংশটুকু লিখছি এমন একটা নিরালা জায়গায় বসে যেখানকার ঠিকানা আমি ছাড়া কেউ জানে না।

রাত যখন ভোর হয়ে আসছে, মোমবাতির আলো যখন নিভু নিভু, তখন আমি নির্ভয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলাম বাইরে।

তারার আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখেছিলাম তিনটে বিরাট কুকুর দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি।

ভ্রম কেটে গেছিল পরক্ষণেই।

কুকুর নয়, তিনটে অতিকায় ইঁদুর।

আচম্বিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল আমার।

মোটর হেডলাইটের আলো। আমারই গাড়ি। ভোর রাতের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসে রোজ মর্নিংওয়াকের জন্যে, সৌরভের আশ্চর্য কাহিনি শুনতে শুনতে আমার তা একেবারেই মনে ছিল না—

ছিল না বলেই টাইটান ইঁদুররা আমার মন থেকে তা জানতে পারেনি।

আচমকা জোরালো আলো আর আগুয়ান মোটরের শব্দে বিদ্যুৎগতিতে উধাও হয়েছিল অতিকায় ইঁদুর তিনটে।

চোখধাঁধানো আলোয় ঘোর কেটে গিয়েছিল আমারও।

নিমেষে ঘরের মধ্যে থেকে তুলে এনেছিলাম সারারাত ধরে লেখা কাহিনিটা। লাফিয়ে উঠে বসেছিলাম গাড়ির মধ্যে। রুদ্ধশ্বাসে বলেছিলাম, 'ঘুরিয়ে নাও, ঘুরিয়ে নাও, এখুনি! ফুলস্পিড!'

গাড়ি উড়ে গেছিল ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস দিয়ে, কোথায় এসে পৌঁছেছিলাম সেখান থেকে কোথায় এসে লুকিয়ে রয়েছি, সেকথা কাউকে বলব না।

মত পালটেছি পরে। বুড়ো হয়েছি। টাইটান ইঁদুরদের হাতের পুতুল আর হতে চাই না। এই লেখা পাঠিয়ে দেব এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বের সর্বত্র।

তারপর আমি গা-ঢাকা দেব সমুদ্রের কোনও দ্বীপে, যেখানে কোনও জাহাজও যায় না—

কিন্তু তা হল না। ঘটনাস্রোত মোড় নিল নাটকীয়ভাবে।

রাজা র‍্যাটদের নিয়ে লেখাটা কোন জায়গায় পাঠানো যায়, তা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেছিল দীননাথের কথা। মহা মারকুটে, ভয়ানক দাঙ্গাবাজ, ভীষণ ডেয়ার ডেভিল বলে ওর সঙ্গে হরিহর আত্মা বন্ধুত্বের সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। রতনে রতন চেনে। রাজা র‍্যাটদের উৎপাতে মাথা বেঠিক হয়ে যাওয়ায় ওর কথা ভুলেই গেছিলাম।

কিন্তু পরমকারুণিক ঈশ্বর সহায় হলেন শেষ পর্যন্ত। রাজা র‍্যাটদের নিপাত-অস্ত্র তেড়ে এল স্পেসের মধ্যে দিয়ে। একটা ধূমকেতু।

সন্ধানটা দিয়েছিল দীননাথ। বিষম বিপদেই প্রকৃত দোস্তকে মনে পড়ে যায়। সব যখন শেষ হতে চলেছে তখন কি দীননাথ যাঁর চ্যালা, সেই বিস্ময়কর বৃদ্ধ প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কোনও সুরাহা বের করতে পারবেন না?

উপসংহার ছোট করে আনছি। দীননাথকে পাকড়াও করেছিলাম। মোবাইলের যুগে যোগাযোগ এখন জলভাত। দীননাথ আমাকে নিয়ে গেছিল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সামনে। রাজা র‍্যাটদের দুষ্কর্ম তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু দেখলাম বেশ নিশ্চিন্ত।

আমার শুকনো মুখ দেখে বললেন, 'বাপু হে, মামারও মামা আছে। মহাবিশ্ব থেকে এসেছে রাজা র‍্যাট বাহিনী। মহাবিশ্ব থেকেই আসছে একটা ধূমকেতু। তার পুচ্ছে থাকবে এমনই একটা গ্যাস যা গোটা পৃথিবীটাকে মুড়ে রেখে দেবে কিছুক্ষণ। গ্যাসটার রং নীল। পৃথিবীর প্রকৃত বাসিন্দা যারা, পোকামাকড় থেকে মনুষ্য পর্যন্ত, ঝরঝরে তরতাজা হয়ে যাবে নীল গ্যাসের ওষধি গুণে। তরতর করে বাড়বে গাছপালা। বাড়বে অক্সিজেন। কিন্তু মরবে পৃথিবীতে যারা আততায়ী তাদের সকলে। এই রাজা র‍্যাটগুলো। এই নীল ধূমকেতুর তাড়া খেয়েই নিশ্চয়ই এরা পালিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল পৃথিবীতে। বড় সুন্দর গ্রহ যে। ধূমকেতু কিন্তু তেড়ে আসছে পেছন পেছন। বাপু হে, একটু সবুর করো। দেখবে ভগবানের মার দুনিয়ার বার।'

ঠিক তাই হয়েছিল। নীল ধূমকেতু পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে নীল ধোঁয়ায় পৃথিবীকে নীলবর্ণ করে দিয়েছিল। তারপর, ধূমকেতু উধাও হওয়ার পর দেখা গেল, শয়তানপ্রতিম রাজা র‍্যাটরা কাতারে কাতারে মরে পড়ে আছে পৃথিবীময়।

মকর মল্লিকের মহামন্ত্র

মকর মল্লিকের মন্ত্র যে নেবে, সেই নাকি মস্ত লেখক হয়ে যাবে। খবরটা চোখে পড়তেই টনক নড়েছিল আমার। আমি মস্ত লেখক নই। বরং বলা যেতে পারে সস্তা লেখক। দারুণ সস্তা। সম্পাদকেরা দয়া করে ছিটেফোঁটা দু'-পয়সা যা দেন তাতেই আমি আনন্দে ডগমগ থাকি।

সম্পাদকদেরই বা দোষ দিই কী করে। ম্যাগাজিন বিক্রি হলে তবে তো লেখক-টেখককে দু' পয়সা দেবেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। হু-হু করে ম্যাগাজিনগুলোর কাটতি কমছে। ওদিকে হু-হু করে টেলিভিশন-ভিসিপি-ভিসিআর— এর বিক্রি বাড়ছে। এখন তো চব্বিশ ঘণ্টা ইলেকট্রনিক আনন্দের যুগ এসে গেল, ঘাড় গুঁজে চোখের আর শিরদাঁড়ার বারোটা বাজিয়ে বই পড়ার যুগ ভাগলবা!

মকর মল্লিকের মহামন্ত্রের রটনা চোখে পড়তেই তাই কলম রেখে সিধে হয়ে বসলাম।

বসেছিলাম মেঝেতে। পয়সা নেই যে টেবিল কিনব। দামি ফাউন্টেন পেনও নেই। একটা ভাঙা কলম আমার বন্ধু কৃপা করে দিয়েছিল। তার মধ্যে আবার কালি ভরা যায় না। দোয়াতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লিখতে হয়। তাই করি আমি। দোয়াতে কলম ডুবোই আর বৈঠকখানা বাজার থেকে ওজনদরে কিনে আনা এক পিঠ লেখা সস্তা কাগজের আর একপিঠে এনতার হাজিজাবি লিখে যাই মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে— অবিকল সাপের মতো। তাতে শিরদাঁড়া চনমনে থাকে, শিরদাঁড়ার মধ্যের স্নায়ুগুলো কখনও হেদিয়ে পড়ে না, লেখা চলে তরতরিয়ে।

এইভাবেই একদিন একটা জমাটি উদ্ভট গল্প লিখছিলাম 'মাসিক কুরুক্ষেত্র' কাগজটার জন্যে। নামটা 'কুরুক্ষেত্র' হলেও ধর্মের সঙ্গে এ কাগজের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এমন সব হট্টগোলে গল্প-কবিতা-উপন্যাস ছাপা হয়, যা পড়লে মাথার মধ্যে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যায়।

আমার উদ্ভট গল্পটার নাম ছিল 'অসম্ভবের দুনিয়া'। দু' লাইন লিখেই কলম কামড়াচ্ছিলাম আর ঘন ঘন দোয়াতের মধ্যে নিব ডোবাচ্ছিলাম— কিন্তু মগজ থেকে তৃতীয় লাইনটা আর জন্ম নিচ্ছিল না।

এমন সময়ে চোখ গেল একপিঠে লেখা কাগজগুলোর দিকে।

প্রথম দিকে অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে তৃতীয় লাইনটার ধ্যান করছিলাম। তারপর ধ্যান-ট্যান মাথা থেকে উড়ে গেল, ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলাম পুরনো কাগজের কাগের-ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লেখাগুলোর দিকে।

এ যে দেখছি কারও পাণ্ডুলিপি! কেউ কাগজের এই পিঠে জঘন্য হাতের লেখায় লাইনের পর লাইন লিখে গেছে, আর ঠিক সেই কাগজখানাই উলটো করে রেখেছি মেঝের ওপর।

যারা লেখা নামক এই বাজে কাজটার চর্চা করে, তারা সব্বাই অন্যের হাতের লেখা সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহলী থাকে। ঠোঁট বেঁকিয়ে নাক উঁচিয়ে পরস্ব পাণ্ডুলিপির দিকে দৃকপাত করে এমনভাবে যেন, আস্তাকুঁড়ের জিনিস দেখছে।

আমিও তো লেখক। সস্তা হতে পারি, তবুও মা সরস্বতীর সাধনা করি সকাল বিকেল। তাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাণ্ডুলিপিটার দিকে তাকিয়েই চোখ বড় বড় করেছিলাম।

কারণ, এই পাণ্ডুলিপিতেই প্রথম পড়লাম মকর মল্লিকের নাম। তার সম্বন্ধে একটা রস-রচনা টাইপের লেখা লিখতে বসেছিল লেখক। অর্ধেক পাতা লিখেই এলেম ফুরিয়েছে, আর লেখেনি।

কিন্তু ওই ক'টা লাইন পড়েই আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল।

মকর মল্লিকের আসল নাম নাকি মকরধ্বজ মল্লিক। ঊর্ধ্বতন চোদ্দোপুরুষ কবিরাজি প্র্যাকটিস করে লাল হয়ে গেছিলেন বলে অকালকুষ্মাণ্ড মকরধ্বজ মল্লিক এখন খালি বসে খায়, বাপ-ঠাকুরদার টাকা ধ্বংস করে।

কিন্তু এই ধরনের আলালের ঘরের দুলালদের কিছু না কিছু অপকীর্তি না রাখলেই নয়। যৎসামান্য বদভ্যেসও রাখতে হয়, মকরধ্বজ মল্লিক বাপের দেওয়া নাম থেকে 'ধ্বজ' অংশটুকু ছেঁটে দিয়েছে, শুধু মকর মল্লিক হয়ে গিয়ে ইংরেজি আর বাংলা সাহিত্য নিয়ে মেতেছে। কবরেজি জড়িবুটির সঙ্গে তান্ত্রিকী মন্ত্র মিশিয়ে এমন একটা শক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছে, যার দৌলতে বোকাপাঁঠাও সাহিত্য-দিগগজ হয়ে যেতে পারে। সাহিত্যের ধন্বন্তরী মকর মল্লিক জিন্দাবাদ!

এইটুকু লিখেই কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লেখক বাবাজির দৌড় ফুরিয়েছে। তারপর কাগজ ফাঁকা। শুধু তলার দিকে একটা বিটকেল মন্ত্র লিখে রেখেছে এইভাবে:

হিং টিং ছট! হিং টিং ছট! হিরিং মিরিং কিরিং!
গল্পের গোরু গাছে উঠুক— নাচো তিড়িং মিড়িং!

এটা ছড়া না মন্ত্র, এই দুর্ঘট সমস্যা নিয়ে চক্ষুযুগলকে যখন ছানাবড়া করে ফেলেছি, ঠিক এই সময়ে কড়া নড়ে উঠল দরজার। দরজার খিল নামিয়ে পাল্লা ফাঁক করার আগেই, পাল্লাই দমাস করে আছড়ে পড়ল আমার ওপর। আমি ঠিকরে গেলাম ঘরের মাঝখানে। কপালে খুব জোরে লেগেছিল বলে চোখে ধোঁয়া দেখছিলাম, কানের মধ্যে গোঁ-গোঁ আওয়াজ হচ্ছিল; সেই অবস্থাতেই দেখলাম সাদা লম্বা দাড়িওলা এক বেঁটে কেলেকুচ্ছিত বুড়ো কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তারপরেই দাঁত খিঁচিয়ে উঠল বিচ্ছিরিভাবে। সাতজন্মে না-মাজা দাঁতের হলদে শ্যাওলা দেখিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বললে, হতচ্ছাড়া! ভুল করে

বাজে কাগজের সঙ্গে একটা দামি কাগজ নিয়ে গেছিল পুরোনো কাগজওয়ালা। বৈঠকখানা বাজার থেকে আমার সেই কাগজ এনেছিস! অনেকক্ষণ থেকে ফলো করছি। ওই তো আমার কাগজ! পড়া হচ্ছিল। বলতে বলতে বুড়ো বদমাশ সাঁ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার নাকের সামনে একটা সাদা কৌটো তুলে ধরে স্প্রে করতেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম, মকর মল্লিকের বৃত্তান্ত লেখা কাগজখানা উধাও হয়েছে মেঝে থেকে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সব শুনে বললেন, 'বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। ছাইপাঁশ লেখার ফল হাতে হাতে ফলেছে। শুধু কপাল ঠুকে দিয়েই ছেড়ে দিল, দু'খানা গাঁট্টা মেরে গেল না কেন!'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তখন তাঁর বিখ্যাত খি-খি-খি হাসি হাসলেন। হেসে-টেসে নিয়ে বললেন, 'বৎস দীননাথ, ছাইপাঁশ যা লিখছ তাই লেখো, মকরের মার খেতে যেও না।'

'মকরের মার! মানে?'

'মকরের কোষ্ঠীতে লেখক হওয়ার কথা লেখা নেই, যেমন তোমার নেই। নেহাত আমি ছিলাম বলে, আমার আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারগুলোকে রঙচঙে করে বাজারে ছেড়ে লেখক হয়েছ। কিন্তু মকরের মন্ত্র নিলে এই পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যাবে। যেহেতু ও লেখক হতে পারেনি, তাই এমন কাণ্ড করছে যে, লেখা আর পড়া জিনিসটাই লোপ পাবে পৃথিবী থেকে। লেখকদের আর হাঁড়ি চড়বে না, কাগজের কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, সম্পাদকেরা লোহালক্কড়ের ব্যাবসা ধরবে। আজ থেকে একশো বছরও যাবে না, বই-টই সব মিউজিয়ামে রাখা থাকবে, মা সরস্বতীর মূর্তি তার পাশে রাখা থাকবে। এরই নাম মকরের মার!'

'কে এই মকর মল্লিক? কোথায় তার নিবাস?'

'কেন? মারবে নাকি?'

'ওর এই অপচেষ্টা ভণ্ডুল করব।'

জুলজুল করে প্রফেসর আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বুড়োর চোখে অদ্ভুত ঝিলিক দেখলাম।

তারপর বললেন, 'দীননাথ, হরফের মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। সেই হরফ লোপ পাক, এটা আমিও চাই না। হাজার হাজার বছর ধরে ছবি হয়ে উঠেছে হরফ। কিন্তু এখনও তা ছবি। এখনও তার মধ্যে রয়েছে জাদুশক্তি। হাজার হাজার বছর পরে এই হরফ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তার মধ্যে নতুন কী শক্তি আসবে, সেটা তর্কের ব্যাপার। আমি তার মধ্যে ঢুকতে চাই না। যে যা লিখছে লিখুক, সব লেখারই একটা দাম আছে, এটা আমি বিশ্বাস করি। সবই চিন্তার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসছে। পশু আর মানুষের সঙ্গে তফাতটা এইখানেই। হরফ না থাকলে মানুষ অমিতমানুষ হবে, না অনতিমানুষ হবে, সেটা মহাকাল দেখিয়ে দেবে। তত্ত্বের কচকচি শুনবে তো চলে এসো।'

এই বলে প্রফেসর আলমারি খুলে একটা চৌকোনো খাম নিয়ে পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

মকর মল্লিক নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। সেই বিকট বুড়োই বটে। কেলেকুচ্ছিত,

দাড়ির রং কিন্তু ধবধবে সাদা, লম্বা লম্বা চুলও সাদা। বেঁটে মর্কট বললেই চলে। কটমট করে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। আর হাত বুলোতে লাগলাম কপালের আলুতে।

আলুর দিকে তাকিয়ে নির্দয় গলায় মকর মল্লিক বললে, 'নাটবল্টু যে! চ্যালাকে নিয়ে এসেছ কেন?'

প্রফেসর বললেন, 'দেখো মকর, আমাকে সবাই প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বলে ডাকে। তুমি বন্ধুমানুষ, প্রফেসর নাই বা বললে, কিন্তু চক্র টাইটেলটাকে বাদ দেবে না। ওটা আমার বংশের ঐতিহ্যকে বহন করছে।'

মকর তখন ওর সেই হলদে শ্যাওলা-ঢাকা দাঁত দেখিয়ে হাসল। বললে, 'চক্কোত্তি বামুনের আবার ঐতিহ্য। চাল-কলা বাঁধা ঐতিহ্য।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'বংশ তুলে গালাগাল দেবে না বলে দিচ্ছি!'

'তুমিই বা সবাইকে বলে বেড়াও কেন, আমি ঘাসপাতা মল্লিক?'

'বেশ করি বলি। তোমার বংশ তো তাই করেছে। ঘাসপাতা বেচে পয়সা করেছে।'

'খবরদার নাটবল্টু—'

'খবরদার ঘাস-পাতা—'

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঠান্ডা করে ফেললাম। আমি বোকা হতে পারি, কিন্তু মাঝে মাঝে দেখেছি, আমার এই বোকা-বুদ্ধি দারুণ কাজ দেয়।

ঝট করে রূপোলি হাসি হেসে মিহিমাজা গলায় বলে উঠলাম, 'আপনারা কি ঝগড়াই করবেন? আমি এলাম মকরমন্ত্র শিখে নিয়ে, আপনার চ্যালা হয়ে, ছকে-বাঁধা লেখকগুলোর ভাত মারার জন্যে—'

মকর মল্লিক জ্বলন্ত চোখে চেয়ে থেকে বললে, 'তোমার মতো কুষ্মাণ্ডকে আমি চ্যালা বানাই না। আমার চ্যালা দরকার নেই। আমি একাই একশো।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র অমনি পটাং-পটাং করে তুড়ি মেরে বলে উঠলেন, 'আর আমি একাই তোমার প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেব।'

'তুমি?' মকর মল্লিকের দু'চোখের মধ্যে বাঘের চাউনি দেখলাম। বললে চিবিয়ে চিবিয়ে, 'তুমি আমার প্ল্যান ভণ্ডুল করবে? জানো কতদূর এগিয়েছি? জানো না, এসো, ঘরে এসো, শুনে যাও শেষ প্যাঁচের গবেষণা।'

পাতালঘরে যে এমন একখানা গবেষণামন্দির দেখতে পাব, কল্পনাও করিনি। আগেকার পয়সাওয়ালা লোকগুলো বাজে অভ্যেসে টাকা ওড়াত, মকর মল্লিক ওড়াচ্ছে কম্পিউটারের গবেষণায়।

বিরাট এই পাতালঘরে কতরকম কম্পিউটার আর ইউপিএস স্টেবিলাইজার ও প্রসেসর আছে, সেসবের নামও জানি না, বলতেও পারব না। অনেকগুলো এয়ারকন্ডিশনার চলছে, ঘর কনকনে ঠান্ডা। লিফটে করে আমরা নামলাম সেই ঘরে। লিফট উঠে যেতেই স্টিল দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মকর মল্লিক। আর আমার দু' চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল ঘরের কলকবজা দেখে।

হলদে দাঁতের ছিরি দেখিয়ে মকর বললে, 'এই আমার অসম্ভবের দুনিয়া। এইখান থেকেই ছাড়ব আমি আমার মহামন্ত্র। মূর্খ দীননাথ, কোনও খবরই রাখো না বলে এখনও ভাঙা কলমে লিখে যাচ্ছ। সল কর্নবার্গ-এর নাম শুনেছ? শোনোনি। লাইব্রেরি টেকনোলজির মস্ত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। ইনি বলেছেন, খুব শিগগিরই লেখা আর পড়া, এই দুটো বিদ্যেই বাতিল বিদ্যে হয়ে যাবে। আর আমি বলছি, আমি মকর মল্লিক বলছি, সে জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়াবে কারিগরি দক্ষতা। বুঝলে কী বললাম? মেশিন-মেশিন-মেশিন... হাইস্পিডে জ্ঞান জুগিয়ে যাবে মানুষকে। মানুষের বই লেখা আর বই পড়ার দক্ষতার দিন ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। ফুরিয়ে যাচ্ছে বইয়ের বাজার।'

আমি সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গিয়ে বললাম, 'বলছেন কী?'

'আমি ওইরকমই বলি দীননাথ, তোমার এই মূর্খ গুরু সেটা এখনও ধরতে পারেনি। ইংরেজি ভাষায় এখন যত শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাদের সংখ্যা মোটামুটি সাড়ে চার লাখ। শেক্সপিয়রের সময়ে ছিল আড়াই লাখ। চারশো বছরে শব্দ বেড়েছে। অনেক শব্দ চলে গেছে। অনেক শব্দ নতুন এসেছে। বেশি পরিবর্তনটা এসেছে গত পঞ্চাশ বছরে। শেক্সপিয়র আজ যদি হঠাৎ আসতেন, মাতৃভাষা বুঝতে পারতেন না। তোমার মতো মহামূর্খরা বাংলা সাহিত্যে কলমবাজি করে চলেছ বলে ভাল ভাল লেখকরা কলকে পাচ্ছে না, বাংলা ভাষার হিসেবটা কেউ দিতে পারছে না। তবে মনে তো হয়, বাংলার দৈন্যদশা চলছে একই কারণে। অনেক শব্দ বাতিল হয়ে যাচ্ছে, অনেক নতুন শব্দ ঢুকছে। ঢুকুক। কিন্তু লাভ কী?'

'লাভ?' বুক ফুলিয়ে বলেছিলাম আমি, 'সাহিত্য সেবা।'

'তোমার মুণ্ডু সেবা। আমেরিকায় বেস্ট সেলারদের মার্কেট কমছে। দশ বছর আগে দোকানের তাকে থাকত ১৮.৮ হপ্তা, এখন থাকে ১৫.৭ হপ্তা। দশ বছরেই মার্কেট গুটিয়ে গেছে ছ'ভাগের এক ভাগ। আরও হু হু করে গুটোবে। কারণ? যে স্পিডে জ্ঞান-বিজ্ঞান বেড়ে চলেছে, সেই স্পিডে পাল্লা দিয়ে বই আর ম্যাগাজিন জ্ঞান-বিজ্ঞান জুগিয়ে যেতে পারছে না। মাথার মধ্যে ঢোকাতেও পারছে না। স্লো, ভীষণ স্লো, নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেও ম্যাগাজিন আর ডেলি পেপারদের কাটতি কমছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমদানির স্পিড আরও বাড়বে, বই হেরে যাবে, মেশিন সে জায়গা নেবে। হাঃ হাঃ হাঃ! সেই আমার মহামন্ত্র। সেই আমার জড়িবুটি!'

'কীভাবে? কীভাবে?'— হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলাম আমি।

চোখ সরু করে তাকিয়ে থেকে মকর মল্লিক বলেছিল, 'এ ঘর থেকে দু'জনের কাউকেই আর জ্যান্ত বেরোতে দেব না যখন, তখন বলেই ফেলি আমার শেষ প্যাঁচের গবেষণা। জল দিয়ে জল বের করতে হয় জানো তো? বিষ দিয়ে বিষনাশ করতে হয়। আমার কম্পিউটার এমন সব শব্দ আবিষ্কার করে ফেলেছে, যার চমক দেখে সম্পাদক আর প্রকাশকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। এমন সব কাহিনি মেশিনই লিখে দেবে, যা ছাপা হলেই হইচই পড়ে যাবে, কাটতি হু হু করে বেড়ে যাবে। হাতে-লিখিয়ে লেখকদের বাজারটা এইভাবে নষ্ট করে দেব। না খাইয়ে ওদের মারব। তারপর যখন লেখক জাতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন মেশিন এমনসব শব্দ বানিয়ে বাজারে ছাড়বে যে, চালু শব্দ সব বাতিল হয়ে যাবে। আরও স্পিডে

নতুন শব্দ, নতুন গল্প ছাড়ব, হার মেনে যাবে কল্পবিজ্ঞান— পাঠকেরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যখন পড়া বন্ধ করে দেবে, বই আর ম্যাগাজিনগুলো উঠে যেতে থাকবে, আর তখন আমার মেশিনই জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাঁড়ারকে পুরো কন্ট্রোলে আনবে। জ্ঞানই শক্তি। সেই শক্তিতে শক্তিমান হবে আমার মেশিন। আর আমি, মন্ত্রনায়ক মকর মল্লিক হব বিশ্বনায়ক।'

বলতে বলতে আবেশে দু' চোখ বুজে ফেলেছিল মকর মল্লিক। সেই ফাঁকে টুক করে পাঞ্জাবির পকেট থেকে চৌকোনো খামটা বের করে, তা থেকে চৌকো জিনিসটা টেনে নিয়ে শট করে পাশের কম্পিউটারের টার্মিনালে ঢুকিয়ে দিলেন প্রফেসর। দিয়েই টার্মিনাল অন করে দিলেন।

ইতিমধ্যে চোখ খুলে ফেলেছিল মকর মল্লিক। প্রফেসরের শেষতম কাজটা দেখেই লম্ফ দিয়ে (অবিকল বাঁদরের মতো) টার্মিনালের সামনে গিয়ে সুইচ অফ করতে গেল।

কিন্তু আমি তাকে শূন্যপথেই লুফে নিয়ে—

তারপর কী করেছিলাম, তা আর বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না। বাড়ি ফিরে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী বিষ ঢুকিয়ে এলেন মকরের মেশিনে?'

'ভাইরাস। সাড়ে সাতশো কম্পিউটার ভাইরাসের জ্বালায় কম্পিউটার বৈজ্ঞানিকরা চোখে ধোঁয়া দেখছে। শিগগিরই ওটা দাঁড়াবে দু' হাজারে। আমি বানিয়ে রেখেছিলাম মকর-ভাইরাস। ওর আর অ্যান্টি-ডোজ নেই। মকরের সমস্ত গবেষণা মুছে গেল।'

'কিন্তু পাগলা-গারদ থেকে বেরিয়ে মকর তো ফের আরম্ভ করবে?'

'তদ্দিনে মরেই যাবে। কিন্তু তোমার হরফ বেঁচে থাকবে। লিখে যাও ছাইপাঁশ।'
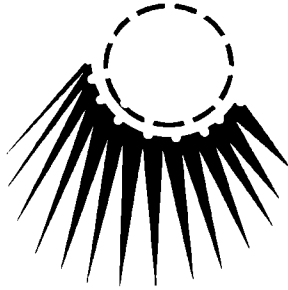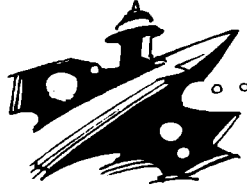
বাড়ির নাম ব্যাবিলন

বিদায়গড় বৈষ্ণব হিন্দু কবরখানা থেকে কঙ্কাল চুরি যাচ্ছে, খবরটা শুনে গুম হয়ে গেলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। আমিও মুখ বুজে বসে রইলাম। প্রফেসরের মুখের চেহারা আমার ভাল লাগছিল না।

হঠাৎ বললেন, 'টেলিফোনটা কই?'

'আপনার ডানদিকে,' বললাম আমি।

অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়িয়ে উনি রিসিভার তুললেন, কথা বললেন নিয়ামতপুর পুলিশ স্টেশনের অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে।

জানতে চাইলেন, 'শুধু করোটি চুরি যাচ্ছে, না, গোটা কঙ্কাল চুরি যাচ্ছে?'

অফিসার খুব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'দেখুন মশাই, আমি পুলিশের লোক, আর আপনি একটা উদ্ভট লোক, আপনার নাম আমি ঢের শুনেছি। কিন্তু এই ব্যাপারে আপনার কিছু করার নেই। যে সিদ্ধি লোকটা কঙ্কাল চালান দিচ্ছে নেপাল আর বাংলাদেশের বর্ডার দিয়ে, তাকে আগে ধরি, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

প্রফেসর একটুকুও রেগে না গিয়ে তোয়াজের গলায় বললেন, 'সে তো ঠিক, সে তো ঠিক। মানুষ পাচারের ঠেলাতেই চোখে অন্ধকার দেখছে দেশের লোক, তার ওপর শুরু হল কঙ্কাল পাচার। আমি খালি জানতে চাইছিলাম, শুধু করোটি চুরি হয়েছে, ধড়ের কঙ্কালটা কারখানায় পড়ে আছে, এমন কোনও কেস কি রিপোর্টেড হয়েছে?'

'জ্বালালেন! হ্যাঁ, হয়েছে। তাড়াহুড়োয় বাকি কঙ্কাল নিয়ে যাওয়ার সময় পায়নি, শুধু করোটি নিয়ে পালিয়েছে।'

'যার কঙ্কাল, তার নাম কি ঘটকর্পর ঘটক?'

এইবার চমকে উঠলেন পুলিশ অফিসার, 'আপনি জানলেন কী করে?'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন প্রফেসর।

আমাকে বললেন, 'বাজে লোকদের সঙ্গে কথা বলা মানেই সময় নষ্ট করা। দীননাথ, ঘটকর্পর ঘটকের করোটি নিশ্চয় এতক্ষণে ব্যাবিলনে পৌঁছে গেছে।'

আমি জানি, প্রফেসরের মাথা খারাপ নয়। তাই 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' কথাটা বলতে গিয়েও সামলে নিলাম। বললাম, 'চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার ব্যাবিলনে?'

'না, না, ব্যাবিলন নামে যে বাড়িটা তৈরি হয়েছে, সেই বাড়িতে।'
'বাড়ির নাম ব্যাবিলন?'
'আরে হ্যাঁ। কিউনিইফর্ম, সুমেরিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান আর আসিরিয়ানদের নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছেন, বাড়ির নাম ব্যাবিলন রাখবেন না?'
'কী... কী...'
'কিউনিইফর্ম। সুমেরিয়ানদের পিকটোগ্রাফ। যাচ্চলে! পিকটোগ্রাফি কাকে বলে, তাও জানো না? ছবি দিয়ে লেখার পদ্ধতি। পাঁচ হাজার বছর আগে সুমেরিয়ানরা নলখাগড়া কেটে চোখা করে নিয়ে কলম বানাত; কলম, মানে গোঁজ, যার একদিক সরু, আর ধারালো, আর-একদিক মোটা। নরম কাদামাটির ওপর এই গোঁজ চেপে ধরে ছবি ফুটিয়ে তুলত। কয়েকশো প্রতীক চিহ্ন ওরা মাথা খাটিয়ে বের করেছিল, কিন্তু গোঁজের মতন খাড়া-খাড়া ছবি দেখেও চেনা যেত না। কষ্ট করে বুঝতে হত কীসের ছবি, কী তার মানে। সাংকেতিক ওই পিকটোগ্রাফি সুমেরিয়ানদের বিখ্যাত কিউনিইফর্ম কোড ল্যাঙ্গুয়েজ— যা নিয়ে রীতিমতো রিসার্চ করে পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে গেছে তমোঘ্ন তোপদার।'
'এ আবার কী নাম?'
'বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিল নিশ্চয় পূর্বজন্মে। এজন্মেও সত্যিই সে রত্ন হয়েছে। সাড়ে চার হাজার বছর আগে কিউনিইফর্ম হস্তলিপির ১৫,০০০ ফলক-এর অভিধান দেখে এসেছে এবোলা শহরে। সুমেরিয়ানরা অতিমানবিক শক্তিতে বিশ্বাস করত। তারা জানত না পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, অথচ নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারত সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ কবে, কখন হবে। এই জগৎ সম্বন্ধে তারা অনেক কিছু জেনেছিল। দেবতা রাজা গিলগামেস-এর কাব্যকাহিনি উদ্ধার করা হয়েছে ভাঙাচোরা অনেক ফলক থেকে, সে কাহিনিতে পৃথিবী প্লাবনের কাহিনি আছে, নোয়ার কাহিনির সঙ্গে মিলে যায়। তমোঘ্ন তোপদার ইরাক আর ইরানে টহল দিতে দিতে খুঁজে পায় একটা জিগুরাট।'
'জিগুরাট কী জিনিস?'
'ধাপে ধাপে তৈরি পিরামিড। এখন যেখানে ইরাক আর ইরান, আগে সেখানে ছিল পরিসিয়া আর মেসোপটেমিয়া— যেখানে পাথর পাওয়া দুষ্কর কিন্তু কাদামাটি অঢেল। বাড়ি আর পিরামিড তৈরি হত এই কাদামাটি দিয়ে, লেখার ফলকও। তমোঘ্ন তোপদার একটা জিগুরাট আবিষ্কার করেছিল, তার মধ্যে পেয়েছিল কিউনিইফর্মে লেখা অনেকগুলো ফলক। কিন্তু যে ফলকে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, এই জগতের বিবর্তন শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে— সেটাই শুধু পায়নি।'
'বিবর্তনের শেষ কোথায়, হাজার হাজার বছর আগে জেনেছিল? অসম্ভব।'
'আমারও তাই মনে হয়েছিল। তমোঘ্ন কিন্তু আর কিছু ভাঙেনি। খুঁজেছিল ঘটকর্পর ঘটককে।'
'সে কে, প্রফেসর?'
প্রফেসর যা বললেন, তা যেন একটা চলমান ছবি।

ঘণ্টাকর্ণ ঘটক তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'হ্যাঁগো, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখার মতন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল যে।'

ঘণ্টাকর্ণের স্ত্রী বললেন, 'যে ছেলেরা দেরিতে কথা বলে, সে ছেলেরা বড় হয়ে অনেক বুদ্ধি ধরে। দশজনের একজন হয়।'

'কী জানি বাবা। আমার তো লক্ষণ সুবিধের মনে হচ্ছে না। কত সাধ করে নাম রাখলাম ঘটকর্পর। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এক রত্ন হবে। এ তো দেখছি পাথর হবে।'

'যত্তসব অলুক্ষুণে কথা। থামো।'

'ঘটকর্পর বড় হয়েছে। বেশ বড়। পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বাবা আর মা দু'জনেই দেহ রেখেছেন। ঘটকর্পর তাঁদের সাধ পূর্ণ করেনি। উলটে একটা অদ্ভুত মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে রত্নের মতন রোশনাই ছড়ায় না, মানে মেধার বিকিরণ ঘটায় না। কিন্তু নিজেকে রত্ন বলে মনে করে। জগতের সেরা রত্ন। তাই সে কারও হুকুম শোনে না। স্কুলে গেলে হুকুম শুনতে হবে বলে স্কুলে যায়নি। সুতরাং কলেজের দরজাও মাড়ায়নি। বাবা হুকুম চালাতে গিয়ে দেখেছেন বেগতিক, ছেলে মুখে চাবি এঁটে, চোখ বুজে, চুপ করে বসে থাকে। সে তখন বেঁচে আছে কি মরে গেছে, বোঝা যায় না। এই দেখে তিনি ছেলেকে বকাঝকা ছেড়ে দিলেন। হুকুম দেওয়াও ছেড়ে দিলেন। ছেলের হুকুম শুধু শুনেই গেলেন। হুকুম না শুনলেই তো বিপদ। ঘটকর্পর বিশ্বাস করে, সে হুকুম দিতেই জন্মেছে, হুকুম শুনতে নয়। হুকুম সে দেয়, হুকুম না শুনলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলে না, চেঁচামেচি করা তার ধাতে নেই। শুধু চোখ বুজে, ঠোঁট টিপে চুপ করে বসে থাকে। তখন তার নাড়ি চলছে, কি চলছে না, তা বোঝা যায় না। নাকের কাছে আয়না ধরলে তাতে নিশ্বেসের বাষ্প দেখা যায় না। এইসব দেখেশুনে ঘটকর্পরের মা খুব ভয় পেলেন। ঘটকর্পরের বাবাকে একহাত নিলেন। বললেন, 'আয়েলে-পয়েলে একটাই তো ছেলে, সে যা চায়, তাই এনে দাও না। দু'দিন পরে সবই তো তার হবে।'

ঘটকর্পরের বাবা প্রথম প্রথম বেঁকে যেতেন, 'এ তো চাওয়া নয়, হুকুম। আমি কি আমার ছেলের পাইক-বরকন্দাজ? আমি গরিবের ছেলে, কিন্তু বড়লোকের বাবা। আমি পয়সা জমিয়েছি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, আর এ হয়েছে গোঁফ-খেজুরে। উড়নচণ্ডি নাম্বার ওয়ান।'

ঘটকর্পরের মা বুঝিয়ে বলতেন, 'আহা, ওতো তোমার কাছে দামি দামি জিনিস চাইছে না। বই চাইছে। বই সবচেয়ে বড় বন্ধু। বেচারার একটাও বন্ধু নেই। বই পর্যন্ত কিনে দেবে না? কীরকম বাবা, তুমি?'

ঘণ্টাকর্ণ ঘটকের সঙ্গে বই-টইয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। ছেলেপুলেদের স্কুল-কলেজে পড়াতে হয়, প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়, এই পর্যন্তই জানেন। লেখাপড়া শেখানোর কারখানা ছাড়াও যে লেখাপড়া শেখা যায় বাড়িতে বসে, এ তত্ত্ব তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু গিন্নির কাছে দু'বেলা দাবড়ানি খেয়ে শেষকালে বই কিনে এনে দেওয়া শুরু করলেন। কী বই কিনতে হবে, তা তিনি জানতেন না। খনার বচন আর পাঁজি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও বইয়ের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রাখতেন না। ঘটকর্পর নিঃশব্দে একটা-দুটো বইয়ের প্রতিটি

লাইন মুখস্থ করে ফেলেছিল। পাঁজিতে যেসব বইয়ের বিজ্ঞাপন থাকে, সেইসব বইয়ের অর্ডার দিত বাবাকে। সেই বই নিমেষে পড়ে নিয়ে আর মুখস্থ করে সেইসব বই থেকেই অন্য বইয়ের সন্ধান পেত। বাবাকে দিয়ে আনাত সেইসব বই। স্রেফ বই পড়ে কারও সাহায্য না নিয়ে, শিখে গেল সংস্কৃত আর ইংরেজি। তারপর ফরাসি আর ল্যাটিন। হিব্রু আর উর্দু। সেমিন্টিকদের আক্কাডিয়ান আর ব্যাবিলোনিয়ানদের কিউনিইফর্ম। আরও অনেক জিনিস। বাড়ি ভরে উঠল বই আর ফলকে। একা এই মিউজিয়াম আর লাইব্রেরির মধ্যে হয় বসে থাকত, নয় ঘুরে বেড়াত ঘটকর্পর। তাকে খাইয়ে দিতে হত, নাইয়ে দিতে হত, শুইয়ে দিতে হত।

ঘটকর্পরের কথা ফুটেছিল একটু দেরিতে। তার মা তাকে অনেক কথাই শিখিয়েছিলেন। কথাও বলত, হাসত, খেলত। আর পাঁচটা ছেলের মতন। তার পরেই একদিন সে চারতলার বাড়ির ছাদ থেকে নিচের বাগানে পড়ে গেল ঘুড়ি ধরতে গিয়ে। তখন তার বয়স মোটে ছ' বছর।

আশ্চর্য এই যে, অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে তার তেমন কিছুই হয়নি। শুধু মুখের ভেতরটা একটু কেটে-ছড়ে গেছিল। মাথায় নিশ্চয় চোট লেগেছিল, এই ভয়ে ঘণ্টাকর্ণ ঘটক ব্রেন স্ক্যানিং করালেন, এনসেফালোগ্রাফ করালেন, কিন্তু দেখা গেল সবই স্বাভাবিক। একবিন্দু রক্তক্ষরণও হয়নি ব্রেনের মধ্যে।

তবে ওই ঝাঁকুনিটা তার মধ্যে যে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সেই কথাই বলা হল এতক্ষণ ধরে। হুকুম দেবে, হুকুম শুনবে না। চুপ করে বসে থাকবে, কারও সঙ্গে কথা বলবে না। খেতে দিলে খাবে, নইলে খাবে না। শুধু বই পড়বে।

আর সে কী পড়া! ব্রেনের মধ্যে যেন হাজারখানা ক্যামেরা ফোটো তুলে নিত বইয়ের প্রত্যেকটা পাতার। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, যার নজির নেই পৃথিবীর ইতিহাসে। যা একবার দেখবে, তা ছবির মতন মনে রেখে দেবে।

পঞ্জিকা ছিল তার জীবনের প্রথম পুস্তক। তারপর এল গাদা গাদা জ্যোতিষচর্চার বই। এইসব বই-টই গিলে হজম করে নেওয়ার পর সে তার অসাধারণ ক্ষমতার আর-একটা নিদর্শন দিল একদিন। বইপাগল আর এক্কেবারে নিঃসঙ্গ এই ছেলের মনের ওপর থেকে চাপ কমানোর জন্য বাবা আর মা একদিন ঠিক করলেন, তিনজনে মিলে গ্যাংটক যাবেন।

ঘটকর্পরকে সে কথা বলা হল। সে চুপ করে রইল। না বা হ্যাঁ, কিছু বলল না। নীরব, নিশ্চুপ ছেলেকে ভয় করতে শুরু করেছিলেন ঘণ্টাকর্ণ। তাই তিনি যাওয়ার দিনক্ষণ নিজে একাই ঠিক করে ফেললেন। বাড়িতে ফিরে ঘটকর্পরের মাকে সেকথা বলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে বেড়ালের মতন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল ঘটকর্পর।

চমকে উঠলেন দু'জনেই। কেন না, ঘটকর্পর তো কখনও বাবা-মায়ের ঘরে আসে না।

দেওয়ালের দিকে চেয়ে যেন নিজেকে বলছে এমনিভাবে বলে গেল ঘটকর্পর, 'গ্যাংটকে যেদিন যাওয়া হবে, সেইদিন মারাত্মক ধস নামবে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই অনেকে মারা যাবে। চাঁদমারি অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে। তাংচেন, তাডং-এর সব বাড়ি পড়ে যাবে। চাঁদমারির যে হোটেলে ওঠা হচ্ছে, সেই হোটেলের প্রত্যেকের জীবন্ত সমাধি হবে।'

বলে, বেড়ালের মতন নিঃশব্দেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঘটকর্পর। থ হয়ে বসে রইলেন তার বাবা আর মা। বিশেষ করে বাবা। কেননা, তিনিই শুধু জানতেন চাঁদমারির হোটেলে দুটো ঘর নেওয়া হয়েছে। বলতে যাচ্ছিলেন গিন্নিকে, এমন সময়ে ছেলে এসে সব গুবলেট করে দিয়ে গেল।

এর কয়েকদিন পরেই কাগজে বেরল খবর:

গ্যাংটকে ধসে মৃত ৫০, জখম ৬০, জীবন্ত সমাধি ৪০০।

জীবন্ত সমাধির লিস্টে ঘণ্টাকর্ণরা কেউ ছিলেন না। তাঁরা গ্যাংটকে যাওয়া বাতিল করে দিয়েছিলেন।

ঘটকর্পর আর একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। নিঃশব্দে মায়ের সামনে এসে বলেছিল, 'হঠাৎ ব্রেক বসে যাবে, তোমরা দু'জনেই মারা যাবে।'

ভয়ে সিঁটিয়ে গেছিলেন ঘটকর্পরের মা। অদ্ভুত ছেলেকে তিনিও ভয় পেতে শুরু করেছিলেন। গোটা বাড়ির মধ্যে যেন একটা ভূত ঘুরে বেড়ায়। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কবে?'

অনেক... অনেক বছর, এই প্রথম মায়ের চোখে চোখ রেখে বলেছিল ঘটকর্পর, 'সেটা বলা যাবে না। বারণ আছে।'

মাস কয়েক গাড়িতেই চাপলেন না কর্তা-গিন্নি। তারপর একদিন একটা নতুন গাড়ি কিনলেন। শোরুম থেকে গাড়ি এসে পৌঁছল বাড়িতে। দু'জনে গাড়িতে উঠলেন। আগেই জিজ্ঞেস করে নিলেন, ব্রেক ঠিক আছে কিনা। একগাল হেসে ড্রাইভার বললে, 'মারকাটারি ব্রেক।'

রেড রোডে ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার স্পিডে যাওয়ার সময়ে আচমকা ব্রেক মারবার দরকার হল। ব্রেক বসে গেল। ড্রাইভারের বডি কেটেকুটে বের করতে হয়েছিল থেঁতলানো গাড়ির ভেতর থেকে। ঘণ্টাকর্ণ আর তাঁর স্ত্রী স্বর্গে বসে তখন ভাবছিলেন, 'এ ছেলে মানুষ, না, কী?'

ঠিক এই প্রশ্নটাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে ঘটকর্পর জিজ্ঞেস করেছিল নিজেকেই, আমি মানুষ, না, কী?

কারণ, আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়েছে ছ' বছর বয়েসে ব্রেনে চোট লাগবার পর এই প্রথম। বেশ দামি আয়না। একটা সামনে, দু'পাশে দু'খানা। বাঁ আর ডানদিকের চেহারা দেখা যায়।

ঘটকর্পর দেখল তিনরকম চেহারা। সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে, তার চোখের পাতা অনেকখানি নেমে রয়েছে, মাত্র কয়েক মিলিমিটার ফাঁক দিয়ে হয় সে পৃথিবীটাকে দেখছে, অথবা দেখছে না, চেয়ে রয়েছে নিজের ভেতরের দিকে। নীচের ঠোঁট বদখতভাবে ঝুলছে। দাঁত হলদে, সেই ছ'বছর বয়সে বাবা-মায়ের হুকুম মতন দাঁত সে মাজেনি। চিবুকের নিচে থলথলে চর্বি পাটে পাট হয়ে রয়েছে।

বাঁদিক থেকে দেখা যাচ্ছে, তার নাকখানা কাকাতুয়ার চঞ্চুর মতন বেঁকে প্রায় ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে। মাথার লম্বা চুল মেয়েদের লম্বা চুলের মতন পিঠে এলিয়ে রয়েছে,

কারণ সে পরামানিককে পাত্তা দেয়নি তার হুকুমমতন ঘাড় ঘোরাতে হবে বলে। দাড়ি-গোঁফ মুখের অর্ধেক ঢেকে রেখে দিয়েছে।

ডানদিক থেকে মনে হচ্ছে যেন একটা গর্দানমোটা শুয়োর মাথা ঝুঁকিয়ে রয়েছে। শিরদাঁড়া ঘাড়ের কাছ থেকে গোল হয়ে রয়েছে, ছ' বছর বয়স থেকে ঝুঁকে বই পড়ার ফল।

প্রফেসরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঘটকর্পর। প্রফেসরও তাকে ঘুরে-ঘুরে দেখছেন। তারপর বসলেন। ঘটকর্পরকে সামনের চেয়ারে বসালেন। বললেন, 'শুধু তিনদিক নয়, পেছন দিক থেকে তোমাকে দেখতে আরেক রকম। গরিলার মতন।'

ঘটকর্পর কথা বলল না। চোখের দু' মিলিমিটার ফাঁক দিয়ে শুধু চেয়ে রইল। কথা সে বলে না, খুব দরকার না পড়লে। প্রফেসরের কাছে এসে যা বলার দরকার তা বলেছে। এখন শুনছে।

প্রফেসরই বলে গেলেন, 'বাইরের ভাষা তোমার প্রায় লোপ পেতে বসেছে। বাইরের চেহারাটাও নানান চেহারা নিয়েছে, তুমি বলছ, এর ফলে তোমার ভেতরের ভাষা একমুখী হয়েছে, বিবর্তনের পথ বেয়ে সব ভাষা শেষ যে ভাষায় গিয়ে দাঁড়াবে, তোমার মধ্যে সেই ভাষা জেগেছে।'

ঘটকর্পরের মুখে কোনও ভাষা নেই।

'শুধু তাই নয়। তুমি জেনে গেছ, স্মৃতি কোথায় যাচ্ছে, কোথায় জমা থাকছে। মেমারি আজও মিস্ট্রি। গবেষণাই চলছে, সঠিক স্মৃতির আধার কোথায় জানা যায়নি। কেউ বলছেন, ব্রেনের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে হিপোক্যামপাস। মেমারির মানচিত্র বানিয়ে মেমারিকে সংগঠিত করছে এই হিপোক্যামপাস। কিন্তু মেমারি কী দিয়ে তৈরি আজও তা রহস্য। থিয়োরি অগুনতি। কেউ বলছেন, মেমারি সঞ্চিত হচ্ছে ইলেকট্রিকাল চার্জ হিসেবে। কেউ বলছেন, মেমারি হচ্ছে এক ধরনের স্পেশাল মলিকিউল। কেউ বলছেন, ব্রেনের সমস্ত কোষ ধরে রাখছে মেমারিকে। কেউ বলছেন, কিছু মনে রাখতে গেলেই কিছু কোষের কেমিক্যালের গঠন পালটে যায়। এক গবেষক বলেছেন, মেমারির বেসিক ইউনিটের নাম দেওয়া যায় এমনেমন, যার যত এমনেমন আছে, সে তত বেশি মেমারির অধিকারী। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি আর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ছিল এই ক্ষমতা।'

ঘটকর্পর শুধু শ্রোতা।

'ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার পর থেকে তুমি এমনেমোনিস্ট হয়ে গেছ। ফোটোগ্রাফিক মেমারির অধিকারী হয়েছ। কিউনিইফর্ম-এর দুষ্প্রাপ্য ফলকটা তোমার হাতে আসবার পর তুমি জেনে গেছ, মেমারি কোথায় জমা হচ্ছে আর থেকে যাচ্ছে করোটিতে।'

ঘটকর্পর এখন চেয়ে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ধ্যানস্থ।

'অবিশ্বাস্য, যদিও চার-পাঁচ হাজার বছর আগের বই কিউনিইফর্ম যার হাতে লেখা, তিনি করোটির এই ক্ষমতার কথা জানতে পেরেছিলেন। সেইসঙ্গে ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। পৃথিবীর শেষ ভাষা কী হবে, তা জেনে গেছিলেন। দিব্যদৃষ্টি বলে উড়িয়ে দেননি, ব্রেন আর করোটি মিলেমিশে যখন কাজ করে, তখন মুখের ভাষা থাকে না। ভেতরের ভাষা জাগে, সেই ভাষাই শেষ ভাষা। কিউনিইফর্ম-এর মতন অনেক ভাষা আসবে আর যাবে, কিন্তু

এই ভাষা চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি থেকে অন্ত লেখা রয়েছে এই ভাষায়। তিনি সেই ভাষা জেনেছিলেন যেভাবেই হোক, জেনেছ তুমিও, ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে। পরাবিজ্ঞানীরা তোমাকে বলবেন ত্রিকালদর্শী। তুমি বলছ, এটা অপবিজ্ঞান নয়, খাঁটি বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিকরা এখনও ধরতে পারেননি। করোটি নিয়ে তাঁদের রিসার্চ করা দরকার।'

ঘটকর্পর এবার একটু চোখ মেলল। বলল, 'আমার করোটি নিয়ে রিসার্চ করা হবে।'

চমকে উঠলেন প্রফেসর, 'সেকী!'

'আমি দেখতে পাচ্ছি, কে করবে, কীভাবে করবে! সে খুঁজছে কিউনিইফর্ম-এর সেই ফলক। সে ফলক আমি নষ্ট করে ফেলেছি। আমার মেমারি সব ধরে রেখে দিয়েছে। এই করোটি থেকে সেই মেমারি যে উদ্ধার করবে, সে জানতে পারবে ভবিষ্যতে কী ঘটবে— এই পৃথিবীর মানুষের আর দেশগুলোর কী অবস্থা দাঁড়াবে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। চললাম।'

'কোথায়?'

'কবরে।'

ঘটকর্পর যে বিষ্ণুর উপাসক হয়ে গেছে, বিদায়গড়ের বৈষ্ণব আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেছে, প্রফেসরের তা জানা ছিল না। মরে গেলে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা শবদাহ করে না, কবর দেয়। ঘটকর্পরের নিশ্চয় মায়া জন্মেছিল নিজের করোটির ওপর। তাই মরেছে বিদায়গড়ে। কবরস্থ হয়েছে সবার অজান্তে।

'দীননাথ, তমোঘ্ন তোপদার মরিয়া হয়ে গেছে। কঙ্কালের চোরাকারবারি সিন্ধি লোকটাকে দিয়ে ঘটকর্পরের করোটিটা শুধু নিয়ে গেছে। চলো তার বাড়ি যাই।'

'ব্যাবিলন' বাড়িটা খুব উঁচু পাঁচিল আর পাঁচিলের গা বরাবর বড় বড় গাছ-গাছালি দিয়ে ঢাকা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভেতরে রয়েছে জিগুরাট স্থাপত্য অনুকরণে তৈরি বাড়িটা, ধাপে ধাপে তৈরি যেন একটা পিরামিড। সুমেরিয়ানদের তৈরি জিগুরাট-এর একদম ওপরে থাকত দেবতার মন্দির। তমোঘ্ন তোপদারের মন্দির আর ল্যাবরেটরি। ঢোকবার পথ আছে, বেরোবার পথ নেই। জানলা নেই। এয়ারকন্ডিশনার ঠাণ্ডা কনকনে রেখে দিয়েছে ঘর। সিলিং থেকে আলোর ধারা নামছে ঘরের ঠিক মাঝখানে কাচের বাক্সেতে রাখা সেই করোটির ওপর। ঘটকর্পর ঘটকের করোটি শূন্যগর্ভে। চোখ রেখেছি প্রফেসর আর তমোঘ্ন তোপদারের দিকে। আমি রয়েছি ঘরের কোণে। বসে রয়েছি চোরের মতন— প্রফেসরের বডিগার্ড হিসেবে। তমোঘ্নও তাঁর বডিগার্ড রেখেছেন ঘরের আর এককোণে। আগে ছিল ব্ল্যাক কমান্ডো। গায়ের রং যেমন কালো, জামাকাপড়ও তেমনি কালো। কটকট করে সে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। হাতের রিভলভারটাও ফেরানো আমার দিকে। তমোঘ্ন তোপদার লোকটা নেহাতই গোবেচারা। লাটখাওয়া সাদা পাজামার তলায় পায়ের ময়লা গোড়ালি দেখা যাচ্ছে। হাতকাটা পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে লিকলিকে হাত দুটো দু'পাশে ঝুলছে। একমুখ সাদা দাড়ি আর মাথাজোড়া টাক। মুখখানা সরু। এ লোক বড় বৈজ্ঞানিক হলেন কী করে বুঝলাম না।

করোটির নানা জায়গায় লাগানো আটটা ইলেকট্রোড। পেছনে দেওয়ালজোড়া টিভি স্ক্রিনের মতন স্ক্রিন। তাতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাচ্ছে সিগন্যাল, বিচিত্র সংকেত।

করোটির হাড় শব্দসংকেত পাঠাচ্ছে। কিউনিইফর্ম। তমোঘ্ন বললেন, '১৫,০০০ ফলকের অভিধান দেখছি সব মুখস্থ। কিন্তু এই ফলকের মানেই তো বুঝতে পারছি না। একদম অজানা কিউনিইফর্ম।'

প্রফেসর বললেন, 'ঘটকর্পর কিন্তু বুঝেছিল। করোটির স্টোরে ধরে রেখেছিল। এমন কিছু জেনেছিল, যা না জানাই ভাল।'

ঘটনাটা ঘটল ঠিক সেই সময়ে। বোধহয় ইলেকট্রিক চার্জ বেশি হয়ে গেছিল। অথবা কিউনিইফর্ম-এর জমাটশক্তি বিবর্তন-এর শেষ ধাপকে রহস্যে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল। আচমকা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল করোটি। ধোঁয়া বেরতে লাগল করোটি থেকে। সুইচের দিকে ছুটে গেলেন তমোঘ্ন।

তার আগেই ছোট একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একদম পাউডার হয়ে গেল ঘটকর্পর ঘটকের করোটি।

কঙ্গোর বঙ্গোবাবা

লোকটাকে দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। বেঁটে বক্কু অনেক দেখেছি, কিন্তু এইরকম ঝাঁকড়াচুলো দাড়ি-গোঁফওয়ালা মর্কট বামন জীবনে দেখিনি।

ওই তো চেহারা, হাইট বড়জোর চার ফুট, গায়ের রং কালো আবলুশ কাঠের মতোই বাহারে। তার ওপর ঢলঢলে লম্বা কোট-প্যান্ট-টাই না চাপালেই কি চলত না?

তাও এই কঙ্গোর জঙ্গলে? যেখানে দেড়শো ফুট উঁচু গাছপালার ঘন চাঁদোয়া ভেদ করে সূর্যের আলো পর্যন্ত মাটিতে পৌঁছয় না? বারো মাস যেখানে আলো-আঁধারির মায়াময় পরিবেশ?

আধা আলোয় চোখ সয়ে গেছিল বলেই মিশমিশে প্রেতের মতো বাঁটকুল মূর্তিটিকে দেখে চমকে উঠিনি। পরনের ছেঁড়া, ময়লা কোট-প্যান্ট-টাই স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলাম, এমনকী সেলাই আর তালিগুলোও। আরও বিদঘুটে ব্যাপারটাও চোখ এড়ায়নি। হতভাগার কপাল, কান, গলা থেকেও লম্বা লম্বা চুল ঝুলছে।

হঠাৎ ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছিল কদাকার বামনটা। পুব কঙ্গোর ইতুরি অঞ্চলের পঁয়ত্রিশ হাজার পিগমিদের অন্যতম নিশ্চয়। এইরকমই আচমকা ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে আসে ব্যাটারা। প্রাণে ভয়ডর তো নেই,— কুসংস্কার, ভূতপ্রেত, তুকতাক, পিশাচগুরু— এসবের ধার দিয়েও যায় না, আফ্রিকার আদিবাসিন্দা হয়েও।

কিন্তু সাহেব সাজবার শখ হল কেন হতভাগার? আর ওইরকম গা-জ্বালানো হাসি হাসবারই বা কী দরকার ছিল? আমাকে আর প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে দেখে যেন খুশির প্রাণ গড়ের মাঠ!

বামবুতি প্রজাতির এই পিগমিরা মারকুটে হয় না জানি। তাই ইচ্ছে হল, টেনে একটা চড় কষাই। ঝকঝকে দাঁতের খানকয়েক ঘুষি মেরে খুলে আনতেও ইচ্ছে হল।

কিন্তু প্রফেসরের প্রাণেও পুলক জেগেছে দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। ফোকলা দাঁতে ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললেন, 'বঙ্গোবাবা, নমস্কার।'

'নমস্কার, নমস্কার', প্রফেসর, পরিষ্কার বাংলাতেই জবাব দিল উদ্ভট জীবটা।

তবে কি আগে থেকেই ঠিক ছিল প্রফেসরের সঙ্গে বঙ্গোবাবা নামের বিচিত্র লোকটার দেখা হবে? ঠিক এই জায়গায়? তাই তড়িঘড়ি আমাকে প্রফেসর টেনে নিয়ে এলেন

আফ্রিকার এই জঙ্গলে, কোনও কারণ-টারণ না দেখিয়েই? জিজ্ঞেস করে করে মুখের ফেনা তুলে ফেলছি। উৎকট গম্ভীর মুখে উনি একটাই জবাব দিয়ে গেছেন, 'গেলেই বুঝবে।'

যেন একটা বিরাট রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কঙ্গোর জঙ্গলে। রহস্য জিনিসটাকে আমি বড় ভালবাসি কিনা; তাই আমাকে ল্যাজে বেঁধে না নিয়ে গেলেই যেন নয়!

এই রহস্য! একটা মর্কটাকার বেঁটে কালো ভূত কোথাকার! চুল-গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল! ঢিলে কোট-প্যান্টের মিউজিয়াম! এর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলার জন্যে এতটা পথ ঠেঙিয়ে আসা!

রহস্য একেবারেই নেই, তাই বা বলি কী করে? কঙ্গোর এই পিগমিদের রাজত্বে বিটকেল এই পিগমিটার গলায় এরকম বাংলা বুকনি বেরোচ্ছে কীভাবে?

তা ছাড়া, দু'জনেই দু'জনকে চেনে মনে হচ্ছে! প্রফেসর হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়ান, আমিও বলতে গেলে সব সময়েই সঙ্গে থাকি। কিন্তু এই লোকটাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না!

কাজেই চড়চাপটি ঘুষি মারার ইচ্ছেটাকে সামলে নিয়ে জুলজুল করে তাকালাম প্রফেসরের দিকে। ভাবখানা, ব্যাপারটা কী?

প্রফেসরও তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'দীননাথ, আগেভাগে তোমাকে বলিনি, তুমি 'হ্যাক থু' করবে বলে। বঙ্কুকে চিনতে পারছ না?'

'বঙ্কু!' হতভম্ব না হয়ে পারলাম না, 'বঙ্কু আবার কে? এরকম বিদিগিচ্ছিরি লোক—'

'জীবনে দেখোনি,' ভারী মিষ্টি গলায় বললে বঙ্কু ওরফে বঙ্গোবাবা, 'সেইজন্যেই তো কোট-প্যান্ট পরে এলুম গো।' বলে, একটা উচ্চাঙ্গের হাসি দেখাল 'লোকটা, চিরকালই হ্যাক থু করেছ দেখতে খারাপ বলে। কিন্তু এখন?' বলে সদর্পে হাত বুলোল ঝাঁকড়া চুলে, 'চিনতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?'

'বঙ্কু?' প্রাণপণে স্মৃতিশক্তিটা চাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বিড়বিড় করে বলেছিলাম, 'বঙ্কু নামে এক ব্যাটাকে চিনতাম বটে, কিন্তু সে তো—'

'টেকো ছিল, তাই না? কিন্তু গায়ের রং আর হাইটটা আমার মতো ছিল না?'

তীক্ষ্ণ চোখে বঙ্গোবাবাকে দেখতে দেখতে বললাম, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য ছিল। দাড়ি-গোঁফও তো ছিল না। মাকুন্দ নম্বর ওয়ান। বুকে লোম পর্যন্ত ছিল না।'

'তবে দেখো,' বলেই হা-হা করে হাসতে-হাসতে বঙ্গোবাবা কোট-প্যান্ট-টাই খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শুধু জাঙ্গিয়া পরে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল আমাকে ঘিরে, 'দেখেছ? দেখেছ? সারা গায়ে-মুখে-বুকে-মাথায় কীরকম চুল বেরিয়েছে দেখেছ?'

থ হয়ে গেলাম নাচিয়ে বঙ্গোবাবার দেহশোভা দেখে। মাথায় যেরকম চুল, গালে আর চিবুকে যেরকম দাড়ি আর গোঁফ, সারা গায়ে তেমনি লম্বা লম্বা কেশ!

'আমিই বঙ্কু! আমিই বঙ্কু! এখন আমি কঙ্গোদেশের বঙ্গোবাবা!'

প্রফেসর ধরে না ফেললে নির্ঘাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম প্রায়ান্ধকারে ওই মিশমিশে মূর্তির কিম্ভূত নৃত্য দেখে!

'ভাইব্রেশন! ভাইব্রেশন! আর তার সঙ্গে সংখ্যাতত্ত্ব! ব্যাস, দেখতেই পাচ্ছ ভেলকিখানা।

এর মধ্যে ম্যাজিক কিচ্ছু নেই, দীননাথ— স্রেফ বিজ্ঞান—', সযত্নে দাড়ি চুমরোতে চুমরোতে পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরে বসে বললে লোমশ বঙ্কু।

'তার মানে?'—বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। বিস্ময়ের ঘোর তখনও তো কাটিয়ে উঠিনি। ভাইব্রেশন মানে যে কম্পনতরঙ্গ, তা জেনেও স্টুপিডের মতো বলে ফেলেছিলাম, 'তার মানে?'

কীরকম যেন দয়া-দয়া চোখে চেয়ে রইল বেঁটে বঙ্কু, সেই বঙ্কু— যাকে কিনা দেখলেই টিটকিরি দিতাম ছড়া কেটে—

'বঙ্কু তুই কঙ্গো যা, টেকোমাথায় চুল গজা!'

সত্যি সত্যিই কঙ্গোয় চলে এসে টাকে-বুকে-মুখে-গায়ে সব জায়গায় চুল গজিয়ে ফেলেছে বঙ্কু! এরপরেও যদি অবাক না হই, তো হব কিসে?

মুখ্যু বঙ্কু দেখলাম বেশ ইংরেজিও শিখেছে! দয়া দয়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ফিফটি থাউজেন্ড চাইনিজ-সিম্বল দিয়ে নানাধরনের সাউন্ড বুঝিয়েও যা হয় না, মাত্র বাইশটা হিব্রু হরফ দিয়ে তা সম্ভব। যদিও ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখা হত এই ভাষা, ব্যঞ্জনবর্ণের বালাই নেই, কিন্তু ঠিকমতো গুনে গুনে উচ্চারণ করতে পারলে ম্যাজিক ঘটে... ম্যাজিক!'

হাঁ করে চেয়ে রইলাম আমি। বলে কী ব্যাটা বঙ্কু?

'চলে এলুম কঙ্গোয়, মনের দুঃখে। ছড়া কাটতে মনে নেই? ভূগোল-টুগোল তো পড়িনি— ওই একটা দেশেরই নাম জানতুম। বিবাগী হয়ে এলুম সেখানেই। তারপর দেখা হল লোমশবাবার সঙ্গে—'

'লোমশবাবা!'

'হ্যাঁগো। পিগমিরা তাকে ওই নামেই ডাকত। সারা গায়ে ইয়া বড়-বড় চুল। ঠিক আমার মতো। রঙটা খালি সাদা। সাহেব তো। হিব্রু বর্ণমালা নিয়ে রিসার্চ করতে করতে দেখেছিল, প্রত্যেকটা হরফ যেন শক্তিতে ঠাসা। ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারলে ভাইব্রেশনের ভেলকি দেখাতে পারে। গাছপালার বাড় বাড়িয়ে দিতে পারে, আরও অনেক ব্যাপার। সে পরে শুনবে'খন। একদিন হয়েছে কী,' বলে হা-হা করে হেসে গড়িয়ে পড়ল বঙ্কু, 'কোত্থেকে একটা হিব্রু মন্ত্র পেয়ে ১০৮ বার জপ করে দেখছিল সত্যি সত্যিই ভাইব্রেশনের এফেক্ট হয় কিনা।'

'কীসের মন্ত্র?'

'চুল গজানোর। প্রথম প্রথম উচ্চারণ ঠিক হয়নি। তারপর কখন যে ঠিক হয়ে গেছে, নিজেরই খেয়াল নেই। এদিকে ১০৮ বার বলাও হয়ে গেছে মন্ত্রটা— মানে, একটাই শব্দ। ব্যস, আর যায় কোথা!' বলেই আবার হা-হা করে হেসে উঠল বঙ্কু।

'কী হল বলবে তো?' বিষম রাগ হয়ে গেল আমার।

'কী আবার হবে? চুল গজিয়ে চুল, চুল! ভাইব্রেশনের ধাক্কায় চুলের ফলিকল বা খুদে থলির মতো কারখানাগুলোয় হুড়হুড় করে উৎপাদন শুরু হয়ে গেল। ডারমিস থেকে এপিডারমিস ফুঁড়ে চামড়ার ওপর দিয়ে বেরিয়ে এল লম্বা লম্বা চুল। বছরে মাথার এক লাখ

চুল বাড়ে পাঁচ ইঞ্চির মতো, গালের তিরিশ হাজার চুল বাড়ে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চির মতো। কিন্তু ১০৮ বারেরও বেশি মন্ত্রটা ঠিকঠাক উচ্চারণ করে যাওয়ার ফলে এক বছরের কাজ হয়ে গেল একমাসেই। লম্বা চুল শুধু মাথা আর গাল নয়— গা থেকেও এল বেরিয়ে। হা-হা-হা! লোমশ মুনিও নিশ্চয় জানতেন ভাইব্রেশনের এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্র, সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য, তাই না প্রফেসর?'

শুধু একটু মুচকি হাসলেন প্রফেসর।

বঙ্কু আর একটু হেসে নিয়ে বললে, 'লোকের টিটকিরির জ্বালায় সাহেব চলে এল এইখানে। পিগমিরা তার নাম দিল লোমশবাবা। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তার পায়ে ধরে পড়লাম। সাহেব তখন মন্ত্র বলে দিল কানে কানে। বলেছিল, বেশিবার বলিসনি। বুঝেছিস? কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললে বঙ্কু, দীননাথকে ট্যারা করবার জন্যে একটু বেশিবারই বলে ফেলেছিলুম। সাহেব তো রেগে আগুন। বললে, এক জায়গায় দু'জন লোমশবাবা থাকতে পারে না। কারওরই প্রেস্টিজ থাকবে না। বলে সেই যে চলে গেল, আর এল না।'

'প্রফেসর তোমার ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?' এতক্ষণে এলাম আসল কথায়।

উদাস গলায় বললে বঙ্কু, 'সেই সাহেবটারই কাজ নিশ্চয়। তোমার টিটকিরি দেওয়ার কথা তার কাছে বলতাম কিনা, ঠিকানাটাও বলে ফেলেছিলাম নিশ্চয়।'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলাম, 'ইয়ারকি হচ্ছে। ইচ্ছে করে সাহেবকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে, সাহেবের পুরোনো কোট-প্যান্ট পরে আমাকে বেইজ্জত করার মতলব তোমার বার করছি—'

বলেই হাত তুলেছিলাম টেনে চড় কষাব বলে।

গম্ভীর গলায় অমনি বললে বঙ্কু, 'খবরদার, মারধর করতে যেয়ো না। পিগমিরা যদি খবর পায় বঙ্গোবাবা মার খেয়েছে—'

না। মারিনি বঙ্কুকে। উলটে পায়ে পর্যন্ত ধরেছিলাম মন্ত্রটা শিখিয়ে দেওয়ার জন্যে। শয়তানটা আমাকে কিচ্ছু বলেনি, বলেছে প্রফেসরকে।

তিনি তো মুখে চাবি এঁটে বসে আছেন। ভয়ের চোটে নিশ্চয়। লোমশবাবা হয়ে গেলে সমাজে টেকা দায় হবে যে!

টেরা ইনকগনিটো

১ জানুয়ারি ১৯...

ভড়ংবাজ বিশু আজ এসেছিল। ন্যাকা ন্যাকা অনেক কথা বলে গেল। লোকটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না। বিশেষ করে দীননাথ ওকে দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। ভাগ্যিস সে ছোকরা এখন নেই।

গা-জ্বালানো হাসি হেসে হেসে বিশু বলছিল, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আজ ভুবন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

আমি তখন মশা মারার জন্যে কামান দাগা টাইপের একটা দারুণ এক্সপেরিমেন্টের কথা ভাবছিলাম। গোটা পৃথিবীটা জুড়ে এই যে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব আরম্ভ হয়েছে, তার গোড়ায় জল ঢেলে দেওয়ার পরিকল্পনা। সে ব্যাপার আর-এক সময়ে বলব। এখন বলি ন্যাকা বিশুর বোকা বোকা কথাগুলো।

অন্যমনস্ক রইছি দেখে বিশু আবার ঘ্যানর ঘ্যানর করে বলে গেল একই কথা।

আমি একটু রেগেমেগেই বললাম, 'ও ব্যাপারটা আজকে আবিষ্কার করলি নাকি?'

বেমালুম সায় দিয়ে গেল বিশু। সেইরকম বিচ্ছিরি হেসে বললে, 'আমি কি জানতুম? স্যামুয়েল বান্টু ভ্যাড়ভ্যাড় করে বলেছে একই কথা।' আমি বললুম, 'জানি... জানি... জানি—'

ভুরু কুঁচকালাম এতক্ষণে, 'স্যামুয়েল বান্টুটা কোন পয়মাল?'

'হাঃ হাঃ হাঃ! যা বলেছেন দাদু, ব্যাটা একটা পয়মালই বটে। খুমরি দেখলেই বোমকে যাবেন।'

'খুমরি মানে?'

'খুমরি? খুমরি মানে খুমরি', ভীষণ অবাক হয়ে গেল ক-অক্ষর গোমাংস বিশু— 'খুমরি মানে জানেন না? খুমরি মানে... ইয়ে... এই মুণ্ডু... মুখ।'

'বুঝেছি। খুব বিচ্ছিরি বুঝি?'

'কী বলছেন দাদু! ওরকম খুমরি এই পিথিবির কোত্থাও দেখতে পাবেন না। ব্যাটা মর্কটের বাচ্ছা। বলে কিনা, 'সোনাদানা ঘেঁটে-ঘেঁটে আর ইয়েদের উৎপাতে চেহারাটা একটু

শুকিয়ে গেছে বটে, প্রফেসরের এক্সপেরিমেন্ট শুরু হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সোনার খনিতে কাজ করে বুঝি?'

'ওর চোদ্দোপুরুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলেনি। খালি জমিয়ে গেছে। বলে কী, রুপো আর ব্রোঞ্জ আমার পূর্বপুরুষরা ছুঁত না— সোনার কাপে শরবত খেয়েছে, সোনার খাটে শুয়ে পটল তুলেছে। দেদার সোনা পাতালঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে। বান্টু ব্যাটা সেসবের ঠিকানা জানে। যাবেন নাকি, দাদু?'

সোনা খুব বাজে জিনিস। মানুষকে পিশাচ করে দেয়। কিন্তু পাতালপুরীর সোনার খবর শুনে মনটা উসখুশ করে উঠল।

বললাম, 'কেন যাব আমি?'

জুলজুল করে তাকিয়ে রইল বিশু। তারপর চোখদুটোকে আরও গোল করে বললে, 'বেঁটে ভূত! বেঁটে ভূত! সব্বাইকে বেঁটে বানিয়ে ছাড়ছে! আপনাকে দেখলেই নাকি ভূত পালাবে।'

শুনে ভালই লাগল! আমার এলেম তো আমি জানি। ভূতেরাও তা হলে আজকাল আমাকে ডরাচ্ছে।

খুশি খুশি গলায় বললাম, 'দীননাথ আসুক—'

'না... না... না', যেন আঁতকে উঠল বিশু, 'এ যাত্রায় ওকে নাইবা নিলেন... আমাকে দেখলেই তেড়ে আসে—'

বিশুর কাতর মুখ দেখে রাজি হয়ে গেলাম। বারবেল তুলে তুলে দীননাথ বড্ড চোয়াড়ে আর গবেট হয়ে যাচ্ছে। ভূত দেখে যদি তেড়ে যায়?

বললাম, 'তথাস্তু।'

তাই চলে এসেছি দক্ষিণ আফ্রিকার এই আশ্চর্য অঞ্চলে। ডায়েরি লিখে যাচ্ছি দীননাথকে উপহার দেব বলে।

২ জানুয়ারি, ১৯...

কেপটাউনে জাহাজ থেকে নেমে ইস্তক বড় ধকল গেছে। বয়স হয়েছে, শরীর আর সয় না। বিশু অবশ্য জামাই-আদরে রেখেছে আমাকে। তবে গভীর রাতে যখন বিলিতি গাড়িখানা নাচতে নাচতে ঢুকেছিল এই অঞ্চলে, তখন কিছুই দেখতে পাইনি, নিদারুণ অন্ধকার। গাড়ির কাচেও কালো প্লাস্টিক লাগানো। যমপুরীতে এলাম, না, ভূতপুরীতে এলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

গাড়ি থামল। আমিও নামলাম। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, আর একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। কবরখানায় এমনই গন্ধ পাওয়া যায়।

বিশু আমার হাত ধরে নামিয়ে আনল গাড়ি থেকে। কানের কাছে বললে, 'নড়বেন না, দাদু। ওরা এসে নিয়ে যাবে।'

তাই দাঁড়িয়ে রইলাম বিলকুল অন্ধকারে অবিকল প্রেতচ্ছায়ার মতো। বিলিতি গাড়িটা গোঁ গোঁ করে ব্যাক করে বেরিয়ে গেল আলো-টালো না জ্বালিয়েই।

ব্যাপার কী? এরা কি অন্ধকারেও দেখতে পায়?

তা ছাড়া এলাম কোথায়? মাটির ওপরে নিশ্চয় নয়— তা হলে গায়ে খোলা হাওয়া লাগত— আকাশের তারা দেখতে পেতাম। নিকষ এই আঁধার বিরাজ করে শুধু পাতালে... অথবা নরকে।

উদ্ভট এই ভাবনাটা মাথায় এসেছিল নিশ্চয় আমার, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আচমকা চনমনে হয়ে গেছিল বলে।

নারকীয় অভিজ্ঞতা-টভিজ্ঞতাগুলো শুরু হল তো তারপরেই! হঠাৎ থিরথির করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি— তারপরেই হু-উ-উ-শ করে নেমে গেল পাতালে। হেঁচকা টান মেরে বিশু টেনে আনল একপাশে— অন্ধকারেই আওয়াজ শুনে বুঝলাম আজ লিফট উঠে গেল ওপরে।

৩ জানুয়ারি ১৯...

গায়ে-গতরে ব্যথা মিলোতেই গেল এই দুটো দিন। বিশু বোকাটা আমার কাছেই রয়েছে। ভয় পেলেও উজবুকটা সোনার লোভে তোফা মেজাজে আছে।

একটা ব্যাপারে খচখচ করছে মনের ভেতরটা।

যার আমন্ত্রণে এতদূরে এলাম, তাকে আজও দেখিনি। কলকাতাতেও দেখিনি— জাহাজেও দেখিনি, এখানেও দেখছি না।

বিশুকে বলেছিলাম, 'বান্টু আমার সামনে আসছে না কেন?'

একগাল হেসে বিশু বলেছে প্রতিবার, 'নজ্জা পাচ্ছে... নজ্জা পাচ্ছে দাদু। ও খুমরি দেখলেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে আপনার।'

চেহারা দেখাতে যে চায় না, তাকে দেখতে আমারও বয়ে গেছে, তবে হ্যাঁ, এত রহস্য করার পেছনে যে অন্য একটা পৈশাচিক কারণও থাকতে পারে, সেটাও আমার ভাবা উচিত ছিল।

আমরা এখন যেখানে রয়েছি, সে ঘরটা নিঃসন্দেহে মাটির তলায়। জানলা-দরজার বালাই নেই। পাথরের দেওয়াল, পাথরের ছাদ, পাথরের মেঝে। দরজাটা কেবল চকচকে ধাতুর। সোনালি ধাতু। নখ দিয়ে আঁচড়ে সোনা বলেই তো মনে হয়েছে।

ঘরে ইলেকট্রিক আলো আছে। এয়ারকন্ডিশনার আছে। খাট, আলমারি, চেয়ার, টেবিল সবই হালফ্যাশনের। এহেন পাথুরে ঘরের সঙ্গে মানায় না।

এই দু'দিন এনতার খেয়েই যাচ্ছি। খাবারদাবার বিশুই নিয়ে আসে। এ ঘরের সামনেই একটা বড় হলঘর। একদম ফাঁকা লিফট নামিয়ে দিয়ে গেছে এখানে এবং এখানেই কল-পায়খানা। একদিকের দেওয়ালে একটা পেল্লায় দরজা। বিশু গিয়ে এই দরজার সামনে

আফ্রিকান ভাষায় কী যেন বলে। অমনি দরজা খুলে যায়। ও বেরিয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যায়। ফিরে আসে খাবারদাবার নিয়ে।

বিশু গড়গড় করে এই ভাষায় কথা বলতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ভাষা অবশ্য এসেছে ওলন্দাজ ভাষা থেকে। গায়ের রং যাদের সাদা, তারাও কথা বলে আফ্রিকান ভাষায়। ইংরেজিও চলে। দুটোই তো সরকারি ভাষা।

বিশু শিখেছে পেটের দায়ে। নাটালে ইন্ডিয়ান ডেরায় ছিল বহু বছর। ব্যাগার খেটে মরেছে বছরের পর বছর। ভেড়া, ছাগলের চামড়া চালান যায় এখান থেকে 'পার্শিয়ান ল্যাম্ব' আর 'অ্যাংগোরা গোট' নামে। ও সেই কারখানায় কাজ করেছে। জার্মানে গিয়ে জাহাজে চেপে তিমি শিকারও করেছে বিস্তর। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে নতুন সোনার খনিতে কাজ করেছে—সোনার উৎপাদনে কীভাবে ইউরোপিয়ান বাড়তি লাভ হয়ে দাঁড়ায় তাও জানে। কিম্বারলিতে হিরে খনিতে মেহনত করার সময়েই নাকি আলাপ হয় স্যামুয়েল বান্টুর সঙ্গে।

দোস্তি জমেছিল প্রথম দিন থেকেই। তার কারণও আছে। বিশুর বাবা আর মা দু'জনেই ছিল দুটো চলমান আলকাতরার পিপে। বিশু ব্যাটা নিজেও তাই, দেখলে কাফ্রি বলেই মনে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটট বুশম্যান, হ্যামিটিকদের মতোই চেহারা। এক্কেবারে আদিবাসী টাইপ। যেমন হলদে দাঁত, তেমনি শুয়োরের লোমের মতো মাথায় চুল। গায়ের রং দেখলে ভূতেও লজ্জা পায়।

বান্টু সম্প্রদায় অবশ্য এই তিন আদিবাসীকে হটিয়ে দিয়েছে। স্যামুয়েল বান্টু এই সম্প্রদায়ের মানুষ।

বড় রহস্যময় মানুষ। আমার খবর আগে থেকেই জানত। তারপর কিম্বারলিতে বিশুর কাছে আমার ফলাও বৃত্তান্ত শোনার পর থেকে আঠার মতো ওর পেছনে লেগে আছে। মুড়িমুড়কির মতো টাকাপয়সা উড়িয়েছে। বিশুকে নিয়ে কলকাতায় এসে সোনার আর ভূতের লোভ দেখিয়ে আমাকে এনে ফেলল এমন একটা পাতালপুরীতে, যেখানে মড়ারা থাকলেই বুঝি মানায়।

থাকে কি না কে জানে। রাতদুপুরে বিশ্রী বিকট গন্ধটা অত উৎকট হয়ে ওঠে কেন? বন্ধ সোনার দরজার ওদিকে অত খসখস-খড়মড় আওয়াজ শোনা যায় কেন? কারা অমন চাপা গলায় কথা বলে?

কাল বাকি রাতটা ঘুমোতে পারিনি। ভোরের দিকে বিটকেল গন্ধ পাতলা হয়ে গেল খসখস-খড়মড় আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই।

দীননাথকে সঙ্গে আনলে ভাল হত। মাথামোটা হলেও ছোকরা পাশে থাকলে বুকে বল পাই।

৪ জানুয়ারি ১৯...

নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল বিশু। হিরে, সোনা, তিমি, ছাগল, ভেড়া নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি করেছে যে ওকে আর ঠিক মানুষ বলাও চলে না।

ঠেলে তুললাম ঘড়িতে ছ'টা বাজতেই। বললাম রাতদুপুরের গা-কাঁপানো গল্প। ও তো শুনেই হেসে গড়িয়ে পড়ল। খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে বললে, 'ওরা যে আপনার সামনে আসতে নজ্জা পাচ্ছে দাদু।'

'কারা?'

'স্যামুয়েল-এর সাঙ্গপাঙ্গরা।'

'স্যামুয়েলকেই দেখলাম না—'

'স্যামুয়েল আজকেই আসবে।'

'এই দুটো দিন কেন আসেনি?'

'তোড়জোড় করছিল যে।'

'কীসের তোড়জোড়?'

'ভূতগুলোকে দেখাতে হবে তো আপনাকে।'

'ভূত?'

'ভূত দেখবেন বলেই তো এসেছেন। ওদের আবার সব জায়গায় দেখা যায় না। বান্টুর ইচ্ছে দু'-একটাকে খাঁচায় ধরে নিয়ে আসবে।'

'খাঁচায় করে ভূত আনবে!'

'অত অবাক হবেন না, দাদু। ভূত না দেখলে ভুতুড়ে রোগের ওষুধটা বের করবেন কী করে?'

'ভুতুড়ে রোগটা তো—'

'বেঁটে হয়ে যাওয়া। স্যামুয়েলকে দেখলেই বুঝবেন কীরকম বাঁটকুল-বাবা হয়ে গেছে বেচারা। ওই... ওই... এসে গেছে, স্যামুয়েল।'

সোনার দরজার ওপারে শুনলাম খুব মিষ্টি গলায় কে যেন 'বিশু' 'বিশু' করে ডাকছে। তারপরেই ক্যাঁচক্যাঁচ করে খুলে গেল সুবর্ণ কপাট। এবং...

স্যামুয়েল বান্টুর কিম্ভুত মূর্তি দর্শন করে চক্ষু চড়কগাছ করে ফেললাম।

৫ জানুয়ারি ১৯...

গতকাল স্যামুয়েল অনেক কথা বলে গেল।

ওকে দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেছিলাম। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলাম। চোখের পাতা ফেলতে পারিনি।

তারপর মনে পড়ল বাক্সটার কথা। বিশুর নিত্যসঙ্গী সেই বাক্স, লম্বায় আর চওড়ায়

একফুট, হাইটে দেড় ফুট। ডালায় অজস্র ফুটো। আংটা লাগানো। বিদঘুটে সাইজের এই বাক্সকে কখনও হাতছাড়া করেনি বিশু। কলকাতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা— এতটা পথ নড়া ধরে বাক্স নিয়ে এসেছে।

সেই বাক্স এখন কোথায়?

এ ঘরে নেই। বিলিতি গাড়ি থেকে নামবার সময়ে অন্ধকারে খেয়াল করিনি বাক্স হাতে ঝুলছিল কিনা। কিন্তু এই পাতালঘরে আশ্চর্য সেই বাক্স নেই!

না থাকারই কথা। বাক্সর মালিক তো এখন আমার সামনেই।

বাক্স রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেতেই খ্যাঁচ করে খিঁচড়ে গেল মেজাজটা। বুরবক বুরবক ভাবটাও নিশ্চয় চোঁ চাঁ পালিয়েছিল চোখ-মুখ থেকে।

বলেছিলাম কড়া গলায়, 'ইয়ারকি হচ্ছিল?'

দাবড়ানি খেয়ে নিমেষে চুপসে গেল স্যামুয়েল। দ্যাখন হাসি উবে গেল মুখাবয়ব থেকে।

বললে তোতলাতে তোতলাতে মিকি-হাউস ভয়েসে, 'ই-ই ইয়ার্কি কেন?'

'বাক্সর মধ্যে অ্যাদ্দিন থাকা হয়েছিল তো বলা হয়নি কেন আমাকে?'

'ই... ই... ই...' একদম কথা আটকে গেল স্যামুয়েলের! ভীতুর ডিম কোথাকার। এতক্ষণে বুঝলাম দীননাথকে কেন সঙ্গে নিতে চায়নি বিশু। স্যামুয়েলকে নিয়ে নির্ঘাত লোফালুফি করত সকাল-সন্ধে, ঠিক যেভাবে ডাম্বেল ছুড়ে ছুড়ে লুফে নেয়।

কাষ্ঠ হেসে ব্যাপারটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করল বিশু, 'দাদু, গুগলিকে দেখলে কারবার কেরোসিন হয়ে যেত বলে বলিনি।'

'কারবার কেরোসিন! মানে?'

'হিঃ হিঃ! দাদু যেন কী! রস ল্যাঙ্গুয়েজ একদম বোঝেন না। গুপ্ত ব্যাপার ভেস্তে যেত না? অত অয়েলিং জলে যেত।'

'অয়েলিং! কাকে?'

'হেঃ হেঃ! আপনাকে দাদু, আপনাকে। আপনি না এলে এ গিঁট খুলবে কে?'

ভয়ানক রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। বিশু ব্যাটা যে এত বজ্জাত, তা তো জানতাম না। ক্রোধে কথা বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে রইলাম নিশ্চয় জ্বলন্ত চোখে।

তাই দেখে দোরগোড়া ছেড়ে গুটিগুটি ঘরের ভেতরে এল আশ্চর্য জীব স্যামুয়েল। মাথায় দেড়ফুট— একটা দু-পাওলা গোসাপ বললেই চলে। ওইটুকু বডিতে কোট প্যান্ট টাই আর টপ হ্যাট দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। খুদে হলেও নিখুঁত কাটিং। মায় পায়ের জুতোটা পর্যন্ত জেল্লা মারছে কালো হিরের মতো। আর একটু কাছে আসতেই জুলপি, দাড়ি, আর গোঁফ দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। ফুস করে রাগ উড়ে গেল। হেঁট হয়ে শেষকালে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে গুলি গুলি চোখে (নিশ্চয় চোখের অবস্থা ওইরকম দাঁড়িয়েছিল তখন) চেয়ে রইলাম গুগলি স্যামুয়েলের চিবুক আর দাড়ির দিকে।

একে কি দাড়ি বলে? এ যে আঁশ। খুব শক্ত কালো আঁশ যেন কালো গ্রানাইট পাথর কেটে কেটে পরিপাটিভাবে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। নাকের নীচে, ঠোঁটের নীচে, জুলপির নীচে!

আমার চোখের এক ফুট তফাতে ঝিলমিল করতে লাগল গুগলি স্যামুয়েলের কালো চশমা। লিলিপুটিয়ান চশমা। ছোট ছোট কালো কাচের আড়ালে যে চাহনি-আভাস দেখলাম, তা ঠিক মানবিক বলে আমার মনে হয়নি। নইলে আচমকা গা শিরশির করে উঠবে কেন?

দীননাথ থাকলে অপকর্মটা করে বসত তক্ষুনি। একটানে চশমা খুলে নিয়ে দেখত চোখের চেহারা, মণির আকৃতি...

গুগলি স্যামুয়েল আমার মনের ভাবনা যেন আঁচ করেই অদ্ভুত লাফ মেরে পেছিয়ে গেল দরজার কাছে।

বললে অবিকল মিকি-মাউস ভয়েসে, 'টাচ করবেন না, বডি টাচ করবেন না... চশমায় হাত দেবেন না।'

'কেন বৎস, কেন?' বললাম সুমধুর কণ্ঠে।

'এখনও সময় হয়নি।'

'এখনও হেঁয়ালি?'

'চটবেন না, প্রফেসর, চটবেন না। আমার ভাঙা ভাঙা বাংলা শুনে বুঝছেন তো, অনেক সময় নিয়েছি নিজেকে তৈরি করতে, আপনাকে সব বলব বলেই তো এত মেহনত করলাম, এই গ্যাঁড়াকল থেকে মুক্তির পথ বাতলাতে পারেন শুধু আপনি। প্রফেসর, প্লিজ, ধৈর্য ধরুন।'

স্তব্ধ হল মিকি-মাউস ভয়েস! আমি হাঁটু গেড়ে বসেই বিষম বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইলাম দেড়ফুট হাইটের প্রাণীটার দিকে। কী বলব একে? মানুষ? অমানুষ? না মর্কট?

বাবু হয়ে মেঝেতে বসে পড়েছিল বিশু। কালো মুখে খ্যাঁকশিয়ালের হাসি (ভুল লিখলাম না তো? খ্যাঁকশিয়াল কি হাসতে পারে? দীননাথ এডিট করে দেবে'খন)।

ঠিক এই সময়ে তুরুক লাফ দেখাল মর্কট-মানুষ স্যামুয়েল। প্রথমবার একলাফে পেছনে পেছিয়ে গেছিল পাক্কা ছ' ফুট— এখন দশফুট লম্বা লাফ মেরে টুপ করে এসে বসল বিশুর কোলের ওপর, বিপুল আদরে দু'হাতে ওকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল বিশু।

হাড়-পিত্তি জ্বলে গেলেও মিছরির রসে ভেজানো গলায় বললাম, 'অহো! অহো! এরকম লং জাম্প বিশ্বের কেউ দেখেনি।'

'দেখবে কী করে?' ভাঙা ভাঙা বাংলায় গুগলি স্যামুয়েল বলে গেল বিশুর কোলে বসে, 'বেঁটে হওয়ার কত যে অ্যাডভান্টেজ, তা শুধু আমিই বুঝছি। হাড়ে হাড়ে বুঝছি।'

শেষ কথার সুরটা একটু যেন কেঁপে গেল। আমার মনটাও দুলে উঠল। মেঝেতে বসে পড়লাম পা মুড়ে।

বললাম, 'হাড়ে হাড়ে বুঝছ?'

'শুধু হাড়ে হাড়ে নয়, রক্তমাংস মেদমজ্জা, সবকিছু দিয়ে বুঝছি। আপনার হাইট কত, প্রফেসর?'

'আমার? তা আর কত... ১৮০ সেন্টিমিটার বলেই তো জানি।'

'খুবই টল, অ্যাভারেজ বেঙ্গলিদের চেয়ে টল তো বটেই... আপনার শরীর অনুপাতে ব্রেনের ওজনটাও তাই একটু বেশি, ঠিক কিনা?'

উৎসুক চোখে চেয়ে রইলাম গুগলি মর্কটের দিকে। বিটলেটা অনেক খবর রাখে মনে হচ্ছে। কিন্তু আরও কী জানে, তা পেট থেকে বের করা দরকার।

বললাম ন্যাকা ন্যাকা গলায়, 'তাই নাকি? তাই নাকি? ব্রেনের ওজনের সঙ্গে হাইটের সম্পর্ক আছে নাকি?'

কালো চশমার আড়ালে একজোড়া কালো পুঁতির ওপর পলক পড়ছে না মনে হল। নির্নিমেষ চাহনি নিবদ্ধ আমার ওপর, আবার আমার লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় বিচিত্র শিহরন অনুভব করলাম।

বললে গুগলি মর্কট, 'না যদি থাকত, আপনার সঙ্গে আমার এভাবে মোলাকাত ঘটত না। প্রফেসর, আজকের আড্ডা নিছক আড্ডা বলে মনে করবেন না। খানকয়েক সিরিয়াস প্রবলেম আর ফ্যানটাসটিক ফ্যাক্ট থ্রো করছি আপনার সামনে। ভাবুন এবং মতামত দিন।'

'জো হুকুম।'

ব্যঙ্গকণ্ঠ শুনেও পুঁতিচক্ষুর পলক পড়ল না। সাপের চোখ নাকি রে বাবা।

বললে গুগলি মর্কট, 'মানুষের বাচ্চার ব্রেনের ওজন জন্মের সময়ে যা থাকে, প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার তিনগুণ বাড়ে। কারেক্ট?'

'অ্যাবসলিউটলি', বললাম আমি, 'মেয়েদের ব্রেন-ওয়েট অবশ্য—।'

'চিরকালই কম থাকে। ও প্রসঙ্গ বাদ দিন। প্রফেসর, গত কয়েক প্রজন্ম ধরে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে আমাদের এই ছোট্ট প্রজাতির মধ্যে। জন্মের সময়ে ব্রেনের ওয়েট যা থাকে, বড় হলে তার ছ'গুণ বাড়ছে।'

সোজা হয়ে বসলাম আমি, 'গোলার্ধ দুটো সমান আছে তো?'

এবার মনে হল কালো কাচের আড়ালে পুঁতি-চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, 'না। ঠিক পয়েন্টে চলে এসেছেন। ব্রেনের বাম-গোলার্ধ লেখাপড়া আর কথার জন্যে দায়ী। এই গোলার্ধটা তেমন বাড়ছে না।'

কথা লুফে নিয়ে আমি বললাম, 'ডান-গোলার্ধ দায়ী কল্পনাশক্তির জন্যে, বাড়ছে ব্রেনের এই অংশ?'

'ইয়েস প্রফেসর ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্যা প্রবলেম।'

'বটে! বটে! বটে!' বলে চোখ বন্ধ করে আলোর গতিবেগে ফটাফট কয়েকটা পয়েন্ট ভেবে নিলাম। চোখ খুলে বললাম, 'বেঁটে হওয়া শুরু হয়েছে কি একই সঙ্গে? মানে, ব্রেনের ওয়েট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে?'

'দ্যাটস রাইট।'

'ফাইন। ফাইন। ফাইন।'

গুগলি মর্কটের কণ্ঠস্বর এবার একটু তিক্ত শোনাল, 'এত খুশি হচ্ছ কেন?'

'বেঁটে হওয়ার অনেক সুবিধে তো নিজেই তো বললে একটু আগে।'

'লং জাম্পের সুবিধে একটু আছে বইকী।'

'আরও আছে বৎস, আরও আছে। আমার সিকি হাইট এখন তোমার, ফলে খাবার আর অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে গেছে চারগুণ— কারেক্ট?'

'ইয়েস, প্রফেসর, ইয়েস।'

'তোমার শরীরের অনুপাতে যতটুকু খাওয়া দরকার, খাচ্ছ তার চারগুণ। এইটাই তো প্রবলেম?'

'এগজ্যাক্টলি। রাক্ষসের মতো খেয়ে চলেছি, এত খাবার জোটাই কোত্থেকে?'

'অ্যাডভানটেজগুলো খতিয়ে দেখলে ও প্রবলেম কিছুই না। দৌড়োচ্ছ আটগুণ বেশি স্পিডে, পাহাড়ে উঠছ অথবা সিঁড়ি ভাঙছ আটগুণ বেশি গতিবেগে, বেঁটে হওয়ার অনেক সুবিধে হে, অনেক সুবিধে।'

'প্রফেসর!'

'আছে, আছে, আরও সুবিধে আছে। আমি আমার শরীরের অনুপাতে খুব জোর একজনকে কাঁধে তুলতে পারব, তুমি পারবে চারজনকে। অবশ্যই তোমার মতো বেঁটে চারজনকে।'

'মানছি, প্রফেসর, মানছি—'

তেড়েমেড়ে বলে চললাম, 'বেঁটে হওয়ার ফলে হাড়গোড় কত মজবুত হয়ে যায় বলো? আটগুণ বেশি চোট পেলেও ভাঙে না। তাই তোমার সাইজের দশজনকে কাঁধে চাপালেও তোমার হাড় ভাঙবে না, তোমার ওজনের চারগুণ ওজনের গাড়ি-পাথর-গুঁড়ি টেনে নিয়ে গেলেও হাড়ে ফ্র্যাকচার দেখা দেবে না। ছ' ফুট হাইট থেকে আমি লাফিয়ে নামলে আমার কিছু থাকবে না, তুমি কিন্তু বারো ফুট হাইট থেকে লাফিয়ে নেমে এলেও থাকবে বহাল তবিয়তে। কম নয় হে, কম নয়, বেড়াল-টেড়ালের এমনি ক্ষমতা থাকে।'

'প্রফেসর... প্রফেসর...'

'আহা... আহা... সুবিধেগুলোর ফর্দ শুনতে ভাল লাগছে না কেন? বেঁটে হলে নার্ভ কমিউনিকেশন কত বেড়ে যায় বলো তো? পেশির ক্ষমতাও বাড়ছে বলেই তো অমন চমৎকার লাফ মারতে পারছ। এত প্রাণবন্ত, এত চটপটে, এত ছটফটে বেঁটেদের অথবা বাঁদরদের অনেক কদর সার্কাসে। আমি লাফিয়ে পেরিয়ে যাব একটা চেয়ার, তুমি পেরোবে একটা আলমারি, যা হাইট তোমার, তার ছ'গুণ তো বটেই...'

'মাই ডিয়ার প্রফেসর—'

'ওয়েট, ওয়েট লিটল ম্যান, আমার হাতে ছোড়া পাথর যাবে খুব জোর ষাট ফুট, মানে, আমার হাইটের দশগুণ, তোমার হাতে সেই পাথরই যাবে তোমার যা হাইট, তার চল্লিশগুণ দূরে—'

'প্লিজ প্রফেসর—'

'ওয়েট, মাই চাইল্ড, ওয়েট... কত সুবিধে বেঁটে হওয়ার বলো তো? তোমার ওই হাতে তলোয়ার ঘুরবে চারগুণ ঘন ঘন, হাতুড়ি পড়বে চারগুণ ঘন ঘন, ঘুষি মারবে চারগুণ ঘন ঘন... অহো! অহো! অহো!'

'আপনি পাগল!'

'লোকে তাই বলে। বয়ে গেল। কিন্তু তোমাদের সুবিধেগুলো বিচার করো আগে। সাঁতার কাটা তোমাদের কাছে এখন ছেলেখেলা, জলের পোকার মতো সাঁতরাবে অনায়াসে—

হাত-পা চলবে তো এখন চারগুণ ঘন ঘন। ইস! কী আরাম! ঠিক যেন মানুষ-মাছি!'

বিশুর কোল ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বেঁটে স্যামুয়েল। আমিও তিড়িং করে দাঁড়িয়ে উঠে গড়গড়িয়ে বলে গেলাম, 'সবচেয়ে বড় সুবিধে কী জানো? এই পৃথিবীর গ্র্যাভিটি তোমাদের চট করে কাহিল করতে পারে না। তোমরা অনেক বেশি এনার্জেটিক, অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল, অনেক বেশি সুইফট— ঠিক কি না? মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে ব্রেনের ডান-গোলার্ধ বেশি বড় হওয়ায়। টপ হ্যাট-টা খুলবে স্যামুয়েল? দেখি কতটা ফুলেছে কপাল?'

এক ঝটকায় টপ হ্যাট খুলে দূরে নিক্ষেপ করল স্যামুয়েল।

ডান কপালের আবটার দিকে তাকিয়ে যতটা না অবাক হলাম, তার চাইতেও বেশি হলাম মাথাজোড়া আঁশ দেখে।

বললাম মুগ্ধ কণ্ঠে, 'কী সুন্দর! কী সুন্দর!'

'সুন্দর!' স্যামুয়েল এবার ভড়কে গেছে মনে হল।

'সুন্দর না? এমন ঢিপি-কপাল যার— সে তো ইমাজিনেশনের মাস্টার— কল্পনার জাদুদণ্ড তার হাতের মুঠোয়— লেখাপড়ায় গবেট হতে পারো, কথা বলায় আকাট হতে পারো, কিন্তু কল্পনা... কল্পনা... শ্রেষ্ঠ শিল্পীও তোমাদের দেখলে ঈর্ষায় জ্বলে যাবে, স্যামুয়েল।'

'ঈর্ষণীয় ব্রেনস্ফীতি, তাই তো?'

'অবশ্যই, অবশ্যই... কিন্তু মাথাজোড়া এত আঁশ এল কোত্থেকে হে? গালচাপাটি আঁশগুলোও তো মানুষের মুখে মানায় না। কেরাটিন-গ্রোথ অ্যাবনরম্যাল হয়ে গেছে, তাই না? চুল-টুল সব শক্ত চামড়া হয়ে গিয়ে নখের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। দেখি-দেখি হাতের নখ দেখি... আরেব্বাস! এ যে রেগুলার ট্যালন... নখী-প্রাণীদের মতোই শিকারি নখ বেরিয়েছে... স্যামুয়েল... স্যামুয়েল... তুমি মানুষ তো?'

কালো চশমার আড়ালে পুঁথি-চোখদুটো এবার কালো আগুন ছড়িয়ে গেল যেন। বেঁকে গেল হাতের লম্বা লম্বা ছুঁচলো নখ।

বিকৃত হয়ে গেল মিকি-মাউস ভয়েস, 'জবাবটা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে, প্রফেসর।'

বলে তড়াক করে লাফ দিয়ে বিশুর কোলে গিয়ে উঠল বেঁটে মর্কট এবং আমার পানে জ্বলন্ত চাহনি নিক্ষেপ করে বিশু ওকে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল বাইরে।

৬ জানুয়ারি ১৯...

দুই মক্কেলই ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে যেতেই দীননাথ হতভাগার জন্যে বড্ড মন কেমন করে উঠল আমার। উদ্ভট যত অ্যাডভেঞ্চারে ওই ছোকরাই তো আমার চিরকালের সঙ্গী। ব্রেন-ওয়েট ওর নেহাতই কম, কিন্তু বডি-ওয়েট তো আছে...

বিশু নচ্ছার খুবই প্যাঁচে ফেলেছে। ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে সোনালি দরজাটা বন্ধ

করে দিতে ভোলেনি। গুটিগুটি এগিয়ে গিয়ে আলতো চাপ দিলাম পাল্লায়।

দরজা খুলল না। জোরে ঠেলা মারলাম, তাও খুলল না। বুঝতে আর বাকি রইল না এখন থেকে আমি কয়েদি— এই পাতালঘরে। ফুরফুর করে এয়ারকন্ডিশনার চলছে, ঘরের মধ্যে মিষ্টি সুবাস ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আরামের ঘাটতি নেই। নেই কেবল স্বাধীনতা।

মিষ্টি সুবাসটা একটু একটু করে কমে যাচ্ছে না? এ সুগন্ধ এয়ারকন্ডিশনারের সুগন্ধ। কিন্তু এখন যে গা-গুলোনো গন্ধটা নাড়িতে পাক দিতে শুরু করেছে... এ গন্ধ আমার অপরিচিত নয়।

মাঝরাতে এমনি বোঁটকা গন্ধ ভেসে এসেছিল দরজার ওপার থেকে। সেই সঙ্গে খড়মড় খচমচ কড়মড় আওয়াজ।

ঠিক এই দুর্গন্ধ স্যামুয়েলের গা থেকেও বেরোচ্ছিল, তখন অতটা আমল দিইনি।

তবে কি ওর জাতভাইরা আসছে দলে দলে আমাকে ছিঁড়ে খাবে বলে?

খটমট খটমট খটাখট আওয়াজ বেড়েই চলেছে ওদিককার হলঘরে। চাপা ঘরে গুমগুম করে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। কাতারে কাতারে খুরওলা প্রাণী যেন গুঁতোগুঁতি দাপাদাপি করছে।

খাটে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছি কী করা যায়, এমন সময়ে দড়াম করে খুলে গেল সোনালি দরজা।

ফ্রেম জুড়ে আবির্ভূত হল বদমাশ বিশু। কেলেকুচ্ছিত মুখখানায় ভাসছে ষড়যন্ত্রী কুটিল হাসি।

আমি কিন্তু হেঁট হয়ে ওর দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে তাকিয়েছিলাম হলঘরের জীবগুলোর দিকে।

এক থেকে দেড় ফুট হাইটের অসংখ্য অমানুষ গিজগিজ করছে ঘরের মধ্যে। তাদের প্রত্যেকেই এক-একটা দু'পেয়ে গোসাপ বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। দরজার সামনেই যারা গুঁতোগুঁতি করছে, আমি শুধু তাদেরকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম।

এরা মানুষ না অমানুষ, চট করে তা বলা মুশকিল। আকৃতিতে প্রতিজনই স্যামুয়েলের সংস্করণ। মাথাভর্তি কালো আঁশ। জুলপি বেয়ে দু' গাল আর চিবুকেও ছড়িয়ে পড়েছে সেই আঁশ এবং ঘাড়-গলা বেয়ে বুক-পিঠ-কোমর-উরু-পা-হাত সর্বত্র কুচকুচে আর চকচকে হয়ে রয়েছে কালো আঁশে। দু' হাতের দশখানা আঙুলের দশখানা নখ শ্বাপদ প্রাণীর নখের মতোই তীক্ষ্ণ, ধারালো এবং যেন রক্তলোলুপ। সবচেয়ে কিম্ভূত ওদের পা। গোরু-ছাগল-ঘোড়া-গাধা-হরিণ-বাইসনের মতো খুরওলা পা— তবে সে খুরের প্রতিটিতে পাঁচটা ভাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ পাঁচখানা আঙুল এখন পাঁচখানা খুর হয়ে জুড়ে গিয়ে এক হয়ে গেছে।

এদের কারও পরনে বস্ত্র নেই। স্যামুয়েল অত কোট প্যান্ট টাই হাঁকিয়ে এসেছিল তা হলে এই কারণেই... আঁশওলা কৃষ্ণকান্ত অবয়ব দেখাতে চায়নি বলে।

আমি অবাক হলাম না, ভয় পেলাম না, শুধু কৌতূহলী হলাম। কৌতূহল তুঙ্গে উঠল ওদের চোখ দেখে। চকচকে গোল পুঁতি। চোখের পাতা পড়ছে পিটপিট করে। নাকের

জায়গায় দুটো ফুটো আছে বটে— কিন্তু বাঁশির মতো নাক তো নয়, বিলকুল চ্যাপটা।

মাথার আর গালের আঁশ কপালের ওপর নেমে এসে দু'চোখ আর নাকের ফুটো ঘিরে ধরে রীতিমতো অমানুষিক আকার এনে দিয়েছে কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীগুলোকে।

হেঁট হয়েই বিশুর পায়ের তলা দিয়ে ঘাড় লম্বা করে আরও একটা প্রত্যঙ্গ দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না।

বিড়বিড় করে বললাম আপন মনে, 'সেটা নেই, অথচ...'

'অথচ কী?' কর্কশ গলায় বললে বিশু।

'দেখতে মারমোসেট-দের মতো।'

'মারমোসেট?'

'নামটা প্রথম শুনলি তো?' বললাম মিষ্টি গলায়, 'শুনলে আর এদের দলে ভিড়তিস না।'

'মারমোসেট কে?' রুক্ষ কিন্তু কৌতূহলী স্বর বিশুর— ওর পেছনে ঘরভর্তি জীবগুলো শুধু খুর ঠুকছে খটাখট শব্দে, বড্ড অসভ্য, বড় ছটফটে, কথা বলতেও দেবে না।

বললাম, 'এই পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট্ট বাঁদর।'

'বাঁ... বাঁদর!'

'হ্যাঁ, বাবা, খুদে বাঁদর। বেশিরভাগ মারমোসেট মাথায় আট ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না, ল্যাজটা হয় কিন্তু বারো ইঞ্চি লটপটে। পিগমি মারমোসেটও আছে, মাথায় ছ' ইঞ্চি ল্যাজ আট ইঞ্চি। কিন্তু ওদের আদিনিবাস তো দক্ষিণ আমেরিকায়। ব্রেজিলের উপকূলে, প্যারাগুয়ের সীমান্তে, আমাজনের অববাহিকায় পিলপিল করছে। মরতে এখানে এল কেন?'

বিশু বললে দাঁত কিড়মিড় করে, 'বাঁদর নয় বলে।'

'ঠিক, ঠিক। বাঁদর হলে তো এদের লম্বা ল্যাজ থাকত। চামড়া আঁশ হয়ে যেত না। তবে এরা কারা?'

'সেইটা বোঝবার জন্যে আর তার বিহিত করার জন্যেই আপনার আগমন।'

'ও... ও... ও। এইজন্যেই আমার আগমন! কিন্তু ওরা অত খুর ঠুকলে কথা বলব কীকরে? কপালগুলো তো সবই দেখছি ডানদিকে ফোলা— মারমোসেটরাও অবশ্য রীতিমতো মগজওলা বাঁদর। ওদের ব্রেনের ওয়েট জানিস?'

'ব্রে—'

'হ্যাঁরে গবেট, হ্যাঁ ব্রেন। ওজন মুখস্থ রাখতে না পারিস মনে রাখিস রেশিয়োটা।'

'রে... রে...।'

'রেশিয়ো— মানে অনুপাত। কোন প্রাণী কতটা বুদ্ধিমান তা এই অনুপাত থেকেই জানা যায়। দাঁড়া... দাঁড়া... অত লাফাসনি... ব্রেন-ওয়েটের সঙ্গে স্পাইন্যাল কর্ডের রেশিয়ো বেড়ালের ক্ষেত্রে চার, বাঁদরের ক্ষেত্রে আট, মানুষের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ, আর... আর মারমোসেটদের ক্ষেত্রে আঠারো। কী বুঝলি?'

জবাবটা এল স্যামুয়েলের মিকি-মাউসের ভয়েস থেকে, এখন অবশ্য সেটা মাঙ্কি ভয়েস বলেই মনে হল।

দরজার আড়াল থেকে সে বললে, 'ষাট।'

'অ্যাঁ!' সত্যি সত্যি চমকে উঠলাম আমি, 'মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান, অথচ অমানুষের মতো চেহারা!'

'প্রফেসর, চেহারার ঘাটতি আমরা ব্রেন ক্যাপাসিটি দিয়ে পূরণ করে নেব। সেইজন্যেই তো আপনাকে—'

'জামাই আদরে রাখা হয়েছে। বৎস স্যামুয়েল, সামনে এসো বাবা, আড়ালে থাকলে কি কথা হয়? একটুও রাগিনি আমি... বাঃ বাঃ! কী সুন্দর দেখতে তোমাকে বলো তো? চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে... বলো, কী করতে হবে আমাকে।'

খুরওলা পায়ে জুতো পরার জন্যেই টলে টলে চৌকাঠে এসে দাঁড়াল স্যামুয়েল।

আমি বললাম, 'ওহে গোবিন্দ—'

'গোবিন্দ মানে?'

'ওটা আদরের নাম। তোমার ওই স্যাঙাতদের বিদেয় হতে বলবে? গন্ধে যে টেঁকা যাচ্ছে না।'

ঘাড় ঘুরিয়ে মাঙ্কিনিনাদ ছাড়ল স্যামুয়েল। নিমেষে প্রবল খুরধ্বনি তুলে ঘর ফাঁকা করে দিল আজব প্রাণীর দঙ্গল।

আমি অমায়িক হেসে বললাম, 'এসো, এসো, হে উন্নত মারমোসেট, বলো এ হাল হল কেন তোমাদের?'

টুপ করে লাফ মেরে বিশু-পাজির কোলে উঠে পড়ল স্যামুয়েল। বললে, 'প্রথমেই বলে রাখি, দক্ষিণ আমেরিকার মারমোসেটদের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের কোনও সম্পর্ক আছে বলে আমার জানা নেই। দ্বিতীয় কথাটা এই, দরজাটা দেখেছেন?'

'সোনা দিয়ে তৈরি তো?'

'খাঁটি সোনা। আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্রোঞ্জ আর রুপো দু' চক্ষে দেখতে পারত না। সারাজীবন সোনার জিনিস নিয়েই কাটায়, মরার পরেও কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা নিয়ে চলে যেত কবরখানায়—'

'জ্যান্ত মড়া হয়ে?'

'খুব যে ইয়ারকি মারছেন! দেখবেন সেই সোনার স্তূপ?'

'দেখব বলেই তো এসেছি এতদূর।' একগাল হেসে আমি বললাম, 'সোনা আমি খুব ভালবাসি।'

৭ জানুয়ারি ১৯...

দেখলাম বটে সোনার পাহাড়। মাটির ওপরে নয়, মাটির তলায়। এ খবর যদি সোনালোভী দেশগুলো পায়, ছারখার করে দেবে মর্কটদের এই আস্তানা।

আমাকে ওরা নিয়ে গেল চাকাওলা গাড়িতে চাপিয়ে। ছ'খানা চাকা লাগানো গাড়ি।

গাড়ি টেনে নিয়ে গেল কুকুর সাইজের খুদে প্রাণী। কুকুর তারা নয়, কেননা পায়ে খুর আছে। অতীতে ঘোড়ার ছিল খুব ছোট্ট, তখন তাদের নাম ছিল ইওহিপ্পাস। এরা কি সেই ইওহিপ্পাস? এত লক্ষ বছর পরে?

প্রশ্নটা আঁচ করে নিয়ে বললে স্যামুয়েল, (গাড়িতে আমার পাশেই বসেছিল ও আর বিশু)— 'প্রফেসর, যে ঘনঘটার পর থেকে আমাদের এই হাল হয়েছে, সেই একই কারণে এ তল্লাটে সমস্ত ঘোড়া এই সাইজ নিয়েছে, বংশপরম্পরায়।'

'বাচ্চারা ছোট্ট হয়ে জন্মেছে?'

'হ্যাঁ, আর আমরা হয়েছি এইরকম। বহু প্রজন্মের ফল।'

আমাদের খুদে ঘোড়ায় টানা গাড়ি তখন ছুটে চলেছে অদ্ভুত হলুদ পাথুরে জমির ওপর দিয়ে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, বিলিতি গাড়ির টায়ার ফেটে যাবে বলেই এহেন অশ্বশাবকের আয়োজন করেছে স্যামুয়েল অ্যান্ড বিশু কোম্পানি (প্রাইভেট লিমিটেড নিশ্চয়!)। হাওয়ায় উড়ছে হলদে বালি উঁচু-নিচু টিলা হলুদ আভা ছড়িয়ে বিস্তৃত দিগন্ত পর্যন্ত। সূর্য এখানে গনগনে সোনার থালা হয়ে ঝুলছে মাথার ওপর।

অনেক দূরে, দিগন্ত জুড়ে, কালো ধোঁয়ার মতো দেখা যাচ্ছে বন-জঙ্গলের মাথা। আমরা চলেছি ওইদিকেই।

বললাম, 'ঘনঘটা-টা কী?'

'বাপ-ঠাকুরদার মুখে মুখে যা শুনেছি, তাই বলছি। ব্যাঙের ছাতার আকারের বিশাল একটা মেঘের পুঞ্জ ভেসে এসে দাঁড়িয়ে গেছিল এখানে এই তল্লাটে।'

'ব্যাঙের ছাতার মতো মেঘ! সে তো নিউক্লিয়ার-এক্সপ্লোশনের পর দেখা যায়।'

'প্রফেসর, এ-ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন পৃথিবী জানত না অ্যাটমবোমা কাকে বলে।'

'তবে সে ছাতা এল কোত্থেকে?'

'কেউ জানে না। কেনই বা ভেসে এসে এখানে দাঁড়িয়ে গেল, তাও কেউ জানে না। মেঘলোকে গিয়ে ঠেকে থাকত নাকি ছাতার মাথা। প্রায় পাঁচ মাইল উঁচু।'

'পাঁ-চ মাইল!'

'বর্ণনা শুনে শুনে আমাদের কল্পনাশক্তিকে আর উন্নত মেধাকে কাজে লাগিয়ে হাইট-টা বের করেছি আমি। প্রফেসর, অদ্ভুত সেই মেঘ মাসকয়েক ঠায় দাঁড়িয়েছিল এই অঞ্চল জুড়ে। অন্ধকার হয়ে গেছিল চারদিক, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাত, লকলকে শিখা নেমে আসতে মাটিতে।'

'ইলেকট্রিক ট্রিটমেন্ট'— বিড়বিড় করে বললাম আমি।

'কেন?' প্রশ্ন করে স্যামুয়েল।

'ট্রিটমেন্ট না বলে এক্সপেরিমেন্টও বলতে পারো। ল্যাবরেটরিতে তো তাই হয়।'

'ধোঁয়ার থামটা তা হলে ল্যাবরেটরি?'

'মনে তো হয়।'

'কার?'

'হয় প্রকৃতির, না হয়... না হয়...' আমতা আমতা করে গেলাম আমি।

‘পাঁচ মাইল উঁচু ব্যাঙের ছাতা একটু একটু মিলিয়ে গেছিল, এখানেই— তারপর... তারপর... বাচ্চাকাচ্চাদের মধ্যে দেখা গেল অদ্ভুত বিদঘুটে পরিবর্তনগুলো।’

‘মিউটেশন,’ আবার বিড়বিড় করে বলে গেলাম আমি।

‘জানি, জানি, মিউটেশন না ঘটলে, কোষবিকৃতি না ঘটলে এমনটা হবে কেন... রেডিয়ো অ্যাক্টিভিটি তো ছিলই সেই মেঘের মধ্যে... ছিল আরও কিছু—’

‘হ্যাঁ, ছিল, আরও কিছু,’ ফের স্বগতোক্তি করে গেলাম আমি।

মাঙ্কি-ভয়েস নিনাদিত হতে গিয়েই সংযত হয়ে গেল। মোলায়েম গলায় বলে গেল স্যামুয়েল, ‘ওই মেঘ আসার আগে বড় দুর্ধর্ষ ছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা... যাযাবর যোদ্ধা। ছত্রিশ জাতের মিশেলে, অনেক ধরনের রক্তের সংমিশ্রণে সে এক আশ্চর্য বেপরোয়া প্রজাতি। অসম্ভব নিষ্ঠুর, অবিশ্বাস্য নির্দয়, অপরিসীম নির্মম। যাযাবর ছিল বলেই কোথাও দু’দিনের বেশি মন টিকত না, বাড়ি ঘরদোর শোবার জায়গা— সব ঘোড়ার পিঠে... বুনো ঘোড়াকে বশ মানিয়ে ছুটে যেত পাহাড় প্রান্তর জঙ্গল পেরিয়ে... দেশের পর দেশ লুঠ করত, জ্বালিয়ে দিত, শ্মশান করে দিত... সোনার ওপর ছিল প্রচণ্ড লোভ... ঘোড়ার পিঠে সোনার গাঁটরি চাপিয়ে ফিরে আসত এই অঞ্চলে। বুনো ঘোড়া গিজগিজ করত এখানে... সংগ্রহ করত নতুন ঘোড়া... আর সোনাদানা লুকিয়ে রাখত মাটির তলায় কবরখানায়... ওই দেখুন একটা কবরখানা।’

পুঁচকে হাত তুলে যে দিকটা দেখাল স্যামুয়েল, সেদিকে কবরখানার মতো কিছু দেখতে পেলাম না। সাঁচীর স্তূপের মতো একটা পেল্লায় টিলা— ছোটখাটো একটা পাহাড় বললেই চলে। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। হলুদ পাথর দিয়ে তৈরি। ঠিক যেন একটা হলুদ গামলা উপুড় করে রাখা হয়েছে। কিনারা ঘিরে পাথুরে রাস্তা।

‘এর নাম কবরখানা?’ বলেছিলাম আমি।

‘এরকম বিস্তর কবরখানা আছে এ তল্লাটে। অবিকল টিলা বা ন্যাচারাল টিলার মতো দেখতে। লুঠের সোনা জমতে জমতে একটা সময় এল যখন পূর্বপুরুষদের মধ্যে চারটে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, মজুর, চাষি, যাযাবর যোদ্ধা আর রাজসম্প্রদায়। শেষের দল বুদ্ধির জোরে অন্যদের রেখে দিল মুঠোর মধ্যে। এরা যখন মারা যেত, রাজ্যের সমস্ত সোনাদানা গলিয়ে তাল পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখা হত টিলার নীচে পাতালঘরে, যার তলায় শোয়ানো থাকত রাজার মোমমাখানো দেহ, তার আগে অবশ্য নাড়িভুঁড়ি বের করে মশলা মাখানো নানান গাছগাছড়া ঢুকিয়ে দেওয়া হত পেটের মধ্যে, যাতে শরীরটা নষ্ট না হয়ে যায়। এইভাবেই দূর দূর অঞ্চল থেকে সোনার খনি, তোষাখানা, রাজপ্রাসাদ লুঠ করে সোনার পাহাড় বানানো হয়েছে প্রত্যেকটা টিলার তলায়। আসুন, এই তো ঢোকবার দরজা।’

কোথায় দরজা? ছ’চাকার গাড়ি তুরুক নাচ নাচতে নাচতে এসে দাঁড়িয়েছে টিলা থেকে প্রায় একশো গজ তফাতে ফাঁকা জায়গায়। দরজা এখানে কোথায়?

আমি ইতিউতি চেয়ে অদৃশ্য কপাটের ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে ঠক ঠকাং ঠক ঠকাং আওয়াজ শুনলাম ছ’চাকা গাড়ির তলার দিকে।

শাখামৃগ-লম্ফ দিয়ে গাড়ি থেকে ভূতলে অবতীর্ণ হল স্যামুয়েল। বিশু আমাকে বললে, 'নেমে আসুন দাদু।'

নেমে এসে জমিতে হাঁটু গেড়ে বসতেই হল, নইলে তো দেখতেই পেতাম না কী কাণ্ড চলছে গাড়ির তলায়।

যেন মন্ত্রবলে পাথুরে জমিতে একটা চতুষ্কোণ গর্ত দেখা দিয়েছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার ওপর। গর্তের কিনারায় দেখতে পাচ্ছি নখরযুক্ত পাঁচ-পাঁচ দশটা আঙুল। একটু পরেই টুক করে লাফ দিয়ে নখী-আঙুলের অধিকারী উঠে এল বুঝি পাতাল ফুঁড়ে।

আর এক না-মানুষ! দেড় ফুট চিড়িয়া! আভূমি নত হয়ে সেলাম ঠুকল স্যামুয়েলকে। রাজা-বাদশার মতো সতেজ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইল স্যামুয়েল। এ সম্মান যেন ওর বাপ-পিতামহ ওর জন্যে গচ্ছিত রেখে গেছে।

বললে আমাকে, 'আসুন।'

'কোন চুলোয়?'

'গর্তের মধ্যে। আঁতকে উঠছেন কেন? চোর-ছ্যাঁচোড়দের ভড়কি দেওয়ার জন্যে কবরখানার গায়ে দরজা রাখা হয়নি। দরজা রয়েছে এতদূরে। ট্র্যাপডোর মাকড়শা যেরকম সিন্দুকের ডালার মতো দরজা বানিয়ে বিবরে লুকিয়ে শিকার ধরে, আমাদের সান্ত্রি সেইভাবে গর্তে সেঁধিয়ে ধনপতির ধনদৌলত আগলায়, আসুন, ভয় নেই।'

ভয় কাউকেই করি না। ভয়ের পাঠশালাতেই পড়িনি। সুতরাং বুকে হেঁটে গাড়ির তলা দিয়ে প্রথমে গর্তের কিনার থেকে ভেতরে উঁকি দিলাম। সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে। এবং কী আশ্চর্য! বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে চাতালে চাতালে!

'ইলেকট্রিসিটি! এই পাতালে!'

আমার বিস্ময়োক্তি শুনে ঈষৎ খেঁকিয়ে বললে স্যামুয়েল, 'ঢুকুন না চটপট, কে কখন এসে যাবে, দেখে ফেলবে।'

মরকটের খিঁচুনি শুনলে দীননাথ নির্ঘাত লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে ছাড়ত। ভাগ্যিস ওকে আনিনি!

সড়াত করে বুকে হেঁটে গিয়ে প্রবেশ করলাম পাতালপথে। আমার পেছনে সটাসট নেমে এল অন্য তিনমূর্তি। ঘটাং ঘট শব্দে বন্ধ হয়ে গেল সিন্দুকের ডালা। আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল চাতালের বিদ্যুৎবাতি।

কিন্তু সত্যিই কি বিদ্যুতের আলো? খটকা লাগল মনে। এরকম দপদপ করছে কেন? হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দেখলাম প্রকৃতির আর-এক বিস্ময়।

গ্যাস-ম্যান্টলের মতো মস্ত একটা সাদা ফানুসের মধ্যে গিজগিজ করছে আলোর পোকা। জোনাকি জাতীয় পোকা। ফানুসটায় অসংখ্য ফুটো। লালা দিয়ে তৈরি নিশ্চয়।

অধীর স্যামুয়েল ভাল করে দেখতেও দিল না। তাড়া লাগাল পেছনে। তাড়া খেয়ে দুড়দুড় করে নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে এঁকেবেঁকে। চাতালের পর চাতাল পেরিয়ে ধকধকে আলোর শোভা দেখতে দেখতে। তারপর এসে পড়লাম টানা লম্বা সুড়ঙ্গপথে। প্রায় দশ ফুট হাইট, চওড়াতেও তাই। নিস্তব্ধ পাতালপথে বিচিত্র পদধ্বনির সঙ্গে আমার আর বিশুর

জুতোর মশমশানি মিশে গিয়ে। সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে চলে এল মড়াদের থাকার জায়গায়। অজস্র সুড়ঙ্গে গোলকধাঁধা ছড়িয়ে গেছে দিকে দিকে। পায়ের তলায় দু'পাশে সোনার তাল যেন ঢেলে রাখা হয়েছে। গর্ত ক্রমশ সংকীর্ণ হচ্ছে সোনার স্তূপের জন্যে। ফানুস-পোকাদের অবিরাম কেরদানির ফলে হলুদ আলোর আশ্চর্য রোশনাই ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি সুড়ঙ্গের মধ্যে। পথ-প্রদর্শক চিড়িয়াটা ঠিক পথেই নিয়ে এল আমাদের গামলা-কবরখানার ঠিক তলায়। এখানে এসে বুঝলাম, বাইরে থেকে যে-টিলা দেখেছি আসলে তা একটা গম্বুজের ছাদ, টিলার গড়নে তৈরি করা, যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে। গম্বুজের তলায় এখন আমরা পৌঁছেছি। সুবিশাল এই কবরখানার ছাদ ঠেকে রয়েছে অনেকগুলো মোটা মোটা থামের ওপর। অসংখ্য ফানুস-পোকাদের ঘাঁটি ঝলমল করে রয়েছে গোটা পাতালকন্দরে। দেখা যাচ্ছে একটা সোনার পাহাড়, সোনার ডেলা দিয়ে তৈরি পাহাড় মেঝে থেকে উঠে গিয়ে ঠেকেছে গম্বুজের ছাদ পর্যন্ত। হাজার হাজার বছর ধরে লুণ্ঠিত হলুদ ধাতুকে গলিয়ে তাল পাকিয়ে জমিয়ে রাখা হয়েছে প্রকাণ্ড এই পাতালসিন্দুকে।

বিমূঢ় কণ্ঠে বলেছিলাম, 'কবরখানায় কবর কোথায়?'

ফিসফিস করে স্যামুয়েল বলেছিল, 'সোনার তালের তলায়, তার সারা গায়ে সোনার গয়না। যখ হয়ে সে আগলাচ্ছে এই সোনা। কিন্তু আমরা কাজে লাগাব এই সোনাকে, তাই আপনাকে ছলনা করে নিয়ে এসে দেখলাম, কীভাবে স্বপ্ন সম্ভব করব আমাদের।'

ঘুরে দাঁড়ালাম। স্যামুয়েলের এই ফিসফিসানির মধ্যে চাপা ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম। ওর কালো চশমা পরা চোখদুটো এখন যেন ধকধক করে জ্বলছে ফানুস-পোকাদের জ্বলন্ত বাল্‌বের মতো। ঘাড় হেঁট করে দেড় ফুট চিড়িয়ার চশমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলাম, কী সেই স্বপ্ন?

নারকীয় এই মতলবটা আমাকে বলবার জন্যেই স্যামুয়েল নিয়ে এসেছিল পাতালপুরীতে। অস্বাভাবিক এই পরিবেশে কল্পনাতীত কুটিল ষড়যন্ত্রটা ততটা অস্বাভাবিক মনে হবে না, যতটা হত দিনের আলোয় মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে শুনলে। কুচক্রীর প্ল্যানে ফাঁক নেই কোথাও। থমথমে মৃত্যুপুরীতে ঝকঝকে হলুদ আলোর মাঝে দাঁড়িয়েও শোনাল ওর পৃথিবীর রাজা হওয়ার স্বপ্ন!

বর্বর ছিল ওর পূর্বপুরুষেরা, ছিল লুঠেরা যাযাবর। রক্তের দোষ যাবে কোথায়? অব্যাখ্যাত ধোঁয়ার মতো কোষে-কোষে বিকৃতি এনে ওদের নাটা চিড়িয়া বানিয়ে দিয়ে গেছে, মস্তিষ্কের কোষে-কোষেও এনেছে উন্মাদ কল্পনা আর আকাঙ্ক্ষা। বাদশা হবে গোটা দুনিয়ার। দুরন্ত কল্পনাশক্তি ওদের শক্তি জুগিয়ে যাবে, ইন্ধন জোগাবে এই স্বর্ণস্তূপ। এরকম স্তূপ আরও আছে এই অঞ্চলে। স্যামুয়েল ধনরক্ষক রাজা সম্প্রদায়ের বংশে জন্মেছে বলেই ঠিকানাগুলো শুধু সেই জানে। তাতার, মোঙ্গোল, চেঙ্গিস খান, নাদির শা লজ্জা পেয়ে যাবে যখন শুরু হবে তার পৈশাচিক নৃত্য, সমগ্র মেদিনী জুড়ে শরীরের অনুপাতে বড় মগজের আজ তার সম্প্রদায়, এই পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব। বুদ্ধি যার, বল তার— এই নীতি অনুসরণ করলে সসাগরা ধরণীরও অধীশ্বর তো স্যামুয়েলদেরই হতে হবে।

কীভাবে?

অতি সহজে।

পারমাণবিক শক্তি আর তো গুপ্ত রহস্য নয়। প্রকাশ্যে এবং গোপনে প্রলয়ঙ্কর এই মারণ বিদ্যাকে রপ্ত করেছে বহু দেশ এবং বহু বৈজ্ঞানিক। টেররিস্টরা কি বেশ কয়েকটা শহরে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ঘটানোর হুমকি দিয়ে অর্থ রোজগার শুরু করে দেয়নি?

স্যামুয়েল অ্যান্ড কোম্পানি নেবে সেই একই পথ। বিশ্বভ্রমণ করে এসেছে এই মতলবেই। পৃথিবীজোড়া হামলা শুরু করবে ওর বর্বর যাযাবর পূর্বপুরুষদের মতো অশ্বপৃষ্ঠে নয়, শুরু এবং শেষ হবে আকাশপথে।

স্টার ওয়ার্স। নক্ষত্র যুদ্ধ। মারণরশ্মি নেমে আসবে আকাশ থেকে। কে না জানে আজকের স্যাটেলাইটগুলোর সত্তর শতাংশ স্পাইগিরি করে চলেছে? হাবল টেলিস্কোপ শূন্যে উড়ে গিয়ে শুধু কি দূরবিন কষছে অন্য ছায়াপথগুলোর দিকে?

স্যামুয়েলদের হাই-এনার্জি বীম নেমে আসবে আকাশ থেকে। ম্যাপ অনুযায়ী পলকে পলকে মানুষশূন্য হবে এক-একটা শহর। নিউট্রন বস্তুটা তো ধ্বংস করবে না— শুধু মানুষ মারবে। কোনও প্রাণীই রেহাই পাবে না।

রেহাই পাবে শুধু স্যামুয়েল অ্যান্ড কোম্পানি— পঁচিশ ফুট পুরু কংক্রিট আর পাথর দিয়ে তৈরি পাতালঘরে থেকে। নিউট্রন, গামা রে, এক্সট্রা গামা রে ঢুকতে পারবে না সেখানে। ঘণ্টাখানেকেই শ্মশান হবে ধরিত্রী।

পূর্বপুরুষদের স্বপ্নকে করাল রূপ দেবে তাদের বেঁটে বংশধররা।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কি হাত মেলাবেন এই মাস্টার প্ল্যানে?

সব শুনে পুলকিত হেসে বললাম, 'ভাববার সময় দাও।'

দূরের সেই জঙ্গলের দিকে যেতে যেতে স্যামুয়েল বললে, 'প্রফেসর আপনাকে আর-একটা কথা বলা হয়নি।'

কবরখানার সোনার সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। নাচিয়ে অশ্বশকটের ওপর কোনওমতে বসে থেকে বললাম, 'কী কথা?'

'সোনা তো দেখলেন। ভূত দেখবেন না?'

'ভূতেদের উৎপাতেই তো তোমরা চিমড়ে হয়ে গেছ শুনেছিলাম— এখন তো শুনলাম, ভূত নয়। ভুতুড়ে ধোঁয়ার থামই সেজন্যে দায়ী।'

স্যামুয়েল বললে, 'ওটা বিশুভাইয়ের মস্করা। ভুতুড়ে ধোঁয়ার থাম এ অঞ্চলের সব প্রাণীদেহেই অল্পবিস্তর মিউটেশন ঘটিয়েছে, বুনো ঘোড়াদের চেহারা দেখেই বুঝছেন।'

'কিন্তু গাছপালাগুলো দেখছি দেদার লম্বা হয়েছে। জঙ্গলের কিনারায় এসে গেছিলাম বলেই দেখতে পাচ্ছিলাম আকাশছোঁয়া গাছের সারি। এত উঁচু আর এত ঝাঁকালো গাছ তো কোনও জঙ্গলেই দেখিনি। প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য নাকি?'

স্যামুয়েল বললে, 'এই জঙ্গলের অধিপতি যারা ছিল তারাও বেধড়ক লম্বা। দৈত্য বললেই চলে।'

ঘাড় ফেরালাম, 'বলছ কী! একই ভুতুড়ে থাম দু'রকম কাজ করে গেল?'

'এক্সপেরিমেন্ট... প্রফেসর... এক্সপেরিমেন্ট... ট্রিটমেন্টও বলতে পারেন। বাপ-ঠাকুরদার

মুখে শুনেছি। ইঞ্চি তিন-চার লম্বা খুদে বাঁদর ছেয়েছিল এই জঙ্গল। আজ তাদের হাইট কতটা জানেন?'

'ওই... ওই... দেখুন... এক ব্যাটা উঁকি মারছে।'

অকস্মাৎ স্যামুয়েলের গলা দিয়ে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসতেই চমকে ওর চাহনি অনুসরণ করে তাকিয়েছিলাম ডানদিকের জঙ্গলের দিকে। দেখলাম, সেদিকের আকাশছোঁয়া গাছগুলো খুব নড়ছে আর দুলছে... এর বেশি আর কিছু দেখতে পেলাম না।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে স্যামুয়েলের কালো আঁশ ভরা মুখ। হাতে একটা খুদে পিস্তল— মশার রিভলভারের মতো দেখতে। নলচেটা যা একটু বেশি লম্বা।

'কী এটা?' তারস্বরে শুধিয়েছিলাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে খামচে ধরেছিলাম স্যামুয়েলের হাত।

আমার শক্ত কবজির সঙ্গে পারবে কেন স্যামুয়েল? আজব হাতিয়ার খসে পড়ল হাত থেকে। কুড়িয়ে নিয়ে আমি বললাম, 'কী এটা?'

ছিনিয়ে নিতে গেল স্যামুয়েল। হাত উঁচু করে ধরে রাখলাম ওর নাগালের বাইরে। বললাম, 'কী এটা?'

দাঁত কিড়মিড় করে স্যামুয়েল বললে, 'রে-গান।'

'কোত্থেকে পেলে?'

'টেররিস্টদের কাছ থেকে।'

'লেজার রশ্মি বেরোয়?'

'হ্যাঁ।'

'কাকে মারতে যাচ্ছিলে?'

'ওই দৈত্যটাকে।'

'কেন?'

'আপনাকে দেখাব বলে... দু'দিন ধরে চেষ্টা করেও একটাকেও দেখতে পাইনি, মেরে খাঁচায় পুরে নিয়ে যেতাম, আপনাকে দেখাতাম... আমাদের পয়লা নম্বর শত্রুর ব্রেন নিয়ে গবেষণা শুরু করতেন।'

'শত্রু! কেন?'

'ওদের ব্রেন আমাদের চেয়েও বড়।'

'কী করে জানলে?'

'জানি... জানি... প্রফেসর আমি জানি... ওদের ব্রেনের ক্যাপাসিটি অন্য ধরনের... অদ্ভুত ক্ষমতা... ঠিক বলে বোঝাতে পারব না... দূর থেকে মাথার মধ্যে কথা ছুড়ে দিতে পারে।'

'মাথার মধ্যে কথা ছুড়ে দিতে পারে! ওরা মুখে কথা বলে না?'

'না। মুখের কথা তো বর্বরদের হাতিয়ার— ওরা তার অনেক ঊর্ধ্বে।'

'অনেক ঊর্ধ্বে! তবুও চাও ওদের খতম করতে?'

'আমাদের চাইতে বেশি ব্রেন-ওয়েট যাদের, তাদের কাউকে টিকিয়ে রাখব না।'

'আমাকে?'

'শরীরের অনুপাতে আপনার ব্রেন-ওয়েট কি আমার চাইতে বেশি?'

'না, তা অবশ্য নয়, তবে কী জানো, ব্রেন সাইজ আর ইনটেলিজেন্সের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই— ধারণাটা এক্কেবারে ভুল।'

'ভুল!'

'পুরুষদের ব্রেন তো সবসময়েই মেয়েদের ব্রেনের চেয়ে বড়।'

'শরীরের অনুপাতে তো বড় নয়।'

'রাশিয়ান লেখক ইভান তুর্গেনেভ-এর ব্রেনের ওজন ছিল ২.০১ কিলোগ্রাম। ফরাসি লেখক আনাতোল ফ্রান্স-এর ব্রেনের ওজন ছিল তার অর্ধেকের একটু বেশি— ১.০১৭ কিলোগ্রাম। দু'জনের মধ্যে প্রতিভার ফারাক কি ছিল? শরীরের ফারাকও কি লক্ষণীয়?'

মুখে কথা জোগালো না স্যামুয়েলের। আর ঠিক তখনই লম্বা লাফ মেরে আমি গিয়ে পড়লাম গাড়ি থেকে নীচে এবং টেনে দৌড়লাম জঙ্গলের দিকে— হাতে রইল লেসার রশ্মির বন্দুক।

বিশু ব্যাটাচ্ছেলে দৌড়য় ভাল। ধর ধর তেড়ে এসে আমাকে যেই ক্যাঁক করে ধরতে যাচ্ছে ঠিক তখনই মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

৭ জানুয়ারি ১৯...

জঙ্গলে বসে এই ডায়রি লিখছি। স্যামুয়েল অ্যান্ড কোম্পানি ভেগে পড়েছে। আমাকে পায়নি। আমি তখন জঙ্গলে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম চোঁ চোঁ করে খুদে ঘোড়ায় টানা গাড়ি চেপে পালিয়ে গেল তিনজনে।

আকাশছোঁয়া গাছগুলোর আড়ালে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখা দেবেও না। কথাও বলছে না। কথা বলতে ওরা জানে না। অথবা বলতে চায় না। কিন্তু ব্রেন-পাওয়ার বড় রহস্যময়। আমার ব্রেনে ধাক্কা মেরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল, বিশু চোট পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। শুধু বিশু নয়, মরকুটে দুই স্যাঙাতও।

তবু ওরা ওদের ক্ষতি করেনি। আমাকে শুধু তুলে এনেছে। প্রাণে বাঁচিয়েছে। দেশে ফিরিয়ে দেবে বলেছে। কীভাবে তা বলছে না। এখানেও একটু রহস্য আছে মনে হচ্ছে।

ব্রেনে ব্রেনে কথা বলা ভারী মজার ব্যাপার। আমি শুধু ভেবেছি কী বলব, আর ওরা তার জবাব দিয়ে গেছে আমার ব্রেনের মধ্যে কথা ফুটিয়ে দিয়ে।

ওরা বলেছে, স্যামুয়েল অ্যান্ড কোম্পানির পৈশাচিক পরিকল্পনা ওরা পণ্ড করে দেবেই, স্রেফ দূর থেকে ব্রেন ফোকাস করে। ওদের কুটিল কল্পনা মোড় নেবে অন্যদিকে। পৃথিবী সুন্দর সবুজই থাকবে, বৈচিত্র্যের সমাহার থাকবে, যেমন ছিল, যেমন আছে, তেমনি থাকবে— অমানুষদের নৃত্য এখানে চলবে না। কারণটা আমিও জানতাম। ওরাও জানে।

ব্রেনের ওজন কম থাকায় পিগমি স্যামুয়েলদের মনের জোর অনেক কম, যুক্তি জোরালো নয়। বেশি বেঁটে হওয়ার একটাই বিপদ।

ওরা ওদের কায়া দেখতে চায় না, সহ্য করতে পারবে না বলে। ধোঁয়ার থাম কোত্থেকে এই অঞ্চলে এসেছিল, তা ওরা জানে, কিন্তু বলবে না। কিছু রহস্য পৃথিবীর লোকের অজ্ঞাতেই থাকুক।

যেমন অজ্ঞাত থাকুক এই অঞ্চল— টেরা ইনকগনিটো হয়ে থাকুক বিশ্ববাসীর কাছে।

ঘুম আসছে কেন?...

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯...

ঠিক একমাস পরে শেষ করছি দিনপঞ্জি। একমাস আগে ডায়েরি লিখতে লিখতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওরাই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপর দীননাথকে এনে দিয়েছিল পাশে।

হতভাগা পয়লা নম্বর টিকটিকি। লুকিয়ে সটকান দিয়েছিলাম কলকাতা থেকে, কিন্তু খুঁজে খুঁজে চলে এসেছিল সেই জাহাজে চেপেই, যার মধ্যে ছিলাম আমি আর বিশু।

তারপর খেই হারিয়ে ফেলেছিল বেচারি। এই এরা... বিশাল জঙ্গলের অদৃশ্য মহাকায়রা... ব্রেন ফোকাস করে ওকে নিয়ে এসেছিল আমার পাশে।
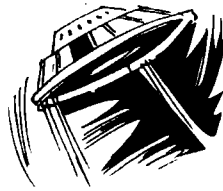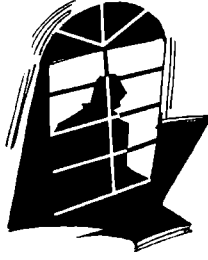
কাঁকড়া

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র খুব বিরক্ত হলেন।

আমি বললাম, 'নিজের চোখে দেখলাম। আমি কি মিথ্যে বলছি?'

প্রফেসর বললেন, 'আমার মাথায় এখন কুপার বেল্ট ঘুরছে। কাঁকড়া নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।'

রাগ হয়ে গেল আমার, 'কুপার বেল্ট রয়েছে প্লুটো গ্রহের ওপাশে, ঠান্ডা বরফের জগৎ; আর কাঁকড়া ঘুরছে আপনার বাড়ির দেওয়ালে।'

বাড়ির দেওয়ালে কখনও কাঁকড়া ঘোরে না। কাঁকড়া টিকটিকি নয়।

ঠিক এই সময়ে টেলিফোন এল আমেরিকা থেকে। প্রফেসর কিড়মিড় করে কিছুক্ষণ ইংরেজি-টিংরেজি বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। গুম হয়ে রইলেন।

আমি বললাম, 'হল কী?'

প্রফেসর বললেন, 'দেখো, দীননাথ, তোমার এই ব্যাড হ্যাবিটটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। যখন চিন্তা করব তখন কথা বলবে না।'

চুপ করে রইলাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলাম। ঠিক তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ড পর ধ্যান ভাঙল প্রফেসরের। বললেন, 'কাঁকড়া দেখেছ? দেওয়াল বেয়ে উঠছে?'

'আপনার বাড়ির পেছন দিকে। যেখানে কেউ থাকে না। শুধু জঙ্গল।'

'তুমি ওদিকে গেলে কেন?'

'কট-কট-কট-কট আওয়াজ শুনলাম যে। ঠিক যেন তাসার বাজনা। খট-খট-খটাস... খট-খট-খটাস...।'

'শুনেছি শুনেছি, তুমি সেই আওয়াজ শুনে দৌড়লে?'

'নিশ্চয়। এত বড় বাড়ি... আপনার ঠাকুরদার তৈরি... জঙ্গল তো ঘিরে ফেলছেই... আপনিও ঘরে ঘরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন... কে কোথায় ঢুকে বসল, দেখতে হবে না?'

'কাঁকড়া! কাঁকড়া!' বলে চুপ মেরে গেলেন প্রফেসর। মুখ দেখে বেশ বুঝলাম অন্য কথা চিন্তা করছেন। আমিও চুপ করে রইলাম। ঘর নিস্তব্ধ।

খট-খট-খটাস... খট-খট-খটাস শব্দটা তাই স্পষ্ট শুনতে পেলাম। প্রফেসর তখন এতই

আনমনা যে শুনতেই পেলেন না। আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে হল, বন্ধ জানলার সার্সিতে কেউ নক করছে।

ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘প্রফেসর।’

প্রফেসর বললেন, ‘শুনেছি।’

কিন্তু মুখ দেখে তো মনে হল না কিছু শুনতে পেয়েছেন। ঠিক এই সময়ে খট-খট-খটাস শব্দটা আবার শোনা গেল— এবার আরও জোরে। ঝনঝন করছে জানলার কাচ। প্রফেসরের চোখ আস্তে আস্তে ঘুরে গেল জানলার দিকে। শীতের রাত। দোতলার ঘর। বাগানের দিকের জানলা। বিকেলের দিকে যাকে দেখেছিলাম, তার আবির্ভাব ঘটেনি তো?

গা ছমছম করে উঠল। কাঁকড়া তো দেওয়াল বেয়ে ওঠে না। তবে এ কে? খট-খট-খটাস... ঝন... ঝন... ঝনাৎ...

সার্সির একটা কাচ ভেঙে ঠিকরে পড়ল মেঝের ওপর। শক্ত হয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া।

ভাঙা কাচের ফুটো দিয়ে প্রথমে গলে এল একটা ভয়াবহ জিনিস। নীল রঙের একটা কাঁকড়ার দাড়া।

ডগায় দুটো ধারালো আঁকশি খাঁজকাটা বল্লমের মতো নড়ছে। দু’মুখ এক হচ্ছে, ফের খুলে যাচ্ছে।

কাঁকড়ার দাড়া এত বড় হয় না। প্রায় এক-বেগদা লম্বা দাড়া জীবনে দেখিনি। বিশেষ করে নীল রঙের কাঁকড়া। কাঁকড়া খেতে আমি ভালবাসি। কিন্তু এই দাড়া দেখে গলা শুকিয়ে গেল আমার।

খট-খট-ঝন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা কাচের বাকি অংশটুকুও ভেঙে পড়ল ভেতরে। অন্য দাড়া দিয়ে ঠুকে ঠুকে গোটা বডিটাকে কাঠের ফ্রেমে টেনে তুলল নীল কাঁকড়া। ইঞ্চি আটেক ব্যাস।

অতিকায় কাঁকড়ার চোখ কিন্তু কাঠির ডগায় নেই। বর্মের গায়ে বসানো। মানুষের মতো না হলেও চাহনিটা পাশবিক বা হিংস্র মনে হল না— মানবিক না হলেও কেমন যেন বুদ্ধিদীপ্ত। মায়া-মমতায় স্নিগ্ধ বলেও যেন মনে হল। হঠাৎ এমনি মনে হওয়ার কোনও কারণ আমি দর্শাতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে, এরকম চারকোনা চকচকে চোখ পৃথিবীর কোনও পশুর বা পক্ষীর আছে বলে আমি জানি না।

আড়চোখে দেখলাম, প্রফেসর চোখের পাতা ফেলছেন না। অতিকায় আগন্তুকের দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে আছেন।

ঠকাস করে সিমেন্টের মেঝের ওপর লাফিয়ে পড়ল দানবকাঁকড়া। বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল আমার। নীল আতঙ্ককে আরও মন দিয়ে দেখতে লাগলেন প্রফেসর। তারপর গালে হাত দিয়ে বসলেন।

বললেন, ‘দীননাথ, একেই দেখেছিলে দেওয়াল বেয়ে উঠতে?’

আমার গলা শুকিয়ে গেছিল। তাই ওপর নীচে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

আশ্চর্য। অতিকায় কাঁকড়ার সামনের দাড়াটাও ওপর-নীচে একইভাবে নড়ে যেন সায় দিয়ে গেল। নরম চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল প্রফেসরের দিকে। তারপর তাঁর দিকেই এগিয়ে এল কড়মড় আওয়াজ করে।

প্রফেসর বললেন, 'তিষ্ঠ।'

কাঁকড়া দাঁড়িয়ে গেল।

প্রফেসর বললেন, 'তুমি সংস্কৃত জানো?'

কাঁকড়ার দাড়া থরথর করে কাঁপতে লাগল। আবার আমার মনে হল, (কেন মনে হল, তা বলতে পারব না)— কাঁকড়া বুঝতে পারছে না, 'না' বলতে হলে কীভাবে দাড়া নাড়াতে হবে।

মনটা নরম হয়ে গেল আমার। ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে দেখালাম, কীভাবে 'না' বলতে হয়।

আমার ঘাড়নাড়া দেখল অপার্থিব কাঁকড়া। সঙ্গে সঙ্গে দাড়া নাড়ল ডাইনে আর বাঁয়ে।

'বুঝেছি', বললেন প্রফেসর, 'তুমি সংস্কৃত জানো না, বাংলাও জানো না, অথচ বুঝতে পারছ কী বলতে চাইছি।'

ওপরে-নীচে দাড়া নেড়ে সায় দিল কাঁকড়া।

'বাঃ বাঃ! তা হলে তো হয়েই গেল। তুমি টেলিপ্যাথি জানো, মানে, আমার মনের কথা তোমার মন ধরে ফেলছে?'

দাড়া নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল কাঁকড়া।

'সাবাস', বললেন প্রফেসর, 'তা হলে বাপু, তোমার মনের কথা আমি কেন ধরতে পারছি না?'

অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল দানবকাঁকড়া। কড়মড় করে সিমেন্টের মেঝের ওপর দিয়ে সড়াত করে চলে এল প্রফেসরের পায়ের কাছে। প্রফেসর যেই হেঁট হয়ে তাকে দেখতে গেছেন, অমনি টপাং করে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তাঁর মাথায়।

আমি আঁতকে উঠেছিলাম। প্রফেসর কিন্তু নির্বিকার। তাঁর মুন্ডুর চাইতেও বড় একটা বিভীষিকাকে মাথার ডগায় নিয়ে শিরদাঁড়া সিধে করে বসলেন। অমনি কাঁকড়া তার ভয়াবহ দুটো দাড়া দু'পাশে নামিয়ে দিয়ে চেপে বসাল দুই রগের ওপর।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। রগ যে ফুটো হয়ে যাবে এখুনি। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম।

প্রফেসর ধমকে উঠলেন, 'তিষ্ঠ!'

দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম, প্রফেসর শিবনেত্র হয়ে আছেন। সুস্পষ্ট মনে হল, কী যেন শুনছেন। ফিক করে একবার হাসলেন। ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। তারপর ঘাড়-ফাড় না নেড়ে মুচকি মুচকি হেসেই চললেন।

'ব্যাপার কী?'

প্রফেসর তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'ব্যাপার ভারী মজার। দেখলে তো, তুমি মনে মনে যা ভাবলে, আমি তা বুঝে গেলাম। ঠিক যেন তুমি আমার মাথার মধ্যে কথা

বললে। দীননাথ, আমার ব্রেনে টেলিপ্যাথির ক্ষমতা ঢুকিয়ে দিয়েছে এই কাঁকড়া। ওর সঙ্গে বেশ তো কথা বলছি, কেন বিরক্ত করছ?'

যাচ্চলে! ভাল করতে গিয়েও ধমক। প্রফেসর ফের শিবনেত্র হয়ে ফিকফিক করে হাসছেন দেখে গুম হয়ে বসে পড়লাম সোফায়।

মিনিটপাঁচেক পরে একলাফে প্রফেসরের মাথা থেকে সিমেন্টের মেঝেতে নামল দানবকাঁকড়া। খুব যে উৎফুল্ল হয়েছে তা ওর বিরাট লাফ দেখেই বুঝলাম। প্রফেসরের পায়ের কাছ থেকেই একটিমাত্র লাফ মেরে, শূন্যপথে অতবড় দেহটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল ভাঙা কাচের ফোকরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দাড়া নেড়ে যেন টা-টা করে পিছু হটেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

আর কি আমাকে রোখা যায়। দৌড়ে গেলাম জানলার সামনে। ঝটকা মেরে খুললাম পাল্লা। গরাদ নেই বলেই ঝুঁকে পড়লাম।

দেখলাম, দেওয়াল বেয়ে টিকটিকির মতন নেমে যাচ্ছে অতিকায় কাঁকড়া।

চাঁদের আলো ছিল বলেই দেখেছিলাম এই দৃশ্য— সেইসঙ্গে কাঁকড়ার বাহিনীকে।

বাগানের মাটি থিকথিক করছে নীল কাঁকড়ায়। অসংখ্য ঢিবি বললেই চলে। তারা নড়ছে। মাটিও যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

'ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে দীননাথ। জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে আমার পাশে এসে বসো। কাঁকড়া কী বলে গেল, শুনে যাও।'

নীল আতঙ্কদের দেখে আমার তখন মাথা ঘুরছে। টলতে টলতে এসে বসলাম প্রফেসরের পাশে। উনি নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'এরা এসেছে ধূমকেতুদের জন্মভূমি থেকে।'

'ধূমকেতুদের জন্মভূমি!'

'ইয়েস মাই বয়। সৌরজগতের বাইরেই বরফবলয় সেই জন্মভূমি। প্রায় কুড়ি কোটি ধূমকেতু রয়েছে সেখানে, সাইজে তারা দশ থেকে পাঁচশো কিলোমিটার বড়।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে যে কক্ষপথে, সেই কক্ষপথ রয়েছে নেপচুন গ্রহের ঠিক পরেই।'

'ব-বলেন কী?'

'চল্লিশ বছর আগে গেরার্ড কুপার ওই ধূমকেতু বলয়ের কথা বলেছিলেন। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সবাই। সাড়ে চার বিলিয়ন বছর আগে সৌরজগতের জন্ম থেকেই রয়েছে এই বলয়। প্লুটোসহ ওই কুপার বেল্টেরই সবচেয়ে বড় সদস্য হ্যালির ধূমকেতু আসছে ওখান থেকে, যার সাইজ মোটে দশ কিলোমিটার।'

আমি ঢোক গিললাম।

প্রফেসর বললেন, 'কুপার বেল্টের ধূমকেতুরা টহল দিয়ে চলে যায়, আবার আসে। কিন্তু আরও দূরের উর্ট মেঘ থেকে যেগুলো আসে, তারা একবার দেখা দিয়েই চলে যায়, আর ফিরে আসে না।'

ধূমকেতু নিয়ে এত লেকচার ভাল লাগছে না। আমি বাড়ি ফিরতে চাই। কিন্তু যাব কী করে? নীচে পিলপিল করছে কাঁকড়া।

'ওরা ভাল কাঁকড়া। কিছু করবে না। ধূমকেতুর ল্যাজে বেঁধে স্পেসশিপ নিয়ে এসেছিল। আর-একটা ধূমকেতু আসছে। তাতেই চেপে চলে যাবে।'

'আসছে? আর-একটা ধূমকেতু?'

'আমেরিকা থেকে সেই খবরই তো পেলাম। ভড়কে যেও না। পৃথিবীর অনেক দূর দিয়ে চলে যাবে, এরাও ফিরে যাবে। যাবার আগে যে-খবরটা দিয়ে গেল, সেটা শুনলে তোমার রক্ত জমে যাবে।'

আমি কানখাড়া করে শুনে গেলাম।

'দীননাথ। উর্ট ক্লাউড থেকে অনেক বছর আগে একটা ধূমকেতু এসেছিল। পৃথিবী ঘুরে চলে গেছিল। তাদের ল্যাজ থেকে স্পেসশিপ নিয়ে পৃথিবীতে নেমেছিল অন্য গ্রহের নৃশংস একদল প্রাণী। তাদেরও দেখতে কাঁকড়ার মতন। সাইজে তারাও অতিকায়। তাদের খাদ্য নরমাংস।'

'ন-ন-ন-।'

'স্টুপিড মানুষ যদি কাঁকড়া খেতে ভালবাসে, তা হলে কাঁকড়া কেন মানুষ খাবে না?'

'কী... কিন্তু এত বড় কাঁকড়া মানুষ খেলে মানুষ কি আর টিকবে?'

'টিকবে না। সেই খবরই দিতে এসেছিল কুপার বেল্ট-এর এই কাঁকড়া। বলে গেল, ঝাড়ে-বংশে উর্ট মেঘের কাঁকড়ারা এখন বড় বেড়ালের সাইজ নিয়েছে। এতদিন লুকিয়েছিল পৃথিবীর বড় বড় জঙ্গলগুলোয়। সেখানে মানুষের আকাল পড়েছে। তাই দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে বড় বড় শহরগুলোর দিকে। সুন্দরবনের দানবকাঁকড়া কলকাতায় নামবে কাল ভোরে...'

'ভো... ভো... ভোরে...।'

'ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে মানুষ। বাঁচবার পথ একটাই।'

'কী?'— গলা চিরে বেরিয়ে এল 'কী' প্রশ্নটা।

প্রফেসর বলে দিলেন কী করতে হবে।

ভোরের আলো ফোটবার আগেই প্রফেসরের বাগানে যেখানে যেখানে ফাঁকা জায়গা, সেখানে সেখানে বড় বড় উনুন জ্বলতে লাগল। বড় বড় কড়াইতে রাশি-রাশি কাঁকড়া রান্না হতে লাগল। সারা রাত ধরে কলকাতার বাজারে বাজারে হানা দিয়ে ঝুড়ি ভরতি কয়েকশো কাঁকড়া জড়ো করেছিলাম, আমি একাই সাদা সরষে বাটা দিয়ে প্রাণপণে এমন কাঁকড়া রাঁধতে লাগলাম যে সুগন্ধ ভুরভুর করতে করতে উঠে গেল আকাশের দিকে।

সেই গন্ধের টানে নিশ্চয়, উর্ট মেঘের অতিকায় সবুজ কাঁকড়ার দল তাদের অদ্ভুত ব্যোমযানে চেপে প্রথমে উড়ে এল প্রফেসরেরই বাগানের ওপর। চ্যাপটা থালার মতন দেখতে ব্যোমযান। একটা থালার ওপর উপুড় করা আর একটা থালা। চারদিকের কিনারায় অজস্র ফুটো। প্রতিটার মধ্যে দিয়ে লিকপিক করছে ভয়ানক ধারালো বাঁকা বল্লমের মতন বাঁকা দাড়া। ঝিলিক দিচ্ছে গনগনে চোখের আভাস।

ব্যোমযানগুলো নিঃশব্দে গাছের মাথায় এসে ভাসতে লাগল। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেও আমি আমার কাজ করে গেলাম— প্রফেসর যেমন শিখিয়ে দিয়েছিলেন, অবিকল সেইভাবে।

বড় থালায় রান্না করা কাঁকড়ার লালচে দাড়া একটার-পর-একটা তুললাম আর মাখোমাখো ঝোলসমেত কড়মড় করে কামড়ে, চুষে খেতে লাগলাম।

আরও কয়েকটা থালা-ব্যোমযান উড়ে এল গাছেদের মাথায়। চোখ তুলে দেখলাম, থালাদের কিনারা ঘিরে অজস্র অতিকায় দাড়া হিংস্রভাবে আস্ফালন করছে। আমাকে পেলেই যেন ছিঁড়ে খাবে।...

কিন্তু সুবুদ্ধি এল তারপরেই। নিমেষে সবক'টা থালা ব্যোমযান একসঙ্গে ছিটকে গেল নীল আকাশের দিকে, মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

বাড়ির মধ্যে থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর— দু' হাতে তালি বাজাতে বাজাতে বললেন, 'সাবাস দীননাথ। এই একটা কাজের জন্যে রাষ্ট্রসংঘ তোমাকে বীর-পুরস্কার দেবে বলেছে। এইমাত্র খবর এল, গোটা পৃথিবীর সমস্ত ভিনগ্রহী কাঁকড়া পাঁইপাঁই করে থালা ব্যোমযানে চেপে উড়ে গেল উর্ট মেঘের আগন্তুক ধূমকেতুর দিকে— ল্যাজে চেপে চম্পট দেবে বলে।'

আমি তখন দরদর করে ঘামছি। কাঁকড়ার ঝোলে গোটা মুখ বিশ্রী। খেঁকিয়ে বললাম, 'আমাকে দিয়ে একাজটা না করালেই কি চলত না?'

একটা বড় দাড়া তুলে নিয়ে চুষতে চুষতে প্রফেসর বললেন, 'এ-দৃশ্য না দেখালে কাঁকড়ারা ভয় পাবে কেন? একরাতে এত কাঁকড়া জুটিয়ে এমন খুশবুওলা রান্না করতে আর কে পারবে বলো?'

তেজস্ক্রিয় মণিক

পরশুদিন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বায়না ধরেছিলেন, তাঁকে একটা বেড়াল এনে দিতে হবে।

আমি খেপে গেছিলাম। কুকুর ধরা সহজ, কিন্তু বেড়াল ধরা চাট্টিখানি কথা নয়। ওদের জাতটাই খারাপ, ঘরেও থাকবে, বনেও ঘুরে বেড়াবে। খাটেও শোবে, আবার চালে উঠেও বসে থাকবে। আদর করে মাছের মুড়ো খাওয়ানোর পরও দেখা যাবে চুপিসাড়ে কখন গোটা মাছটাই খেয়ে চলে গেছে। কায়দা-টায়দা করে থলির মধ্যে ভরে গঙ্গার ধারে ফেলে এলেও দেখা যায়, কী এক অলৌকিক ক্ষমতা বলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। হারামজাদাদের তিনতলার ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে দিলেও একতলায় আছড়ে পড়ার আগেই শিরদাঁড়া আর খুলি বাঁচিয়ে নেয়। বেড়ালের নাকি নটা প্রাণ। মরেও মরে না। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এডগার অ্যালান পো'র 'ব্ল্যাক ক্যাট' গল্পটা পড়বার পর থেকে বেড়ালদের আমি একটু ভয়ও পাই। বেড়াল যে রঙেরই হোক না কেন, বেড়াল বেড়ালই, তাদের দূরে রাখাই ভাল।

প্রফেসর আমার এই বেড়ালভীতি কি জানতেন না? তা সত্ত্বেও আমাকেই কিনা বললেন, 'ও হে দীননাথ, মস্তানি-টস্তানি তো অনেক দেখিয়েছ, একটা বেড়াল এনে দিতে পারো?'

হ্যাঁ, আমি মানছি, আমি একটু রগচটা মানুষ। কথার চেয়ে আমার হাত চলে বেশি। কিন্তু আমার এই বদ অভ্যাসটার উপকার কি প্রফেসর পাননি? তা সত্ত্বেও মস্তান বলে আমাকে টিটকিরি দেওয়ার দরকার ছিল কি?

রগচটা হই আর যাই হই, মনটা কিন্তু আমার খুব নরম। সেকথা আমার শত্রুরাও স্বীকার করে। বিশেষ করে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যদি আমাকে বলেন, 'ওহে ছোকরা, যাও তো ওষধি পর্বতে, দক্ষিণ শিখর থেকে নিয়ে এসো বিশল্যকরণী, সাবণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী আর সন্ধানী— এই চারটে মহৌষধ।'

অন্য কেউ হলে এই অর্ডার শুনলে তক্ষুনি সেইখানেই মাথা ঘুরে বসে পড়বে। হনুমান ছাড়া এহেন অসম্ভব কর্ম কেউ করতে পারে? ময়দানবের তৈরি রাবণের হাত দিয়ে নিক্ষিপ্ত শক্তিশেল খেয়ে লক্ষ্মণের চোখ যখন উলটে গেছে, তখন অর্ডার তামিল করতে লম্ফ দিয়ে হনুমান চলে গেছিল ওষধি পর্বতে। ওষধি খুঁজে না পেয়ে চুড়ো পাকড়ে পুরো পাহাড়টাকেই উপড়ে নিয়ে এসেছিল বায়ুপথে।

আমি কিন্তু শুধু হিমালয় কেন, ত্রিভুবনও চক্কর মেরে আসতে পারি প্রফেসরের অর্ডার বা আবদার শুনলেই। কিন্তু মস্তান বলবার কী দরকার ছিল?

মুখ গোঁজ করে হুকুম তামিল করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আজকালকার ছোকরারা বুড়ো মানুষদের সম্মান দেয় না— আমি কিন্তু দিই। পাড়ার ছোকরারা সেই কারণে আমাকে দুচক্ষে দেখতেও পারে না— তাও আমি জানি। আড়ালে আমাকে দীননাথ-প্যালানাথ-ঘাটের মড়া-চ্যালাকাঠ বলে। হারামজাদারা উঠতি-মস্তান, ফুঁ দিলে উড়ে যাবে বলে কিছু বলি না। রেগে গেলে তো আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তখন আমি চণ্ডাল।

যাই হোক, যা বলছিলাম। প্রফেসরের আজব আবদার শুনে ভাবলাম, নিশ্চয় আবার একটা বিষম এক্সপেরিমেন্টের প্ল্যান কষেছেন। অতএব, সবেধন-নীলমণি এই সহকারীকেই তো কোমরে গামছা বেঁধে আসরে নামতে হবে।

সেই হল আমার বেড়াল খোঁজার অভিযান। খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই আবিষ্কার করলাম একটা আশ্চর্য তথ্য। আমাদের এই বিখ্যাত বনেদি পাড়ার কোথাও একটাও বেড়াল রাখা হয়নি।

কী আশ্চর্য! বেড়াল নেই এমন জায়গা এই পৃথিবীতে কোথাও যে আছে, এবং সেই পাড়াটা আমার পাড়া, তা তো জানা ছিল না!

খুবই পুলকিত হলাম। যুগপৎ খুবই বিমর্ষ। কেননা, আমার অসাধ্য কিছু নেই— প্রফেসর তা জানেন। সামান্য একটা বেড়াল ধরে দিতে পারলাম না— এ খবর শুনলে যে ব্যঙ্গবচনের ঝড় তুলে আমার ঘিলু পর্যন্ত নড়িয়ে ছাড়বেন।

বেড়াল খোঁজার জন্যে পাড়া ছেড়ে বেপাড়া যাওয়াটাও খুব সমীচীন বোধ করলাম না। আত্মসম্মানে লাগল। বেড়াল এমন একটা কেষ্টবিষ্টু জীব নয় যে তাকে দেশ-দেশান্তরে খুঁজে বেড়াতে হবে। বেড়াল হল গিয়ে গৃহপালিত পশু এবং খুবই বিশ্বাসঘাতক প্রাণী। তার চোরের মতন আনাগোনা এবং সময়বিশেষে আত্মগোপন করে থাকার কু-অভ্যেসটিও আমার অবিদিত নয়। অতি নিরীহদর্শন এই জীবটিকে অকারণে বাঘের মাসি বলা হয়নি। তার চোখ বাঘের চোখের মতন রাতে জ্বলে এবং কোনও এক অজানা ইন্দ্রিয়শক্তির দৌলতে অদৃশ্য বিভীষিকাদের অস্তিত্ব টের পায়। তখন ল্যাজ গুটিয়ে তল্লাট ছেড়ে লম্বা দেয়, যার দুধ-মাছ খেয়ে গতর ফোলানো হয়েছে তাকেই বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে।

সুতরাং শরীর নিয়েও যারা প্রায় অশরীরী, সেই বেড়ালদের এই পাড়াতেই খুঁজতে হবে— তার জন্যে দরকার হলে গোয়েন্দা পর্যন্ত লাগাব। দরকার হলে থানায় গিয়েও বলে আসব— বদমাশ বেড়াল যদি কোথাও থাকে, সন্ধান দিন। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তার ব্রেনের নাটবল্টু টাইট মেরে দেবে।

এই সব সাত-পাঁচ যখন ভাবছি শিবমন্দিরের বটগাছতলায় বসে, আর পাড়ার চ্যাংড়াগুলো অস্ফুট আওয়াজ দিচ্ছে আশেপাশে, ঠিক তখন ধূমকেতুর মতন সাঁ করে আমার সামনে চলে এল গ্রেট গুলবাজ চাণক্য চাকলাদার।

উটের মতন লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে দুলে দুলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে এক বেগদা লম্বা ইয়ামোটা জ্বলন্ত চুরুটটাকে সরিয়ে বললে, 'মুখটা এত শুকনো কেন?'

এদিক-সেদিক চেয়ে দেখলাম, চ্যাংড়াগুলো আমাদের দেখছে। বিশেষ করে চাণক্যকে। এরকম আখাম্বা লম্বা বিদঘুটে ঠ্যাংওলা মানুষ তো চট করে চোখে পড়ে না!

হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল ছেলেগুলোর চাহনি দেখে। আমারও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নামে একটা ইন্দ্রিয় আছে— যাকে বলা হয়, হর্স সেন্স। সেই 'সেন্স' দিয়ে কেন জানি আমার মনে হল, ছোঁড়াগুলো অনেক কিছু জানে। আমার কাছে চেপে যাচ্ছে।

রোখ চেপে গেল, চাণক্যকে নিয়ে তফাতে চলে গেলাম। বললাম, 'একটা বেড়াল খুঁজছি।'

আমি ভেবেছিলাম, এই কথা শুনে চোখ-টোখ কপালে তুলে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠবে চাণক্য। কিন্তু লোকটা সেসবের ধার দিয়েও গেল না। বরং আমার পিলে চমকে দিয়ে বললে, 'আমিও তো খুঁজছি।'

এইবার যাকে বলে আকাশ থেকে পড়া, আমার হল সেই অবস্থা। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে, চাণক্যর পিটপিটে চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকবার পর আচমকা খেয়াল হল— আশ্চর্য! চাণক্য হঠাৎ এপাড়ায় কেন? যে কিনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে টহল দিয়ে ফেরে যত্তোসব অদ্ভুত আজগুবি ব্যাপারস্যাপারের খোঁজে, এবং তাই নিয়ে এনতার গুল মেরে যায়— সে হঠাৎ এই পাড়ায় আমাকে অথবা প্রফেসরকে আগেভাগে না জানিয়ে হুট করে চলে এল কেন?

আশ্চর্য মানুষ চাণক্যর কিছু কিছু কাণ্ডকারখানা এর আগে লিখেছি। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ ওর মধ্যে পেল্লায় মাত্রায় আছে। তাই আমার হাঁ-মুখের দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললে, 'মুখটা বন্ধ করুন। বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।'

হাঁ বন্ধ করলাম। ফলে, কথাও বলতে পারলাম না।

কিন্তু কথার ফুলঝুরি চাণক্য কথা চালিয়ে গেল বটে। যার সারমর্ম এই: চাণক্য এমন একটা বেড়াল খুঁজতে বেরিয়েছে, যে বেড়াল যখন তখন অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমার মুখটা আবার হাঁ হয়ে গেছিল। বজ্জাত বেড়ালদের অনেক বজ্জাতির ব্যাপার শুনেছি, কিন্তু মা ষষ্ঠী তাঁর এই বিশেষ বাহনটিকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দিতে গেলেন কেন? আরও অঘটন ঘটানোর জন্যে?

চাণক্য বললে, 'ঠিক তাই। হাড়বদমাশ— এক ভাড়াটে, তার বাড়িওয়ালাকেই বাড়ি ছাড়া করবার জন্যে পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষকে দিয়ে তৈরি বিশেষ বটিকা খাইয়ে এই বেড়ালকে আনিয়েছে কামাখ্যা থেকে। খবরটা পেয়েই আমি দৌড়তে দৌড়তে আসছি। ত্রিভুবনে যা নেই, আমার তা চাই। এই বেড়ালটাকেই চাই।'

শুনেই, ঘোর সন্দেহ হল আমার। প্রফেসর কি সব জেনেশুনেই আমার কাছে বেমালুম চেপে গিয়ে এই বেড়ালটাকেই খুঁজে আনতে অর্ডার দিয়েছেন?

চাণক্য আমার সন্দেহের কথা শুনেই আবার খানিকটা হ্যা হ্যা করে হেসে বললে, 'প্রফেসর মাঝে মাঝে তাজ্জব রগড় করেন ঠিকই। তবে অদৃশ্য বেড়াল খুঁজতে আপনাকে পাঠাবেন কেন? নিশ্চয় অন্য কোনও মতলব আছে। চলুন তো যাই—।'

প্রফেসর চাণক্যকে দেখেই কিন্তু ভুরু-টুরু কুঁচকে মুখখানাকে ভয়াল ভয়ংকর বিকট

কদাকার করবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘আবার কী ফিকিরে আসা হয়েছে এ তল্লাটে?’

এবার কিন্তু হ্যা হ্যা করে না হেসে মিঠে মিঠে হাসি ছড়িয়ে চাণক্য বললে, ‘আরেব্বাস, কী যে বলেন? এই ব্রেনে ফিকির গজায় কখনও? ফিকির তো কিলবিল করছে আপনার ব্রেনে।’

‘তার মানে? তার মানে? তার মানে?’ উৎকট গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রফেসর।

‘বলব? বলব? তা হলে বলেই ফেলি। প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপপুঞ্জে তেজস্ক্রিয় মণিক খুঁজতে গেছিলাম।’

‘তেজস্ক্রিয় মণিক!’ চোখ দুটো প্রায় ছানাবড়া হয়ে এল প্রফেসরের।

‘যে মণিকচূর্ণ দিয়ে বটিকা বানিয়ে গিলিয়ে দিলে শরীরের লক্ষ জিন এমন পালটে যায় যে অদৃশ্য হয়ে যেতেই হয়।’

জুলজুল করে তাকিয়েই রইলেন প্রফেসর। স্পষ্ট বুঝলাম, মনের মাপকাঠি দিয়ে মেপে মেপে দেখছেন, চাণক্য আর কতটা জানে।

কথার তলোয়ার চালিয়ে গেল বটে চাণক্য, ‘সেইখানেই খবর পেলাম কামাখ্যার পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষ বেশ কয়েকটা তেজস্ক্রিয় মণিক পাহাড়-পর্বত খুঁজে নিয়ে গেছেন অদৃশ্য করার এক্সপেরিমেন্ট করবার জন্যে।’

প্রফেসরের চোখের পাতাও আর পড়ছে না।

চাণক্য বলছে, ‘কাজে লাগিয়ে দিলাম ফেরেব্বাজ গোয়েন্দা গ্যাঙকে। এককাঁড়ি টাকা খরচ হয়ে গেল বটে, কিন্তু খবর হেঁটে হেঁটে চলে এল আমার কাছে।’

‘কী খবর?’ এতক্ষণে মুখ খুললেন প্রফেসর।

‘পণ্ডিত পুণ্ডমূর্খাক্ষ—’

‘মূর্খ। ওঁর নাম পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষ।’

‘তা হলে জানেন দেখছি। বাজিয়ে নিলাম।’ বলে, আমার দিকে চেয়ে অদৃশ্য হাসির বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চাণক্য বললে, ‘পণ্ডিত পুণ্ড.... পুণ্ড... পুণ্ডরীকাক্ষ এক্সপেরিমেন্ট করে হাইলি সাকসেসফুল। একটা বেড়ালকে অদৃশ্য করে দিয়েছেন। এখন ঘুরঘুর করছেন আপনার বাড়ির চারপাশে আপনাকে অদৃশ্য করে দেওয়ার জন্যে।’

‘খবরটা আর চাপা নেই দেখছি।’ স্বগতোক্তি করলেন প্রফেসর।

‘আমাকে বলেননি কেন?’ রাগের চোটে গলা চড়ে গেল আমার, ‘ঠেঙিয়ে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দেব।’

‘তাকে দেখতে পেলে তো!’— বেশ মিষ্টি গলায় বললেন প্রফেসর, ‘বুঝলে না? ওই মোটা মাথাটা এত আস্তে চলে... চাণক্য, মোটামাথাকে বুঝিয়ে দাও তো কেন দেখা যাচ্ছে না পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষকে।’

‘তিনি নিজেই অদৃশ্য হয়ে আছেন যে।’ চাণক্য প্রাঞ্জল করে দিল রহস্যটা।

আমি তো হাঁ।

মিষ্টি মিষ্টি করে বলে গেলেন প্রফেসর, ‘সেই জন্যেই তোমাকে একটা বেড়াল ধরে আনতে বলেছিলাম।’

'কী করতেন বেড়াল নিয়ে?'

'অদৃশ্য করে দেব।'

'তেজস্ক্রিয় মণিকচূর্ণ তো আপনার কাছে নেই?'

'ওই তো রয়েছে।' টেবিলের দিকে আঙুল তুলে একটা কৌটো দেখালেন প্রফেসর। কাচের কৌটো। ভেতরের নীল মখমলের ওপর একটা রামধনু রঙিন পাথর জেল্লা মারছে, 'আমাকে উপহার দিয়ে গেছেন পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষ— খেলেই নাকি আমি তাঁর অদৃশ্য বৈজ্ঞানিকদের ক্লাবে মেম্বার হতে পারব।'

'নিজে না খেয়ে বেড়ালকে খাওয়াতে চান?'

'এই তো ঘটের বুদ্ধি খুলেছে। বেড়ালকে খাইয়ে তার ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাতে চাই। আগামী শতাব্দীটা হচ্ছে বায়োটেক শতাব্দী। আমার এই বায়োটেক এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হলে সেটাই হবে বায়োটেক সেঞ্চুরির সেরা আবিষ্কার।'

'বেড়ালের ওপর এক্সপেরিমেন্ট কেন?'

'এই পাড়ার এক ভদ্রলোকের একটা মস্ত উপকার করব বলে।'

'কোন ভদ্রলোক বলুন তো?'

'বিদ্যাসাগর বিদ্যার্থী।'

'ব্যাচেলর বুড়ো? যিনি পৈতৃক ভিটের একতলায় থাকেন? দোতলার ভাড়াটে ভাড়া দেয় না? একতলার কলতলায় বিদ্যার্থীমশায় ঢুকলে দোতলার কলঘর থেকে মাথায় নোংরা জল ফেলেন ফাটা মেঝের মধ্যে দিয়ে।'

'যখন শোবার ঘরে শুয়ে থাকেন, তখনও ফাটা কড়িকাঠ দিয়ে গায়ে জল ঢালেন— জানো না?'

'জানি... জানি... বিদ্যার্থীমশায়কে বাড়িছাড়া করার মতলবে আছে ভাড়াটে— পাড়ার ছেলেদের হাত করে। কিন্তু বেড়াল ধরে আনতে বললেন কেন?'

'পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষর অদৃশ্য বেড়ালটাকে এনে ভাড়াটে ভদ্রলোক বিদ্যার্থীমশায়ের ঘরে ছেড়ে দিয়েছেন। ঘরদোর নোংরা করে সে যা করছে, বলবার নয়। বিদ্যার্থীমশায় সেদিন এসে এর একটা বিহিত করতে বললেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে। তাই তোমাকে একটা বেড়াল ধরে আনতে বলেছিলাম।'

'তাকে তেজস্ক্রিয় মণিকচূর্ণ খাইয়ে অদৃশ্য করতেন না হয়। কিন্তু তারপর?' চোখের ইশারা করে প্রফেসর বললেন, 'পণ্ডিত নিশ্চয় অদৃশ্য হয়ে সব শুনছে। দেখতেই পাবে কী করব।'

এরপর যা ঘটল, তা এক তাজ্জব ব্যাপার। আমি আর চাণক্য দুজনে মিলে একটা বেড়াল ধরে এনেছিলাম। প্রফেসর তাকে তেজস্ক্রিয় মণিকচূর্ণ খাইয়ে আমাদের চোখের সামনেই অদৃশ্য করে দিলেন। গলায় দড়ি বেঁধে রেখেছিলেন আগে থেকেই— সেই দড়ি ধরে অদৃশ্য বেড়ালকে টেনে নিয়ে গেলেন ল্যাবরেটরির মধ্যে।

তারপর, তার ওপর চালালেন বায়োটেক এক্সপেরিমেন্ট। গাছের জিন নিয়ে বেড়ালটার শরীরে ঢুকিয়ে অনেক রশ্মি-টশ্মি ফেলে তাকে একটা গাছ বানিয়ে দিলেন।

অদৃশ্য বেড়াল আর অদৃশ্য রইল না। কাঠের বেড়াল হয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমাদের সামনে। তারপর তাকে রেখে এলাম ভাড়াটের ঘরে। সেই সঙ্গে একটা চিরকুট: 'বাড়ির মালিকের উপর উপদ্রব বন্ধ না হলে ভাড়াটেকে বানিয়ে দেওয়া হবে কাঠের ভাড়াটে। ইতি প্র. না-ব-চ।'

আমার আর চাণক্যর ওপর এবার ভার পড়েছে বিদ্যার্থীমশায়ের বাড়ি থেকে অদৃশ্য বেড়ালটাকে ধরে আনার। তাকে কাঠের বেড়াল বানিয়েই খোদ পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষকে কাঠের মূর্তি বানাবেন প্রফেসর।

কিন্তু তিনি কি আর এ তল্লাটে আছেন? পাজি ভাড়াটেও তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। বিদ্যার্থীমশায় এখন তোফা আছেন।
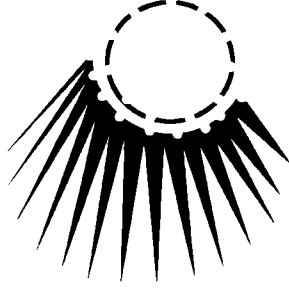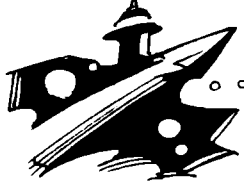
আশ্চর্য রশ্মি

চিমড়ে চেহারা। রোদে ঝামা মুখ। সরু নাকের নীচে কাঁচাপাকা গোঁফ। বিলকুল টেকো মাথা, তাতে বিলক্ষণ তেল দেওয়াও হয়েছে। গায়ে ফতুয়া প্যাটার্নের বুশ শার্ট আর ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট, পায়ে রবারের হাওয়াই চটি। সবচেয়ে অদ্ভুত, তার ভুরু নেই। বিলকুল নির্লোম! ল্যাকপেকে হোক আর যাই হোক, লোকটার চোখে কিন্তু তেজ আছে। চেহারাখানার মধ্যেও চাবুক চাবুক ভাব। মেরুদণ্ড সিধে— নোয়াতে গেলেই বুঝি ভেঙে যাবে।

টিপ করে প্রফেসরকে পেন্নাম ঠুকে নির্লোম ভুরু বেঁকিয়ে সে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই রাখালরাজ তরফদার।'

'বসা হোক, বসা হোক,' বললেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক, 'তুমিই সেই ভূপর্যটক?'

'আজ্ঞে!'

'পায়ে হেঁটে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করেছ?'

'আজ্ঞে।'

'তুমি বাংলার গৌরব।'

'আজ্ঞে না, বাঙালিরা যেকাজটা ভাল পারে, আমি তাই করেছি। এতে কোনও গৌরব নেই।'

'বাঙালি কোন কাজটা ভাল পারে রাখালরাজ?'

'পায়ের কাজ।'

'সেকি! বাঙালি তো মাথার কাজেই বিশ্ববিখ্যাত।'

'সেটা ব্যতিক্রম। পনেরো আনা বাঙালি পায়ের কাজটাই ভাল পারে।'

'রাখালরাজ, তোমার হেঁয়ালি কথার মানে বুঝতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। পায়ের প্রহেলিকা প্রাঞ্জল করে দিলে ভাল হয়।'

রাখালরাজ তখন ভারী সুন্দর ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে বললে, 'বাঙালি ভাল পালাতে পারে। রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যেতে পারে। পায়ের কাজে তাই সে বড় পটু।'

'জীবনযুদ্ধে তাই সে পরাজিত। ব্যাবসাবাণিজ্যে ল্যাজগুটিত। ঠিক, ঠিক, ঠিক। বৎস্য পদসম্রাট, আমার কাছে কী অভিপ্রায়ে আগমন?'

'সমুদ্রসৈকতের কাহিনিটা শুনবেন বলেই তো চিঠি লিখে পাঠালেন। ভুলে গেলেন?'

'মনে পড়েছে। ভূপর্যটনে বেরিয়ে তুমি গেছিলে পাহাড়ঘেরা নিরালা এক সমুদ্রসৈকতে। কেউ সেখানে যায় না পাহাড় টপকাতে হবে বলে, কিন্তু তুমি গেছিলে পা সুড়সুড় করছিল বলে—'

'তা তো সবসময়েই করে। কিন্তু আসলে গেছিলাম খবরটা যাচাই করতে।'

'সমুদ্রের ধারে নাকি এক আশ্চর্য দুনিয়া গজিয়ে উঠছে?'

'আজ্ঞে। পাহাড়ি মানুষরা মিথ্যে কথা বলে না। তারা যখনি বললে, গেঁড়িগেঁড়ি মানুষে ছেয়ে যায় বালির তীর, গভীর রাতে অদ্ভুত আলোর ঝলক ধেয়ে যায় আকাশ লক্ষ করে— আশ্চর্য সেই মানুষরা কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়— কেউ তা জানে না। পাহাড় ডিঙিয়ে কেউ যে যায় না, এটা ঠিক। তার চাইতেও ভয়ংকর হল, তাদের চোখের দেখা দেখলেও পাগল হয়ে যেতে হয়।'

'কেউ হয়েছিল?'

'পাহাড়িদের একটা ছেলে হয়ে গেছিল। পাগল হয়েই সে পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে যায়। যে কদিন বেঁচে ছিল ঘ্যানর ঘ্যানর করে গেছে শুধু একটা কথা নিয়ে।'

'কী কথা রাখালরাজ?'
'যেও না-যেও না কভু সাগরের ধারে,
সেথা আছে বেঁটে মানুষ।
তার আজব আলো— মারিবে তোমারে।'

'তুমি গিয়ে তাদের দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মরোনি কেন?'

'পায়ের জোর বেশি ছিল বলে।...'

'পালিয়ে এসেছিলে?'

'আজ্ঞে।'

'কী দেখেছিলে?'

'জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে বুঝি পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। চারদিকে চোখা চোখা গ্র্যানাইটের পাথর আর একদম ন্যাড়া পাহাড়। সে পাহাড় এমনই খাড়াই আর দুর্গম যে দুর্দান্ত পাহাড়িরাও পাহাড় টপকে সাগরের চেহারা দেখতে যায় না। যাবেই বা কেন? ন্যাড়া পাহাড়ে না আছে গাছপালা, না আছে জীবজন্তু। খাড়াই পাঁচিলের মতো পাহাড় টপকে লাভ কী? তাই কস্মিনকালেও কেউ ওদিকে যায় না।

কিন্তু কয়েক বছর ধরেই গভীর রাতে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল পাহাড়ের মাথায়। তারপর মাঝে মাঝেই শোনা যেতে লাগল গুমগুম শব্দ। কুসংস্কারের জাহাজ পাহাড়িরা ভাবলে নিশ্চয় ভূতপ্রেত দখল নিয়েছে নিরালা পাহাড়গুলোয়। ফাঁকা জায়গাই তো বেশি পছন্দ অশরীরীদের।

এই যে গা-ছমছমে গুজবের শুরু হল, তা বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই ডালপালা মেলে

ছড়িয়ে পড়ল আওয়াজগুলো দিনের বেলাতেও শোনা যাওয়ার পর থেকে। কায়াহীনদের কাণ্ডকারখানা রাতের বেলাতেই ঘটে, দিনের বেলা তো নয়।

দিনদুপুরে একী আওয়াজ! গোটা তল্লাটটা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। আলো ঝলকায় কিনা, তা অবশ্য বোঝা যায় না মাথার ওপর সূর্য থাকে বলে।

কিন্তু নিশুতি রাতে দেখা যায় আলোর ঝলকানি। অনেক রঙের খেলা থাকে সেই আলোর মধ্যে। আকাশের মেঘের চেহারাও যেন পালটে যায় আলোর ঝলক গগন লক্ষ্য করে ছুটে গেলে।

এক ডাকাবুকো পাহাড়িয়া অজানাকে জানার নেশায় পাহাড় টপকে গেছিল সেখানে। ফিরে এসেছিল বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়ে।'

রাখালরাজ তরফদার নিজেও এক পাগল। পা-পাগল। পা দুটোকে খামোকা টনটন করালে তবে তার মাথা ঠিক থাকে— দু'দিন জিরেন দিলেই মাথার পোকা নড়ে ওঠে। পায়ে হেঁটে পৃথিবী দেখতে বেরিয়ে তাই সে বড় বড় শহর এড়িয়ে গেছে, অজানা অচেনা জায়গাগুলোতেই বেশি গেছে— পায়ের জোরের চরম পরীক্ষা দিয়েছে। চিতাবাঘের পায়ের পেশিতেও এত জোর নেই— যা তার পায়ে আছে।

পাহাড়িদের এই গণ্ডগ্রামে গিয়ে তাই দুদিন জিরোতেই মাথার পোকা নড়ে উঠেছিল। ভূত-প্রেতের গালগল্প শুনে আর গভীর রাতে আশ্চর্য আলোর ঝলক নিজের চোখে দেখে, বড় ইচ্ছে হয়েছিল ভূত দেখবে। মামদো, বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা প্রমুখ উঁচু জাতের ভূতেদের শরীরের বর্ণনা তার জানা আছে। কিন্তু বেঁটে ভূতেদের গল্প সে কখনও শোনেনি। তাই বড় ইচ্ছে হয়েছিল, গেঁড়ি ভূত দেখবে। ফটো তুলে রাখবে।

পাগল হয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়েছিল গাঁয়ের মানুষ। হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল রাখালরাজ। বলেছিল, 'তাতেই আমার পাগলামি সারবে গো।'

এই বলে একটা বোঁচকা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়েছিল ভূত দেখতে।

যদিও সেই দুর্গম পাহাড় খোদ পাহাড়ি মানুষদের কাছেও বিভীষিকা— কিন্তু রাখালরাজের কাছে নয়। পা যার চিতাবাঘের চাইতেও শক্ত পেশি দিয়ে তৈরি, গোটা পৃথিবী যার পায়ের পেশির কাছে পরাজিত— তাকে কি খাড়াই পাহাড় আটকাতে পারে?

খুঁজে পেতে তাই শর্টকাট বের করে ফেলেছিল রাখালরাজ। ভূমিকম্পের ফলে একটা পাহাড় চড়চড় করে ফেটে দুভাগ হয়ে গিয়ে রাস্তা বানিয়ে রেখেছিল। বড় খারাপ সেই পথ। রাখালরাজ কিন্তু এই খারাপ পথেই শিস দিতে দিতে চলে গেছিল সমুদ্রসৈকতের অনেক আগে। খুব কাছে যেতে পারেনি। খুব উঁচু একটা পাহাড়ের ডগায় হাঁচড়পাঁচড় করে উঠেই দেখেছিল বহু দূরে আর বহু নীচে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

তখন দিনের বেলা। মাথার ওপর সাতঘোড়ার টানা রথ নিয়ে বিষম বেগে ধেয়ে চলেছেন সূর্যদেব। অনেক দূর পর্যন্ত তাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। খালি চোখেই সেই দৃশ্য দেখে বিলকুল তাজ্জব হয়ে গেছিল রাখালরাজ।

তারপর চোখে লাগিয়েছিল বাইনোকুলার। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছিল সঙ্গে সঙ্গে। রাখালরাজের তখন মাথাভর্তি চুল ছিল। কিন্তু এখন নেই। অবিশ্বাস্য সেই ঘটনাটার পর

থেকে সে পাগল হয়ে যায়নি বটে— কিন্তু মাথার সমস্ত চুল উধাও হয়েছে।

ঘটনাটা এই:

বাইনোকুলার দিয়ে সমুদ্রসৈকতে অজস্র চলমান জীব দেখেছিল রাখালরাজ। কোনও জীবকেই ডাঙার জীব বলে মনে হয়নি। ডুগং বা তিমি এত ছোট হয় না— দুপায়ে হেঁটে বেড়ায় না— অর্থাৎ তাদের গায়ের চামড়া গাঢ় রঙের ডুগং আর তিমির চামড়ার মতো। রোদ ঠিকরে যাচ্ছিল সেই চামড়া থেকে। দিব্বি দুপায়ে তারা হেলেদুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বালির ওপর দিয়ে। আকৃতি তাদের অবিকল মানুষের মতোই— শুধু ওই গায়ের চামড়া ছাড়া। তাদের অনেকেই ঠ্যাং ছড়িয়ে বালির ওপর বসে পিঠ ফিরিয়েছিল সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল না কেউই। দেখবার জিনিস যেন এই পাহাড়ের রাজা। ঠিক যেন জল থেকে উঠে এসে বসে রয়েছে জলের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। হতভম্ব হয়ে যখন তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাখালরাজ, ঠিক তখনই সমুদ্রের জল তোলপাড় করে উঠে এসেছিল আস্ত একটা পাহাড়। তরতর করে জল কেটে ডাঙার কাছে এসে সটান উঠে গেছিল বালির ওপর। তলায় চাকা ছিল কি না বলতে পারবে না রাখালরাজ। চাকা থাকলে অত স্পিডে বালির ওপর দিয়ে যাওয়া যায় না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সমুদ্রের ধার থেকে অনেকটা ভেতরে এসে বালির ওপরেই দাঁড়িয়ে গেছিল চলমান পাহাড়।

আর অনেকগুলো ফুটো দেখা দিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে। পিলপিল করে বেরিয়ে এসেছিল গাঢ় রঙের তেলতেলে চামড়ার মানুষ। একটা বড় ফুটো দিয়ে টেনে এনেছিল একটা অদ্ভুত যন্ত্র। বালির ওপর সেটাকে রেখে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিচিত্র জীবগুলো।

তারপরেই ভেলকি দেখাতে শুরু করেছিল আজব যন্ত্রটা। গুমগুম শব্দ বেরচ্ছিল তার ভেতর থেকে। ঠিকরে যাচ্ছিল আলোর ঝলক। একটা আলো সটান এসে পড়ল পাশের পাহাড়ের চুড়োয়। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল চুড়োটা। আওয়াজ-টাওয়াজ কিছুই হল না। বিস্ফোরণ-টিস্ফোরণ দেখা গেল না। স্রেফ শূন্যে মিলিয়ে গেল পাহাড়ের চুড়ো।

চোখ বড় বড় করে সেই দিকেই চেয়েছিল রাখালরাজ। আলোর রশ্মিটা কিন্তু সরে যায়নি। পাহাড়ের চুড়ো যেখানে ছিল— ঠিক সেই জায়গা ফুঁড়ে অনেক দূরে আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

হাঁ করে চেয়েছিল বলেই এরপরের অসম্ভব কাণ্ডটা দেখতে পেয়েছিল ভূপর্যটক।

খুব আবছাভাবে ফের দেখা গেছিল চুড়োটাকে। যেন জমাট কুয়াশা দিয়ে তৈরি। আলোর রশ্মি তখনও তাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটু একটু করে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল চুড়োর চেহারা। একটু পরেই আগের মতোই পরিষ্কার দেখা গেছিল পর্বতশিখরকে। এখন আর আলোর রশ্মি তাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারছে না। একটু পরেই নিভে গেছিল আশ্চর্য রশ্মি।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে গেছিল রাখালরাজ।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও বৈজ্ঞানিক যা করতে পারেনি— এইমাত্র সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে গেল আশ্চর্য আলোর রশ্মি।

নিরেট জিনিসকে অদৃশ্য করে দিল চোখের সামনেই। দৃশ্যমানও করে তুলল চোখের সামনে।

কিন্তু কেন?

জবাবটা পেয়েছিল রাখালরাজ একটু পরেই। কিন্তু তার দাম দিতে হয়েছিল অনেক।

বলি দিতে হয়েছিল সাধের মাথার চুলগুলোকে। ধনুকের মতো বাঁকানো ভুরু জোড়াকে। আহারে! অমন লম্বা ঢেউখেলানো চুল— সব গেল।

কিন্তু আশ্চর্য মাহাত্ম্য তো টের পাওয়া গেল।

রাখালরাজের বউ নেই, ছেলেপুলে নেই— তাই প্রাণের মায়াও নেই। ও ঠিক করেছিল, কিম্ভূত জীবদের কাছ থেকে গিয়ে দেখতে হবে। ওই যে পাহাড়টা জল ঠেলে উঠে এসে ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে— ওটাকেও কাছ থেকে দেখতে হবে। কেনই বা তার গা থেকে রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে, সেটাও তো জানা দরকার। ধাতু দিয়ে তৈরি বডি নাকি? তা হলে তো পাথরের পাহাড় নয়— ধাতু দিয়ে তৈরি জলযান। গড়নটা পাহাড়ের মতো। কিন্তু কেন?

গুটিগুটি নীচে নেমেছিল রাখালরাজ। দিন গড়িয়ে তখন সন্ধে হয় হয়। বালির ওপর বসে থাকা প্রাণীগুলো একে একে পাহাড়-জলযানের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। অদ্ভুত আলোর সেই যন্ত্রটা কিন্তু তখনও বালির ওপর বসানো রয়েছে।

একটা ভুল করেছিল রাখালরাজ। ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখার লোভটা সামলাতে পারেনি। কিন্তু শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে পড়ন্ত রোদের আলো লেন্স থেকে অমনভাবে ঠিকরে যাবে কে জানত!

সঙ্গে সঙ্গে ফের জীবন্ত হয়ে গেছিল অদ্ভুত আলোর সেই মেশিন। রশ্মি ঠিকরে এসেছিল ওর ক্যামেরা লক্ষ্য করে।

ক্যামেরার সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছিল রাখালরাজের দুখানা হাত। কবজির পর থেকে হাত আর নেই। হতচ্ছাড়া রশ্মি শুধু ক্যামেরাই অদৃশ্য করেনি, দুহাত দিয়ে ক্যামেরা ধরা ছিল বলে, হাত দুটোকেও অদৃশ্য করে দিয়েছিল।

বিতিকিচ্ছিরি এই কাণ্ড দেখে ভয় পায়নি রাখালরাজ। রেগে গেছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে ক্যামেরা— কিন্তু তা অদৃশ্য। ক্যামেরা যখন ধরে রয়েছে— হাতদুটোও নিশ্চয় আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং রাখালরাজের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। রেগে গিয়ে চেঁচিয়েমেচিয়ে কী যে বলেছিল, তা ঠিক মনে নেই।

তবে চেঁচানি শেষ হতে না-হতেই পায়ের কাছে কী একটা নড়ে উঠতেই ও চোখ নামিয়ে দেখেছিল বিচিত্র মানুষদের একজনকে।

অবাক হয়ে লোকটা তাকিয়েছিল রাখালরাজের দিকে। খুবই বেঁটে সে— একহাতও লম্বা নয়। গায়ে লোম নেই। গায়ে জামাকাপড়ের বালাই নেই। চোখ দুটো কিন্তু অবিকল মানুষের চোখের মতো। বরং আরও বেশি উজ্জ্বল, আরও বেশি বুদ্ধিদীপ্ত।

এই পর্যন্ত দেখার পর আর কিছুই দেখতে পায়নি রাখালরাজ। চোখের সামনে থেকে সবকিছু মিলিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে শুধু মনে হয়েছিল— আলোর রশ্মিটা ওর মুখে এসে পড়েছে।

আবার যখন সব দেখা গেছিল, তখন সমুদ্রসৈকত বিলকুল ফাঁকা। মাথার ওপর তারা ঝকঝক করছে। নেই পাহাড়-জলযান, সেই খুদে মানবও নেই—

আর নেই রাখালরাজের মাথার চুল আর চোখের ভুরু।

হতভম্ব হলে মাথা চুলকোনো তার পুরনো স্বভাব। তাই হাতদুখানাকে আর ক্যামেরাটাকে ফের দেখা যাচ্ছে দেখে মাথা চুলকোতে গেছিল।

তখনই টের পেয়েছিল, মাথায় একগাছি চুলও নেই। বিলকুল টাক।

প্রফেসর শুনে-টুনে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। ওরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মহড়া চালাচ্ছে। তোমার চোখের রেটিনা অদৃশ্য হয়ে গেছিল বলে অন্ধ হয়ে গেছিলে। অদৃশ্য মানুষ দেখতে পায় না— ওয়েলস সাহেব ভুল লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাসে।'

'ম্যাগনেটিক ফিল্ড!' রাখালরাজ তেলা মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়েছিল।

'ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট এখন একটা মিথ্যে গুজব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বৈজ্ঞানিক মহলের সবাই এ ব্যাপারটা নিয়ে গোপনে ভেবে চলেছে। গোটা জাহাজকে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছিল ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে— অদৃশ্য জাহাজকে লোকজনসমেত দৃশ্যমান করা হয়েছিল আর-এক জায়গায়। কিন্তু পাগল হয়ে গেছিল বেশ কিছু লোক। অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ড পরমাণুদের ছত্রাখান করে দিয়ে অদৃশ্য করে দিচ্ছে বটে, কিন্তু দৃশ্যমান করে তোলার পর অবিকল আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারছে না। পাহাড়ি ছেলেটা পাগল হয়ে গেছিল এই কারণেই।'

হাবার মতো চেয়েই রইল রাখালরাজ। প্রফেসর বলে গেলেন, 'তোমার বেলা ঘটল অন্য বিপর্যয়। মগজের কোষগুলো ঠিকঠাক থাকলেও চুলগুলো গেল হারিয়ে। খুব অন্যায়। খুব অন্যায়। ক্যামেরার ফিল্মটা ঠিক আছে?'

'আজ্ঞে না। বিলকুল সাদা হয়ে গেছে। কোনও ছবিই ওঠেনি।'

'অর্থাৎ ওরা ভ্যানিশ করার ডিগ্রি একটু একটু করে আয়ত্ত করে আনছে। ঠিকমতো ডোজ ছাড়ছে। পাহাড়ি ছেলেটার বেলায় ডোজ বেশি হয়ে গেছিল বলে মাথা বিগড়েছিল। ক্যামেরার বেলায় শুধু ফিল্মের ছবি অদৃশ্য করে দিয়েছে— আর তোমার বেলায় পারমানেন্টলি অদৃশ্য করেছে তোমার মাথার আর ভুরুর চুল। তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে— যাতে আর ওমুখো না হও। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের টাইমলিমিট বেঁধে দিয়েছিল বলেই ওরা চলে যাওয়ার পর চুল বাদে মুণ্ডুটা দৃশ্যমান হয়েছিল। তোমার ভাগ্য ভাল, রেটিনাকে স্থায়ীভাবে অদৃশ্য করে দিয়ে যায়নি। তা হলে অন্ধই থেকে যেতে।'

লাফিয়ে উঠে বলেছিল রাখালরাজ, 'চুল তা হলে আছে। ফিরে পেতে পারি? আবার ভুরু নাচাতে পারব?'

ঠোঁট উলটে বলেছিলেন প্রফেসর, 'সেটা ওদের দয়া। কলকাতায় খুব শিগগিরই ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কাজে লাগিয়ে মানুষের শরীরের ভেতরের সবকিছু দেখার এক যন্ত্র আসছে। সেখানে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারো। তবে সে মেশিনের ক্যাপাসিটি তো মোটে ষাট হাজার গুণ।'

‘কীসের ষাট হাজার গুণ?’

‘পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের।’

‘তা হলে ওদের কাছেই যাই।’

‘যাও।’

‘কিন্তু ওরা কারা প্রফেসর?’

‘খুব সম্ভব ডুবে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশের বংশধর,’ ঠাট্টার সুরে বললেন প্রফেসর, ‘ফিরে এসে আসল খবরটা দিয়ো।’
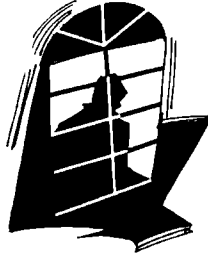
দজ্জাল দর্পণ

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আর ডক্টর গোপাল গোলদার দুজনে দুজনকে ঘুষি দেখিয়ে বললেন, 'জোচ্চোর! চারশো বিশ! ঠগ! প্রবঞ্চক!'

চারটে বিশেষণ একই সঙ্গে দুই বৈজ্ঞানিকের মুখ দিয়ে বেরোয়নি। প্রথমে তেড়ে এসেছিলেন ড. গোলদার। তিনি ঘুষি উঁচিয়ে বলেছিলেন, 'জোচ্চোর! চারশো বিশ!'

দপ করে জ্বলে উঠেছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। ঘুষি মারার বিদ্যেটা উনি আমার কাছ থেকেই রপ্ত করেছেন মনে হল। দ্বিগুণ বেগে তেড়ে গিয়ে ঘুষি তুললেন, 'ঠগ! প্রবঞ্চক!'

উল্কা স্পিডে আমি মাঝে চলে গেলাম। ফলে, দমাদম ঘুষি খেয়ে গেলাম। বিদ্যাসাগর ঠিকই বলেছেন, কারও উপকার করতে নেই।

অথচ ঘুষোঘুষির মূল কারণটা নিতান্তই তুচ্ছ। ড. গোপাল গোলদারের নামকরণ করার সময়ে তাঁর বাবা-মা কেউই ভাবেননি, তাঁদের পুত্ররত্ন বাস্তবিকই গোল বলের মতন হবেন বড় হলেই— মুখখানাও হবে গোরুর মতো বোকা বোকা আর নিরীহ।

খাদ্যাভ্যাসও হবে গোরুর মতন— সব সময়ে জাবর কেটেই চলবেন। ভুঁড়ি ঝুলতে ঝুলতে মাটিছোঁয়া হয়ে যাবে, চোখ দুটোও গোরুর মতন— নিস্পৃহতায় সদা উদাসী হয়ে থাকবে।

স্কুললাইফে দুই কিশোর (একজন ভবিষ্যতের নাটবল্টু চক্র, অপরজন ভবিষ্যতের গোপাল গোলদার) হরিহর আত্মা বন্ধুবিশেষ ছিলেন। নাটবল্টু চক্রর নতুন নাম দেন গোপাল গোলদার। ফুটবল মাঠে গোপাল গোলদারের এই বন্ধুটি (প্রফেসর নাটবল্টু চক্র) যখন পাঁইপাঁই করে দৌড়োতেন, তখন মনে হত যেন তাঁর পায়ে চাকা লাগানো আছে, যখন চার্জ করার নামে ল্যাং মারতেন— তখন ধরাশায়ী প্রতিপক্ষ গলার শির তুলে চেঁচাত— তোর পায়ে লোহার নাট, লোহার বল্টু আছে নাকি? ওই তো কঙ্কালের মতন হাড্ডিসার চেহারা— উফ! গেল বুঝি পা-খানা ভেঙে!

গোপাল গোলদার গোরুর মতন ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে গোলালো বপু নিয়ে গোলকিপারের কাজটা ভালই করতেন। গোলপোস্টে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'নাটবল্টু...নাটবল্টু... চক্র...চক্র' (চক্রবর্তীর, অপভ্রংশ চক্র—।) মাঠশুদ্ধু ছেলেরা চেঁচিয়ে বলেছিল, 'ফাউল... ফাউল... নাটবল্টু চক্রর ফাউল।'

রেগে টং হয়ে গিয়ে নতুন নামপ্রাপ্ত নাটবল্টু চক্র বন্ধুবর গোপাল গোলদারকে বললেন, 'তুই...তুই একটা গোগো।' এমনভাবে বললেন যাতে মনে হয়, গোগো এক শ্রেণির ছুছুন্দর (ছুঁচো) জাতীয় জীব। যদিও গোপাল গোলদারের অপভ্রংশ হল গোগো।

রেগে কাঁই হতেন গোগো। আজও রেগে কাঁই হয়ে ঘরে ঢুকেই প্রফেসরকে বলেছিলেন, 'কীরে নাটবল্টু, আর কত ফোর-টোয়েন্টি কারবার চালাবি?'

রেগে টং হয়ে প্রফেসরও তখুনি বলেছিলেন, 'লোক ঠকিয়ে জাবর কেটেই যা, গোগো— ঢুকে থাক গর্তে— তোর দ্বারা কিসসু হবে না।'

ব্যস, তারপরেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সূচনা এবং আমার মধ্যস্থতা।

উত্তাপ প্রশমনের পর গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে খোসাছাড়ানো চিনেবাদাম বের করে চিবোতে লাগলেন ড. গোগো। খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই— সত্যিই যেন জাবর কাটছেন।

বিরসবদনে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বললেন, 'আসা হয়েছে কী জন্যে?'

তখুনি জবাব দিলেন না ড. গোগো। পরপর আরও তিনমুঠো চিনেবাদাম খেলেন। চোখদুটো সত্যিই গোরুর মতন। যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। খুব ধড়িবাজরা বাইরে বোকা সেজে থাকে। এদেরকে সাবধান। আমিও সাবধান হলাম।

খ্যাংরাকাঠি প্রফেসরও কাঠ হয়ে রইলেন।

সমস্ত বাদাম ভুঁড়িতে চালান করার পর বললেন ড. গোগো, 'ইপাচি লোক লাগিয়েছে।'

এইবার যে কথাটা বললেন প্রফেসর, তা শুনেই বুঝলাম, উনি ড. গোগোর হাঁড়ির খবরও রাখেন। চেপে রেখেছেন আমার কাছেও।

বললেন, 'তোর দজ্জাল দর্পণের জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

আমি আর বোবা হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। সাঁটে কথাবার্তা আমার সামনে? আমি কি গোপন কথা ফাঁস করে দিই? একটু আধটু গপ্পো লিখি ঠিকই— তাই বলে আমাকে অবিশ্বাস করা?

মুখখানা নিশ্চয়ই তোলা উনুনের মতন করে ফেলেছিলাম। প্রফেসর তা দেখেই প্রমাদ গুনলেন। সাত তাড়াতাড়ি বললেন, 'আরে শোনো, শোনো।'

শুনে তো আমি থ। এরকম একটা তাজ্জব আয়না আবিষ্কার করে বসে আছেন ড. গোগো, কাকপক্ষীও তা জানে না।

না, না, জানে। জেনে ফেলেছে। গর্তে ঢুকে, মানে গোপন আস্তানায় ঘাপটি মেরে থেকে বৈজ্ঞানিক গোগো শুধু বিজ্ঞানের সাধনাই করেননি— দেশ-বিদেশের ম্যাজিক আর কিংবদন্তি, মারণ-উচাটনের তন্ত্রমন্ত্র থেকে শুরু করে ভুডুইজম, জ্যান্ত মানুষকে জ্যান্ত মড়া বানানো ইত্যাদি উদ্ভট অবিশ্বাস্য ব্যাপার নিয়ে বছরের পর বছর গবেষণা করে গেছেন বস্তা বস্তা চিনেবাদাম খেয়ে। আর কিছু খাননি। শুধু চিনেবাদাম আর পিপে পিপে জল।

ফল যা হয়েছে, তা একই সঙ্গে অত্যাশ্চর্য আর মারাত্মক। ওঁর আশ্চর্য আবিষ্কার জানাজানি হয়ে গেলেই পৃথিবী কেঁপে উঠবে, তার পরেই পৃথিবীর সর্বনাশ হওয়া শুরু

হবে। মহাবিপদটা হাইড্রোজেন বোমা ফাটানোর চাইতেও ভয়ানক।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তাই ওঁকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, 'চেপে যা, গোগো, চেপে যা, তুইও ওর সামনে যাসনি।'

ওর সামনে, মানে, গোগো-র তৈরি আয়নার সামনে।

গেলেই আয়না কায়াকে টেনে নেবে নিজের বুকে। পেছন দিয়ে বেরিয়ে যাবে ছায়া।

প্রথম প্রথম কুকুর বেড়াল দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন গোগো, সটাসট তাদের খেয়ে নিয়ে শুধু ছায়াকে বের করে দিল আয়না, সে ছায়াদের কোনও শক্তি নেই। না পারে মিউ মিউ করতে, না পারে ঘেউ ঘেউ করতে। চুরি করে খায়ও না। ছায়াভূত হয়ে স্লান মুখে ঘুরে বেড়ায় বাড়িময়।

তারপর একটা স্পাই ঢুকল গোপন গবেষণাগারে। ড. গোগো তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আয়নার সামনে নিয়ে গেলেন। আয়না সঙ্গে সঙ্গে তার কেরামতি দেখিয়ে দিল। কায়া লুফে নিয়ে ছায়াকে বের করে দিল। সে এখন ছায়াভূত হয়ে বিষণ্ণ বদনে ঘুরঘুর করছে।

প্রফেসর আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, 'বুঝলে দীননাথ? এই হচ্ছে ছায়াবিশ্ব। যাকে অনেকেই বলছে প্রতিবিশ্ব। ঠিক এইরকম বিশ্বর পালটা বিশ্ব কোথাও-না-কোথাও আছে। সেখানে ঠিক তোমার মতন একটা দীননাথ, এই পৃথিবীর মতন একটা পৃথিবী, এমনকী এই গোগো-র মতন একটা গোরুও আছে।'

খ্যাঁক করে উঠলেন ড. গোগো, 'তোর মতন একটা চিংড়িও আছে।'

কর্ণপাত না করে বলে গেলেন প্রফেসর, 'গোগো কিন্তু স্রেফ চিনেবাদাম খেয়ে আর সাধনভজন করে আর একটা বিশ্ব আবিষ্কার করে ফেলেছে। ওর থিয়োরি অনুসারে, প্রত্যেকটা ব্ল্যাকহোলের মধ্যে এইরকম একটা ছায়াবিশ্ব রয়েছে। মানুষ মরে সেখানে গিয়ে ছায়া হয়ে যায়। পৃথিবীটাকে যাদের বেশি ভাল লাগে, তারা ছায়াশরীরী হয়ে ফিরে আসে। আমরা তাদের ভূত বলি।'

ড. গোগো আর-একমুঠো চিনেবাদাম মুখে পুরে বললেন, 'ধানাইপানাই ছাড়ো, ইয়ার। কাজের কথায় এসো।'

প্রফেসর কটমট করে তাকালেন, 'গর্তে থেকে থেকে তোর ল্যাংগুয়েজটা খারাপ করে ফেলেছিস। ওই জন্যে খারাপ লোক তোর কাছে ঘুরঘুর করছে।'

গোরু গোরু চোখে তাকিয়ে কচরমচর করে চিনেবাদাম চিবিয়ে গেলেন ড. গোগো।

প্রফেসর বললেন, 'ইপাচি জেনে গেছে আয়নার খবর।'

এই প্রথম কথা বললাম আমি, 'ইপাচি কে?'

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন, 'গপ্পো-টপ্পো লেখা হবে না তো? যদিও ব্যাপারটা গপ্পোর মতন আজগুবি।'

সখেদে আমি বললাম, 'সব গপ্পো আজগুবি নয়। আপনার কাণ্ডকারখানা কি আজগুবি? আমার গপ্পো তো আপনাকে নিয়ে।'

'বাবা দীননাথ, গোগো-কে পাবলিসিটি দিতে যেয়ো না। মারা পড়বে।'

'ইপাচি কে?'

ঠিক সাড়ে সাত সেকেন্ড মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন প্রফেসর।

তারপর বললেন, 'ইন্ডিয়া— পাকিস্তান— চিন— সন্ধি করো। শুধু প্রথম অক্ষরগুলো নাও। কী হল? ইপাচি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলাম আমি।

'ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, চিনদেশের গুঁতোগুতি দেখে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বেশ কিছু শক্তিমান পুরুষ গোপনে একটা দল পাকিয়েছে। তারা চায়— ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, চিন জুড়ে গিয়ে একটা দেশ হোক। তার নাম হোক— ইপাচি।'

আমি খাবি খেলাম।

প্রফেসর চালিয়ে গেলেন, 'ইপাচি-র মারদাঙ্গা এজেন্টরা দজ্জাল দর্পণের বৃত্তান্ত জেনে ফেলেছে। তারা এই দর্পণ নিয়ে গিয়ে ফেলবে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-চিনের-রথীমহারথী রাষ্ট্রনায়কদের সামনে। একে একে তারা মিলিয়ে গিয়ে মহাভূত, মানে, ছায়াশরীর নিয়ে নিজের নিজের দেশে বিচরণ করবে। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-চিনের লাগাম ধরবে ইপাচি-র কর্তারা।'

সবেগে বললাম, 'সে তো ভালই।'

সখেদে বললেন প্রফেসর, 'স্টুপিড। আমরা বৈজ্ঞানিক, আমাদের আবিষ্কার নিয়ে রাজনীতি চলবে না... চলবে না।'

কোরাস গাইলেন ড. গোগো, 'চলবে না... চলবে না।'

অগত্যা আমাকে আসরে নামতে হয়েছিল। ইপাচি-র প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিয়েছি। দজ্জাল দর্পণ কিন্তু এখন আমার দখলে।

এই কাহিনি যারা অবিশ্বাস করবে, তারা ইচ্ছে করলে এসে দর্পণের সামনে দাঁড়াতে পারে।
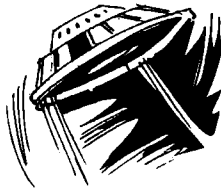
মেহগনি জঙ্গলের বিস্ময়

যথারীতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলেন প্রফেসর। তারপরেই এল তাঁর চিরকুট— 'চলে এসো, চলে এসো, বিস্ময়প্রিয় বোকা দীননাথ। এসে ভাব, অ্যাডভেঞ্চার করবে কি না।'

গালে হাত দিয়ে বসে গেছিলাম। এ আবার কী হেঁয়ালি! অ্যাডভেঞ্চারের পোকা আমি। বিপদের গন্ধ পেলেই আমার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু মহানন্দে ধেই ধেই করে নাচে আর গলা ছেড়ে গান ধরে, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

প্রফেসর তো এসব জানেন। গণ্ডারের গোঁ নিয়ে বদ অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ে পাছে অক্কা পাই— তাই সব জায়গায় আমাকে নিয়ে যান না। নিজে গা-ঢাকা দেন। এরকম অনেকবার হয়েছে। খুঁজে খুঁজে তাঁকে বের করতে হয়েছে। অথবা এই বোকা দীননাথের জন্যে মন কেমন করায় নিজেই ঠিকানা পাঠিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কখনও লেখেননি, এসে ভাব, অ্যাডভেঞ্চার করবে কিনা।

ধাঁধায় পড়লাম সে কারণেই।

অ্যাডভেঞ্চার তো করবই— পেলেই ঝাঁপ দেব। কিন্তু একথা উঠছে কেন? আমাকে রুখতে চান বলে?

তা হলে আবার ডাকছেন কেন? বিপদে পড়েছেন বলে?

এক লাইনের নেমন্তন্নপত্রে দুটো শব্দ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। বিস্ময় আর প্রিয়। হাইফেন দিয়ে জুড়ে দিয়েছেন বটে। কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা মানে নিয়ে আমার মনের কোণে খোঁচা মেরে চলেছে চিঠি পড়া ইস্তক।

বিস্ময় আমার প্রিয় সন্দেহ নেই। প্রফেসর যেখানে আছেন, নিশ্চয় সেখানে সৃষ্টিছাড়া কোনও বিস্ময় রয়েছে। সে বিস্ময় এমনই বিস্ময় যে দেখলে পিলে আমার চমকাবেই। জবর সেই বিস্ময় নির্ঘাত প্রবল হাতছানি দেবে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধের জোগান দিয়ে। সেই গন্ধে পাগল আমি হবই।

কিন্তু সে অ্যাডভেঞ্চার নিশ্চয় ভয়ানক বিপদে ভরা। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তাই ঘর ছেড়ে বেরুনোর আগেই আমাকে হুঁশিয়ার করতে চেয়েছেন।

মানেটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই আমি গণ্ডার হয়ে গেলাম। শিং উঁচিয়ে তেড়ে গেলাম প্রফেসরের পাশে।

প্রফেসর বসেছিলেন একটা প্রকাণ্ড মেহগনি গাছের তলায়। জায়গাটা কলকাতা থেকে অনেক দূরে। ক্যারিবিয়ান সাগর আর মেক্সিকো উপসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় যেন পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইউকাটান উপদ্বীপ। সত্তর হাজার বর্গ মাইলের বেশিরভাগই চুনাপাথর। নদীর বালাই নেই জমির ওপর। জায়গাটার পয়লা নম্বর বিস্ময় এখানেই। নদী ছিল এককালে। এখন সব পাতালে চলে গেছে। ফল্গু নদীর রমরমা চলছে সত্তর হাজার বর্গমাইল জুড়ে।

জায়গাটার দোসরা বিস্ময়, মায়া সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ। সুপ্রাচীন সেই মায়া সভ্যতা— যা বৈজ্ঞানিক আর প্রত্নতাত্ত্বিকদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে ছেড়েছে। ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা ধ্বংসস্তূপগুলোর কেন্দ্র এইখানেই। বলা চলে ভগ্নস্তূপের আড়ত।

আমি এসেছি ইউকাটানের দক্ষিণ অঞ্চলে। নিবিড় সবুজ অরণ্য মনের মধ্যে যেন ঠান্ডা মলম বুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এমন গাঢ় মেহগনি এই প্রথম দেখছি। নিরক্ষীয় আমেরিকার ঘন জঙ্গলেই এমন মেহগনি জন্মায়। বেশ ভারী কাঠ। ফার্নিচার করার উপযুক্ত।

আমার চোখ কিন্তু মেহগনির দিকে নেই। রয়েছে সামনের আজব পিরামিডটার দিকে। অলস নয়নে এই দিকেই তাকিয়ে বসে আছেন প্রফেসর। পেছনের তাঁবুর ওপর ঝুঁকে পড়েছে মেহগনির ডাল। বড়সড় কয়েকটা বাঁদর ওই ডালে লাইন দিয়ে বসে জুলজুল করে দেখছে আমাদের।

মিশরের পিরামিড ঢের দেখেছি। কিন্তু এমন পিরামিড দেখছি এই প্রথম। পিরামিডদের মধ্যে দানব।

চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। শুধু অতিকায় বলে নয়— এমন সাদা পিরামিড কখনও দেখিনি।

সবুজ জঙ্গলের মাঝে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। মাঝে খাড়াই পাহাড়। এই পাহাড়ের মাথায় তৈরি হয়েছে দানবিক সাদা পিরামিড। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে ওর শ্বেতবপু থেকে। আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, মাথা ঘুরিয়ে ছাড়ছে।

অবিশ্বাস্য! এক্কেবারে অবিশ্বাস্য! বাস্তবে এমন পিরামিড হয় কীকরে! অথচ দেখছি তো নিজের একজোড়া চক্ষুবীক্ষণ দিয়েই।

বালিপাথরের রং বিলকুল সাদা। শ্বেতবর্ণের মধ্যে নেই কোনও ভেজাল। মেক্সিকোর সূর্য পরমানন্দে কিরণ বর্ষণ করে চলেছে সাদা বালিপাথরে।

চারপাশের ঘন সবুজের মাঝে সাদা দানব। চোখে লাগার মতো বর্ণবৈচিত্র্য। দানবিক পিরামিড তাই চোখের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ব্রেনের ভেতর ঝড় তুলেছে।

'মানুষের হাতে তৈরি বলে তো মনে হচ্ছে না,' বলেছিলাম বিস্ময় মন্থর স্বরে।

প্রফেসরের যেন চমক ভাঙল। বললেন, 'কিন্তু প্রকৃতি আর যাই বানাক, স্ট্রেট লাইন বানাতে পারে না। এই পিরামিডের দিকে দিকে রয়েছে সোজা সরল রেখা। যা বানাতে জানে মানুষ— আর কেউ না।'

'আর কেউ না'— শব্দ তিনটে একটু অস্বাভাবিক সুরে বললেন প্রফেসর! ঝটিতি মুখ ফেরালাম তাঁর দিকে। তিনি কিন্তু চেয়েই আছেন অপরাহ্নের রৌদ্র-ঝলকিত শ্বেত-ইমারতের দিকে।

ঝড়ের মেঘ জড়ো হচ্ছে মাথার ওপর। কালো কুচকুচে মেঘ। আসন্ন প্রলয়ের পূর্বাভাস। মেঘ চলেছে পাহাড়চুড়োর পিরামিডের দিকে। ঝলমলে রোদও ম্রিয়মাণ হচ্ছে। দিনের আলো স্তিমিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। অন্ধকার একটু পরেই গ্রাস করবে বিপুলকায় এই শ্বেত বিস্ময়কে।

নিরন্ধ্র তমিস্রায় অরণ্যের চরিত্র তখন হয়তো পালটে যাবে। এখন যা মধুময়— তখন তা ভয়াল ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কিচমিচ করে যেন আমার চিন্তাকে সায় দিয়ে গেল মেহগনির বাঁদরগুলো। ফিরলাম প্রফেসরের দিকে। বললাম, বিজ্ঞানদুনিয়া স্তম্ভিত হয়ে যাবে আপনার এই আবিষ্কারের খবর পেলে। শুরু হবে অভিযানের পর অভিযান।

নড়ে বসলেন প্রফেসর। অস্বস্তির চাঞ্চল্য। আমার উক্তি তাঁর মনমতো হয়নি। বললেন, 'প্রথম দর্শনে বিশাল মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে তেমন বিরাট নয়।'

আমি বললাম, 'প্রফেসর, আমাকে যতটা বোকা ভাবেন, আমি ততটা বোকা নই। মিশরের পিরামিড নিয়ে আপনি যখন গবেষণা শুরু করেছিলেন, আমি ছিলাম আপনার নিত্যসঙ্গী। চিওপস-এর গ্রেট পিরামিডও এই পিরামিডের সামনে নেহাতই বামন।'

কালো মেঘের দঙ্গলের দিকে চোখ তুললেন প্রফেসর। পাতলা কালো যবনিকার চেহারা নিচ্ছে মেঘ। শ্বেতবিস্ময়কে মুড়ে দেওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি। বললেন, 'ঝড় উঠবে এখুনি। আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আরও কাছ থেকে দেখো।'

শুনেই এতজোরে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম যে, পেছনের বাঁদরগুলো চমকে উঠল। বিষম কলরব তুলে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল মেহগনির ঘন পাতার আড়ালে।

কড়া গলায় বললাম, 'এখুনি... এখুনি...এখুনি। ভেতরে ঢোকবার পথ যদি থাকে, ভেতরেই ঢুকব এখুনি।'

ঢোক গিললেন প্রফেসর, 'ঢোকবার পথ আছে কিন্তু পিরামিডের ওদিকে। যেতে যেতেই রাত ঘনাবে।'

কটমটে চোখে প্রফেসরের গুলি গুলি চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে? হয়েছে কি আপনার?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন প্রফেসর, 'ভয় পাব কেন? দ্বিধায় পড়েছি। আজ পর্যন্ত যত পিরামিড দেখেছি, তাদের তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই পিরামিড নির্মাণের উদ্দেশ্যটা—'

বলতে বলতে থমকে গেলেন প্রফেসর। মুখে আর কথা নেই।

আমি বললাম, 'বেশ তো, দেখেই আসা যাক না কেন। আপনি গ্রিন সিগন্যাল না দিলে তো এই নিয়ে গল্প লিখতে বসব না।'

'গল্প!' বলে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প? যত্তো সব বুজরুকি।'

মাথাটা চড়াত করে উঠল। অতি কষ্টে সামলে নিলাম। বিজ্ঞানজগতে খোলামন নিয়ে চলেন প্রফেসর। তাই তো এত পিলে চমকানো কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়েন। কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের

অতীব সম্ভাবনাময় গল্প-কাহিনির নাম শুনলেই ঝাঁজিয়ে ওঠেন।

ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

জুলজুল করে আমার দিকে তাকালেন প্রফেসর। একটু নরম গলায় বললেন, 'লেখো না! ছাইপাঁশ লেখায় আমার কিছু এসে যাবে না। ও গল্প কেউ বিশ্বাসও করবে না। এখানেও কেউ বাগড়া দিতে আসবে না।'

আমি বললাম, 'তা হলে মুখে চাবি এঁটে আছেন কেন? এরকম একটা পিরামিড যে এই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, সে খবর তো পেয়েছেন অনেকদিন— মুখে কুলুপ এঁটে আছেন কেন?'

'সেই ক্যারিবিয়ান ভূতটার জন্যে।' বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর।

'ক্যারিবিয়ান ভূত!' খাবি খেলাম আমি।

'ক্যারিব...ক্যারিব... নামটা দিয়েছিলেন কলাম্বাস। ক্যারিব শব্দের অপভ্রংশই তো ইংরেজিতে— ক্যানিব্যাল। নরখাদক। অতি হিংস্র জাত। খাঁটি ক্যারিবদের আলাপ এই ক্যারিব ভূতটার সঙ্গে।'

'ভূত!'

'দুর ভূত! কথাও বোঝে না? আস্ত আদিবাসী ওই ক্যারিব-এর মুখেই শুনেছিলাম, এখানে রয়েছে এক আশ্চর্য পিরামিড।... বলেছিল অবশ্য ওর ক্যারিব ভাষায়— মানে বুঝতে আমার কালঘাম ছুটে গেছিল। বুঝলাম যখন, তখন চক্ষু চড়কগাছ। সেই থেকে আমার খাওয়াদাওয়া ঘুমটুম মাথায় উঠেছে। তোমাকেও বলিনি। নিজের চোখে না দেখে তোমাকে টেনে আনতে চাইনি।'

'ও...ও...ও!' বলে চুপ মেরে গেলাম আমি।

সান্ত্বনার সুরে বলে গেলেন প্রফেসর, 'চটছ কেন? আসবার সময়েই তো দেখলে আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চল এইটা। যখন এসে পৌঁছলে, স্পষ্ট দেখলাম তোমার মতন ছেলেরও জিভ বেরিয়ে গেছে।'

বলে আমার দিকে চাইলেন প্রফেসর। তাঁর রসিকতা যে আমার ভাল লাগেনি, তা বুঝলেন। গ্রাহ্য করলেন না।

বলে চললেন, 'উপত্যকায় ঢোকবার আগে কি কল্পনাও করতে পেরেছিলে, এমন একটা তাজ্জব দৃশ্য তোমার পথ চেয়ে বসে আছে? তাও আবার পুরোটা দেখা যায় শুধু আকাশ থেকে? আমাকেও অবশ্য সেভাবেই দেখতে হয়েছে।'

'আকাশ থেকে দেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই। ক্যারিব ভূতটার গপপো শুনেই কি দৌড়ে এসেছি বনজঙ্গল ঠেঙিয়ে? এই বয়েসে পোষায়? আগে যাচাই করা দরকার তো! আকাশপথে দেখে গেছিলাম বলে আবিষ্কারটা করতে পারলাম, নইলে চোখের আড়ালে থেকে যেত আরও কয়েকশো বছর।'

'আপনার আগে আকাশপথে আর কেউ দেখেনি?'

'না। কারণ, আকাশের এরোপ্লেনরা বাঁধাধরা পথে যাতায়াত করে— এটা পড়ছে রুটের বাইরে। তাই আমাকে আলাদা প্লেন ভাড়া করতে হয়েছিল।'

‘অনেক টাকা উড়িয়েছেন?’

‘কে খাবে আমার টাকা? সবই তো বিজ্ঞানের জন্যে।’

‘কিন্তু প্রফেসর, এতবড় আবিষ্কার এতদিন চেপে রেখেছেন কেন? কেন বিজ্ঞান-দুনিয়াকে জানাননি? একা এসে তাঁবু খাটিয়ে বসে আছেন কেন? আমি না হয় বোকা-হাঁদা, বিজ্ঞানীরা তো নন।’

‘তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, বিজ্ঞানমহলকে জানাতে আমার বয়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, বসে আছি অভিযানের আনন্দে। যে আনন্দ করতে তুমি সাত সুমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে উড়ে এসেছ এখানে।’

‘লোকালয়ের সঙ্গেও তো যোগাযোগ রাখেননি।’

‘বিজ্ঞানী হতে গেলে কি লোকালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়? মূর্খ! যে মুহূর্তে দেখেছি এই পিরামিড, সেই মুহূর্তেই একটা আইডিয়া ডালপালা মেলে ধরেছে মাথার মধ্যে। প্রথম যখন পুরাতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলাম— সে অনেক বছর আগের কথা, আইডিয়াটা তখনই অঙ্কুরিত হয়েছিল মাথার মধ্যে। এখানকার মাটিতে পা দিয়েই বুঝলাম, আইডিয়াটা কারেক্ট।’

‘থিয়োরিটা কী?’

‘কথায় কাজ কী বৎস, চোখ যখন রয়েছে!’

‘চলুন, যাওয়া যাক।’

‘আজ রাতেই?’

‘নিশ্চয়।’

‘তাঁবুর মধ্যে দুটো হ্যাজাক আছে। জ্বালিয়ে আনো।’

মিনিট পনেরো পরেই পৌঁছে গেলাম পিরামিডের পাশে। চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল স্মৃতিসৌধের বিশালতা দেখে। পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিরামিডের স্থাপত্য দেখছিলাম, আর অবাক হচ্ছিলাম। রীতিমতো অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছি তো দেখছিই।

মিশরের পিরামিডের যে স্থাপত্যের মুনশিয়ানা বিশ্ববাসীর চক্ষুস্থির করেছে— এই পিরামিডেও রয়েছে সেই একই স্থাপত্যদক্ষতা। তফাত শুধু একটা জায়গায়।

এখানকার সবকিছুই নির্মিত দানবিক মাপকাঠিতে। সে তুলনায় মিশরীয় মাপকাঠি পিগমি-মাপকাঠি বললেও চলে। প্রত্যেকটা পাথরের ব্লক যেন দৈত্য কারিগরের হাতে তৈরি হয়েছে।

টানা লম্বা পিরামিডের মাঝবরাবর গিয়ে আঙুল তুলে দেখালেন প্রফেসর। না দেখালে দেখতেই পেতাম না— নির্ঘাত চোখ এড়িয়ে যেত।

খুব ছোট ছোট সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে আজব পিরামিডের গা বেয়ে।

প্রফেসর বললেন, ‘ওই সিঁড়ি বেয়ে যেতে হবে ঢোকবার সুড়ঙ্গে।’

প্রায় একশো ফুট উঠলাম সেই সিঁড়ি বেয়ে। তারপরেই দেখলাম, ধাপগুলো বেশ চওড়া হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা প্রশস্ত চাতালে। চাতালের শেষে মানুষ-সমান উঁচু সুড়ঙ্গের মুখ।

‘পিরামিডের বুকে ঢুকে যাওয়ার সুড়ঙ্গ।’— গভীর গলায় বললেন প্রফেসর।

তাঁর গলায় যেন ম্যাজিক ছিল। আমার ধমনির রক্তে নাচন লাগল। আবিষ্ট গলায় বলেছিলাম, 'মিশরের পিরামিডের মতন।'

'উলটো বললে, দীননাথ। মিশরের পিরামিডের সবকিছুই এই পিরামিডের মতন। আদি পিরামিড এইটাই।'

'আদি পিরামিড!'

'এই পৃথিবীর প্রথম পিরামিড। পিরামিড তৈরির আইডিয়া এখান থেকেই ছড়িয়েছে। যে কিংবদন্তির ভিত্তিতে পিরামিডের পর পিরামিড তৈরি হয়েছে, যে কিংবদন্তি হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে রয়েছে, সেই কিংবদন্তির সূত্রপাত করেছিল তারা— যখন বেঁচেছিল।'

'তারা...যখন...বেঁচেছিল! প্রফেসর, মাথার ঢুকছে না। তারা, মানে, কারা?'

'পরে জানবে। আগে চলো সমাধিগর্ভে— কবরঘর বলেই যে ঘরকে সবাই জানে।'

একটা হ্যাজাক হাতে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকলেন প্রফেসর। পেছনে আমি।

কিছুক্ষণ হাঁটলাম না-নেমে না-উঠে। সুড়ঙ্গ চলেছে জমির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায়। তারপরেই আচমকা পথ উঠে গেল ওপর দিকে। এখানকার সুড়ঙ্গ বেশ ভ্যাপসা। নাকে ভেসে আসছে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ— সেইসঙ্গে একটা কটু গন্ধ। অনেকদিন পড়ে থাকা, ব্যবহার-না-করা জিনিসপত্র থেকেই এমনি বিশ্রী গন্ধ বেরোয়।

তারপরেই আচমকা সরু সুড়ঙ্গ আর সরু রইল না। দুপাশের দেওয়ালে আর হাত রাখা গেল না। দেখলাম, ঢুকে পড়েছি একটা ঘরে। ছোট্ট ঘর। মাথার ওপর তুলে ধরলাম হ্যাজাক লণ্ঠন। ঘরটা খুবজোর চওড়ায় বিশ ফুট, লম্বাতেও বিশ ফুট। শক্ত গোলাপি বালিপাথরের ব্লক দিয়ে মোড়া চার দেওয়াল। এত সুন্দরভাবে ব্লকগুলোকে পাশাপাশি বসানো হয়েছে যে জোড় খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু মঞ্চ। মঞ্চে বসানো খোদাই করা চারটে প্রস্তর-শবাধার।

দেখেই ঝিলিক মেরেছিল আমার ব্রেনে। মিশরের পিরামিডে দেখেছি এইরকম প্রস্তর শবাধার। মিশরাধিপতিদের সমাধি। গিজার তিনটে পিরামিড তো আজও পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য। শবাধারে শুয়ে আছে পাঁচহাজার বছর আগে মৃত নৃপতির মমি।

তাই তনুমন নেচে উঠেছিল আমার। লাফিয়ে উঠে পড়েছিলাম মঞ্চে। হ্যাঁচকা টান মেরেছিলাম একটা শবাধারে। দেখতে চাই... দেখতে চাই... হাজার হাজার বছর আগে মমিকে কীভাবে শোয়ানো হয়েছিল, তা দেখতে চাই।

কিন্তু কী ভারী ডালা! আমার মতন জাঁদরেল পুরুষও পারল না একচুলও নড়াতে।

ব্যাকুলভাবে চেয়েছিলাম পেছনে প্রফেসরের দিকে। হ্যাজাকের জোরালো আলো মাটিতে নামিয়ে রেখে অদ্ভুত চোখে চেয়ে আছেন আমার দিকে। নিচ থেকে আলো ধেয়ে গিয়ে তাঁর চিবুকে আটকে যাওয়ায় চোখের হেঁয়ালি যেন আরও রহস্যময়।

'প্রফেসর!' আমার উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বর চৌকোনা প্রস্তরকক্ষে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে ফিরে আছড়ে পড়েছিল আমারই কানে। গুরুগম্ভীর শব্দলহরী সুড়ঙ্গপথে ধেয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেছিল দূর থেকে দূরে।

খট-খটাস শব্দটা কানে ভেসে এসেছিল ঠিক তখনই। আমার পেছনকার প্রস্তরশবাধার মুখর হয়েছে আচম্বিতে।

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

সবিস্ময়ে দেখেছিলাম সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

ভারী পাথরের যে ডালা আমি হেঁইও হেঁইও করেও একচুল তুলতে পারিনি— সেই ডালা এখন উঠে রয়েছে ঠিক ইঞ্চিখানেক।

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল ভয়ানক ভৌতিক এই ব্যাপার দেখে। শবাধারে যে ব্যক্তি শুয়ে আছে, নিঃসন্দেহে তার কীর্তি। আমার চিৎকারেই বোধহয় ঘুম ভেঙেছে। বিরক্ত হয়ে ডালা ঠেলেছে ভেতর থেকে।

এক লাফে নেমে এলাম মঞ্চ থেকে। জানি না তখন ঠকঠক করে কেঁপেছিলাম কিনা, তবে গলা যে কেঁপে গেছিল, তা স্বকর্ণে শুনেছি। বলেছিলাম, 'প্রফেসর, মমি কি জ্যান্ত হয়?'

হ্যাজাক রেখে এসেছিলাম মঞ্চে। শবাধারটা স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছি। ভেতর থেকে ব্যান্ডেজ-জড়ানো আঙুল বের করে পাথরের বাক্সর গা কেউ খামচে ধরছে না তো?

আমার পিঠে একটা হাত রাখলেন প্রফেসর। বললেন, 'বোকা... আস্ত বোকা!'

ভয় পাওয়ার লেশমাত্র নেই তাঁর কণ্ঠস্বরে, 'ঠিক এমনটাই আমি শুনেছিলাম ক্যারিব ভূতটার কাছে।'

'কী শুনেছিলেন?'

ভারী প্রস্তরডালা ইঞ্চিখানেক উঠেই রয়েছে, আর নেমে যাচ্ছে না। সেই দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন, 'বেহালায় ছড়ি টেনে দূর থেকে কাচের গেলাস ভেঙে দেওয়া যায়, জানো তো?'

'শুনেছি।'

'এও সেই স্পন্দন-কম্পনের ম্যাজিক। ঠিকমতো চেঁচালে ঘরের মধ্যে যে স্পন্দন-কম্পাঙ্ক জাগে, তা ওই শবাধারের গুপ্ত স্প্রিংয়ে চাপ দিয়ে ডালা খুলে দেয়। আমি চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়েছি, কিন্তু পারিনি। তখন তোমার কথা ভেবেছিলাম। যা হেঁড়ে গলা তোমার।... দেখলে তো, এক চিৎকারেই ডালা খুলে গেল।'

ঢোক গিললাম আমি প্রফেসরের দিকে চেয়ে। বুড়োর গাঁটে গাঁটে এত বিটলেমি।

পিঠে ঠেলা দিয়ে বললেন, প্রফেসর, 'যাও বৎস, যাও। খুলে দেখো, কী আছে শবাধারে।'

ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে বললাম, 'আপনিও চলুন।'

'চলো!' বলে যুবকোচিত লম্ফ দিয়ে মঞ্চে উঠে গেলেন প্রফেসর। এখন তাঁর এক হাতে হ্যাজাক। আর-এক হাতে অবলীলাক্রমে ঠেলে তুললেন পাথরের ডালা। যেন শোলা দিয়ে তৈরি।

লণ্ঠন ধরলেন বাক্সর ওপর। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'যা আশা করেছিলাম, ঠিক তাই। ডামি সমাধি।'

প্রফেসরের পাশে এবার নিশ্চিন্তে দাঁড়ানো যায়। আমিও তাই করেছিলাম। হেঁট হয়ে চেয়েছিলাম প্রস্তরশবাধারের অভ্যন্তরে।

হ্যাজাকের নীলচে-সাদা অত্যুজ্জ্বল আলো ঠিক বিপরীত ছায়া-তমিস্রা রচনা করেছে শবাধারের মধ্যে। ওই ছায়া পড়েছে লম্বালম্বিভাবে। তলদেশের বস্তু সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তাই চোখ নামিয়ে আনতে হল নীচে।

এখন দেখছি জিনিসগুলো। আকার-আয়তন দেখে চিনতেও পারছি।

হাড়। মানুষের হাড়গোড়। গোটা কঙ্কালটাই মানুষের। কিন্তু ঠাহর করলে তবে চেনা যায়। ধাতুর টুকরো খানকয়েক বোধহয় অলংকার। খসে পচে যাওয়া কিছু বস্ত্র— একদা যা ছিল পোশাক।

নাক সিঁটিয়ে বলেছিলাম, 'একী!'

প্রফেসর তন্ময় চোখে পাথরের শবাধারের দিকে তাকিয়েছিলেন। হ্যাজাক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবদিকে আলো ফেলছিলেন।

'কিছু খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

'হ্যাঁ, দীননাথ'— আনমনে বললেন প্রফেসর: 'চাবিটা খুঁজছি।'

'চাবি!'

'তোমার গলাবাজিতে সবকটা কফিন খুলে যাওয়া উচিত ছিল দীননাথ। কিন্তু খুলল মোটে একটা।'

বলতে বলতে ডানদিকে একদম নীচের কোণে তাকালেন প্রফেসর। হ্যাজাক ঘুরিয়ে আলো ফোকাস করলেন সেদিকে। হিরের রোশনাই দেখলাম ওঁর দুই চোখে, 'দেখেছ?'

দেখেছিলাম। ছোট্ট একটা পুঁতি। তিন পাথর যেখানে মিলেছে, সেই সংযোগের জায়গায় কাবলি ছোলা সাইজের একটা সবুজ পুঁতি। নিশ্চয় কোনও দামি পাথর। কিন্তু সেই মুহূর্তে দাম নিয়ে মাথা ঘামানোর মতন অবস্থায় আমি ছিলাম না।

জ্বলজ্বলে চোখে নিমেষহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রইলেন প্রফেসর। বাঁহাতে ধরলেন হ্যাজাক। ডান হাতের তর্জনী বাড়িয়ে দিয়ে রাখলেন সবুজ পুঁতির ওপর।

আঙুল ছোঁয়াতে-না-ছোঁয়াতেই পর্যায়ক্রমে তিনটে শব্দ শুনলাম: খট খটাস...খট-খটাস... খট-খটাস।

আওয়াজ হয়েছে চৌকোনা এই ঘরের মধ্যে— মঞ্চের ওপরেই। সুতরাং সবেগে মুণ্ড টেনে আনলাম শবাধারের বাইরে এবং দেখলাম, পাশের তিনটে শবাধারের ডালা আপনা থেকে খুলে গিয়ে ইঞ্চিখানেক উঁচু হয়ে রয়েছে।

হ্যাজাক উঁচু করে ছানাবড়া চোখে এই দৃশ্য যখন দেখছি, প্রফেসর তখন হ্যাজাক দুলিয়ে চলে গেছেন পাশের শবাধারের সামনে। টেনে খুলেছেন ডালা। অগত্যা আমিও দৌড়োলাম। দেখলাম, সেই একই দৃশ্য— প্রথম শবাধারে যা দেখেছি।

তৃতীয় আর চতুর্থ শবাধারেও একই ব্যাপার।

নরকঙ্কাল— হাড়গোড় দেখে চিনে নিতে হচ্ছে। আর ধাতুর টুকরো জীর্ণ বস্ত্র।

দেখে টেখে মাথা গরম করে ফেললাম— 'মমি কোথায়?'

'নেই!'— খুশি খুশি মুখে বললেন প্রফেসর, 'কিন্তু মমি বানিয়ে রাখা হয়েছিল। মিশরের মানুষ যখন বানিয়েছে, তারও হাজার হাজার বছর আগে। সেই মমি বানানোর বিদ্যে আর পিরামিড বানানোর কায়দা এখান থেকেই নকল করা হয়েছে মিশরে। কিন্তু এই পিরামিড আর এই মমি যারা বানিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক্কেবারে আলাদা।'

'এক্কেবারে আলাদা মানে?' বলেছিলাম রীতিমতো রুষ্ট গলায়।

'তোমার এই এক দোষ, দীননাথ। ঝাঁ করে রেগে যাও। এই মমি আর পিরামিড যারা বানিয়েছিল, তাদের অভিসন্ধি অবশ্যই ছিল— এই শবাধার আর এই সব হাড়গোড় দেখেই যেন ভবিষ্যতের মানুষ রেগেমেগে চলে যায়। আরও কিছু খোঁজার কথা মাথায় না আনে।'

'এই চাপা ঘরে হেঁয়ালি আমার ভাল লাগছে না প্রফেসর।'

'দীননাথ, মিশরে মমি বানানো হত কেন?'

'আত্মা ফিরে এসে যেন দেহ ফিরে পায়।'

'গুড, গুড, ভেরি গুড। মড়ার মধ্যে আত্মা ঢুকে যেন ফের জ্যান্ত হতে পারে।... কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম। এক্কেবারে অন্যরকম। দেহ এখানেও সিধে হয়ে দাঁড়াবে, তবে সে দেহ—' বলে, চুপ করে গেলেন প্রফেসর।

সব গুলিয়ে গেল আমার। চোখ পিট পিট করলাম বারকয়েক।

কৃপা হল প্রফেসরের। বললেন, 'আমি শেষ পর্যন্ত দেখেছি। শুধু এই বিটকেল কফিনগুলো খোলার মতন গলার জোর নেই বলে তোমাকে এত কষ্ট দিয়ে এখানে আনিয়েছি। আনিয়েছি যখন, সব বলব, সব দেখাব তোমাকে। তার আগে তোমাকে একটু জ্ঞান দিতে চাই।' বলতে বলতে মঞ্চের ওপর হ্যাজাক রেখে তার পাশেই বসে পড়লেন প্রফেসর।

আমিও বসলাম নিতান্ত নাচার মুখভঙ্গি করে। বললাম, 'বেশি জ্ঞান দেবেন না, বেশি সময় নেবেন না।'

'দীননাথ, তুমি ঈজিপ্টলজিস্ট নও, কিন্তু বহু মিশরতত্ত্ববিদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম ঘটেছে আমার সুবাদে।'

'পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।' মুখ গোঁজ করে বললাম আমি।

'মমিকে বাঁচিয়ে তোলার এই যে কিংবদন্তি, এর পেছনে কী অভিলাষ মূলত কাজ করেছে, তা কি তোমরা কেউ ভেবেছ?'

'অভিলাষ! জ্বালালেন দেখছি। বললাম তো, মমি যাতে বেঁচে ওঠে।'

'মিশরীয়রা শুধু এইটুকুই চেয়েছিল। আসল কিংবদন্তির ল্যাজ ধরে তারা শুধু এইটুকুই করতে চেয়েছিল। দীননাথ, আসল কিংবদন্তিটা যে অভিলাষ থেকে তৈরি হয়েছে, তা এমনই সৃষ্টিছাড়া যে শুনলে তোমার চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।'

টিটকিরির 'মুডে' চলে যাচ্ছেন প্রফেসর। সুতরাং মুখে চাবি দিয়ে রইলাম।

'সৃষ্টির পর সেই আদি সভ্যতাগুলোর কথা ভাব, দীননাথ। অনেক লোককথা, উপকথা, কিংবদন্তি মুখে মুখে ছড়িয়েছে। এইসব প্রাচীন কাহিনিতে মহাপ্লাবনের কথা লেখা আছে। তখন সাতদিন পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে ছিল। মহাভারতের মাৎস্য উপাখ্যানে খুঁটিয়ে লেখা

হয়েছে সেই মহাপ্রলয়ের বর্ণনা। ধরে নাও, হাজার হাজার বছর আগে, পৃথিবীর মানুষ যখন অর্ধসভ্য, তখন—' বলে একটু থামলেন প্রফেসর। দম নিলেন।

আমি চেয়ে রইলাম।

উনি বললেন, 'তখন পৃথিবীর বাইরে থেকে সুসভ্য প্রাণী এসেছিল ধরাতলে।'

'যাক, আপনিও তা হলে কল্পবিজ্ঞানের চর্চা করছেন!' যেন শুনতেই পেলেন না প্রফেসর, 'আমি বিজ্ঞানের চর্চা করি, গাঁজা বিজ্ঞানের নয়। আমি যা বলছি, সেটা অনুমিতি— মনগড়া দমবাজি নয়।'

বড় কড়া কড়া কথা বলছেন বৃদ্ধ। আমি জবাব দিলাম না। বললেন প্রফেসর, 'কোবাল থিয়োরির নাম শুনেছ?'

'না।'

'নেপচুন আর প্লুটোর কক্ষপথে রয়েছে পাগলামি। প্রায় পৃথিবীর সমান আপেক্ষিক গুরুত্বের একটা গ্রহ ধূমকেতুর মতন বহু বছর পরে পরে চলে যাচ্ছে সৌরজগতের মধ্যে দিয়ে।'

'ও!'

'ধরে নাও, ওই গ্রহের অতি ধীমান প্রাণীরা একটা অভিযান চালিয়েছিল পৃথিবীর বুকে। হয়তো সে গ্রহে খাবারদাবার অথবা জনবসতির অভাব ঘটেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে এলে টনক তো নড়বেই। সুতরাং পৃথিবীতে উপনিবেশ পত্তনের ইচ্ছে হয়েছিল সেই গ্রহবাসীদের।'

'এসব কল্পবিজ্ঞানে লেখা হয়ে গেছে অনেক আগে।'

'প্রমাণহীন বারফট্টাই মারা হয়েছে। মূর্খ! চুপ করে শোনো।'

'শুনছি।'

'অভিযান পাঠানোর পর তারা জেনেছিল, পৃথিবীর আবহমণ্ডল তাদের প্রাণধারণের উপযোগী নয়। ঝুঁকি নিয়েছিল, কিন্তু হেরে গেল। বাতাসে নেই সেই বিশেষ গ্যাস যা তাদের প্রাণ টিঁকিয়ে রাখতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন, সেগুলোই নেই জানোই তো, ফিতেবর্ণালী বিশ্লেষণে সব তথ্য জানা যায় না। অন্য গ্রহেরা প্রকৃত আঁধারেই থেকে যায়। দীননাথ, তর্কের খাতিরে ধরে নাও, হুবহু এই পরিস্থিতিতে তোমাকে পড়তে হয়েছে। সেই অভিযানে ছিলে তুমি— শ্রী দীননাথ নাথ। কী করতে তুমি?'

প্রফেসরের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ভোঁ ভোঁ করছিল বলে ঘরের দেওয়ালের দিকে চেয়েছিলাম। মায়া ভাষায় কী যেন সব লেখা রয়েছে দেওয়ালে। প্রফেসরের লম্বা বক্তিমের শেষ প্রশ্নটা আমার নজর চঞ্চল করে তুলল।

'কী বললেন? ও হ্যাঁ— এ অভিযানে থাকলে কী করতাম? কী আবার করতাম, করবার তো কিছু নেই। পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হতাম।'

'সেটা সকলেই তো জানে। ননসেন্স! বাঁচবার চেষ্টা কি করতে না?'

'একশোবার।'

'খুবই ইনটেলিজেন্ট আর বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করেছিল বলেই তো ভিনগ্রহের

প্রাণীরা মহাকাশ পাড়ি দিয়ে এসেছিল এতদূরে। নিশ্চিত মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার মন্ত্রগুপ্তি কি তাদের অজানা ছিল?'

'মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবার মন্ত্রগুপ্তি!'

'হিমঘুম।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। আমাদের এই আনাড়ি বিজ্ঞানও ভাবছে না টেনে লম্বা ঘুম পাড়িয়ে প্রাণকে টিঁকিয়ে রাখা যায় কীভাবে? দূরের অজানা গ্রহের সুপার-সায়ান্টিস্টরা কি সে বিদ্যেতে যথেষ্ট এগিয়ে না থেকে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিল?... বৎস দীননাথ, তোমার মতো গণ্ডারের গোঁ নিশ্চয় তাদের ছিল না।'

ঢোক গিললাম।

প্রফেসর বললেন, 'ধরো, এক ধরনের ঘুমপাড়ানি ওষুধ বা জ্ঞান লোপ করার ওষুধ তাদের কাছে ছিল। মৃত্যু আসন্ন জেনে সেই ওষুধ তারা নিজেদের শরীরে প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল।...দীননাথ, পরিণামটা কী হবে?'

'ঘুমোবে।'

'এই তো বুদ্ধি খেলেছে, মুখে বোল ফুটছে। তারা ঘুমোবে— সুদিন ফিরে না আসা পর্যন্ত লম্বা ঘুম দেবে।'

'সুদিন মানে?'

'এই বৈরী পৃথিবী থেকে চম্পট দেওয়ার সুযোগ একদিন তারা পাবেই— সেই সুযোগটা আসবে কবে, সে হিসেবও নিশ্চয় তারা করেছিল।'

'ও...ও...ও!'

'তদ্দিন ঘুমিয়ে থাকাই মনস্থ করেছিল। কিন্তু ঘুমোবে কোথায়? ফাঁকা মাঠে অথবা গাছতলায় নিশ্চয় নয়। শরীরটা যাতে টিকে থাকে সুযোগ আসার দিন পর্যন্ত, সে ব্যবস্থাও করে নিতে হয়েছে ঘুমোনোর আগে। দীননাথ, কী বলছি মাথায় ঢুকছে?'

'একটু একটু।'

'বিশাল ইমারত তৈরি করা দরকার। এমন সৌধনির্মাণ করা প্রয়োজন, যা পুঁচকে মানুষদের দূরতম কল্পনারও বাইরে। ভিনগ্রহীদের সুপারসায়েন্সে এমন পেল্লায় ইমারত নির্মাণ করা ছিল নেহাতই ছেলেখেলা।'

'পিরামিড! পিরামিড!'

'ইয়েস মাই বয়, পিরামিড। এমন জিনিস তাদের স্থপতিরা নির্মাণ করেছিল যা আকাশ থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। পাহাড়ের মধ্যে থাকলেও সেটা যে পাহাড় নয়, তা বোঝা যায়। কারণ পিরামিডে আছে সরল রেখার স্থাপত্যকৌশল। মহাকাশ থেকে এক নজরেই ভিনগ্রহীদের উদ্ধারকারী অভিযাত্রীদল চিনে ফেলবে— এই তো এখানে রয়েছে ইনটেলিজেন্ট প্রাণীদের তৈরি অতিকায় ইমারত— যা নেই পৃথিবীর কোথাও। অতএব নামো এখানে। জাতভাইদের পেয়ে যাবে ওই ইমারতের মধ্যেই। আমি কি ভুল বকছি, দীননাথ?'

'কখনও বকেছেন?'

গাল চুলকে প্রফেসর বললেন, 'কখনও কখনও বকি বটে, যখন তোমার ওপর রেগে যাই। যখন তুমি আমার কথা ধরতে না পারো। এখন পারছ, তাই ভুল বকছি না। কী বলছিলাম?

'ভিনগ্রহীরা আকাশ থেকে পেল্লায় পিরামিড দেখে নেমে আসবে। তার মানে, হঠকারী ভিনগ্রহীরা নাক ডেকে এখনও ঘুমোচ্ছে এই পিরামিডের তলায়। প্রমাণ? চলো দেখাচ্ছি।'

মঞ্চ থেকে নামলেন প্রফেসর। হেঁটে গেলেন একটা দেওয়ালের সামনে। দ্রুত হিসেব করলেন। প্রকাণ্ড একটা পাথরের ব্লকে কাঁধ লাগিয়ে একটু ঠেলা দিলেন। অতবড় পাথরের চাঁইটা ঘুরে গেল নিঃশব্দে। প্রফেসর বললেন, 'সুপারসায়েন্সের ভেলকি। যে কৌশল আজও আমাদের শিশু বিজ্ঞান রপ্ত করতে পারেনি। দীননাথ, পাথর কোথায়?'

'নেই।' অতবড় পাথরের ব্লকটা বুঝি ভোজবাজির মতন মিলিয়ে গেছে। দেওয়ালের গায়ের পথ ব্যাদিত মুখে নিঃসীম তমিস্রার মধ্যে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। যে সুড়ঙ্গপথে এই ঘরে এসেছি, তার চাইতে অনেক সংকীর্ণ নতুন এই বিবর।

প্রফেসর পা বাড়ালেন সেই সুড়ঙ্গে। পেছনে আমি। আমার দু'হাতে দুটো হ্যাজাক।

সুড়ঙ্গ নীচের দিকে নামছে তো নামছেই। শেষ নেই, শেষ নেই। আমার তো মনে হল ভূপৃষ্ঠ থেকেও নেমে এসেছি— পাতালগর্ভে পৌঁছে গেছি।

আচমকা প্রশস্ত হয়ে গেল সরু সুড়ঙ্গ। পৌঁছলাম একটা ঘরে। কবরঘরের চেয়ে একটু বড়, তবে চার দেওয়ালে নেই কোনও অলংকরণ— যা দেখে এসেছি সমাধিকক্ষের চার দেওয়ালে। এ ঘরের দেওয়াল এক্কেবারে ন্যাড়া— তেলতেলে পরিষ্কার। ছেনি-হাতুড়ির ছোঁয়া পড়েনি কোথাও।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে চারটে পেটিকা। হ্যাজাকের আলোয় মনে হচ্ছে কোনও পেটিকাই পাথর দিয়ে তৈরি নয়— ধাতুনির্মিত। কিন্তু সে যে কী ধাতু, আমার স্বল্পজ্ঞান দিয়ে তা ধরতে পারলাম না।

প্রফেসরের কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল চতুষ্কোণ এই ভূগর্ভ কক্ষে, 'ওপরে দেখেছিলাম চারটে শবাধার, এখানেও দেখো চারটে পেটিকা। অপূর্ব ধোঁকাবাজি দীননাথ। ভবিষ্যতের কৌতূহলী মানুষ যেন ওপরের চার শবাধার দেখেই প্রতারিত হয়— আর খোঁজ না নিয়ে কেটে পড়ে। কী দূরদৃষ্টি, কী অসাধারণ পরিকল্পনা! হাজার হাজার বছর পরেও বুরবক মানুষ বুরবকই রয়ে গেল— প্রতারণার আভাসটুকুও পেল না।'

'আপনি তো পেয়েছেন!' কীরকম যেন হয়ে গেছিলাম আমি। প্রফেসরের চোখমুখ দিয়ে যেন দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছিল। বিহ্বল কণ্ঠে তাই বলেছিলাম, 'আপনি তো মানুষ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও মানুষ। হাজার হাজার বছর ধরে ধোঁকাবাজির আভাস যে মানুষ পায়নি— আমি তাদেরই বংশধর। বিজ্ঞান-সমুন্নত ভিনগ্রহীরা এই পৃথিবীতে পা দিয়েই বোধহয় টের পেয়েছিল, জানোয়ারদের চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধি ধরে দু-পেয়ে মানুষ। বড় বেশি কৌতূহলী।'

'ওপরের শবাধারের কঙ্কালগুলো কাদের?'

'মানুষের।'

‘মানুষের?’

‘তা ছাড়া কী? মানুষের কঙ্কাল দেখলেই তো মানুষ খুশি হয়ে চলে যাবে— আর খুঁজতে যাবে না। ভাববে, সমাধি পেয়েছি, পিরামিডও দেখেছি।’

‘মানুষ মেরে শবাধারে ঢুকিয়েছে?’

‘নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তা করতে হয়েছে, দীননাথ।’

‘মারল কারা?’

‘ভিনগ্রহীদেরই একটা দল। তারাই বিশেষ চারজনকে লম্বা ঘুমের দাওয়াই দিল, পিরামিড বানিয়ে ভূগর্ভে তাদের নিরাপদে রেখে দিল, চার বজ্জাত মানুষকে মেরে মমি বানিয়ে ওপরের ঘরের শবাধারে রেখে দিল, তারপর নিজেরা গেল পরলোক— স্বইচ্ছায়।’

‘ফ্যানটাসটিক!’

‘ইয়েস মাই বয়, মিশরের মানুষ এই দেখেই শিখল মমি বানিয়ে, পিরামিড তৈরি করে, সমাধিসৌধ রচনার বিদ্যে। তৈরি হয়ে গেল ছল-কিংবদন্তি— আত্মা ফিরে আসবে মড়ার মধ্যে। আসল কিংবদন্তি গেল হারিয়ে।’

‘ভিনগ্রহীদের স্বদেহে জাগ্রত হওয়ার কিংবদন্তি?’

‘ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। ক্যারিব ভূতটার কাছে আগড়ম-বাগড়ম গল্প শুনে এই সন্দেহটাই মাথাচাড়া দিয়েছিল আমার। মিশরীয়দের মধ্যে যা ধর্মীয় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে— আসলে তা—’

‘উদ্দেশ্যসিদ্ধির কলাকৌশল?’

‘ইয়েস, মাই বয়।’

নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম পেটিকা চারটের দিকে।

প্রতিটার ওপর চেপে রয়েছে অদ্ভুত ডালা। দেখে তো মনে হচ্ছে কাচের ডালা। খুবই স্বচ্ছ, রীতিমতো পুরু। অথচ তা মোটেই কাচ নয়। প্লাস্টিক জাতীয় বস্তুও নয়। প্রতিটি পেটিকার নীচে পাতা নরম কুশন জাতীয় গদি। প্রতিটি গদিতে শুয়ে একজন করে মানুষ।

আরও প্রাঞ্জল করে বলা যাক— তাদের দু’জন দুটি ছেলে, বাকি দু’জন দুটি মেয়ে। বয়স তাদের আমার মতনই। গায়ে খাটো জামাকাপড়। যে বস্ত্র তন্তুজাতীয় কিছু দিয়ে তৈরি নয়— গাছের বাকলের মতন দেখতে। খসখসে, পুরু। অথচ তা উদ্ভিদজগতের দান নয়। এমন কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি যে ধাতু আমি অন্তত কখনও দেখিনি। এই পৃথিবীর কোনও ধাতুবিজ্ঞানীরও জানা আছে বলে তো আমার মনে হল না। প্রফেসরের মুখেও পরে শুনেছিলাম, আমার অনুমানে ভুল নেই। এ ধাতু অপার্থিব ধাতু— পৃথিবীর কেউ কখনও দেখেনি।

ফিকে সবুজ সেই ধাতুর দিকে প্রথমে চেয়ে থাকলেও পরমুহূর্তেই আমার নজর ছিনিয়ে নিয়েছিল তাদের মুখের চেহারা। কফিন-আবদ্ধ হয়েও তারা কেউ কিন্তু মড়া নয়। মড়ার চোখে-মুখে সারাদেহে যে প্রাণহীনতা আবির্ভূত হয়, এদের শরীরের কোথাও তা নেই। ঠান্ডা মৃত্যুর করাল ছায়া নেই শাণিত নাক-চিবুকে। গ্রিক ভাস্কর অসীম ধৈর্য নিয়ে বাটালি দিয়ে পাথর খুদে যেসব মূর্তি বানিয়েছেন, এদের চারজনের দেহাবয়ব সেইসব প্রস্তরমূর্তির মতন অতীব সুন্দর।

ঘুমোচ্ছে। বড় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে চারজনেই। মৃত্যু ধারে-কাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না। বদ্ধ কফিনে এ কেমন নিদ্রা? মানুষ ঘুমিয়ে থেকেও অক্সিজেন নেয় নিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে। চারদিকের বন্ধ আধারে বাতাস তো নেই! থাকলেও হাজার হাজার বছরে তা টাটকা রয়েছে কী করে?

স্তম্ভিত হয়েছিলাম তাদের গাত্রবর্ণ দেখে। যেহেতু তাদের গায়ের জামাকাপড় খুব হালকা সবুজ রঙের, তাই প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম ওদের গায়ের চামড়ায় যে হালকা সবুজাভা দেখছি, ওটাও নিশ্চয় ক্রমাগত সবুজ ধাতু দেখার ফলে আমার চক্ষুভ্রম।

কিন্তু তা দৃষ্টিবিভ্রম নয়, নয়, নয়!

তাদের প্রত্যেকের মুখ থেকে, গা থেকে ঝরে পড়ছে আশ্চর্য সবুজ আভা। পৃথিবীর মানুষের চামড়ায় যেমন ঈষৎ গোলাপি আভা দেখা যায়, খুব ফর্সা হলে তা অল্প লালচে অথবা দুধে-আলতা বর্ণ ধারণা করে— এদের চারজনের ক্ষেত্রে তা খুবই হালকা সবুজ বর্ণ।

সবুজ মানুষ!

মৃত্যুর হিমশীতল আভা নয়— প্রাণের সবুজাভা!

চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল আমার। প্রফেসরও তা লক্ষ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'হাতের আঙুলগুলো দেখেছ?'

তখনও পর্যন্ত হিসেবি চোখে দেখিনি। শুধু চোখ বুলিয়ে গেছিলাম। প্রফেসরের কথায় ভাল করে তাকালাম।

আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে ছটা করে আঙুল!

বাতাসের সুরে কানের কাছে বলে গেলেন প্রফেসর, 'এই পৃথিবীর মানুষ নয় ওরা, এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে— প্রত্যয় হল কি এবার?'

আর প্রত্যয়! কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলাম।

জবাব দিতে পারলাম না। ফ্যালফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইলাম।

আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার মগজের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে।

বিজ্ঞানের কিছু বুঝি না বুঝি, কমন সেন্স তো আছে আমার। আশ্চর্য এই রহস্যের সমাধান ঘটিয়ে দিতে পারি এখুনি। হ্যাজাক নামিয়ে রেখে শক্ত দুই মুঠোয় চেপে ধরলাম একটা কফিনের স্বচ্ছ ডালা। মতলব ছিল, ডালা টেনে খুলে দেওয়ার। কিন্তু পারলাম না শুধু প্রফেসরের জন্যে।

এই বৃদ্ধের শরীরে যে বাঘের শক্তি লুকিয়ে আছে, তা তো জানতাম না!

আমার মতলব উনি আঁচ করেই নামিয়ে রেখেছিলেন নিজের হাতের হ্যাজাক। আমি যখন লম্ফ দিয়েছি একটা কফিন লক্ষ্য করে, উনিও তখন তেড়ে এসেছেন পেছন পেছন। দুই মুঠোয় কফিন চেপে ধরেও তাই ডালায় টান মারতে পারিনি।

শার্দুল শক্তিতে হ্যাঁচকা টান মেরেছিলেন প্রফেসর পেছন থেকে আমার কোমর জড়িয়ে। এত জোরে যে আমি পেছনে ছিটকে গিয়ে পড়েছিলাম প্রফেসরের ওপর।

বেচারা প্রফেসর! আমার ভার সইবার ক্ষমতা তাঁর কোথায়?

তিনি পড়লেন চিতপটাং অবস্থায়, আমি পড়লাম তাঁর ওপর।

চিল চিৎকার ছাড়লেন প্রফেসর, 'উঁহু! উহু! লাগছে!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে টেনে তুললাম প্রফেসরকে। চিঁড়েচ্যাপটা হয়েও কাহিল হননি তিনি। খাড়া হয়েই ফের জাপটে ধরলেন আমাকে। ছোট্ট ঘর গমগম করতে লাগল তাঁর বাজখাঁই চিৎকারে, 'মূর্খ! মূর্খ! গাঁইয়া গোঁয়ার কোথাকার! অতল সমুদ্রের মতো যাদের জ্ঞানভাণ্ডার— তাদের শক্তি কতখানি তা মাথায় এল না? কী বিপুল শক্তির অধিকারী হলে তারা মহাকাশের বুকে পাড়ি দিয়ে, এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে এসে, কল্পনাতীত এই ইমারত বানিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে তাদের শরীর প্রাণময় রাখতে পারে! সেটা না ভেবেই তাদের জাগাতে যাচ্ছ? জাগবার পর তারা কী ধরনের শক্তির খেলা দেখাবে, তা তুমি জানো? অথবা এই বিষাক্ত হাওয়ায় যদি ওদের মৃত্যু হয়— ওদের জাতভাইরা যখন ফিরে আসবে পৃথিবীতে— এসে দেখবে খাঁ খাঁ করছে পৃথিবীর প্রথম পিরামিড— তখন কি তাণ্ডব কাণ্ড শুরু করবে, তা কি কল্পবিজ্ঞানের কল্পনাশক্তি দিয়েও আঁচ করতে পারছ না? পৃথিবীর শেষ কি সেদিন ঘনিয়ে আসবে না?'

'ছাড়ুন!' আস্তে আস্তে বলেছিলাম আমি।

'খ্যাপামো করবে না তো?'

'না।'

প্রফেসর ছেড়ে দিলেন আমাকে।

ঘুরে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে আসবে ওরা?'

'ওপরের ঘরে 'মায়া' ভাষায় সে তারিখটা লেখা আছে। হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে, ওই সালের আগে যদি পিরামিড ধ্বংস হয়— পৃথিবীও মিলিয়ে যাবে শূন্যে।'

'তারিখটা কবে?'

'২০৪০ খ্রিস্টাব্দে।'

চুপ করে রইলাম।

প্রফেসর বললেন, 'নিজের কক্ষপথে পাক দিয়ে সেই গ্রহ বা জ্যোতিষ্ক ফিরে আসবে এই পৃথিবীর পাশে। ওপরের ঘরে সেই অভিশাপই দেওয়া আছে। ২০৪০ সালের আগে যদি এই সমাধি ধ্বংস হয়, পৃথিবীও ধ্বংস হবে। এই অভিশাপের ভয়েই এ তল্লাট খাঁ খাঁ করে। এই পিরামিডের ধারেকাছেও আদিবাসীরা আসে না। দীননাথ, এখনও কি কফিন ভাঙতে চাও?'

'না, বাড়ি ফিরে যেতে চাই।'

ভয়ংকরদের দ্বীপ

এ জাহাজ থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যমজ দ্বীপটাকে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র চোখ কুঁচকে চেয়েছিলেন পাহাড়দুটোর দিকে। চোখের নিবিড় চাহনি দেখে কে বলবে, সুদূর কলকাতা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপে আসতে গিয়ে তাঁর জিভ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পথকষ্ট তো কম নয়। তাঁর বয়সটাও বাড়ছে।

কিন্তু কোনও কথাই উনি শোনেননি।

সেই জিওকেমিস্ট ভদ্রলোক এল ওঁর কাছে, কানে কানে এমন মন্ত্র দিল যে, প্রফেসর খেপে গেলেন এখানে আসার জন্যে।

জিওকেমিস্ট ভদ্রলোক রয়েছে প্রফেসরের পাশেই। পাগল পাগল চেহারা। নাকের ফুটো দুটো বড়। বড় বড় লোম ঝুলছে ফুটো থেকে। মাথার চুল এত কম আর এত লালচে যে নেই বললেই চলে। কপাল খুব ছোট, নাকটাও থ্যাবড়া। মুখের তলার দিকটা অবিকল এপম্যানদের নকলে বিধাতা গড়ে দিয়েছেন। চোখের নীচে ভাঁজভাঁজ চামড়া আর পাটকিলে চোখের তারা দেখলে এমন লোককে মানুষ বলে মনে হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে তার গালের আর চিবুকের রোঁয়া রোঁয়া দাড়ি তো নরবানরদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকী, লোকটার গোঁফও নেই। খানকয়েক লালচে রোঁয়াকে নিশ্চয় গোঁফ বলা চলে না।

লোকটার নাম গোনজালা। কোন দেশের লোক, তা জানি না। হাইট দেখেও আন্দাজ করা যায় না। বেঁটে মরকুটে নয়— আবার তালঢ্যাঙাও নয়। হাতদুটো অবশ্য বড্ড লম্বা। সবসময়ে দস্তানা পরে থাকে। পাজামার মতো ঢিলে প্যান্ট, ঢলঢলে শার্ট আর এহেন চেহারা— দেখলে হাসি পায় না?

গোনজালা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলে চলেছে। আমি তার গোটা গোটা বাংলা করে দিচ্ছি।

'প্রফেসর, এই সেই দ্বীপ।'

প্রফেসর মুগ্ধ চোখে পাহাড়-জঙ্গল আর সমুদ্র দেখতে দেখতে বললেন, 'গোনজালা, এমন দ্বীপের সন্ধান পেলে কীকরে?'

গোনজালা হাসতে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ফেলল। ছ্যাতলা পড়া হলদে দাঁত। জন্মে দাঁত মাজে না।

বলল, ‘আমি যে, জিওকেমিস্ট। খনিজের সন্ধান করে বেড়াই।’

‘প্লাটিনাম মেটালদের দেখেছ এখানেই?’

‘ইয়েস, প্রফেসর। চাঁইটাও দেখিয়েছি আপনাকে।’

‘সেটা দেখেই তো আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়েছে, গোনজালা।’

‘আপনিই তো বললেন ওর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো মেটাল।’

‘হ্যাঁ। অনেকগুলো। সবগুলোই প্লাটিনাম মেটাল। সবগুলোই দুষ্প্রাপ্য। কোনওটাকেই এক জায়গায় তাল তাল আকারে আজও পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি—’

‘কিন্তু এখানে তা আছে,’ বললে গোনজালা।

‘প্লাটিনাম, রেডিয়াম, অসমিয়াম, ইরিডিয়াম, রুথেনিয়াম। আশ্চর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য!’

‘কিছুই আশ্চর্য নয়, প্রফেসর। পৃথিবীর দেখা সবটাই হয়ে গেছে এমন কথা যে বলে, সে মানুষই নয়।’

চোখ ফিরিয়ে বললেন প্রফেসর, ‘কথাটা এমনভাবে বললে, গোনজালা, যেন তুমি একাই মানুষ— আর সবাই অমানুষ।’

লাল টকটকে মোটকা জিভখানা অর্ধেক বের করে গোনজালা বলে উঠল, ‘কী যে বলেন। আমি আবার একটা মানুষ! আমি শুধু গোনজালা জিওকেমিস্ট— এই পৃথিবীটা আমার বাড়ি—’

‘যাকগে, দ্বীপে তুমি নেমেছিলে বলেছ। কোন পাহাড়টার মধ্যে আছে তাল তাল প্লাটিনাম ধাতু?’

‘বাঁদিকেরটায়। এটাই একেবারে মরে গেছে। ডানদিকেরটায় এখনও একটু আঁচ আছে।’

এই পর্যন্ত শুনেই ফস করে আমি বলেছিলাম, ‘আঁচ আছে? পাহাড়ে আবার আঁচ থাকে নাকি? পাহাড় কি উনুন?’

গোনজালা পাটকিলে চোখে পিটপিট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ‘থাকে, থাকে, এরা যে এককালে আগ্নেয়গিরি ছিল। এখনও একটার মধ্যে কাদা ফুটে যাচ্ছে— গেলেই দেখতে পাবে।’

‘তার আগে,’ বললেন প্রফেসর, ‘হেলিকপ্টারে করে গোটা দ্বীপটাকে ওপর থেকে দেখে নেওয়া যাক।’

‘নিশ্চয়, নিশ্চয়,’ বলে উঠল গোনজালা, ‘ওপর থেকে দেখলে কী-ই বা আর বুঝবেন— তবুও দেখা দরকার।’

অত্যাধুনিক এই জাহাজে সব ব্যবস্থাই ছিল। তক্ষুনি আমরা উঠে বসলাম ডেকের ওপর খাড়া হেলিকপ্টারে, বিকট আওয়াজ করে উঠল শূন্যে উঠল যন্ত্রযান।

তখন গোধূলি। একটু পরেই অন্ধকার আরও গাঢ় হবে। দ্বীপদুটোকে দূর থেকে যতটা খুদে মনে হয়েছিল, ওপরে গিয়ে ততটা মনে হল না। এক-একটা দ্বীপ লম্বায় পাঁচ মাইল, আর চওড়ায় মাইল তিনেক। দুই দ্বীপের মাঝে একটা সরু নালা— সেখানে সবুজ আগাছার ওপর সাদা কুয়াশার চাদর। জাহাজ নোঙর ফেলেছে পূর্বদিকে। দূরবিন দিয়েও ওদিকে

কুয়াশা দেখিনি। দেখলাম পশ্চিম দিকে। আকাশপথ থেকে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে কুয়াশা ঘন হয়ে লেপটে রয়েছে গাছপালার ওপর। কোথাও কিচ্ছু নড়ছে না।

কেন জানি না, গা-টা শিরশির করে উঠেছিল চারদিকের এই নিঝুমতা দেখে। কোথাও পাখি উড়ছে না। গাছপালা নড়ছে না—

হ্যাঁ, নড়ছে...নড়ছে... কুয়াশার ওই চাদর দুলে দুলে উঠছে... চিকচিক করছে শেষ আলোয়।

পাহাড়দুটোর তলার দিকে রং হালকা সবুজ— ওপর দিকে ঘন সবুজ। তারপরেই আবার সেই সাদা কুয়াশা। সাদা চাদরে মোড়া। তারও ওপরে পাহাড়ের চুড়ো।

মাথাকাটা চুড়ো। আগ্নেয়গিরিই বটে। জ্বালামুখ। এককালে এখান থেকে ভলকে ভলকে আগুন, ধোঁয়া আর লাভা বেরিয়েছে। দ্বীপের প্রাণ কি তখন থেকেই মুছে গেছে?

জাহাজে ফিরে এসে এই প্রশ্নই করেছিলাম গোনজালাকে।

আমরা তখন খেতে বসেছিলাম। গোনজালা লোকটা সত্যিই একটা জীব। মাংস-টাংস কিসসু খায় না। শুধু ফল। এরকম নিরামিষাশী মানুষ জন্মে দেখিনি।

গোনজালা বললে, 'ডিনোনাট, (পাঠক-পাঠিকা চমকে যেয়ো না— দীননাথ নামটা গোনজালার গলায় ওই রকম শোনায়), অ্যাটম বোমাটা ফাটানোর পর থেকেই নাকি এ দ্বীপের সবাই মরে গেছে।'

'দুটো দ্বীপেরই?'

'তাই তো শুনেছি', কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললে গোনজালা, 'সেই যে বোমাটা ফাটল ওই দূরে... আকাশ যেখানে জলে মিশেছে—'

কুট করে ফুটকুনি কাটলেন প্রফেসর, 'এমনভাবে বলছ গোনজালা যেন বোমা ফাটার সময়ে তুমি দ্বীপে ছিলে—'

চমকে ওঠে গোনজালা, 'আমি? আমি কেন থাকতে যাব? আমি যে জিওকেমিস্ট, হিল্লি-দিল্লি ঘুরতে হয়... তখনি তো শুনলাম অ্যাটম বোমা ফাটানো হয়েছিল এই দ্বীপেরই ধারেকাছে। কেননা মানুষ তো ছিল না এখানে।'

পোর্টহোল দিয়ে অন্ধকারে ঢাকা যমজ দ্বীপের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বললেন প্রফেসর, 'সেটাও একটা ব্যাপার। দ্বীপের মানুষগুলো সব গেল কোথায়?'

'ম-মানে?'

'প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ তো— যতই একটেরে হোক না কেন, জংলি মানুষ থাকবেই। এখানে কেন নেই?'

'খাবারের অভাবে বোধহয়', বললে গোনজালা।

'তা হতে পারে', বলে চুপ মেরে গেলেন প্রফেসর।

পরের দিন সকালে হেলিকপ্টারে চেপেই পৌঁছলাম দ্বীপের সৈকতে।

কপ্টারচালক রিচার্ড কম কথার মানুষ। সাদা বালি ছাওয়া বালুকাবেলায় কপ্টার নামিয়ে এককথায় বলে দিলে, 'আপনারা যান।'

'তুমি?' প্রফেসরের প্রশ্ন।

'এখানেই রইলাম।'

লোকটা এমনিতেই কাঠগোঁয়ার, ক্যাটকেটে কথা শুনলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়। প্রফেসর আমাদের লিডার, তাঁকেও পরোয়া করে না।

খেপে গেলে বৃদ্ধকে সামলানো মুশকিল। তাই খাঁটি বাংলায় বললাম, 'ব্যাটা ভয় পেয়েছে।'

'ভয়? কাকে?' প্রফেসর চিড়বিড়িয়ে উঠলেন আমার ওপরেই।

'কাকে তা বলতে পারব না। তবে আমারও গা ছমছম করছে কাল থেকেই।'

'ভীতুর ডিম কোথাকার!' বলেই হনহন করে বালি মাড়িয়ে দ্বীপের ভেতর দিকে রওনা হলেন প্রফেসর।

গোনজালা কপ্টার থেকে নেমেই হেলেদুলে ছুটছিল বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোর দিকে। লোকটার পায়ে সিরিয়াস ডিফেক্ট আছে নিশ্চয়। ওইজন্যে অমন পাতলুন পরে— পাজামা ছাড়া যাকে আর কিছুই বলা যায় না। পায়ের বুটজুতোজোড়া যে মুচি বানিয়েছে, বলিহারি যাই তার কল্পনার।

বুটের মাথা এত চ্যাপটা কখনও হয়? সার্কাসের ক্লাউনেরাও এহেন বদখত বুট পরে না।

গেল কোথায় পাগলা জিওকেমিস্ট?

প্রফেসর হনহন করে কিছুটা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইতিউতি তাকাচ্ছিলেন গোনজালাকে দেখবার জন্যে।

পেছনে গিয়ে আমি বললাম, 'ওই তো পাথরগুলোর আড়ালে ঢুকে গেল।'

প্রফেসর কোমরের বেল্ট ধরে প্যান্টটাকে টেনে তুলতে তুলতে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আপদ! নতুন জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে থাকবে তো।'

বেল্ট পরা প্রফেসরের ধাতে সয় না। ট্রাউজার্স পরেন না বেল্ট পরতে হবে বলে। কোমরবন্ধনী নাকি তাঁর দমবন্ধ করে দেয়। কিন্তু দ্বীপের পাহাড়-জঙ্গলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে অভিযানে যাওয়া যায় না। তাই আমি কলকাতা থেকেই ওঁর জন্য হাঁটু পর্যন্ত উঁচু চামড়ার বুট আর মোটা জিনসের প্যান্ট এনেছি। নিজেও তা পরেছি। পোকামাকড় থাকতে পারে, সাপ, বিছে থাকতে পারে— একটা কামড় খেলে প্রাণটাও সটকান দিতে পারে।

এখন সকাল সাতটা। রোদ বেশ মিঠে। নীল আকাশ বড় ভাল লাগছে, তার চাইতেও ভাল লাগছে নীল সমুদ্রকে। পুরীর বঙ্গোপসাগর আর বম্বের আরব সাগর দেখে যারা দু'হাত তুলে নাচে, তারা কল্পনাও করতে পারবে না প্রশান্ত মহাসাগরের এই রূপকে। চারদিক থেকে ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে ঢেউগুলো একের পর এক আছড়ে পড়ছে দ্বীপদুটোর ওপর। অটল মহিমায় এদের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সবুজ আর সাদায় অপরূপ দু-দুটো পাহাড়।

রোদ ঠিকরে যাচ্ছে এদের গা থেকে। জঙ্গলকে কেন যে সবুজ সোনা বলা হয় তা এই দ্বীপযুগলের সৈকতে দাঁড়িয়ে মুগ্ধাবেশে অনুভব করলাম। বেলাভূমির বালি কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে, তারপর পাথরের চাঁই আর চাঁই। তেড়াবেঁকা, গোলগাল, এবড়োখেবড়ো।

ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর চোখ গেল, এই ধরনের পাথর পড়ে আছে সৈকতকে পাহারা দিয়ে।

ঠিক যেন পাঁচিল। প্রকৃতি নিজের হাতে বড় বড় পাথর ফেলে দ্বীপদুটোকে ঘিরে রেখে দিয়েছে যাতে নোনাজল ভেতরে ঢুকতে না পারে। নোনাজলের আতঙ্করা সবুজ সোনার লোভে দ্বীপের শান্তি নষ্ট করতে না পারে।

আমি চিরকালই একটু উলটো দিক থেকে ভাবি। তাই আমার মনে হল, পাথর ফেলা আছে বলেই দ্বীপের আতঙ্করা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না— অন্তহীন রহস্য নিয়ে আটকে রয়েছে দ্বীপের মধ্যে।

আতঙ্ক? রহস্য? যত্তোসব উলটোপালটা চিন্তা। মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে তাকালাম গোনজালার সন্ধানে।

উড়ে গেল নাকি লোকটা?

যে কথাটা গতকাল থেকেই ঘুরঘুর করছিল মাথার মধ্যে এবার তা সুড়ুত করে চলে এল জিভের ডগায়। বলেই ফেললাম প্রফেসরকে, 'গোনাজালা বলছিল দ্বীপের কাছেই অ্যাটম বোমা ফাটানো হয়েছিল। কত বছর আগে?'

'বিশ বছর আগে।'

'পারমাণবিক ধুলো আর বিকিরণ তো দ্বীপেও পৌঁছেছে— চারদিক খাঁ খাঁ করছে ওই জন্যেই। কেউ বেঁচে নেই।'

'দীননাথ, উজবুক বলেই প্রশ্নটা এখন করছ। আমি আগেই করেছিলাম। গোনজালা সব খবরই রেখেছে। তিনমাস অন্তর তিনবার বৈজ্ঞানিকরা এ দ্বীপে এসে দেখে গেছেন, পারমাণবিক বিষ রেহাই দিয়ে গেছে দুটো দ্বীপকেই।'

'কেন?'

'বোমা যখন ফাটে, তখন হাওয়া বইছিল অন্যদিকে। ধুলো এদিকে আসেনি। রেডিয়েশন যেটুকু এসেছে, তা ডেঞ্জার লেভেলের অনেক নীচে।'

'ও', বলে ঢোক গিললাম আমি— 'মানুষজন কোনও কালেই কি দ্বীপে ছিল না?'

'না। টেস্ট হয়েছিল সেই কারণেই। লোক থাকলে সরিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু গোনজালা গেল কোথায়?'

'গোনজালা! গোনজালা!... গোনজালা!' আচমকা এ রকম বিকটভাবে যে উনি চেঁচিয়ে উঠবেন, ভাবতে পারিনি। তেড়াবেঁকা পাথরগুলোর ওপর দিয়ে বিচ্ছিরি চিৎকারটা সাঁত করে ছুটে গিয়ে যেন দমাস করে আছড়ে পড়ল সবুজ সোনাদের ওপর। তারপর পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি জাগিয়ে সেই ডাকই ফিরে এল কানে, 'গোনজালা! গোনজালা! গোনজালা!'

জঙ্গলের মধ্যে গোটা তিন-চার পাখি কেবল উড়ে গেল সেই ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির আছাড়িপিছাড়িতে, তার বেশি নয়।

খটকা লাগল আমার তখনি। এত গভীর জঙ্গল অথচ এত কম পাখি!

শ্মশান দ্বীপ নাকি? প্রাণের চিহ্ন যাও বা দেখলাম— এত কম?

আচমকা পিলে চমকে গেল আমার রক্ত জল করা একটা শব্দে।

জঙ্গলের অনেক ভেতর থেকে, পাহাড়ের ডানদিক থেকে ভেসে এল অনেকগুলো গলায় অমানুষিক আকাশফাটা চিৎকার, 'আঁহু!...আঁহু! আঁহু!'

সেই চিৎকারের রেশ মিলোতে না মিলোতেই আবার পাহাড়ের বাঁদিক থেকে জঙ্গলের মাথায় নাচতে নাচতে ছুটে এল রক্ত জল করা ভয়াবহ সেই হাহাকার— 'আঁহু-উ!... আঁহু-উ!... আঁহু— উ!'

আর তারপরেই পাহাড়দুটির একদম ওদিক থেকে 'আঁহুঃ! —আঁহু—!'

তারপরেই সব চুপচাপ। জঙ্গল স্তব্ধ। পাখিরা কেউ নেই। কানে ভেসে আসছে কেবল বিরামবিহীন ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ!

গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছিল অমানুষিক শব্দপরম্পরা শুনে। পরিষ্কার দিনের আলোয় নীল আকাশের নীচে একী কাণ্ড! কারা ওভাবে চেঁচাচ্ছে? কেন চেঁচাচ্ছে?

প্রফেসর ঘুরে দাঁড়িয়েছেন আমার দিকে। তাঁর চোখদুটো শুধু কুঁচকে গেছে দেখলাম। ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। খুব কূট একটা চিন্তা নিয়ে ভেবেই চলেছেন তন্ময় হয়ে।

গলা শুকিয়ে গেছিল। ওঁর পেছনেই বেশ কিছু দূরে বড় বড় বিশাল পাথরগুলোর দিকে চাইতেই নামহীন আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল আমার।

দস্তানা পরা একটা হাত আগে দেখা গেল একটা বিশাল পাথরের মাথায়। তার পাশে উঠে এল আর একটা হাত। সাদা দস্তানা। আমি চিনি। গোনজালার।

আর তার ঠিক পরেই একটা মাথা দেখা গেল দুই দস্তানার মাঝ দিয়ে। মাথায় লালচে চুল খুব অল্প।

সট করে উঠে এল পুরো মুণ্ডুটা।

গোনজালা তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

এবং, দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। হলুদ দাঁতগুলো এতদূর থেকেও গা ঘিনঘিনিয়ে দিচ্ছে আমার। মুখবিবর ঘিরে লালচে রোঁয়ার মতো গোঁফ-দাড়ি আর নাকের ফুটো থেকে ঝুলে পড়া লালচে চুলগুলোও এত কদর্য লাগছে যে বলবার নয়।

পাটকিলে চোখে পিটপিট করে চেয়ে রইল গোনজালা।

প্রফেসর তার দিকে পেছন ফিরে থাকায় কিছুই দেখতে পাননি। কিন্তু আমার চোখমুখ দেখে ছিলেন। নিশ্চয় নিঃসীম আতঙ্কে তা বিকৃত, বীভৎস হয়ে গেছিল।

তাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে অপরিসীম উদ্বেগে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে, দীননাথ?'

আমার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ, জবাব দেব কী? হাত তুলে শুধু দেখিয়েছিলাম তাঁর পেছন দিকে— যেখানে তখনও মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে গোনজালা বিকট হাসি হেসে চলেছে। সবেগে পেছনে ফিরেছিলেন প্রফেসর। আর সঙ্গে সঙ্গে সাঁৎ করে কদাকার মুখটা নেমে গেল। পাথরের আড়ালে, নেমে গেল সাদা দস্তানাদুটোও।

স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। তাঁর পেছনে থাকায় মুখের চেহারাটা দেখতে পেলাম না— তবে শরীরটা যে হঠাৎ শক্ত হয়ে গেছে, তা বুঝলাম।

সমুদ্রের অশান্ত গজরানি ছাড়া আশেপাশে দূরে কোথাও আর কোনও শব্দ নেই।

পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন এক অপার্থিব জগতে এসে পড়েছি।

আচমকা উল্লসিত গলায় শুনলাম একটা ডাক: 'ডিনোনাট।'

আমার কানে যেন ডিনামাইট ফাটল ডাকটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। আঁতকে উঠে সভয়ে প্রফেসরকে হ্যাঁচকা টান মেরে বলেছিলাম— 'পালিয়ে আসুন! পালিয়ে আসুন!'

শক্ত হয়ে প্রফেসর দাঁড়িয়েই রইলেন। চেয়ে আছেন সেদিকে, যে জায়গাটায় একটু আগে বিচ্ছিরি মুণ্ডু যেখানে দেখেছি, তার একটু পাশেই।

দুটো বড় পাথরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে গোনজালা। মাতাল হাওয়ায় লটপট করছে তার পাতলুন, নিশানের মতো গা থেকে উড়ে যেতে চাইছে ঢলঢলে শার্ট।

'ডিনোনাট।'

প্রফেসর এমনিতে নরম ধাতের মানুষ। কিন্তু রেগে গেলে যাচ্ছেতাই রকমের কর্কশ হয়ে যান।

এখন যে হয়েছেন, তা তাঁর কাঠচেরা গলাবাজি শুনেই মালুম হয়ে গেল, 'বলি, ব্যাপারটা কী?'

দুলে দুলে পাথরের ফাঁক ছেড়ে এগিয়ে এল গোনজালা। বললে, 'হে! হে! হে। ডিনোনাটকে ভয় দেখাচ্ছিলুম।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে? এটা ইয়ার্কি মারার জায়গা?'

'একটু-আধটু রগড় না করলে যে আমরা পারি না।'

'আমরা। মানে?'

বিটকেল হলুদ দাঁত বের আর-এক দফা হেসে নিল গোনজালা, 'আপনাকে মস্ত খবরটা দিইনি চমকে দেব বলে।'

'কী খবর?' গোনজালা তখন আরও এগিয়ে এসেছে। একটা উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে নাকে।

'বললে কি বিশ্বাস করবেন?' দুলে দুলে আরও সামনে এসে দাঁড়াল গোনজালা। এতক্ষণে লক্ষ করলাম সারা মুখে তেল মেখেছে। মুখ চকচক করছে সকালের রোদে— উগ্র গন্ধটাও আরও ঝাপটা মারছে আমার নাসিকারন্ধ্রে।

'করব,' চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছেন প্রফেসর।

'কারা এখুনি চেঁচাল বলুন তো?'

'সে প্রশ্নটা আমিই করতে যাচ্ছিলাম।'

'প্রফেসর, আপনি জানতে চাইছিলেন, এ দ্বীপে মানুষ-টানুষ নেই কেন— মনে আছে?'

'আছে।'

'মানুষের মতোই একরকম প্রাণী এ দ্বীপটা দখল করে আছে বলে।'

'মানুষের মতো প্রাণী?'

'ডি এন এ মিলিয়ে দেখা গেছে, এরাই মানুষের সব চাইতে কাছের না-মানুষ আত্মীয়।'

'শিম্পাঞ্জিদের কথা বলা হচ্ছে?'

'ইয়েস স্যার। অনেক... অনেক বছর আগে আফ্রিকার তানজানিয়া থেকে একদল শিম্পাঞ্জি এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এই জঙ্গলে। তারাই এখন এ দ্বীপের অধীশ্বর। মানুষকে তারা অনেক অনেক বছর আগেই খেদিয়ে দিয়েছে পাহাড় আর জঙ্গল থেকে।'

'তোমার সঙ্গে এত ভাব কেন?

'কারণ আমি যে ওদের ভাষা শিখেছি— আমাকে দেখতে যে ওদের মতোই।'

হাঁ হয়ে শুনছিলাম গোনজালার কথা। গোড়া থেকেই লোকটাকে নরবানরের মতো দেখতে মনে হয়েছে। গরিলার মতো নয়, ওরাংওটাং-এর মতোও নয়— সার্কাসের শিম্পাঞ্জির মতো। 'প্রোজেক্ট এক্স' ফিল্মে এদের দেখেছি। আমি জানি এদের স্বাভাবিক সঙ-এর মতো দেখতে হলেও এরা যুদ্ধ করতে পোক্ত, খুনে স্বভাবটা এদের রক্তে। ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে 'হোমো স্যাপিয়েন্স' অর্থাৎ মানুষ জাতটার কাছাকাছি এসেও হড়কে পড়েছে।

'শিম্পাঞ্জি। যমজ দ্বীপে তা হলে শিম্পাঞ্জিদের রাজত্ব চলছে?'

চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন প্রফেসর, 'শিম্পাঞ্জিরা তা হলে ঠেঙিয়ে মানুষদের বিদেয় করেছে?'

'কোন কালে! কিন্তু আমাকে কোলে টেনে নিয়েছে। কারণটা আগেই বলেছি। দেখতে আমাকে অবিকল শিম্পাঞ্জিদের মতোই।'

'তাতো দেখতেই পাচ্ছি। স্বভাবের ফিচলেমোও রয়েছে,' প্রফেসরের কথায় এখন ছুরি চলছে, 'তা নকল শিম্পাঞ্জি মশায়, মুখে এই তেলটা কেন মেখে এলে?'

'আর বলেন কেন! অনেকদিন পরে আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে মুখে ফলের রস মাখিয়ে দিল।'

'ফল-টলও খেয়ে এলে?'

'তাতো খেতেই হবে।'

'আহারেও যে শিম্পাঞ্জিদের মতো। যাক, এখন কী মতলব?'

'মতলব?' পাটকিলে চোখে বিস্ময় নিয়ে বললে গোনজালা, 'এত কাঠখড় পুড়িয়ে এলেন যা করতে, সেটা করে আসি চলুন...'

'ও হ্যাঁ, প্লাটিনাম মেট্যালদের ডিপোজিট। আজ থাক।'

'কেন, প্রফেসর, কেন?'

বাজখাঁই চিৎকার শোনা গেল পেছন থেকে। রিচার্ড এতক্ষণ সব দেখেছে শুনেছে— কিন্তু একটাও কথা বলেনি। এবার চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে, 'না! না! না!'

'কেন রে? কেন না?' বলেই হেলেদুলে হেলিকপ্টারের দিকে তেড়ে গেল গোনজালা।

আমি আর প্রফেসর দুজনেই ওকে ধরতে গিয়ে ধরতে পারলাম না। সাঁত করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় আমাদের হাত গলে ছুটে গেল গোনজালা এবং অদ্ভুত লাফ মেরে উঠে গেল রিচার্ডের পাশে।

শুনতে পেলাম তার চিৎকার, 'কেন? যাবি না কেন? তোকেও যেতে হবে।'

'দূর হ! বাঁদর কোথাকার! ওঃ ওঃ ওঃ!'

রক্তজল করা চিৎকারটা ঠিকরে এল রিচার্ডের গলা থেকেই। দূর থেকেই দেখতে পেলাম

তিড়বিড়িয়ে লাফ দিয়ে নেমে এল সে বালির ওপর। আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে গড়িয়ে গেল কিছুটা। তারপর স্থির। নিস্পন্দ।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। পালকের মতো হালকা লাগছিল নিজেকে। কেউ বিপদে পড়লে এমনিই হয় আমার। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দৌড়োই তাকে বাঁচাতে।

প্রফেসর আমাকে ধরতে গেছিলেন। কিন্তু বুড়ো শরীর আমার সঙ্গে পারবেন কেন? পেছন থেকে কেবল চেঁচিয়ে গেলেন—

'সাবধান! সাবধান! সাবধান!'

কাকে সাবধান? কীসের সাবধান? জলজ্যান্ত একটা লোক ছটফটিয়ে ঠান্ডা মেরে গেল, তাই দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নেমে ততক্ষণে তফাতে সরে গেছে গোনজালা। চোখের কোণ দিয়ে পলকের জন্যে দেখলাম, হাতে রয়েছে একটা থলে।

নক্ষত্রবেগে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিলাম রিচার্ডের ওপর।

বেচারি রিচার্ড! বেচারি রিচার্ড। একি মুখের চেহারা তোমার?

মনে মনে ককিয়ে উঠে ঝাঁকুনি দিতে গিয়েছিলাম ওর দেহটা ধরে, জানি প্রাণ উড়ে গেছে একটু আগেই আমাদের চোখের সামনেই— তবুও... তবুও...

পেছন থেকে প্রফেসর জাপটে ধরলেন আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলেন আকুল গলায়, 'বোকা! বোকা! বোকা! তফাৎ যাও! তফাৎ যাও!'

বিহ্বল চোখ তাকিয়েছিলাম প্রফেসরের পানে। শুধিয়েছিলাম ব্যাকুল গলায়, 'প্রফেসর! প্রফেসর! কীভাবে মারা গেল রিচার্ড?'

'সেটা দেখতে দাও— হাঁদারাম গোঁয়ার— সরে দাঁড়াও।' বলে এক ঝটকায় আমাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে হেঁট হলেন প্রফেসর এবং রিচার্ডের দুটো ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলেন কিছুটা। ঠ্যাং ছেড়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন রুদ্ধশ্বাসে, 'দেখেছ?'

দেখলাম বটে। বালিতে মাখামাখি হয়ে গেলেও তাদের চেনা যাচ্ছে। কালো কুচকুচে তাদের দেহ। সারা গায়ে টকটকে লাল ফুটকি। ভেলভেটের গা বললেও চলে!

আটখানা পা কুঁকড়ে গুটিয়ে শক্ত হয়ে আছে।

সংখ্যায় তারা তিন। তিনজনে একই সঙ্গে বিষ ঢেলে দিয়েছে বেচারি রিচার্ডের অঙ্গে। দেহের চাপে পিষ্ট হয়ে পটল তুলেছে তার পরেই। রিচার্ডের দেহের ওজন তো কম নয়। আর এরা আধ ইঞ্চির চেয়ে বড় নয়।

মাত্র আধ ইঞ্চি দেহের মাপ! কিন্তু কী বীভৎস আকৃতি!

না, এরা পোকা নয়। পোকাদের থাকে ছ'টা পা। এদের রয়েছে আটখানা পা। এরা যখন আট ইঞ্চি বড় শরীর নিয়ে জ্যান্ত পাখি ধরে খায় তখন তাদের টারানটুলা বলা হয়। কিন্তু মাত্র আধ ইঞ্চি মাপের মখমল কোমল বপু নিয়ে এরা কারা? কেন এত নৃশংস? হত্যালালসায় কেন এত উদগ্রীব?

হত্যাসংকল্পই জাগ্রত হয়েছিল আমার দুই চোখ। জ্বলন্ত চোখে চেয়েছিলাম দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গোনজালার দিকে।

চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

বিরাট বিরাট পাথরগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে কাতারে কাতারে শিম্পাঞ্জি। দুলে দুলে চলছে ঠিক গোনজালার মতোই। চেহারাও অবিকল গোনজালার মতো। দেখতে দেখতে হেলিকপ্টার আর আমাদের দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল শিম্পাঞ্জিবাহিনী। মারমুখো আকৃতি আর নৃশংস পাটকিলে চাহনি দেখেই বুঝলাম, নড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে— ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

গোনজালা একা দাঁড়িয়ে একটু তফাতে।

অশান্ত সমুদ্রগর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল তার উচ্চকণ্ঠ, 'প্রফেসর! ডিনোনাট! এবার বুঝেছেন আমাদের শক্তিটা কোথায়?'

'ওই মাকড়শা?' আশ্চর্য শান্ত গলায় বললেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ। যাদের মোট চল্লিশ হাজার রকমের প্রজাতিরা রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে পৃথিবীময়।'

'রাজত্ব আর করছে কোথায়!' বেশ শান্তভাবেই ব্যঙ্গ করেন প্রফেসর, 'যাদের মেয়েরা ছেলেদের ধরে খেয়ে ফ্যালে, তারা কোনওদিনই পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারবে না।'

দপ করে জ্বলে উঠল গোনজালার পাটকিলে চোখ। হলদে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'আপনাকে তা হলে গ্রিক পুরাণের সেই গল্পটা বলতে হয়।'

'মিনার্ভা আর অর্চনার সেই গল্পটা?' প্রফেসরের গলায় তাচ্ছিল্যের সুর।

'অর্চনা!'— সমান ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয় গোনজালায় গলায়।

'আরে, ওই হল গিয়ে। নাম তার Arachne— আমি নাম দিয়েছি অর্চনা, ক্ষতি কী? আমরা বাঙালিরা নাম-ধামগুলোকে একটু মিষ্টি করে নিই। তা গল্পটা শোনাও।'

'জানেন মনে হচ্ছে।'

'জানব না কেন। কে ভাল বুনতে পারে, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়েছিল অর্চনা নামে মেয়েটা আর দেবী মিনার্ভার মধ্যে। জিতে গেল অর্চনা। রেগেমেগে মিনার্ভা তার বোনা কাপড় ছিঁড়ে ফেললে। ভীষণ দুঃখ পেয়ে গলায় দড়ি দিতে গেল অর্চনা অমনি মন গলে গেল মিনার্ভার। দড়িটাকে বানিয়ে দিলেন মাকড়শার জাল— আর অর্চনাকে মাকড়শা!'

'ঠিক। ঠিক। ঠিক।'

'বেঠিক কথা কবে বলেছি! অর্চনা নামটা থেকেই মাকড়শাদের নাম হয়ে গেল Arachnid— তাই না?'

'ঠিক। ঠিক। ঠিক।'

'এবার বলো তো ছোকরা— ছোকরা বলছি বলে রাগ কোরো না, গোনজালা— তোমার এই শিম্পাঞ্জি স্যাঙাতদের লেলিয়ে দিও না— অর্চনাদের হাত থেকে তোমরা কীভাবে টিঁকে আছো?'

হলদে দাঁত বার করে গোনজালা বললে, 'তেল দিয়ে।'

'অ্যাঁ! মাকড়শাদের তেল দিয়ে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

'সে তেল নয়... সে তেল নয়— সত্যিকারের তেল।'

বলেই গালে আঙুল রগড়ে বললে গোনজালা, 'গাছের তেল গায়ে মাখলে— বড্ড ঘেন্না করে মাকড়শারা।'

'বটে! এই জন্যেই এত বিটকেল গন্ধ তোমার গায়ে। তোমার স্যাঙাতদের গায়েও তো দেখছি তেল হড়হড় করছে।'

'তা তো করবেই! অর্চনারা পোষ মানে না— তেলের ভয়ে দূরে থাকে।'

'বেশ! বেশ! রোদ ক্রমশ চড়া হচ্ছে গোনজালা। কথাবার্তা চটপট সেরে নাও। প্রহসনের কী দরকার ছিল?'

'প্রহসন!'

'অর্চনাদের দ্বীপে কেন নিয়ে এলে আমাদের।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না গোনজালা। অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইল দূর সমুদ্রের দিকে।

তারপর বললে মুখ ফিরিয়ে, 'অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে মানুষ জাতটা এই দ্বীপের মাকড়শাদের অবিশ্বাস্য ক্ষমতা দিয়ে গেছে।'

'অবিশ্বাস্য ক্ষমতা?'

'প্রফেসর, এই দ্বীপে মানুষ থাকতে পারেনি এই মাকড়শাদের ভয়ে। তারপর এল শিম্পাঞ্জিরা। এরা বনবাদাড় থেকে ঠিক গাছটি বেছে নিতে শিখল সহজাত অনুভূতি দিয়ে— সেই গাছের তেল মেখে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখে মানুষদের সাবাড় করেছে কীভাবে, তা একটু আগেই দেখলেন।' শেষ কথাটা রিচার্ডকে দেখিয়ে বললে গোনজালা।

'শিম্পাঞ্জিরা তো তখন ওখানে ছিল না,' বললেন প্রফেসর।

'ছিলাম আমি, আর ছিল এই থলি।' হাতের থলিটা উঁচু করে দেখায় গোনজালা। ভেতরে কী যেন নড়ছে। গাছের ছাল দিয়ে তৈরি থলি ফুলে ফুলে উঠছে— 'এর মধ্যেই আছে আপনার অর্চনারা। মাত্র তিনটেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম রিচার্ডভায়ার ওপর।' বলে মুখবন্ধ থলিটা ঢলঢলে শার্টের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে গোনজালা।

'বুঝলাম,' গম্ভীর মুখে বললেন প্রফেসর— 'পারমাণবিক বিকিরণের ফলে এই কুড়ি বছরে প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছে অর্চনাদের মধ্যে। কী পরিবর্তন?'

'দেখবেন আসুন। ভয় নেই। আমরা ঘিরে নিয়ে যাব আপনাদের।'

আর তাই দেখলাম খুদে মাকড়শাদের ভয়াবহ কীর্তি। দ্বীপের এদিকটায় কুয়াশার চাদর, দেখিনি আকাশ থেকে। কারণ এদিকের জঙ্গলে রয়েছে সেই গাছের জঙ্গল যাদের তেল সহ্য করতে পারে না মাকড়শারা।

শিম্পাঞ্জিবাহিনী আমাকে আর প্রফেসরকে মাথায় তুলে নিয়ে গেল এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। গোনজালা নির্ভয় করেছিল বলেই উঠেছিলাম তাগড়াই একজনের কাঁধের ওপর— নইলে আমার বয়ে গেছে। তাতে লাভ হল বিস্তর।

হাঁটার মেহনতই শুধু কমেনি— গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও হল সেই প্রথম। অসম্ভব শক্তিশালী এই শিম্পাঞ্জিরা। হাঁটাপথে কিছুদূর গিয়েই আচমকা আঁহু-আঁহু-আঁহু করে চেঁচিয়ে উঠেই টপাটপ লাফ দিয়ে উঠে গেল গাছের ডালে— একহাতে জাপটে ধরে রইল আমাকে আর প্রফেসরকে।

খুবই খারাপ লাগছিল আমার এইভাবে বাচ্চা খোকার মতো শিম্পাঞ্জির বগলদাবা হয়ে থাকতে— প্রফেসর কিন্তু বেড়ে মজায় আছেন দেখলাম। আমার ব্যাজার মুখ দেখে খিকখিক করে হেসেও ফেললেন কয়েকবার।

হু-হু করে যেন উড়ে গেলাম শূন্যপথে। এক গাছ থেকে আর এক গাছে— তারপরেই পরের গাছে। প্রথম প্রথম ভয় করছিল। আমার ঠিক পাশেই অবিকল শিম্পাঞ্জিদের মতো গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে যেতে যেতে গোনজালা বলে উঠল, 'ভয় নেই, ডিনোনাট! আমরাই এ যুগের টার্জন!'

ননসেন্স! সুযোগ পাই, তারপর ছোটাব তোমার টার্জনগিরি— মনে মনেই বলেছিলাম আমি।

ঝড়ের বেগে উড়ে যাওয়ার ফলে কীভাবে কোনদিক দিয়ে যমজ দ্বীপের ওদিকে গিয়ে পৌঁছোলাম, তা গুলিয়ে গেছিল।

আচমকা শিম্পাঞ্জিবাহিনী থমকে গেল মজবুত মগডালগুলোয়।

গোনজালা বললে হেঁকে, 'ডিনোনাট! প্রফেসর! সামনে দেখুন।'

সূর্য তখন মাথার ওপর। ঝকঝকে রোদ ঠিকরে যাচ্ছে সামনের জঙ্গলের মাথায় পাতা কুয়াশার চাদর থেকে।

কুয়াশা! এত রোদে কুয়াশা!

চোখ কচলে ফের তাকিয়েছিলাম।

হাওয়ায় চিকমিক-চিকমিক করে উঠছে ঝকঝকে সাদা কুয়াশার আস্তরণ— সেই সমুদ্রতীর পর্যন্ত।

গতকাল গোধূলির ম্লান আলোয় হেলিকপ্টার থেকে এই কুয়াশার চাদরই দেখেছিলাম।

দেখেছিলাম পাহাড়দুটোর মাথার দিকে গাছপালার ওপর।

আপনা হতেই চোখ ঘুরে গেছিল পাহাড়ের চুড়োর দিকে।

হ্যাঁ, সেখানেও কুয়াশার চাদর ঝিকমিক করছে প্রখর রোদ্দুরে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ফের তাকিয়েছি সামনের দিকে— অমনি দেখলাম একটা আশ্চর্য দৃশ্য।

সমুদ্রের দিকে বেশ খানিকটা কুয়াশার চাদর ভেসে উঠল শূন্যে। হাওয়া তখন বইছে এদিক থেকে ওদিক— অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে।

কুয়াশার চাদরটা ভাসতে ভাসতে নেমে গেল সমুদ্রের ওপর— তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে— যেখানে ঢেউ উথালি-পাথালি নয়।

গুটিয়ে যেন ছোট হয়ে রইল কুয়াশার চাদর।

তারপর— তারপর— অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

হাওয়ার বিপরীত দিকে কুয়াশার চাদর একটু একটু করে সরে আসছে বেলাভূমির দিকে!

অথচ জোর হাওয়ায় চাদরটার সরে যাওয়ার কথা আরও গভীর সমুদ্রে!

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছিল স্বয়ংচালিত কুয়াশার পশ্চাদগতি দেখে।

এমনসময়ে হেঁকে উঠলেন প্রফেসর, 'আহাম্মক! দড়িটা দেখতে পাচ্ছ না!'

'দড়ি!'

'অর্চনার দড়ি! অর্চনার দড়ি! ঝকঝক করছে রোদ্দুরে!'

হ্যাঁ, এবার দেখতে পেয়েছি। অর্চনার দড়িই বটে। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে তার চকচকে মসৃণ গা থেকে। গাছের ডগায় কুয়াশার চাদরে তার একপ্রান্ত লেগে রয়েছে আর-একপ্রান্ত সমুদ্রের মাঝে পিছু-হটা কুয়াশার চাদরের গায়ে।

পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ ঝলসানির মতোই আসল ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল আমার এই বোকা মাথায়।

মাকড়শার জাল।

আকাশপথে কপ্টারে বসে যাকে 'কুয়াশার চাদর', ভেবেছিলাম এখনও চিন্তার সেই ছাপ মাথার মধ্যে নিয়ে যে জিনিসটাকে কুয়াশার চাদর মনে করে যাচ্ছি— আসলে তা বহুদূর বিস্তৃত কল্পনাতীত মাকড়শার জাল ছাড়া কিছুই নয়!

এই জালেরই খানিকটা মিহি তন্তুতে বোনা বেলুনের মতো উড়ে গেছে সমুদ্রের বুকে— কিছু জালেরই মোটা সুতো তাকে আবার টেনে আনছে জঙ্গলের দিকে।

অর্চনার দড়িই বটে! এত মজবুত। এত ভেল্কিও জানে এদের বোনা কাপড়।

কিন্তু অত নড়ছে কেন জালটা? দূর থেকে দেখলেও বেশ বুঝছি, মুহূর্মুহু ছটফটিয়ে উঠছে গুটিয়ে আসা জালটা। কাদের যেন বন্দি করে আনছে জালের আঠায় লাগিয়ে— মরণান্তক যন্ত্রণায় ছটফট করছে তারাই।

মাছ!

জাল পেতে মাছ ধরেছে মাকড়শারা। যেভাবে পোকামাকড় ধরে ঘরের কোণে— সেইভাবে পাশে জেলের মতো হাওয়ায় জাল উড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে মাছ ধরে আনছে নোনা জল থেকে!

গা শিরশির করে উঠল তাই দেখে।

'এরা মাছ খায়?' প্রশ্নটা অজান্তেই বেরিয়ে গেছিল মুখ দিয়ে।

জবাবটা দিলে গোনজালা পাশ থেকে, 'ডিনোনাট, এই গাছের তলায় দেখো।'

দেখলাম। শিউরে উঠলাম। একটা নরকঙ্কাল। না না। একটা নয়— অগুনতি। মানুষের হাড়ের পাহাড় রয়েছে যেন গাছের তলা বরাবর— ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর দু'চোখ যায়— কেবল হাড় আর হাড়।

গোনজালা বললে, 'ডিনোনাট! প্রফেসর! এই জন্যেই আপনাদের নিয়ে এসেছি!'

শাখামৃগর মতো গাছের ডালে বসে বললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'কী জন্যে? এত মানুষের হাড় কেন?'

'ওগুলোর সব মানুষের হাড় নয়, প্রফেসর। ওদের মধ্যে আছে শিম্পাঞ্জিদেরও হাড়।'

'কেন? কেন?'

'মাকড়শাদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। যারা মরেছে, তাদের দেহ এখানে ফেলে যাওয়া হয়। সবসময়ে তেল মেখে নিজেদের কতই বা টিকিয়ে রাখবে— কালো শয়তানগুলো মাটির ফুটো থেকে, গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে! হাওয়া এদিকে

থাকলে জাল ভাসিয়ে উড়ে আসছে। একটু একটু করে শিম্পাঞ্জিদের সংখ্যা কমছে।'

'খুবই বিপদের কথা, গোনজালা,' গালে হাত দিয়ে বললেন প্রফেসর।

'খুবই প্রফেসর, খুবই। অ্যাটম বিকিরণ শুধু যে মাকড়শাদের উন্নতি ঘটিয়েছে, তা তো নয়— শিম্পাঞ্জিদের ডিএনএ-তেও পরিবর্তন এনেছে— আরও আনছে— এখন এদের বাচ্চাকাচ্চারা মানুষের আরও কাছে চলে এসেছে— ক্রমবিবর্তনের লম্বা ফাঁকটা ডিঙে মেরে দিচ্ছে একলাফে।'

'অ্যাঁ!'

মুচকি হেসে বললে গোনজালা, 'আমাকে দেখে বুঝছেন না?'

'তুমি তো— তুমি তো মানুষ।'

চট করে ঘুরিয়ে কথা নিল গোনজালা, 'সে যাক, ডাইনোসররা পৃথিবীতে আসবার আগে থেকেই মাকড়শা ছিল— ডাইনোসররা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে— কিন্তু টিঁকে রয়েছে মাকড়শারা। এরা হল 'যখন-যেমন-তখন-তেমন'-দের জাত। খাবারের অভাব কীভাবে মিটিয়ে চলেছে দেখুন। জল থেকে মাছ ধরছে। এরপর প্রচণ্ড ঝড়ে পুরো জাল ভর্তি মাকড়শা ছড়িয়ে যাবে আশপাশের দ্বীপে— সেখান থেকে মহাদেশে। তারপর?'

চোয়াল ঝুলে পড়ে প্রফেসরের, 'সত্যিই তো!'

'খাবারের অভাবে মেয়েরা ছেলেদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলেছে— এই যা রক্ষে। কিন্তু কতদিন এরা আটকে থাকবে যমজ দ্বীপে?'

'তা...ইয়ে... আমাদের কী করার আছে?' আমতা আমতা করে বললেন প্রফেসর।

গোনজালা বললে, 'চলুন, প্লাটিনামের ভাঁড়ারটা আগে দেখিয়ে আনি— তারপর বলব!'

আবার ধাবিত হলাম শূন্যপথে নরবানরদের কাঁধে চেপে। হুম হুম করে পাহাড় বেয়ে নানা পথ দিয়ে, মাকড়শাদের জালপাতা ঘাঁটি ঘুরে, পৌঁছোলাম একটা চুড়োয়।

জ্বালামুখে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে দেখলাম, অনেক নীচে খুব আস্তে আস্তে কাদা ফুটছে। ঘন কাদা অনেক পরে পরে ফুলে উঠছে— একটা বুদবুদ তৈরি করে ফাটিয়ে দিয়েই আবার তলিয়ে যাচ্ছে।

বিড়বিড় করে গোনজালা বললে, 'কে জানে এই কাদার কেমিক্যালের জোরেই মাকড়শাগুলো এত বেড়েছে কিনা।'

প্রফেসর নির্বাক। আমি হতবাক।

আবার শাখামৃগদের কাঁধে চেপে উড়ে এলাম গাছ থেকে গাছে— এক পাহাড় থেকে নেমে উঠে গেলাম আর এক পাহাড়ের জ্বালামুখের কিনারায়।

আর এইখানেই দেখলাম প্লাটিনাম মেটালের বিশাল ভাণ্ডার!

অবিশ্বাস্য! কিন্তু সত্যি! চাঁই চাঁই সাদাটে ধাতু জ্বালামুখের ভেতরের গা বেয়ে নেমে গেছে অনেক নীচে পর্যন্ত, মাথার ওপর থেকে সূর্য একটু সরে যাওয়ার ফলে তলদেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না—

কিন্তু সেখানেও যে চাঁই চাঁই সাদা ধাতু পড়ে রয়েছে— তাতে সন্দেহ নেই।

মরা আগুনপাহাড়ে এত দামি ধাতু? যে ধাতু আলাদাভাবে এমন রাশিকৃত অবস্থায় আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও পাওয়া যায়নি?

আমরা এখন সমুদ্রের ধারে। হেলিকপ্টারের পাশে।

রিচার্ডের ডেডবডি কিন্তু উধাও।

অনুমান করতে পারলাম সেটা এখন কোথায়।

মাকড়শাদের জঙ্গলের পাশে। শিম্পাঞ্জিরাই বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছে। রাক্ষুসে খিদে মিটিয়ে চলেছে যেভাবেই হোক। কেষ্টর জীবদেরই দিয়ে পেট ভরিয়ে চলেছে। মনটা দমে গেল।

প্রফেসর আর গোনজালা এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একটু দূরে গোল হয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছে শিম্পাঞ্জিরা।

প্রফেসর বললেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই এখানে হাজির?'

গোনজালা বললে, 'আমাকে বাদ দিয়ে বলুন। হ্যাঁ, ওরা সব্বাই হাজির।'

'আচ্ছা, তোমাকে বাদ দিলাম। সংখ্যায় ওরা কজন?'

'একান্নজন।'

'তার মানে এই দ্বীপে একেবারে নতুন প্রজাতির অত্যন্ত উন্নত ধরনের একান্নটা শিম্পাঞ্জি রয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'প্লাটিনাম মেটালগুলো ঘুষ দিতে চাইছে?'

'মনের কথা বলেছেন।'

'তারপর?'

'গাছের তেল নিয়ে যাব সঙ্গে। নমুনা হিসেবে। আপনারা ল্যাবরেটরিতে হুবহু সেইরকম কীটনাশক বানিয়ে দেবেন। এরোপ্লেনে করে এনে গোটা দ্বীপে ছড়িয়ে দেবেন।'

'অর্চনারা তাতে মরে যাবে?'

'সঙ্গে সঙ্গে।'

'প্রমাণ?'

ইশারা করল গোনজালা। একটা শিম্পাঞ্জি একটা ডাব নিয়ে দৌড়ে এল। কাটা মুখটা গাছের লতা দিয়ে মুখেই বাঁধা রয়েছে।

লতা খুলে মুখটা ফেলে নিল গোনজালা। উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। নাকের মধ্যে দিয়ে ঝাঁঝাল গন্ধটা টাগরা পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিল।

শার্টের মধ্যে থেকে সেই থলিটা বের করে গোনজালা। যার মধ্যে থেকে মাত্র তিনটে মাকড়শা বেরিয়ে এসে পরলোকে পাঠিয়েছে রিচার্ডকে।

খুব সন্তর্পণে থলির মুখ আলগা করে ডাবের কাটা মুখে টিপে ধরে গোনজালা।

পরক্ষণেই থলির মুখ টিপে ধরে ডাক দিলে আমাকে আর প্রফেসরকে, 'অর্চনা মরছে!'

মরছেই বটে। নিদারুণ যন্ত্রণায় একটা মাকড়শা আট পা নাড়তে নাড়তে মারা যাচ্ছে ডাবভর্তি তেলের মধ্যে। তার কালো মখমলের মতো লাল দেহে টকটকে ফুটকিগুলো যেন আরও লাল হয়ে উঠছে মৃত্যুযন্ত্রণায়।

বড় আনন্দ পেলাম অর্চনার মৃত্যু দেখে।

একান্নটা শিম্পাঞ্জিকে জাহাজে তুলে আমরা এখন ফিরে চলেছি স্বদেশে। একান্নজনই কাঁড়ি কাঁড়ি প্লাটিনাম চাঁই বয়ে এনে ভরে দিয়েছে জাহাজের খোল। আরও আছে আগুনপাহাড়ের গর্ভে।

গোনজালা মনের আনন্দে কলা খাচ্ছে।

এখনও বুঝলাম না, আসলে সে কী!

মানুষ না শিম্পাঞ্জি?

হাতের দস্তানা খুলে আঙুলগুলো দেখতে হবে!
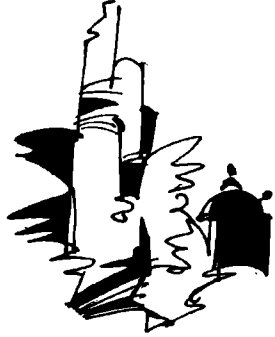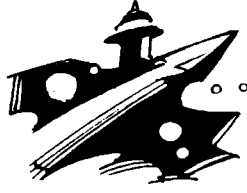
ইলেকট্রিক জীবাণু

প্রাইভেট ট্যাক্সি যখন দার্জিলিং-এ ঢুকল, তখন রাত ন'টা। শহর অন্ধকার। দোকানপাট বন্ধ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

সুদর্শন, শিক্ষিত, নেপালি ড্রাইভার পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'টুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে চলে যান— মিনিট দশেকের পথ। জলাপাহাড় যাওয়ার রাস্তায় পাবেন আপনাদের হোটেল।'

বলে, চৌমাথা থেকে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিল বোঁ করে। বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে গেল ঝকঝকে নতুন অ্যামবাসাডর।

দু'হাতে দুটো সুটকেশ নিয়ে গরম জামাকাপড় পরেও ভিজতে ভিজতে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম আমি। নিষ্প্রদীপ, তমিস্রাময়, কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ঢাকা এ শহরকে কে বলবে রানি শহর।

মনটা দমে গেল খুবই! অন্ধকার আর বৃষ্টির ধারায় বুঝতেও পারছি না কোন রাস্তাটা দিয়ে একটু উঠলে টুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে জলাপাহাড়ে যাওয়ার পথে পৌঁছব।

তিরিক্ষে গলায় পেছন থেকে বললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র— 'কী হে, দীননাথ! বলেছিলাম না, উড়ো খবর শুনে ছুটে এসো না— ছো! ইলেকট্রিক বিভীষিকা দেখাবে! ইলেকট্রিকই নেই গোটা টাউনে!'

কথাটা শেষ করতে পারেননি প্রফেসর।

আচমকা ডানদিকের ওপর দিকের একটা বাড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলো ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল। নিমেষের মধ্যে হাজার হাজার ওয়াট বিদ্যুৎ যেন ফেটে পড়ল ওই পাহাড়ি কটেজে। পরক্ষণেই শোরগোল, আর্তনাদ, চিৎকার।

বিস্ফোরণের আওয়াজটা কানে ভেসে এল তারপরেই। ঘাড় তুলে দেখলাম, অত্যুজ্জ্বল আলোক-বিস্ফোরণ অন্তর্হিত হয়েছে। দার্জিলিং যেমন নিষ্প্রদীপ ছিল, তেমনই রয়েছে। শুধু যে বাড়িটায় অকস্মাৎ আলোর বন্যা বয়ে গেল, সেটা চৌচির হয়ে ওপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের রাস্তার দিকে পড়ছে!

এসব পরিস্থিতিতে চিরকালই আমার হাতে-পায়ে ইলেকট্রিক খেলে যায়। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ দেয়। ধ্বসে পড়া কটেজের তলায় আমি আর প্রফেসর চাপা পড়তে চলেছি, বুঝতে

পারার সঙ্গে সঙ্গে সুটকেশ দুটো ফেলে দিয়ে প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম এবং তিরবেগে নেমে গেলাম হিলকার্ট রোড বেয়ে নীচের দিকে।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম দু'জনে, প্রচণ্ড শব্দে ভাঙা কটেজ এসে পড়ল সেখানে।

কোলবন্দি হয়ে হাত-পা ছুড়ছিলেন প্রফেসর। নামিয়ে দিলাম রাস্তায়। বললাম ঠান্ডা গলায়, 'দেখতেই পেলেন, উড়ো খবর নয়। ইলেকট্রিক বিভীষিকার আবির্ভাব ঘটেছে দার্জিলিং-এ।'

শোরগোল তখনও থামেনি। আশপাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেকেই। তাদেরই একজন শুনতে পেল আমার কথা। দাঁড়িয়েছিল পেছনেই। হাতে টর্চ। বাংলায় বললে, 'ইলেকট্রিক বিভীষিকাই বটে! এত দিন হচ্ছিল নীচের ভুটিয়া গ্রামে। এই প্রথম দেখা গেল ম্যালের এত কাছে। খুব জোর বেঁচে গেলেন। কলকাতা থেকে আসছেন?'

ভিড়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'হ্যাঁ। যাব সানগোল্ড হোটেলে। রাস্তা চিনতে পারছি না।'

ভদ্রলোক মাঝ বয়সি। চোখে রিমলেস চশমা, গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। বেশ বিদগ্ধ পুরুষ বলেই মনে হল। টর্চের আলোয় এর বেশি আর দেখা গেল না।

বললেন, 'চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি। আপনাদের মালপত্র?'

'ভাঙা কটেজের তলায়।'

'চলুন তো দেখি, টেনে বার করা যায় কিনা।'

আধঘণ্টা পর সানগোল্ড হোটেলে আমাদের পৌঁছে দিলেন ভদ্রলোক। একটা সুটকেশ নিজেই বয়ে নিয়ে এলেন— আর-একটাকে বইলাম আমি।

হ্যাজাক জ্বলছে ডাইনিং হলে। দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনি না থাকলে খুবই কষ্ট হত। আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি।'

'ক্যাপ্টেনকাকা বলেই সবাই আমাকে চেনে এখানে। পার্মানেন্ট বাসিন্দা— টুরিস্ট নই। আপনারা?'

'আমাকে শুধু দীননাথ বলেই ডাকতে পারেন— কেউ চেনে না— আপনিও চিনবেন না। তবে এঁকে অনেকে চেনেন,' বললাম প্রফেসরকে দেখিয়ে।

'কে বলুন তো?'

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

'মাই গড! আগে বলবেন তো? টেলিফোনটা আমিই তো করেছিলাম।'

'আপনি? নাম বললেন না কেন?'

রিমলেস চশমার আড়ালে অদ্ভুত ঝিলিক দেখলাম। ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসলেন ক্যাপ্টেনকাকা।

বললেন, 'এখানে যা ঘটেছে, তা অবিশ্বাস্য। তাই নাম জানিয়ে হাস্যস্পদ হতে চাইনি। তবে আপনারা এলেই আমি নিজেই যেতাম।'

'কেন?'

'কারণ,' একটু থেমে আবার সেই বিচিত্র হেসে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা, 'সবক'টা স্ট্রেঞ্জ কেস আমার সামনেই ঘটেছে।— আচ্ছা চলি। কাল সকালে দেখা হবে।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন ক্যাপ্টেনকাকা। ঢালু রাস্তায় দূর থেকে দেখতে পেলাম তাঁর টর্চের আলো ম্যালের দিকে নেমে যাচ্ছে।

কিন্তু একটা খটকা রেখে গেলেন মাথার মধ্যে।

পেছনে দাঁড়িয়ে উনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে প্রফেসরের কথাবার্তা শুনেছিলেন। উড়ো খবর নয়— এ কথাটা আমিই বলেছিলাম প্রফেসরকে। ক্যাপ্টেনকাকা অবশ্যই তা শুনেছেন।

তা সত্ত্বেও আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন কেন? নাম গোপন করে টেলিফোন তো উনিই করেছিলেন!

ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলেন ক্যাপ্টেনকাকা।

দিনের আলোয় আরও স্পষ্টভাবে দেখলাম চেহারাটা। কীরকম যেন জেলি মাছের মতো থসথসে বপু। শীতবস্ত্র চাপিয়েও চাপা পড়েনি। মাথায় নেপালি টুপি, কাল রাতেও দেখেছিলাম— এখনও দেখলাম। মুখখানা অদ্ভুত রকমের সাদা। সাবুর পাঁপড়ভাজা যেন, সেইরকম অজস্র সাদা আঁচিল, লাল আঁচিল। আঁচিল লাল হয় জানি, সাদা কি কখনও হয়? সন্দেহ হল, খালি গায়ে থাকলে সারা গায়েও হয়তো দেখতাম সাদা আঁচিল— ভাগ্যিস মুখখানা দাড়ি গোঁফে ঢাকা, নইলে ও মুখের দিকের তাকালে গা শিরশির করে উঠত।

প্রফেসর কিন্তু যেন বেশ মজাই পাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেনকাকার মুখশ্রী দেখে। যদিও গতকাল থেকে খেপে ছিলেন আমার ওপর, জোর করে দার্জিলিং-এ টেনে আনায়। কিন্তু ক্যাপ্টেনকাকা চশমার কাচে আর সাদা দাঁতে ঝিলিক তুলে টেবিলে এসে বসতেই বেশ খুশি হয়েই উঠতে দেখা গেল বৃদ্ধকে।

স্বাগতম জানালেন উদাত্ত গলায়, 'আসুন, আসুন, ওয়েট করছি আপনার জন্যেই। ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

কী ব্যাপার, তা আর ব্যাখ্যা করে না বললেও ক্যাপ্টেনকাকা বুঝলেন। সুতরাং আর ভণিতা করলেন না—

বললেন, 'পেশায় আমি ডাক্তার। ছিলাম আর্মিতে। রিটায়ার করে প্র্যাকটিস করছি এখানে। কিছুদিন আগে একটা রুপোলি চোঙা দার্জিলিং-এর মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে কোবিং চা বাগানে পড়ে ফেটে যায়। ইলেকট্রিক বিভীষিকা দেখা দিয়েছে তারপর থেকেই।'

'রুপোলি চোঙা?' প্রফেসর যেন খুব সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল।

'হ্যাঁ। দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেছিল। নইলে বলতাম উল্কাপাত।'

'নিশ্চয় স্যাটেলাইট। কক্ষপথ থেকে খসে পড়েছে।'

'উল্কা নয়, স্যাটেলাইটও নয়।' স্পষ্ট করে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা।

'কেন নয়?' হেসে হেসে বললেও বেশ চোখা প্রশ্নই করলেন প্রফেসর, এবং ঝটিতি তার জবাবও দিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনকাকা চোখে মুখে হেসে হেসেই।

'প্রফেসর, আর্মি এক্সপিরিয়েন্স ছিল বলেই আপনাকে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার সমেত অ্যান্সারটা দিতে পারব। গ্রেট সাইবেরিয়ান এক্সপ্লোশনের কথা নিশ্চয় ভোলেননি?'

'১৯০৮ সালের তিরিশে জুন রাশিয়ার পুব অঞ্চলে—'

'টুঙ্গাসকায় নাকি হাজার হাজার টন ওজনের একটা বিকল মহাকাশযান শূন্যপথেই ফেটে গিয়ে বারো হাজার বর্গমাইল জায়গা জুড়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করেছিল— এতই পাওয়ারফুল ছিল তার এনার্জি।'

'বাঃ! বাঃ! অনেক খবর রাখেন তো দেখছি!' হল কি প্রফেসরের? এত ফুর্তি তো অনেকদিন দেখা যায়নি ওঁর কথাবার্তায়!

'তা রাখি। আমার হবি যে তাই,' থেমে থেমে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা।

'হবি! গাঁজাখুরি ব্যাপারের হবি?'

গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেনকাকা, 'গাঁজাখুরি কিনা জানি না, তবে বলিভিয়ার এক্সপ্লোশনে যে সাড়ে দশ মিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্রানাইট ভেপার হয়ে উড়ে গেছিল— সেটা চোখে দেখেছি।'

'বলিভিয়ায়? কবে? কখন? কীভাবে?' প্রফেসর বেশ নির্বিকার।

'আমি তখন ছিলাম বলিভিয়ার তারজা আর আর্জেন্টিনার বর্ডারে। হঠাৎ একটা দারুণ হুইশলিং শব্দ শুনলাম মাথার ওপর। দেখলাম লকলকে আগুনের শিখা দিয়ে ঘেরা একটা জিনিস উড়ে যাচ্ছে ১২০ মিটার উঁচু দিয়ে। তারপরেই শুনলাম বাজ পড়ার মতো শব্দ। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সারা শরীর।'

'আহ! আগে বলবেন তো?' কাঁচুমাচু মুখে বললেন প্রফেসর, 'তারপর?'

'জিনিসটা কী বুঝতে পেরেছেন?' ক্যাপ্টেনকাকার কণ্ঠস্বর এবার একটু কঠিন।

'উড়ন চাকি?'

'হ্যাঁ। সেইদিনই বিকালে সাড়ে চারটের সময়ে আবার সাংঘাতিক সেই হুইশলিং শব্দ শোনা গেল মাথার ওপর। প্রায় তিনশো ফুট ওপরে দেখলাম আশ্চর্য এক দৃশ্য। একটা ধাতুর চোঙা। ক্রোম স্টিলের চাইতেও চকচকে। লালচে কমলা রঙের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরোচ্ছে সামনের দিক থেকে। লম্বাটে ডিমের মতো গঠন। নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

'বেশ?' প্রফেসর এবার কিন্তু শুনছেন কান খাড়া করে।

'খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল অদ্ভুত সেই আকাশযান— ঘণ্টায় মাত্র ২২০ মাইল স্পিডে। দরজা, জানলার বালাই নেই— খোঁচা বেরিয়েও নেই কোত্থাও। লম্বায় প্রায় ৩০ ফুট, চওড়ায় ২০ ফুট। ঠিক যেন একটা কামানের গোলা— আর্টিলারি শেল— ক্রোমপ্লেটেড। টার্গেটটা মনে হল ১২ মাইল দূরের এল টেয়ার পর্বতচূড়া!'

'ফাইন! তারপর?' ঝুঁকে বসেছেন প্রফেসর। 'কতদিন আগের ঘটনা বলেছেন বলুন তো?'

'১৯৭৮ সালের ৬ মে'র ঘটনা।— তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ড পরে চোঙাটা আছড়ে পড়লে টার্গেটে— মানে, এল টেয়ারের চুড়োয়। দারুণ ফ্ল্যাশে অন্ধ হয়ে গেছিল বেশ কিছু লোক। আলোর ঝলক দেখা গেছিল ৯৩ মাইল দূরেও— মানে, প্রায় ৯০০ বর্গমাইল অঞ্চলের সবাই দেখেছিল আলোটা।'

'ব্রিলিয়ান্ট!' প্রফেসরের প্রীত মন্তব্য।

'কয়েক সেকেন্ড পরেই ঘটল ভয়ংকর একপ্লোশন। ভেঙে গেল ৪৫ মাইল দূরের জানলার কাচ, শুনতে পেল ৫৭,০০০ বর্গমাইল অঞ্চলের প্রত্যেকে।'

'ফিগারগুলো বেশ মনে রেখেছেন তো?'

'রাখতে হয়েছে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা, 'ভূমিকম্প দেখা দিল তারপরেই।'

'ওয়ান্ডারফুল!' প্রফেসর কি তাতাচ্ছেন ক্যাপ্টেনকাকাকে?

'প্রায় পুরো সাউথ ডাকোটা জুড়ে ৭৫৪৭৭ বর্গমাইল অঞ্চলে টের পাওয়া গেছিল ভূমিকম্পের রেশ।— প্রফেসর, সাইবেরিয়ায় নাকি উল্কা পড়েছিল— বলিভিয়ার ঘটনা নিজের চোখে দেখা। উল্কা বলে কি মনে হয়?'

'না, না, কখনওই নয়,' সজোরে মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর।

'বেশিরভাগ উল্কাই পৃথিবীর দিকে ৩২,০০০ থেকে ৪৭,০০০ মাইলস পার আওয়ার স্পিডে ধেয়ে আসে। কখনও কখনও ঘণ্টায় ৯০,০০০ মাইল স্পিডও দেখা যায়। কিন্তু বলিভিয়ার উড়ুক্কু চোঙা এসেছিল খুব জোর ২২০ মাইলস পার আওয়ার স্পিডে।'

'রহস্যজনক ব্যাপার!'

'উল্কা নামে সোজাসুজি— দিকরেখার সঙ্গে প্রায় নব্বই ডিগ্রি কোণে। কিন্তু বলিভিয়ার এই বিভীষিকা নেমেছিল দিকরেখার মাত্র ২৭ ডিগ্রি কোণে।'

'বলিভিয়ার বিভীষিকা! বেড়ে নামটা দিলেন বটে।' প্রফেসর হাসছেন ফিক ফিক করে।

জ্বলন্ত চোখের ফ্ল্যাশ দেখলাম ক্যাপ্টেনকাকার রিমলেস চশমার কাচযুগলের আড়ালে। বললেন দাঁতে দাঁত পিষে, 'কেন দিয়েছি, সেটা পরের কথাটা শুনলেই বুঝবেন। রুপোলি চোঙার ঠিক পেছন পেছন উড়ে এসেছিল আর একটা চোঙা— সাইজে অনেক ছোট। প্রথমটা আছড়ে পড়তেই পেছনেরটা বাঁক নিয়ে উধাও হয়ে গেল আকাশে।'

'তারপর?' প্রফেসর এখনও নিরুত্তাপ।

'বলিভিয়ার মিলিটারি অথরিটি বেশ কিছুদিন হই চই করেছিল বটে— কিন্তু ধামাচাপা পড়ে গেল তদন্ত, যখন দেখা গেল সাড়ে দশ মিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্রানাইট ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই ঘটেনি।'

'আপনি কিছু অঘটন আশা করেছিলেন মনে হচ্ছে!' আচমকা প্রশ্ন করলেন প্রফেসর। কণ্ঠস্বরে ঢিলে ভাবটা আর নেই, তীক্ষ্ণতা এসেছে।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেনকাকার চক্ষুযুগলও, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আশা করেছিলাম। শুনবেন?'

'নিশ্চয়।'

'সাইবেরিয়ার এক্সপ্লোশন খুব বড় রকমের হয়ে গেছিল— কাজ হয়নি। বলিভিয়ার এক্সপ্লোশন তার চাইতেও কম হল— কিন্তু খুব সামান্য রকমের নয়— কাজেই সেখানেও কোনও ফল দেখা গেল না। তাই—' বলে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেনকাকা।

চেয়ে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও। আমি তো বটেই।

ফিসফিস করে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা, 'বিফলে যায়নি দার্জিলিং-এর এক্সপ্লোশন। ছড়িয়ে পড়েছে ইলেকট্রিক জার্ম।'

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেনকাকা। ভুরু আর কপাল কুঁচকে গেল। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে রইলেন জানলা দিয়ে বাইরের কুয়াশাঢাকা পাহাড়ের দিকে।

স্পষ্ট মনে হল কী যেন শুনছেন। ডাইনিং হলে তখন জোর গুলতানি চলেছে। টেবিলে হাসিঠাট্টা চলেছে, স্টিরিয়ো বাজছে।

ক্যাপ্টেনকাকার শূন্যগর্ভ চাহনি দেখে মনে হল না এসব শুনছেন।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর প্রফেসর। ক্যাপ্টেনকাকা এমনকী শুনছেন যা আমাদের দু'জনের কানেই ঢুকছে না!

উঠে পড়লেন হঠাৎ। দ্রুতকণ্ঠে বললেন, 'কাজ আছে। বাকিটা পরে বলব।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন চটপট। সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর খরখরে চোখে তাকালেন আমার দিকে।

বললেন, 'ফলো হিম। দেখো এসো কোথায় যান। তোমাকে যেন দেখতে না পান।'

হোটেলের ডাইনিং হলটা রাস্তার ওপরেই। দরজা খুললেই চাতাল। দু'পাশের সিঁড়ি নেমে গেছে সটান রাস্তার ওপর। সকালের দিকে ঘোড়ায় টুরিস্টরা জলাপাহাড়ের দিকে যায় আবার ফিরে আসে।

চাতালে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম একদল ঘোড়সওয়ারকে। হইহই করতে করতে টগবগিয়ে চলে গেল জলাপাহাড়ের দিকে।

ক্যাপ্টেনকাকা কোথায়?

ওই তো— প্রায় দৌড়ে নেমে যাচ্ছেন নীচের গ্রামের দিকে। থসথসে বপুটা যেন শক্তির আধার। এত জরুরি কাজই যদি ছিল, আড্ডা মারতে এলেন কেন বুঝলাম না। তোফা প্রাতরাশটা আধখাওয়া অবস্থায় রেখে আসায় মেজাজ তখন ভাল নেই আমার। কিন্তু প্রফেসরের হুকুম— শুনতেই হবে। বুড়োর মুখখিঁচুনিও তো সহ্য হয় না।

দৌড়ে নেমে গেলাম রাস্তা ধরে। গ্রামে ঢুকলাম সেই প্রথম। নামছি তো নামছিই। ক্যাপ্টেনকাকাও পাঁইপাঁই করে দৌড়োচ্ছেন বললেই চলে। ঘাড় বেঁকিয়ে ওপর দিকে তাকালাম। অনেক উঁচুতে সানগোল্ড হোটেল দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের প্রায় তলায় চলে এসেছি বললেই চলে। ছোট ছোট কটেজ প্যাটার্নের বাড়ির শেষ নেই। পাহাড়ের ঢালু গায়ে একটার পর একটা কটেজ। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি ক্যাপ্টেনকাকাকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে গাঁয়ের লোক। একজন একটা ঘোড়ায় চড়ে আসছিল ম্যালের দিকে— ভাড়া খাটানোর জন্যে। ক্যাপ্টেনকে দৌড়ে নামতে দেখে ঘোড়া দাঁড় করাল সামনে। কী যেন বলল ঝুঁকে পড়ে। টপ করে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে, আর লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ঘোড়ার।

চশমার কাচ ঝলসে উঠল ঠিক সেই সময়ে।

স্পষ্ট মনে হল পলকের জন্যে আমাকে দেখে নিলেন কাকা। যদিও আমি অনেক পেছনে। কিন্তু উনি যেন ঠিক আমার দিকেই তাকালেন।

পরক্ষণেই মুখ ঘুরে গেল ঘোড়ার। মোড় ঘুরে উধাও হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল অশ্বক্ষুরধ্বনি!

সব শুনলেন প্রফেসর।

শুনে-টুনে বললেন, 'হুঁ।'

'হুঁ মানে?' ঠান্ডা ওমলেট গবগব করে খেতে খেতে বলেছিলাম আমি, 'ভদ্রলোকের চোখদুটো দেখেছেন?'

'তুমি শুধু চোখই দেখলে? আর কিছু দেখলে না?' বলেই অন্য কথায় চলে গেলেন প্রফেসর 'ফাইন ওয়েদার। চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।'

দুপুরবেলা সবে খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকেছি, আবির্ভূত হলেন ক্যাপ্টেনকাকা।

ঘরে ঢুকেই আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুত হেসে বললেন, 'সরি। আর একটা ঘোড়া থাকলে আপনাকে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু হাতে আর সময় ছিল না।'

আমি তো থ!

মিটিমিটি হাসছিলেন প্রফেসর। ফস করে বললেন, 'আপনার পেশেন্টের খবর কী? বাঁচানো গেল?'

চোখের পাতা ফেলতে বোধহয় ভুলে গেলেন ক্যাপ্টেনকাকা। সেকেন্ডকয়েক ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে রইলেন প্রফেসরের দিকে। চেয়ে আছেন প্রফেসরও। মুখে সেই হাসি। যা মোনালিসার হাসির মতোই রহস্যময়।

থেমে থেমে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা, 'প্রফেসর, তার কথাই বলতে এসেছি। লেটেস্ট কেস। অ্যানাদার এক্সপ্লোশন। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মেয়েটা।'

তারপর যা বললেন, তা নড়িয়ে দিল আমার মগজের ঘিলু।

অন্য গ্রহ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীরা যে পৃথিবী গ্রহে যাতায়াত করছে, স্পেসশিপ পাঠাচ্ছে, খবরাখবর নিচ্ছে এ সন্দেহ ক্যাপ্টেনকাকার অনেক দিনের। বলিভিয়ার সেই বিস্ফোরণের পর থেকেই।

তাই যখন দার্জিলিং-এর ওপর দিয়ে রুপোলি চোঙা উড়ে গিয়ে ফেটে গেল চায়ের বাগান— উনি সেখানে ছুটে গেছিলেন সবার আগে।

'গেলাম বটে। কিন্তু বিশাল একটা গহ্বর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। বলিভিয়ার সেই বিরাট গর্তের মতো নয় মোটেই। লোকজনের হইচই শুনলাম। উল্কাপাত বলেই মনে করেছে সবাই। কিন্তু উল্কার চিহ্ন যে নেই কোথাও সেটা মাথায় ঢুকছে না। যা ছিল চোঙার মধ্যে, তা ততক্ষণে ছড়াতে আরম্ভ করেছে দার্জিলিং-এ।'

'কী ছিল চোঙার মধ্যে?' প্রফেসরের প্রশ্ন।

'ইলেকট্রিক জার্ম।'

'সেটা আবার কী?'

'প্রফেসর, প্রথম কেসটা এল চা বাগান থেকেই। একটি মেয়ের জ্বর হয়েছে শুনে দেখতে

গেছিলাম। স্বাভাবিক জ্বর নয় বলেই গেছিলাম। তাকে ছুঁলেই নাকি লোক ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে পড়েছে।'

'ইলেকট্রিক শক! বলেন কী মশায়!'

'আমি গিয়ে দেখলাম মেয়েটার বয়স পনেরোর মধ্যে। ভুটিয়া মেয়ে। এমনিতে এদের চোখ ছোট হয়। কিন্তু এর চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। চোখের মেনিনজেস-এর ওপর যেন খুব চাপ পড়ছে। ব্রেনের মেনিনজেস-এর ওপরেও চাপ পড়েছিল বোধহয়। তাই প্রলাপ বকছিল। সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছিল।'

'যেমন?'

'আমি মনে মনে ভাবলাম, টেমপারেচার দেখা দরকার। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বললে, দরকার নেই। এ জ্বর থার্মোমিটারে ধরা পড়বে না। ইলেকট্রোমিটার আছে? ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা ধরা দরকার।'

'অ্যাঁ!' প্রফেসর বিমূঢ় হয়েছেন বলেই মনে হল। অভিনয়ও হতে পারে। বুড়ো কম ধড়িবাজ নন।

'আমি মনে মনে ভাবলাম, তা হলে তো তোমাকে ছোঁয়া যাবে না— শক খেয়ে মরব নাকি— মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বললে, সরে পড়ুন। ডেঞ্জারাস লিমিট এসে গেছে। এক্সপেরিমেন্ট ফেলিয়োর!'

'কী করলেন আপনি?'

'তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটাও সটান খাটের ওপর উঠে দাঁড়াল। সারা দেহ কাঁপছে থরথর করে। আচমকা স্পার্ক ছিটকে গেল সারা গা থেকে।'

'স্পার্ক?'

'ইলেকট্রিক স্পার্ক! তারপরেই আগুন ধরে গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। লাফিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘরের বাইরে। বিস্ফোরণটা শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে। ঘরের চাল পর্যন্ত উড়ে গেল এক্সপ্লোশনে।'

'মেয়েটা?'

'ফাটল তো মেয়েটাই। এক্কেবারে নিশ্চিহ্ন।'

'ফাইন!' তৃপ্ত স্বর প্রফেসরের— 'তারপর?'

কটমট করে তাকালেন ক্যাপ্টেনকাকা— 'একই ব্যাপার ঘটে চলেছে পরপর। সব পেশেন্টেরই বয়স তেরো থেকে ষোলোর মধ্যে। কিশোর-কিশোরী প্রত্যেকেই। কিন্তু মজাটা কী জানেন, বোধহয় গ্ল্যান্ডের ক্ষরণে তফাৎ থাকার ফলেই মেয়েরাই শুধু ইলেকট্রিক টেম্পারেচারে ভোগে, আগুন লেগে যায়, ফেটে উড়ে যায়— ছেলেরা দু'দিন ভুগে সেরে ওঠে।'

'চোখদুটো শুধু ড্যাবডেবে হয়ে থাকে, তাই না?' অমায়িক কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

জ্বলন্ত চোখে তাকালেন ক্যাপ্টেনকাকা 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ধরেছেন ঠিক। ধরতে পারবেন জেনেই আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে এখানে।'

মিষ্টি মিষ্টি হাসলেন প্রফেসর, 'তাই নাকি? তাই নাকি? অধমের ভূমিকাটা এখানে কী

হতে পারে শুনতে পারি।'

'এতই যখন ধরতে পেরেছেন, এটাও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন অন্য গ্রহের এই ইলেকট্রিক জার্ম যার শরীরে ঢোকে, তাকে পুরোপুরি কবজায় আনতে গিয়ে প্রথমেই তার ব্রেনের মধ্যে যে ক্ষমতাটা জাগিয়ে দেয় তার নাম—'

'টেলিপ্যাথি,' বিনয় ঝরে পড়ে প্রফেসরের গলায়, 'যেমন আছে আপনার। দূর থেকেই বুঝতে পারেন কে কী ভাবছে। নীচের গাঁয়ে পেশেন্টের ডাক শুনতে পান এই হোটেলে বসে। দীননাথ পেছন নিলে পেছনে না তাকিয়েও জানতে পারেন। ঠিক যেমন আপনার পেশেন্টরা ধরতে পারে আপনার মনের কথা। ঠিক কি না?'

ক্যাপ্টেনকাকার সাদা আঁচিলে ভরা মুখটা অদ্ভুত সবুজ হয়ে আসে এবার। রাগে লাল হতে দেখেছি। সবুজ হতে দেখিনি কখনও। বীভৎস! গা শিরশির করে ওঠে আমার।

ভাঙা গলায় বললেন ক্যাপ্টেনকাকা, 'প্রফেসর, আপনাকে ডেকে আনার উদ্দেশ্যটা শুনুন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আপনার কথা শুনবে— আমি বলতে গেলে তুড়ি মেরে তাড়িয়ে দেবে।'

'তা তো দেবেই।'

'সেটাও টের পেয়েছি।'

'টের পেয়েছেন কীভাবে?'

'আপনার ড্যাবডেবে চোখ দেখে। বলিভিয়াতেও ইলেকট্রিক জার্ম আপনার ভেতরে ঢুকেছিল— তাই না? ছেলে বলে জ্বলে মরেননি, ফেটে পড়েননি— শুধু টেলিপ্যাথি ক্ষমতাটা পেয়েছেন। আর পেয়েছেন—'

'বলুন আর কী?'

'আপনার প্রভুদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতা। বলুন ক্যাপ্টেন, বলে ফেলুন চটপট, কী বলতে চায় তারা।'

জানলা দিয়ে ক্যাপ্টেনকাকা তাকালেন আকাশের দিকে। চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। এক্কেবারে তন্ময়— যেন ইহজগতে নেই। দেহ অনড়।

মিনিটখানেক পর ঝাঁকুনি খেল সারা দেহ।

বললেন প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে, 'এক্সপেরিমেন্ট। ইলেকট্রিক জার্ম মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। জীবাণুর ক্ষমতা তো জানেন। মানুষ মাইক্রোস্কোপে যা দেখতে পায় না, জীবাণু তা দেখতে পায়। মানুষ তত্ত্ব দিয়ে অ্যাটমের মধ্যে ক'টা ইলেকট্রন আছে হিসেব করে বার করে— জীবাণু তা চোখে দেখে বলে দিতে পারে। জীবাণুও একটা অ্যানিমাল— প্রাণী— অনেক উন্নত স্তরের— কিন্তু মানুষ তাকে হেয়জ্ঞান করে এসেছে এতদিন। যদিও সব জীবাণুর স্বরূপ এখনও জানেনি মানুষ। জানতে পারে কেবল— জীবাণুরাই— জাতিভাইদের সব খবর রাখে কেবল এরাই। প্রফেসর, অসংখ্য ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে, এক-একটা ছায়াপথে অসংখ সৌরজগৎ, এক-একটা পরমাণুর মধ্যে কি সেই প্যাটার্ন নেই? একই প্যাটার্ন, একই ছক, একই নিয়ম। জীবাণুরাই জানে সেই খবর— মানুষকে তারা সেই জ্ঞান দিতে চায়, কিন্তু মানুষ কী করছে? নিরীহ কিছু জাতের

জীবাণু বাদে সমস্ত জীবাণুকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। শত্রু, জীবাণু মানেই যেন শত্রু! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

'ছিঃ ছিঃ ছিঃ!' প্রতিধ্বনি করলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। 'আপনি নিজেই তা হলে একটা জীবাণু হয়ে গেছেন এখন, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা 'এতদিন ইলেকট্রিক জার্মের ইলেকট্রিসিটিকে মাথা চাড়া দিতে দিইনি। কিন্তু প্রভুদের বিফল এক্সপেরিমেন্টের ফল ফলতে চলেছে আমার ওপরেও। বেশি বকাবেন না। গা ছুঁয়ে এমন শক দেব—'

সরে বসলাম আমি সভয়ে। প্রফেসর নির্বিকার।

বললেন, 'এক্সপেরিমেন্ট আনসাকসেসফুল হল কেন ক্যাপ্টেন সাহেব?'

'মানুষের মস্তিষ্কই তার জন্য দায়ী। আমার প্রভুরা বুঝতে পারেননি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে বড় বিস্ময় মানুষের মস্তিষ্ক। ওজন তো মোটে ১.৪৬ কিলোগ্রাম। জিলেটিনের মতো দেখতে ধূসর আর সাদা টিসুর একটা ব্যাঙের ছাতা যেন। জঘন্য! কিন্তু তিন হাজার কোটি স্নায়ুকোষ আর তার পাঁচ থেকে দশ গুণ গ্লাইয়ার কোষ রয়েছে ওইটুকুর মধ্যে। দেড় কিলো ব্রেনের সামান্য অংশ কাজে লাগিয়েই মানুষ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে গেছে। সবটুকু লাগাতে গেলে সময় লাগবে আরও কয়েক লক্ষ বছর। তাই আমার প্রভুরা শক্তিমান জীবাণুদের পাঠিয়েছিল ব্রেনে ঢুকে ব্রেনটার ক্ষমতা বাড়িয়ে মানুষকে অতিমানুষ করে তোলার জন্যে। মহৎ উদ্দেশ্য নয় কী?'

'বিলক্ষণ!' প্রফেসর বিপুল হর্ষে যেন ফেটে পড়েন।

'কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া অজ্ঞাত ব্রেন-কোষগুলো কী যে কাণ্ড করে বসল, মানুষের বায়ো-ইলেকট্রিসিটি ধাঁ করে বেড়ে গেল পরদেশি ইলেকট্রিক জার্ম ব্রেনে ঢুকে পড়তেই। ব্যস, আর যায় কোথা— আগুন লাগছে শরীরে, ফাটছে বোমার মতো। শুনেছেন তো, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে অনেকে! এই তো সেদিন ফ্রান্সের একটা মেয়ে—'

'জানি, জানি। আপনি বলে যান।'

'আর বলে যান! সময় আমার শেষ, এতদিন প্রভুদের হুকুম শুনে দৌড়েছি ইলেকট্রিক জার্মদের কী হল জানবার জন্যে— কিন্তু এই নচ্ছার মানুষের মগজ নাকানিচোবানি খাইয়েছে প্রতিবার— এমন প্রতিরোধশক্তি গড়ে তুলেছে গোটা বডির মধ্যে... উঃ উঃ উঃ!'

ক্যাপ্টেনকাকা মুখ বিকৃত করে আর্তনাদ করে উঠতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রফেসর আমার নড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দৌড়লেন দরজার দিকে। চৌকাঠ পেরিয়েই করিডরে পড়ে পাশ ফিরে ছুটতে গিয়ে দেখলাম লকলকে আগুনের শিখা ঘিরে ধরেছে ক্যাপ্টেনকাকাকে। ছিটকে যাচ্ছে অজস্র ইলেকট্রিক স্পার্ক!

রাস্তায় নেমে এসেছিলাম হুড়মুড় করে।

বিস্ফোরণটা ঘটল ঠিক সেই সময়ে। চোখের সামনে সানগোল্ড হোটেলের একটা অংশ ভেঙে গড়িয়ে গেল পাহাড় বেয়ে!

পাথর

ডেভিলকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে। 'পক্ষীরাজ' পত্রিকায় ছাপা হয় গল্পটা। সিউড়িতে আমার ভাগনে গল্পটা পড়েও কিন্তু আমাকে চিঠি লিখে জানায়নি স্বয়ং ডেভিল গল্পের বৃত্তান্ত জেনে চটেছে কিনা।

সত্যি কথা বলতে কি, ডেভিলকে ভয় করতে আরম্ভ করেছি। কুকুরকে আমি যেভাবে ভয় পেয়ে এসেছি চিরকাল— এ ভয় সে নয়। যেদিন থেকে জেনেছি, কুকুরদেহের ভেতরে অন্যগ্রহের প্রাণী রয়েছে, সেদিন থেকে ডেভিলকে আর সামান্য কুকুর বলে হেয় জ্ঞান করি না।

সিউড়ি ছেড়ে চলে এলাম তো ওই কারণেই। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যেদিন দেখলাম ঘুমের ঘোরে আমাকে দিয়েই কাগজে নিজের কথা লিখিয়েছে ডেভিল— পরিচয় দিয়েছে নিজের— সেদিনই বিকেলের বাসে চম্পট দিয়েছি সিউড়ি ছেড়ে। চলে আসার সময় কেবল দেখেছিলাম, বড় বড় লোমের আড়ালে প্রায় ঢেকে যাওয়া অদ্ভুত দুটো সবুজ চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে ডেভিল।

কলকাতায় এসে কিন্তু স্থির থাকতে পারিনি। ছটফট করেছি। পাগলাডাঙার মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছি, নতুন যে রাস্তাটা দমদম এয়ারপোর্ট থেকে গড়িয়া পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে ঝিলের ধার দিয়ে, ধু ধু মাঠের বুক চিরে— একা একা সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। ডেভিল যেন ডেভিলের মতোই আমাকে পেয়ে বসেছিল। অথচ জানি সে আমাদের, এই মানুষদের চেয়ে অনেক উন্নত, অনেক সভ্য প্রাণী— যার নাগাল ধরার ক্ষমতা আইনস্টাইন বেঁচে থাকলেও বোধহয় পেতেন না। সত্যেন বোস আর জগদীশ বোস হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক— অসম্ভবের মধ্যে বিজ্ঞানকল্পনা করবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। গাছের প্রাণ আছে— একথা বলতে গিয়ে অনেক হাসি-টিটকিরি সহ্য করতে হয়েছিল জগদীশ বোসকে। আজকে সারা পৃথিবীর তাবৎ বৈজ্ঞানিক বসু বিজ্ঞান মন্দিরের নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

উপহাসকে উপেক্ষা করেন— এমনি একজন বিজ্ঞানসাধকের নাম অবশ্য জানি। তাঁর সান্নিধ্যেই থেকেছি এত দিন। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র অন্তত আমার এই কাহিনি বিশ্বাস করবেন।

পত্রিকায় ডেভিল-কাহিনি ছাপা হওয়ার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পাঠকমহলে। আমি তার তোয়াক্কা করি না। করি কেবল ডেভিলের— আর প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের। প্রথমজন কীভাবে নিয়েছে তার গল্প— উৎকণ্ঠা সেই জন্যে। দ্বিতীয়জন কীভাবে নেবে— সেটা অবশ্য মোটামুটি জানি।

তাই ছুটলাম প্রফেসরের গবেষণামন্দিরে। উনি একটা গাছের গায়ে গ্যালভানোমিটার লাগিয়ে ফিতের মতো কাগজে ফুটে ওঠা রেখাচিত্র দেখে ডায়েরিতে কী সব নোট করছিলেন। আমার পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন।

বললেন, 'এসো দীননাথ, তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'হঠাৎ?'

'গাছেরও চোখ আছে— অদৃশ্য চোখ। আমাদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা তারা দেখছে— খবর পাঠাচ্ছে গ্রহ-গ্রহান্তরে। এবারে আমি তা প্রমাণ করব।'

বলে প্রফেসর যে আশ্চর্য গবেষণার কথা বলে গেলেন সে কাহিনি এরপরে বলা যাবে'খন। আমার মাথায় তখন ডেভিল ঘুরঘুর করছে। গ্রহ-গ্রহান্তরের কথা বলতেই গ্রহান্তরের প্রাণীর কথা না বলে পারলাম না। প্রফেসরের বকবকানি বন্ধ হতেই তাই বললাম ডেভিল বৃত্তান্ত।

গ্যালভানোমিটারের কথা ভুলে গেলেন প্রফেসর। চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার কথা শুনতে শুনতে। ঠিক এই সময়ে 'টেলিগ্রাম' বলে হাঁক পাড়ল পিয়ন দরজার কাছে।

টেলিগ্রাম এসেছে আমার নামে— প্রফেসরের ঠিকানায়। পাঠাচ্ছে সিউড়ি থেকে আমার ভাগনে। আমি যেন এখুনি সিউড়ি রওনা হই। প্রফেসরকে আনতে পারলে খুব ভাল হয়।

সব শেষে হেঁয়ালি করেছে ভাগনে।

সংক্ষেপে লিখেছে, পাথরটা দেখলে মামা তুমি হতভম্ব হয়ে যাবে।

পাথর দেখে হতভম্ব হব? কেন?

প্রফেসর এলেন না। তিনি গাছের চোখ নিয়ে তখন ব্যস্ত। আমি রামপুরহাটের স্টেট বাস ধরে সটান চলে এলাম সিউড়িতে।

রিকশা থেকে সদর দরজার সামনে নামতে-না-নামতেই শুনলাম বাড়ির মধ্যে অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল ডেভিল। অদ্ভুত গলা বললাম এই কারণে যে, ডাকটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল কেনা জানি না— মনে হল ডেভিল যেন ভয় পেয়েছে। একরাশ উৎকণ্ঠা যেন ঝরে পড়ল ডাক-টার মধ্যে!

ডেভিলকে আমি নিজেই ভয় করি। তার ভয় পাওয়ার অব্যাখ্যাত অনুভূতিটা তাই রোমাঞ্চ জাগিয়ে গেল লোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সোজা কথায়, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। অন্য সময়ে হলে অবাক হয়ে ভাবতাম, ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো! দোতলার ঘর থেকে ডেভিল কী করে জানল সদর দরজায় আমি এসে পৌঁছেছি। তখন কিন্তু ও ধরনের কোনও বিস্ময়বোধই জাগ্রত হল না মনের মধ্যে। ডেভিল অপার্থিব অনুভূতি দিয়ে অনেক কিছুই জানতে পারে, এ অভিজ্ঞতা তো আমার আগেই হয়েছে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল আমার ভাগনে। বয়সের অনুপাতে খুব বেশি লম্বা আর প্রস্থেও তেমনই। চোখমুখে কিন্তু সারল্য মাখানো। তরতর করে নেমে আসার সময় দেখলাম, উত্তেজনায় চোখদুটো গোলগোল।

শেষের তিনটে ধাপ একলাফে পেরিয়ে একেবারে রাস্তায় পড়ল ভাগনে। রিকশা থেকে আমার সুটকেশটা নামিয়ে নিয়ে রিকশাওলাকে বললে, 'দাঁড়াও, এখনি আবার বেরোব।' আমাকে বলল, 'মামা, সুটকেশটা রেখে আসি— পাথরটা দেখিয়ে আনি আগে।'

মিনিটকয়েক পরে ছুটন্ত রিকশার মধ্যে ভাগনে বলল, 'মামা, পরশু রাতে অমাবস্যা ছিল। পশ্চিম আকাশে হঠাৎ একটা লাল আলো দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল ডেভিল। তোমার লেখা ডেভিলের গল্প পড়ে আমরা তো হেসে খুন। বাবা বলছিল, তোমার নাকি মাংস খেয়ে পেট গরম হয়েছিল সেই রাত্রে। আর গুচ্ছের সায়েন্স ফিকশন গল্প পড়েছিলে। তাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলে। যাই হোক, সেই ডেভিল যখন পশ্চিম আকাশে লাল আলো দেখে ডেকে উঠল, তখন আমি ভেবেছিলাম বুঝি মঙ্গলগ্রহ দেখে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু দেখতে দেখতে আলোটা বড় হয়ে উঠল। তারপরেই সমস্ত আকাশ জুড়ে আগুনের স্রোত বয়ে গেল যেন। আশ্চর্য সেই আগুনের খেলা না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না মামা। লকলকে লাল-নীল-হলুদ আগুনের শিখা মেঘের মধ্যে থেকে যেন ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে চারদিকে ঢেউ খেলে ছুটে গেল— কিন্তু মাটি পর্যন্ত এসে পৌঁছল না। বাবা বাড়ি ছিল। জানোই তো, জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে বাবা চর্চা করে। আগুনের খেলা দেখে বললে, প্রায় আলোর স্পিডে ধূলিকণা এসে পৃথিবীর বাতাসে আছড়ে পড়ছে বলে অমন আগুনের স্রোত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ধূলিকণা আসছে কোত্থেকে— মহাশূন্যের কোন অঞ্চল থেকে, সেটা জিজ্ঞেস করতেই বাবা আমতা আমতা করে বললে, তোর মামাকে জিজ্ঞেস করিস। এই কথা বলতে-না-বলতেই লাল আলোটা বিরাট থালার মতো হয়ে উঠল। মস্ত আগুনের গোলা হয়ে দাউদাউ করতে জ্বলতে জ্বলতে নেমে এল। আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে তেড়চাভাবে ছুটে গেল। উল্কা সাঁৎ করে খসে পড়ে— কিন্তু এই আগুনের গোলাটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানকে যেন জয় করেছে মনে হল। স্লো স্পিডে নেমে গেল গাছপালার ওপর দিয়ে পুলিশ গ্রাউন্ডের দিকে। তারপরেই রামধনু রঙের রোশনাই দেখলাম পুলিশ গ্রাউন্ডের দিকে। যেন অনেক আতসবাজি পোড়ানো হচ্ছে মনে হল সেদিকে। আস্তে আস্তে রঙের ছ'টা মিলিয়ে গেল।

'ঠিক সেই সময়ে গম্ভীর গলায় একবার ডেকে উঠল ডেভিল। ওই একবারই। আর নয়।

'আমি আর বাবা বারান্দা থেকে চেয়েছিলাম পুলিশ গ্রাউন্ডের দিকে। ডেভিলের ওই একবারমাত্র ডাকের পরেই নীরবতার কারণ খুঁজতে ঘরে ঢুকলাম। ভেবেছিলাম, ইঁদুর-টিদুর মেরেছে— তাই জানান দিল। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলাম, গায়ের লোম প্রায় খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাটা। আমি ওর লটপটে কানদুটো আচ্ছা করে মুচড়ে দিয়ে বললাম— 'এই ডেভিল... ডেভিল।' ডেভিল কিন্তু দেখলাম কাঁপছে। বিশ্বাস করো মামা, স্পষ্ট দেখলাম, হাত দিয়েও টের পেলাম— ডেভিল কাঁপছে। কেন যে কাঁপছে, তা কিন্তু বুঝতে পারলাম না। তবে সমস্ত রাত আমার পায়ের কাছে বসে রইল। সকালবেলা মা বললে, ডেভিল সারা রাত ঘুমোয়নি। ওই জানলার দিকে চেয়েছিল। জানোই তো, তোমার বোন নাইটবার্ড—

রাতজাগা পাখি। তাই অন্ধকারে দেখেছে ডেভিলের সবুজ চোখ দুটো কোন দিকে চেয়ে আছে। যে জানলার দিকে চেয়েছিল, সে জানলার দিকে পুলিশ গ্রাউন্ড— যেখানে রামধনু রঙের ছটা দেখা দেখা গেছে আকাশ থেকে আগুনের গোলা খসে পড়ার পর।

'সকালবেলা ডেভিলকে নিয়ে বেরোতে হয় ওর পেট খালি করানোর জন্যে। আমি বেরোলাম সেদিন, উদ্দেশ্য পুলিশ গ্রাউন্ডে একটা চক্কর মেরে আসা। ডেভিল কিন্তু বেঁকে বসল। অন্যদিন সিঁড়ি দিয়ে নেমেই চেন টেনে নিয়ে যায় ওইদিকেই। সেদিন চেন টেনে নিয়ে গেল উলটোদিকে— বাজারের দিকে। যতই টানি, ততই ও আমাকে উলটো টান মারে। মহা জ্বালা! কান মুলে দিলাম, পেটে লাথি কষালাম— কিন্তু কাঠগোঁয়ার ব্যাটাচ্ছেলে কিছুতেই গেল না পুলিশ গ্রাউন্ডের দিকে।

'আমার তখন রাগ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এসে ওকে বাবার হাতে গছিয়ে দিয়ে যেই নীচে নেমেছি সাইকেল বার করার জন্যে, অমনি আবার গতরাতের মতো অদ্ভুতভাবে একবার ডেকে উঠেই চুপ করে গেল ডেভিল।

'কুকুর সিক্সথ সেন্স দিয়ে অনেক জিনিস টের পায়— আমাদের ষষ্ঠ অনুভূতি নেই— ওদের তা আছে। ওই জন্যেই নিশ্চয় পুলিশ গ্রাউন্ডের রহস্য ও টের পেয়েছে— অন্য গ্রহের প্রাণী ওর মধ্যে আছে— তোমার ওই সব গাঁজাগল্প আমি একদম বিশ্বাস করি না— তোমার গল্প পড়ে তাই তো তোমাকে চিঠি লিখিনি।

'যাই হোক, ডেভিলের ডাক শুনে আরও রোখ চেপে গেল আমার। সাইকেল নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম পুলিশ গ্রাউন্ডে। গতকাল রাতের আগুনের গোলা কোথায় পড়েছে, তা খুঁজতে হল না। দূর থেকেই দেখলাম, কবরখানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে লম্বা লম্বা গাছের পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। মাঠের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে গেলাম। সাইকেল রেখে ভিড় ঠেলে গিয়ে দেখলাম অনেকখানি মাটি আগুনের গোলায় পুড়ে গেছে। ঘাস-ফাস জ্বলে গেছে। মাটি কালো হয়ে গেছে। শুধু পুড়ে যায়নি— যেন খাল কাটা হয়ে গিয়েছে। পঞ্চাশ ষাট ফুট লম্বা একটা খাল— পাঁচ-ছ' ফুট গভীর। প্রথম দিকে কম গভীর শেষের দিকে বেশ গভীর। আগাগোড়া কালো ছাইয়ে ঢাকা। গর্তের শেষপ্রান্তে পড়ে রয়েছে একটা পাথর।

'লোকের ভিড় এই পাথরকে ঘিরে। কালোরঙের পাথর। সারাগায়ে অজস্র ফুটো— ঝামাপাথর যেমন হয় আর কি। এবড়ো খেবড়ো— তেলতেলে মসৃণ গোলাকার মোটেই নয়। এই পাথরটাই কাল রাতে আগুনের গোলা হয়ে খসে পড়েছে— মাটি ফেটে আটকে গেছে। উল্কার টুকরো নিঃসন্দেহে। কিন্তু দুটো ব্যাপারে খটকা লাগল। উল্কা অমন স্লো স্পিডে নামবে কেন? দ্বিতীয়ত, উল্কা পড়ার আগে কি আকাশজোড়া আগুনের স্রোত বয়? পড়বার পর কি রামধনুর ছটা দেখা যায়!

'মনের মধ্যে খটকা লাগল বলেই দূরে সাইকেল শুইয়ে মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। ভিড়ভাট্টা পাতলা হলে কাছ থেকে দেখতে হবে পাথরটাকে।

'ঘণ্টা তিন-চার বসে রইলাম এইভাবে। সেদিন ছুটির দিন নয়— অফিসের তাড়া আছে, স্কুলে-কলেজে যাওয়ার তাড়া আছে— তাই মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল একসময়ে। সামান্য

একটা পাথরকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেতে থাকার মতো মানুষ ক'জন থাকে— নরানাং মাতুলক্রমঃ বলেই আমি হয়েছি মামার মতো হাফ-ম্যাড। তাই থেকে গেলাম মাঠ ফাঁকা না হওয়া পর্যন্ত।

'তারপর গুটিগুটি গিয়ে দাঁড়ালাম পাথরটার সামনে। খুব বড় পাথর নয়— লম্বায় চওড়ায় ফুটখানেকের বেশি নয়— বিয়েবাড়ির ডেকচি দিয়ে অনায়াসেই চাপা দেওয়া যায়। আমি কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম খুব কাছ থেকে পাথরটাকে দেখে। গর্তের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে হেঁট হয়ে চেয়েছিলাম। পাথরের গায়ে ফুটোগুলো বেশ গভীর— যেন পাথরের ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে। মামা, ঠিক সেই সময়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত হল আমার সত্তায়। তোমার গল্প পড়ে তোমার ল্যাংগুয়েজ ইউজ করছি তোমার বোঝবার সুবিধে হবে বলে! হঠাৎ আমার মনে হল, পাথরের ওই ফুটোগুলো যেন চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

'মামা, হেসো না। হাসি তোমাকে মানায় না। পাথর কখনও চেয়ে দেখে না। কিন্তু কেন যে সেদিন অমন মনে হল, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। স্পষ্ট মনে হল, পাথরের গায়ে ওই অজস্র ছেঁদাগুলো যেন এক-একটা চোখ। পাথরটা যেন জীবন্ত। হাজার চোখ মেলে একদৃষ্টে দেখছে আমাকে।

'গা শিরশির করে উঠল আমার। দিনদুপুরে গোরস্থানের পাশে বসে গা ছমছম করে উঠল। কিন্তু মন থেকে ভয় তাড়িয়ে আরও ভাল করে চেয়ে রইলাম। আর ঠিক তখনই স্পষ্ট মনে হল আমার আর পাথরের মধ্যে রয়েছে যেন একটা অদৃশ্য ডাণ্ডা— ডাণ্ডার একদিকে পাথর— আর একদিকে আমি। ডাণ্ডাটা যেন একটু একটু করে টানছে আমাকে— পাথরের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছি একটু একটু করে— মাথার মধ্যেও যেন কীরকম ঝিমঝিম করছে— একটা চিড়িং চিড়িং ভাব মাথার কোষে কোষে অনুভব করছি— খুব অল্প ইলেকট্রিক কারেন্ট যেন— একটা চিনচিন ভাব।

'ডেভিলের ভয়ে কাঁটা হওয়া চেহারাটা চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠল। আসবার সময়ে পেছন ডেকেছিল যেভাবে— কাল রাতে এই পাথরটা আকাশ থেকে পড়তেই ডেকে উঠেছিল সেই একইভাবে। আজ সকালে টানাহ্যাঁচড়া করেও তাকে এদিকে আনা যায়নি। আর এখন মনে হচ্ছে অপার্থিব এই পাথর যেন জীবন্ত— সহস্র চোখ মেলে যেন আমাকে হিপনোটাইজ করতে চাইছে।

'এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগের মধ্যে এই ভাবনাগুলো মাথার মধ্যে খেলে যেতেই সম্বিৎ ফিরে পেলাম আমি। দূর থেকে ডেভিলই আমার সম্বিৎ ফিরিয়ে দিল কিনা— তা তুমিই ভাল বলতে পার। সম্বিৎ ফিরে পেতেই আমি দেখলাম গর্তের মধ্যে প্রায় মাথা ঢুকিয়ে বসেছি— আর একটু হলেই পড়ে যাব।

'লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম, অদৃশ্য আকর্ষণটা কমজোরি হয়েই আবার প্রবল হয়ে উঠল। আমি কিন্তু রামভিতুর মতো পেছন ফিরেই টেনে দৌড় লাগালাম। সাইকেল তুলেই ফুলস্পিডে প্যাডেল করে বাড়ি ফিরে এলাম। সিঁড়ির গোড়ায় ব্রেক কষতেই শুনলাম ওপরের ঘরে আবার সেইরকম একবারমাত্র অদ্ভুত ডেকে উঠেই চুপ করে গেল ডেভিল।'

পুলিশ গ্রাউন্ডের পাশের রাস্তা দিয়ে গোরস্থানের এমাথায় এসে দাঁড়িয়ে গেল রিকশা।

ফিরব এই রিকশাতেই। তাই রিকশা দাঁড় করিয়ে গোরস্থানের পাশ দিয়ে এগোলাম লম্বা লম্বা গাছগুলোর দিকে। যেতে যেতে ভাগনে বললে, 'মামা, পোকাকে তুমি দেখেছ? পাশের বাড়িতে থাকে, ক্লাসের ফার্স্টবয়। আমি লাস্টবয় বলে ঘেন্না করে না। বরং সেই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমি যখন সাইকেল থেকে নামছি সিঁড়ির গোড়ায় পোকা নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।'

'বলল— 'কোথায় গেছিলি?' আমি বললাম কোথায় গেছিলাম এবং এইমাত্র কী দেখে এলাম। ও আমার ঘামভেজা চেহারাখানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, বিজ্ঞানের যুগে পাথরের চোখ থাকে না। রাত জেগে পড়ে তোর চোখ খারাপ আর মাথা খারাপ হয়েছে। পাথরটাকে দেখব বলেই তোকে ডাকতে এসেছিলাম। তুই যা ভয় পেয়েছিস, তোকে নিয়ে আর যাব না— একাই যাচ্ছি।' বলে পোকা হনহন করে চলে গেল পুলিশ গ্রাউন্ডের দিকে।

'বিকেলবেলা পোকার বাবা খুঁজতে এল ওকে। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেকি! ওতো সকালবেলা পুলিশ গ্রাউন্ডে উল্কার পাথর দেখতে গেল।'

'পোকাকে পুলিশ গ্রাউন্ডেই পাওয়া গিয়েছিল, মামা। পাথরের পাশে গর্তের মধ্যে চুপ করে বসেছিল। বাবাকে চিনতে পারেনি, মা-কে পারল না। আমাকেও না। চেনা জানা হঠাৎ সব অচেনা হয়ে গেছে। তাই বলে যে পাগল হয়ে গেছে, তা নয়। খুবই প্রকৃতিস্থ— কেবল স্মৃতি বলে আর কিছু নেই। এমনকী, স্কুলের কোনও পড়াই আর মনে নেই। অ আ ক খ অক্ষর পর্যন্ত চিনতে পারছে না। পাথর যেন ওর স্মৃতির ভাঁড়ার লুঠ করে নিয়েছে— শূন্য মস্তিষ্ক নিয়ে কেবল বেঁচে আছে। আবার নতুন করে ওকে সব শিখতে হবে, জানতে হবে।'

বলতে বলতে লম্বা লম্বা গাছগুলোর তলায় এসে গেলাম। পোড়া ছাই ভরতি কালো লম্বা খালের গর্তটা চোখে পড়ল। গর্তের শেষ প্রান্তে একটা কালো পাথর। এবড়ো-খেবড়ো। সহস্র ছিদ্রময়।

দূর থেকে দেখলাম পাথরটাকে। কাছে গেলাম না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক রহস্য, অনেক বিভীষিকা আছে। নিরীহদর্শন পাথরের সান্নিধ্যে থেকে পোকার মতো স্মৃতিশূন্য হওয়ার মতো বাসনা আমার ছিল না। তাই দূর থেকেই পাথর দর্শন করে ফিরে এলাম ঝটপট।

এইটুকু বুঝেছিলাম, পাথরের রহস্য ডেভিল জানে। তাই সেই রাত্রে মশারির মধ্যে ঢুকলাম ডটপেন আর খাতা নিয়ে। বালিশের পাশে রাখলাম। মশারির একটা পাশ আলগা করে রাখলাম যাতে ডেভিল নিজে থেকে ঢুকতে পারে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। যা ভেবেছিলাম, দেখলাম ঠিক তাই হয়েছে— মাথার কাছে রাখা কাগজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ডটপেন দিয়ে কয়েকটা লাইন লিখেছি। যে লিখিয়েছে, সেই ডেভিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চোখের কোটরে দু'-টুকরো সবুজ আগুন জ্বালিয়ে নির্নিমেষে দেখছে আমাকে।

ডেভিল যা লিখিয়েছে তা এই:

বন্ধু, এই গ্যালাক্সির মাঝখানে আবার একটা সুপারনোভা দেখা গিয়েছে। জানো তো,

মহাশূন্যের স্তিমিত মৃতপ্রায় তারকাকে বলে নোভা। এদের তাপ আর জ্যোতির উৎস নিঃশেষিত হয়ে উপরিভাগ ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। এই সংকোচনের ফলেই এদের ভেতরকার জ্বলন্ত অংশ বেরিয়ে আসে তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ এদের উজ্জ্বল দেখায়। কখনও কখনও এই ধরনের স্তিমিত তারকার বা নোভার ভেতরকার জ্বলন্ত আর গলিত পদার্থের পারমাণবিক রূপান্তরের ফলে উত্তাপ হঠাৎ অত্যধিক বেড়ে যায়— হঠাৎ বিশেষ উজ্জ্বল দেখায়। এই অবস্থায় একে বলে 'সুপারনোভা'।

সুপারনোভার আশপাশে গ্রহগুলোয় তাই আর থাকা যাচ্ছে না। বাস্তুত্যাগীরা দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে মহাশূন্যের দিকে দিকে। তোমাদের গ্রহে এমনি একটা দল এসে নেমেছে। পাথরটা ওদের মহাকাশযান। জীবন্ত মনে হয়েছে ওরা ভেতরে রয়েছে বলে। ওরা প্রথম পর্যায়ে এই পৃথিবীর সবার ব্রেন লুঠ করবে— জ্ঞানীগুণীদের স্মৃতি কেড়ে নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের মালিক হবে— তারপর সেই জ্ঞানের সঙ্গে নিজেদের জ্ঞান যোগ করে এই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে।

পোকার স্মৃতির ভাঁড়ার খালি করে দিয়েছে এরাই। পৃথিবীর বাইরেও এরা যোগাযোগ রেখেছে— খবর পাঠিয়েছে। আসছে আরও মহাকাশযান। এমন খাসা গ্রহ আর এমন নির্বোধ প্রাণী ওরা আর দেখেনি। এই বিপদ থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে কেবল একজন— প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। তাঁকে তুমি গিয়ে শুধু বলো, সুপারনোভার রেডিয়েশনের ফলেই এক মাইক্রনের দশভাগের একভাগ সাইজের ধূলিকণাগুলো আলোকের গতিবেগ অর্জন করেছে— পৃথিবীর বাতাসে আছড়ে পড়ছে— তাই আগুনের খেলা দেখা দিয়েছে। এইটা বললেই উনি বুঝবেন কী করতে হবে— আর দেরি কোরো না— আজই তাঁকে নিয়ে এসো।

সন্ধ্যায় প্রফেসরকে নিয়ে ফিরলাম সিউড়িতে। উনি একটা বড় বেতের বাস্কেট এনেছিলেন সঙ্গে। তার মধ্যে কী আছে, তা আমাকেও বলেননি।

বাস থেকে নেমেই উনি পুলিশ গ্রাউন্ডের দিকে রওনা হলেন। তখন রাত ন'টা। আকাশে তারার মেলা। পুলিশ গ্রাউন্ড আর গোরস্থানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভিনগ্রহীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছেন কিন্তু শুধু ওই বাস্কেটটা নিয়ে— আর কিছু নয়।

লম্বা লম্বা গাছগুলোর তলা পর্যন্ত যেতে হল না। গোরস্থানের অন্ধকারে গা মিলিয়ে একটু এগোতেই একটা আলোকরশ্মি দেখলাম মিলিয়ে গেল আকাশের দিকে। মেঘলোক ফুঁড়ে মহাশূন্যে ছুটে গেল। পেনসিলের মতো সরু আলোকরশ্মিটা— লেজার রশ্মির মতোই সরু হয়ে রইল— সাধারণ আলোকরশ্মির মতো ছড়িয়ে পড়ল না।

থমকে গিয়েছিলেন প্রফেসর। পেছনে আমি। গাছপালা আর কবরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম আলোকরশ্মিটা বেরোচ্ছে ছাই ঢাকা গর্তের মধ্যে পড়ে থাকা পাথরটার গা থেকে।

সেই সঙ্গে দেখলাম আরও একটা বিচিত্র দৃশ্য!

পাথরটার হাজার ছেঁদা দিয়ে ধোঁয়ার মতো কী যেন বেরিয়ে এসে পাক খাচ্ছে পাথরটাকে ঘিরে! সবুজ রঙের ধোঁয়া। গাঢ় কুয়াশার মতো অনেকটা। নিছক ধোঁয়ার মতো আকারহীন

নয় কিন্তু— পাক খাওয়া ধূম্রপুঞ্জের মধ্যে হাজার রকমের আকার যেন জমাট বেঁধে মিলিয়ে যাচ্ছে পরক্ষণেই।

বৃদ্ধ প্রফেসর ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলেন সেই দিকে। বিড়বিড় করে কী যেন বললেন আপনমনে, আস্তে আস্তে হাতের পেল্লায় বাস্কেটটা রাখলেন মাটির ওপর। ঢাকা খুললেন। অন্ধকারে টের পেলাম কী যেন টেনে বার করলেন ভেতর থেকে। তারপরেই আচমকা টানে দৌড়ালেন পাথরের দিকে— বাধা দেওয়ার সময় পর্যন্ত দিলেন না।

উনি যেই গাছপালার আড়াল থেকে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন, অমনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল পাথরটা। টকটকে লাল, উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ, কমলা, নীল, বেগুনি, তুঁতে রঙের সাতরঙা ছ'টায় ছেয়ে গেল চারদিক। ঠিক এই রামধনু রোশনাই প্রথম রাতে দেখেছিলাম পুলিশ গ্রাউন্ড থেকে ঠিকরে যেতে।

প্রফেসর তখনও দৌড়োচ্ছেন। রামধনু আলোয় দেখলাম, তিনি দু'হাতে ধরে আছেন একটা মস্ত গামলা— বিয়েবাড়ির পান্তুয়া রাখার গামলা যেন। এমনভাবে গামলাটা মাথার ওপর তুলে দৌড়োচ্ছেন যেন গামলা চাপা দেবেন পাথরটাকে ঝপাং করে।

পাথরের ধোঁয়া-বাসিন্দারাও (কে জানে ধোঁয়ার আকারে তারা সত্যিই প্রাণী কিনা) নিশ্চয় আঁচ করেছিল প্রফেসরের মতলব। আচমকা রামধনু রঙের একটা ছটা অগ্নিশিখার মতো লকলকিয়ে ছিটকে গেল তাঁর দিকে। গা স্পর্শ করার আগেই যেন অদৃশ্য থাপ্পড়ে উনি ছিটকে গেলেন মাটিতে— হাতের গামলা গড়িয়ে গেল একদিকে।

প্রদীপ্ত পাথরটা এবার দুলে উঠল। মহাকাশযানের মতোই ফুটখানেক শূন্যে ভেসে উঠল। চারপাশের ফুটোগুলো দিয়ে ধোঁয়াগুলো দ্রুত এঁকেবেঁকে পাথরের মধ্যেই অদৃশ্য হল! জেগে রইল কেবল সরু পেনসিলের মতো আলোকরশ্মি— যে আলোকরশ্মি মেঘলোক ফুঁড়ে বিস্তৃত দূর মহাকাশপানে।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন প্রফেসর। গামলাটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটলেন। কিন্তু কাছ পর্যন্ত যাওয়ার আগেই সরু পেনসিলের মতো আলোকরশ্মি বেয়ে পাথরটা উঠে গেল তালগাছ সমান উঁচুতে।

নীচ থেকে চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, 'নেমে আয়! নেমে আয় ভিতুর ডিম কোথাকার! তোদের জারিজুরি খতম করি কী করে দেখে যা— পালাচ্ছিস কেন?'

পাথরটা কিন্তু অকস্মাৎ গতিবেগ বাড়িয়ে নক্ষত্রবেগে পেনসিলের মতো আলোকরশ্মির পথ বেয়েই যেন উড়ে গেল মেঘলোকের দিকে। নীচ থেকে মনে হল আলোকরশ্মিটাই যেন চুম্বকরশ্মির মতো পাথরটাকে টেনে নিয়ে গেল দূর হতে দূরে— আলোর ছোট্ট বিন্দুটা তারার মতো ছোট্ট হয়ে গিয়ে একসময়ে মিলিয়ে গেল কালো আকাশে।

অন্ধকারে গামলা হাতে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসতে লাগলেন প্রফেসর।

আমি কাছে গেলাম। অভিভূত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রফেসর, কীসের গামলা এটা?'

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'ন্যাকা নাকি! তুমিই তো বললে সুপারনোভার রেডিয়েশনের ফলে ধূলিকণাগুলো আলোকের গতিবেগ অর্জন করেছে।'

আমতা আমতা করে বললাম, 'তা বলেছি। কিন্তু গামলা দেখে ওরা ভয়ে পালাল কেন?'

'ওই একই রেডিয়েশনের শক্তিতে ওরাও শক্তিমান বলে। ওদের সেই শক্তি গামলা চাপা দিয়ে শেষ করে দিতাম।'

'কী ছিল গামলায়?'

'তোমায় বলব কেন? তোমায় বলা মানেই তো সিক্রেট ফাঁস করে দেওয়া। সিসের সঙ্গে এমন কয়েকটা ধাতু মিশিয়ে এ গামলা বানিয়েছি যার মধ্যে দিয়ে কোনও অদৃশ্যরশ্মির বিকিরণ যেতে পারে না। ফলে, গামলা চাপা পড়লে বাইরের জগতের জাতভাইদের সঙ্গে বাছাধনদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেত— শক্তির উৎস থেকে শক্তির জোগানও আর আসত না। নমুনা বানিয়ে রেখে দিতাম অ্যালকোহলে ডুবিয়ে— ইস একটুর জন্যে...!'

মাথার সামান্য ক'টা চুলই ছিঁড়তে লাগলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।
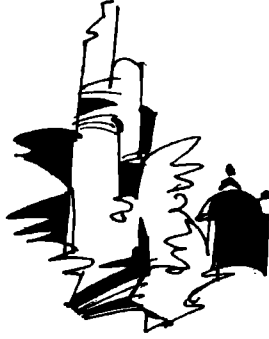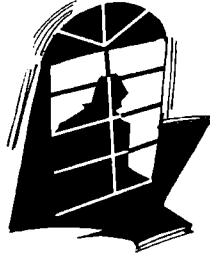
যদি

১৯৬৬ সালের সতেরোই নভেম্বর ভোররাতে এই কলকাতা শহর মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে যেত, পূর্ব ভারত শ্মশান হয়ে যেত, যদি না প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বর্ম-রহস্য ভেদ করতেন।

ব্যাপারটা এতদিন চেপেই রেখেছিলাম। প্রফেসর আতঙ্ক ছড়াতে চাননি। এখন আমাকে ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন। কেননা, এতদিন পর সেই জিনিসটা কলকাতার বুক থেকে তিনি সরিয়ে ফেলেছেন। জিনিসটা এখন সমুদ্রের তলায়।

১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম হপ্তায় প্রফেসর একটা চিঠি পেলেন। খামের ভেতর সাদা কাগজে শুধু একটা বর্ম আঁকা। হাতে আঁকা। তলায় লেখা:

'ওরে সবজান্তা প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, দেখি তোকে এবার বাঁচায় কে! সামনের সতেরোই নভেম্বর ভোররাতে চিঁড়ে চ্যাপটা করে দেব তোকে, তোর ল্যাবরেটরিকে, কলকাতা শহরকে। ভারতের পুবদিকটাও শ্মশান হয়ে যাবে— ঠিক কতটা যাবে এখনই আন্দাজ করতে পারছি না। ৩০ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমা খানকয়েক কলকাতায় ফেললে যা ঘটে, সেইরকম ঘটনাই ঘটবে। তোর বড় বাড় বেড়েছে। দেখি তোদের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররা তোকে বাঁচাতে পারে কিনা। আমি কে জানতে ইচ্ছে করছে? মরবার পর ভূত হয়ে এসে দেখে যাস।'

খাঁটি ইংরেজিতে ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে টাইপ করা আশ্চর্য এই চিঠি পেয়ে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র থ হয়ে গেলেন। আমাকে চিঠি দেখালেন। আমি হাতে আঁকা বর্মটা দেখিয়ে বললাম, 'এটার মানে কী?'

প্রফেসর মাথা চুলকে বললেন, 'সেইটাই তো ভাবছি।'

'চিঠিখানা কে লিখেছে বলে মনে হয়?'

'সেটাও তো ভাবছি।'

'কেউ কি ইয়ারকি করেছে, না, সত্যি বলে মনে হয়?'

'ভাবছি, ভাবছি, তাও ভাবছি।'

'আচ্ছা মুশকিল তো! সামান্য একখানা উড়ো চিঠি নিয়ে এত ভাববার কী আছে? ছিঁড়ে ফেলে দিন। সত্যি কিছু থাকলে এত ভাবনার দরকার হত না।'

'সেটাও ভাবছি।'

রাগ করে বাড়ি চলে এলাম আমি।

সেদিন রাতেই প্রফেসরের লেখাপড়া জানা শিম্পাঞ্জি রবি একটা চিঠি দিয়ে গেল আমাকে। প্রফেসর লিখেছেন:

'বর্ম কী দিয়ে তৈরি হয় জানো?'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল চিঠি পড়ে। বর্ম, মানে, আর্মার প্লেটে যে শতকরা নব্বই ভাগ লোহা আর দশভাগ নিকেল থাকে, তা পাঁচ বছরের বাচ্চাও জানে। ভাবেন কী প্রফেসর? এতই গোমুখ্যু আমি! পরের দিন ভোরবেলাই বাজার করার পথে গেলাম প্রফেসরকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি নেই। গতকাল রাত্রে হাওয়া হয়ে গেছেন।

ঠিক একমাস পরে পনেরোই নভেম্বর সক্কালবেলা আমার বাড়িতে একগাল হাসি নিয়ে হাজির হলেন প্রফেসর। ফোকলা মাড়ি দেখে দেখে গা-পিত্তি জ্বলে গেল আমার। কড়া গলায় বললাম, 'যাওয়া হয়েছিল কোথায়?'

'ক্যালকাটাকে বাঁচাতে।'

'উড়ো চিঠির পেছনে এখনও উড়ে বেড়াচ্ছেন দেখছি।'

'উড়ো চিঠি নয় দীননাথ, কেস খুব সিরিয়াস। কাচুমাচুকে মনে আছে?'

'ড. কাচুমাচু? জাপানের পাগলা বৈজ্ঞানিক? আপনার নাম শুনলেই যিনি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন।'

'এগজ্যাক্টলি!' মুখটা কাঁচুমাচু করেই বললেন প্রফেসর, 'বুদ্ধির কমপিটিশনে হেরে গেছেন বলেই খেপে আছেন ভদ্রলোক, তাঁর কাছেই গেছিলাম।'

'কেন?'

প্রফেসর পালটা প্রশ্ন করলেন, 'বর্ম কী দিয়ে তৈরি হয় জানা আছে তো?'

'প্রফেসর—'

উনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি তা হলে জানো। কাচুমাচুর কাছে গেছিলাম সেই জন্যেই! ভেবেছিল আমার বুদ্ধি কম! তাই বর্ম দেখেও বুঝতে পারব না কলকাতাকে স্রেফ প্লেন করে দেওয়া হবে কী করে। নাইনটি পার্সেন্ট লোহা থাকে আর্মার প্লেটে। চাট্টিখানি কথা নাকি?'

'প্রফেসর—'

'সোজা চলে গেলাম জাপানে। সেখান থেকে জোগাড় করলাম ওর সিক্রেট ল্যাবরেটরির ঠিকানা! সাউথ প্যাসিফিকে তিনটে আগ্নেয় দ্বীপ আছে! সবচেয়ে বড়টার নাম মাসা তিয়েরা। স্প্যানিশ নাম, আলেকজান্ডার সেলকার্ক এই দ্বীপ থেকে 'রবিনসন ক্রুশো' লেখবার প্রেরণা পান। কাচুমাচু পেয়েছেন আমাকে নিপাত করবার ফরমুলা।'

'প্রফেসর—'

'আরে শোনোই না। কথার মাঝে প্রফেসর, প্রফেসর করে বাগড়া দাও কেন!— গিয়ে শুনলাম কাচুমাচু মাসছয়েক হল সেখান থেকেও ভেগেছেন। কিন্তু আমার নাম হল গিয়ে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র—

'ঘাপটি মেরে আছেন কোথায় ঠিক বার করে ফেললাম। ছোট লঞ্চ নিয়ে একাই চলে গেলাম দূর সমুদ্রের একটা বিজন দ্বীপে। কাচুমাচু সেখানে এলাহি কাণ্ড করে বসেছেন। ম্যাগনেটিক বীম বানিয়েছে।'

'ম্যাগনেটিক বীম!'

'ইয়েস, মাই বয়। উনি বৈজ্ঞানিক সভায় বলেছিলেন, এই পৃথিবীর ভেতর কোথাও ন্যাচারাল ডায়নামো বসানো আছে। মেকানিক্যাল এনার্জিকে ম্যাগনেটিক এনার্জিতে রূপান্তর করছে। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের আসল কারণ সেইটাই। আমি প্রমাণ চেয়েছিলাম! সেই থেকেই উনি খেপে গিয়েছিলেন। বিজন দ্বীপে গিয়ে দেখলাম পেল্লায় জেনারেটর বসিয়ে ইলেকট্রিককে মেকানিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করে তা থেকে ম্যাগনেটিক বীম বানিয়ে নিচ্ছেন।'

'ম্যাগনেটিক বীম মানেটা কী?'

'মানে? মানেটা কীকরে বোঝাই বলো তো? ধরো, সমুদ্র দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। ম্যাগনেটিক বীম তার ওপর ফোকাস করা হল। সঙ্গে সঙ্গে লোহার জাহাজ চুম্বকের প্রচণ্ড টানে ছুটে এসে দ্বীপের পাথরে আছড়ে পড়বে। অথবা সাঁজোয়াবাহিনী শত্রুপক্ষের দিকে এগোচ্ছে। ম্যাগনেটিক বীম চালু করে দেওয়া হল, আর্মার্ড কার, ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক— সব চুম্বকের টানে ছুটে যাবে— নদী বা গিরিখাতে তলিয়ে যাবে— শত্রুর দিকে আর এগোতে হবে না। এমনিভাবে উড়ন্ত প্লেনের লোহার কলকবজা খুলে নীচে চলে আসবে— প্লেন ভেঙে পড়বে। আমাদের এই লোহা সভ্যতা তছনছ করে ছাড়বে একা এই ম্যাগনেটিক বীম। ম্যাগনেটিক বীমের টান যে কী প্রচণ্ড, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। ব্রিজ ভেঙে দেয়, কংক্রিটের বাড়ি ধ্বসিয়ে দেয়, চলন্ত ট্রেন পাকসাট খেয়ে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়।'

'কিন্তু কলকাতা ধ্বংস হতে যাবে কেন?'

'আচ্ছা উজবুক তো, বললাম না আর্মার প্লেটে শতকরা নব্বই ভাগ লোহা থাকে!'

আমিও রেগে গিয়ে বললাম, 'তার সঙ্গে কলকাতা ধ্বংসের কী সম্পর্ক।'

'ইডিয়ট, ইডিয়ট, এক্কেবারে ফার্স্ট ক্লাস ইডিয়ট! এখনও ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না।' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে রেগে তিনটে হয়ে প্রফেসর বললেন, 'নিজে ভাবো, ভেবে বার করো কেন খানকয়েক হাইড্রোজেন বোমা ফাটার উপমা দিয়েছেন কাচুমাচু। আমি চললাম— দেখি ব্যুমেরাংয়ের খেলা।'

লাফিয়ে গিয়ে পথ আটকে ধরলাম প্রফেসরের, 'ব্যুমেরাংয়ের খেলা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যুমেরাংয়ের খেলা। সতেরোই নভেম্বর ভোররাতে কাচুমাচুর বিজন দ্বীপ শূন্যে মিলিয়ে যাবে। কলকাতা বেঁচে যাবে। খি-খি-খি-খি!'

নিয়মিত যারা খবরের কাগজ পড়ে, তারা নিশ্চয় দেখে থাকবে খবরটা। সতেরোই নভেম্বর ভোররাতে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অকস্মাৎ প্রলয় ঘটে গিয়েছিল। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা অনেক ভেবেও কূলকিনারা পাননি অতলান্ত সেই রহস্যের। আচমকা যেন কয়েকটা হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে কল্পনাতীত ধ্বংসলীলার মহড়া দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীর মানুষ এরকম ভয়ংকর দৃশ্য কখনও দেখেনি। এ ঘটনা যদি ডাঙায় ঘটত, তা হলে

যে কী ঘটত, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। শ্মশান হয়ে যেত গোটা একটা দেশ।

প্রফেসর খবরের কাগজ খুলে হাঁ করে বসেছিলেন। আমি গিয়ে দেখলাম, চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। উনি আমাকে দেখলেন। কাগজ নামিয়ে রেখে ধরা গলায় বললেন, 'বিরাট একটা প্রতিভা শেষ হয়ে গেল, দীননাথ। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল ম্যাগনেটিক বীম। ভালই হল। নইলে পৃথিবী শেষ করে ছাড়ত কাচুমাচু।'

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না যে এত কাণ্ডের মূলে রয়েছে ম্যাগনেটিক বীম নামক চুম্বকের খেলা।

প্রফেসর ফের বললেন, ''বর্ম আঁকা দেখেই বুঝেছিলাম কী কাণ্ড করতে চলেছেন কাচুমাচু।'

'কী কাণ্ড?'

'দীননাথ, একটিমাত্র ডিনামাইটে কত ক্যালোরি হিট বেরোয় জানো? এক হাজার ক্যালোরি। কিন্তু যদি একটা পেল্লায় উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে আছড়ে পড়ে পৃথিবীতে, তখন যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড সংঘাতের ফলে, তা কল্পনাও করতে পারবে না। গ্রাম পিছু সাড়ে চার লক্ষ ক্যালোরি। এই কারণেই ক্যারোলিনায় সাতশো বর্গকিলোমিটার জায়গা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে উল্কাপাতের ফলে। সাইবেরিয়ায় ১,৩০,০০০ কিলোমিটার বেগে দশলক্ষ টন ওজনের উল্কা ঠিকরে এসে পড়ায় সংঘাতের ধাক্কা টের পাওয়া গিয়েছিল আড়াই হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল পর্যন্ত— এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯০৮ সালে। বিশ হাজার বছর আগে প্রায় বিশলক্ষ টন ওজনের একটা উল্কাপিণ্ড তিরিশ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমার মতোই প্রলয় ঘটিয়েছিল আমেরিকার অ্যারিজোনা মরুভূমিতে। দেড় কিলোমিটার চওড়া গহ্বরটা আজও রয়েছে মরুভূমির বুকে। কিন্তু মানুষের কপাল ভাল, আজ পর্যন্ত জনবহুল কোনও অঞ্চলে এরকম উল্কাপাত ঘটেনি। কাচুমাচু উল্কাবৃষ্টি ঘটাতে চেয়েছিল কলকাতার বুকে ম্যাগনেটিক বীমের ক্ষমতা দেখানোর জন্যে।'

আমি বললাম, 'ম্যাগনেটিক বীম দিয়ে উল্কাবৃষ্টি!'

প্রফেসর বিরক্ত হলেন, 'মাথায় এত গোবর থাকলে তো কথা বলাই মুশকিল! বার বার বলেছি বর্মে নিকেল আর লোহা থাকে, তবুও মাথায় ঢুকছে না। কাচুমাচুর ব্রেন আছে! বছরের এক-একটা সময়ে উল্কাপাত ঘটবেই। চার্ট পর্যন্ত করে ফেলেছেন বৈজ্ঞানিকেরা। এগুলো বাৎসরিক ব্যাপার। টেমপেল টার্টল ধূমকেতুর ল্যাজ থেকে খসে পড়া লিওনিডস্ উল্কাবৃষ্টি ঘটে কিন্তু তেত্রিশ বছর অন্তর অন্তর— সাতাশে নভেম্বর থেকে চৌঠা ডিসেম্বরের মধ্যে। ১৯৬৬ সালের ১৭ নভেম্বরের ভোররাতে এই লিওনিডসের দেড় লাখ উল্কাপিণ্ডকে একসঙ্গে নিজের ল্যাবরেটরির ওপরেই টেনে এনে ফেলেছিলেন কাচুমাচু।'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'নিজের ওপরে উল্কাবৃষ্টি কেউ ঘটায়?'

'তা ঘটায় না। কিন্তু কাচুমাচু বাধ্য হয়েছিলেন। যখন দেখলাম কলকাতা বুকে ম্যাগনেটিক বীমের মেশিন কোথায় বসিয়েছেন কিছুতেই তা বলছেন না— তখন ওঁকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে এলাম। কলকাতার কোথায় মারাত্মক সেই মেশিন রয়েছে তখন জানতাম না, এই সেদিন জানলাম— মেশিনও বঙ্গোপসাগরে ফেলে এলাম।... দ্বীপে বসেই রিমোট কন্ট্রোল

করে ১৭ নভেম্বর ভোর রাতে এই মেশিন চালু করে দিত কাচুমাচু। ঘরে আটকে রাখায় তা পারল না— কিন্তু ওর ল্যাবরেটরির ম্যাগনেটিক বীম চালু করে দিয়ে এসেছিলাম বলে ১৭ নভেম্বর আকাশের গোলাগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে চুম্বকের টানে নেমে এল ওর ওপরেই। সমুদ্রের জলে তলিয়ে গেল এ যুগের সবচেয়ে মারাত্মক হাতিয়ার।'

আমি আর থাকতে পারলাম না। মুখখিঁচুনি খাব জেনেও কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'কিন্তু আকাশের উল্কা চুম্বকের টানে নীচে নেমে এল কেন সেইটাই তো বুঝলাম না।'

'ইডিয়ট,' অনুকম্পার চোখে তাকিয়ে বললেন প্রফেসর, 'উল্কার দেহও যে লোহা আর নিকেল দিয়ে তৈরি।'

'বর্ম দেখে বুঝলেন কীকরে যে উল্কাবৃষ্টি ঘটাতে যাচ্ছেন কাচুমাচু?'

'আচ্ছা গবেট তো! আরে বাবা, শতকরা নব্বই ভাগ লোহা আর দশ ভাগ নিকেল মিশিয়ে দারুণ মজবুত ইস্পাত বানিয়ে বর্ম তৈরির, মতলবটাই তো এসেছিল উল্কার উপাদান বিশ্লেষণ করার পর।'
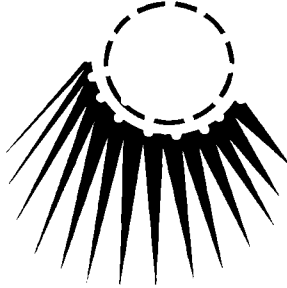
কাঁকড়া কারখানার দ্বীপে

খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম বিরাট বিজ্ঞাপন। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র পরিকল্পিত 'মলিকিউলার রেস্তোরাঁ'র দ্বারোদ্ঘাটন হবে আজ। মিনিস্টাররাও আসছেন।

মলিকিউলার রেস্তোরাঁ! অনেকদিন আগে প্রফেসরের মুখে এরকম একটা আইডিয়া শুনেছিলাম বটে। মলিকিউল অর্থাৎ অণুই হবে সেই রেস্তোরাঁর খাবার-দাবারের মূল উপাদান। তরি-তরকারি, আটা-ময়দা, মাছ-মাংস, মশলা-পেঁয়াজ— কিছু লাগবে না। এমনকী রাঁধুনির দরকারও হবে না। হোটেল বয়কেও প্রয়োজন হবে না। সুইচ টিপলেই খাবার বেরিয়ে আসবে। চপ কাটলেট, দই সন্দেশ, চিকেন চাও চাও, বিরিয়ানি— সব!

প্রফেসরের উর্বর মাথায় আইডিয়া রোজ গজায়। কিন্তু এই আইডিয়াটা নিশ্চয় কোনও হোটেলওয়ালা লুফে নিয়ে গেছে। লাখ লাখ টাকা কামাবে মলিকিউলার রেস্তোরাঁর দৌলতে। আক্রাগণ্ডার বাজারে বাজার করার কোনও হাঙ্গামাই নেই। শুধু কড়াং কড়াং করে সুইচ টেপা। অমনি বেরিয়ে আসবে গরম গরম খাবার। মেনুতে মনের মতো খাবার না থাকলেও পাকপ্রণালী দেখে মাইক্রোফোনে অর্ডার দিলেই চলবে। মলিকিউলার রেস্তোরাঁ চক্ষের নিমিষে তা বানিয়ে দেবে!

সেই মলিকিউলার রেস্তোরাঁর আজ উদ্বোধন। অথচ আমি জানি না? কাগজ ফেলে ছুটলাম প্রফেসরের বাড়ি।

প্রফেসর ওই সাতসকালেও বসেছিলেন গবেষণামন্দিরে। দৃষ্টি টেবিলের ওপর রাখা একটা কাচের বাক্সের দিকে।

দেখলাম, বাক্সের মধ্যে রয়েছে একটা কাঁকড়া!

ধুত্তোর কাঁকড়া! আমার মাথায় তখন মলিকিউলার রেস্তোরাঁ ঘুরছে। প্রফেসরের কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'শুনছেন?'

'অ্যাঁ!' ভীষণ চমকে উঠলেন প্রফেসর।

'মলিকিউলার রেস্তোরাঁর আজ তো উদ্বোধন।'

'মলিকিউলার রেস্তোরাঁ!....মলিকিউলার রেস্তোরাঁ! ও হ্যাঁ, খুশবন্তকে খুশি করার জন্যে দিয়েছিলাম ফরমুলাটা। রেস্তোরাঁ তৈরি করে ফেলেছে নাকি?'

'বলছি কী তাহলে, আজ উদ্বোধন। আপনিও যাচ্ছেন—খবরের কাগজে নাম বেরিয়েছে।'

'আমি!' অসহায় চোখে কাঁকড়ার দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। 'আমার সময় কোথা?'

'চলুন চলুন, মলিকিউলার রেস্তোরাঁর কোপ্তা-কাবাব তো খেয়ে আসি!'

জুলজুল করে তখনও বাক্সবন্দি বিদঘুটে প্রাণীটির দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। আমি দেখেও দেখলাম না, কাঁকড়ার চেহারাটা যেন কেমনতর!

এক কথায়, কিম্ভূতকিমাকার!

মলিকিউলার রেস্তোরাঁর বিরাট প্যানেলটার ছবি সব খবরের কাগজেই বেরিয়েছে। অগুনতি সুইচ, পাশে খাবারের নাম লেখা, টিভি স্ক্রীনের মতো ঘষা কাচের পর্দায় ভেসে ওঠা মাছ, মুরগির ছবি। অনেকেই কেটে বাঁধিয়ে রেখেছে ঘরের দেওয়ালে।

নেই শুধু ড. আলফোঁসের ছবি। ভদ্রলোক বেঁটে, বড়জোর পাঁচ ফুট, শুকনো মুখ। চিবুকে সোনালি ছাগলদাড়ি। চোখে লাল ফ্রেমের চশমা। সোনালি চুল টেনে আঁচড়ানো, ঠোঁটের দুপাশে চামড়া কুঁচকোনো—যেন সবসময়ে হাসছে। হাসলেই অবশ্য ঝকঝক করে সামনের স্টেনলেস স্টিলের দাঁতটা।

ড. আলফোঁসে জাতে ফরাসি। ইন্ডিয়ায় এসেছে গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণে। মলিকিউলার রেস্তোরাঁয় প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে দেখেই 'বোঁজোর' বলে জড়িয়ে ধরলে। সোজা এল ল্যাবরেটরিতে, কাঁকড়াটাকে দেখেই 'ফুনেস্তে' বলে হাঁক ছেড়েই জার্মান-ফ্রেঞ্চ-ইতালিয়ান মিশানো জগাখিচুড়ি ভাষায় প্রফেসরের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বকবক করলে অনেকক্ষণ ধরে।

এবার আসা যাক মূল ঘটনায়।

ঘটনাস্থল ভারত মহাসাগরের একটা ছোট দ্বীপ। দ্বীপটার অবস্থান তিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপের কাছাকাছি। এর বেশি এখন আর কিছু বলব না।

'আছটুং! আছটুং!' সে কী চিৎকার আলফোঁসের। কোমরজলে দাঁড়িয়ে খালাসিদের সঙ্গে হাতাহাতি করে প্যাকিং বাক্সগুলো নামাচ্ছে ডক্টর। মোট দশটা বাক্সর ন'টা নেমে গিয়েছে—বাকি আছে এই একটা। নৌকোর গলুইতে দাঁড়িয়ে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

আমি দাঁড়িয়ে আছি দ্বীপের ওপর। মাইলখানেক দূরে ভাসছে হালকা জাহাজটা। বিজন দ্বীপে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে। ফের আসবে তিন সপ্তাহ পরে।

সর্বশেষ বাক্সটা নিয়ে দুই বৈজ্ঞানিক দ্বীপে এলেন। প্রফেসর হাসছেন ফোকলা দাঁত বার করে। ডক্টর হাসছে স্টেনলেস স্টিলের দাঁত বার করে।

দেখেই পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার।

বললাম, 'কোনও মানে হয়? দ্বীপে তো কাকপক্ষীও দেখছি না। এদিকে রোদ্দুরের চোটে তো কাঠ ফাটছে। কী দরকার ছিল আসার?'

লাল রঙের ব্যানডানা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ডক্টর। বললে, 'এনফান্ত।' অর্থাৎ শিশু!

ধাঁ করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। গোড়া থেকেই দেখছি, আমাকে দেখলেই গুজগুজ ফুসফুস করা হচ্ছে। যেন আমি বাইরের লোক, ঘরের কথা বলা চলে না। ঘরের লোক হল ওই আলফোঁসে— উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!

গোদের ওপর বিষফোঁড়া ওই টিটকিরি! বোমার মত ফেটে পড়তে যাচ্ছি, অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন বুড়ো প্রফেসর, 'দীননাথ, কড়া রোদের দরকার আছে বলেই তো এতটা পথ এলাম। ভরদুপুরে সূর্য মাথার ওপর এসেছে, তাই কষ্ট হচ্ছে। সব সয়ে যাবে।'

রাগে অভিমানে ফুলতে ফুলতে বললাম, 'খাস আফ্রিকাতেও এত গরম নেই! চাঁদি ফেটে গেল আমার!'

মালপত্র নামিয়ে খালাসিরা সামনে এসে দাঁড়াল। আলফোঁসে একতাড়া নোট বের করল পকেট থেকে। গুনেও দেখল না।

দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'আভান্ট!'

অর্থাৎ, বাপু হে, এবার কুইক মার্চ করে কেটে পড়ো!

খালাসিরা তো অবাক! বকশিশের জন্যে এত টাকা। ঝটপট নোটের তাড়া পকেটস্থ করে তারা লাফিয়ে উঠল নৌকোয়, ঝপাঝপ দাঁড় টেনে ফিরে গেল জাহাজে।

আমার চোখও কপালে উঠে গিয়েছিল আলফোঁসের দান-ধ্যানের বহর দেখে। টাকা কি খোলামকুচি? এত টাকা পাচ্ছে কোত্থেকে?

দ্বীপে এখন আমরা তিনজন।

থুড়ি, চারজন। আলফোঁসের পোষা পমেরিয়ান কুকুরটাও দ্বীপে নেমেছে। লোমশ কুকুর। কুতকুতে চোখ। নামের ডাকে অবশ্য গগন ফাটে। ডায়মণ্ড!

জাহাজে জিজ্ঞেস করেছিলাম আলফোঁসেকে, 'কুকুরের নাম ডায়মণ্ড কেন?'

'আইনস্টাইনের কুকুরের নাম ডায়মণ্ড কেন?' পালটা প্রশ্ন করেছিল আলফোঁসে।

অত খবর আমার জানা ছিল না। সত্যেন বোসের বেড়ালের শখ ছিল জানি। আইনস্টাইনের খবর রাখতাম না।

সেই ডায়মণ্ড লেজ নাড়তে নাড়তে লাফালাফি শুরু করে দিল দ্বীপের বালির ওপর।

প্রফেসর একগাল হাসলেন। বললেন, 'দীননাথ, চটছ কেন। এস, হাত লাগাও।'

'কেন হাত লাগাব? আমি কি কুলি?'

'আরে ছ্যা, ছ্যা, তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট!'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট না কচু! দ্বীপে কেন এসেছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট এখনও তা জানে না।'

'এই দ্যাখো! তোমাকে বলবার সময়টা পেলাম কোথা? জাহাজে তো এসব কথা বলা যায় না। টপ সিক্রেট যে!'

মনে মনে বললাম— আলফোঁসেকে তো বলতে পেরেছিলেন?

প্রফেসর দন্তহীন মাড়ি বার করে হি-হি করে হাসছেন।

'রাগ করেছ? শোনো তা হলে কেন এসেছি। ডারউইনের নাম শুনেছ?'

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। চোখ-মুখ লাল করে বললাম—'যতটা গণ্ডমূর্খ ভাবছেন, ততটা নই!'

'ভীষণ চটে আছ দেখছি। ডারউইনের থিয়োরি নিয়ে একটা জবর এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য এসেছি।'

'ডারউইন! তিনি তো ক্রমবিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেছেন।'

'আমারও তাই বলতে পারো।' বলে চোখ টিপলেন আলফোঁসের দিকে চেয়ে। আমার কেমন জানি মনে হল, প্রফেসর সব কথা ভাঙলেন না।

মুখ গোঁজ করে বললাম, 'হুকুম করুন, কী করতে হবে।'

'এক নম্বর বাক্সটা আগে খুলে ফ্যালো।'

খুললাম। ভেতর থেকে বেরোল তাঁবু, কোদাল, কুড়ুল, গাঁইতি, স্ক্রু-ড্রাইভার, শ'খানেক টিন ভরতি খাবার, আর জল, র‍্যাঁদা ও হাতুড়ি।

তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করার পর আমি আর আলফোঁসে দুজনে মিলে খুললাম দু-নম্বর বাক্স। দেখলাম, ফরাসি জাতটা খাটিয়ে বটে। শুকনো খ্যাটখেটে চেহারা নিয়েও অসুরের মতো খাটতে পারে আলফোঁসে।

দু-নম্বর বাক্স থেকে বেরোল একটা চাকাগাড়ি অর্থাৎ 'ট্রলার'। রেলের প্ল্যাটফর্মে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে কুলিদের কাছে যা থাকে আর কি।

তিন নম্বর বাক্সটায় হাতুড়ি মারতেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর।

'দীননাথ! স্টপ!'

'কেন?'

'ম্যাপটা দ্যাখো। দ্বীপময় ছড়িয়ে দিতে হবে জিনিসপত্র।'

'সে আবার কী!'

প্রফেসর আর আলফোঁসে ততক্ষণে খুলে ফেলেছেন ম্যাপটা। ম্যাপের নানান জায়গায় লাল পেনসিলের দাগ দেওয়া।

প্রফেসর বললেন, 'এক্সপেরিমেন্ট নইলে জমবে না।'

ম্যাপের দিকে তাকাতেই দ্বীপের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঠিক যেন কাচের প্লেট উপুড় করা জলের ওপর। পঞ্চাশ গজ চওড়া বালির পাড় দিয়ে বাঁধানো। সৈকতভূমির পর কাঁটাঝোপ। রোদ্দুরে সব যেন ঝলসে পুড়ে গিয়েছে।

দ্বীপটার ব্যাস মাত্র দু'মাইল।

লাল দাগগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন প্রফেসর।

'প্যাকিং কেসগুলো এইসব জায়গায় নিয়ে গিয়ে খুলতে হবে।'

'কেন?' ফের শুধোলাম আমি!

'এক্সপেরিমেন্ট!' জবাব দিল আলফোঁসে।

চাকাগাড়িতে প্যাকিং কেস চাপিয়ে চিহ্নিত অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে জিনিসপত্র খুলতেই গেল পুরো তিনটে দিন।

তিন নম্বর কেসটা খুলেই কিন্তু ভ্যাবাচাকা খেয়েছিলাম প্রথম দিন। ভেবেছিলাম অত

ভারী বাক্সর মধ্যে থেকে নিশ্চয় একটা পেল্লায় মেশিন বেরোবে। কিন্তু দেখলাম রাশিরাশি লোহালক্কর ছাড়া কিছুই নেই ভেতরে। আজেবাজে লোহা। বিভিন্ন মাপের রকমারি ওজনের পেতল। তাল তাল দস্তা। কোনওটা চৌকোনা, কোনওটা লম্বাটে। কোনওটা গোল বলের মতো। ব্যাপার কী? এ আবার কি এক্সপেরিমেন্ট?

চার নম্বর কেস থেকে ন'নম্বর কেস পর্যন্ত ঠাসা এই ধরনেই ফেলে দেওয়া ধাতুর রদ্দিমার্কা টুকরোটাকরা দিয়ে।

শেষ বাক্সটা যেই খুলতে যাচ্ছি, আবার হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও!'

'আবার কী হল?' চমকে উঠলাম আমি। মাথাটাও গেল গরম হয়ে। এই ক'দিন ধরে ভূতের মতো খেটেছি প্রফেসরের কথামতো। কিন্তু বুঝিনি কেন উনি তাগাড় করে রাখছেন লোহালক্করগুলো দ্বীপের এক-এক জায়গায়। কোথাও সব ধাতু মিশিয়ে রেখেছেন। কোথাও রেখেছেন শুধু একরকম ধাতু। কোথাও মাটির ওপর স্তূপাকারে রেখেছেন, কোথাও মাটি খুঁড়ে পুঁতে রেখেছেন, কোথাও রেখেছেন জলের কিনারায়, কোথাও রেখেছেন টিলার ওপর। কিন্তু কেন? যতবার জিজ্ঞেস করেছি, অনামুখো ওই আলফোঁসে বলেছে, 'এক্সপেরিমেন্ট!'

তবুও মুখ বুজে হাড়ভাঙা খেটে গিয়েছি। দশ নম্বর প্যাকিং কেসটা আকারেও ছোট, ওজনেও হালকা। হাতুড়ির দু'ঘা আর শাবলের একটা চাড় দিলেই ডালা খুলে ছিটকে যাবে। কিন্তু এমন হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য রয়েছে বাক্সর মধ্যে!

চটেমটে বললাম, 'হয়েছেটা কী? চিল্লাচ্ছেন কেন?'

'আস্তে আস্তে খোলো। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

খুললাম আস্তে আস্তে। যেন ঠুনকো জিনিসে বোঝাই এমনভাবে বিলিতি খড় দিয়ে ঠাসা ভেতরটা। কাঠের গুঁড়ো, বনাত আর মোমমাখানো কাগজ দিয়ে প্যাক করা বেশ পরিপাটি করে।

অতি সন্তর্পণে ডালা খুলে নামালাম। বিলিতি খড় সরালাম। কাঠের গুঁড়োর মধ্যে থেকে টেনে বার করলাম একটা কাচের বাক্স।

বাক্সর মধ্যে রয়েছে কিম্ভূতকিমাকার সেই কাঁকড়াটা।

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম কাঁকড়া মহাশয়ের দিকে!

কাচের বাক্সে লাটসাহেবি আপ্যায়নে যাকে নিয়ে আসা হয়েছে জাহাজে চাপিয়ে বিজন দ্বীপে, কিম্ভূতকিমাকার সেই কাঁকড়াটা কিন্তু জীবন্ত কাঁকড়া নয়। কাছ থেকে ভাল করে দেখতে গিয়ে দেখলাম, খেলনার কাঁকড়া!

এ কী রহস্য! এ কী প্রহেলিকা!! এ কী গোলকধাঁধা!!!

ছেলেভুলোনো খেলনা কাঁকড়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলাম বলে সেকেন্ড কয়েক পরেই খেয়াল হল, জিনিসটা সাধারণ কাঁকড়া নয়। মামুলি খেলনাও নয়।

ছ'টা গাঁটযুক্ত দাড়ার ওপর দিব্বি দাঁড়িয়ে আছে মস্ত কাঁকড়াটা। সেই সঙ্গে সামনের

দিকে রয়েছে দু'জোড়া শুঁড়। শুঁড়ের ডগা 'মুখ' নামক ভীষণাকৃতি বিবরের মধ্যে ঢোকানো। পিঠের ওপর চকচক করছে আরশির মতো কী যেন। আরশির মতো দেখতে হলেও আরশি নয়। ঠিক যেন একটা পেটমোটা চকচকে ধাতু—মাঝে গাঁথা কালচে-লাল রঙের একটা ক্রিস্টাল। মামুলি কাঁকড়া হলে সামনের দিকে শুধু একজোড়া চোখ থাকত। কিন্তু অতি কদাকার এই কাঁকড়ার চার চারটে চোখ! দুটো সামনে, দুটো পেছনে!

সৃষ্টিছাড়া এমন একটা মেটাল টয়, দেখলে ভ্যাবাচাকা হব, এ আর আশ্চর্য কী! সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হল, দু'দুটো ঝানু বৈজ্ঞানিক এই কাঠফাটা রোদ্দুরে বিজন দ্বীপে বদখত খেলনাটা নিয়ে এলেন জীবজগৎ নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের জন্যে।

ভাবতে ভাবতে আমি নিজেই যেন একটা খেলনা হয়ে গেলাম, পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম বালির ওপর।

আলফোঁসে চটপটে হাতে বাক্সটা তুলে নিল। ডালা খুলে আলতোভাবে তুলে ধরল কাঁকড়াবাবুকে—নামিয়ে দিল আমার পায়ের কাছে বালির ওপর।

দেখলাম, দুই বৈজ্ঞানিকের চোখ কাঁকড়ার চোখের মতোই বুঝি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ডাঁটির ডগায়। অগত্যা আমিও গোলগোল চোখে তাকালাম পায়ের দিকে।

আঁতকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে!

কাঁকড়ার পিঠে বসানো আরশির মতো ক্রিস্টালটা আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে সূর্যের দিকে।

ম্যমী কাঁকড়া! এতক্ষণ মরে ছিল, এখন বেঁচে উঠেছে!

লাফিয়ে সরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ছায়া গিয়ে পড়ল কাঁকড়ার ওপর। তৎক্ষণাৎ কিলবিলিয়ে উঠল ছটা দাড়া, চারটে শুঁড়। সরসর করে কাঁকড়া এগিয়ে গেল ছায়ার বাইরে—রোদের মাঝে! সঙ্গে সঙ্গে বিষম ঘেউ ঘেউ করে লাফিয়ে উঠল ডায়মণ্ড!

এরকম ভুতুড়ে ব্যাপার আমি জীবনে দেখিনি। পাছে আমার পা কামড়ে ধরে এই ভয়ে তিন লাফে গিয়ে দাঁড়ালাম আলফোঁসের পেছনে। বাঁধানো দাঁত বার করে হাসল আলফোঁসে বলল, 'এনফান্ত!'

চলন্ত কাঁকড়া আবার চলতে শুরু করেছে। গুটিগুটি এগোচ্ছে জলের দিকে। রোদে পিঠ দিয়ে বালির ওপর এঁকাবেঁকা রেখা এঁকে এগিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে।

কিনারায় গিয়ে শুঁড় ডুবিয়ে রইল জলের মধ্যে। জল খাচ্ছে নাকি? নইলে শুঁড় ডোবাতে যাবে কেন?

পেট ভরে গেছে বোধ হয়। আবার পিছু হটে এল কাঁকড়া। কড়া রোদে দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দ দেহে।

আমার গা শিরশির করে উঠল। রোমাঞ্চ কাকে বলে— প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে অনুভব করলাম। মনে হল যেন মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে বিদঘুটে প্রাণীর ভৌতিক কাণ্ডকারখানা দেখে!

ঢোঁক গিলে শুধোলাম, 'আবিষ্কারটা কার? আপনার?'

ফোকলা মাড়ি বার করে হাসলেন প্রফেসর।

'এই দিয়ে ডারউইনের থিয়োরি টেস্ট করবেন?'

'একরকম তাই বলতে পারো,' বলে আবার আলফোঁসের দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসলেন প্রফেসর।

অর্থাৎ আসল কথাটা এবারেও ভাঙলেন না।

কাঁকড়া আর নড়ছে না। ক্ষুদে দানবের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মিহি বালির ওপর। একটা চোঙাকে শুইয়ে দিয়ে তলার দিকে ছ'টা পা আর চারটে শুঁড় লাগিয়ে দিলে যা হয়, পুঁচকে রাক্ষসকেও দেখতে হুবহু তাই। শুধু সামনে-পিছনে চোঙাটা চ্যাপটা চাতালের মতো হয়ে গিয়েছে। দু'জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে সেখানে। চোখ বলে মনে হলেও আসলে তা পাথরের মমি বললেও চলে। স্পষ্ট দেখলাম ভেতরে ধকধক করছে রক্তবর্ণ ক্রিস্টাল। মেটাল মনস্টারের ক্রিস্টাল চোখ!

দানোটার পেটের দিকটা প্ল্যাটফর্মের মতো সমতল। ভেতরে কী আছে, তা অবশ্য দেখতে পেলাম না।

জার্মান-ইতালিয়ান-ফ্রেঞ্চের জগাখিচুড়ি ভাষায় কী যেন বলল আলফোঁসে। খিকখিক করে হেসে উঠলেন প্রফেসর।

সূর্য হেলে পড়ছে পশ্চিমে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি দ্বীপের উত্তরে। তাই রোদ্দুর সরে সরে যাচ্ছে জলের দিকে। সেই ছায়া এসে পড়ল কাঁকড়ার ওপর, অমনি চঞ্চল হল তার ধাতব বপু। সরসর করে ছায়া থেকে বেরিয়ে গেল— দাঁড়াল রোদে পিঠ দিয়ে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। চকচক করছে পিঠের ক্রিস্টাল। আচমকা গাছপালার ছায়া এসে পড়ল পিঠে। তক্ষুনি চনমনে পায়ে ফের রোদের দিকে সরে গেল মেটাল মনস্টার।

আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম পেছন পেছন। কাঁকড়া এগোয়, আমরাও এগোই। এইভাবে জলের ধার দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এসে পৌঁছলাম দ্বীপের পশ্চিম দিকে।

দ্বীপের এই দিকে জলের ধারে বালির ওপর তাগাড় করা ছিল দস্তা-পেতল-লোহার একটা স্তূপ। ফুটদশেক দূরে এসে থমকে দাঁড়াল ছ'পেয়ে দানো। পরমুহূর্তেই সাঁ করে ছুটে গেল বালির ওপর দিয়ে বিদ্যুৎরেখার মতো। একটা পেতলের ডাণ্ডার সামনে গিয়েই নিথর হল দেহ।

উদ্দেশ্যটা বুঝলাম না। লোহালক্কর দেখে কেন এত উত্তেজনা, ধরতে পারলাম না। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠলেন প্রফেসর। বললেন, 'চলো হে দীননাথ, তাঁবুতে ফেরা যাক। কাল এসে কাঁকড়ার কাণ্ড দেখে পিলে চমকে উঠবে তোমার।'

'ইন্তারেস্তিং!' ফিক করে হেসে বলল আলফোঁসে।

টিনভরতি খাবার দিয়ে ডিনার খেলাম তিনজনে। চাদর মুড়ি দিয়ে ক্যাম্পখাটে শুতে-না-শুতে ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু পারলাম না। অত হাসির আওয়াজে ঘুম আসে? সমস্ত রাত ধরে ক্যাম্পখাটে উদখুস করলেন প্রফেসর আর হেসেই চললেন খিকখিক করে।

যেন ভারী মজার এমন একটা ব্যাপার ঘটতে চলছে যার বৃত্তান্ত তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

ভোর হল। আমি দাঁত-টাত মেজে মুখ ধুতে গিয়ে সমুদ্রের জলে বেশ খানিকটা সাঁতার কেটে নিলাম। ফুরফুরে হাওয়ায় ঠান্ডা জলে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

আচমকা শুনলাম প্রফেসরের চিৎকার।—'দীননাথ, ও দীননাথ।'

হাঁকপাঁক করে জল থেকে উঠে পড়লাম। বাঘে তাড়া করেছে নাকি প্রফেসরকে? এত চেঁচানি কেন?

'দীননাথ! ও দীননাথ! শীগগির এসো।'

ছুটতে ছুটতে গেলাম তাঁবুতে। প্রফেসর নেই, আলফোঁসেও নেই। চেঁচানিটা ভেসে আসছে দ্বীপের মাঝখান থেকে।

সাঁতারের পোশাক পরেই দৌড়লাম ঊর্ধ্বশ্বাসে। কাঁটাঝোপ টপকে গাছপালা পাশ কাটিয়ে কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল উঁচু টিলাটা। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে প্রফেসরের হ্যাংলা মূর্তি। হাত নাড়ছেন আর গলার শির তুলে চেঁচাচ্ছেন, 'শীগগির এসো। সুন্দরীদের দেখবে এসো!'

সেই সঙ্গে কুকুরের তড়পানি, 'ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ।'

ডায়মণ্ড চেঁচাচ্ছে!

সুন্দরী! বিজন দ্বীপে সুন্দরী!

কথা না বাড়িয়ে ছুটলাম প্রফেসরের পেছন পেছন। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে ফেলে দেওয়া ধাতুর স্তূপের কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে বললেন, 'দ্যাখো।'

সবার আগে দেখলাম আলফোঁসেকে। হেঁট হয়ে তাকিয়ে আছে বালির দিকে। পাশে দাঁড়িয়ে সমানে ঘেউ ঘেউ করে গলা ফাটাচ্ছে ডায়মণ্ড।

কিন্তু তন্ময় হয়ে কী দেখছে আলফোঁসে?

আমিও হেঁট হলাম। আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল তক্ষুনি!

নীল ধোঁয়া উঠছে কাঁকড়ার গা থেকে। কিন্তু এ কী! কিলবিলে শুঁড় নাড়ছে একটা নয়—দুটো কাঁকড়া!

ভুরু কুঁচকে বললাম, 'কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন জোড়াটাকে?'

'লুকিয়ে রাখতে যাবো কেন,' যেন আকাশ থেকে পড়লেন প্রফেসর। 'কাল রাতে জন্মেছে!'

'জন্মেছে!'

'আরে হ্যাঁ, চোখ মেলে দ্যাখোই না!'

চোখ মেলে দেখতে গিয়ে একবার চোখ রগড়ে নিতে হল। কেননা যা দেখলাম, তা রীতিমত অবিশ্বাস্য! স্বপ্ন দেখছি না তো?

দেখলাম তুরন্ত বেগে কাজ করছে দুটো কাঁকড়াই। হুবহু একরকম দেখতে দুজনকে। সামনের দুটো শুঁড় নাড়ছে, অমনি যেন ইলেকট্রিকের স্পার্ক বেরুচ্ছে শুঁড়ের মধ্যে থেকে।

স্পার্ক দিয়ে ধাতুর ছোট ছোট টুকরো কেটে নিয়ে মুখে পুরছে। সেই সঙ্গে কেমন জানি গুন-গুন-গুন-গুন শব্দ হচ্ছে পেটের মধ্যে। যেন কত কলকবজা ঘুরছে পেটের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরেই তৈরি কলকবজা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে হিসহিস শব্দে, অন্য দুটো শুঁড় 'ফিনিশড' পার্ট নিয়ে পেটের তলায় প্ল্যাটফর্মে সাজিয়ে রাখছে নিখুঁতভাবে থরে থরে বিশেষ একটা প্যাটার্নে।

প্ল্যাটফর্মটাও একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে। বেশ বুঝলাম, আর একটা কাঁকড়ার আদল দেখা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের ওপর।

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল কাঁকড়ার কারখানা দেখে।

কোনও মতে বললাম মিনমিন করে, 'কাঁকড়া কাঁকড়া বানাচ্ছে।'

'তবে আর বলছি কী। লেদ মেশিন দিয়ে যদি লেদের কলকবজা তৈরি করা যায়, তাহলে আমিই বা পারব না কেন? তাই এমন একটা মেশিন বানিয়েছি যে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের নকল বানাতে পারবে। এই হল সেই মেশিন।'

এইটুকু সময়ের মধ্যেই প্রথম কাঁকড়ার পেটের প্ল্যাটফর্মে ক্ষুদে কাঁকড়ার কঙ্কাল প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। হঠাৎ কড়কড় শব্দে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল খাঁজকাটা ধাতুর একটা ফিতে। শুঁড় দিয়ে ফিতেটা নিয়ে ক্ষুদে কাঁকড়ার কঙ্কালকে জুড়ে দিতেই সম্পূর্ণ হল তার চেহারা। দুটো লিকপিকে দাড়া সামনের ঘাঁটিতে লাগিয়ে প্ল্যাটফর্মটাকে বালির ওপর নামিয়ে দিল 'মা' কাঁকড়া।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল নবজাতক। তার পরেই পিঠের ক্রিস্টাল বসানো ধাতুর আয়না আস্তে আস্তে ঘুরে গেল সূর্যের দিকে। যেন গা গরম করছে। একটু পরেই গুটিগুটি গেল জলের ধারে। শুঁড় দিয়ে জলপান করল কিছুক্ষণ। ফিরে এসে বালির ওপর পড়ে রইল নিস্পন্দ দেহে।

বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, দ্বিতীয় কাঁকড়ার পেটের প্ল্যাটফর্মেও আদল দেখা দিয়েছে আরেকটা ভাবী কাঁকড়ার। প্রথম কাঁকড়াটাও নির্বিকারভাবে ফের স্পার্ক দিয়ে ধাতু কাটছে, মুখে পুরছে। ঠিক যেন ওয়েল্ডিং মেশিন থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছে অত্যুজ্জ্বল শিখা নিয়ে।

খাবি খেতে খেতে বললাম, 'আপনার মেশিন জল খায় কেন?'

'নোনা জল দিয়ে পিঠের ব্যাটারি চার্জ দেবে বলে।'

'রোদ পোহায় কেন?'

'সূর্যের শক্তি দিয়ে সিলিকন ব্যাটারি চালু করবে বলে। সারাদিনের সৌরশক্তি অ্যাকিউমিউলেটরে সঞ্চয় করে রাখে সারারাত কাজ করবে বলে।'

'বলেন কী! দিনে-রাতে সমানে কাজ করে আপনার মেশিন?'

'এক সেকেন্ডও বিশ্রাম নেয় না। মেশিন তো।'

'কিন্তু এত সিলিকন পাচ্ছেন কোথায়? লোহালক্কড়ের মধ্যে তো সিলিকন নেই?'

'তোমার পায়ের তলায় রয়েছে সিলিকনের অফুরন্ত খনি।' বালিতে লাথি মেরে বললেন প্রফেসর, 'বালি হল সিলিকন অক্সাইড। কাঁকড়ার পেটের কারখানায় গিয়ে ইলেকট্রিক স্পার্ক তা থেকে বের করছে শুধু সিলিকন। দ্যাখো, দ্যাখো, চার নম্বর কাঁকড়া ভূমিষ্ঠ হল।'

সচমকে দেখলাম চতুর্থ নবজাতককে। গুটিগুটি এগোচ্ছে জলের দিকে ব্যাটারি চার্জ করার মতলবে। ঠিক যেন দম দেওয়া কলের কাঁকড়া!

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে শুধোলাম, 'কিন্তু কী হবে এত কাঁকড়া দিয়ে?'

'বোকা ছেলে! কী হারে বংশবৃদ্ধি করছে ওরা, তা তো নিজের চোখেই দেখলে। কাল ছিল একটা, রাতারাতি হল দুটো। এখুনি হবে আটটা। কাল হবে চৌষট্টিটা। পরশু দিন পাঁচশো বারোটা। দশ দিনে এক কোটি। তখন ওদের পেটের কারখানা চালু রাখতে লাগবে তিরিশ হাজার টন ধাতু।'

'তারপর?'

'তারপর? আচ্ছা বোকা ছেলে তো! শত্রু এলাকায় একটা কাঁকড়া পাচার করার পরিণামটা কল্পনা করতে পারছো না? দশ দিনেই তো শত্রুদের কামান বন্দুক সাবাড় করে দেবে। লড়াইয়ের দফারফা হয়ে যাবে।'

এতক্ষণে বুঝলাম, কেন ইন্ডিয়ান নেভি সামান্য একটা কাঁকড়াকে এত জামাই আদরে পৌঁছে দিয়ে গেছে বিজন দ্বীপে।

চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। আমতা আমতা করে বললাম, 'শত্রুদের ধাতু খেয়ে ফেলার পর ওরা যদি মিত্রপক্ষের এলাকায় চলে আসে?'

'যে হুকুম নিয়ে কাঁকড়ারা কাজ করছে, তার চাবিকাঠি তো আমার কাছে। ইচ্ছে করলেই মেশিন বন্ধ করে দেব। তার আগেই অবশ্য শত্রুপক্ষের সমস্ত ধাতু নিয়ে চলে আসবে কাঁকড়াবাহিনী। ভাবো দিকি কত খরচ বাঁচিয়ে দেবে আমাদের?'

শুনেই বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল মাথা। ধপ করে বসে পড়লাম বালির ওপর।

'এনফান্ত!' বলল আলফোঁসে।

সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যেও চমকে চমকে উঠলাম দুঃস্বপ্ন দেখে। দেখলাম, কাঁকড়া-রোবটরা পিলপিল করে গায়ে উঠছে আমার। তীক্ষ্ণ দাঁড়া দিয়ে খুবলে খাচ্ছে আমার চোখ-মাংস-নাক!

চারদিন পর সারা দ্বীপ ছেয়ে গেল কাঁকড়াবাহিনীতে। রোদে বসে দেখতাম পাঁই পাঁই করে ছুটোছুটি করছে কলের কাঁকড়ার দল। দারুণ ব্যস্ত প্রত্যেকেই! মরবারও বুঝি সময় নেই।

শুনলাম, ওদের সংখ্যা এখন চার হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

সেই দিনই বিকেলের দিকে একটা অশুভ ঘটনা ঘটল।

দ্বীপের একপ্রান্তে বালির মধ্যে দস্তা পুঁতে রেখেছিলাম প্রথম দিন। কাঁকড়াদের কলকবজার বিশেষ একটা অংশ তৈরি করতে দস্তার দরকার হয়। তাই দ্বীপের অন্য অঞ্চল থেকেও পিলপিল করে ওরা ছুটে আসত এখান থেকে দস্তা জোগাড় করতে।

সেদিন একসঙ্গে কাতারে কাতারে কাঁকড়া জড়ো হয়েছে দস্তা নিতে। ফলে, গাদাগাদি ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোমাত্রায়। এদের মধ্যে একটা কাঁকড়াকে দেখলাম যেন একটু দলছাড়া। গায়ে গতরে বেশ ভারী। পালোয়ান ধাঁচের চেহারা। জাতভাইদের ঘাড়ের

ওপর দিয়ে লাফ মেরে এগিয়ে এল সে। দস্তার একটা ডাণ্ডা সবে ধরেছে দাঁড়া দিয়ে, অমনি আর একটা কাঁকড়া উলটো দিক থেকে টেনে ধরল ডাণ্ডাটা। শুরু হয়ে গেল টাগ অব্ ওয়ার—টানাটানির লড়াই। জিতল অবশ্য পালোয়ান কাঁকড়া। কিন্তু পরাভূত কাঁকড়ার তেজ দেখে কে। রণে ভঙ্গ দেওয়া দূরে থাকুক, পেছন থেকে সাঁ করে ছুটে এসে দুটো দাঁড়া সটান ঢুকিয়ে দিল পালোয়ানের মুখের মধ্যে।

তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড লড়াই! কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অবশ্য পালোয়ানটা উলটে দিল প্রতিপক্ষকে। সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে হড়কে সরে গেল চিৎপটাং কাঁকড়ার পেটের প্ল্যাটফর্ম। হরেকরকম ক্ষুদে কলকবজা বেরিয়ে পড়ল উদরের মধ্যে!

ভয়ংকর দৃশ্যটা দেখতে হল এর পরেই। চক্ষের নিমেষে ইলেকট্রিক স্পার্ক দিয়ে অসহায় কাঁকড়াটার পেট কাটতে শুরু করল বিজয়ী কাঁকড়া। নীল ধোঁয়ার রেখা উঠল। দেখলাম, লিভার, হুইল, পিস্টন কেটে কেটে মুখে পুরছে গুণ্ডা কাঁকড়াটা। ক'সেকেন্ডই বা গেল! নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল জাতভাই বেচারা!

আশপাশে নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাঁকড়ার দল। তিলমাত্র উত্তেজনা দেখলাম না কারও মধ্যে! মেশিন! ডাহা মেশিন!

পালোয়ান কাঁকড়াটার পেটের প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এর মধ্যেই ঘন ঘন নড়তে শুরু করেছে। গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে দেহের কারখানায়। অতি দ্রুত জন্ম নিচ্ছে আর একটি কাঁকড়া। মিনিটকয়েকের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হল নবজাতক এবং দৌড়ল ব্যাটারি চার্জের জন্য জল আনতে!

আমি দৌড়লাম প্রফেসরের সন্ধানে। আলফোঁসেকেও দেখলাম সেখানে। বসে বসে ডায়েরি লিখছে।

প্রফেসর আমার শুকনো মুখ দেখে হন্তদন্ত হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে দীননাথ?'

আমি সব বললাম। শুনে কোথায় ঘাবড়ে যাবেন, তা না বেশ খুশিই হলেন। খিকখিক করে বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, 'যাক, যা চাইছিলাম, তা শুরু হয়ে গেছে।'

'তার মানে? কাঁকড়ায় কাঁকড়া খেলে তাহলে আর রইল কি?'

'সব চাইতে পালোয়ান কাঁকড়াটা তো বাঁচবে? সব চাইতে শক্তিশালীরা টিকে গেলে তাদের চাইতেও আরও ভয়ংকর কাঁকড়া তো জন্মাবে?'

'প্রফেসর—'

'দ্যাখো, দুটো জিনিস হুবহু একরকম কখনও হয় না। দুটো বলবিয়ারিং পর্যন্ত সমান ছাঁচের হয় না। আমি যে ছাঁচ, যে ব্লুপ্রিন্ট ওদের মেশিনের মধ্যে বসিয়েছি, ওরা হুবহু তার নকল করার চেষ্টা করলেও উনিশ-বিশ তফাত থাকবেই। আস্তে আস্তে এই তফাত বাড়বে। শেষে এমন কাঁকড়ার সৃষ্টি হবে যার সঙ্গে আমার তৈরি আদি কাঁকড়ার কোনও মিল থাকবে না। কিন্তু যত দিন যাবে, ততই ডেঞ্জারাস আর পাওয়ারফুল রোবট তৈরি হবে রোবট কারখানার মধ্যেই। দীননাথ, এই হল আমার ক্রমবিবর্তন এক্সপেরিমেন্ট। কাঁকড়াদের জগতে আমিই হব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আমি সৃষ্টি করছি, পালন করছি, সংহারও করছি। এমন একটা দিন আসবে যেদিন দ্বীপে একরতি ধাতুও থাকবে না। সেদিন কী হবে জানো? ধাতুর

লোভে নিজেদের জাতভাইদের ধরে ধরে খাবে এরা। তারপরেই জন্মাবে নতুন কাঁকড়া। তারা কী ধরনের হবে, আমি তা জানি না। কিন্তু দেখতে পাব আর কদিনের মধ্যেই।'

দেখলাম, ডায়েরি লেখা থামিয়ে গোগ্রাসে কথাগুলো গিলছে আলফোঁসে!

রাত নেমেছে। চুপ করে বসে আছি অন্ধকারে। বৈজ্ঞানিক দুজনের নাসিকা গর্জন শুনতে পাচ্ছি বাইরে বসেও। আমার চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেছে। প্রফেসর শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়বেন না তো? মানুষের মঙ্গল করতে গিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না তো? ভয়ংকর এই কাঁকড়াদের একটিও যদি কোনও রকমে কলকাতায় ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলেই তো দফাদফা হবে কলকাতার বাবুদের। টালার ট্যাঙ্ক থেকে আরম্ভ করে ট্রাম লাইন পর্যন্ত সমস্ত নিশ্চিহ্ন হবে! ট্রাম, বাস, ট্রেন, এরোপ্লেন—সব অদৃশ্য হবে!

পাশ দিয়ে খড়খড় করে ছুটছে কাঁকড়ার দল। অসীম এনার্জি ওদের মধ্যে। বিরামবিহীন কর্মব্যস্ততা। দেখেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল। তাঁবুর মধ্যে থেকে একটা শাবল এনে দমাস করে থেঁতলে দিলাম একটা রোবটকে। ভেবেছিলাম জাতভাইরা তাই দেখে চোঁচা দৌড় দেবে। কিন্তু উলটোটা ঘটল। অর্থাৎ পিণ্ডি পাকানো ভাইয়ের লাশ নিয়ে কামড়াকামড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি শুরু হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে! নীল ধোঁয়া আর ইলেকট্রিক স্পার্কের দ্যুতিতে রাত ঝলসে উঠল, চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেখতে দেখতে সাবাড় করে ফেলল বিকল রোবটকে! দেখে রাগে গা রি রি করে উঠল আমার। মড়াখেকোদের মধ্যে সবচাইতে দুঁদেটাকেই মনে হল পালের গোদা। শাবল দিয়ে তাকে উলটে দিতে গিয়ে আপাদমস্তক অবশ হয়ে এল দারুণ ইলেকট্রিক শকে।

সর্বনাশ! ক্রমবির্বতনের ফলে এ কী সৃষ্টি হয়েছে! এ কাঁকড়ার গা দিয়ে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বইছে! ছুঁলেই সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠছে প্রচণ্ড শকে!

শাবলটা হাত থেকে খসে পড়েছিল। তুলতে গিয়ে দেখলাম, পালের গোদাটি তা ভক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটছে আরও অনেকে!

তাঁবুতে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাতে ধড়মড় করে ফের লাফিয়ে উঠলাম। গায়ের ওপর দিয়ে সরসর করে কাঁকড়া হাঁটছে!

শুনলাম, ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির শব্দতে টিন কাটছে দস্যু কাঁকড়ারা। খাবারের টিন, জলের টিন লুঠ করতে এসেছে নিশাচররা।

তাড়াতাড়ি ডেকে তুললাম প্রফেসরকে। আলফোঁসেও লাফিয়ে উঠল। অমনি হাঁকডাক শুরু করল ডায়মণ্ড।

টর্চের আলোয় ভাঁড়ার লুটের দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলেন প্রফেসর!

'জলের মধ্যে টিন ডুবিয়ে রাখো। দীননাথ! আলফোঁসে! কুইক!'

এক হাঁটু জলের মধ্যে বালির ওপর তাগাড় করে রাখলাম আমাদের খাবার ভাঁড়ার আর যন্ত্রপাতি। বাকি রাতটা সবাই মিলে বসে রইলাম তীরের ওপর।

মনে মনে অভিসম্পাত করলাম খ্যাঁটকেল ফরাসিটাকে! প্রফেসরকে নাচিয়েছে নিশ্চয়

সে! নিশ্চয় কোনও ফিকিরে ঘুরছে। কিন্তু কী সেই ফিকির, ধরেও ধরতে পারছি না!

ধরলাম দিন কয়েকের মধ্যেই!

এরপর ক'টা দিন কেটেছে, ঠিক মনে নেই।

প্রফেসর বললেন, 'যাক, অ্যাদ্দিনে দ্বীপের সমস্ত ধাতু ফুরোলো।'

সেই সঙ্গে কাঁকড়া কারখানার কাজও বন্ধ হয়ে গেল। ধাতুর সরবরাহ না থাকলে কারখানা তো বন্ধ থাকবেই। পালে পালে কাঁকড়ারা ঘুরতে লাগল দ্বীপময়। কাজ নেই, কর্ম নেই, শুধু টোঁ টোঁ করা!

প্রফেসরের কথা যে কতখানি সত্যি, কাঁকড়াদঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। দেখলাম, রকমারি সাইজের কাঁকড়া ঘুরঘুর করছে আশে পাশে। কেউ রোগা, কেউ বেঁটে, কেউ মোটা, কেউ ঢ্যাঙ্গা, কেউ চটপটে, কেউ ঢিলেঢালা, কেউ পিগমি, কেউ দৈত্য!

কিন্তু কাজ নেই! কারও কাজ নেই!

কাঁকড়াদের রকমারি চেহারা দেখতে ঘুরছি দ্বীপের সর্বত্র, এক সময়ে একটা ঝোপের মধ্যে দেখলাম আলফোঁসে চুপিচুপি গিয়ে ঢুকল চোরের মতো!

আলফোঁসে! তাঁবু থেকে এত দূরে কী করছে? এত চুপিসাড়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকছেই বা কেন?

বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা টিপে টিপে উঁকি দিলাম ঝোপের মধ্যে, দেখলাম, সেই কাচের বাক্সটার মধ্যে বিলিতি খড় আর কাঠের গুঁড়োর মধ্যে একটা আদি কাঁকড়া প্যাক করছে আলফোঁসে। প্রথম যে জাতের কাঁকড়া দ্বীপে ছেড়েছিলেন প্রফেসর, এটা সেই শ্রেণির। বেশ ভাল করে বাক্সর মধ্যে পুরে বালিমাটি খুঁড়ল আলফোঁসে। বেশ গভীর গর্তের মধ্যে বাক্সটা রেখে ফের বালিমাটি চাপা দিয়ে দিল ওপরে। সুট করে সরে এলাম আমি।

ওর রহস্যজনক গতিবিধির রহস্য ধরতে পারলাম না। প্রফেসরকেও কিছু বললাম না। নজর রাখলাম আলফোঁসের ওপর।

কিন্তু তার আর দরকার হল না!

তাঁবুতে ফিরতেই দেখি প্রফেসর আমায় খুঁজছেন।

বললেন, 'দীননাথ, এবার একটা নতুন মজা দেখাব। জলের মধ্যে কতকগুলো কোবাল্টের ডাণ্ডা রেখেছি মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'কাঁকড়ার কলকবজা এমনভাবে তৈরি যে কোবাল্টের খাদ গিয়ে ভেতরে মিশলেই হিংস্র হয়ে উঠবে ওরা। তখন আর জাতভাই বলে কাউকে রেয়াত করবে না। সোজা কথায়, গৃহযুদ্ধ লাগাব এবার।'

বলে, হাঁটু জলে গিয়ে চারটে কোবাল্টের ডাণ্ডা মাথার ওপর তুলে ফের বালিতে এসে উঠলেন প্রফেসর। সঙ্গে সঙ্গে যেন অলৌকিক ভাবে চনমনে হল কাঁকড়ার দল। প্রফেসরকে

ছেঁকে ধরল চারদিক থেকে। কয়েকজনকে স্পষ্ট দেখলাম লাফিয়ে ডাণ্ডা ধরবার চেষ্টা করছে!

ডাণ্ডাগুলো একে একে দূরের ঝোপে ছুড়ে দিলেন প্রফেসর।

সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটল, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

বিদ্যুৎরেখার মতো সব ক'টা কাঁকড়া ধেয়ে গেল ঝোপের দিকে। শুরু হল কামড়াকামড়ি ঠেলাঠেলি। কোবাল্টের স্বাদ প্রথম যারা পেল, তারাই জাতভাইদের ইলেকট্রিক স্পার্ক দিয়ে কাটতে লাগল সবার আগে। কেটে মুখে পুরতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। এদের পেটের মধ্যে যারা জন্মাল, তারা তৎক্ষণাৎ লড়াই আরম্ভ করে দিল পাশের কাঁকড়াদের সঙ্গে। আওয়াজ নেই, চিৎকার নেই—শুধু ইলেকট্রিক স্পার্কের চোখ ঝলসানো দ্যুতি আর নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী!

কয়েক ঘণ্টা পরে দেখলাম, ব্যাটারি চার্জ করার বা অ্যাকিউমিলেটরে পাওয়ার সঞ্চয় করার দরকারও হচ্ছে না নবজাতকদের। সোজাসুজি সৌরশক্তি দিয়ে লড়ে যাচ্ছে জাত-ভাইদের সঙ্গে।

সূর্য হেলে পড়ল পশ্চিমে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কেমন জানি শান্ত হয়ে এল ক্ষুদে কাঁকড়ার দল। পালে পালে গিয়ে ভিড় করল পশ্চিম প্রান্তে।

প্রফেসরকে এই প্রথম ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম।

বিড়বিড় করে বললেন, 'সর্বনাশ হল দেখছি! এদের অ্যাকিউমিলেটর নেই, সূর্য ডুবলেই সবাই বিকল অচল হবে।'

বলতে না বলতেই সূর্য ডুব দিল। অগুনতি কাঁকড়া নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল বালির ওপর। নির্জীব মেশিন প্রত্যেকেই—ধাতুর পিণ্ড ছাড়া কিছু নয়!

বিশালকায় কাঁকড়াদের দেখা গেল ঠিক তখনি। দ্বীপের অন্য প্রান্ত থেকে এল তারা হেলতে দুলতে। আকারে তারা আমার কোমর সমান। ছোট ছোট পাথরের চাঁই যেন। ধীর গতিতে এসে কপাকপ ক্ষুদে কাঁকড়াদের চালান করতে লাগল পেটের মধ্যে!

দু'হাতে রগ টিপে ধরে বসে পড়লেন প্রফেসর। এমনটি তিনি আশা করেননি। এত ভারী এত বড় কুমড়োপটাশ প্যাটার্নের কাঁকড়া শত্রু এলাকায় কোনও কাজেই আসবে না। নিজেরাই নড়তে পারে না— শামুকের গতি নিয়ে চলতে ফিরতে হয়।

এক্সপেরিমেন্ট বুঝি ব্যর্থ হতে চলল।

খিকখিক হাসি শুনলাম পেছনে। বাঁধানো দাঁত বের করে হাসছে অনামুখো আলফোঁসে!

সেই রাতেই আলফোঁসের হাসি ছুটে গেল। কাঁদতে হল একগলা জলে দাঁড়িয়ে!

মাঝরাতে বিকট আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল আমার। প্রফেসরও দেখি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েছেন।

তাঁবুর মধ্যে আলফোঁসে নেই!

কোথায় সে? নিশুতি রাত। কিন্তু শিউরে শিউরে উঠছে আর্তনাদের পর আর্তনাদে... আলফোঁসে প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে চলেছে বাইরে কোথাও...

ছুটলাম তাঁবুর বাইরে।

চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে দিগ্বিদিক। সমুদ্র অতিশয় প্রশান্ত। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালুকাবেলায়। টিনভরতি খাবারদাবার জলের মধ্যে যেখানে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে, সেইখানে সামান্য আলোড়ন দেখলাম বটে, কিন্তু আলফোঁসেকে দেখলাম না।

চিৎকারটা আবার ভেসে এল ডান দিক থেকে।

দৌড়ে গেলাম আমি আর প্রফেসর। তীর থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে জলের মধ্যে একটা মুখ। সোনালি চুল, ছাগলদাড়ি আর লাল ফ্রেমের চশমার কাচে চাঁদের চমক দেখে বুঝলাম মুখটা কার।

গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলফোঁসে!

আমাদের দেখেই হাউমাউ করে উঠল সে। জলে নেমে কাছে যেতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম একটা অতিকায় কাঁকড়ার ওপর। দাড়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ধাতব দানব। পাঁচ হাত তফাতে ভয়ার্ত মুখে আলফোঁসে! কাঁকড়া শুঁড় বাড়িয়ে আলফোঁসের মুখ ছুঁতে চাইছে।

প্রফেসরও এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার পেছনে। আলফোঁসে ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, জার্মান ভাষার জগাখিচুড়ি দিয়ে যা বলল, তা শুনে পিলে চমকে গেল আমার।

ঘুমের মধ্যে কয়েকটা কাঁকড়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকে শুঁড় বুলোচ্ছিল তার মুখের ওপর। সরে শোয় আলফোঁসে। কাঁকড়ারাও ফের সরে যায় তার পাশে। আলফোঁসে বেরিয়ে আসে বাইরে। কাঁকড়ার দলও আসে পেছনে। আলফোঁসে ছুটতে শুরু করতেই কাঁকড়ারাও ধাওয়া করে তাকে। নিরুপায় হয়ে বেচারি গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে আছে বটে, কিন্তু যে হারে নতুন নতুন দানব জন্মাচ্ছে, আরও ঢ্যাঙা কাঁকড়া ভূমিষ্ঠ হয়ে তেড়ে এলেই জল থেকেই তুলে নিয়ে যাবে আলফোঁসেকে।

কিন্তু কেন? শুধু তার ওপরেই কাঁকড়াদানবের এত রাগ কেন?

প্রফেসর মাথা চুলকোলেন। ক্রমবিবর্তনের ফলে যদি মানুষজাতটা তাদের চোখের বালি হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে আর প্রফেসরকেও অ্যাটাক করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তো হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলাম বড় কাঁকড়াটাকে। কিছু তো বলল না? শুঁড়টা দুমড়ে-মুচড়ে দিলাম, যেন বিরক্ত হয়ে পিছু হটে গেল কাঁকড়া, আক্রমণ তো করল না? ফরাসিরা কি বেশি মুখরোচক? বাঙালিরা কি এতই অখাদ্য?

মনে মনে বড় ফুর্তি হল আলফোঁসের দুরবস্থা দেখে। একটু মায়াও হল। আমি তার হাত ধরে জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এলাম টিনভরতি খাবার যেখানে লুকোনো ছিল সেইখানে।

কিন্তু একটা টিনও পেলাম না পায়ের তলায়!

'প্রফেসর!' আঁতকে উঠলাম আমি, 'প্রফেসর!'

'আবার কী হল?'

'সর্বনাশ হয়েছে। আপনার কাঁকড়ারা আমাদের সমস্ত টিনগুলো তুলে নিয়ে গেছে জল থেকে!'

টিনগুলো আর পাওয়া গেল না বটে, তবে ভেতরকার মাছ, কড়াইশুঁটি, রসগোল্লার

ছড়াছড়ি দেখলাম বালির ওপর। আলফোঁসেকে জলে দাঁড় করিয়ে রেখে খাবারদাবারগুলো যতখানি সম্ভব দু'হাতে জড়ো করলাম। রাত ভোর হল শুধু এই করতেই।

জলে দাঁড়িয়ে সারারাত বকেছে আলফোঁসে। মনে হল যেন মুণ্ডপাত করছে প্রফেসরের। প্রফেসর জবাব দিতেও পারছেন না। ভ্যাবাচাকা খেয়ে বসে আছেন বালির ওপর।

ভোরের সূর্য উঠতেই কাঁকড়ার দল সরে গেল পুব দিকে। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল আলফোঁসে। বেচারির নিউমোনিয়া না হয়। বালির ওপর সটান শুয়ে পড়ল অসীম ক্লান্তিতে। আমি উষ্ণ বালি দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলাম শরীর গরম করা জন্য। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

প্রফেসরকে বললাম, 'আসুন।'

'কোথায়?' অসহায়ের মতো তাকালেন প্রফেসর।

'কাঁকড়াদের কাছে।'

'কেন?'

'খুন করব ওদের। কোথায় চোট দিলে মেশিন বিগড়োবে চটপট বলুন।'

আমতা আমতা করলেন প্রফেসর, 'পিঠের আয়না ভাঙলেই সিলিকন ব্যাটারি বিগড়োবে, পেটের অ্যাকিউমিউলেটর সরিয়ে নিলেও মেশিন বিকল হবে— কিন্তু এখন ওদের মরণ মার কোথায় মারতে হবে বলা মুশকিল। ক্রমবিবর্তনের ফলে ওদের কলকবজা কীরকম দাঁড়িয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করা দরকার!'

'ধুত্তোর গবেষণা, আসুন আমার সঙ্গে।' বলে এগোলাম। তাঁবুর ভেতর থেকে একটা কাঠের হাতুড়ি নিলাম। দ্বীপের পুবদিকে গিয়ে দেখলাম, চুকচুক করে জল টেনে বালির ওপর গা তাতাচ্ছে বুকসমান পেল্লায় কাঁকড়ার দল।

বিনা দ্বিধায় পিঠের ক্রিস্টালদর্পণ ভাঙতে লাগলাম হাতুড়ির ঘায়ে। এলোপাতাড়ি হাতুড়ি চালাতেই গোটা পঞ্চাশ কাঁকড়া এলিয়ে পড়ল বালিতে। তার বেশি পারলাম না। কেননা, ভাঙা কলকবজা লুঠ করার জন্যে প্রচণ্ড মারামারি লাগল বাকি কাঁকড়াদের মধ্যে। বালির ঝড় উঠল যেন ওদের হুটোপাটিতে। কিছুক্ষণ কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর বালির মেঘ থেকে বেরিয়ে এল আরও বড় কয়েকটা কাঁকড়া!

দেখলাম, এরা আগের কাঁকড়াদের চাইতে ভাল দৌড়বাজ! চটপটেও বটে। আকারে আমার চিবুক পর্যন্ত। হাতুড়ি দিয়ে মারবো কী, শুঁড় বা দাঁড়া ধরতে না ধরতেই ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে অসম্ভব গতিতে।

বেদম হয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ পরে। প্রফেসর তখনও মুখ কালো করে রয়েছেন। আলফোঁসের ওপর কাঁকড়াদের এত কৃপা কেন! রোদের তাতও খুব বেড়েছে। জলে ডুব দিয়ে ক্লান্তি কাটিয়ে উঠে এলাম। প্রফেসরকে নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুর কাছে।

কিন্তু তাঁবু কোথায়? তাঁবুর জায়গায় লণ্ডভণ্ড তেরপলের স্তূপ ছাড়া কিচ্ছু নেই। লোহার খুঁটি উদরস্থ করেছে কাঁকড়া কোম্পানি, তাঁবু গড়াগড়ি যাচ্ছে বালিতে। শুধু তাঁবু কেন, আমাদের শার্ট ট্রাউজার্সের, ধাতুর বোতাম, জিপ চেন পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে কাঁকড়ারা। ঘড়িটা পর্যন্ত হজম করেছে— ফেলে গেছে প্লাস্টিকের কেসটা!

দূরে বালির মধ্যে দিয়ে শুধু মুণ্ড বার করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বেচারি আলফোঁসে।

আচমকা কাঁটাঝোপ টপকে খোলা জায়গায় আবির্ভূত হল একটা দানবিক কাঁকড়া!

কাঁকড়া না বলে তাকে 'ইকথিওসরাস' বলা উচিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যেন সহসা এ-যুগে বেরিয়ে এল মূর্তিমান শয়তান। আকারে ছোটখাটো টিলা বললেই চলে। লম্বায় আমার মাথার সমান। কিন্তু চলন ভঙ্গিমাটা যেন কেমনতর! পলকা সামনের দাঁড়ার ওপর ঈষৎ ঝুঁকে পেছনের দেহটা টেনে আনছে সামনে—অনেকটা হামাগুড়ি দেওয়ার মত। পরক্ষণেই ঝাঁকুনি দিয়ে এগোচ্ছে খানিকটা পথ।

ক্রমবিবর্তনের নবতম নমুনা দেখে প্রফেসরের চোয়াল ঝুলে পড়ল! ক্ষিপ্র, বেগবান, শক্তিমান কাঁকড়া আশা করেছিলেন তিনি, এমন জবুথুবু মেশিন তো চাননি! এক্সপেরিমেন্ট এ কোন পথে চলেছে? বিবর্তনের বিপাকে পড়ে একি হাল হল তাঁর আশ্চর্য আবিষ্কারের?

ধুঁকতে ধুঁকতে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছিল বিরাট 'ইকথিওসরাস'। জল নেওয়ার মতলব বোধহয়। তাই আর তার দিকে নজর দিইনি। দিলে দুর্ঘটনাটা ঘটতে দিতাম না।

আমি দেখছিলাম প্রফেসরের শুকনো মুখখানা। গলা দিয়ে 'কুঁই, কুঁই' আওয়াজ বেরোচ্ছে। কণ্ঠটা ওঠানামা করছে আপনা থেকেই!

বিপুল মেশিনটা জলের ধারে পৌঁছোলো শম্বুকগতিতে। জলের ওপর শুঁড় নামিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। শুঁড়গুলো হাওয়ায় নাড়িয়ে যেন হালচাল বুঝতে চাইছে। কী যেন খুঁজে পাচ্ছে না!

পরক্ষণেই বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গেল ইকথিওসরাস। এত তাড়াতাড়ি মোড় নিল যে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না কী তার মতলব। তারপরেই ধনুক থেকে ছিটকে যাওয়া তিরের মতই সাঁ করে ছুটে গেল ঘুমন্ত আলফোঁসের সামনে।

আঁতকে উঠলাম আমি। তিন লাফে হাজির হলাম দানবযন্ত্রের সামনে। কাঁকড়া কিন্তু ততক্ষণে শুঁড় বুলোচ্ছে আলফোঁসের মুখের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বালির মেঘ উড়ল যেন। ধড়মড়িয়ে বালির মধ্যে থেকে লাফিয়ে উঠেছে আলফোঁসে। আমি দুহাতে কাঁকড়ার দুটো শুঁড় চেপে মুচড়ে দিলাম। শুঁড় মানে পেতলের ফ্লেক্সিবল পাইপ। কিন্তু বাকী দুটো শুঁড় চক্ষের নিমেষে আলফোঁসের গলা পেঁচিয়ে ধরে তুলে ফেলল শূন্যে। দেখলাম, আলফোঁসের চশমা ঠিকরে গেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে!

ঠেলে উলটোতে গেলাম কাঁকড়াকে, পারলাম না। হাতুড়ি নিয়ে থামের মতো পা ধরে উঠে পড়লাম পিঠের ওপর। দুহাতে হাতুড়িটা মাথার উপর তুলতেই দেখলাম আলফোঁসের লাল টকটকে শীর্ণ মুখ কাঁকড়ার মুখের সামনেই উপস্থিত হয়েছে। এমন সময়ে রোদ্দুর ঝিলিক দিয়ে উঠল স্টেনলেস স্টীলের দাঁতে।

দাঁত! ইস্পাতের দাঁত!

নিমেষমধ্যে পরিষ্কার হয়ে এল ধাঁধার রহস্য। বিদ্যুৎচমকের চাইতেও কম সময়ের মধ্যে বুঝলাম কেন আমাদের ছেড়ে আলফোঁসেকে তেড়ে গেছে কাঁকড়ারা! দাঁত, স্টীলের দাঁত! ওইটুকু ইস্পাতও চাই বুভুক্ষু কাঁকড়াদের।

রহস্য পরিষ্কার হল শেষ মুহূর্তে। কেন না, পলকের মধ্যে আমার হাতুড়ি নেমে এল ক্রিস্টাল-আরশির ওপর—চুরমার হল সিলিকন ব্যাটারি!

ভয়ংকর ইলেকট্রিক স্পার্কটা ঠিক সেই সময়ে হিস্ করে বেরিয়ে এল শুঁড় দিয়ে—পুড়ে কালো হয়ে গেল আলফোঁসের চোখ, মুখ, কপাল!

ধড়াম করে বালির ওপর আছড়ে পড়ল বিকল কাঁকড়া—সেইসঙ্গে আলফোঁসের প্রাণহীন দেহ!

তেরপল নিয়ে মুড়ে কবর দিলাম আলফোঁসেকে। ডায়মণ্ড বেচারি করুণভাবে কাঁদতে লাগল মনিবের সমাধি ভূমিতে।

কুকুরটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল এই ক'দিনে। দু'হাতে কোলে তুলে নিলাম ওকে। লম্বা লম্বা লোমের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আদর করতে গিয়ে হাতে ঠেকলো একগাছি সুতো! লোমে ঢাকা পড়ে গেছে সুতোটা। সুতো দিয়ে গলার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ছোট্ট একটা কবজ। ধাতুর নয়—প্লাস্টিকের।

প্লাস্টিকের কবচ! কৌতূহল হল। সুতো ছিঁড়ে খুলে আনতেই দেখলাম কবচ নয়—একটা চ্যাপটা কৌটো। ভেতরে মিহি কাগজে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে কী যেন লেখা!

প্রফেসরও দেখলেন। ফরাসি ভাষা তিনি জানতেন। চোখ বুলিয়েই দু'চোখ কপালে তুলে বসে পড়লেন বালির ওপর।

'আলফোঁসে! স্পাই!'

স্পাই? আলফোঁসে স্পাই? ধীরে ধীরে ফরাসি লিপির মানে জানলাম প্রফেসরের মুখে। জানলাম, প্রফেসরের কাঁকড়া এক্সপেরিমেন্টের মূল উদ্দেশ্য। জানলাম, কেন ইন্ডিয়ান নেভি আস্ত একটা জাহাজে এত খরচপত্র করে প্রফেসরকে মালপত্রসমেত নামিয়ে দিয়ে গেছে বিজন এই দ্বীপে। জানলাম, কেন আঠার মতো প্রফেসরের পেছনে লেগে থেকেছে আলফোঁসে এবং কেনই বা দ্বীপের মাঝে কাঁটাঝোপের ভেতর পুঁতে রেখেছে আস্ত একটা কাঁকড়া মেশিন!

আলফোঁসে গুপ্তচর! ভারত মহাসাগরের ডিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে বিদেশি রাষ্ট্রের নৌ-ঘাঁটি বসছে, এ খবর সকলেরই জানা। ফলে টনক নড়েছে প্রত্যেকের। পশ্চিমে কয়েকটা রাষ্ট্র তাই গুপ্তচর মোতায়েন করেছে ইন্ডিয়ায়। ডিয়েগো গার্সিয়ার সামরিক আয়োজন পণ্ড করার জন্যেই কি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে পাঠাচ্ছে বিজন দ্বীপে গোপন এক্সপেরিমেন্টের জন্যে? ভারত সরকারের আসল উদ্দেশ্য কী, তা জানা নেই, হয়ত প্রফেসরের কাঁকড়া মেশিন দিয়ে খনি থেকে বিনা খরচে ধাতু তুলে আনত। অথবা অন্য কোন সমাজসেবায় কাঁকড়াকে নিয়োগ করা হত। কিন্তু তার উলটো অর্থ করে সন্দিগ্ধ রাষ্ট্রা আলফোঁসের মতো বৈজ্ঞানিককে হাত করল টাকা দিয়ে— পাঠাল প্রফেসরের সহযোগী বানিয়ে!

ডায়মণ্ডের লোমের তলায় লুকোনো প্লাস্টিক কৌটোয় এক্সপেরিমেন্টের সমস্ত বৃত্তান্ত লিখে রেখেছে আলফোঁসে! লুকিয়ে রেখেছে একটা কাঁকড়া মেশিন বালির তলায়। একুশ

দিন পর দ্বীপ ছেড়ে সবাই চলে যাওয়ার পর সে আবার আসত, কাঁকড়া নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসত ডিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে। পৃথিবীর নানান জায়গায় শত্রু ঘাঁটির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হত তাদের জাতভাইদের। সর্বনাশ হত পৃথিবীর ধাতুভিত্তিক সভ্যতার! দুর্ভেদ্য সাবমেরিন, জাহাজ, বোমারু বিমান মুছে যেত পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে! প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে হত মানুষ জাতটাকে! শুধু একটি কাঁকড়ার জন্যে ব্যর্থ হত লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন আর সভ্যতা। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় তা নয়। তাই পৃথিবীবাসীরা বেঁচে গেল শুধু একটি দাঁতের জন্যে! শুধু একটি দাঁত! ইস্পাতের তৈরি বাঁধানো দাঁত!

এরপর কীভাবে অনাহারে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে দ্বীপে পড়েছিলাম আমি আর প্রফেসর, সে বর্ণনা দিতে চাই না। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জলে মুখ ডুবিয়ে রোদে-পোড়া চামড়া ঠান্ডা করতাম। শেষকালে ভুল বকতে লাগলেন প্রফেসর। আমিও মড়ার মতো পড়ে রইলাম বালির ওপর। জানি না কতদিন পরে একটা ছায়া এসে পড়ল আমার চোখে। দেখলাম, বিশাল একটা কাঁকড়া আমার পাশে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে দূর সমুদ্রে।

ডায়মণ্ডকে, আমাকে আর মৃতপ্রায় প্রফেসরকে ধরাধরি করে তোলা হল জাহাজের নৌকোয়। খালাসিরা অবশ্য বলেছিল, কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রটাকে নৌকোয় তুলতে হবে কিনা।

আমি রাজি হইনি।
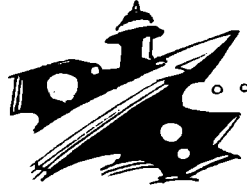
উড়ন্ত গোলার জ্বলন্ত কাহিনি

এক

প্রথমে মনে হয়েছিল, মঙ্গলগ্রহ নিজেই এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে।

লালমতো ফুটকিটা বড় হয়েই চলেছিল। তারার চুমকিবসানো আকাশে সে-এক অদ্ভুত দৃশ্য।

তারপরেই বুঝলাম, মঙ্গলগ্রহ নয়। মঙ্গলগ্রহ কখনও একটার বেশি হয় না। কিন্তু আকাশে দেখা যাচ্ছে গোটাপাঁচেক লাল ফুটকি! ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ফুটকিগুলো। দেখতে দেখতে এগিয়ে এল আরও কাছে। এবার স্পষ্টই দেখলাম, আগুনের গোলা খসে পড়ছে আকাশ থেকে সমুদ্রের দিকে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে গোলা ঘিরে।

জাহাজের ডেকে আমার পাশে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। ফোকলা মুখে মাড়ির সে কী বাহার।

কিছুক্ষণ পরেই প্রথম গোলাটা আছড়ে পড়ল জলে। হু-উ-উ-শ করে জল ছিটকে উঠল শূন্যে। যেন জলস্তম্ভ সৃষ্টি হল চোখের সামনে। বাষ্প উড়ে গেল আকাশে। ফোয়ারার মতো জল নেমে এল সাগরে।

দেখলাম আগুনের মতো গোলাটা জলে তলিয়ে গিয়েছে। জলে তখনও বুদবুদ উঠছে। তোলপাড় জল আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল।

একইভাবে পরপর আরও চারটে আগুনের গোলা আছড়ে পড়ল জলে। কী আশ্চর্য! পড়ল একই জায়গাতে!

হাঁ বন্ধ করে প্রফেসর শুধু বললেন, 'দীননাথ, কী ভয়ংকর এরা!'

আমি বললাম, 'কারা?'

উনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

ঘটনার শুরু আরও আগে।

ভারত মহাসাগরে একটি জাহাজ চলেছে ১৫ অক্ষাংশ বরাবর। জায়গাটা জাভা আর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি। এমন সময়ে দেখা গেল একঝাঁক উড়ন্ত গোলা জ্বলন্ত অবস্থায়। একে একে গোলাগুলো জলে ঝাঁপ দিল, জলস্তম্ভ সৃষ্টি হল, তারপর সব শান্ত হয়ে গেল।

জাহাজের ক্যাপ্টেনের মুখে সে কাহিনি শুনল একজন সাংবাদিক। কাগজে বেরুল ছোট্ট খবরটা। যাদের চোখে পড়ল, তারা নাক সিঁটকে শুধু বলল, 'আষাঢ়ে গল্প!' কেউ কেউ বললে, 'অমন ঘটনা সমুদ্রে হামেশাই ঘটে! সমুদ্র এখনও রহস্যময়।'

মাসখানেক পরে উড়ন্ত গোলা আবার দেখা গেল আর এক সাগরে। তারপর আবার। আবার। আবার। পৃথিবীর সব সাগরেই নাকি জ্বলন্ত গোলা খসে পড়ছে আকাশ থেকে। পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। পড়েই তলিয়ে যাচ্ছে। আর উঠছে না। অশান্ত আটলান্টিক, ভারত মহাসাগরের বহু স্থানে আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল এমনি উড়ন্ত গোলা।

কিছুদিন পরেই বেরুল আরও একটি আশ্চর্য খবর! উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে উড়ছিল একটা মার্কিন বোমারু বিমান। পাইলটের মনে দিব্বি ফুর্তি। এয়ারপোর্ট আর বেশি দূরে নেই। প্লেন নামিয়ে ওমলেট আর ব্র্যান্ডি খেয়ে টান টান হয়ে যাবে। শিস দিচ্ছে পাইলট। ঠিক এমনি সময়ে আকাশের বুকে দেখা গেল একঝাঁক উড়ন্ত গোলা।

অসম্ভব বেগে এগিয়ে আসছিল পাঁচ-পাঁচটা জ্বলন্ত গোলা। একটার পর একটা। দূর থেকে মনে হল যেন আগুনের মালা খসে পড়ছে মহাশূন্য থেকে।

দেখেই চমকে উঠল পাইলট। সাগরে সাগরে উড়ন্ত গোলা নামার অনেক গল্পই ইদানীংকালে আসছিল। ভেবেছিল সবই আজগুবি গল্প। মাঝখানে উড়ন্ত পিরিচ বা ফ্লাইং সসারের হিড়িক পড়েছিল। গুলপট্টির কম্পিটিশন শুরু হয়ে গিয়েছিল যেন। এবার আরম্ভ হয়েছে উড়ন্ত গোলার কেচ্ছা।

কিন্তু চোখের সামনে পরপর পাঁচটা গোলাকে তারই বিমান লক্ষ্য করে ধেয়ে আসতে দেখে ভড়কে গেল পাইলট বেচারি। বিমানের স্পিড বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি সরে এল উড়ন্ত গোলার গতিপথ থেকে। এসে দেখল, আশ্চর্য কাণ্ড। উল্কার বেগে থেকেই নামতে নামতে আপনা থেকেই যেন স্পিড কমে আসছে উড়ন্ত গোলাগুলোর। সাগরের ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা ধেয়ে গিয়ে প্রথম গোলাটা আছড়ে পড়ল জলে। জলস্তম্ভ আর বাষ্প হু-উ-উ-শ করে ঠিকরে গেল আকাশে। যেন তুফান সৃষ্টি হল। পরপর এমনি তুফান হল চারবার। চারটি গোলা তলিয়ে গেল জলে।

শেষ গোলাটি যখন নামছে জল লক্ষ্য করে, হঠাৎ দুর্বুদ্ধি গজাল পাইলটের মগজে। প্লেন নিয়ে চক্রাকারে ঘুরছিল সে। একই লাইনে উড়ন্ত গোলা দেখে আচমকা ইচ্ছে হল মিসাইল ছোড়ার। মিসাইল মানে ক্ষেপণাস্ত্র। যা কিনা বিমানের মতোই নিজে থেকে উড়ে গিয়ে বিস্ফোরিত হবে লক্ষ্যবস্তুর ওপর।

বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর অস্ত্রটা উড়ে গেল বোমারু বিমান থেকে। সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনের গোলার ওপর। বিস্ফোরণটা ঘটল সঙ্গে সঙ্গে।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল বিস্ফোরণের ধরন দেখে। অনেক বিস্ফোরণ সে দেখেছে। বিস্ফোরণ মানেই লক্ষ্যবস্তু পাউডারের মতো গুঁড়িয়ে যাবে। টুকরোগুলো ছিটকে যাবে দিকে দিকে।

কিন্তু আগুনের গোলার ওপর মিসাইল গিয়ে ফাটতেই অন্য কাণ্ড দেখা গেল। দেখতে দেখতে যেন ফুলে উঠল গোলাটা। সাবানের বুদবুদে ফুঁ দিলে যেমনি বড় হয়, ঠিক

তেমনিভাবে ফুলে-ফেঁপে বিশাল হল! তারপর যেন কুয়াশার মতো পাতলা হয়ে এল। সেকেন্ড কয়েক পরে তাও মিলিয়ে গেল। রইল না কিছুই।

বোমারু বিমানটার ওপর ওই কুয়াশার একটা ঝাপটা এসে পড়েছিল। আচমকা প্লেন টলমল করে উঠে গোঁৎ খেয়ে নামতে লাগল নীচে। ব্যাপার কী দেখতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল পাইলটের। কী এক রহস্যজনক কারণে প্লেনের আধখানা ডানা যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে!

অদ্ভুত কুয়াশার ছোঁয়া লেগেই ডানাটা অদৃশ্য হল কিনা, ভাববার সময় আর ছিল না। ইজেকটরের সাহায্যে পাইলট বেচারি শূন্যে ঝাঁপ দিল প্যারাসুট নিয়ে।

কখনও উত্তর গোলার্ধে, কখনো দক্ষিণ গোলার্ধে একই কাণ্ড ঘটে চলল কয়েক মাস অন্তর অন্তর। চোখে পড়ল অনেকের। কেউ ফলাও করে বলল, কেউ বলল না। কোথাও কাগজে বেরুল, কোথাও বেরুল না। দু'-একবার রেডিয়োতে শোনা গেল এমনি ঘটনা। নানারকম কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল চারদিকে। কেউ দোষ দিল ক্রেমলিনকে, কেউ বলল, আরে না, এ হল ওয়াশিংটনের নতুন এক্সপেরিমেন্ট, সুপার-স্পাই রকেট। আরেক দল ব্যঙ্গের হাসি হাসল। তাদের মতে পিকিংয়ের কথা কেউ ভাবছে না হে। গণ্ডগোলটা সেখান থেকেও তো হতে পারে। রাজনীতিবিদরা গোঁফ চুমরে মস্ত মস্ত 'সামিট' বৈঠকের ব্যবস্থা করে ফেললেন। বিস্তর ইস্তাহারও ছাপা হল রাষ্ট্রসংঘ থেকে। সবারই মুখে শান্তির বাণী। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! একী অন্যায় কাণ্ড। সাগরে সাগরে আগুনের গোলা ফেলতে থাকলে মাছের সাম্রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে না? তারাও তো কেষ্টর জীব! রেডিয়ো অ্যাকটিভিটি খুব খারাপ জিনিস। মাছ তো যাবেই। তারপর সেই বিষাক্ত ঢেউ এসে লাগবে নানান মহাদেশের উপকূলে। কে তখন ঠেকাবে মড়কের ঠেলা?

জল্পনা-কল্পনা যখন উঁচু মহলে বেশ গরম গরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই আরেকটি ঘটনা ঘটল আরেক সাগরে।

ওয়েডেল সাগরের দক্ষিণে বুভেন দ্বীপপুঞ্জের কাছে টহল দিচ্ছিল একটা মার্কিন রণপোত। কী কারণে টহল দিচ্ছিল, অত্যন্ত গুহ্য সামরিক কারণে তা জানা যায়নি। তবে যা ঘটল, তা এই—

দিনদুপুরে একঝাঁক উড়ন্ত গোলার চেহারা দেখা গেল আকাশে! এক-আধটা নয়, মূর্তিমান বিভীষিকার মতো দূর আকাশে সাত-সাতটা রক্তবর্ণ ফুটকি দেখেই শিকারী বেড়ালের গোঁফ চাড়া দেওয়ার মতোই মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। দূরবিন দিয়ে দেখা গেল, ফুটকিগুলোর কেন্দ্রবিন্দু সত্যিই লাল। চারপাশ ঘিরে জ্বলছে আগুন। এ কী ধরনের আকাশযান?

দেখতে দেখতে গোলাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল নীল আকাশে। শুধু চোখেই দেখা গেল সারি বেঁধে নামছে তারা। নামছে তির্যক রেখায়।

হঠাৎ কুবুদ্ধি গজাল ক্যাপ্টেনের মাথায়। গোলাগুলো যেদিক দিয়ে আসছে, জাহাজও চলছে সেইদিকে। একটু পরেই জাহাজের মাথার ওপর দিয়ে একে একে ওরা ডুব মারবে সাগরে। কাজেই একটু নষ্টামি করতে ক্ষতি কি? রণপোত ডিঙিয়ে কাউকে যেতে দেওয়া সমীচীন নয়।

পাঁচটা 'গাইডেড মিসাইল' ছোড়বার হুকুম দিল ক্যাপ্টেন। তিন সেকেন্ড অন্তর অন্তর পাঁচ-পাঁচটা ক্ষেপণাস্ত্র সাঁ সাঁ করে ছুটে গেল রণপোত থেকে। 'গাইডেড মিসাইল' ফসকায় না। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা আগুনের গোলা একে একে ফুলে-ফেঁপে কুয়াশার মতো হয়ে মিলিয়ে গেল শূন্যে। বাকি দুটো সহসা মোড় নিল! আশ্চর্য বেগে শূন্যপথে বাঁক নিয়ে উধাও হল আকাশে।

আগুনের গোলা দরকার হলে যে চম্পট দিতে পারে, এবার তাও জানা গেল। সুতরাং আবার শুরু হল জল্পনা-কল্পনা। চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। যারা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেছিল, 'আগুনের গোলা নিয়ে মাথা ঘামায় উজবুকের দল, ওগুলো আসলে উল্কার ঝাঁক', তাদের মুখ এবার চুন হল। টিটকিরি শুনতে হল। উল্কা কি তাড়া খেয়ে পিটটান দেয়? জ্যান্ত উল্কা নাকি? ভাবিত হল বৈজ্ঞানিকরা, ব্যাপারটা আর তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাংবাদিকরা এই মওকায় দিস্তে দিস্তে প্রবন্ধ লিখে ফেলল। টেলিভিশন বাজার মাত করল 'রহস্যজনক উল্কা পতনের' রোমাঞ্চকর ছবি দেখিয়ে। দু'-চারটে ছায়াছবিও ঝটপট তোলা হল একই বিষয় নিয়ে। সেসব ছবিতে দেখা গেল, গেঁড়িগুগলির মতো চেহারাওয়ালা দৈত্যাকার জীবেরা নামছে উড়ন্ত গোলা থেকে। ঝাঁকে ঝাঁকে ডানা মেলে তারা উড়ছে পৃথিবীর ওপর। দখল করে নিচ্ছে সবকিছু, না পারলে মুখের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

মোটের ওপর দেশে দেশে যেন সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মহাশূন্য থেকে কারা নামছে সাগরে সাগরে, তাই নিয়ে সায়েন্স ফিকশন লেখকরা বেশ কয়েকখানা পাঁজির মতো মোটা উপন্যাস লিখে ফেলল। কিন্তু সুরাহা হল না কিছুই।

কেননা অব্যাহত রইল আশ্চর্য উল্কাদের খসে পড়া। তবে মার্কিন রণপোত ক্যাপ্টেনের দেখাদেখি বেশ কয়েকটা উড়ন্ত গোলককে 'গাইডেড মিসাইল' দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে দেওয়া হল। স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ আর কেরোলাইন দ্বীপপুঞ্জের কাছে এমনি ঘটনা ঘটল বেশ কয়েকবার। প্রতিবারেই 'গাইডেড মিসাইল' ফেটে পড়তেই আগুনের গোলারা বিশাল কুয়াশার মেঘ হয়ে মিলিয়ে গেল। বাকিরা চোঁ চোঁ চম্পট দিল উলটোদিকে।

রাষ্ট্রসংঘের টনক নড়েছিল অনেক আগেই। এবার চুল খাড়া হয়ে গেল বৈজ্ঞানিকদের। সবাই যখন দিশেহারা ঠিক তখনই তলব পড়ল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের।

রোজকার মতো সকালে বাজার যাচ্ছিলাম। রোজকার মতোই দেখলাম, উঠোনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন প্রফেসর। আমাকে দেখেই হেঁকে উঠলেন, 'ও দীননাথ, শুনছ?'

বললাম, 'অত চেঁচাচ্ছেন কেন? আমি কালা নাকি?'

উনি বললেন, 'রাগ করছ কেন? আমেরিকা যাবে?'

আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'আগে বাজারে যাই।'

উনি বললেন, 'ঠাট্টা নয় দীননাথ। উড়ন্ত গোলাগুলোর কীর্তিকলাপ সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই ডাক পড়েছে আমার।'

'আপনার?' ভুরু কুঁচকে বললাম, 'কোথায়?'

উনি ইতি-উতি তাকিয়ে খাটো গলায় বললেন, 'কাছে এসো বলছি।'

সেদিন প্রফেসর যা বলেছিলেন, তা সত্যিই ভয়াবহ। উড়ন্ত গোলা-রহস্যর কিনারা না

করতে পারলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে কোনও মুহূর্তে লাগতে পারে। তাই বিশ্বের শান্তিকামী মোড়লরা এক বিশ্বসভা ডেকেছেন আমেরিকায়। সেখান থেকেই জাহাজে করে ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে যাওয়া হবে এমন এমন জায়গায় যেখানে উড়ন্ত গোলাদের উপদ্রব চরমে পৌঁছেছে। চাক্ষুষ দেখানো হবে মহাশূন্যের বিভীষিকাদের। তারপর?

তারপর কী হল, এ কাহিনির শুরুতেই তা বলেছি।

একে একে উড়ন্ত গোলারা জলে ডুব মারল। দুই চোখ শামুকের মতো ঠেলে বার করে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। বুড়োকে এমন ভয় পেতে কখনও দেখিনি। চেহারায় ছিরিছাঁদ না থাকতে পারে, কিন্তু প্রফেসর হেঁজিপেঁজি লোক নন। নিজের ল্যাবরেটরিতে দিবারাত্র খুটখাট করে কলকবজা নেড়ে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার তিনি করেছেন যা বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এই সেদিনও তাঁর আবিষ্কার 'উড়ন্ত ছাতা' আর 'বামন করার রশ্মি' খোয়া যাওয়ায় টি টি পড়ে গিয়েছিল কলকাতায়। সেই মানুষটাকে অমন ঘাবড়ে যেতে দেখে আমি নিজেও ঘাবড়ে গেলাম।

এদিকে পিলপিল করে দেশ-বিদেশের তালেবর মানুষেরা এসে ছেঁকে ধরেছে প্রফেসরকে। দাড়িওলা রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক কসমোকভ বলে উঠলেন, 'মি. চক্কর, কী মনে হয় আপনার?' সঙ্গে সঙ্গে নোবেল প্রাইজ পাওয়া মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী একগাল হেসে বললেন, 'প্রফেসর চক্কর নিজেই বোধহয় চক্কর খাচ্ছেন!' তৎক্ষণাৎ চৈনিক বৈজ্ঞানিক বললেন, 'নো ম্যান, নো, উনি ভাবছেন।' আরও অনেকে অনেক কথা বলতে লাগল। কান ঝালাপালা হবার উপক্রম হল কিচিরমিচির আওয়াজে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তখন তাঁর ছেঁড়া পাঞ্জাবির পকেট থেকে বার করলেন তাঁর বিখ্যাত 'সঞ্জীবনী নস্যি।' নাকের ফুটোয় দু' টিপ নস্যি ঠেসে দিতেই ব্রেনটা বিলকুল সাফ হয়ে গেল। তখন এমনভাবে ইতিউতি তাকালেন যেন একদল পোকামাকড় তাঁকে ঘিরে ধরেছে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে এবার বেরুল একটা ভাঁজ-করা প্ল্যাস্টিক ম্যাপ। খুলতেই দেখা গেল ম্যাপটা পৃথিবীর। ডেকের ওপরেই ম্যাপ বিছিয়ে ধরে প্রফেসর বললেন, 'কী দেখছেন?'

কে যেন বলে উঠল, 'ম্যাপ।'

'আর কী দেখছেন?'

এবার সবারই চোখে পড়ল লাল লাল ফুটকিগুলো। সমস্ত ম্যাপ জুড়ে যেন মাকড়শার জাল বিছানো। সবক'টা মহাদেশ ঘিরে লাল ফুটকির জাল ফেলেছে সাগরের জলে।

প্রফেসর বললেন, 'আপনারা অন্ধ। তাই চোখ থেকেও চোখের ব্যবহার করেননি। এবার দেখুন আজ পর্যন্ত যত উড়ন্ত গোলা পৃথিবীতে নেমেছে, তার প্রত্যেকটিতে এই ম্যাপে দেখানো হয়েছে। কোথায় কোথায় নেমেছে, তা লাল ফুটকি দিয়ে দেখিয়েছি। লক্ষ করলেই দেখবেন, উড়ন্ত গোলারা শুধু জলেই পড়েছে, একটিও ডাঙায় পড়েনি। জল যেখানে সবচাইতে গভীর, সাগরের সেই অঞ্চলেই এরা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমেছে— অগভীর অঞ্চলে একটি গোলাও নামেনি। এ থেকে কী প্রমাণিত হয় জানেন?' বলে আর এক টিপ

সঞ্জীবনী নস্য নিলেন প্রফেসর, 'এর মানে যেমন সোজা, তেমনি ভয়ংকর। উড়ন্ত গোলারা নিশ্চয় আসছে পৃথিবীর বাইরে থেকে। এরা গভীর জলে নামছে, কেননা সেখানে জলের চাপ খুব বেশি। প্রতি বর্গইঞ্চিতে এক টন থেকে চার-পাঁচ টনের মতো চাপ পড়ছে সমুদ্রের তলায়। এই প্রচণ্ড চাপ সইতে পারে যারা তারাই আসছে পৃথিবীর বাইরে থেকে এমন এক মহাকাশযান নিয়ে, যা আমরা এখনও কল্পনাতেও আনতে পারি না।'

একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিক টিটকিরি দিল, 'মসিঁয়ে কি গাঁজাখুরি সায়েন্স ফিকশন লেখেন?'

কটমট করে প্রফেসর তাকালেন সেদিকে। খাঁটি বাংলায় বললেন, 'অর্বাচীন ছোকরা!' তারপরেই ইংরেজিতে বললেন, 'মঁসিয়ে কি খবর পড়েননি, গাইডেড মিসাইল যেসব উড়ন্ত গোলাকে ধ্বংস করেনি, তারা উলটোদিকে পাঁইপাঁই করে পালিয়েছিল?'

অর্বাচীন ফরাসি বৈজ্ঞানিকটি ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে কী যেন বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই এক দাবড়ানি দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'এরা উল্কা নয়। উল্কা হলে ডাঙাতেও পড়ত। তা ছাড়া মহাশূন্যের যে-অঞ্চল দিয়ে পৃথিবী এখন যাচ্ছে, সেখানে উল্কার ঝাঁক হবার মতো কিছু নেই। সবচাইতে বড় কথা, তাড়া খেয়ে যারা পালায়, তারা পাথরের চাঁই নয়— জ্যান্ত জীব। সমুদ্রের অঞ্চলে নেমে এরা ঘাপটি মেরেছে। কী করছে, তা আমরা জানি না। সেখানে ওরা ক্রমশ দলে ভারী হচ্ছে, আর এখানে আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছি। জলের তলায় ওদের যদি দেখতে চান তো আসুন, আমার নয়া আবিষ্কার এই 'চক্রস্কোপ'কে জলে নামাই।'

বলে, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আমার হাত থেকে পেটমোটা ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে ভেতর থেকে একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্র বার করলেন।

দুই

যে যন্ত্রটা পেটমোটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ থেকে বার করলেন প্রফেসর, তা দেখে অনেকেই হেসে উঠল খুকখুক করে। হাসবারই কথা। পুরোনো লোহালক্কড় জোড়াতাড়া লাগালে যা হয়, যন্ত্রটাও যেন তাই। দেখতে এমন বিদঘুটে যে কহতব্য নয়। কিন্তু প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কেরামতি আমি ছাড়া আর কে জানবে। তাই যারা যারা ব্যঙ্গের হাসি হাসল ইচ্ছে হল তাদের মাথাগুলো ধরে ঠুকে দিই।

প্রফেসর কিন্তু অমায়িক হেসে বললেন, 'এই হল আমার 'চক্রস্কোপ'।'

'সেটা আবার কী?' দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলল এক হিপি-সাংবাদিক।

'আমার নাম অনুসারে এ যন্ত্রের নাম দিয়েছি 'চক্রস্কোপ'। সাগরের তলায় কী কাণ্ড চলছে যদি দেখতে চান তো 'চক্রস্কোপ'কে জলে নামিয়ে দিন। আজব এ যন্ত্রের মধ্যে আছে একটা কলের মানুষ। মানে, রোবট। সে যা দেখবে, ওপরে বসে আপনারাও তা দেখবেন সিনেমার মতো। সে যা বলবে, আপনারা তা শুনবেন লাউডস্পিকারে।'

'বুঝলাম। কিন্তু এইটুকু যন্ত্র কি অত কাজ করতে পারবে?' টিপ্পনি কাটল সাংবাদিক।

প্রফেসর মুখে কিছু বললেন না। ফোকলা হাসি হেসে যন্ত্রটায় একটা চাবি লাগিয়ে বারতিনেক মোচড় দিলেন। ব্যাস! সঙ্গে সঙ্গে যেন ম্যাজিক আরম্ভ হয়ে গেল ডেকের ওপর।

ঝন, ঝন, খটাং, ক-র-র-র, হু-উ-উ-শ ইত্যাদি নানানরকম আওয়াজ শোনা যেতে লাগল 'চক্রস্কোপে'র মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন জাদুমন্ত্রবলে আপনা হতেই নড়তে লাগল যন্ত্রটা। নস্যির ডিবের মতো একটা কৌটো দেখতে দেখতে টেলিস্কোপের মতো সাঁ সাঁ করে লম্বা হয়ে গেল। টেনিস বলের মতো একটা বল ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করতে করতে ফুলতে লাগল। দেখতে দেখতে গজখানেক উঁচু একটা গোলক তৈরি হয়ে গেল চোখের সামনে। এবার স্পষ্ট দেখা গেল গোলকের চারিদিকে চারটে গোল গোল কাচের জানলা। ভেতরে আলো জ্বলছে। মর্কটের মতো কিম্ভূতকিমাকার একটা লোহার মানুষ চেয়ারে বসে অদ্ভুত অদ্ভুত কলকবজা টিপছে।

প্রফেসর হেঁকে উঠলেন, 'ঘটোৎকচ, শুনতে পাচ্ছ?'

হেঁড়ে গলা ভেসে এল গোলকের গা থেকে, 'ইয়েস, বস।'

'কলকবজা সব চালু আছে?'

'ইয়েস, বস।'

প্রফেসর এবার আমাকে বললেন, 'দীননাথ রেডি?'

'ইয়েস, বস', বললাম আমি। বলে ঝট করে প্লাস্টিকের ভাঁজ-করা সাদা পরদা খাটিয়ে ফেললাম ডেকের ওপর। ব্যাগ থেকে বার করলাম তারের বান্ডিল। তারের দু' মুখে দুটো প্লাগ। একটা প্লাগ লাগালাম 'চক্রস্কোপে'র মাথায়। আর একটা প্লাগ লাগালাম বিচিত্র টেলিস্কোপের পেছনে। তারপর টেলিস্কোপটা পরদার দিকে ফিরিয়ে ধরতেই রঙিন ছবি ভেসে উঠল পরদায়। দেখা গেল প্রফেসরের খ্যাংরাকাঠির মতো চেহারা, কসমোকভের দাড়িওলা মূর্তি, এমনকী আমাকেও।

প্রফেসর বললেন, 'ঘটোৎকচ, মানে কলের মানুষ আমাদের দেখছে। পরদাতে তারই ছবি দেখছেন। ঠিক এইভাবে ঘটোৎকচ জলের নীচে যাদের দেখবে, তাদেরও আপনারা পরদায় দেখবেন।' বলে আর কথা না বাড়িয়ে 'চক্রস্কোপে'র দিকে ফিরে বললেন, 'ঘটোৎকচ, নাউ ফ্লাই।'

বলতে না বলতেই ঘটোৎকচ একটা বোতাম টিপে দিল। অমনি সবার পিলে চমকে দিয়ে 'চক্রস্কোপ' নিঃশব্দে শূন্যে উড়ল অবিকল ফানুসের মতো। ডেকের রেলিং টপকে গিয়ে পড়ল জলে। পড়েই তলিয়ে গেল।

তারের গোছা আমার হাতে। আমি তার ছাড়ছি আর 'চক্রস্কোপ' ডুবছে। যত ডুবছে, ততই হাত থেকে তার বেরিয়ে যাচ্ছে। আর পরদার গায়ে আশ্চর্য আশ্চর্য ছবি ভেসে উঠছে।

প্রথমে দেখা গেল 'ম্যাকরেল' মাছের একটা ঝাঁক। রুপোলি ঢেউ তুলে তারা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। শুনেছি 'ম্যাকরেল' মাছের একটা দল নাকি একবার সমুদ্রের পঞ্চাশ মাইল জায়গা

জুড়ে চলেছিল। ‘চক্রস্কোপ’ এদের এলাকা ছাড়িয়ে ডুব মারতেই দেখা গেল অন্য দৃশ্য। ‘প্ল্যাঙ্কটন’ ভাসছে ধুলোর মেঘের মতো। এরা মাছের খাদ্য। তাই ম্যাকরেল মাছের এত ভিড় এখানে। ‘চক্রস্কোপ’ নামছে। আরও নামছে। পরদার জলের তলার দৃশ্য পালটে যাচ্ছে সিনেমার পটপরিবর্তনের মতো। রঙিন মাছ। ঝিলমিলে মাছ। আধ মাইল নীচে পৌঁছে দেখা গেল অতিকায় ‘স্কুইড’ চলেছে দশ হাত নেড়ে।

আর সামনে বকবক করে চলেছে ঘটোৎকচ, মানে, কলের মানুষ। হেঁড়ে গলায় বলছে, ‘স্যার, এই গেল স্কুইডের ফ্যামিলি। এখন ঠিক আধ মাইল। জল বেশ শান্ত। ওকি? ওটা কী? তিমি বলে তো মনে হচ্ছে না। প্রফেসর, এ মাছ আমি চিনতে পারছি না। আপনি চিনিয়ে দেন না কেন? এক মাইল নীচে নামলাম। স্যার, কি আশ্চর্য শান্ত জল। বড্ড অন্ধকার যদিও। আমার কপালের তৃতীয় নয়নের আলোয় সব অন্ধকার পালাচ্ছে। আলো বেরোচ্ছে মাছেদের গা দিয়েও। স্যার, মাছের ঝাঁক এখানে কম। প্রেসার মিটারে দেখছি জলের চাপ এখানে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক টন। বাসরে! কী শক্ত ওই চক্রস্কোপ! এত জলের চাপেও দুমড়ে যাচ্ছে না। ওকী! ওকী! ওটা কী! প্রফেসর! কী একটা জন্তু দূর থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে ‘চক্রস্কোপ’কে ঘিরে। এত দূরে রয়েছে যে আমার তৃতীয় নয়নের আলো সেখানে পৌঁছোচ্ছে না। জন্তুটা দেখতে কচ্ছপের মতো। কিন্তু কচ্ছপ কি কখনও ছোটখাটো পাহাড়ের মতো হয়?’

ঘটোৎকচ হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে বলে চলেছে, ‘আমরাও পরদায় দেখছি সাগরের তলায় আলোর বান ডেকেছে যেন। বহু দূরে আবছা ছায়ার মতো কি একটা বস্তু সরে সরে যাচ্ছে।’

ঘটোৎকচ চেঁচাচ্ছে, ‘স্যার, ছায়াদানবটা এ-জানালা থেকে সে-জানালায় সরে যাচ্ছে। এবার ওপর দিকে উঠছে। আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। ‘চক্রস্কোপে’র মাথার দিকে উঠে গেছে জন্তুটা। মতলব কী, ধরা যাচ্ছে না। আমি—’

আচমকা স্তব্ধ হল ঘটোৎকচের হেঁড়ে গলা। একই সঙ্গে মিলিয়ে গেল পরদার দৃশ্য।

আর সবাই যখন হতভম্ব, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তখন পাগলের মতো ‘কেবল’ টানছেন। এক মাইলের ওপর লম্বা তার সাগরের তলা থেকে টেনে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা সবাই জানতাম, কী দেখব। দেখব, কামড়ে ‘চক্রস্কোপে’র তার কেটে দিয়েছে ছায়াদানবটা। দেখব, ছেঁড়া দড়ির মতো আঁশ উঠে উঠে রয়েছে। কিন্তু টেনে-হিঁচড়ে তারের ছেঁড়া ডগা তুলে আনার পর যা দেখলাম, তাতে আক্কেল গুড়ুম হল সকলের।

তারের তামার অংশটুকু গলে গেছে। অর্থাৎ মাইলখানেক নীচে সাগরের তলায় তীব্র অগ্নিশিখা দিয়ে কেউ তার গলিয়ে কেটে দিয়েছে। চক্রস্কোপ এখন তাদের খপ্পরে।

কিন্তু জলের নীচে আগুনের শিখা? মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল আমার।

প্রফেসর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, ‘ওরে আমার ঘটোৎকচ রে! তুই কোথায় গেলি রে...!’

এ-ঘটনা ঘটল পৃথিবীর এক গোলার্ধে। বৈজ্ঞানিকদের অনুরোধে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ল্যাবরেটরিতে ফিরে গিয়ে আবার একটা ‘চক্রস্কোপ’ তৈরি করলেন। দু’ নম্বর ঘটোৎকচও

বসল 'চক্রস্কোপে'র মধ্যে। ফলে, আদি ঘটোৎকচের শোক অনেকটা ভুললেন প্রফেসর। তারপর আমাকে নিয়ে রওনা হলেন পৃথিবীর আর এক গোলার্ধে।

এমন একটা জায়গায় আমাদের জাহাজ পৌঁছল যেখানে তিরিশ হাজার ফুট নীচে নেমেও সমুদ্রের তল পাওয়া যায় না। প্রশান্ত মহাসাগরের এমনি একটা অঞ্চলে বেশ কয়েক ঝাঁক উড়ুক্কু গোলাদের নামতে দেখা গিয়েছে। আমাদের অভিযান এবার সেই এলাকাতেই।

আবার জলে নামল 'চক্রস্কোপ'। দুরু দুরু বুকে আবার চাওয়া হল পরদার দিকে। আবার শোনা গেল জুনিয়র ঘটোৎকচের হেঁড়ে গলার ধারাবিবরণী। মাইল পাঁচেক নীচে নেমে দেখা গেল শুধু কালো জল আর ধূ ধূ শূন্যতা। যেন মহাশ্মশান গড়ে উঠেছে পাতালপুরীতে। জ্যান্ত প্রাণীর চিহ্নটি নেই! পাঁচ মাইল নেমেও প্রচণ্ড জলের চাপে তালগোল পাকিয়ে গেল না চক্রস্কোপ। ব্যাপার দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল বিজ্ঞানীদের। প্রফেসরের তখন সে কী হাসি?

তারপরেই যেন কী করে উঠল জুনিয়র ঘটোৎকচ, 'স্যার, স্যার কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। কালো কুচকুচে। কচ্ছপ-কচ্ছপ চেহারা। কিন্তু ঠিক যেন একটা টিলা। কচ্ছপ কি অতবড় হয়? ঘুরছে জন্তুটা। পাক দিচ্ছে চক্রস্কোপকে। উঠে যাচ্ছে ওপরে। আর দেখা যাচ্ছে না। আমি—।'

কথা আটকে গেল সহসা। সাদা হয়ে গেল পরদা। আবার তার কাটা গেছে।

পাঁচ মাইল লম্বা তার টেনে তোলা হল। কাটা জায়গাটা হাতে আসার পর দেখা গেল সেই একই কাণ্ড!

অর্থাৎ আগুনের শিখায় গলে কেটে গিয়েছে 'চক্রস্কোপে'র তার। ঘটোৎকচ এখন জলের নীচে। খুব সম্ভব সাগরতলের সেই বিভীষিকাদের খপ্পরে।

কিন্তু এরা কারা? জলের নীচে আগুন জ্বালায় কারা? তার গলায় কারা? গভীর সমুদ্রে এ কি চক্রান্তের শুরু?

চক্রান্ত যে রীতিমতো জটিল হয়ে উঠছে, তা টের পাওয়া গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। সাগরে সাগরে আরম্ভ হল নতুন উৎপাত। জাহাজডুবি।

হইচই পড়ে গেল গোটা পৃথিবীতে। এতদিন উড়ুক্কু গোলারা নিরীহ ছিল বলা চলে। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে। কিন্তু কখনও কারও ক্ষতি করেনি। বরং নিজেদের ক্ষতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই পাঁই পাঁই করে পালিয়েছে।

কিন্তু এবার শুরু হল জাহাজডুবি। আশ্চর্যভাবে একটার পর একটা জাহাজ ধ্বংস হয়ে চলল উড়ুক্কু গোলাদের এলাকায়। জাহাজডুবির মূলে যে তারাই, এটা সকলেই ধরে নিল, যদিও চোখে দেখল না।

প্রথম ঘটনাটা ঘটল ফিলিপাইনের কাছে। অভিযানে গিয়েছিল একটা আমেরিকান গবেষণা জাহাজ। না, আগুনের গোলাদের নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। গভীর সমুদ্রের হালচাল দেখা, তা মুভি ক্যামেরায় তুলে আনাই ছিল ওদের কাজ। বিচিত্র একটা ডুবোযান তাই নিয়েই ব্যস্ত। এরকম ডুবোযানের ছবি আজকাল হামেশা সিনেমায় দেখা যায়। চ্যাপটা উড়ন্ত পিরিচের মতো গড়ন। সামনে পেছনে সার্চলাইট। কাচের জানালায় চোখ দিয়ে বসেছে চালক। জল কেটে দিব্যি চলেছে ডুবোযান।

এরপর কী ঘটেছিল, তা কেউ জানে না। কিন্তু আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। আচমকা জলতলের নিঃসীম অন্ধকার ফুঁড়ে আবির্ভূত হল একটা বিশালকায় বস্তু। যেন জলন্ত ডুবোপাহাড়। তিমি? না। দানব কচ্ছপ? না। তবে কি?

চালক আর ভাববার সময় পেল না।

আচমকা চোখ ধাঁধিয়ে গেল অতি তীব্র বিদ্যুৎরশ্মিতে। তারপরেই সব অন্ধকার। ডুবোযানটিও দেখা গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

একই সঙ্গে প্রলয় ঘটল জলের ওপরে ভাসমান গবেষণা জাহাজে। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। লকলকে অগ্নিশিখার মতো দারুণ বিদ্যুৎবহ্নি গোটা জাহাজটাকে ঘিরে জ্বলে উঠল একবার... দু'বার... তিনবার!

পর মুহূর্তেই ঘটল বিস্ফোরণ।

অতবড় জাহাজটা গুঁড়িয়ে যেন ছাতু হয়ে গেল। টুকরো টুকরো অংশগুলো বহুদূর পর্যন্ত ছিটকে গেল শূন্যে। লণ্ডভণ্ড ভয়ংকর সেই দৃশ্যস্থলে পরে কতকগুলো পোড়া শব ভাসতে দেখা গিয়েছিল। কারও মুণ্ড নেই, কারও হাত নেই, কারও পা নেই...।

পরের জাহাজটা গেল এক ভারতীয় কোম্পানির। মালজাহাজ। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের কাছে সর্বশেষ বেতারবার্তা এল জাহাজের রেডিয়ো অপারেটরের কাছ থেকে। জলস্তম্ভের মতো কী যেন দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে। অথচ আবহাওয়া বিশারদরা বলছেন টাইফুনের চিহ্ন ধারেকাছেও নেই। তারপরেই আর্ত চিৎকার শোনা গেল রেডিয়োতে— 'ওটা কী? ওটা কী? ওঃ! কী সাংঘাতিক জোরে আসছে! বিদ্যুৎ? বিদ্যুৎ! বাঁচাও... বাঁ—!'

সব শেষ। মালজাহাজটা তারপর থেকে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে নিপাত্তা হল একটা যাত্রীজাহাজ। বড় জাহাজ। ডেকে সুইমিং পুল আছে। সিনেমা হল আছে। এমনকী ছোট্ট খেলার মাঠও আছে। রাত দশটা নাগাদ কেউ নাচছে নাচঘরে, কেউ ড্রিংক করছে পানাগারে, কেউ গা এলিয়ে দিয়েছে সিনেমা হলে। ঠিক এমনি সময়ে বিদ্যুৎ লকলক করে উঠল জাহাজ ঘিরে। বারবার কয়েক বার। তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। টন টন ছাই আর ভাঙাচোরা টুকরো ছড়িয়ে পড়ল বহুদূর পর্যন্ত।

সেই সঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড পোড়া লাশ।

এমনি ধরনের জাহাজ নিখোঁজের খবর যেন হঠাৎ বেড়ে গেল সারা পৃথিবীর সবক'টা কাগজে। কেউ বললে টাইফুনের কীর্তি, কেউ বললে নারে বাবা না, জলদস্যুর কারবার। আধুনিক হার্মাদের দল ছেয়ে ফেলেছে পৃথিবীটা। কেউ কেউ আরও রং চড়াল। নিশ্চয় এমন কোনও রাষ্ট্র এই অরাজকতার পেছনে রয়েছে যাদের মোদ্দা উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে দেশে লড়াই লাগিয়ে সবশেষে বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া। বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু প্রমাদ গুনলেন। একমাত্র তাঁরাই আঁচ করতে পেরেছিলেন কী ভয়াবহ সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে পৃথিবীবাসীদের।

তা না হলে অমন গণ্ডায় গণ্ডায় জাহাজডুবির পরেও যাদের টনক নড়েনি, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহসা খেপে যাবে কেন একটা ডেস্ট্রয়ার নিখোঁজ হওয়ায়? সামান্য একটা যুদ্ধজাহাজ বই তো নয়। নৌবহরের গায়ে আঁচড় লাগার কথাটি নয়। প্রশান্ত মহাসাগরে টহল দিতে দিতে গভীর জলের এলাকায় গিয়ে পড়েছিল রণতরীটি। তারপর কী ঘটেছিল

তা রহস্যাবৃত। কিন্তু যেন ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেল অতবড় ডেস্ট্রয়ারটা।

ফলে, রেগে তিনটি হল মার্কিন সামরিক দপ্তর। শোধ তুলবার পরিকল্পনাও হল অভিনবভাবে। বেশি কিছু নয়। একটিমাত্র অ্যাটম বোমা ফেলে দেওয়া হল জল যেখানে মাইলপাঁচেক গভীর, ঠিক সেই জায়গাটিতে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত যে ক'জন ছিলেন, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এবং এই অধম ছিল তাঁদের অন্যতম। সেদিন যে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলাম, তা বড় একটা দেখা যায় না।

পাঁচ মাইল নীচে জলের চাপ এমন প্রচণ্ড যে ইয়া মোটা লোহার চাদর তালগোল পাকিয়ে যায়। কাজেই ইস্পাতের মজবুত খোলের মধ্যে ভরা হল অ্যাটম বোমাটি, যাতে আগেভাগেই কলকবজা বিগড়ে না যায়। তারপর ধীরে ধীরে লোহার তারে বেঁধে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল বোমা। সবশেষে শুরু হল কাউন্টডাউন: দশ... নয়... আট... সাত... ছয়... পাঁচ... চার... তিন... দুই... এক।

জিরো আওয়ারে টেপা হল বোতাম। দূর থেকে দেখছি আমরা। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ জল শান্ত। তারপর জল যেন ফুলে ফেঁপে উঠল, টগবগিয়ে ফুটে উঠল; ফুটন্ত জল থেকে যেন লাফিয়ে উঠল মস্ত সাদা মেঘ... ছুটে গেল দিগন্ত পর্যন্ত। অশান্ত জল শত জলস্তম্ভের আকারে ঠেলে উঠল আকাশের দিকে। পর মুহূর্তেই দিকে দিকে ধেয়ে গেল টাইডাল ওয়েভ— বিশাল তরঙ্গরাশি। তারও অনেকক্ষণ পরে গুরুগম্ভীর গর্জন ভেসে এল কানে।

আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল সবকিছুই। বিস্ফোরণের এলাকার চারিদিকে হপ্তা কয়েক ধরে ভেসে এল পাহাড়প্রমাণ মরা মাছ আর বিচিত্র সাগর প্রাণীরা। আর সে কী পচা গন্ধ। রেডিয়ো অ্যাক্টিভিটির ভয়ে আতঙ্কিত হল সবাই। মাছের রাজ্যে এ কী অনাচার? মশা মারতে কামান দাগা? অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে খামোকা মৎস্যকুল ধ্বংস করা ধর্মে সইবে না। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!

কিন্তু মুখ চুন হল বৈজ্ঞানিকদের। অনেক আশা করা গিয়েছিল, অ্যাটম বোমার মার খেয়ে গভীর জলের বিভীষিকারা তেড়ে ফুঁড়ে জলের ওপর ভেসে উঠবে, নয়তো মরে পচে ছিটকে ছড়িয়ে যাবে।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! অতিকায় কচ্ছপের মতো যাদের দেখতে, তাদের কাউকেই দেখা গেল না জলের ওপর! বিস্ফোরণের প্রলয়লীলা দেখে বোধহয় মাস কয়েক তারা ভ্যাবাচাকা খেয়েছিল। জাহাজডুবিও বন্ধ ছিল। তারপরেই ঘটল নতুন অঘটন।

মার্কিন সামরিক দপ্তর আবার একটা অ্যাটম বোমা ফেলল প্রশান্ত মহাসাগরের সেই গভীর জলের অঞ্চলেই। সাগরের দিকে দিকে অ্যাটম বোমা ফেলে কাঁহাতক আর মাছ মারা যায়। জলও বিষিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এবার স্রেফ এক্সপেরিমেন্টের অজুহাতে আবার বোমা ফেলা হল একই জায়গায়।

কিন্তু সে বোমা ফাটল না!

কাউন্ট ডাউনের পরেও, বোতাম টেপার পরেও বোমা ফাটে না দেখে টেনে তুলতে

গিয়ে শুধু তারটাই উঠে এল। দেখা গেল, আগুনে গালিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে মোটা তার।

অর্থাৎ এবার তাজা অ্যাটম বোমা গায়েব করল জলতলের বিভীষিকারা, কিন্তু বিস্ফোরণ বন্ধ করল কারা?

আ-ফাটা অ্যাটম বোমা গিলে নেয়, এমন জীবও আছে পৃথিবীতে।

তিন

অনেকে অবশ্য বলল, একটা বোমা ফাটেনি তো হয়েছে কি? নিশ্চয় ফিউজ খারাপ ছিল। অত জলের চাপে, মানে যেখানে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কয়েক টন চাপ পড়ছে, সেখানে এরকম বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক। সুতরাং মাভৈঃ! ফাটাও আরেকটা বোমা!

তাই হল। পরপর দুটি অ্যাটম বোমা ফেলা হল মহাসাগরের এমন দুটি উপদ্রুত অঞ্চলে, যেখানে জাহাজ নিখোঁজের যেন হিড়িক পড়ে গিয়েছে। বেশ কায়দা করে ফেলা হল বোমা দুটি।

কিন্তু কোনওটাই ফাটল না! ইতিমধ্যে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের একটা প্রবন্ধ পৃথিবীর সবক'টা বড় কাগজে ফলাও করে ছাপা হল। সেই সঙ্গে তাঁর ফোকলা মাড়ির ছবি। প্রবন্ধতে উনি বলছেন, 'হে বিশ্ববাসীগণ! সতর্ক হও। পৃথিবীর সব ক'টা সাগরের গভীর জলে কয়েক মাস ধরে এ কোন আগন্তুকরা উড়ন্ত গোলায় চেপে বাসা নিয়েছে? জলের চাপ সেখানে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কয়েক টন পর্যন্ত। অকস্মাৎ জ্বলন্ত গোলায় চেপে যারা আকাশ থেকে উল্কার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে খসে পড়ল পৃথিবীর জলে তারা নিশ্চয় জলের এই ভয়াবহ চাপে অভ্যস্ত। তাই তারা ডাঙায় পড়েনি। জলে পড়েছে, তাও গভীর জলে, সেখানে এই চাপের মধ্যে তারা স্বস্তিবোধ করবে। তারপর থেকে যে কাণ্ডকারখানা চলছে, তা ভাবনার ব্যাপার। আগুন দিয়ে তার গালিয়ে যারা 'চক্রস্কোপ' লোপাট করে, অ্যাটম বোমা গায়েব করে, বিদ্যুৎ ছুড়ে জাহাজ উড়িয়ে দেয়, তারা বুদ্ধিমান জীব নিঃসন্দেহে। তারা চাইছে না তাদের গোপন ঘাঁটিতে কেউ হানা দিক। তাই ও অঞ্চলে যে যাচ্ছে তাকেই খতম করছে।'

যাদের গা-সহা, তারা যদি পৃথিবীর বাইরে থেকেই এসে থাকে, তবে তাদের আদি ডেরা কোথায়? প্রফেসরের মতে বৃহস্পতি গ্রহে। কেননা, আকারে আয়তনে সে গ্রহকে দানব-গ্রহ বলা চলে। জাহাজডুবির খবর পুরনো হয়ে গিয়েছে। দেখা দিয়েছে আরও একটি রহস্যজনক কাণ্ড। সামুদ্রিক স্রোতে সমুদ্রের তলানি ভেসে আসছে, স্রোতের রঙও জায়গায় জায়গায় পালটে গিয়েছে। কয়েক অঞ্চলের মাছ আর সামুদ্রিক প্রাণীরা দলে দলে পালাচ্ছে। ভেসে আসছে জলজ উদ্ভিদ। অনেকে বলতে পারেন, অ্যাটম বোমা সমুদ্রের তলানি ঘেঁটে ওপরে তুলে দিয়েছে। মাছেরাও পালাচ্ছে ওই কারণে। কিন্তু তা নয়। এ ঘটনা ঘটছে অ্যাটম বোমা ফাটানোর আগে থেকেই। এমনকী যেখানে ফাটেনি, সেখানেও। সমুদ্রের ডুবো

আগ্নেয়গিরির উৎপাত? মোটেই নয়। ওসব অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি বিশেষ নেই। থাকলেও সমুদ্রের স্রোত কাদায় কালচে রয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি।

তবে এই নতুন উপসর্গ কেন? প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের নতুন থিয়োরি তাবৎ বিশ্ববাসীর মাথা ঘুরিয়ে দিল বাঁই বাঁই করে।

প্রফেসর বলেছেন, সমুদ্রের তলায় ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে। খনি খোঁড়া হচ্ছে। মাথার ওপর টন টন ওজনের জলের চাপ নিয়ে একাজ তারাই করেছে যারা জাহাজ ডুবিয়েছে। এরা এবার প্রস্তুত হচ্ছে। সুদূর বৃহস্পতি গ্রহ থেকে পৃথিবী গ্রহে হানা দিয়েছে গভীর উদ্দেশ্য নিয়েই। গভীর জলে আস্তানা নিয়েছে নিশ্চয় নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবার জন্যে নয়। কাজ শুরু হয়েছে। পুরো এলাকা জুড়ে আরম্ভ হয়েছে তাদের কলোনি পত্তন। তাই মাছেরা পালাচ্ছে, অ্যাটম বোমা লোপাট হচ্ছে, জাহাজ নিখোঁজ হচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মাথার উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কয়েক টন ওজনের জলের চাপ নিয়ে যারা এইভাবে কলোনি গড়তে পারে, তারা ফচকে নয়, ফিচেল নয়, ভয়ংকর জীব। অতএব, হে বিশ্ববাসী, সাবধান হও।

খবর পড়ে তো হাসির হররা ছুটল শহরে শহরে দেশে দেশে। সেই সঙ্গে প্রফেসরের ওই ফটো। অমন খোলতাই চেহারার সঙ্গে ওই খবর, আর দেখে কে! রাস্তা-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, অফিসে-আদালতে, প্রফেসরের প্রবন্ধ নিয়ে সে কী টিটকিরি! বেঙ্গলি ব্রেনের ব্যায়রাম! আজগুবি গল্পের আড়তদার! আরও কত কি বিশেষণ। কেউ বলল, মহাশয় কি আজকাল গাঁজা নিয়ে গবেষণা করছেন? কেউ ভয়ানক রেগে গিয়ে বললে, এসবের মানে কী? ছেলেপুলেদের মাথাখাওয়া?

একদল বিজ্ঞানী বলেছিল সমুদ্রের তলায় ট্রেঞ্চ কাটার ব্যাপারটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? এটা ঠিক যে আটলান্টিকের তলায় ডুবোপাহাড়ের শ্রেণি আছে। কিন্তু খনি খোঁড়া, ট্রেঞ্চ কাটা— নাঃ! প্রফেসর নিশ্চয় ইদানীং এলএসডি খেয়ে তুরীয়ানন্দ হয়েছেন। উদ্ভট কল্পনা করছেন।

প্রফেসর সব শুনলেন। না দমে শুধু বললেন, জলের তলায় ওদের সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হোক। তারপর কত ধানে কত চাল বাছাধনরা বুঝবে'খন। সমুদ্রের তলানি এমন অঞ্চল থেকে উঠছে যেখানে আটলান্টিকের তলায় রয়েছে পাহাড়ের শ্রেণি। পাহাড় থাকার ফলে সমুদ্রতল সমতল নয় মোটেই। তার ওপর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমেছে তলানি। এই তলানি সাফ না করা পর্যন্ত সমতল জমি পাওয়া যাবে না। চ্যাটালো জমি না পাওয়া গেলে কলোনি বসবে না। দেখছ না তলানির স্রোত ঠায় আসছে? এক-আবার এসেই বন্ধ হচ্ছে না। তার মানে জমি সাফ চলছে, জঞ্জাল পরিষ্কার চলছে। তারপর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে মাথার ওপর মাইল কয়েক উঁচু জল নিয়ে শুরু হবে নবাগত বুদ্ধিমান জীবেদের ফৌজ বাড়ানোর পর্ব। একই গ্রহে দু' দুটো বুদ্ধিমান জাত তো থাকতে পারে না। মানুষ জাত নিশ্চিহ্ন না হলে সারা পৃথিবীতে ওদের কলোনি কায়েমী হবে কী করে? তাই ওরা জলের তলায় এমন জায়গায় ঘাঁটি নিয়েছে যেখানে মানুষ কস্মিনকালেও পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু ওরা পৌঁছবে মানুষের কাছে। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই।

এরপর কিন্তু হঠাৎ সব শান্ত হয়ে গেল। মাস দুয়েক ধরে আকাশ থেকে উড়ন্ত গোলা খসে পড়ার খবর শোনা গেল না, জাহাজ নিখোঁজও বন্ধ হয়ে গেল।

আমার কিন্তু মনে হল, ঝড়ের আগে যেন থমথমে হয়ে রয়েছে সবকিছু!

ঠিক দু' মাস পরে পরপর কয়েকটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটল। সমুদ্রের সেই বিপজ্জনক অঞ্চলে সাতশো যাত্রী নিয়ে টুপ করে ডুবে গেল 'কুইন' জাহাজ। তারপর ডুবল এক বিমানবাহী জাহাজ। কামস্কাটকার কাছে তলিয়ে গেল ডেস্ট্রয়ার। মালজাহাজ ডুবল জাপানের কাছে।

প্রতিটি জাহাজডুবির ধরন কিন্তু লক্ষ করবার মতো। অন্যান্যবারে জাহাজ ফেটে উড়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ লকলক করে যেন ঘিরে ধরবার পর বিস্ফোরণ ঘটেছে।

এবারে তা হল না। প্রতিটি জাহাজই এক থেকে দু' মিনিটের মধ্যে আচমকা তলিয়ে গেল। জাহাজের তলা আচমকা খসে গেলে যা হয়, এ যেন তাই। কিন্তু কী যে হল, তা কেউ জানল না। জানবার সময়ও পেল না।

সাতশো যাত্রী নিয়ে গভীর রাতে 'কুইন' যখন অতলে তলাল, তখন বৈজ্ঞানিকরা ভীষণ তর্ক-টর্ক করে বললেন, এ হল এক ধরনের 'মেটাল-ফেটিগ' মানে ধাতুর অবসাদ। ধাতুরা ধাঁ করে খসে খসে যায়, জাহাজও তলিয়ে যায়।

কিন্তু বিশ্বের আর কোথাও মেটাল-ফেটিগ দেখা দিচ্ছে না, দিচ্ছে কেবল বিপজ্জনক গভীর অঞ্চলেই? এ কেমনতর কথা? রাষ্ট্রসংঘে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হল কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে। প্রত্যেকের সন্দেহ অপরকে। আটলান্টিকের পঞ্চাশ মাইল চওড়া আর চারশো মাইল লম্বা বিশাল জায়গা জুড়ে যে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা চলছে, পৃথিবীর অন্য অন্য গভীর জলেও যা ঘটছে, তা উড়িয়ে দেবার নয়। ভিনগ্রহীদের হানা দেওয়ার কাহিনি আসলে ধোঁকাবাজি, চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র নামধারী খ্যাপাটাও ঘুষখোর বৈজ্ঞানিক। মাথায় ছিট আছে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই লাগে সেই লাগে অবস্থায় পৌঁছে একটা রফা হল। ঠিক হল গোটা কুড়ি যুদ্ধজাহাজ সাংঘাতিক বোমা নিয়ে আটলান্টিকের বিপজ্জনক অঞ্চলে যাবে। দমাদম করে বোমা ফেলবে। সমুদ্রের চার-পাঁচ মাইল নীচে গিয়ে ফাটবার মতো গোটা দুই অ্যাটম বোমাও নেওয়া হবে। নইলে বিশ্বশান্তি রাখা দায়! বোমা ফেলবে সব রাষ্ট্রই— কাজেই কেউ কাউকে আর সন্দেহ করতে পারবে না।

কিন্তু সে ব্যবস্থাও ভণ্ডুল হয়ে গেল। কুড়িটা জাহাজ যথাসময়ে গিয়েছিল বিপজ্জনক অঞ্চলে। তারপরেই উন্মাদের মতো চিৎকার করে বলেছিল রেডিয়ো অপারেটর, 'এইমাত্র দুটো এক্সপ্লোশন শুনলেন না? আমাদের দুটো জাহাজ উড়ে গেল। আমাদেরই জাহাজভরতি বোমা ফেটে উড়ে গেল দু' দুটো জাহাজ। বাকি আঠারোটি জাহাজ ভয়ের চোটে পালাচ্ছে এই ভুতুড়ে জায়গা ছেড়ে। সবাই দেখছে পেছনে— একটু আগে পিশাচ এসে দু' দুটো জাহাজ উড়িয়ে দিয়েছে ওখানে। ভীষণ জোরে ছুটছে আমাদের জাহাজ... কাঁপছে ডেক... পাঁচ মিনিট হয়ে গেল... জানিনা পালাতে পারব কিনা... আবার বিস্ফোরণ ঘটবে কিনা বলা যাচ্ছে না... জাহাজভর্তি বোমা যদি ভূতে এসে ফাটায়...।'

রেডিয়ো অপারেটরের গলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাকি আঠারোটি জাহাজ আর ফেরেনি!

মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল কেষ্ট বিষ্টুদের। কেরদানি দেখাতে গিয়ে এমনি হাল হবে জানলে না এগোলেই ভাল ছিল দেখছি, অনেকেই ভাবল মনে মনে। একি সাংঘাতিক গুবলেট কেস রে বাবা।

এই তালে কিছু জাসু চারশোবিশ বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে, এ তো জানা কথা। আকাশ কালো হয়ে গেল ধোঁয়ায়।

কিন্তু মুখ কালো হল পাশ্চাত্যের। খুব ডঙ্কা মেরে বেরোনো গিয়েছিল; প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে গ্যাঁড়াকলের বৈজ্ঞানিক বলে চিক্কুর মারা গিয়েছিল। এখন? এখন তো সেই ফোকলা বেঙ্গলি ব্রেনের কাছেই না গেলে নয়। কে জানত সাগরতলের বিভীষিকারা এমনি কোঁতকা ঝাড়বে? বিশখানা জাহাজ বেমালুম ডুবিয়ে দেবে?

অতএব ফের ডাক পড়ল প্রফেসরের। সেদিনও আমি ব্রাহ্মমুহূর্তে বোঁ বোঁ করে দৌড়োচ্ছি বাজারের দিকে, এমন সময় দেখি উঠোনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন প্রফেসর, 'ও দীননাথ, শুনছ?'

দাঁড়াতে হল। বললাম, 'কী হল?'

প্রফেসর যা বললেন, তা সুখবর সন্দেহ নেই। ঢিট হয়ে গেছে সাগরপারের বৈজ্ঞানিকরা। পটকে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত করেছে প্রফেসরকে ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান করে। বিরাট সম্মান! প্রফেসর তো দেখি আনন্দে আটখানা! সেইসঙ্গে এসেছে আমন্ত্রণ। প্রফেসর যেন তাঁর সুযোগ্য সহকারী মি. 'ডীনোনাট'কে নিয়ে অবিলম্বে ওয়াশিংটন চলে আসেন। সেখানে ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটির প্রথম অধিবেশন বসছে।

মি. ডীনোনাট মানে এই শ্রীহীন দীননাথ এক পায়ে খাড়া ছিল। তাই দিন কয়েকের মধ্যে হাজির হওয়া গেল ওয়াশিংটনে। সেখানে হলভর্তি তালেবর জ্ঞানীগুণীদের মাথা ঘুরিয়ে দিলেন বেঙ্গলি প্রফেসর শুধু একখানি বক্তৃতা ঝেড়ে। বক্তৃতার সারমর্ম হল এই:

সমুদ্রের গভীর অঞ্চল এখন বিপজ্জনক। কেননা, মহাকাশের আগন্তুকরা ঘাপটি মেরেছে সেখানে এবং মানুষকে লবডঙ্কা দেখিয়ে তাদের এমন পটকান ঝাড়ছে যে চোখে ধুতরো ফুল ফুটছে।

কিন্তু এই বিশাল সমুদ্রের ঠিক কোন জায়গায় তারা লুকিয়ে আছে? এবং কী এমন ভয়ানক অস্ত্র ঝাড়ছে যা বড় বড় জাহাজের তলা নিমেষে খসিয়ে দিচ্ছে?

এই দুটো সমস্যারই সমাধান প্রফেসর করে ফেলেছেন।

সমুদ্র যেখানে মাইল চার-পাঁচ গভীর, দেখা যাচ্ছে সাগরতলের বেল্লিকগুলো সেই সেই জায়গাতেই তুলোধোনা করেছে আমাদের। সাগরের তলানিও এইসব অঞ্চলেই বেশি দেখা যাচ্ছে। মাটি খোঁড়ার যন্ত্র দিয়ে সমুদ্রতলে গর্ত করলে কী দেখা যায়? না আগে তলানি প্রচণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে সাগরের ওপরদিকে। তলানি ভেসে ওঠে, জল বিরঙ হয়ে যায়, তারপর তা আস্তে আস্তে ফের থিতিয়ে যায়। তার মানে তলানি যেখানে সবচাইতে বেশি উঠছে, সেইখানেই মহাকাশের আগন্তুকরা সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে জলের তলায়। ফলে তলানি উঠছে

তো উঠছেই। কাজেই এই জায়গাগুলোয় হানা দিলেই বিটলেগুলোকে ফাঁসানো যাবে।

কিন্তু হানা দিতে গেলে তেমনি হাতিয়ার তো চাই। শুধু তাই নয়, ওদের অদ্ভুত হাতিয়ারকেও রোখা চাই। ওরা জাহাজের তলা খসিয়ে দিচ্ছে চক্ষের পলকে। এক মিনিটের মধ্যে জাহাজডুবি হচ্ছে। নয়তো অদ্ভুতভাবে জাহাজভর্তি বিস্ফোরক ফাটিয়ে দিচ্ছে। কীভাবে?

প্রফেসর বললেন, ভাইব্রেশন দিয়ে। মানে, কম্পন। বেহালার তারে ছড়ি টেনে বাতাসে বিশেষ কাঁপন তৈরি করলে যেমন কাচের গেলাস ভেঙে যায়, এও ঠিক তেমনি। বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটির মধ্যে না যাওয়াই ভাল। তবে ওরা এমন এক যন্ত্র বানিয়েছে যা দিয়ে কম্পনতরঙ্গ পাঠাচ্ছে জলে ভাসা জাহাজ লক্ষ্য করে। ফলে, জাহাজের তলা খসে যাচ্ছে। বিস্ফোরক ফেটে উড়ে যাচ্ছে।

সুতরাং আগে দরকার একটা অ্যান্টি-ভাইব্রেশন গ্যাজেট। তারপর, নির্দিষ্ট টার্গেটে গিয়ে ত্যাঁদড় বিভীষিকাদের একহাত নেওয়া যাবে'খন।

বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই তুমুল শোরগোল শোনা গেল ঘরময়। পটাপট করে ক্যামেরার ছবি উঠে গেল। হুল্লোড় থামাতেই গেল আধঘণ্টা। তারপর প্রশ্ন উঠল, প্রফেসর যা বললেন সবই অনুমানের ব্যাপার। এক্সপেরিমেন্ট না করা পর্যন্ত সঠিক কিছু বলা মুশকিল। কিন্তু হাতিয়ার বানাবে কে?

কুছ পরোয়া নেহি। তাল ঠুকে বললেন প্রফেসর। দাওয়াই তিনিই বানাবেন। তবে একটা ল্যাবরেটরি চাই। আর চাই মাসখানেক সময়।

দুটোই পেয়েছিলেন তিনি। যথাসময়ে তৈরি হয়েছিল অ্যান্টিভাইব্রেশন গ্যাজেট। তাঁর অভিযানের জোগাড়যন্ত্র করতে গেল আরও একটা মাস। এই দুটো মাস সাগরের বিপজ্জনক এলাকা দিয়ে জাহাজ যাওয়া বন্ধ করে দিল জাহাজ কোম্পানিরা। বড় রকমের কোনও দুর্ঘটনার খবরও পাওয়া গেল না।

মাস দুই পরে একটা জাহাজ রওনা হল সেই অঞ্চলে যেখানে বিশখানা জাহাজ রহস্যজনকভাবে তলিয়ে গিয়েছে। জাহাজের গলুইতে একটা ক্রেন লাগানো। এ ছাড়াও জাহাজ ঘিরে অ্যান্টিভাইব্রেশন গ্যাজেটের রাশি রাশি তার ফিট করা।

ক্রেনের ডগা থেকে ঝুলছিল একটা বস্তু। দেখতে রুপোলি মাছের মতো— আকারে অবশ্য বিরাট। তা প্রায় পনেরো ফুট লম্বা তো বটেই। জিনিসটাকে টর্পেডো বলা যায় এবং রোবট স্পাইও বলা যায়। কেননা, জলে নামিয়ে দেবার পর জিনিসটা নিজেই খুঁজে নেয় শত্রু কোনদিকে। তারপর ধেয়ে যায় সেইদিকে। তবে কখনওই নিজের জাহাজের দিকে আসে না।

আদর করে প্রফেসর টর্পেডো স্পাইয়ের একটা নামও দিয়েছিলেন, বোয়াল মাছ। বলতেন, বোয়ালের হাঁ থেকে দেখি কী করে ব্যাটারা পালায়।

পালাতে ওরা পারেনি। তবে পালটা ঘা মারতেও ছাড়েনি।

বোয়ালের একটা মস্ত গুণ ছিল। ক্রেনে করে জলে নামিয়ে দেবার পর ডুব মেরে জাহাজের সামনে চলে যেত এবং শ' দুই ফুট তফাতে থেকে এগিয়ে চলত জাহাজের আগে

আগে। কিন্তু যেই সন্দেহজনক কিছুর অস্তিত্ব টের পেত, সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই ধেয়ে যেত সেই দিকে। যাবার আগে অবশ্য দপ করে একটা সিগন্যাল বাতি জ্বলে উঠত জাহাজের কন্ট্রোল কেবিনে।

বিপজ্জনক এলাকায় জাহাজ পৌঁছল। একটানা তিন ঘণ্টা চলেছি তো চলেইছি। সমুদ্র দিব্বি শান্ত।

তারপরেই লাউডস্পিকারের হাঁক শোনা গেল, 'এইমাত্র বেরিয়ে গেল এক নম্বর বোয়াল। নামাও নাম্বার টু।'

ঘড়াং ঘড়াং করে চালু হয়ে গেল ক্রেন। নামছে দু' নম্বর বোয়াল। আমরা কিন্তু দুরুদুরু বুকে তাকিয়ে সমুদ্রের দিকে।

পাঁচ মিনিটও গেল না। সিগন্যাল বোর্ডের হিসেবে জানা গেল, পঁয়ত্রিশ ফ্যাদম গভীর জলে পৌঁছেছে বোয়াল। বিস্ফোরণ ঘটল তারপরেই।

আমরা শুধু দেখলাম, সাগরের জল সহসা ফুলে-ফেঁপে লাফিয়ে উঠল শূন্যে।

দু' নম্বর বোয়াল ততক্ষণে ডুব দিয়েছে। সিগন্যাল বাতিও জ্বলেছে। অর্থাৎ বোয়াল দেখতে পেয়েছে শত্রুকে। ছুটেছে সেইদিকে। জাহাজের পেছনদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার জল লাফিয়ে উঠল। অর্থাৎ আবার বিস্ফোরণ ঘটেছে বেল্লিকদের গায়ে।

হুড়মুড় করে নামানো হল তিন নম্বর বোয়াল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলল সিগন্যাল বাতি। তারপরেই আবার বিস্ফোরণ। এবারে জাহাজের পাশে।

গা শিরশির করে উঠল। বেশ বুঝলাম, জলের তলায় থেকে ওরা ঘিরে ধরেছে আমাদের। এরপর?

অ্যান্টি-ভাইব্রেশন গ্যাজেট চালু হয়ে গেছে। বেশ বুঝছি, পায়ের তলায় ডেক কাঁপছে থিরথির করে। একটা অস্পষ্ট গুমগুম ধ্বনিও কানে আসছে।

হঠাৎ গুমগুম ধ্বনিটা বেড়ে গেল। গোঁ গোঁ শব্দে কানে যেন তালা লাগার উপক্রম হল। বুঝলাম, কী হচ্ছে।

প্রফেসরও দেখি উদ্বিগ্নচোখে তাকিয়ে। অ্যান্টি-ভাইব্রেশন গ্যাজেট ওদের ভাইব্রেশন হাতিয়ারকে ঠেকাচ্ছে। তাই শব্দ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধাপে ধাপে শব্দ আরও বাড়ছে। সমস্ত জাহাজ কাঁপছে থরথর করে। জলের তলার বিভীষিকারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে কম্পনতরঙ্গ পাঠিয়ে আমাদের জাহাজের তলা খসিয়ে দেবার, জাহাজভর্তি বিস্ফোরক উড়িয়ে দেবার। কিন্তু পারছে না কেবল অ্যান্টি-ভাইব্রেশন গ্যাজেটের দৌলতে।

আধঘণ্টা এমনি লড়াই চলল। কাঁপন আর পাল্টা কাঁপনের লড়াই। শেষে বোধহয় রণে ভঙ্গ দিল জলতলের আতঙ্করা। কেননা, অ্যান্টি-ভাইব্রেশন গ্যাজেটের গোঙানি মিলিয়ে গিয়ে গুমগুম শব্দ আবার ফিরে এল।

সোল্লাসে যেন ফেটে পড়ল গোটা জাহাজ। প্রফেসরকে মাথায় তুলে বুড়ো বুড়ো বৈজ্ঞানিকদের সে কী নাচ!

পরেরদিনই রেডিয়োতে, খবরের কাগজে ফলাও করে ছড়ানো হল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের

রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনি। পৃথিবীবাসীরা রক্ষে পেয়েছে জলতলের ছ্যাঁচড়াদের হাত থেকে। জাহাজ আর ডুববে না। এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। তবে হ্যাঁ, জাহাজভাড়া বাড়বে। মালের ভাড়াও বাড়বে। কেননা সব জাহাজেই অ্যান্টি-ভাইব্রেশন গ্যাজেট লাগাতে হবে তো। খরচ অনেক। সে খরচ তুলতে হবে ভাড়া বাড়িয়ে। শেয়ার মার্কেটে জাহাজ কোম্পানিদের শেয়ারের দাম ফের চড় চড় করে বেড়ে গেল। পৃথিবী শান্ত হয়ে এল।

চার মাস আর কোনও ঘটনা নেই। সবাই ভুলেই গেল উড়ন্ত গোলা আর রহস্যজনক জাহাজডুবির আতঙ্ক কাহিনি। তারপরেই দুটি ঘটনা ঘটল প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগরের দুটি দ্বীপে।

চার

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপটির নাম কোয়াইকু। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এমন কিছু নয়। অনেকের নজরে পড়ে না। ম্যাপে একটিমাত্র ফুটকি দিয়ে দেখানো হয়েছে দ্বীপের অবস্থান।

দ্বীপে সব মিলিয়ে শ'খানেক লোক আছে। অনেক... অনেক বছর আগে এ অঞ্চলে একটা জাহাজডুবি হয়েছিল তুফানের দাপটে। যাত্রীরা প্রাণে বেঁচে যায় পায়ের তলায় কোয়াইকু দ্বীপের ছোঁয়া পেয়ে। রবিনসন ক্রুশোর মতো তারা ঘর বাঁধে দ্বীপে। খাবারের অভাব ছিল না। সুতরাং বিজন দ্বীপটিকে তারা দু'দিনেই আপন করে নেয়। ভুলে যায় স্বদেশের কথা।

দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজ গেলেই দ্বীপবাসীরা দৌড়ে আসত সমুদ্রের ধারে। আদিম বাসিন্দার মতোই হাত নাড়ত, নাচত, শোরগোল করত। তাই একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল কোয়াইকু দ্বীপের গা-ঘেঁষে জাহাজ থামানোর। কাঁচা তরিতরকারির স্বাদ পাওয়া যেত, সেই সঙ্গে মিষ্টি জল।

সেদিনও একটি জাহাজ এল কোয়াইকুর কাছে। জাহাজের নাম কামপালা। কিন্তু অভ্যেসমতো দুড়দাড় করে সমুদ্রের ধারে কাউকেই দৌড়ে আসতে দেখা গেল না।

ভেঁপু বাজালেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু কতকগুলো গাঙচিলের হাহাকার ছাড়া কোনও সাড়া পাওয়া গেল না দ্বীপ থেকে। এমনকি গোরু ছাগল মুরগিও চোখে পড়ল না।

ক্যাপ্টেন একটু অবাক হলেন। ভাল করে তাকালেন কুঁড়েঘরগুলোর দিকে। আগে সেখানে দেখা যেত রান্নাবান্নার ধোঁয়া। কিন্তু আজ তার কোনও চিহ্নই নেই।

ব্যাপার কী? কোয়াইকু দ্বীপের বেলাভূমি খুবই খাড়াই। অর্থাৎ জাহাজ অনেকটা কাছে ঘেঁষতে পারে। ক্যাপ্টেন তাই জাহাজ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। পরপর কয়েকবার ভেঁপু বাজালেন। কিন্তু আশ্চর্য। গাঙচিল ছাড়া মনে হল আর কেউ নেই। না মানুষ, না ইতর প্রাণী।

জাহাজশুদ্ধ লোক তো অবাক। এরকম তাজ্জব কাণ্ড তো এর আগে দেখা যায়নি। ক্যাপ্টেনের হুকুমে লাইফবোট জলে নামানো হল। কয়েকজন নাবিক পৌঁছল দ্বীপে। হেঁকে

ডাকা হল দ্বীপবাসীদের। কিন্তু কেউ আনন্দে আটখানা হয়ে দৌড়ে এল না আগের মতো।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল নাবিকরা। তারপর গুটিগুটি এগোল কুঁড়েঘরগুলোর দিকে। প্রথম কয়েকটি ঘরে জনপ্রাণীর চিহ্ন পাওয়া গেল না। একটি ঘরে পচা গন্ধ পেয়ে নাক টিপে ঢুকে দেখা গেল রান্নাঘরে মাছ পচেছে। আর একটি ঘরে দোলনায় একটি মরা বাচ্চাকে শুয়ে থাকতে দেখা গেল। না খেয়েই মারা গেছে বাচ্চাটি।

ওরা ভয় পেয়ে ফিরে এল জাহাজে। ক্যাপ্টেনকে জানাল, দ্বীপে নিশ্চয় ভূত এসেছে। নইলে বাসিন্দারা গেল কোথায়? কেউ কোনও জিনিস সঙ্গে নিয়ে যায়নি। বিছানায় টানটান করে চাদর পাতা রয়েছে, কেউ শোয়নি। রান্নাঘরে খাবার রান্না করা রয়েছে, কেউ খায়নি। অথচ লোকগুলো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেনের গা ছমছম করলেও এবার তিনি নিজে দ্বীপে নামলেন। তন্নতন্ন করে খুঁজলেন গোটা দ্বীপটা। দূরে পাহাড়ের গুহায় চারজন পুরুষ-দু'জন মেয়েকে দেখতে পেলেন। তবে জীবিত অবস্থায় নয়, অনাহারে প্রত্যেকেই মৃত। কিছু পোষা গোরু-ছাগল-শুয়োরের সন্ধান পেলেন জঙ্গলের মধ্যে। তারা অবশ্য জীবিত।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে জাহাজে ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন। দিনকয়েক পরে কয়েকটি খবরের কাগজে ইঞ্চিখানেকের মতো খবর ছাপা হল। বিজন দ্বীপের বিস্ময়কাহিনি অনেকের চোখে পড়ল। কিন্তু কেউই মাথা ঘামালে না তা নিয়ে।

আটলান্টিক মহাসাগরের সেন্ট জর্জিয়া আর বুভেন দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট্ট দ্বীপ। নাম সেন্টল্যান্ড। সেন্টল্যান্ড কোনওকালেই নামকরা দ্বীপ নয়। কয়েকঘর আদিবাসীর বাস সেখানে। মাঝে মাঝে জাহাজ যেত নারকেল নিতে। বিনিময়ে যৎসামান্য কিছু দিয়ে আসত আদিবাসীদের।

আচম্বিতে একদিন দ্বীপে আবির্ভূত হল একদল বোম্বেটে। জাতে এল ব্রেজিল আমেরিকান। পেশায় জলদস্যু। জলপুলিশের তাড়া খেয়ে আশ্রয় নিল সেন্টল্যান্ডে। রাইফেল আর স্টেনগান উঁচিয়ে বশ করল বাসিন্দাদের। তেরিয়া মেজাজের কয়েকজনকে বিনা দ্বিধায় এফোঁড়-ওফোঁড় করল তপ্ত বুলেট দিয়ে, লাশ ভাসিয়ে দিলে জলে।

আত্মগোপনের পক্ষে সেন্টল্যান্ড দ্বীপ মন্দ নয় দেখে তারা আর নড়বার নাম করল না দ্বীপ থেকে। মাঝে মাঝে বিপদ আসত বাইরের জাহাজ নারকেল নিতে এলে। ওরা তখন আড়াল থেকে রাইফেল উঁচিয়ে আদিবাসীদের পাঠাত তীরে— ওরা শেখানো বুলি আউড়ে ভাগিয়ে দিত জাহাজকে। বেচারা আদিবাসীরা বেচাল হবার সাহস পেত না। বোম্বেটেদের গুলি যে ফসকায় না, তা ওরা দেখেছে।

তাই, স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে ফুর্তিবাজ সেন্টল্যান্ডবাসীরা দিন কাটাচ্ছিল মাসের পর মাস খোঁয়াড়ে বন্দি শুয়োরের মতো। অবশেষে তাদের মধ্যে একজন লম্বা দিল গভীর রাতে একটি মাত্র ক্যানো সম্বল করে। মহা ডানপিটে লোকটা ডাঙায় কোনওদিনই পৌঁছতে পারত না যদি না একটা জাহাজের নজরে পড়ত। খুনে হার্মাদ দলের কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করা হল সেখানে। জাহাজ বন্দরে পৌঁছলে খবর গেল জলপুলিশের কাছে। নিপাত্তা হার্মাদ দলের সন্ধান পেয়ে পুলিশি অভিযানের ব্যবস্থা হল সেন্টল্যান্ড দ্বীপে। সঙ্গে এল সেই পলাতক

সেন্টল্যান্ডবাসী... রাস্তা চিনিয়ে দেবার জন্যে। দিনেরবেলা এলে কিছু বাসিন্দা খামোকা গুলি খেতে পারে বোম্বেটেদের হাতে। তাই গানবোট এল রাতের অন্ধকারে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চুপিসারে দ্বীপে নামল একদল জলপুলিশ।

মিনিটপাঁচেক কোনও শব্দ নেই। তারপরেই ঘন ঘন গুলিবর্ষণের শব্দ ভেসে এল দ্বীপের দিক থেকে। কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার গুলিবর্ষণের শব্দ, তারপরেই নিশুতি রাত শিউরে উঠল ভয়ানক একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে।

ঘাবড়ে গেল গানবোটের সবাই। লড়াই লেগেছে হার্মাদ দলের সঙ্গে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এমন সাংঘাতিক আওয়াজে ফাটবার মতো বিস্ফোরক তো দলের কারও কাছে নেই?

ভাবনা শেষ হতে না হতেই আবার গুলিবর্ষণের আওয়াজ। যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে রাইফেলধারীরা। এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে চলেছে স্টেনগান। পরমুহূর্তেই আবার একটা প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। তারপর সব চুপ।

আর মুখ চাওয়াচাওয়ি করা চলে না। গানবোট থেকে জ্বলে উঠল সার্চলাইট। নিমেষে আলোর একটা জোরালো ফোকাস গিয়ে পড়ল তীরে। ঠিক সেই সময়ে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল।

আলোর মধ্যে যা কিছু সব নিথর। কিন্তু আলোর সীমানার ঠিক বাইরে জলটা হঠাৎ তোলপাড় করে উঠল। অনেকে বললে, অতিকায় কচ্ছপের খোলার মতো কী যেন একটা টুপ করে ডুব দিল জলে।

আলোর ফোকাস এবার গিয়ে পড়ল গাঁয়ের মধ্যে। সেন্টল্যান্ডবাসীদের কুঁড়েঘরগুলো আধখানা চাঁদের আকারে সাজানো। মাঝখানে খোলা উঠোন। আলো সবক'টা কুঁড়েঘরের ওপর দিয়েই ঘুরে এল। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না।

সার্চলাইট ফিরে এল জলের কাছে। যেখানে একটু আগেই জলে আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, সেইখানে দেখা গেল কয়েকটা হাতিয়ার। পুলিশি রাইফেল। বালির ওপর হেলায় পড়ে হাতিয়াররা— তাদের মালিকরা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

আরও একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করল সবাই। সার্চলাইটের আলোয় যেন চক চক করছে রাইফেলগুলো। শুধু তাই নয়। কুঁড়েঘরগুলোও চকচক করছে আলোয়। এমন কিছুতে মাখামাখি হয়েছে রাইফেল আর কুঁড়ে যা আলোয় চকচক করে।

কিন্তু সহসা বুঝি পাণ্ডববর্জিত হয়ে গিয়েছে সেন্টল্যান্ড দ্বীপ।

গানবোট থেকে সে-রাতে দ্বীপে নামা বন্ধ রইল। দিনের আলো ফুটতে নামা হল দলবেঁধে। নেমে কী দেখা গেল?

জলের কাছে পড়ে থাকা রাইফেলগুলোয় আঠার মতো, জেলির মতো চকচকে কী যেন মাখানো। চত্বরের তিনদিক ঘিরে কুঁড়েঘরগুলোতেও সেই বস্তু যেন স্প্রে করে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্প্রে করা হয়েছে চত্বরের মাঝখান থেকে। কেননা কুঁড়েঘরগুলোর সামনের দিকেই কেবল চকচকে আঠালো জেলি জাতীয় বস্তু মাখানো— পেছনে নেই।

চত্বরময় ছড়ানো রাশি রাশি বিচিত্র ধাতুর টুকরো। প্রতিটি টুকরোর একদিক ঈষৎ গোল। দেখতে সিসের মতো, ওজনে তুলোর মতো, চেহারায় ঢালাই ধাতুর মতো। অদ্ভুত এ বস্তু

শ্রেষ্ঠ ধাতুবিজ্ঞানীদেরও মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন পর। চত্বর জুড়ে ছড়ানো এই আজব ধাতুর টুকরো কোত্থেকে এল, তার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

বালুকাবেলার কাছে দেখা গেল শুধু একজোড়া বিদঘুটে চিহ্ন। বালির ওপর দিয়ে গোল বয়লার টেনে আনলে যেরকম দাগ পড়ে, ঠিক তেমনি। দাগদুটো জলের মধ্যে থেকে ওপরে উঠেছে। কিছু দূরে অবিকল তেমনি দুটো দাগ ডাঙা থেকে জলে নেমেছে। রাতের অন্ধকারে এইখানেই জল তোলপাড় হতে দেখা গিয়েছিল।

সারাদিন ধরে তন্নতন্ন করে খোঁজা হল সেন্টল্যান্ড দ্বীপ। কিন্তু হার্মাদ দল, আদিবাসীর দল আর পুলিশ দল, কোনও দলেরই টিকি দেখা গেল না। যেন রাতারাতি সমুদ্রের প্রেত এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ওদের।

ধাতুর টুকরো টুকরো আর চকচকে জেলির নমুনা নিয়ে গানবোট ফিরে এল সদর ঘাঁটিতে। সেন্টল্যান্ড দ্বীপের রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

দুটো ঘটনাই যথাসময়ে এসে পৌঁছল ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটিতে। সবশুনে মুখ অন্ধকার করে বসে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। মুখ কালো হল আরও অনেক বৈজ্ঞানিকের। কিন্তু কী যে করণীয়, তা কারও মাথায় এল না। কিছু তার্কিক যথারীতি তর্ক করলেন, সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে যারা জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে, তারাই যে সেন্টল্যান্ড আর কোয়াইকু দ্বীপে এসেছে, তার কি প্রমাণ?

প্রফেসর শুধু বললেন, অত কথায় কী কাজ। দুটো দ্বীপেই গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসা যাক কী ব্যাপার।

সুতরাং আমরা পৌঁছলাম আগে কোয়াইকু এবং পরে সেন্টল্যান্ড দ্বীপে। বালির ওপর দাগ তখন প্রায় মুছে এসেছে। বিশেষ কিছু দেখা গেল না। প্রফেসর কিন্তু হেলিকপ্টারে চেপে গেলেন পাশের দ্বীপগুলোয়। সেন্টল্যান্ডকে ঘিরে আরও চারটে দ্বীপ ছিল কয়েক মাইল দূরে দূরে। ফিরে এসে বললেন, 'দীননাথ, যে আতঙ্ক রাতের সেন্টল্যান্ডে হানা দিয়েছে, আমার মন বলছে সে আতঙ্ক পাশের দ্বীপগুলোতেও হানা দেবে দিনকয়েকের মধ্যে। আমি ওদের দেখতে চাই।'

বলেন কী প্রফেসর! আমার তো আক্কেল গুড়ুম ওঁর কথা শুনে। সেন্টল্যান্ডে নির্ঘাৎ ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটেছে, নইলে রাতারাতি অত লোক গেল কোথায়? সাপ আর ভূতের সঙ্গে হাতাহাতি করা কি ঠিক?

কিন্তু কে কার কথা শোনে। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র হেঁজিপেঁজি লোক নন। ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটির তিনি চেয়ারম্যান। কাজেই ভুতুড়ে দ্বীপের বালিতে দাঁড়িয়ে তক্ষুণি মিটিং হল এবং ঠিক হল তিন মাইল দক্ষিণে ফ্রেমল্যান্ড দ্বীপে আস্তানা গাড়বেন ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটি। ফ্রেমল্যান্ড দ্বীপটি আয়তনে মোটামুটি ভালই। লোকবসতিও কম নয়। দ্বীপের বাজার অঞ্চলটি জল থেকে সিকি মাইল দূরে। চত্বর ঘিরে বাড়ির সারি। কয়েকটি দোতলা বাড়িও আছে। কাজেই কমিটি মেম্বারদের কোনও অসুবিধে হবে না।

প্রফেসর আরও কয়েকটা বায়না ধরলেন। তিনি বললেন, দুটো দ্বীপেই ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটেছে রাত্রে, দিনের আলোয় নয়। এটা ঠিক যে ভূতপ্রেতরা রাতেই দাপাদাপি করে। কিন্তু

আলো জ্বাললে তাদের দেখা যায় না। তবুও আমি জ্বালব। ফ্রেমল্যান্ড দ্বীপের তীর বরাবর ফ্লাডলাইট ফিট করা হোক। মার্কেট অঞ্চলে প্রতিটি বাড়িতে ফ্লাডলাইট বসানো হোক। সব ফ্লাডলাইট জ্বলবে একটিমাত্র সুইচ টিপলে এবং সে সুইচ থাকবে আমার হাতের কাছে।

কী যে প্রফেসরের মতলব, তা বোঝা গেল না। কিন্তু উনি যা যা বললেন, সবই করা হল। ফ্রেমল্যান্ড দ্বীপের যেদিকে বাজার এবং বাড়িঘরদোরের সারি, সেদিকে খুঁটি পুঁতে লাগানো হল বিস্তর ফ্লাডলাইট। ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও হল। তারপর শুরু হল সারা রাত ধরে প্রতীক্ষা।

কীসের প্রতীক্ষা? তা প্রফেসরই জানেন। আমরা শুধু প্রহরে প্রহরে পালা দিয়ে রাত জাগতে লাগলাম। এইভাবে গেল পরপর চারটি রাত। প্রফেসরের মাথার ছিট নিয়ে আবার শুরু হল কানাঘুষো। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমার নিজেরও বিরক্তি লাগছিল। কার জন্যে এত তোড়জোড়, তার নেই ঠিক। খামোকা রাতজাগা। প্রফেসরের মুখ চুন হল বলে।

কিন্তু মুখ চুন হল আমাদের। পঞ্চম দিন সকালে পাশের দ্বীপে হেলিকপ্টারে টহল দিতে গিয়ে দেখা গেল এক শ্মশানদৃশ্য। লোকজন সব উধাও। রাতারাতি গোটা দ্বীপটা জনমানবশূন্য হয়ে গিয়েছে।

বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল আমাদের। প্রফেসর বালির ওপর কয়েকটা দাগ দেখলেন। কী যেন হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখান দিয়ে। বয়লার বলেই মনে হল। দাগের কিনারার চাইতে মাঝের অংশ বেশ গভীর।

আমাদের মুখ যখন শুকিয়ে আমসি, প্রফেসরের হাসি তখন দেখে কে। প্যাংলা চেহারা নিয়ে কেবল ড্যাং ড্যাং করে নাচতে বাকি রাখলেন। তুবড়ির মতো একটানা যা বললেন, তার সাদা মানে হল এই— হে ডেঁপো মূর্খগণ! প্রস্তুত হও! এবার তোমাদের পালা!

বুড়োর বাক্য যে এমন শোচনীয়ভাবে সত্য হবে, তা তখন ভাবিনি।

সেইদিন রাত্রেই হানা দিয়েছিল তারা। ফ্রেমল্যান্ড দ্বীপকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। পেছনে রেখে গিয়েছিল এমন এক স্মৃতি যা দুঃস্বপ্নের সামিল।

রাত তখন দুটো হবে। খাটে শুয়ে উশখুশ করছেন প্রফেসর। পাশের খাটে আমি সটান বসে আছি। জানলা দিয়ে দেখছি দূরের সমুদ্র। কালো আলকাতরার মতো সমুদ্র দুলে দুলে উঠছে— তারার আলোয় এর বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না।

আচম্বিতে দূরে, সমুদ্রতীরে কীসের হট্টগোল শোনা গেল। কারা যেন বিষম ভয় পেয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠল। তারপরেই গুলি ছোড়ার আওয়াজ শুনলাম। একবার... দু'বার... তিনবার।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রফেসর— 'দীননাথ, ওকী!'

প্রফেসরের মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই আবার শোরগোল ভেসে এল। এবার অন্যদিক থেকে। আবার ফায়ারিংয়ের শব্দ। আর্তনাদ... কান্না... চেঁচামেচি!

প্রফেসর আর দেরি করলেন না। হাতের কাছে মেন সুইচটা ধরে ঘড়াং করে টেনে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন একশো সূর্য জ্বলে উঠল দ্বীপ ঘিরে। আলোয় আলোয় দিন হয়ে গেল চারিদিক।

দেখলাম, সমুদ্রের ধার থেকে পাহারাদাররা পালাচ্ছে। ওরা দৌড়চ্ছে বাজারের দিকেই। মাঝে মাঝে দৌড়চ্ছে। মাঝে মাঝে পেছনের দিকে গুলি ছুড়ছে। আবার দৌড়োচ্ছে।

কার দিকে এত গুলিবর্ষণ? চোখ পাকিয়ে তাকালাম সাগরের দিকে। ভেবেছিলাম, ভাসমান এমন কিছু দেখব যা দেখামাত্র দাঁতকপাটি লেগে যাবে।

হরি। হরি! যা দেখলাম, তা দেখে শুধু কৌতূহল হল, ভয় হল না। দেখলাম, জলের মধ্যে থেকে যেন একটা কালো টিলা উঠে আসছে বালির ওপর। ফ্লাডলাইটের জোরালো আলোয় চকচক করছে পিঠ। দেখে তো মনে হল, তিমি মাছ। কিন্তু তিমি কি কখনও জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠে? তাই ফের ভাল করে তাকালাম। শামুকের মতো বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো না করে অতিকায় বস্তুটা ততক্ষণে অনেকটা উঠে এসেছে।

হঠাৎ কানের কাছে ক্লিক ক্লিক আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম। দেখি, প্রফেসর তন্ময় হয়ে ক্যামেরায় ছবি তুলছেন। পরপর কয়েকবার শাটার টিপে রেখে দিয়ে এবার তুললেন মুভি ক্যামেরা।

আবার চোখ ফেরালাম তীরের দিকে। বন্দুকের গুলি কালো টিলার গায়ে লাগছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। লাগলেও নিশ্চয় ঠিকরে যাচ্ছে। এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জিনিসটাকে।

একটা ডিমকে লম্বালম্বিভাবে আধখানা করলে যা হয়, জিনিসটার আকার অনেকটা তাই। সামনের চাইতে পেছন দিকটা লম্বাটে। চ্যাপটা তলাটা জমি কামড়ে রগড়ে রগড়ে উঠে আসছে। চকচকে কালো পিঠটা মাটি থেকে প্রায় দোতলা উঁচু। লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট তো বটেই। যেন একটা অতিকায় মিলিটারি ট্যাঙ্ক। অথবা এমন একটা সাবমেরিন যা কিনা ডাঙাতেও চলতে পারে।

জিনিসটা আসছে তো আসছেই। লক্ষ্য বাজারের এই চত্বরের দিকে। পাথর বাঁধানো রাস্তার ওপর যখন পৌঁছল অতিকায় বস্তুটা, তখন স্পষ্ট শুনলাম কড়মড় করে পাথর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। পাথরের ওপর দিয়ে ঘষটে ঘষটে একটানা আওয়াজ করে তবুও জিনিসটা আসছে... আসছে... আসছে...!

শোরগোলটা এবার চত্বরের দু'পাশেও শোনা গেল। চমকে তাকালাম সেদিকে। আরও দুটো সাবমেরিন-ট্যাঙ্কের মতো কালো পাহাড় ঢুকছে চত্বরের ভেতর। সবক'টা বাড়ির জানলা খোলা। লোক গিজগিজ করছে প্রতিটি জানলায়। হঠাৎ হুড়মুড় আওয়াজ শুনে দেখি সামনের সচল পাহাড়টা একটা দোতলা বাড়ির কোণা ধ্বসিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে। আধখানা বাড়ি পিঠে করে টেনে আনছে নির্বিকারভাবে। এই না দেখেই বিকট চেঁচাতে চেঁচাতে বহু লোক বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল চত্বরে।

চত্বরের তিনদিকে পৌঁছেছে তিনটে কালো পাহাড়। দাঁড়িয়েছে। গুলিবর্ষণ, চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, বাড়িভাঙা— কোনও ব্যাপারেই ভ্রূক্ষেপ নেই। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে চত্বরের ঠিক তিনদিকে। যেন একটা ত্রিভুজের তিন কোণে দাঁড়িয়ে তিনটে মিলিটারি ট্যাঙ্ক।

আমি দৌড়ে বেরোতে যাচ্ছি ঘর থেকে, প্রফেসর আমাকে জাপটে ধরলেন। মাকড়শার মতো আঁকড়ে ধরলেন চার হাত-পা দিয়ে। যত বলি, 'আমাকে ছেড়ে দিন, নীচে যাই।' উনি

ততই আমাকে জাপটে ধরেন। বলেন, 'না, না, সামনে যেয়ো না। আড়াল থেকে আগে দেখো।'

ঠিক তখনই চত্বরের শোরগোল থেমে গেল। থমথমে স্তব্ধতার কারণ দেখতে দু'জনেই ছুটলাম জানলার দিকে। গিয়ে দেখি সবারই চোখ পাহাড় তিনটের দিকে। তিনটেরই কালো পিঠে কী যেন নড়ছে।

চোখ পাকিয়ে ফের তাকালাম। অবাক কাণ্ড! এতক্ষণ যা ইস্পাতের পিঠ মনে হচ্ছিল, এখন তা অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। খানিকটা ঠেলে উঠেছে। আরও উঠছে। উঠছে আর ফুলছে। অবিকল বেলুনের মতো। দেখতে দেখতে সত্যিই পিঠের ওপর একটা মস্ত বেলুন ফুলে উঠল। সাদা জেলির মতো থলথলে বস্তুর বেলুন। পেটটা ফুটপাঁচেক মোটা। দুলছে বেলুনটা, তলায় সরু সুতোর মতো কী দিয়ে লাগানো রয়েছে পিঠের দিকে। মনে হচ্ছে যেন এখুনি ফাটবে বেলুনটা।

কিন্তু ফাটল না। শুধু তলার সরু সুতোটা ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভর দিয়ে বেলুন উঠে পড়ল শূন্যে। ভাসতে ভাসতে কিছুদূর গেল।

তারপরেই ফট করে একটা আওয়াজ হল। রাশি রাশি কিলবিলে শুঁড় ছিটকে গেল চারদিকে। বেলুনের বদলে একটা জেলির ডেলা নেমে এল মাটিতে। সাদা সাদা শুঁড়গুলো ডেলার গা থেকে এদিকে-ওদিকে লকলক করতে লাগল অক্টোপাশের শুঁড়ের মতো।

নারকীয় দৃশ্যটা দেখলাম তারপরেই।

পাঁচ

শুঁড়গুলো সাপের ফণার মতো লকলক করতে করতে গিয়ে পড়ল নীচের জনতার ওপর। যার যেখানে লাগল, সেইখানেই আটকে গেল আঠার মতো। সঙ্গে সঙ্গে ছোট হতে লাগল শুঁড়। সেইসঙ্গে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল বন্দি মানুষটাকে জেলির পিণ্ডর দিকে। মানুষটা যতই হাত দিয়ে ছাড়াতে গেল নিজেকে, ততই আটকে গেল আঠায়। তারপর সবশুদ্ধ গিয়ে আটকে রইল ডেলার গায়ে।

একটি মেয়ের শুধু চুল ধরে একটা শুঁড় টেনে নিয়ে গেল পাথরের ওপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে। সেকি পরিত্রাহি চিৎকার। থমথমে স্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল মরণ কান্নায়। আর্তনাদ ক্রমেই বাড়তে লাগল। আরও কয়েকটি বেলুন ছেড়েছে সচল টিলারা। প্রতিটি ফানুস শূন্যে ভেসে গিয়ে পৌঁছেছে চত্বরের এক একদিকে। তারপর সহস্রনাগের মতো ফণা মেলে বেরিয়ে এসেছে মৃত্যুর দূত শুঁড়ের দল। ওরা যাকে পাচ্ছে, তাকে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ডেলার দিকে। একটা ডেলার দিকে নজর রাখতে গিয়ে যা দেখলাম, তা আরও ভয়ানক। সব ক'টা শুঁড়ে মানুষ বন্দি হওয়ার পর ডেলাটা মানুষের পিণ্ড হয়ে গেল এবং মাটির ওপর দিয়ে আপনা হতেই গড়াতে গড়াতে গিয়ে তলিয়ে গেল সাগরের জলে।

শিউরে উঠলাম সেই দৃশ্য দেখে। এতক্ষণে বুঝলাম, রাতারাতি কেন কোয়াইকু আর

সেন্টল্যান্ড দ্বীপের বাসিন্দারা উধাও হয়ে গিয়েছে। কেননা, চোখের সামনেই আরও কয়েকটা মানুষের বল গড়াতে গড়াতে গেল সমুদ্রের দিকে। সে দৃশ্য দেখা যায় না। কারও হাত ভেঙে গেছে, কারও ঘাড়। কেউ জ্ঞান হারিয়েছে, কেউ তখনও চেঁচাচ্ছে। ঝপাঝপ করে বলগুলো নেমে যাচ্ছে জলে, আর উঠছে না।

আচমকা সপাৎ করে পাশের জানালা দিয়ে কী যেন এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। পড়েই নড়তে লাগল। দেখি একটা সাদা শুঁড়। জানালার সামনে কখন জানি একটা জেলির বেলুন ভেসে এসেছিল। তারই একটা শুঁড় নড়ছে এবং এগোচ্ছে আমার দিকেই। আশ্চর্য, শুঁড়টা যেন বুদ্ধি ধরে। নইলে ঠিক আমাদের দু'জনের দিকেই ডগাটা কিলবিল করে এগিয়ে আসবে কেন?

সময়মতো আমি সরে এসেছিলাম। কিন্তু প্রফেসরের পা পিছলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর পায়ের ডিমে লেগে গেল শুঁড়ের ডগা। এক সেকেন্ডও গেল না। প্রফেসরকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল জানলার দিকে।

প্রফেসর অমন বিপদেও বুদ্ধি হারাননি। চিলের মতো চেঁচিয়ে বললেন, 'দীননাথ, আমাকে ধরো, খবরদার, শুঁড়ে হাত দিয়ো না। তুমিও আটকে যাবে।'

বলতে না বলতেই আমি প্রফেসরকে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে এলাম খানিকটা। পরমুহূর্তেই শুঁড় আবার টান মারল জানলার দিকে। এবার আমিও পিছলে গেলাম মাটির ওপর দিয়ে। হাতের কাছে পেলাম খাট। খাটের পায়াসমেত প্রফেসরকে জাপটে ধরলাম। শুঁড় তখনও আমাদের টানছে। টানের চোটে খাটটাও সরে গেল জানালার দিকে। তারপরেই উলটোদিকে ছিটকে পড়লাম আমি আর প্রফেসর।

উঠে দেখি জানলা দিয়ে শুঁড় বেরিয়ে গিয়েছে। যাবার সময়ে প্রফেসরের পায়ের ডিম থেকে ইঞ্চিছয়েক ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

দরদর করে রক্ত পড়ছে দেখে আমার মাথায় খুন চাপল। প্রফেসর ডিনামাইট আনিয়ে রেখেছিলেন। একটা বান্ডিল নিয়ে সলতেতে আগুন দিয়ে জানলা দিয়ে ছুড়ে দিলাম সবচাইতে কাছের টিলাকে লক্ষ করে।

ছুড়েই সরে এসেছিলাম। নইলে মুখ ভেসে যেত জেলিতে। দড়াম করে ফাটল ডিনামাইট এবং একই সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে উড়ে গেল একটা কালো পাহাড়। চত্বরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল টুকরো ধাতু। ছপাৎ করে জেলি ছিটকে পড়ল জানলায়। তাকিয়ে দেখি, চত্বরের সবক'টা বাড়ির সামনের দিক জেলিতে ভেসে গেছে। সাদা জেলি, চকচক করছে ফ্লাডলাইটে।

অর্থাৎ প্রতিটি কালো পাহাড় জেলিতে ঠাসা। বেলুন ছাড়ছিল ওই জেলি দিয়েই আমাদের খতম করার জন্যে। বন্দুকের গুলিতে যা হয়নি ডিনামাইটের বিস্ফোরণে তাই হয়েছে। ফেটে উড়ে গিয়েছে ধাতুর খোলা, জেলি ছিটকে গিয়েছে ফোয়ারার মতো চারিদিকে।

মনে পড়ল সেন্টল্যান্ড দ্বীপের কাহিনি। সে রাতেও এমনি প্রবল বিস্ফোরণের পর জেলি ছিটকে গিয়েছিল। অর্থাৎ দুটো চলমান সাগর, আতঙ্কে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

এতক্ষণ যারা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছিল, বিস্ফোরণের পরেই তারা নড়ে উঠেছিল। বাকি দুটো 'ট্যাঙ্ক' ফের এগুচ্ছে জলের দিকে। তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই, শামুকের

মতো পাথরের ওপর দিয়ে ঘষটে ঘষটে চলেছে তো চলেছেই। চত্বরের ওদিক থেকে আবার কে যেন ডিনামাইট ছুড়ল। আবার প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটল। আবার জেলিবৃষ্টি ভাসিয়ে দিল প্রতিটি বাড়ি। তৃতীয় ট্যাঙ্কটাও রেহাই পেল না। ডিনামাইটের শক্তি দেখে প্রেরণা পেয়ে দৌড়ে গেল আর একটি দল। আবার নিক্ষিপ্ত হল ডিনামাইট। কানফাটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল সর্বশেষ টিলাটা।

হুল্লোড় পড়ে গেল ফ্রেমল্যান্ড দ্বীপে। এই প্রখর সমুদ্রের বিভীষিকাদের চরম শিক্ষা দেওয়া গেছে। বিজয়-উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই। প্রফেসরকে মাথায় তুলে সে কি নাচানাচি।

দ্বীপের অর্ধেক বাসিন্দা তখন অবশ্য জলের তলায়।

গোটা পৃথিবীতে খবর ছড়িয়ে গেল তিনদিনের মধ্যে। সাবমেরিন-ট্যাঙ্কের কুকীর্তি অ্যাদ্দিনে ছাপা হল ফলাও করে। তখন আরও খবর আসতে লাগল নানা স্থান থেকে। জাপানের আশেপাশে, ইন্দোনেশিয়ার ধারেকাছে, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবেশী দ্বীপে, এমন কি আফ্রিকার উপকূলেও হানা দিয়েছিল রহস্যময় কতকগুলো জলজন্তু। আদিবাসীরা কেউ বাঁচেনি। যারা জঙ্গলে-পাহাড়ে পালিয়েছিল, তারা শুধু দারুণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, সমুদ্র আর নিরাপদ নয়। কেননা, তিমিরা আজকাল ডাঙাতেও উঠছে। মানুষ খাচ্ছে।

এমনি নানান খবর রটতে লাগল। সাতদিন যেতে না যেতেই আরও খবর এল। জলজন্তু বা সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক কাতারে কাতারে উঠে আসছে বিভিন্ন দ্বীপে। এবার আর গভীর জল নয়, অগভীর জলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। কুক দ্বীপপুঞ্জে নাকি হাহাকার পড়ে গিয়েছে। সেখানে এক-এক রাতে এক-একটা দ্বীপে পঞ্চাশ থেকে একশোটা সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক হানা দিয়েছে। অকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে অতিকায় সাবমেরিন-ট্যাঙ্কের দল এত বেশি সংখ্যায় এসেছিল যে, জমি কালো হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে আজকাল হামেশাই এমনি রহস্যময় জীবদের দেখা যাচ্ছে। কাঠুরেরা আর জঙ্গলে যেতে চাইছে না। মধু সংগ্রহও মুলতুবি রয়েছে। অনেকের ধারণা, এসবই শত্রুপক্ষের কারসাজি। বিদিকিচ্ছিরি সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক বানিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে চায়।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ওয়াশিংটনে রিপোর্টারদের বললেন, 'বন্ধুগণ! পৃথিবীর সর্বনাশের আর বুঝি দেরি নেই। বহুদিন ধরেই আমি হুঁশিয়ার করে আসছি আপনাদের। আপনারা ভ্রূক্ষেপ করেননি। আমার কথায় আমল দেননি। আমি বলেছিলাম, আমাদের এই গ্রহে মহাশূন্য থেকে যারা এসেছে, তারা বুদ্ধিমান জীব। ছলে বলে কৌশলে তারা মানুষ নামক বুদ্ধিমান শত্রুদের নাশ করবে পৃথিবীকে মুঠোয় আনার জন্যে। আমি বলেছিলাম, জলের তলায় তারা সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে, কলোনি পাতছে, খনি কাটছে কেবল তৈরি হবার জন্যে। আজ আমার বিশ্বাস তাদের সেই উদ্যোগপর্ব শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে হানা দেবার পর্ব। নইলে পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো অগুনতি দ্বীপে সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক জাতীয় কদাকার এই জিনিসগুলো দলে দলে হানা দেবে কেন? তারা গুলির ঘায়ে জখম হয় না। কিন্তু বোমার বিস্ফোরণে ফেটে উড়ে যায়। কেন? না, তারা জেলি দিয়ে ঠাসা বলে। এমন প্রচণ্ডভাবে ঠাসা যে জোরালো বিস্ফোরণে নিমেষে ধাতুর খোলা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। (এই সময়ে পেছনের সারি থেকে একজন বলে উঠল, ধাতুর খোলা বলছেন কেন? জলের তলায় কি ধাতু বানানো

যায়?) প্রফেসর কটমট করে বক্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, মহাশয়ের এখনও আক্কেল হয়নি দেখা যাচ্ছে। জলের তলায় যারা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পারে, বিদ্যুৎশিখার মতো আগুন দিয়ে মোটা তার গালিয়ে দিতে পারে তারা ধাতু বানাতে পারবে না? সাবমেরিন-ট্যাঙ্কের বিশাল বপু যা দিয়ে তৈরি আমরা তার টুকরো ল্যাবরেটরিতে এনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছি। অ্যালুমিনিয়ামের চাইতেও হালকা অথচ সিসের মতো চেহারা, ইস্পাতের মতো মজবুত ধাতু এখনও পৃথিবীতে আমরা বানাতে পারিনি। সাগরতলের বিভীষিকারা তা বানিয়েছে।'

একটানা বলে যেই দম নেবার জন্যে প্রফেসর থেমেছেন, অমনি একজন বলে উঠল, 'প্রফেসর কিন্তু একটা জিনিস খোলসা করলেন না। মহাকাশ থেকে যারা আগুনের গোলায় চেপে সাগরে নেমেছে, তারাই কি সাবমেরিন-ট্যাঙ্কে চেপে ডাঙায় উঠছে?'

প্রফেসর বললেন, 'ইনটেলিজেন্ট প্রশ্ন। এ সম্বন্ধেও ওয়ার্ল্ড টেকনিক কমিটি গবেষণা করেছেন। আমরা দেখেছি, সাবমেরিন ট্যাঙ্কের বাইরেটা ধাতুর, কিন্তু ভেতরে ঠাসা জেলি। সে জেলিতে জীবন আছে। তাই শুঁড় নেড়ে নেড়ে তারা মানুষ খোঁজে। মানুষের দিকেই ধেয়ে যায়, মানুষ নিয়ে গড়াতে গড়াতে জলে ডুব দেয়। অর্থাৎ নিষ্প্রাণ ধাতুর খোলার মধ্যে এমন এক জেলি যা বুদ্ধি ধরে। কেননা, সাবমেরিন-ট্যাঙ্কগুলো যেভাবে চত্বর ঘিরে দাঁড়ায়, তা সাধারণ জলচর জীবের কাজ নয়। তারা জানে, মানুষ রাতেই অসহায়। তাই রাতে আসে— দিনে নয়।

'জেলি নিয়েও আমরা গবেষণা করে দেখেছি। একটা শুঁড়ের খানিকটা ছুরি দিয়ে কেটে এনেছিল আমাদের একজন। মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে দেখা গেছে, জেলিতে অগুনতি কোষ। জীবন্ত কোষ। নতুন ধরনের এই কোষের ব্যাখ্যান আমাদের জীববিজ্ঞানে নেই। তারপরেও দেখা গেছে, সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক ফেটে যে জেলি ঘরবাড়ি ভাসিয়ে দিয়েছিল, তা রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পচে গিয়ে এমন দুর্গন্ধ ছেড়েছিল যে নাকে কাপড় দিতে হয়েছে। বিকেলবেলা শুকিয়ে কাচের মতো শক্ত হয়েছিল জেলির প্রলেপ।

'কাজেই জেলি জীবন্ত, কিন্তু ধাতু নয়। তবে কি আমরা ধরে নেব, সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক ঠেসে পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন দ্বীপে? এদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে জলের তলার সদর ঘাঁটি থেকে? কন্ট্রোল করছে মহাশূন্যের আগন্তুকরা? যখন আমরা চাঁদে রোবটগাড়ি পাঠিয়েছি, ড্রাইভার চার লক্ষ কিলোমিটার দূরে বসেও তাকে খুশিমতো চালাচ্ছে, এও ঠিক তেমনি। এতদিন ধরে লাখ লাখ সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক বানিয়েছে ওরা। এখন পাঠাচ্ছে ডাঙায়। ড্রাইভার বসে পাঁচ মাইল গভীর জলের তলায়।'

প্রফেসর থামলেন। ঘর স্তব্ধ। তারপর কে যেন খুকখুক করে হেসে উঠল। দেখা গেল ছাগলদাড়ি নেড়ে হাসছে এক ছোকরা রিপোর্টার, প্রফেসর তাকাতেই বলে উঠল, 'ল্যাবরেটরিতে জীবন্ত জেলি বানানোর ব্যাপারটা বেশি আজগুবি হয়ে যাচ্ছে না?'

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'ল্যাবরেটরিতে টেস্টটিউব লাইফ তৈরির চেষ্টা কি আমরাও করছি না? সাগরতলের উন্নত হানাদাররা সেদিকে আমাদের টেক্কা মেরেছে নিশ্চয়। নইলে এত সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক আসছে কোত্থেকে? আকাশ থেকে ওরা এত সংখ্যায় তো পৃথিবীতে পড়েনি? আর, ডাঙাতেই যদি উঠতে পারবে তো গভীর জলে পড়ল কেন? ধাতুর অভাব

নেই সাগরতলে। বছর বছর ধরে ওরা তৈরি হয়েছে আর আমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমিয়েছি। কুম্ভকর্ণের ঘুম এইবার ভাঙল বলে।'

প্রফেসরের বক্তৃতা পরের দিন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। তার সাতদিনের মধ্যে তাঁর হক কথার প্রমাণ পাওয়া গেল। এবার আর শুধু দ্বীপ নয়, মেনল্যান্ডেও হানা দিল ওরা। পুরী তছনছ হয়ে গেল ওদের একরাতের আক্রমণে। রিও ডি জেনেরিও-র একই হাল হল পরের দিন। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে হাহাকার পড়ে গেল। সেখানে অবশ্য প্রফেসরের কথামতো সারারাত উপকূল বরাবর আলো জ্বালিয়ে ডিনামাইট ছুড়ে অনেক সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক ঘায়েল করল পাহারাদাররা।

গভীর জল থেকে অগভীর জলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় অচল হয়ে পড়ল জাহাজ কোম্পানিগুলো। মাইনে দিতে না পারায় নাবিকেরা দাবি আদায়ের লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে দিল। নতুন জাহাজ তৈরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইস্পাতের চাহিদা কমে গেল। দর পড়ল ইস্পাতের, সেই সঙ্গে কয়লার। কেননা কয়লার চাহিদাও কমল ইস্পাত কারখানায়। ফলে বেশ কিছু কয়লার খনি বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খনিশ্রমিকেরা জেহাদ ঘোষণা করল। এবার মুখ চুন হল নাকউঁচু রিপোর্টার আর বিজ্ঞানীদের। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড— সব জায়গাতেই কান্নার রোল উঠতে লাগল প্রতি রাতে। প্রফেসরের শিক্ষামতো অবশ্য পাল্টা মার দেওয়া হচ্ছে। মাইন আর কামান বহু ট্যাঙ্ককে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শেষ নেই ওদের। পিঁপড়ের মতো পালে পালে উঠে আসছে রাতের অন্ধকারে। বৃষ্টির মতো বোমা পড়ছে, হাতবোমা ফাটছে, মাইন বিস্ফোরিত হচ্ছে, জেলির স্তর শুকিয়ে শক্ত ভার্নিসের মতো হয়ে যাচ্ছে, ধাতুর টুকরোয় উপকূল বোঝাই হয়ে যাচ্ছে, তবুও ওরা আসছে, আসছে, আসছে।

মানুষজাতি যখন উদভ্রান্ত, বিভ্রান্ত, দিশেহারা, ঠিক তখনই আচমকা ওদের আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল। খবর এল, জল থেকে আর ওরা উঠছে না, হানা দিচ্ছে না। মাসের পর মাস অমানুষিক মানুষলুণ্ঠনের পর সহসা যেন ঝিমিয়ে পড়ল সাগরের আতঙ্কবাহিনি।

জল ছেড়ে উঠে আসা কালান্তক যমদূতের মতো আর একটিও সাবমেরিন-ট্যাঙ্ককে দেখা গেল না পৃথিবীর কোনও অঞ্চলে।

আশ্চর্য! গেল কোথায় তারা?

ছয়

মাসের পর মাস যারা দিবায় উদ্বেগ, নিশায় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, আচম্বিতে তারা যেন বিদায় নিল। জলের রহস্য জলেই উধাও হল— প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল বেশ কয়েক মাস প্রতীক্ষার পর।

মানুষের মন তো! দুরু দুরু বুকে সাগ্রহ প্রতীক্ষা অন্তে এল বিস্মৃতি। ছায়াদানবের মতোই যারা এসেছিল ছায়া-মায়ার অন্তঃপুর থেকে, তাদের কথা প্রায় ভুলেই গেল দ্বীপবাসীরা, উপকূলের বাসিন্দারা।

উদ্বেগ তিরোহিত হল, এল স্বস্তি। সেইসঙ্গে বিজয়োল্লাস। ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটিতে এত প্রশস্তিপত্র আসতে লাগল প্রতিদিন যে, বিরাট বিরাট গুদোম বোঝাই হয়ে গেল তাই দিয়ে। সব চিঠিরই মোদ্দাকথা একই। জয় হোক প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের। সাবাস বেঙ্গলি ব্রেন! তাঁরই উদ্ভাবিত পথেই লড়াই না চালালে এতদিনে তো মানুষকে মেরে ছাতু করে ছাড়ত সাবমেরিন-ট্যাঙ্ক চালকরা। জনশূন্য হত পৃথিবী।

সবাই যখন থরহরি কম্পমান জেলি-জীবের দণ্ডযাত্রায়, ঠিক তখনই খেল দেখালেন বটে বৃদ্ধ প্রফেসর। দাম তুলে ছাড়লেন পুরনো শত্রুতার। কী মার, কী মার! নাকাল হয়ে, নাজেহাল হয়ে তবেই না চম্পট দিয়েছে ব্যাটারা! সুতরাং জয় হোক প্রফেসরের।

কিন্তু প্রফেসরের খুব একটা উল্লাস দেখা গেল না আকস্মিক যুদ্ধবিরতিতে। মুখ আমসি করে বুড়ো সবসময়ে বসে থাকতেন জানলায়। মাঝে মাঝে নিজের আবিষ্কৃত 'মায়ামুকুর'-এর সুইচ টিপে পরদায় দেখতেন। আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটিতে আর ক'টা চিঠি এল। পৃথিবীর নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে বাক্যালাপ হত মায়ামুকুরের মাধ্যমে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। না দেখলে অবিশ্বাস্য তো বটেই। 'মায়ামুকুর' আবিষ্কার কাহিনি অন্য কোনও সুযোগে বলা যাবে'খন।

অবশ্য সে সুযোগ আর আসবে কিনা বলা মুশকিল। কেননা, এ কাহিনি আমি লিখছি কলকাতার সর্বোচ্চ বিল্ডিংয়ের ওপরতলায় বসে। পাশেই ময়দান। এখন আর অবশ্য ময়দান দেখা যাচ্ছে না। বিশাল হ্রদে পরিণত হয়েছে গোটা ময়দান। গাছগুলোশুদ্ধ তলিয়ে গিয়েছে জলের তলায়। সলিল সমাধি ঘটেছে নিচু বাড়িগুলোর। ইদানীংকালে গড়া স্কাইস্ক্র্যাপার বিল্ডিংগুলো আকাশমুখে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে হেথায় হোথায়। ওইতো দূরে মনুমেন্ট; তারও ওদিকে হাওড়ার পুল।

কিন্তু কোথায় কলকাতা! হায় কলকাতা! হায় ভারত! হায় পৃথিবীর জলাঞ্চল! সব আজ জলে জলাকার! কলির এই বুঝি শেষ।

প্রথমে দেখা গিয়েছিল কুয়াশা। তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। আটলান্টিকে পাড়ি দেওয়া তখন মাথায় উঠেছে। উড়োজাহাজে সাগর পেরোনোর হুজুগ উঠেছিল চরমে। জলযাত্রার নাম করত না কেউ।

আকাশপথে আটলান্টিক পেরোনোর সময় পাইলটদের চোখে পড়েছিল নিবিড় কুয়াশার

পুঞ্জ। পশ্চিম আটলান্টিক অঞ্চলে সহসা এত ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হল কেন, তা নিয়ে পাইলটরা বিস্মিত হয়েছে। কথাটা মুখে মুখে খবরের কাগজের অফিসেও পৌঁছেছে। ছাপাও হয়েছে। কিন্তু ফলাও করে নয়। মহাসাগরে কুয়াশার আবির্ভাব একটা বিরাট ব্যাপার নয়।

তাই কেউ দেখেও দেখেনি কুয়াশার আবির্ভাব। ফলে, কুয়াশার পর এল আরও বিপর্যয়। আরও ভয়াল, আরও ভয়ংকর।

শুধু পশ্চিম আটলান্টিক কেন, একই সময়ে বিশ্বের আরও কয়েক অঞ্চলে দেখা গেল এই আশ্চর্য কুয়াশা। উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর যেন ছেয়ে গেল বহুদূরবিস্তৃত কুয়াশার মেঘে। জাপান সাগর তো সাদা হয়ে গেল কুয়াশায়। হাহাকার শুরু হয়ে গেল জাপানের উত্তর অঞ্চলে। হোক্কাইডোর চাইতেও খারাপ অবস্থা দাঁড়াল দ্বীপপুঞ্জের।

এই তো গেল উত্তর গোলার্ধের ব্যাপার। দক্ষিণ গোলার্ধেও আবির্ভূত হল ঘন কুয়াশা। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে, মানে, মাটিরাস উপসাগর, সেন্ট জর্জ উপসাগর, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে আচমকা এমন নিবিড় কুয়াশার আবির্ভাব ঘটল কেন, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর দরকার মনে করল না।

এমনকী ইংল্যান্ডে হঠাৎ গরমকালেও অমন কনকনে ঠান্ডা পড়ল কেন, তাও কেউ তলিয়ে ভাবল না।

টনক নড়ল কেবল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের। তিনিই বললেন, 'দীননাথ, লক্ষণ তো ভাল নয়। কুয়াশা যে যে অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে, সেই সেই অঞ্চলে কুয়াশা জিনিসটা এর আগেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু কোনও কুয়াশাই টেকেনি। ঠায় দাঁড়িয়েও থাকেনি। কিন্তু এ কুয়াশা নড়েও না, চড়েও না। তিন মাস একটানা জমাট বেঁধে আছে তো আছেই। একী ব্যাপার? রেকর্ড ঘেঁটেও তো এমনি কাণ্ড এর আগে ঘটেছে বলে দেখছি না!'

শেষকালে হল কি, কুয়াশা-রহস্য নিয়ে তলায় তলায় 'ঠান্ডা লড়াই' লেগে গেল বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে। কুয়াশাটা নিশ্চয় ইচ্ছে করেই বানানো হয়েছে। উদ্দেশ্য? কুয়াশার আড়ালে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো, ক্ষেপণাস্ত্রের মহড়া দেওয়া এবং আরও এমন অনেক রহস্যজনক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যা কিনা কুয়াশার পরদায় ঘেরা থাকবে—আকাশপথে উড়ন্ত গোয়েন্দা-স্যাটেলাইটও দেখতে পাবে না।

'ঠান্ডা লড়াই' যখন বেশ জমেছে, ঠিক তখনই এল নতুন খবর। আরও গোলমেলে ব্যাপার। খবর দিল গ্রিনল্যান্ডের গডথাব। বেফিন উপসাগরে সহসা জল বেড়েছে। বাড়তি জল ডেভিস প্রণালী দিয়ে হু হু করে আসছে গডথাবের দিকে। শুধু তাই নয়, বাড়তি জলে বরফের টুকরোও ভাসছে। এ সময়ে বরফখণ্ড কস্মিনকালেও দেখা যায়নি ডেভিস প্রণালীতে। সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখে তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে কর্তৃপক্ষের।

দু'দিনও গেল না। আলাস্কা থেকেও এল সেই খবর। আবার বাড়তি জল। আবার বরফখণ্ড। বেরিং প্রণালী ছেয়ে গেছে ভাসমান বরফে।

এরপর খবর এল স্পিটসবার্গেন থেকে। সেখানেও জলের পরিমাণ বেড়েছে। সেইসঙ্গে দেখা দিয়েছে ভাসমান বরফ। তাপমাত্রা হু হু করে নেমে আসছে। হাড়কাঁপানো শীত পড়েছে অকস্মাৎ।

ফলে, কুয়াশা-রহস্যের মীমাংসা হল। এ তো জানা কথা, বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন বড় বড় বিজ্ঞানীরা। বরফগলা কনকনে জলের স্রোত আসছিল সাগরের তলা দিয়ে। আসতে আসতে সাগরতলের ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঠেলে উঠেছে ওপরদিকে। গরম আবহাওয়ার ছোঁয়ায় আসতেই সৃষ্টি হয়েছে কুয়াশার।

অর্থাৎ বরফগলা জল বাড়তেই কুয়াশা এসেছে। কিন্তু বরফগলা জলটা সহসা বাড়ল কেন, সে সমস্যা উঠতেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তাবৎ বিজ্ঞানীরা।

এদিকে ক্রমশ বেড়েই চলল বরফের টুকরো। গডথাব থেকে খবর এল গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল ছেয়ে গেছে ভাসমান বরফখণ্ডে। বরফের আকারও বাড়ছে। এরকম অস্বাভাবিক সাইজের এমন বিপুলসংখ্যক বরফের টুকরো কোনওকালেই দেখা যায়নি গ্রিনল্যান্ডের উপকূলে। খবর পেয়ে আমেরিকা থেকে প্লেন উড়ে গেল সরজমিন তদন্তে। তারা ফিরে এসে বললে, গাঁজা নয়, যা ঘটেছে, তা অবিশ্বাস্যভাবে সত্য। বেফিন উপসাগরের উত্তর অঞ্চলে বোধহয় আর এক ইঞ্চিও জায়গা নেই— ঠাসাঠাসি বরফের টুকরোয় এমন জমায়েত বুঝি হিমযুগের পর আর ঘটেনি। সেকী ভয়াবহ দৃশ্য! গ্রিনল্যান্ডের আইসক্যাপের বিশাল বিশাল হিমবাহ থেকে ক্রমাগত বরফের চাঁই খসে খসে পড়ছে। হিমবাহ থেকে হিমশিলা সৃষ্টি এর আগেও যারা দেখেছে, তাদের চোখ কপালে উঠল, বর্তমান দৃশ্য দেখে। এরকম ব্যাপকভাবে এমন বিপুল আকারে এমন মুহুর্মুহু তুষারশৈল সৃষ্টি এর আগে কোনওদিনই দেখা যায়নি। আচম্বিতে কয়েকশো ফুট উঁচু ফাটল দেখা দিচ্ছে হিমবাহর গায়ে। পরমুহূর্তেই পর্বতপ্রমাণ বরফের চাঁই খসে পড়ছে, ধীরে ধীরে ঘুরে গিয়ে আছড়ে পড়ছে বরফজলে। জল ছিটকে যাচ্ছে এত দূরে এবং এত উঁচুতে যা নাকি দুরন্ত কল্পনাতেও আনা যায় না। তারপর বৃষ্টির মতো সেই জল ঝরে পড়ছে ভাসমান বরফপাহাড়ের উপর, আকারে যারা ছোটখাটো দ্বীপের মতোই।

বেশ কয়েকশো মাইল পর্যন্ত একই দৃশ্য দেখে এল পাইলটরা। কেবল ভাঙনের খেলা। ধ্বংসের করাল লীলা। ভাঙছে। ভাঙছে। কেবলই ভেঙে চলেছে বরফের পাহাড়। হিমবাহ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। জল আকাশ পর্যন্ত ছিটকে উঠে বৃষ্টির মতো ফের ঝরে পড়ছে। দুলছে, ভাসছে, এগোচ্ছে তুষারশৈল, বরফ-দ্বীপ। একটা দ্বীপের ওপর আর একটা বরফদ্বীপ ভেঙে পড়ছে, চুরমার হয়ে যাচ্ছে। জল ছিটকোচ্ছে, বরফ ছিটকোচ্ছে। উড়োজাহাজ থেকে মনে হচ্ছে যেন জল আর বরফ শূন্যে ভাসছে— আস্তে আস্তে আছড়ে পড়ছে নীচে। বিরাট এই দৃশ্যের তুলনা কিছুর সঙ্গেই নাকি চলে না।

ডেভন দ্বীপের ওপরে উড়ে গিয়ে আরও খবর নিয়ে এল পাইলট অভিযাত্রীরা। আনল একই খবর, একই বর্ণনা। বেফিন উপসাগরে তুষারশৈলের গাদাগাদি, বরফে বরফে ধাক্কার প্রচণ্ড শব্দ। ধাক্কাধাক্কি করে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে অগুনতি বরফদ্বীপ। ডেভিস প্রণালী দিয়ে নামছে দক্ষিণ দিকে— পড়ছে আটলান্টিকে।

স্পিটসবার্গেন থেকেও এল বরফখণ্ড বৃদ্ধির সংবাদ। বরফের পাহাড় উত্তর মেরু থেকে নামছে তো নামছেই। সবারই গতি দক্ষিণদিকে।

জনসাধারণ পুলকিত হল, রোমাঞ্চিত হল, বিস্মিত হল হিমবাহ ভাঙার এই আশ্চর্য

সংবাদ শুনে। চায়ের টেবিলে, কফির টেবিলে, রকে-ক্লাবে গুলতানি উঠল চরমে। ওই পর্যন্তই। এর বেশি ভাববার ক্ষমতাই নেই জনগণের।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রই কেবল বিচলিত হলেন। বুড়ো তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন আমার একটি কথায়। দোষের মধ্যে আমি বলেছিলাম, 'আমার তো মনে হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে কোনও রাষ্ট্র। উত্তর মেরু অভিযান থেকেই তার শুরু।' উনি ধাঁ করে রেগে গিয়ে বললেন, 'অর্বাচীনের মতো কথা বোলো না দীননাথ। ব্যাপারটা অত সোজা নয়।'

ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম গেল। পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধে এল বসন্ত। তারপর গ্রীষ্ম। তিমি-শিকারীদের মরশুম পড়তেই গুটিগুটি দু-চারটি জাহাজ বেরুল শিকারের ধান্দায়।

খবরটা এল তাদের মুখেই, এল নিউজিল্যান্ড হয়ে। দক্ষিণ মেরুতে তখন গ্রীষ্মের শেষ। কিন্তু কী এক রহস্যজনক কারণে সহসা ভিক্টোরিয়াল্যান্ডের পেল্লায় হিমবাহগুলো ভেঙে ভেঙে ভেসে পড়ছে রস সাগরে। হিমালয়সম রস-ব্যারিয়ার নিজেই খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে, এমন কথাও শোনা গেল তাদের মুখে।

এক সপ্তাহও গেল না। একই খবর ফের শোনা গেল ওয়েডেল সাগরে। সেখানেও কেম্পনার ব্যারিয়ার আর লারসেন আইসসেল্‌ফ থেকে বিরাট বিরাট তুষারশৈল ভেঙে নামছে সাগরে। ফ্যানটাসটিক সেই দৃশ্যের নাকি তুলনা নেই। একই সঙ্গে এমন বিপুলসংখ্যক বিপুল হিমশৈল সৃষ্টির নজিরও ইদানীংকালে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা উড়োজাহাজ উড়ে গেল খবরটা সত্যি কিনা দেখে আসতে। পাইলটরা এসে যা বললে, তা শুনে কেষ্টবিষ্টুদের মাথার চাঁদি পর্যন্ত গেল গরম হয়ে। একী বিদঘুটে ব্যাপার রে বাবা! উত্তর মেরুর বেফিন উপসাগরে এই সেদিন যা ঘটতে দেখা গেছে, তারই পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয়েছে দক্ষিণ মেরুতেও।

রিল রিল ছবি তুলে আনল ক্যামেরাম্যানরা। কাগজে কাগজে ছাপা হল গরম গরম খবর। কেউ শিরোনামা দিল, 'মেরু অঞ্চলে কি নতুন নতুন হিমালয় গড়ছেন প্রকৃতি দেবী?' কেউ লিখল, 'অলৌকিক কাণ্ড... মেরুপ্রদেশে বরফপাহাড়। প্রকৃতির মহান বিস্ময়!'

মোট কথা, প্রত্যেকেই নানারকম ফিচকেমো শুরু করে দিল দুই মেরুর সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নিয়ে। পয়সা লোটার ধুম পড়ে গেল এই নিয়ে। ফিল্ম কোম্পানি ফিল্ম তুলে আনল, সিনেমায় দেখা গেল এলাহি কাণ্ড। বিরাট বিরাট তুষারপর্বত ভাসছে জলে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় মুখরোচক নিবন্ধ ছেপেও নাম করল অনেকে। টেলিভিশনের পরদাতেও দেখা গেল মেরু অঞ্চলের ধ্বংসলীলা।

ঠিক এইরকম সময়ে ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটি থেকে ইস্তাহার বিলানো হল দেশে দেশে। ইস্তাহারে ছাপা হয়েছে শুধু একজনেরই বক্তব্য— বলাবাহুল্য তিনি প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

বড় ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন প্রফেসর। বলেছেন, উত্তর মেরুতে ছ'মাসব্যাপী রাত তো শেষ হতে চলল। অন্ধকারে পর্যবেক্ষণপর্ব সম্ভব হয়নি, আলো ফুটলেই নতুন করে দেখা যাবে আরও নতুন কী ঘটল সেখানে।

তবে হ্যাঁ, নোয়ার নৌকা নতুন করে না বানাতে হয়। মহাপ্লাবনের আর বুঝি দেরি নেই। উত্তর মেরুতে আলো ফুটলেই চোখ ফুটবে তাদের, যারা এখনও নাকে সরষের তেল দিয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিচ্ছে।

জাহাজডুবি দিয়ে যে উপাখ্যানের শুরু, প্লাবন দিয়ে ঘটবে তার সমাপ্তি। যে ব্যর্থ লড়াই আমরা লড়ে আসছি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তারও এবার শেষ। ব্যর্থ লড়াই বলছি এই কারণে যে, আমরা জিততে পারিনি কোনওদিনই। মিথ্যে বড়াই করে তো লাভ নেই। জল থেকে যারা আমাদের মেরে তাড়িয়েছে, তারাই আবার আমাদের ডাঙাতেও তাড়া করেছে।

সাগর আমাদের বেদখল হয়েছে, এবার হবে স্থল।

স্তোকবাক্যে আত্মতৃপ্তি আসে, কিন্তু তা সাময়িক। তাই নির্জলা খাঁটি কথাই বলা যাক। গত পাঁচ বছর ধরে আমরা উড়ন্ত গোলায় চেপে চেপে আগন্তুক শত্রুদের ঘায়েল করার চেষ্টা করেছি নানাভাবে। কিন্তু পারিনি। উলটে ঘায়েল হয়েছি নিজেরাই। অগুনতি জাহাজ আমরা হারিয়েছি, হারিয়েছি লক্ষ লক্ষ অমূল্য প্রাণ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা সমস্যার সমাধান হাতড়েছেন উন্মাদের মতো। কিন্তু এখনও আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। জল আমাদের কাছে আতঙ্কস্বরূপ... এবার বুঝি স্থলও...

গভীর জলে লুকিয়ে থেকে যারা হানা দিয়েছে বারংবার, এবার তারা হানা দিয়েছে অন্য পথে। আমি উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের কথা বলছি। এত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিমযুগ ছাড়া এর আগে কখনও ঘটেনি। পৃথিবীবাসীর ওপর এতবড় আক্রমণও এর আগে কেউ করেনি।

এ আক্রমণ ঠেকাবার হাতিয়ার আমাদের জানা নেই।

কী এমন অস্ত্র যা আমরা সর্বশক্তি দিয়েও ঠেকাতে পারি না?

জবাব— উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ গলার হিড়িক।

অসম্ভব? অবিশ্বাস্য?

আজ্ঞে না মশাই। পরমাণুর প্রলয়ঙ্কর শক্তি আমরা আবিষ্কার করেছি। মেরু অঞ্চলের বরফ গলানো পারমাণবিক শক্তির কাছে যে নেহাতই ছেলেখেলা, তা অন্তত আমাদের অনুমান করা উচিত।

শীতকালীন অন্ধকারের জন্যে উত্তর মেরুর কুয়াশা-সংবাদ বিশেষ জানা যায়নি। বসন্তকালে দু' জায়গায় দেখা দিয়েছিল কুয়াশার পুঞ্জ। গ্রীষ্মের শেষে সব মিলিয়ে ছ' জায়গায় দেখা দিয়েছে কুয়াশা। কুয়াশার সৃষ্টি হয় কী করে তা আমরা জানি। জল বা বাতাসের ঠান্ডা স্রোত আর গরম স্রোতের সংঘর্ষ থেকে কুয়াশার উৎপত্তি। অর্থাৎ গরম জলের স্রোত বইছে উত্তর মেরুর আট জায়গায়। কিন্তু হঠাৎ আটটা উষ্ণ স্রোত এল কোত্থেকে?

ফলাফল যে কী সাংঘাতিক তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। বেরিং সাগরে, গ্রিনল্যান্ড সাগরে এতো বরফের চাঁই ভেসে আসছে যা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারে না। কয়েক শ' মাইল পর্যন্ত বরফের দ্বীপে দ্বীপে ঠোকাঠুকি চলছে এই অঞ্চলে। নরওয়ের উত্তরেও তাই। ইউরোপেও এবার যা শীত পড়েছে তা নাকি মেরু অঞ্চলের শীতের ধারেকাছে আসে।

তারপর ধরুন হিমবাহের আবির্ভাব রহস্য। হিমবাহর সৃষ্টি কী করে হয়, তা তো আমরা জানি। কিন্তু জানিনা রাতারাতি রাশি রাশি হিমবাহ তৈরি হয়ে গেল কেন দুই মেরুতে।

এত হিমবাহ আসছে কোত্থেকে, তাও আমরা জানি। গ্রিনল্যান্ড দ্বীপ হিসেবে বিরাট সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চাইতেও ন'গুণ বড় এই দ্বীপ। কিন্তু গ্রিনল্যান্ড সম্বন্ধে এইটাই বড় কথা নয়। গত হিমযুগে সারা পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল বরফে। হিমযুগের শেষে বরফ পিছিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে দুই মেরুতে। উত্তর মেরুতে গ্রিনল্যান্ডই পিছু-হটা হিমযুগের সর্বশেষ দুর্গ।

উত্তর মেরু থেকে বেশ কয়েকবার বরফ এগিয়ে এসেছে দক্ষিণে। পাহাড় চূর্ণ করে, জনপদ ধ্বংস করে, জমি সমতল করে নীলচে কাচের মতো বরফের আস্তরণে বারংবার ছেয়ে গেছে অর্ধেক ইউরোপ। শামুকের মতো গতিতে হিমবাহর পর হিমবাহ বারংবার হানা দিয়েছে ইউরোপে। কিন্তু বারবার তারা ফিরে গিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শম্বুকগতিতে তারা পিছু হটে গিয়েছে। বরফের পাহাড় ফের গলে গিয়েছে, হিমযুগের চিহ্ন কোথাও থাকেনি।

শুধু এক জায়গায় ছাড়া। গ্রিনল্যান্ড। অমর বরফ শতাব্দীর পর শতাব্দী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে ন' হাজার ফুট উঁচু পর্যন্ত। প্রতি মরশুমেই গ্রিনল্যান্ডের গা খসে সৃষ্টি হয়েছে বহু হিমবাহর। কিন্তু বছরের এই সময়ে সহসা বিশগুণ হিমবাহর সৃষ্টি হচ্ছে কেন গ্রিনল্যান্ডে, তা কি তলিয়ে ভেবেছেন?

যে-কোনও পন্থায় উত্তর মেরুর বরফ গলাতে পারলেই পরপর কতকগুলো বিপর্যয় দেখা যাবে। ধৈর্য ধরে লক্ষ করলেই অনুমান করা যাবে বিপর্যয়টা কী ধরনের। প্রথমে যা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরতে থাকবে, সময় দিলেই তা প্রবল স্রোত এবং সর্বশেষে তা মহাপ্লাবনে পরিণত হতে পারে।

মেরু অঞ্চলের জমাট বরফ যদি কোনও পন্থায় গলানো যায়, শুনেছি সমুদ্রে আরও একশো ফুট জল বেড়ে যাবে। জলের উচ্চতা একশো ফুটের কম হতে পারে, বেশিও হতে পারে। কিন্তু জল যে বাড়বেই, তা সন্দেহ নেই।

গত জানুয়ারি মাসে রেওয়াজমতো নিউলিনে সমুদ্রের গড়পড়তা উচ্চতা মাপা হয়েছিল। দেখা গেছে, এর মধ্যেই আড়াই ইঞ্চি জল বেড়েছে সাগরের।

আশা করি এবার বুঝবেন, কোন পথে মৃত্যু আসছে আমাদের? ইঁদুরের মতো ডুবে মরা ছাড়া আর কোনও পথ নেই পৃথিবীবাসীর।

প্রফেসরের পিলে-চমকানো ভবিষ্যৎবাণীতে পিলে চমকাল কেবল বৈজ্ঞানিকদের। সাধারণ মানুষ তো হেসেই গড়িয়ে পড়ল বিটলে বিজ্ঞানীর কপোলকল্পনা শুনে। বলে কি বুড়ো? মাত্র আড়াই ইঞ্চি জল বেড়েছে সাগরে তার জন্য কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? খবরের কাগজগুলো আর এককাঠি সরেস। তারা এই সুযোগে ফের লম্বা লম্বা সম্পাদকীয় লিখে ফেলল। তাতে প্রফেসরকে টিটকিরি দিয়ে বলা হল, বৃদ্ধ এত উসিপিসি করেন কেন? উনপঞ্চাশ বাই আছে নাকি? এককে একুশ করে ছাড়ছেন যখন-তখন? আরে বাবা, জল বেড়েছে মাত্র আড়াই ইঞ্চি, প্রফেসর সঙ্গে সঙ্গে সায়েন্স ফিকশন কল্পনা করে বসলেন তাই

নিয়ে। আমরা নাকি জলে ডুবে অক্কা পাব? কেন মশাই? কী দুঃখ? প্রফেসর তো কেবল এলতলা দিয়ে বেলতলা দিয়ে ঘোরাচ্ছেন, ঝেড়ে কাশছেন না কোথাও। সাগরের জল বাড়ল কেন? না, মেরু অঞ্চলের জমাট বরফ গলিয়ে। জমাট বরফ গলাচ্ছে কে? না, সাগরতলের বিভীষিকারা। কী করে গলাচ্ছে? মোদ্দা প্রশ্ন এইটাই: যে-বরফ লক্ষ লক্ষ বছরেও গলেনি, এমন কে তালেবর আছে যে সেই বরফ গলাবে? যদিও বা গলায়, কীভাবে? প্রফেসর কি এই হেঁয়ালির জবাব দেবেন?

মস্কো থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় কিন্তু সাধুবাদ দেওয়া হল প্রফেসরকে। বলা হল, কী ঘেন্নার কথা! কুম্ভকর্ণের ঘুম আর ভাঙবে কবে? সাগরে আড়াই ইঞ্চি জল বাড়া চাট্টিখানি কথা নয়। চোদ্দোশো দশ লক্ষ বর্গমাইল সাগর অঞ্চলের সব জায়গায় আড়াই ইঞ্চি জল বাড়া মানে কত জল বাড়ল, তা ভাবলেও মাথা ঘুরে যাওয়া উচিত। জলটা বাড়ল কী করে, সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন প্রফেসর। এরপর তাঁকে উস্তমখুস্তম না করে এ সম্পর্কে আরও ভাবলে হয় না কি? যদি ধরেই নেওয়া যায় এ নষ্টামির পেছনে রয়েছে সাগরতলের বিভীষিকারা— তা হলেই প্রশ্ন জাগছে তারা উত্তর মেরু অঞ্চলে পৌঁছল কোন পথে? আমরা তো জানি, আলাস্কার পাশ দিয়ে বেরিং সাগরে ডুব দিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়— কারণ এ অঞ্চলে হাজার দুয়েক মাইল জল এত অগভীর যে হতভাগারা যেতে যেতেই টেঁসে যাবে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কি এই প্রশ্নের জবাব দেবেন?

সাত

প্রফেসর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন। বললেন, 'মুশকিলটা কোথায়? স্কটল্যান্ডের উত্তরদিক দিয়ে এবং ফারো দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণদিক দিয়ে পথ তো রয়েছে। তবে হ্যাঁ, ডুবোপাহাড়ের একটা শ্রেণি কেটে সুড়ঙ্গ বানাতে হয়েছে। সেটা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। তারপর থেকেই তো জল মোটামুটি গভীর— সেই উত্তর মহাসাগরের ভেতর পর্যন্ত। ও অঞ্চলে আমরা বোমাও ফেলেছি বিস্তর। নরওয়ের উপকূল থেকে শুরু করে আরও উত্তরে স্পিটসবার্গেন পর্যন্ত জলের হাঙ্গামা ঠেকাতে বোমা খরচ কম হয়নি। তার মানেই দাঁড়াচ্ছে, ওরা অনেকদিন ধরেই তলায় তলায় কাজ এগিয়ে নিয়েছে। এখন বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে। কেননা, কুয়াশার নতুন নতুন পুঞ্জ আরও কয়েক জায়গায় দেখা দিয়েছে।

আর বরফ গলানো? চোখে না দেখলে অনুমান করতে ক্ষতি কি? অনুমান উদ্ভট হতে পারে, অবাস্তব হতে পারে, কিন্তু খানিকটা আঁচ করা যাবে তো? না, মশাই, না... নিরক্ষীয় অঞ্চলের গরম জল পাইপে করে এনে মেরু অঞ্চলের বরফ গলানো কি চাট্টিখানি কথা? কী বললেন? পৃথিবীর বুক থেকে উত্তাপ টেনে এনে মেরুর বরফ গলানো হয়েছে? এই দেখুন, আবার দুরন্ত কল্পনা করে ফেললেন। তার চাইতে আসুন না, ওদের দৌড়টা আগে যাচাই করা যাক। আমরা জানি, জলতলের বিভীষিকারা খুব তোড়ে জল ছুড়তে পারে। এ

আবিষ্কার ওদের মুঠোয় বলেই সাগরের তলানি ঘুলিয়ে তুলে দিয়েছে ওপরে। আচ্ছা মশাই, এই সঙ্গে যদি সাগরের তলায় পারমাণবিক চুল্লি বসিয়ে থাকে? হাসবেন না, সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। পৃথিবীর তিনভাগের দু'ভাগ ওরা দখল করে নিয়েছে, জলের নীচে খনিজ সম্পদও ওদের মুঠোয়। ইউরেনিয়াম খুঁজে পাওয়াটা বিচিত্র নয়। তারপর বানিয়েছে পারমাণবিক চুল্লি— প্রচণ্ড তাপে জল গরম করে নিয়ে তোড়ে ছুড়েছে বরফের দিকে। পারমাণবিক শক্তি ওরা মুঠোয় না আনলে আমাদের অ্যাটম বোমা ওরা না ফাটিয়ে হজম করল কী করে? বিশ্বের খুঁতখুঁতে বৈজ্ঞানিকরা এ প্রশ্নের জবাব দেবেন কি? কে জানে, অ্যাটম বোমা লোপাট করেই পারমাণবিক রহস্য ওরা শিখেছে কিনা।

যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙছে দাঁতের গোড়া?

আর হ্যাঁ, পর্বতপ্রমাণ তুষারশৈলকে ফাটিয়ে চৌচির করা হয়েছে ওদের সেই কম্পনতরঙ্গ দিয়ে। আমরা দেখেছি মস্ত মস্ত জাহাজ কীভাবে নিমেষে ফেটে উড়ে গিয়েছে ওদের ভয়াবহ কম্পন-অস্ত্রে। কাজেই ভাসমান বরফের পাহাড় ফেটে ভেঙে ছড়িয়ে যাবে, এ আর আশ্চর্য কী!'

প্রফেসরের চোখা যুক্তিতে থোঁতা মুখ ভোঁতা হল অনেক কেষ্টবিষ্টুর। কিন্তু সেই যে কথা আছে, 'হেরেও না হারব, গোলমাল করে সারব'— ঠিক সেইভাবেই বড় বড় কাগজওয়ালারা মস্ত মস্ত সম্পাদকীয় ফেঁদে জানতে চাইল, বাঃ! বেঙ্গলি ব্রেন তো বেশ উর্বর দেখা যাচ্ছে! এখন সুরাহা কী? মানে, কোন হাতিয়ারে এদের জব্দ করা যাবে?

প্রফেসর তেড়েমেড়ে আবার একটা রিপোর্ট পাঠালেন নানান কাগজে। বললেন, 'মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্ত! বলি অ্যাদ্দিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনো হচ্ছিল? ওদের অস্ত্রের ধরনটা অ্যাদ্দিন যাচাই করে দেখা হয়নি কেন? শত্রুপক্ষের অস্ত্রের গড়ন সম্বন্ধে একটু ওয়াকিবহাল না হলে কি পালটা অস্ত্র বানানো যায়? আমাদের দৌড় তো ক্ষেপণাস্ত্র আর অ্যাটম বোমা পর্যন্ত। ওরা সে খবর রাখে বলেই টেক্কা দিয়েছে আমাদের। আর আমরা? কী জানি ওদের সম্বন্ধে? এটুকুও কি জানি যে ওদের অস্ত্রাগারে লোহার হাতিয়ার একটাও নেই? সেদিকে ওরা হুঁশিয়ার। জলের তলায় লোহা মানেই মরচে। কিন্তু যদি লোহা থাকত, চুম্বক অস্ত্র প্রয়োগ করে ওদের অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুই টেনে আনা যেত জলের ওপরে।

'সুতরাং, হে সুধীগণ, হে কুম্ভকর্ণগণ, নাকে সরষের তেল দিয়ে আরও কিছুকাল নাক ডাকান। যুদ্ধে শত্রু সম্বন্ধে কিছু খবর না রাখা মানেই বেঘোরে পটল তোলা। তার জন্যেই তৈরি হন। কেননা, ওরা এমন এক সামুদ্রিক ট্যাঙ্ক ডাঙায় তুলে আমাদের পিটিয়েছে যা মেশিনে চলে না— চলে জেলি জাতীয় জৈববস্তুর সাহায্যে। বস্তুটা আমাদের বিজ্ঞানে এখনও অজ্ঞাত। সমুদ্রের পাঁচ মাইল তলায় ঘাপটি মেরে ওরা আরও কী আজব অস্ত্র বানাচ্ছে, তার কোনও হদিশ আমরা রাখি না, রাখাও সম্ভব নয়। সুতরাং মেরু অঞ্চলের বরফ গলবেই, সাত সাগরের জলও বাড়বে। বাঁচতে চান তো পাহাড়ের ডগায় গিয়ে দুর্গ বানিয়ে বসে থাকুন। জল সেখানে পৌঁছাবে না।'

ভাবা গিয়েছিল, প্রফেসরের এহেন আটোপ-টঙ্কার শুনে টনক নড়বে দেশবিদেশের;

আর কিছু না হোক, আড়মোড়া ভেঙে আস্তিন তো গুটোবে। কিন্তু হায় রে! সে গুড়ে বালি!

ঘাড়ে রদ্দা না পড়লে যাদের হুঁশ হয় না, তারা যাচ্ছি-যাব ভাব নিয়েই গড়িমসি করে চলল। প্রফেসর হুঁশিয়ার করেছিলেন, যে বিষয়ে যে মন্ত্র— মানে, যেমন প্রয়োজন তেমনি হাতিয়ার না বানালে এদের ঠেকানো যাবে না। তা সত্ত্বেও তেমন একটা সাড়া পড়ল না কোনও দেশেই।

যেমন ধরা যাক, ইংল্যান্ড দারুণ গোঁড়া দেশ। পরের মুখে ঝাল খাওয়া তাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি। আমেরিকা মত্ত রইল অ্যাটম বোমার অহংকারে। রাশিয়া কখনও ফট করে মন্তব্য করে না। এশিয়ায় গেঁয়ো যোগী ভিখ পেল না। আফ্রিকা সামান্য ঘাবড়াল বটে— বাইরে প্রকাশ করল না। ফ্রান্স আর ইতালির অবস্থাও হল তথৈবচ।

ক্যালিফোর্নিয়ায় হঠাৎ ঠান্ডা বেড়ে গেল। কুয়াশার অত্যাচারও বৃদ্ধি পেল। আবহাওয়াবিদরা বললেন, এরকম হাড়কাঁপানো শীত নাকি কস্মিনকালেও পড়েনি। ঠান্ডার মূলে যে বরফগলা জল সেটা অবশ্য ঢোঁক গিলে স্বীকার করতে হল।

ইংল্যান্ডে দু'-চারজনের ভুরু সামান্য ওপরে উঠল যখন এপ্রিল মাসে জোয়ারের জল ওয়েস্টমিনস্টারের বাঁধ টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল। খবরের কাগজের লোকেরা দেখল এই সুযোগে গরমাগরম খবর ছেপে দু' পয়সা কামানো যাক। তারা ধুয়ো তুলল— অ্যাটম বোমার পেছনে পয়সাগুলো কি জলে গেল? জল বাড়ছে কেন? দ্বীপে তাড়া খেয়েছে, এবার কি আন্ডাবাচ্চা নিয়ে ঘরে বসে ডুবে মরতে হবে?

ফলে, একটু কাজ হল। মানে সমুদ্রধারে যেসব শহর, সেইসব জায়গায় বাঁধ তোলা হল সৈকত বরাবর। লন্ডন শহরের নদীতীরে বাঁধের ওপর বালির বস্তার পাহাড় বানানো হল। বোম্বাইতে হল তাই। সেখানে নাকি ইদানীং মেরিন ড্রাইভেও জল উঠছে। জোগাড়যন্ত্র করতেই গেল একটা বছর।

এল আর এক এপ্রিল। আবার জোয়ারের জল বাড়ছে। লন্ডনে কাঠ হয়ে জনতা দাঁড়িয়ে নদীর ধারে। পুলিশ আগেভাগেই নোটিশ দিয়ে গাড়ির স্রোত অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল তাই রক্ষে। নইলে কেলেঙ্কারি হত সেদিন।

কেননা, জনতার চোখের সামনেই জল ছলাৎ ছলাৎ করে বাঁধে মাথা কুটল, তারপর বালির বস্তার ফাঁক দিয়ে দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসতে লাগল এদিকে। দু' জায়গায় বস্তা সরে যেতে পুলিশ গিয়ে ফুটো বন্ধ করল। দমকল আর পুলিশ— দুই বাহিনির সকলেই হাজির। কিন্তু কাঁহাতক লড়া যায় জলের সঙ্গে। বালির বস্তার এখান-সেখান দিয়ে তোড়ে জল আসাও রোধ করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। দেখতে দেখতে দুটো বালির বস্তা ছিটকে পড়ল ভেতরে— তারপর গোটা বালির বাঁধ ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে—হু-উ-উ-শ করে জল ঢুকে পড়ল শহরের মধ্যে।

বোম্বাই শহরে বান্দ্রা, দাদার, জুহু ভেসে গেল আরবসাগরের দৌরাত্ম্যে। নরিম্যান পয়েন্টে থই থই করতে লাগল জল। পুরীর সবক'টা সৈকত-হোটেল মনে হল সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য।

গঙ্গার জল স্ট্র্যান্ড রোড ভাসাল, ময়দানকে হ্রদে পরিণত করল, চৌরঙ্গীর হোটেলগুলোতেও জল ঢুকে পড়ল। সিনেমা হলগুলোর অবস্থা শোচনীয়।

সাজ সাজ রব পড়ল চারিদিকে। মাটি খোঁড়ার যত যন্ত্র আছে, সব জড়ো করা হল পৃথিবীর বড় বড় শহরে। তাই দিয়ে একদিকে মাটি খুঁড়ে আর একদিকে বাঁধ বানানো আরম্ভ হল পাইকারি হারে। নদী আর সাগরকে বাঁধ দিয়ে ঠেকানোর সেই অভিনব প্রয়াস দেখে মনে পড়ল রাজা ক্যানিউটের গল্প। সাগরকে তিনি ঠেকাতে গিয়ে কি নাকালই না হয়েছিলেন।

নাকাল হল পৃথিবীর সবাই। টেক্সাসের বেশ খানিকটা গ্রাস করে নিল আগুয়ান সাগর। হাজার হাজার মেহনতি মানুষ দিবারাত্র খেটে কংক্রিটের চাঁই বানিয়ে ঠেকাতে লাগল সমুদ্রকে। জলের দেবতা তাই দেখে বোধহয় হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন। কেননা, অক্টোবর নাগাদ সাধারণ মানুষেও বুঝল, গতিক সুবিধের নয়। সশরীরে জলের তলায় যাওয়ার চাইতে চম্পট দেওয়াই শ্রেয়।

তাই সবার আগে বাড়িঘরদোর ছেড়ে উদ্বাস্তু হল খাস লন্ডনের নদীতীরের বাসিন্দারা।

পরের বছরে আরও প্রকট হল আতঙ্ক। ধরা যাক, শুধু কলকাতার কাহিনি। পাছে প্যানিক ছড়িয়ে পড়ে, তাই সরকারপক্ষ আসল কথা না ভেঙে শুধু হুঁশিয়ার করেছিল জোয়ারের জল নিয়ে। গঙ্গায় জল বাড়তে পারে, কাজেই একটু সাবধান থাকা ভাল। সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা অতি-হুঁশিয়ার, তারা একতলা ছেড়ে দোতলা-তিনতলায় বাসা নিতে শুরু করে দিলে। হু হু করে একতলা বাড়িভাড়া পড়ে গেল— হাওড়ার পোলে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কী ঘটে। স্ট্র্যান্ড রোডের ধারে অফিসবাড়ির ছাদগুলোও ভরে গেল জোয়ারের জল দেখতে।

নিউ সেক্রেটারিয়েটের ছাদে দাঁড়িয়ে আমরা রগড় দেখছিলাম। নদীর জল মসৃণ গতিতে উঠে আসছে তীর বেয়ে, ঘোলাটে জল এতই নিস্তরঙ্গ যে ভয়ংকর কিছুর আশঙ্কা মাথায় আসতেই চায় না। কিন্তু তবুও এল আতঙ্ক। কেননা, তেলেতেলে জলের কিনারা ক্রমশ রাস্তার ওপর উঠছে তো উঠছেই। দেখতে দেখতে রাস্তার লোক সরে গেল। জলে জলাকার পথে দাঁড়িয়ে সারি সারি বোবা ল্যাম্পপোস্ট। ফুটপাত ঘেঁষে পাঁচিল তোলা হয়েছিল জল ঠেকাবার জন্যে। দেখলাম জলের দাগ পাঁচিল বরাবর ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠছে। পাঁচিলটা ময়দান আগলে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত জানতাম। পাঁচিলের একদিকে কেল্লা— আর একদিকে যে গঙ্গা এসে গেছে, তা দূর থেকেই বুঝলাম।

রাত বাড়ছে। জোয়ারের স্রোত আসবার সময় ঘনিয়ে আসছে। আমরা শামুকের মতো চোখ বাড়িয়ে দেখছি কী হয়। এমন সময়ে দূর থেকে ভেসে এল গুরু গুরু গর্জন।

জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। গঙ্গায় বান আসা যাঁরা দেখেছেন, এ শব্দের কিছুটা তাঁরা অনুমান করতে পারবেন। কিন্তু সে রাতে যে শব্দ আমরা শুনলাম, তা আরও ভয়ানক।

একটু পরেই দেখলাম পর্বতপ্রমাণ জলের তোড় আসছে।

সে জল গঙ্গার ওপারে কলকারখানা ডুবিয়ে দিয়ে এল হুংকার ডাক ছেড়ে। এ পাড়ে যেন নিমেষে প্রলয় ঘটে গেল। বালির বস্তার মতোই জলের সেই তোড়ে ভেসে গেল ইটের উঁচু পাঁচিল।

জল কেল্লা ডুবিয়ে দিল। কলকাতা ভাসিয়ে দিল। হাওড়ার পোলের ওপর থেকে খান দুয়েক ট্যাকসিকে দেশলাইয়ের বাক্সর মতো রেলিং টপকে কোথায় যে নিয়ে গেল ঈশ্বর জানেন।

পরের দিন রেডিয়োতে জানা গেল কাঁথি, কাকদ্বীপ, সাগরের তলায় চলে গেছে। সুন্দরবনে হাহাকার করবার মতো কেউ নাকি আর নেই। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাদের মতে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূলে নিশ্চয় ভারতীয় কারসাজি আছে...!

সারা পৃথিবীতে সে কী কান্নাকাটি! ইংল্যান্ডের গোঁড়া গভর্নমেন্ট আর মুখে চাবি দিয়ে থাকা নিরাপদ মনে করল না। ফতোয়া বেরিয়ে গেল— চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা! অর্থাৎ উঁচু জমিতে চটপট সরে পড়ো হে দেশবাসীগণ! কিন্তু দেশের তিনভাগের দু' ভাগ লোক উঁচু জায়গায় পালাতে গিয়ে সে যা কাণ্ড আরম্ভ হল তা আর বলবার নয়।

ওলন্দাজরা অনেক শতাব্দী ধরে সাগর ঠেঙিয়েছে। এবার হাড়ে হাড়ে বুঝল সাগরের পালটা ঠেঙানি রোধ করবার এলেম তাদের নেই। কাজেই তারাও চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অনুসরণ করল। ডেনমার্ক থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু নৌকো-স্টিমার-লঞ্চ নিয়ে চম্পট দিল সুইডেনের দিকে।

সমুদ্রতীরের বড় বড় শহরে লুঠপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা সহসা গেল বেড়ে। জলের তলায় দোকানপাট যেতেই খাবারের আকাল দেখা দিল। টিনফুডের জন্যে আরম্ভ হল মারপিট। উঁচু জমি দখল করার জন্যে হাতাহাতি। ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাতের অন্ধকারে খুন-জখম। পাইকারি হারে কেলোর কীর্তি আরম্ভ হয়ে গেল গোটা ভূগোলক জুড়ে।

অথচ এত কাণ্ড ঘটল সাগরে মাত্র পনেরো ফুট জল বাড়ার জন্যে।

সময় থাকতেই উঁচু উঁচু বাড়ির ওপরতলায় রেডিয়ো অফিস থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালত তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গোটা কলকাতা যখন জলের তলায়, আকাশবাণী তখন নিউ সেক্রেটারিয়েটের ওপরতলায়। জলমগ্ন বাড়িগুলোর মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র জলযান হল নৌকো আর মোটর বোট!

গেল আরও একটি বছর। অবর্ণনীয় সেই অবস্থার বর্ণনা আমার কলমে অন্তত সম্ভব নয়। শীতকাল যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। আর ঠান্ডায় মনে হল বরফের ঘরে বসে আছি।

এল গ্রীষ্ম। কলকাতায় লোকজন তখন অনেক কমে এসেছে। মাঝে মাঝে গুলি বর্ষণের শব্দ শোনা যায়। নিস্তব্ধ রাত খানখান হয়ে যায় কাদের বুকফাটা কান্নায়। আমরা বুঝতে পারি মানুষ ক্রমে পশু হয়ে যাচ্ছে। এ সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম! উঁচুতলা বাড়ি কলকাতায় কটাই বা আছে। মজুত খাবারও তেমন নেই। গুণ্ডামি এই জন্যেই। মানুষ খুন এই কারণেই। সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে— ভেঙে পড়েছে শাসনব্যবস্থা। কে শাসন করবে? লালবাজার তো প্রায় জলের তলায়। কেল্লাও তাই। তাই বাড়ির ওপরতলা দখলের জন্যে নির্দ্বিধায় চলছে নরহত্যা— মজুত খাবার লুণ্ঠনের জন্য ব্যাপক অভিযান।

ময়দানের কিনারায় মস্ত একটা বাড়ির ওপরতলায় ডেরা নিয়েছিলাম আমি আর প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। ছাদের ওপর থাকত আমাদের হেলিকপ্টার— ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটির

চেয়ারম্যান যাতে কষ্ট না পান, তাই কোনও আয়োজনের ত্রুটি নেই আমাদের ফ্ল্যাটে। বন্দুকধারী সান্ত্রী অষ্টপ্রহর মোতায়েন হানাদার ঠেকানোর জন্যে। একটা ঘরভর্তি টিন টিন পেট্রল আর ডিজেল। নিচের তলায় জানলার সামনে জলে ভাসছে একটা স্পিডবোট। কেননা, এককালে যা ময়দান ছিল, এখন তা লেক। ময়দান-লেকও বলা যায়।

নাওয়া-খাওয়াও ভুলে প্রফেসর দিনরাত খুটুর খুটুর করে চলেছেন যন্ত্রপাতি নিয়ে। তাঁর সাধনা চলছে জেলিজীবের দেহাংশ নিয়ে। সামুদ্রিক ট্যাঙ্ক ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে খানিকটা থলথলে জেলি টেস্টটিউবে ধরে আনা হয়েছিল। নানান ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করে প্রফেসর দেখছিলেন কী ধরনের হাতিয়ার দিয়ে জ্যান্ত জেলিকে কাহিল করা যায়।

নিজের আবিষ্কৃত অত্যাশ্চর্য 'মায়ামুকুর' আর শক্তিশালী রেডিয়ো ট্রান্সমিটারে পাশ্চাত্যের বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন প্রফেসর। গবেষণা সব দেশেই চলে ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটির পরিচালনায়। প্রফেসর সবাইকে বুদ্ধি বাতলে দিতেন রেডিয়ো আর 'মায়ামুকুর' মারফত— কোন দেশে গবেষণা কতদূর এগোল, সে খবরও রাখতেন।

আমার হাতে বিশেষ কাজ না থাকায় হেলিকপ্টার নিয়ে প্রায় বেরোতাম শহরের অবস্থা দেখতে। জোয়ারের জলের দাগ তখন পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। আকাশপথে উড়তে উড়তে দেখলাম, পার্ক স্ট্রিট দিয়ে উত্তর আর পূর্ব কলকাতা নৌকোয় ছেয়ে গিয়েছে। শহরের মায়া যারা ছেড়েও ছাড়তে পারছিল না, যারা অনেক যাগযজ্ঞ করে জেনেছিল জল নাকি আর বাড়বে না, সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে শহরের এ মোড় থেকে সে মোড় পর্যন্ত। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়— লুঠ। খাবার চাই! জোর যার মুল্লুক তার!

রাত্রে শুনতাম ময়দান-লেক ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে বাড়ির নীচের তলায়। শুনতাম জোয়ারের জল বাড়ছে... বাড়ছে... বাড়ছে। চাঁদের আলোয় দেখতাম একঠেঙে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে জলমগ্ন শহীদ মিনার। রিজার্ভ ব্যাংক, হাওড়ার পোল চন্দ্রালোকে আবছা হয়ে দেখা যেত কুয়াশার মধ্যে দিয়ে।

ভুতুড়ে শহর বললে ভুল হবে। জলমগ্ন কলকাতাকে দেখে মনে হত সমাধিস্থ কলকাতা। অ্যাদ্দিন বাদে সত্যি সত্যিই কবর হল কলকাতার। সেই সঙ্গে বিশ্বের আটভাগের পাঁচভাগ মানুষের।

জল বাড়ার বর্ণনা দিয়ে পাতা ভরিয়ে লাভ দেখছি না। পঞ্চাশ ফুট জলের লেভেল বেড়ে দাঁড়াল পঁচাত্তর ফুটে পরের বছরের শীতে। সারা পৃথিবীর খবর তখনও আসছে আমাদের শক্তিশালী রেডিয়োতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দার্জিলিংয়ে। বাংলা বলতে সে বাংলাও আর নেই। রাক্ষসী সাগরের গর্ভে তার প্রায় সবটুকুই গিয়েছে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এগিয়ে এসেছে বুভুক্ষু সাগর। ওড়িশা, মাদ্রাজ, গোয়া, বোম্বাই। কাথিওয়াড় উপদ্বীপ জলমগ্ন হয়ে দ্বীপে এসে দাঁড়িয়েছে। বোম্বাই শহরের ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর সুউচ্চ অট্টালিকার ওপরে হেলিকপ্টার ঘাঁটি থেকে ক্রমাগত আকাশযান উড়ছে শূন্যে— মালাবার হিলের কোটিপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে হেলিকপ্টার বাহিনি। ফিল্মস্টারদের অবস্থা হয়েছে অতি শোচনীয়। স্টুডিয়ো জলমগ্ন। মালাবার হিলের

উঁচু ডাঙা দখল করবার জন্যে ক্রমাগত জলপথে আসছে হানাদার, এলিফ্যান্ট কেভস হয়েছে বোম্বেটেদের বড় ঘাঁটি। গোলাগুলি দিয়ে কাঁহাতক ঠেকিয়ে রাখা যায় হার্মাদদের।

বিশ্বের সর্বত্র যখন এই একই ব্যবস্থা, ঠিক তখনই শোনা গেল আর একটি খবর।

সামুদ্রিক ট্যাঙ্কবাহিনি আবার দেখা দিয়েছে।

আট

হ্যাঁ, সমুদ্র থেকে রাতের অন্ধকারে যারা পাহাড়সমান দেহ নিয়ে উঠে এসেছিল এক সময়ে দ্বীপে দ্বীপে, উপকূলে উপকূলে, যাদের খোলস ধাতুর, কিন্তু ভেতরটা বিচিত্র জেলি দিয়ে গড়া, যারা জেলির ফানুস-ফাঁদ পেতে বন্দি করে মানুষকে এবং টেনে নিয়ে যায় গভীর জলে— করালমূর্তি সেই সামুদ্রিক আতঙ্করা আবার আবির্ভূত হয়েছে দিকে দিকে।

ডাঙার মানুষকে ডাঙাতেই যারা ডুবিয়ে মারবার ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে তাদের প্রথম সাঁজোয়া বাহিনি এই ট্যাঙ্ক। টিলার মতো আকার, কচ্ছপের মতো দেহ। ডিনামাইট আর কামান ছাড়া যাদের ঘায়েল করা মুশকিল— তারাই দলে দলে আবার উঠে আসছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে।

রেডিয়োতে খবরটা শুনেই আঁতকে উঠেছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। জল বাড়ার ফ্যাসাদ নিয়েই প্রাণান্ত, আবার সামুদ্রিক ট্যাঙ্ক? উনি সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়োতে জানতে চাইলেন, হতভাগাদের উদ্দেশ্য কী? মানুষ মারা? না, মানুষ এখনও টিকে আছে কিনা দেখা?

জবাব এল দিন কয়েক পরে। এবার সামুদ্রিক ট্যাঙ্কবাহিনি অতটা মারমুখো নয়। ওরা জল থেকে ডাঙায় উঠেছে বটে, কিন্তু উপকূল থেকে বেশি ভেতরে ঢুকছে না। বড় জোর মাইলখানেক। তার ভেতর মানুষ পেলে জেলির বেলুন ছেড়ে পাকড়াও করছে। নইলে খানিকটা টহল দিয়ে রাত্রি থাকতে থাকতেই ফের লম্বা দিচ্ছে জলের তলায়।

প্রফেসর তাই শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। উনি তখন হুকুম দিলেন, অ্যাট র‍্যানডম বম্বিং করা হোক। এলোপাতাড়ি বোমা ফেলে যত পারো সামুদ্রিক ট্যাঙ্ক গুঁড়িয়ে দাও। দিয়ে, টাটকা জেলি সংগ্রহ করে বড় বড় পাত্রে এমনভাবে জমা করো যেন বাতাস না ঢোকে, রোদ না লাগে। নতুন হাতিয়ার উদ্ভাবন করা সম্পর্কে যারা যারা গবেষণা করছে, তাদের সবাইকে টাটকা জেলি পাঠিয়ে দাও বরফের মধ্যে রেখে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যাক, কোন হাতিয়ারে দূর থেকে ঘায়েল করা যায় জ্যান্ত জেলিকে।

সঙ্গে সঙ্গে তামিল করা হল হুকুম। হেলিকপ্টার থেকে বেধড়ক বম্বিং-এর ঠেলায় বলতে গেলে একটা সামুদ্রিক ট্যাঙ্কও জলে ফিরতে পারল না। মানুষ মার খেয়ে খেয়ে খেপে ছিল বিলক্ষণ। যারা মেরুর বরফ গলিয়ে লোকালয় ডোবাচ্ছে, তাদের প্রতিনিধিকে পিটুনি দেবার সুযোগ পেয়ে মাত্রা গেল ছাড়িয়ে।

ফলে হল কি, দিনকয়েকের মধ্যেই জলের আতঙ্কেরা জল থেকে বাইরে আসা বন্ধ করে

দিলে। রাতের অমানিশায় হানা শুরু হয়েছিল যেমন আচম্বিতে, শেষও হল তেমনি হঠাৎ। কয়েকটা রাত খামোকা পেট্রল পুড়িয়ে টহল দিল হেলিকপ্টার-বাহিনি! শেষকালে হন্যে হয়ে রিপোর্ট দিল, ব্যাটারা মার খেয়ে পালিয়েছে।

কিন্তু কয়েক রাতের বোমা নিক্ষেপেই কাজ এগিয়ে গিয়েছিল অনেক। বড় বড় পিপে ভর্তি জ্যান্ত জেলির টাটকা নমুনা সংগ্রহ করে এয়ারটাইট পাত্রে বরফের ঠান্ডায় পাঠানো হল নানান বৈজ্ঞানিকদের কাছে। কয়েকটা পাত্র এল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের ল্যাবরেটরিতে।

এই নমুনা থেকেই চরম আবিষ্কার করলেন প্রফেসর। কিন্তু সে কাহিনি বলব এ কাহিনির উপসংহারে।

যতই দিন যাচ্ছিল, ততই জল যেন আরও তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসছিল। প্রফেসরের ভবিষ্যৎবাণীও তাই ছিল। প্রথমদিকে অল্প বরফ গলবে— জলও অল্প বাড়বে। কিন্তু যতই দিন যাবে, বরফগলার পরিমাণও বাড়বে হু হু করে— সেই সঙ্গে জলের ঊর্ধ্বগতি।

কাজেই শীত ফুরোনোর আগেই জোয়ারের জলের সর্বোচ্চ রেখা এসে দাঁড়াল একশো ফুটে।

একশো ফুট! সমুদ্রপৃষ্ঠ সারা পৃথিবীতে উঠে এল একশো ফুট! যেসব বিজ্ঞব্যক্তি অনেক আঁকজোক করে বলেছিলেন, মেরুর সব বরফ গললেও জল একশো ফুটের ওপর যাবে না— তাঁরা এবার শঙ্কিত হলেন।

কেননা, কয়েক মাসের মধ্যেই জল এসে দাঁড়াল একশো পঁচিশ ফুটে।

প্রফেসর বললেন, মূর্খ। সঠিক হিসেব ভগবান ছাড়া কেউ জানে না। দুই মেরুতে ঠিক কতখানি বরফ জমে আছে, তা কি কেউ মেপে রেখেছে? তবে এমন উজবুকের মতো বারফট্টাই ঝাড়া হয় কেন?

এদিকে বরফের চাঁই বঙ্গোপসাগরেও দেখা দিল অগুনতি। সেই সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়া, যা ঝড়ের সামিল। কনকনে সেই বাতাসের দাপটে গভীর রাতে জানলার নীচে যখন ঢেউ উঠত, ছলাৎ ছলাৎ করে জল আছড়ে পড়ত দেওয়ালে, তখন মন কাঁদত আমার মতো জোয়ান ছেলেরও। চাঁদনি রাতে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে। মনুমেন্ট, হাওড়ার পুল, দু'-একটি চিমনি আর আকাশচুম্বী সৌধের ডগা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ত না। মাঝে মাঝে কুয়াশার মধ্যে ভেসে আসত বরফের এক-আধটা চাঙড়।

কলকাতার বুকে বরফ ভাসার সেই দৃশ্য দুরন্ত কল্পনাতেও আনা সম্ভব নয়। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঠান্ডা হাওয়া যখন মাথাকুটে মরত জানলার সার্সিতে, মনে হত কলকাতার প্রেতাত্মা হাহাকার করে ফিরছে। শহরেরও যে প্রাণ থাকতে পারে, শহরেরও যে মৃত্যু হতে পারে— সেদিন তা মর্মে মর্মে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। কলকাতার কান্না আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। আর শুনছিলাম দীর্ঘশ্বাস— অগণিত জলমগ্ন মানুষের দেহমুক্ত আত্মার হাহাকার।

এসবই হয়তো কল্পনা। লস্ট আটলান্টিস নিয়ে অনেক গালগল্পই শুনেছি। শুনেছি আটলান্টা জনপদ সভ্যতার শিখরে উঠেও আটলান্টিকের তলায় সমাধিস্থ হয়েছিল সামান্য

ভূকম্পনে। যুগ যুগ পরে হয়তো সমাধিস্থ কলকাতা নিয়েও এমনি উপকথা রচিত হবে এবং তা শুনে মনে হবে অবিশ্বাস্য, আজগুবি, অসম্ভব!

নিশুতি রাতে দাঁড়িয়ে জলকল্লোল শুনতাম আর কল্পনা করতাম এমনি সব অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য। ভাবতাম, এই কলকাতারই পার্ক স্ট্রিট দিয়ে এখন হয়তো গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে সামুদ্রিক ট্যাঙ্ক, সাদার্ন অ্যাভিনিউতে বসে উড়ন্ত গোলার ভয়ংকর বিভীষিকারা, প্রতিনিধিরা প্ল্যান আঁটছে কী করে শেষ করা যায় পৃথিবীর শেষ মানুষটিকে। দলে দলে সামুদ্রিক ট্যাঙ্ক হয়তো এগোচ্ছে বৌবাজার, সার্কুলার রোড দিয়ে আরও উত্তরে ডাঙার দিকে। সাগরের পাহাড় অঞ্চল পেরিয়ে এরা এসেছে শামুকের গতিতে। কলকাতার পতন ঘটিয়ে এগোচ্ছে আরও উত্তরে শেষ ডাঙাটুকুও দখলে আনবার মতলবে। ভাবতেই শিউরে উঠতাম, রোমাঞ্চিত হতাম। কে জানে, ওরা ঠিক এই জানলার নীচেই ওত পেতে আমাকে দেখছে কিনা। এখুনি হয়তো কিলবিল করে জেলির শুঁড় বেরিয়ে আসবে জল থেকে— অক্টোপাসের মতো আমাকে আঁকড়ে ধরেই চম্পট দেবে চৌরঙ্গী রোডে ওদের আস্তানায়।

রেডিয়োতে এবার সে সাংঘাতিক খবরটা এল, তা শুনে ভাবনায় পড়লাম। গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বাংলার অঞ্চলে। পূর্ব এবং পশ্চিমবাংলা আর কোনও সীমান্ত মানছে না, সরকার মানছে না। অবশিষ্ট বাংলা বাঁচার তাগিদে এক হয়ে গিয়েছে, পার্টিশন বলে কোনও কিছু আর নেই।

গেরিলাযুদ্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই— রাজনীতির লড়াই নয়। কাজেই নতুন ধরনের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। গণবিপ্লব!

সব মিলিয়ে প্রচণ্ড চাপ এসে পড়েছে ওয়ার্ল্ড টেকনিক্যাল কমিটির ওপর। অ্যাদ্দিন ধরে হচ্ছেটা কি? ভিনগ্রহ থেকে আগন্তুক এসে তছনছ করে ছাড়ছে সবকিছু, নাকাল করে দিচ্ছে মানুষকে। তিন-তিনটে হাড়কাঁপানো শীত গেল, জল একশো পঁচিশ ফুট লেভেলে উঠে এল, এখনও কিনা একটা হাতিয়ার আবিষ্কার করা গেল না? তোবা! তোবা! এরই নাম গবেষণা! সৃষ্টি রসাতলে গেলেও বৈজ্ঞানিকদের ধ্যানভঙ্গ বুঝি ঘটবে না।

টিটকিরির বহর শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। এ যে দেখছি উল্টো চাপ! যখন হুঁশিয়ার করা হয়েছিল, তখনও টিটকিরি। এখন মরতে বসেও টিটকিরি!

আমাকে শুধু বললেন, আর সাতটা দিন! তারপর বেঙ্গলি ব্রেনের ভেলকি দেখবে জগৎবাসী।

ঠিক সাতদিন পরে বাস্তবিকই ভেলকি দেখাল বেঙ্গলি ব্রেন। ভেলকি বলে ভেলকি! মেরো তুলোধোনা করার এমন আজব হাতিয়ার কেউ কল্পনাতেও আনতে পারেনি। দুনিয়ার তাবৎ বৈজ্ঞানিকরাই তো আদাজল খেয়ে লেগেছেন। কিন্তু কাজের বেলায় হয়েছিল লবডঙ্কা। শেষকালে ম্যাও সামলালেন এই বেঙ্গলি ব্রেন, মানে, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র!

'বামনগড়ার রশ্মি', 'উড়ন্ত ছাতা' আর 'গরুড়াস্ত্র' আবিষ্কারের চাইতে সহস্রগুণ চাঞ্চল্যকর এই আবিষ্কারে প্রফেসরের নাম মুখস্থ হয়ে গেল পৃথিবীর সবক'টি মুমূর্ষু মানুষের।

আশ্চর্য এই কাহিনি পড়তে পড়তেই অনেকেই হয়তো ভাবছেন, কিম্ভূতকিমাকার

ভিনগ্রহীদের কাণ্ডকারখানা লাটে ওঠানোর জন্যে যে হাতিয়ার, তা নিজেও নিশ্চয় অতীব কিম্ভূতকিমাকার। গোটা কাহিনিটাই যখন আজগুবি জাতীয়, তখন অস্ত্রটাও নিশ্চয় অবিশ্বাস্য ধরনের এবং গড়নের।

না মশাই না। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কেরামতি তো সেইখানেই। তিনি যে হাতিয়ার বানালেন, তা দেখতে অবিকল একটা ট্রানজিস্টর রেডিয়োর মতো। লম্বায় বড়জোর একফুট, চওড়ায় পাঁচ ইঞ্চি আর উচ্চতায় ছ' ইঞ্চি। যেখানে সেখানে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এ যন্ত্র। এমনকী আংটায় চেন বেঁধে সাগরের মধ্যে ডুবিয়ে রাখাও যায়।

অস্ত্রটার পয়লা পরীক্ষা এইভাবেই করেছিলেন প্রফেসর আমার সামনেই। ময়দান-লেকের গা ঘেঁষেই যে বিরাট বাড়িটার ওপরতলায় বসে উনি হাতিয়ার আবিষ্কার করলেন, তার জানলার নীচে জল এসে পৌঁছেছিল। কত রাত আমি মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছি এই জানলার সামনে। ভেবেছি কত উদ্ভট কল্পনা। তার মধ্যে একটা গা-শিরশিরে কল্পনা হল, জানলার ঠিক নীচেই হয়তো ওত পেতে বসে সামুদ্রিক-ট্যাঙ্কের গোটা একটা রেজিমেন্ট। ওদের খতম করার গবেষণাই যে চলছে এই তলায়, সে খবর নিশ্চয় ওরা রাখে ওদের অতি উন্নত কলকবজার সাহায্যে। আমাদের কথাবার্তাও কান পেতে শোনে। তাই বছরের পর বছর ঘাপটি মেরে বসে আছে কবে জানলায় জল পৌঁছবে, শুঁড় নেড়ে ঘরে ঢুকে লণ্ডভণ্ড করবে যতকিছু গবেষণা।

বিদঘুটে এই কল্পনার কথা প্রফেসরকে শুনিয়েছিলাম। উনি খিকখিক করে হেসে বলেছিলেন, 'দীননাথ, আর দুটো দিন সবুর কর। ওরা সত্যিই ওত পেতে আছে কিনা তা হাতেনাতে দেখিয়ে দেব।'

খুব একটা ভরসা পাইনি প্রফেসরের অভয়বাণীতে। সমুদ্রের ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ শব্দে জানলার ফুটখানেক নীচে আছড়ে পড়ছে। আর ক'দিনই বা দেরি? হেলিকপ্টার নিয়ে এবার এ ডেরা ছেড়ে চম্পট দেওয়া দরকার।

দিনকয়েক পরে প্রফেসর একটা বাক্স দেখালেন আমাকে। দেখতে ট্রানজিসটার রেডিয়োর মতো। ডগায় একটা আংটা। আংটায় লাগানো নাইলন দড়ি।

বাক্সটা দেখে ম্লান মুখে শুধিয়েছিলাম, 'নতুন রেডিয়ো নাকি?'

উনি খিকখিক করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। বললেন, 'না, হে না, দিস ইজ বেঙ্গলি ব্রেন। ইলিশ আর চিংড়ি খাওয়া ব্রেন। গোটা পৃথিবী যার জন্যে হাঁ করে বসে আছে, এই হল সেই হাতিয়ার। জলের শত্রু নিধন করার মারাত্মক অস্ত্র। নাম দিয়েছি জিম্ভকাস্ত্র।'

'কী অস্ত্র?'

'জিম্ভকাস্ত্র। রামায়ণ পড়োনি মনে হচ্ছে? জানো না, এ অস্ত্র ছাড়লে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে? আর আমার জিম্ভকাস্ত্র ছাড়লে কী হবে জানো?'

'কী?'

'মরণ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়বে সাগরতলের বিভীষিকারা।'

'কী করে?' প্রশ্নটা করেই বুঝেছিলাম বোকার মতো জিজ্ঞেস করা হয়ে গিয়েছে। টেকনিক্যাল ব্যাপারের আমি কি বুঝব?

প্রফেসর কিন্তু পরমোৎসাহে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বোঝাতে লাগলেন। সব কথা মাথায় ঢুকল না। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে সুপারসনিক, মানে, যে শব্দ কানে শোনা যায় না— এ হাতিয়ারের মূলে আছে তাই। মূল শক্তি হল সেই অশ্রুত শব্দ। এবং অদৃশ্যও বটে। কিন্তু ভয়ংকর তার প্রতিক্রিয়া। জলের মধ্যে বাক্সটা ডুবিয়ে ধরলেই চালু হয়ে যাবে জিম্ভকাস্ত্র। ফল হবে মারাত্মক। শুধু চোখেই দেখা যাবে ফলাফলটা।

প্রফেসরের লম্ফঝম্প দেখে খুব একটা ভরসা পেলাম না। সন্দিগ্ধ মন নিয়েই নাইলন দড়ি ধরে জিম্ভকাস্ত্র ডুবিয়ে দিলাম জানলা দিয়ে বঙ্গোপসাগরের জলে।

মিনিটখানেক দড়ি ধরেই রইলাম। কিছু টের পেলাম না। প্রফেসর ন্যাংলা পিঠ বেঁকিয়ে দেখছিলেন কী হয়। কিন্তু কিছুই না হওয়ায় কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'ফ্রিকোয়েন্সিটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তুলে আনো জিম্ভকাস্ত্র।'

ঈষৎ অনুকম্পার হাসি হেসেই তুলে আনলাম জিম্ভকাস্ত্র। প্রফেসর পিড়িং পিড়িং করে দুটো তার ধরে টানলেন, ক্যাচ ক্যাচ করে দুটো নব ঘোরালেন, পটাং পটাং করে গোটা দুই বোতাম টিপলেন। তারপর 'ম্যাজিক আই'-এর সবুজ আলোয় ফ্রিকোয়েন্সি মেপে নিয়ে ফের জিম্ভকাস্ত্রকে ডুবিয়ে দিলেন জলে। দড়িটা দিলেন আমার হাতে।

এবার টের পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি আঙুলের ডগা বেয়ে শিরশির করে উঠে আসছে কাঁধ বেয়ে মাথা পর্যন্ত। অনুভূতিটা আরামের নয়— যন্ত্রণারও নয়। অথচ সওয়া যায় না।

আমার চোখের অবস্থা দেখেই প্রফেসর ঝাঁ করে দড়ি ছিনিয়ে নিলেন আমার হাত থেকে। নিয়ে, বেঁধে দিলেন জানলার হুকে।

বললেন, 'ঘণ্টাখানেক সবুর করতে হবে। দেখা যাক শয়তানগুলো কতক্ষণ লুকিয়ে থাকে জলের তলায়।'

ঘণ্টাখানেক পরে জানলার দিকে চোখ পড়তেই দেখি জল দুলছে বঙ্গোপসাগরের। এক ঘণ্টা আগেও যে জল ছিল পুকুরের জলের মতো অচঞ্চল, এখন তা দুলে দুলে উঠছে।

দৌড়ে গেলাম জানলার সামনে। এবার স্পষ্ট দেখলাম, বড় বড় ঢেউ উঠছে জলে। মনে হল, জলের তলায় কীসের একটা আলোড়ন চলছে যেন। যেন মস্ত লড়াই চলছে সেখানে। হুটোপুটির শেষ নেই জলের তলায় ময়দানে।

ঢেউয়ের ছিটে ঘরের মধ্যেও এসে পড়ছে দেখে তাড়াতাড়ি সার্সি ভেজিয়ে দিতে গিয়ে দেখলাম, জিম্ভকাস্ত্রর নাইলন দড়ি দিব্বি স্থির। কিন্তু কী আশ্চর্য! জল যেন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

গেল আরও একটা ঘণ্টা। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল উত্তাল জল। ফের ঝিমিয়ে পড়ল মাথা-উঁচু ঢেউগুলো। বেশ বুঝলাম, জল তোলপাড়ের মূল কারণটা আর নেই। মানে, জলের তলায় যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডটা চলছিল, তা থেমে গিয়েছে।

বিমূঢ় চোখে তাকিয়েছিলাম প্রফেসরের দিকে। ফোকলা মাড়ি বার করে বুড়োর সে কি হাসি। চোখাচোখি হতেই খিকখিক করে বললেন, 'কি দেখছ হে দীননাথ? জিম্ভকাস্ত্রর ধোলাইয়ের বহর দেখলে?'

আমতা আমতা করে বলেছিলাম, 'জিম্ভকাস্ত্রর ধোলাই কিনা বুঝব কী করে? ওপর ওপর জলটাই কেবল মাতামাতি করল—'

'আহাম্মক!' বলে খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ নাকি! ওগুলো কী?'

ধমক খেয়ে অভিমান হল খুব। মুখ গোঁজ করে তাকালাম সাগরের দিকে। দেখলাম, ভাসমান কতকগুলো সাগর-ফেনার দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন প্রফেসর। তাল তাল সাদা ফেনা ভাসছে হেথায়-সেথায়।

ঢোক গিলে বলেছিলাম, 'ফেনা। জল তোলপাড় হয়েছে কিনা। তাই ঢেউয়ের ফেনা—'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু।' বলে প্রফেসর এমনভাবে তাকালেন আমার দিকে যেন আমি একটা নেহাত অপোগণ্ড। বললেন, 'ফেনার চেহারা এরকম হয়? জেলি চিনতে পারো না? সাদা জেলি নিয়ে এত গবেষণা করলাম—'

প্রফেসরের বাকি কথাগুলো আর শোনার দরকার ছিল না। চোখের পলকে বুঝলাম, ঢেউ কেন উঠেছে, সাগরতলে কীসের তোলপাড় চলেছে এবং জলে সাদা জেলি কেন ভাসছে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের জিম্ভকাস্ত্র মরণ-মার মেরেছে সাগর দানোদের। সামুদ্রিক ট্যাঙ্ক ফেটে এই জেলি বেরিয়েছে নিশ্চয়।

প্রমাণ সেই জিম্ভকাস্ত্র। দড়ির প্রান্তে তখন ঝুলছিল বাক্সটা। অন্যান্যবারের মতো ওরা দড়ি কেটে গায়েব করতে পারেনি নিরীহদর্শন অস্ত্রটাকে।

পারেনি— কারণ তারা নিজেরাই মরেছে। জিম্ভকাস্ত্রর ধারেকাছে আসতে পারেনি, কিন্তু অস্ত্রর শক্তিপ্রবাহের মধ্যে থাকার ফলে পটল তুলেছে দলে দলে। ধাতুর খোলসের মধ্যে জেলির পিণ্ড মরণযাতনায় ফুলে ফেঁপে উঠে খোলস ফাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, ভাসছে সাগরের জলে।

খবরটা সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়ো মারফত দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিলেন প্রফেসর। ইউরেকা! ইউরেকা! সাগর-আতঙ্কদের সাগরেই বিনাশ করার মোক্ষম অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আনন্দ করুন! জগৎবাসী, আনন্দ করুন! সাগরের জল আর বাড়বে না, কেন না বরফ আর গলবে না, বরফ আর গলবে না কেননা বরফ যারা গলাচ্ছে সেই অগাধ জলের জেলি-জীবরা আর বাঁচবে না।

প্রফেসরের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হল। দিনকয়েকের মধ্যেই জিম্ভকাস্ত্রর আরও কয়েকটা বড়সড় মডেল বানালেন প্রফেসর। তারপর উড়োজাহাজে করে সেগুলিকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হল আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অতল জলের উপদ্রুত এলাকায়।

পরিণাম যা হল, তা নাকি কল্পনাতেও আনা যায় না। বেশ কয়েক জায়গায় থকথকে জেলি ভাসতে দেখা গেল তাল তাল হয়ে। বৈজ্ঞানিকরা আপশোস করে বললেন, হায় রে! বেটারা অক্কা পেল, তবুও চেহারাটা একবার দেখিয়ে গেল না। উড়ন্ত গোলায় চেপে অন্য

গ্রহ থেকে এতদূর এল, এত কাণ্ড করল, মরবার আগে ওপরে এসে চেহারাটা দেখিয়ে গেলে হত না?

ভাসমান জেলি যে শুধু সামুদ্রিক ট্যাঙ্ক ফেটে বেরোয়নি, তাদের স্রষ্টাদের দেহ থেকেও এসেছে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন শুধু একটি কারণে।

সাত সাগরের জল বৃদ্ধি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এরপরের ঘটনা আর ফেনিয়ে লাভ নেই। কাহিনির উপসংহারে শুধু সংক্ষেপে বলা যাক, মাসখানেকের মধ্যে বিস্তর জিম্ভকাস্ত্র বানিয়ে বিশ্বের সর্বত্র জলে ফেলে দিল নতুন রাষ্ট্রসংঘ। ফলে, কত যে জেলি জলে ভাসল, তার আর ইয়ত্তা নেই।

পৃথিবীর মানুষ মরতে মরতে বেঁচে গেল, কেবল প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আবিষ্কৃত জিম্ভকাস্ত্রর দৌলতে।

সাগরপৃষ্ঠ আর ওপরে উঠছে না। তার মানে মেরুর বরফ আর গলছে না। কিন্তু কবে যে নতুন করে বরফ জমবে মেরু অঞ্চলে, সাত সাগরের বাড়তি জল সরে সরে গিয়ে ফের বরফ হয়ে জমা হবে সুমেরু আর কুমেরুতে, তা জানি না।

বলতে পারেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। কিন্তু তিনি ক'দিন ধরেই ছাদে উঠে খুব ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আর ভাবতে চাইছেন না।
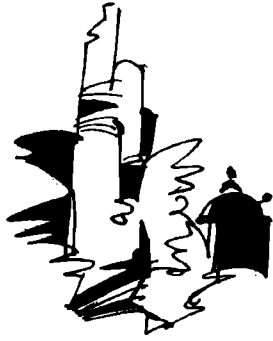
অপার্থিব ভাইরাস

আমার এই কাহিনি কারা বিশ্বাস করবে আর কারা করবে না, তা নিয়ে আমার অন্তত কোনও ভাবনা নেই। আমি জানি, সত্যি ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যের চেয়েও অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু তাই বলে কি সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যায়?

লাল বিভীষিকার শুরু হয়েছিল ভূগোলকের যেখান থেকে দ্রাঘিমা লঘিমা হিসেবে সেখানকার ঠিকানা একুশ ডিগ্রি আটতিরিশ মিনিট উত্তর এবং সাঁইতিরিশ ডিগ্রি বত্রিশ মিনিট পূর্ব। ভূমণ্ডলের তাবৎ বৈজ্ঞানিকরা জায়গাটাকে ওইভাবে চিহ্নিত করে রেখেছে বলেই যে আমাদেরকেও ওইভাবে চিনতে হবে তার কোনও মানে নেই। কেননা সে জায়গা আমাদের ঘরের কাছেই। বলতে গেলে কলকাতা ছেড়ে পা বাড়ালেই।

আমি দীঘার কথা বলছি। অনেকেই জানেন না দীঘা প্রস্তরযুগের আমল থেকেই মানুষের কাছে প্রিয়। দীঘার বালিয়াড়ি খুঁড়ে এই সেদিনও প্রস্তরযুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। দীঘার বিখ্যাত ঝাউগাছও কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক জিমনোস্পার্ম জাতীয় গাছের স্মৃতি বহন করে চলেছে। খুঁটিয়ে কাগজ পড়া আমার চিরকালের অভ্যেস। গাঁটের কড়ি খরচ করে কাগজ কিনি না বলেই যে সুদে আসলে উশুল করে নেব না, তা কী হয়! প্রতিটি লাইন তারিয়ে তারিয়ে না পড়লে যেন কাগজ পড়ার মজাটাই পাই না।

এমনিভাবেই কাগজ পড়ছিলাম দিনকয়েক আগে। লাইনের পর লাইন পড়েই চলেছি এবং হাতের লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে চলেছি। দাগ দিচ্ছি প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের জন্যে। ওঁর এত পড়বার সময় কোথায়? আমি যা দেখিয়ে দেব, সেইটুকুই পড়বেন। তারপর রাশি রাশি গাছগাছড়া আর দিশি যন্ত্রপাতি নিয়ে ছাইভস্ম গবেষণায় নিমগ্ন হবেন।

রাজ্যের কাগজ আসে প্রফেসরের ঠিকানায়। অত কাগজ পড়বার লোভে আমিও আসি রোজ সকালে। সেদিন বিখ্যাত দৈনিকের পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের একদম তলার দিকে চোখ নামিয়ে আনার পর দেখলাম সেখানকার চার লাইন খবরটায় আগে থেকেই কে লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছে।

প্রফেসর নিশ্চয়। তাঁর কাগজে তিনি দাগ দেবেন, এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হলেও ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। কেননা, উনি তো সাত জন্মেও কাগজ ওলটান না। আমি দেখিয়ে না দিলে চোখ তুলেও দেখেন না। তা সত্ত্বেও সাতসকালে খবরটায় দাগ দিতে গেলেন কেন?

সুতরাং কৌতূহলে ফেটে পড়লাম। খবরটা এক পলকে পড়েও ফেললাম। আর একবার পড়লাম। তার পরেও আবার একবার। অবশেষে মাথা চুলকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম লাইন চারটের দিকে। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না এরকম একটা বাজে পানসে খবরে অত যত্ন করে লাল বর্ডার দিতে গেলেন কেন প্রফেসর!

খবরটা এই:

দীঘা। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ, দীঘার ঝাউগাছে এক রকম লাল রোগ দেখা দিয়েছে। রোগের লক্ষণ বড়ই অদ্ভুত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আগাগোড়া লাল হয়ে মরে যাচ্ছে একটির পর একটি গাছ। তারপর হাওয়ার ধাক্কায় ধরাশায়ী হচ্ছে বালির ওপর।

কাগজটা হাতে করেই উঠে গেলাম ভেতরে। সেকেলে আমলের বাড়ি তো। উঁচু দরজা, বেজায় উঁচু কড়িকাঠ, পেল্লায় ঘর। এমনি একটা ঘরে গবেষণা করছিলেন প্রফেসর। গাছপালার ডাঁই সাজিয়ে রেখেছিলেন একপাশে।

আরেকপাশে তারের খাঁচায় খরগোশ, ইঁদুর, একটা খোকা কুমির, বাচ্চা কচ্ছপ, ড্রাগন টাইপের গিরগিটি এবং আরও অনেক বিদঘুটে জন্তু পুষে কী যে ঘোড়ার ডিমের গবেষণা করছিলেন, তা উনিই জানেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম, উনি ভাল করে জবাব দেননি। আমিও আর জিজ্ঞেস করিনি।

কাগজখানা হাতে করে পা দিলাম সেই ঘরে। জানি গিয়ে দেখব বকযন্ত্রের ওপর মাথা নামিয়ে তন্ময় হয়ে গাছগাছড়া সেদ্ধ করছেন প্রফেসর, নয়তো কুমির ছানার গায়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছেন, অথবা খাতা নিয়ে সাঁই সাঁই করে গবেষণার ফলাফল লিখছেন।

কিন্তু গিয়ে দেখলাম ভোঁ ভাঁ। প্রফেসর নেই, ঘর বেবাক খালি। কুমির, গিরগিটি, শুয়োর, খরগোশগুলো জুলজুল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

টেবিলের ওপর একটা কাগজ দেখতে পেলাম। পেপারওয়েট চাপা দেওয়া রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি প্রফেসরের চিঠি। আমাকে লিখেছেন:

দীননাথ,

গুরুতর ব্যাপার। চললাম দীঘায়। না ফেরা পর্যন্ত কুমির-টুমিরগুলোকে খেতে দিয়ো। গাছের টবগুলোয় জল দিও।

—প্রফেসর

আমি চিঠিখানা উলটো করে পড়লাম, সোজা করে পড়লাম, আলোর সামনে রেখে পড়লাম, আগুনের ওপরে রেখে পড়লাম। নাঃ! কোনও গুপ্ত সংকেত নেই চিঠির ভেতরে। লাল মড়কের রহস্যসন্ধানেই প্রফেসর দৌড়েছেন দীঘায়।

সুবোধ বালকের মতো সারাদিন হুকুম তামিল করলাম প্রফেসরের। সন্ধেবেলা শুকনো মুখে বাড়ি ফিরলেন প্রফেসর। ধপ করে টুলে বসলেন।

বললেন বিমর্ষ মুখে, ‘নাঃ! কিছুতেই ধরতে পারলাম না।’

আমি একটি কথাও বললাম না। বলে লাভ নেই। বুড়ো বয়সে একদিনেই দীঘা গিয়ে ফিরে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। আধমরা হয়ে এসেছেন। তার ওপরে যে জন্যে যাওয়া, তাও হয়নি মনে হচ্ছে। খিঁচড়ে আছে মেজাজটা সেই কারণেই। কী দরকার বাবা আগ বাড়িয়ে ঝাঁটা খাওয়ার। নিজেই বলবেন 'খন।

বললেনও। এক গেলাস জল আর দুটো বিস্কুট খেয়ে প্রফেসর যা বললেন তার সারমর্ম খুবই খারাপ।

সকালে খবরটা পড়েই ওঁর টনক নড়েছিল। আর পাঁচটা টনকের মতো মামুলি টনক ওঁর নয়। হলে নড়তই না। কিন্তু প্রফেসর খবর পড়তেই বুঝলেন মড়কটা সুবিধের নয়। দৌড়ালেন দীঘায়। গিয়ে দেখলেন সত্যিই ঝাউগাছগুলোর অর্ধেক সাবাড় হয়ে এসেছে। লাল হয়ে আছড়ে পড়েছে। শুধু গাছ নয়— ঘাস পর্যন্ত লাল হয়ে মরে গিয়েছে। তার চাইতেও অদ্ভুত হল, আশপাশের বালি পর্যন্ত জ্বলে লাল হয়ে গিয়েছে।

বলতে বলতে পকেট থেকে কাগজের কতকগুলো পুরিয়া বার করে টেবিলে রাখলেন প্রফেসর। আমার তর সইল না। খুলে ফেললাম পুরিয়াগুলো। কোনওটার ভেতর দেখলাম লাল বালির নমুনা, কোনওটার মধ্যে লাল পাতার স্যাম্পল। সবই গাছ, পাতা, বালি। পোকামাকড় একটিও নেই।

প্রফেসরকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম কেন নেই। উনি বললেন, 'মড়কটায় পোকামাকড় মরে না— মরছে কেবল গাছপালা।'

বলতে বলতে মাইক্রোস্কোপের তলায় বালি নিয়ে গিয়ে রাখলেন প্রফেসর। আমাকে বললেন, 'কালকে এস।'

পরের দিন সকালে কাক ডাকবার আগেই দৌড়লাম বুড়োর বাড়ি। ঘরে ঢুকে দেখলাম গতকালের মতোই একখানা চিঠি লিখে রেখে প্রফেসর বেরিয়ে গিয়েছেন। ছোট্ট চিঠির গোড়াতেই লিখেছেন, 'দেশের বৈজ্ঞানিকগুলো বিজ্ঞান বিজ্ঞান করেই গেল— খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত পড়ে না। দীঘার মড়ক অজ্ঞাত এক ভাইরাসের জন্যে। ওরা আদাজল খেয়ে সেই ভাইরাসের বংশপরিচয় বার করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। পারবে কী করে? এ যে অজ্ঞাতকুলশীল ভাইরাস। পৃথিবীতে এদের কেউ কোনওকালে ছিল না। আমি তাই চললাম ওদের ঘিলুর মধ্যে আসল খবরটা ঢুকিয়ে দিতে। বনবিভাগ বলে কি জানো? এ মড়ক ঠেকাতে না পারলে পৃথিবীর চেহারাটা হবে মঙ্গলগ্রহের মতো। মাটি পর্যন্ত লাল হয়ে যাবে— গাছপালা কিসসু থাকবে না— ফলে জীবজগৎও ধ্বংস হবে। উজবুকদের কাণ্ড দেখেছ? এরপরেও কিনা অজ্ঞাত ভাইরাস এল কোত্থেকে বুঝতে পারছে না! তুমি এক কাজ করো। যদ্দুর মনে পড়ে, মাসদুয়েক আগে 'যুগমণি' কাগজের সপ্তম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে একখানা খবর আমাকে দেখিয়েছিলে। তারিখটা পনেরোই সেপ্টেম্বর বলেই বিশ্বাস। কাগজখানা বার করে পড়ে নিয়ো। আমি এসে শুনব।'

প্রফেসরের স্মৃতিশক্তি এককথায় রিমার্কেবল। অতীতে সে প্রমাণ বহুবার পেয়েছি। অত সাল-তারিখ কীভাবে যে মনে রাখেন ঈশ্বর জানেন। কম্পিউটার মেশিনও অত ক্ষমতা রাখে কিনা সন্দেহ।

তাই পনেরোই সেপ্টেম্বরের 'যুগমণি' বার করে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম সপ্তম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের আজগুবি খবরখানা।

এ কাহিনি যাঁরা পড়েননি, তাঁদের অবগতির জন্য পুরো খবরটাই ছোট্ট করে লিখে দিচ্ছি এখানে।

মাসদুয়েক আগে এক বাঙালি ভদ্রলোক দীঘার লাল পাথরের বেঞ্চিতে বসে সমুদ্রের ঢেউ গুনছিলেন। তখন ভোর চারটে। সবে অন্ধকার ফিকে হতে আরম্ভ করেছে। সৈকতাবাস এবং অন্যান্য হোটেল থেকে কেউ বেরোয়নি। সমুদ্রসৈকত ফাঁকা। আকাশ নীল। মেঘ একদম নেই। ভদ্রলোক বসে ভাবছিলেন, আচ্ছা, পুরীর জল কী সুন্দর নীল— দীঘার জল এমন ঘোলাটে কেন?

ঠিক সেই সময়ে একটা সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল মাথার ওপর। প্রথমে অতটা খেয়াল করেননি। হাওয়ায় অমন বাঁশি বাজে হরবখৎ। সমুদ্রের হাওয়া তো। ভয়ানক দুরন্ত।

কিন্তু শিস দেওয়ার মতো আরও একটা শব্দ যখন আচমকা শোনা গেল সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে, তখন আর ভদ্রলোক চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না। আওয়াজটা আসছিল পুবদিকের ঝাউবনের ওপর থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকালেন নেহাতই কৌতূহলবশে।

এবং চমকে উঠলেন।

পুবের আকাশ তখনও রাঙা হয়নি। সূর্যদেব তখনও সাতঘোড়ার রথ বার করেননি। তবুও কেন দূর আকাশ অমন রাঙা হয়ে উঠেছে? কেন একটা জ্বলন্ত গোলা উল্কাবেগে ধেয়ে আসছে?

উল্কা নাকি? উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। আওয়াজটা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। সেই সঙ্গে শিস দেওয়ার মতো তীক্ষ্ণ শব্দ। দাউদাউ করে জ্বলতে জ্বলতে বস্তুটা কিন্তু এগিয়ে আসছে এমন একটা গতিবেগে যাকে উল্কার গতিবেগ বলা যায় না। উল্কা হলে তো চোখের পলকে খসে পড়ত। কিন্তু এটা যেন একটা উড়ুক্কু যান। প্রচণ্ড গতিবেগে আকাশ থেকে নেমে এলেও গতিবেগ কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে জমির কাছাকাছি এসে। গতিবেগ যত কমছে সোঁ সোঁ আর কু-উ-উ-উ-উ শব্দ দুটো ততই বেড়ে চলেছে।

ভদ্রলোক ততক্ষণে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। জ্বলন্ত যন্ত্রযান নেমে আসছে তাঁর দিকে। সৈকতের ওপর ভেঙে পড়তে পারে— ওঁকেও শেষ করে দিতে পারে। তাই লাফ দিয়ে বেঞ্চি টপকে রাস্তা পেরিয়ে পালাতে গিয়ে পড়লেন বিপদে।

কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ছিল বেশ খানিকটা জায়গা, পরে সৈকত উদ্যান করার জন্যে। ভদ্রলোকের ধুতি হাওয়ায় উড়ে গিয়ে আটকে গেল সেই কাঁটাতারে।

বিষম আতঙ্কে কাঁটাতার থেকে ধুতি ছাড়াতে ছাড়াতেই উড়ন্ত জ্বলন্ত বস্তুটা এগিয়ে এল আরও কাছে। পুবদিকের বালিয়াড়ির মাথায় সারি সারি ঝাউয়ের মাথা উড়িয়ে দিল মড়মড় শব্দে। সেই ঝাক্কাতেই সামান্য বেঁকে ছুটে গেল সমুদ্রের দিকে।

সমুদ্রে আছড়ে পড়ার আগে সভয়ে দেখলেন ভদ্রলোক একটা সাদা গোলবস্তু— লকলকে আগুন ঘিরে ধরলেও দেখতে পেলেন কতগুলো অদ্ভুত যন্ত্র বেরিয়ে রয়েছে গা থেকে। মাথাটা পিরামিডের মতো।

এর বেশি আর দেখা যায়নি। খুব পাতলা ঢিল জলের ওপর ছুড়ে দিলে যেমন লাফাতে লাফাতে অনেক দূরে গিয়ে তবে টুপ করে ডুবে যায়, উড়ন্ত জ্বলন্ত কিম্ভুতকিমাকার বস্তুটাও ঠিক সেইভাবে জল ছুঁয়েই তুরুক তুরুক করে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল গভীর সমুদ্রে— তারপর গেল তলিয়ে।

এই হল মূল ঘটনা। এরপর রং চড়েছিল কিনা ঈশ্বর জানেন। তবে ভদ্রলোক বানিয়ে বলার লোক নন। প্যারিসে তাঁর নিজের বাড়ি আছে। দীঘায় ওই বস্তুটি সত্যিই ফ্লাইং সসার কিনা— তা তিনি হলফ করে বলেননি।

কিন্তু কাগজওয়ালারা এই মওকা কখনও ছাড়ে? দিনকয়েক রেষারেষি আরম্ভ হয়ে গেল সবক'টা দৈনিক পত্রিকায়। অন্তত দিনসাতেকের জন্যে বাংলায় যা কখনও ছিল না, তাই হয়ে গেল— দৈনিক সায়েন্স-ফিকশন পত্রিকা। কত রগরগে চনমনে গল্প আর ছবিই না ছাপা হল। কেউ লিখল, কিছুদিন আগেই নাকি একটা উড়ন্ত পিরিচ দীঘায় দেখা গিয়েছে। দেখেছে এক জেলে— খুব ভোরে। পরে নাকি খবর এসেছে দারুণ চকচকে একটা সাদা বস্তু পাকিস্তান, ইরান, তুরস্কের ওপর দিয়ে ইতালি ডিঙিয়ে প্যারিস টপকে আটলান্টিকের দিকে নেমে গিয়েছিল। ঠিক যেন একটা সরলরেখা বরাবর বঙ্গোপসাগর থেকে আটলান্টিকের দিকে উড়ে গিয়েছিল উড়ুক্কু ব্যোমযান।

আর একটা ক্ষুদ্র দৈনিক খেই তুলে নিয়ে শুনিয়ে দিলে আর একখানা রোমাঞ্চকর কাহিনি। ফ্লাইং সসার আটলান্টিকের দিকেই তো যাবে। ওদের ঘাঁটি তো ওইখানেই— বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলে— যার নাম দেওয়া হয়েছে 'শয়তানের ত্রিকোণ'। কয়েকশো প্লেন, জাহাজ আর মানুষ নিখোঁজ হয়ে যায়নি রহস্য থমথমে ওই অঞ্চল থেকে? কে না জানে। অন্যগ্রহ থেকে ফ্লাইং সসাররা ওইখানে আসে কেবল পৃথিবী গ্রহ থেকে মানুষ, জাহাজ, প্লেন লুঠ করার জন্যে। ওরা চায় নমুনা। সবুজ গ্রহ থেকে অনেক স্যাম্পল নিয়ে ফিরতে চায় নিজেদের গ্রহে। তাই ওরা আসছে মহাকাশ থেকে ফোর্থ ডাইমেনশনের মধ্যে দিয়ে বার্মুডা অঞ্চলে, নিঃসাড়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আস্ত প্লেন, আস্ত জাহাজ, আস্ত মানুষ। সেই ওরাই যখন দীঘায় হাওয়া খাওয়া শুরু করছে, তখন সাধু সাবধান, সর্বনাশের আর দেরি নেই।

এই ধরনের বহুবিধ রসালো গল্পে সরগরম হয়েছিল পনেরোই সেপ্টেম্বরের পরের কটা দিন। প্রফেসর ভ্রূক্ষেপ করেননি। দাগ দিয়ে দিতাম। উনি পড়তেন কিনা জানি না, মন্তব্য করতেন না। গাছগাছড়া আর কুমির-গিরগিটি নিয়ে দিবারাত্রি কী যে করতেন ঈশ্বর জানেন।

কিন্তু এতদিন পরে তিনি নিজে থেকেই বলছেন পুরনো খবরে চোখ বুলিয়ে নিতে। বলছেন দীঘা থেকে ফিরেই লাল বালির রহস্যকে মাইক্রোস্কোপের তলায় প্রত্যক্ষ করার পর।

তবে কী... তবে কী...

হঠাৎ একটা খলখল আওয়াজ শুনলাম যেন মাথার মধ্যে। স্পষ্ট মনে হল কে যেন বিশ্রী গলায় হেসে উঠল। অথচ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ঘরের মধ্যে জন্তু ছাড়া মানুষ কাউকে দেখতে পেলাম না।

তখন সন্ধ্যে নামছে। সারাদিন এই ঘরেই বসে কাগজ পড়েছি আর জন্তুদের খেতে দিয়েছি, গাছে জল দিয়েছি। বদ্ধ ঘরে থেকে মাথা ঘুরছে নিশ্চয়। স্নায়ুবিভ্রম। বাইরে বেরিয়ে আসা দরকার।

একচক্কর বেরিয়ে বাড়ি গিয়ে মাংস-টাংস সেঁটে ফের এলাম প্রফেসরের ল্যাবরেটরিতে। বাইরে থেকে দেখলাম আলো জ্বলছে ল্যাবরেটরিতে; প্রফেসর তা হলে এসে গেছেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম ঘাড় বেঁকিয়ে যথারীতি কেমিক্যাল ফোটাচ্ছেন।

আমি গিয়ে পাশে বসলাম। উনি আড়চোখে দেখলেন, কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকবার পর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রফেসর।'

'বলো।'

'কিছু হল?'

'কী হবে?'

'লাল মড়কের রহস্য?'

'রহস্য? রহস্য আবার কোথায়! সব তো পরিষ্কার।'

'ফ্লাইং সসার থেকে পৃথিবীর ওপর আক্রমণ তা হলে শুরু হয়ে গেছে?'

'সেই কথাটা বলতে গিয়েই তো মুখঝামটা খেয়ে এসেছি,' বোমার মতো ফেটে পড়লেন প্রফেসর।

'বলতে গেলেন কেন? যা বিশ্বাস করা যায় না, তা বলতেই-বা যাওয়া কেন?'

'দ্যাখো ছোকরা, জ্ঞান দিতে এসো না। আমার কাজ আমি করছি। এখন বুঝুক ওরা ঠ্যালা। গোমুখ্যুর দল! আমাকে বলে কিনা বাহাত্তুরে!' এমন সময়ে কানের কাছে আবার সেই খলখল হাসি শুনলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তারপরেই খুব মৃদু স্পষ্ট গলায় কে যেন বললে:

'বাহাত্তুরে ওরাই— আপনি নন।'

প্রথমটা প্রফেসরও বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন বুঝি আমি কথা বলছি। তারপরেই খেয়াল হল আমিও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি বক্তার সন্ধানে। অমনি সচমকে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

খলেখলে হাসিটা আবার শোনা গেল কানের কাছে... না, না, মাথার মধ্যে। একদম ভেতরে বসে কেন যেন পৈশাচিক হাসি হাসছে। পরক্ষণেই আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠস্বর। কিন্তু তা আশ্চর্য মধুর— পিশাচকণ্ঠের গলা বলে মনেই হয় না।

'যদি অনুমতি করেন, সামনে আসতে পারি।'

'আসতে কে বারণ করেছে?' খ্যাঁক করে উঠলেন প্রফেসর।

চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল একটি বিচিত্র মূর্তি। আপাদমস্তক উজ্জ্বল রুপোর মতো বস্ত্রে ঢাকা। হাতে ওই কাপড়েরই দস্তানা। মুখে একই বস্ত্রের মুখোশ— চোখের জায়গায় ইলেকট্রিক বালবের মতো দুটো নীল ক্রিস্টালের গোলক। হাত পা ঘাড় মাথা— অবিকল মানুষের মতোই। কিন্তু রুপোলি বস্ত্রের আচ্ছাদনে দৃষ্টিগোচর নয় কিছুই।

বিচিত্র মূর্তি মুখ না নেড়ে বললে, ‘পৃথিবীতে একমাত্র আপনিই আঁচ করেছেন লাল মৃত্যুর রহস্য। তাই অভিনন্দন জানাতে এলাম।’

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললেন প্রফেসর, ‘কোন গ্রহ থেকে আসছেন?’

‘এককালে কোন গ্রহে ছিলাম, সেটা শুনলে চলবে?’

‘বললেই হয়।’

‘মঙ্গল গ্রহ।’

‘সেখানে প্রাণ নেই।’

‘কিন্তু মানুষের মুখের অনুকরণে তৈরি একটা পাথরের ছবি তুলে এনেছে আপনাদের ভাইকিং স্পেসক্র্যাফট।’

‘ওটা চোখের ভুল। মঙ্গলে জীবিত প্রাণী নেই।’

‘নেই তো বটেই। কিন্তু আগে ছিল।’

‘আপনি?’

‘তাদেরই একজন।’

‘এখানে থাকা হয় কোথায়?’

‘সৌরজগতেরই অন্য এক অঞ্চলে।’

‘ঠিকানা?’

‘বলব না।’

‘তা হলে আসা হল কেন?’

‘আপনার উপকারের জন্যে।’

‘উপকার তো যথেষ্ট হচ্ছে দেখছি। কাজের মধ্যে বাগড়া না দিলেই কি নয়?’

‘কাজ তো আপনার দানব সৃষ্টি।’

‘কে বলেছে?’

‘আমাদের বলতে হয় না। পৃথিবীর কোন মক্কেল কী করছে সব খবর আমরা রাখি।’

‘তা হলে আর কী! কেতাত্থ করেছেন। এখন বিদেয় হন।’

‘গাছের সঙ্গে জন্তু মিশিয়ে দানব তৈরির গবেষণা চালিয়ে যান প্রফেসর— যদি বাঁচতে চান।’

‘কেন, মারবেন নাকি?’

‘আপনি তো ভারী খিটখিটে লোক মশায়? পৃথিবীর লোকের ভাল করতেও নেই দেখছি।’

‘কী ভাল করতে আসা হয়েছে জানতে পারি?’

‘লাল মড়ক—’

‘কী! কী বললেন? লাল মড়ক ঠেকানোর ওষুধ আপনি জানেন?’

‘এতো আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়লাম। ওষুধ আমরা জানি না বলেই তো মঙ্গল গ্রহ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলাম। কিন্তু এখানে এসে দেখছি আপনি সে ওষুধ না জেনেশুনেই বার করে বসে আছেন।’

'আমি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি। কথা আর বলতে দিচ্ছেন কোথায়। মঙ্গলগ্রহও এককালে পৃথিবী গ্রহের মতো সবুজ সুন্দর ছিল— আপনাদের পৃথিবীতে তখন ডাইনোসরের রাজত্ব। তারপর কোত্থেকে মহাশূন্য থেকে ভেসে এল সর্বনেশে এক ভাইরাস। সে ভাইরাসের খপ্পরে মরে কেবল গাছপালা— অনেক চেষ্টা করেও ঠেকানো গেল না ভাইরাসের আক্রমণ। মাটি পর্যন্ত লাল হয়ে গেল মঙ্গলের। গাছপালা শেষ হয়ে গেল। খতম হয়ে গেল জীবজগৎও। মুষ্টিমেয় আমরা ক'জন পালিয়ে গেলাম সৌর জগতের অন্য এক অঞ্চলে— কলোনি বানিয়ে থেকে গেলাম জন্ম জন্ম। মাঝে মাঝে স্পেসশিপ নিয়ে আসি পৃথিবীর আকাশে। দূর থেকে সবুজ পৃথিবীকে, দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি— মাটি স্পর্শ করি না পাছে ভাইরাসের আক্রমণে পৃথিবী ছারখার হয়ে যায়। আশ্চর্য ব্যাপার কী জানেন, মঙ্গল গ্রহের অনুকূল পরিবেশে মহাশূন্যের আগন্তুক ভাইরাস সক্রিয় হয়েছিল— আমাদের নতুন কলোনিতে তা নিষ্ক্রিয় ছিল— কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে আবার তা সক্রিয় হয়েছে।'

মঙ্গলের আগন্তুকের নীল ক্রিস্ট্যালের মতো চক্ষু আবরণ দপদপ জ্বলে উঠল কয়েক বার।

'ছোট্ট একটা দুর্ঘটনার ফলে এই ভাইরাস নেমেছে পৃথিবীর মাটিতে। আমাদেরই একটা ফ্লাইং সসার মাস দুই আগে হঠাৎ ভেঙে পড়ে দীঘার ওপর দিয়ে সমুদ্রের জলে। আগুনেও মৃত্যু নেই যে ভাইরাসের। ঝাউয়ের মাথায় ছুঁয়ে তারা ফিরে পেয়েছে নতুন প্রাণ।— প্রফেসর, আমরা দায়ী পৃথিবীর আসন্ন সর্বনাশের জন্য। তাই ছুটে এসেছি জীয়নকাঠির সন্ধান দিতে।'

নীল আলোর মতো ঘন ঘন জ্বলছে আগন্তুকের চোখের ক্রিস্ট্যাল।

'আপনি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গবেষণা করছেন। গাছের সঙ্গে জন্তু জোড়া লাগিয়ে গাছ-জন্তু দানব তৈরি করছেন। ওই দানবের দেহে ঢুকিয়ে দিন ভাইরাসটা। যে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, তাই দিয়ে সিরাম তৈরি করে ছড়িয়ে দিন লাল মাটিতে— দেখবেন ভাইরাস আর সুবিধে করতে পারছে না মারাত্মক সেই প্রতিষেধকের কাছে।'

অবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'গোরুর গায়ে বসন্তের বীজ ঢুকিয়ে টীকা তৈরির মতো!'

'এগজ্যাক্টলি।' বলে হাত বাড়িয়ে প্রফেসরের সঙ্গে করমর্দন করল। বিষম উত্তেজনায় হাতটা জোরেই চেপে ধরেছিলেন প্রফেসর। এক ঝটকায় খুলে গেল দস্তানা। সভয়ে দেখলাম কাচের মতো স্বচ্ছ মাংসের একটা হাত দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্ট।

ভীষণ বিরক্ত হয়ে ঝটিতি হাত তুলে প্রফেসরের নাক মলে দিয়ে সাঁৎ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মঙ্গলের আগন্তুক। একটু পরেই একটা প্রায় অশ্রুত অদ্ভুত শব্দ শুনলাম এবং তীব্র একটা আলোর ঝলক দেখলাম বাইরে। এর পরের ঘটনা সবাই জানে। দীঘার লাল মড়ক পৃথিবী ছেড়ে পালিয়েছে। মূলে কে, এখন তা জানা গেল তো?

কেমিক্যাল এক্স

১. কফিন চুরি

সকালবেলা কাগজ খুলেই চমকে উঠলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা চাঞ্চল্যকর একটা সংবাদ। খবরটা একবার পড়লাম, দু'বার পড়লাম, তিনবার পড়লাম। রয়টারের খবর যদিও; অবিশ্বাস করার কিছু নেই। তবুও যেন চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে অসম্ভব সেই সংবাদ।

স্যার আইজ্যাক ক্যারম্যানের কফিন উধাও!

লিটলরক। যুক্তরাষ্ট্র। আরকানসাসের রাজধানী লিটলরকে এত বড় ঘটনা কখনও ঘটেনি। বিশ্ববিশ্রুত চিত্রাভিনেতা এবং চিত্রপরিচালক স্যার আইজ্যাক ক্যারম্যানের কফিন গির্জার প্রাঙ্গণ থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে গত তেরোই নভেম্বর। স্যার আইজাক ক্যারম্যান আরকানসাস নদীর পাড়ে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন আশি বছর আগে। শৈশবে বাবা-মাকে হারান এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি কৈশোরে পদার্পণ করেন। উত্তরকালে উনিই পৃথিবীর লোককে হাসিয়েছেন তাঁর অনবদ্য কৌতুক-অভিনয় দিয়ে। ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং স্যার উপাধি পান। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর তাঁর নশ্বর দেহকে যেন সমাহিত করা হয় আরকানসাস নদীর তীরে সেই ছোট্ট গির্জাটিতে যেখানে তাঁর বাপ-মায়ের নশ্বরদেহ সমাহিত হয়েছে। লিটলরকে কলকারখানা নেই— আছে বিস্তর খনি আর চাষের জমি। তুলো, বক্সাইট, কয়লার ব্যাবসা, বস্ত্র, কাঠের জিনিস আর তুলোর বীজের বস্তু উৎপাদনই এ অঞ্চলের দেড় লক্ষ লোকের রুজিরোজগারের একমাত্র উপায়। প্রায় সত্তর হাজার নিগ্রো বাসিন্দার সঙ্গে ১৯৫৭ সালে যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বেঁধেছিল স্থানীয় শ্বেতকায় বাসিন্দাদের, তারও অবসান ঘটিয়েছিলেন স্যার আইজ্যাক ক্যারম্যান। তিনি নিজে এসেছিলেন লিটলরকে, নদীর ধারে দুই পাহাড়ের

অজস্র দুর্গম গুহায় গিয়ে দুর্বৃত্তদের অস্ত্রশস্ত্র নিজের হাতে উদ্ধার করেছিলেন এবং বুকঢালা ভালবাসা দিয়ে জীবন বিপন্ন করেও দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি শুধু অভিনয় করেই যে পৃথিবীর মানুষের মন জয় করেননি— এই ঘটনাই তার প্রমাণ। লিটলরকের সত্তর হাজার নিগ্রো বাসিন্দাও আজ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে স্যার আইজ্যাকের কফিন লুঠ হওয়ায়। তিনি অজাতশত্রু। জীবদ্দশায় যাঁর কোনও শত্রু ছিল না ভূগোলকের কোনও অঞ্চলেই, মৃত্যুর পর তাঁর নিষ্প্রাণ দেহটার ওপর কাদের এত আক্রোশ— এ রহস্য ভাবিয়ে তুলেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরক্ষাবাহিনীকে। এফবিআই এবং পিনকারটন ন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সি একযোগে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

স্যার আইজ্যাকের কফিন নেই! সেই শ্বেতশুভ্র হাসি উজ্জ্বল একমাথা সাদা চুলওয়ালা মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। নাতিদীর্ঘ ছোটখাটো মানুষ। চেহারায় ব্যক্তিত্ব নেই, কিন্তু জাদু ছিল কথা বলার ভঙ্গিমায়। সারা জীবন উনি মানুষকে হাসিয়েছেন নিজের জীবনভোর দুঃখের কাহিনি সরসভাবে শুনিয়ে। সেইখানেই তাঁর সার্থকতা।

কাগজটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। স্যার আইজ্যাকের ভূসম্পত্তি নেহাৎ কম নয়। আধপেটা খেয়ে যাঁর ছেলেবেলা কেটেছে, রাজার ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। কুবের সম্পদ দান করে গিয়েছেন অনাথ আশ্রমে। নিজের জন্যে রেখেছিলেন ছ' ফুট লম্বা আর দু' ফুট চওড়া শুধু একটা কাঠের বাক্স। অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে তৈরি সস্তা কফিনে অনাড়ম্বরভাবে শেষ শয্যা রচনা করেছিলেন অখ্যাত একটা নদীর ধারে, নিভৃত এক পল্লীতে।

কিন্তু সেখানেও তিনি শান্তি পেলেন না। উধাও হল মরদেহ। মাসখানেক এই নিয়ে কাগজে কাগজে কী ধরনের লেখালেখি চলেছিল, কাগজ যাঁরা নিয়মিত পড়েন, সেখবর তাঁরা রাখেন। স্যার আইজ্যাকের কফিন লুঠকে সম্বল করে খবরের কাগজের কাটতি বাড়িয়ে ফেলল সম্পাদকেরা। তারপর কালের নিয়মে একদিন থিতিয়ে এল উত্তেজনা, তিরোহিত হল চাঞ্চল্য— অন্যান্য খবরের স্রোতে চাপা পড়ে গেল স্যার আইজ্যাক ক্যারম্যানের কফিন লুঠের অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

তারপরেই আবার চমকে উঠল পৃথিবীর মানুষ।

সক্কালবেলা কাগজ খুলে বিষম বিস্ময়ে ঝড়ের মতো পড়ে গেলাম সেই ছোট্ট সংবাদটা।

স্যার আইজ্যাক ক্যারম্যানের কফিন ফিরে এসেছে

লিটলরক। যুক্তরাষ্ট্র। গত চোদ্দোই ডিসেম্বর লিটলরকের শেরিফ একটা উড়ো চিঠি পেয়ে লোকজন নিয়ে গির্জার প্রাঙ্গণে দৌড়ে গিয়ে দেখেছেন স্যার আইজ্যাক ক্যারম্যানের কফিন যথাস্থানেই রয়েছে। কফিনের মধ্যে স্যার আইজ্যাকের নশ্বর দেহও বিরাজ করছে। অভূতপূর্ব

এই ঘটনায় সারা যুক্তরাষ্ট্র স্তম্ভিত। উড়ো চিঠির বয়ান খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু রীতিমতো রহস্যজনক। চিঠি যিনি লিখেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে স্যার আইজ্যাকের গুণমুগ্ধ অনুরাগী। লিখেছেন: 'অসামান্য মানুষটার সামান্য দেহটা আর দরকার নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তিনি মরেননি— পৃথিবীবাসী সে প্রমাণ শিগগিরই পাবে।' প্রকাশ, ব্ল্যাক ম্যাজিক, অর্থাৎ ডাকিনীতন্ত্র নাকি নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে পাশ্চাত্যে। পিশাচবিদ্যায় উৎকট বিশ্বাস নিয়ে হয়তো কেউ স্যার আইজ্যাকের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের যুগে এই উদ্ভট তত্ত্ব নিছক কপোলকল্পনা সন্দেহ নেই।

ডাকিনীতন্ত্র আর স্যার আইজ্যাক ক্যারম্যানকে এই লাইনে ফেলে ভাবতে রাজি নই আমিও। কিন্তু স্যার আইজ্যাককে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার জন্যেই যদি লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তো আবার তা ফিরিয়ে দেওয়া হল কেন? ফিরিয়ে দেওয়ার পরেও কেন বলা হল সামান্য দেহটার আর দরকার নেই?

রহস্য, রহস্য, সত্যিই বিরাট রহস্য!

২. ব্রেন লুঠ

চেকোস্লোভাকিয়ার বোহেমিয়ার প্রদেশের স্ট্রেডোসেসকি অঞ্চলে এই অতি প্রাচীন শহরটির নাম পৃথিবীর সবাই জানে। চেকোস্লোভাকিয়ার সুমিষ্ট উচ্চারণে এ শহরের নাম প্রাহা— খটমটে ইংরেজিতে লেখা হয় প্রাগ্। আশ্চর্য, এই কাহিনির দ্বিতীয় অংকের রঙ্গমঞ্চে এই প্রাহা শহর।

প্রাহা জগদ্বিখ্যাত এর প্রাচীনত্বের জন্যে। শহরের পাশ গিয়ে বয়ে চলেছে ভিটালভা নদী। ব্যাবসাবাণিজ্য, কলকারখানা আর ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে যাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আজকের প্রাহা খ্যাতি অর্জন করলেও বোদ্ধাদের কাছে প্রাহার আকর্ষণ অন্য কারণে। যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ— সবই এখন এ শহরে নির্মিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কৃষ্টি আর সংস্কৃতির পীঠস্থান রূপে সারা ইউরোপে অগ্রণী হয়ে থাকবে ভিটালভা তীরবর্তী এই সুপ্রাচীন নগরীটি। টুরিস্টরা ঝেঁটিয়ে আসেন প্রাহার অনন্যসাধারণ ভাস্কর্যশিল্প দেখে নয়ন সার্থক করতে।

পাঠক আপনিও আসুন। না না, ৬৩০ বছরের পুরনো চার্লস ইউনিভার্সিটি আর ২৭১ বছরের প্রাচীন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি পরে দেখবেন। আপনি চলে আসুন চারশো বছরের বৃদ্ধ টাউন হলের পাশ দিয়ে পাউডার টাওয়ারকে পেছনে ফেলে। ভিটালভার ওপর নির্মিত দ্বাদশ সেতুর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত যেটি, চতুর্দশ শতকে তৈরি সেই চার্লস ব্রিজের উপরে আসুন। ওই যে অতিকায় স্টেডিয়ামটি দেখছেন, ওটি কিন্তু নির্মিত হয়েছে আধুনিককালে। এক সঙ্গে দু' লক্ষ ক্রীড়ামোদীর বসবার উপযুক্ত ক্রীড়াঙ্গন কলকাতায় বসে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ব্রিজ থেকে নদীর পাড় বরাবর কিছুটা পথ গেলেই ওই যে বিরাট প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছেন, ওটি কিন্তু সুবিখ্যাত হ্রাডকানি প্যালেস নয়— সেখানে

এখন বোহেমিয়ার রাজারা আর থাকেন না— থাকেন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট। এই প্রাসাদটি রাজপ্রাসাদের অনুকরণেই নির্মিত। এখানে থাকেন চার্লস ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য এক প্যাথলজিস্ট— ড. স্ট্রাহোভ।

পাঠক, আপনার গতি সর্বত্র। আপনার আর বায়ুর পথরোধ করার ক্ষমতা দুনিয়ার কারও নেই। প্রাসাদ-প্রহরীদের দেখে তাই শংকিত হওয়ার কারণ নেই। আসুন এই অধমের পেছনে।

আসুন মাঝের বড় হলঘরটিতে। উঁহু, করেন কী? দেওয়ালে প্রলম্বিত তৈলচিত্র, দানবিক মুকুর আর দেওয়াল বরাবর টেবিলে সাজানো মর্মরমূর্তি দেখানোর জন্যে আপনাকে ডাকিনি। আপনি এসেছেন ব্রেন-লুটেরার দ্বিতীয় কীর্তি দেখতে।

বিশাল টেবিলটার মাথায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শুষ্ক, অত্যন্ত দীর্ঘ, অত্যন্ত বৃদ্ধ ওই যে পুরুষটি, ওঁরই নাম ড. স্ট্রাহোভ। প্যাথলজি, অর্থাৎ রোগনিরূপণ বিদ্যায় তিনি দুনিয়াবিখ্যাত।

টেবিল ঘিরে যাঁরা ওর কথা শুনছেন, নোটবই খুলে লিখছেন, টেপরেকর্ডার চালিয়ে রেকর্ড করছেন এবং ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছেন— তাঁরা এসেছেন এই ভূগোলকের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রসংস্থা থেকে— এসেছেন ড. স্ট্রাহোভের যুগান্তকারী গবেষণার বিষয়বস্তু জানতে।

গবেষণাটা কী নিয়ে তা আপনিও জানেন। সৌরজগতের এই তৃতীয় গ্রহের হেন অঞ্চল নেই যেখানে সংবাদটি পৌঁছয়নি। সামান্য এই গ্রহের নগণ্য মানুষ প্রজাপতির অন্যতম হয়েও যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে অঙ্ক কষে মস্তিষ্ককোষে ধারণ করতে পেরেছিলেন, ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন এবং জগৎসংসারের বহু অব্যাখ্যাত রহস্যের সমাধান শুনিয়েছিলেন— প্রাতস্মরণীয় পদার্থবিদ সেই মার্শাল কনওয়ের ব্রেন নিয়ে রিসার্চ চলছে স্ট্রাহোভের এই গবেষণামন্দিরে।

মার্শাল কনওয়ের নতুন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এত বড় বিজ্ঞানী এ গ্রহে কখনও জন্মাননি। প্রকৃতই অতিমানুষ যদি কাউকে বলা যায়, তবে তিনি মার্শাল কনওয়ে। মাত্র পাঁচ ফুট হাইটের পাঁচজনের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার মতো আকৃতি নিয়েও ভূগোলকে অনন্য হতে পেরেছেন কেবল অসাধারণ মস্তিষ্কশক্তির জন্যে।

অত্যন্ত গোপন এই গবেষণা সেই মস্তিষ্কটা নিয়েই।

খুব উত্তেজিতভাবে বলছেন ড. স্ট্রাহোভ, 'আমি নিভৃত সাধনায় মগ্ন। খবরের কাগজের লোকদের দু' চক্ষে দেখতে পারি না। তা সত্ত্বেও—'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে টিপ্পনি কাটল একজন তরুণ সাংবাদিক। বাংলার বিখ্যাত দৈনিক গল্প পত্রিকার প্রতিনিধি সে, 'খবরের কাগজের লোকেদের ব্রেনটাও ব্রেন, ড. স্ট্রাহোভ।'

'তাতে আমার সন্দেহ আছে,' চাঁচাছোলা কণ্ঠে বললেন প্যাথলজিস্ট। 'ব্রেন যাদের নেই, তারাই ইনসিওরেন্সের দালাল, সেলসম্যান আর নিউজপেপারের রিপোর্টার হয়।'

ঘর নিস্তব্ধ। ছুঁচ পড়ার আওয়াজ শোনা যায়। ড. স্ট্রাহোভ অতিশয় দুর্মুখ এবং উগ্রমেজাজী। সংবাদে প্রকাশ, এক দুঃসাহসী সাংবাদিক লুকিয়ে-চুরিয়ে মার্শাল কনওয়ের ব্রেন রিসার্চ দেখতে এসে ধরা পড়ে যায় তাঁর হাতে। তিনি বুলটেরিয়ার কুকুর দিয়ে তাকে প্রাসাদের

বাইরে বার করে দিয়েছিলেন। স্ট্রাহোভের কুকুরশালায় এক ডজন কুকুর সব সময় মজুত থাকে সাংবাদিকদের ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে। দৈনিক গল্প পত্রিকার রিপোর্টারটি সে-খবর জানে বলেই কিল খেয়ে হজম করে গেল— আর ট্যাঁ-ফুঁ করার সাহস পেল না।

ড. স্ট্রাহোভ তাঁর অত্যন্ত দীর্ঘ, অত্যন্ত শুষ্ক বপুটিকে টানটান করে বললেন, 'আপনারা সভ্যসমাজের কলঙ্ক, আপনারা পৃথিবীর প্রগতির অন্তরায়, আপনারা যে কী নন, তা এই মুহূর্তে বলে শেষ করার মতো সময় আমার নেই। আপনাদের ডেকে এনেছি শুধু এই কথাটাই বলার জন্যে। আপনারা আমার সাধনায়, আমার গবেষণায়, আমার সত্যসন্ধানে যথেষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করেছেন— অনুগ্রহ করে আর করবেন না।'

সোভিয়েত সংবাদদাতা ট্রিফোনভ সাদা পাথরের মূর্তির মতো এতক্ষণ বসেছিলেন কোলের ওপর সচল টেপরেকর্ডার রেখে। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক, দেবদূতের মতো আকৃতি, চুল চোখ চামড়া— সবই সোনালি। এখন মৃদুকণ্ঠে কেবল বললেন, 'কিন্তু আমাদের অপরাধটা না বললে কী করতে হবে না, বুঝব কী করে?'

ব্যস, আর যায় কোথায়? আগুন তো জ্বলছিলই, এখন তাতে ঘিয়ের ছিটে দেওয়া হল। পটপটিয়ে জ্বলে উঠলেন বৃদ্ধ স্ট্রাহোভ।

'হোয়াট ননসেন্স! ন্যাকা আর বোকাদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আপনি জানেন না বলতে চান? আমার সিক্রেট ল্যাবরেটরিতে ঢুকে মার্শাল কনওয়ের ব্রেন দেখে দ্যাট ফেমাস ব্লাইটার মাইকেল জোসেফ চুটিয়ে প্রবন্ধ লিখে কাগজের সার্কুলেশন বাড়াতে গিয়ে যুগান্তকারী এই রিসার্চে বাগড়া দিয়েছে— আপনি তা জানেন না?'

নিরীহ কণ্ঠে ট্রিফোনভ বললেন, 'মাইকেল জোসেফ, মানে, ডেলি মিস্ট্রি ম্যাগাজিনের এডিটর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।' স্ট্রাহোভ যেন প্রায় তাথৈ তাথৈ নৃত্য করতে লাগলেন প্রত্যেকটা 'হ্যাঁ' বলার সঙ্গে সঙ্গে।

'কিন্তু তিনি তো আপনার রিসার্চে বাগড়া দেননি? তিনি যা করেছেন, জনগণের স্বার্থে তাকে অন্যায়ই বা বলি কি করে? মার্শাল কনওয়ে বেঁচে থাকবার সময়ে প্রায় বলতেন, আমার ব্রেনটাই আমার ল্যাবরেটরি। আরও বলেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর বিস্ময়কর ব্রেন নিয়ে যেন উপযুক্ত গবেষণা হয়।'

'নতুন কথা কিছু বলছেন না মিস্টার... মিস্টার...'

'ট্রিফোনভ।— আমার নাম ট্রিফোনভ। সোভিয়েত রিপোর্টার।'

'আপনি যে দেশেরই রিপোর্টার হন না কেন, চর্বিতচর্বণ করে অযথা আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।'

'চর্বিতচর্বণ আপনিই আরম্ভ করেছেন, ড. স্ট্রাহোভ', খুব আস্তে করে বললেন ট্রিফোনভ। দুঁদে সাংবাদিক। একদম রাগতে জানেন না। 'আমরা যে সংবাদসন্ধানী, তা জেনেও আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটবার জন্যে। আমি সেই কথাটাই বলতে চাই। আপনি যা বলবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমরা তা জানি। জেনেছি মাইকেল জোসেফের দুঃসাহসিকতার জন্যে। বাড়িটাকে আপনি কেল্লা বানিয়ে রেখেছেন। ইলেকট্রিক অ্যালার্ম,

সেনট্রি আর শিকারি কুত্তা দিয়ে সুরক্ষিত রেখেছেন। কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষ যা জানতে চায়, সেই সংবাদ সংগ্রহ করতে এসে মাইকেল জোসেফ আপনার সব বাধাই অশরীরীর মতোই অতিক্রম করে গিয়েছে। ড. স্ট্রাহোভ, শব্দটা স্মরণে রাখবেন, প্রয়োজনবোধে এই রিপোর্টার ব্লাইটাররা অশরীরীর মতোই সর্বত্র গমনে সক্ষম হয়— মাইকেল জোসেফও—'

একটা কড়মড় আওয়াজ শোনা গেল ড. স্ট্রাহোভের মুখবিবরে। দাঁত কিড়মিড় করতে গিয়ে বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে ফেলেছেন বৃদ্ধ।

দৃকপাত না করে মুহূর্তের জন্যেও বিরতি না দিয়ে ধীর স্থির সংযত দৃঢ়কণ্ঠে ট্রিফোনভ চালিয়ে গেলেন বাক্য রোলার।

'—আপনার গোপন ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দেখে এসেছি সুবিখ্যাত সেই পাথরের বয়েম।'

ঘর নিস্তব্ধ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই শুনছে মাইকেল জোসেফের বহুপঠিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। এমনকী, বৃদ্ধ প্যাথলজিস্টও দন্তঘর্ষণ স্থগিত রেখে নির্নিমেষে নিরীক্ষণ করছেন ট্রিফোনভের দেবদূত আকৃতি।

'পাথরের বয়েমে টলটলে পরিষ্কার জলের মতো আরকে ভাসছিল কয়েকখণ্ড বস্তু... ধূসর মুঠি-সমান স্পঞ্জের মতো তুলতুলে চেহারার একটা জিনিস। আর একটা আলাদা থলির মধ্যে ফুলে ওঠা ফেঁসোর মতো গোলাপি সাদা একটা সুতোর বাণ্ডিল। খুব সামান্য জিনিস যেন— কিন্তু জীবদ্দশায় এই সামান্য বস্তুর ধীশক্তি স্তম্ভিত করেছে বিশ্ববাসীকে। ড. স্ট্রাহোভ, এই কারণেই বিশ্ববাসীর দাবি আছে মার্শাল কনওয়েয়র ব্রেন-সংক্রান্ত কৌতূহল চরিতার্থ করার।'

'মি. ট্রি—'

'এখনও শেষ হয়নি আমার কথা। আপনি বলছেন মাইকেল জোসেফ তস্করের মতো ঢুকেছে আপনার গবেষণামন্দিরে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তস্কর শব্দটা আপনি ব্যবহার করেননি— কিন্তু মানেটা তাই। ড. স্ট্রাহোভ, আমি যদি বলি আপনি নিজেও সেই কুকর্মটি করেছেন, অস্বীকার করতে পারেন কি?'

খুব আস্তে, কিন্তু নিপুণ লক্ষ্যে মোক্ষম মার মেরেছেন ট্রিফোনভ। ঘা দিয়েছেন স্ট্রাহোভের দুর্বলতম পয়েন্টে। স্পষ্টত টলমল করে উঠলেন বৃদ্ধ। কথা আটকে গেল। মুখখানা গনগনে হয়ে উঠল।

বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো না করে অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে ট্রিফোনভ বলে চললেন, 'মার্শাল কনওয়েয়র একান্ত ইচ্ছে মৃত্যুর পর তাঁর ব্রেন যেন নষ্ট করা না হয় এবং তাই নিয়ে যেন গবেষণা করা হয়। কিন্তু তিনি এই গুরুভার বিশেষ কারও ওপর ন্যস্ত করে যাননি। ড. স্ট্রাহোভ, আপনি সেই সুযোগ নিয়েছিলেন।'

সূচ্যগ্র চোখে চেয়ে রইলেন ড. স্ট্রাহোভ।

ট্রিফোনভ বললেন, 'ব্রেন নিয়ে যে এমন কাড়াকাড়ি পড়বে, আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক তা বুঝতে পারেননি। তাই সেরকম ব্যবস্থা করতে পারেননি। বহু প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এল মার্শাল কনওয়েয়র ব্রেন নিয়ে তথ্যানুসন্ধান চালানোর জন্যে— কেউ কেউ শুধু একটু অংশ

চাইলে বিশ্লেষণের জন্যে। কিন্তু আপনি কাউকেই ব্রেন স্পর্শ করতে দিলেন না। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াল। কিন্তু যেহেতু মার্শাল কনওয়ের শেষ চিকিৎসা আপনি করেছিলেন এবং করোটি থেকে ব্রেন আপনি সরিয়েছিলেন, তাই মামলায় জিতে গেলেন। তারপর তেইশ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। সুদীর্ঘ এই তেইশ বছর বিশ্বের বিস্ময় এই মগজ নিয়ে আপনি কী গবেষণা করেছেন, গবেষণায় কী ফল লাভ করেছেন— তা সর্বৈব গোপন রেখেছেন? কেন? ড. স্ট্রাহোভ, জবাব দিন, কেন? আপনার চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অভাব নিশ্চয়ই নেই এই পৃথিবীতে। মার্শাল কনওয়ের ব্রেনের কোন উপাদানের জন্যে তিনি অতিমানুষ আখ্যা পেয়েছিলেন— জানবার কৌতূহল এদের সবার আছে, দাবি আছে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের— কেননা তাঁদের মঙ্গলের জন্যেই সারা জীবন সাধনা করেছিলেন মার্শাল কনওয়ে, তাঁদের হিতের জন্যেই দান করে গিয়েছেন তাঁর রহস্যময় মগজ। কিন্তু আপনি তস্করের মতো সেই মগজকে সরিয়ে এনে গোপন করে রেখেছেন দীর্ঘ তেইশটি বছর এবং একান্ত স্বার্থপরতার মতো গবেষণার ফল থেকে বঞ্চিত করেছেন পৃথিবীর মানুষকে। বলুন, ড. স্ট্রাহোভ, এ অপকর্ম আপনি কেন করেছেন? তবে কি ধরে নেব আপনি ব্যর্থ হয়েছেন আপনার গবেষণায়? তাই সংবাদসন্ধানীদের ঠেকিয়ে রাখতে চান তফাতে?'

শেষের দিকে মৃদু কিন্তু তীব্র ভৎর্সনার আকারে প্রতিটি শব্দ ছুড়ে ছুড়ে দিলেন ট্রিফোনভ। থরথর করে কাঁপছিলেন ড. স্ট্রাহোভ। জবাব দেবেন কী! সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সৎসাহস কী সবার থাকে। ট্রিফোনভ হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন।

তাই দু'হাতে টেবিলের প্রান্ত চেপে ধরলেন বৃদ্ধ— সাদা হয়ে গেল আঙুলের গাঁট। নিরক্ত মুখে কী যেন বলতে গেলেন..

এমন সময় বেজে উঠল সামনের টেলিফোন।

বেঁচে গেলেন যেন স্ট্রাহোভ। তক্ষুনি জবাব দেওয়ার দায় থেকে সাময়িক অব্যাহতি যদিও, তবুও মনটাকে সুস্থিত করার পক্ষে যথেষ্ট। খপাৎ করে রিসিভার তুলে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'হ্যালো?'

তারের মধ্যে দিয়ে কী কথা ভেসে এল, তা ডক্টরই জানেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর শোনা গেল না। শিথিল মুষ্টি থেকে খসে পড়ল রিসিভার, দুই চোখের তারা আস্তে আস্তে উঠে গেল ওপরদিকে, বেঁকে দুমড়ে গেল দুই হাঁটু, সশব্দে ভূলুণ্ঠিত হলেন বৃদ্ধ প্যাথলজিস্ট।

দৌড়ে গেল সাংবাদিকরা। দেখল, জ্ঞান হারিয়েছেন বৃদ্ধ।

খবরটা সেইদিনই দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কলকাতায় বসে রেডিয়োতে শুনলাম আমি সেই চমকপ্রদ সংবাদ।

মার্শাল কনওয়ের কিংবদন্তিসম ব্রেন চুরি হয়ে গিয়েছে পাথরের বয়েমের মধ্যে থেকে।

৩. মড়া উধাও

ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সূর্য মুখার্জিকে চেনে না এমন শিক্ষিত মানুষ ত্রিভুবনের কোথাও নেই। তিনি মোট ৩৪টা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন এবং তার দ্বিগুণ ভাষা পড়তে পারেন।

সূর্য মুখার্জি দরিদ্র সন্তান। বাবা ছিলেন হুগলী জেলার এক গ্রামের টোলের পণ্ডিত। সাত ছেলের কনিষ্ঠতম সূর্য মুখার্জি বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভের জন্যে কলকাতা এলেন, শীলস ফ্রি কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা সাঙ্গ করলেন এবং সরকারি সাহায্য অর্জন করলেন অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ।

সেই থেকে ধাপে ধাপে নাম, যশ, খ্যাতি অর্থের শিখর থেকে শিখরে এগিয়ে চললেন সূর্য মুখার্জি। বিশ্বপর্যটন করেছেন একাধিকবার, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন বহুবার, ভাষা-সংক্রান্ত গবেষণায় বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন বারংবার।

অশীতিপর ড. সূর্য মুখার্জি কিন্তু একটুও পালটাননি। আত্মমগ্ন বলেই বাইরের প্রশস্তিতে মোহগ্রস্ত হননি। শিশুর মতো সরল তিনি এখনও। আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালির মতোই এখনও ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবি পরেন। সাদার্ন এভিন্যুর তিনতলা ইমারতের চিলেকোঠা থেকে সিঁড়ির ধাপ এবং পাতালকুঠরি পর্যন্ত সর্বত্র ঠাসা বিবিধ দুষ্প্রাপ্য কেতাব নিয়ে মশগুল হয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের মতো অকারণে কেউ বিরক্ত করলে রেগে যান, কিন্তু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুরু করলে রাশি রাশি বই টেনে এনে ঠিক পাতাটি খুলে ধরে লাইন পড়ে শুনিয়ে দেন, মুখে মুখে হাজার রকম উদ্ধৃতি বলে যান। জীবন্ত বিশ্বকোষ বলতে যা বোঝায়, ড. সূর্য মুখার্জি তাই। গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, ক্ষীণ দৃষ্টি এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সামনে এলেই আপনা থেকেই মাথা হেঁট হয়ে আসে— পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে যায়। উনি বাধা দেন না। চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি অমুকের ছেলে না? বাবা কীরকম আছে? ডক্টরেট করছিলে শুনছিলাম, শেষ করেছ?'

ড. সূর্য মুখার্জি অজাতশত্রু। এমন মানুষের শত্রু থাকা সম্ভব নয়। তাড়া খেয়ে যারা বাড়ি থেকে পালানোর পথ পায়নি, তারাও তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে।

আশি বছর বয়সে উনি শিক্ষার্থী। কিছুতেই আশ মেটে না পড়াশুনায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খুঁতখুঁত করতে থাকেন চোখে আর ভাল দেখতে পারছেন না বলে, আস্তে আস্তে রাতকানা হয়ে যাচ্ছেন বলে। অমুক প্রবন্ধটা লিখতে হবে, অমুকের বইটা পড়ে ভালমন্দ সমালোচনা করতে হবে, অমুক ভাষার গভীরতা নিয়ে অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যেতে হবে— কিছুই হচ্ছে না চোখটার জন্যে।

কলকাতার বিখ্যাত চোখের ডাক্তাররা প্রায় সবাই তাঁর চিকিৎসা করছেন। মাস ছয়েক ধরেই চোখের দৃষ্টি মোটামুটি উন্নত করার প্রচেষ্টাও চলছে। এত হাই ব্লাড প্রেসারে চোখ চোখ করে অষ্টপ্রহর যেন উৎকণ্ঠায় না থাকেন, এমন পরামর্শও দু'বেলা দেওয়া হচ্ছে।

এমন সময় একটা ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্টে শেষ হয়ে গেলেন ড. সূর্য মুখার্জি।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে লেক থেকে হেঁটে ফিরছিলেন বৃদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ। গাড়ি চড়তে চাইতেন

না নেহাৎ প্রয়োজন না হলে। বলতেন, 'টোলের পণ্ডিতের ছেলে আমি। অত লাটসাহেবি আমাকে মানায় না। পা দু'খানা রয়েছে কেন?'

সাদার্ন এভিন্যু পেরনোর সময় ঘটল দুর্ঘটনাটা।

মোটর সাইকেল চালানো প্র্যাকটিস করছিল একজন তরুণ। থ্রি-পয়েন্ট ফাইভ হর্স পাওয়ারের মোটামুটি হেভি মোটর সাইকেল। এখনও ক্লাচ-গিয়ার-ব্রেক ম্যানেজ করে উঠতে পারেনি। তাই 'এল' প্লেট লাগিয়ে সাতসকালে বেরিয়েছে দূরস্থিত সাদার্ন এভিন্যুতে হাত পাকাতে। সূর্য ওঠার আগে এত ভোরে গাড়ি ঘোড়ার ভিড় থাকে না এ রাস্তায়।

সূর্য মুখার্জি এই সময়ে ফুটপাথ থেকে নামলেন রাস্তায়। চোখে ভাল দেখতে পান না। অথচ খামোকা চশমা চোখে রাখেন না। ওঁর কাছে চশমার দরকার শুধু পড়াশুনা করার সময়, প্রভাত বায়ুসেবনে চশমা নিষ্প্রয়োজন। তাই যন্ত্রটিকে কালো কারে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখেন গলায়। গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে বলে হাতে যষ্টি পর্যন্ত রাখেন না। আপন মনে ফুটপাথ থেকে নেমে আত্মচিন্তায় তন্ময় হয়ে হনহন করে চলে এলেন পথের ঠিক মধ্যিখানে।

অন্যমনস্ক থাকায় শুনতেও পেলেন না উল্কাগতিতে ভট ভট ভট শব্দে ছুটে আসছে দ্বিচক্রযানটি। হর্নও বাজছে একনাগাড়ে। চালক আন্দাজ করে নিয়েছিল সাড়ে তিন অশ্বশক্তির প্রচণ্ড নিনাদে আর হর্নের তীব্র আর্তনাদে নিশ্চয় সচকিত হয়ে আর এগুবেন না বৃদ্ধ।

হিসেবে ভুল হয়ে গেল সেইখানে। সুচালক কখনও ঝুঁকি নেন না। তার লক্ষ্য থাকে দুটি— নিজেকে বাঁচানো, আরেকজনকে বাঁচানো। কিন্তু নবীন চালক এই সতর্কতা বেশ কয়েকবার ঠেকবার পর শেখে। যেমন, শিখল টু-হুইলারের বর্তমান চালক। শিখেও আর কাজে লাগল না।

হাত আর পা তখনও সড়গড় হয়নি। ব্রেক-ক্লাচ-গিয়ার পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনমতো প্রয়োগ করার দক্ষতা তখন রপ্তও হয়নি। হেনকালে নক্ষত্রবেগে ধাবমান যন্ত্রযানের সামনে গট গট করে সটান এসে গেলেন শক্তসমর্থ চেহারার এক বৃদ্ধ— আওয়াজ টাওয়াজে কর্ণপাত করলেন না— ফিরেও তাকালেন না।

ফলে যা ঘটবার তা ঘটে গেল।

আচম্বিতে ভোরের নৈঃশব্দ্য খানখান হয়ে গেল প্রলয়ংকর আওয়াজে। শব্দ শুনে দৌড়ে এলেন বায়ুসেবীরা। এসে দেখলেন রাস্তার দু'দিকে ঠিকরে পড়ে দুটি দেহ— নিস্পন্দ। আর একদিকে বনবন করে চাকা ঘুরছে রাস্তায় শয়ান দ্বিচক্রযানের— বিনা নোটিশে ভূলুণ্ঠিত হওয়ায় বিষম প্রতিবাদে তখনও গর্জে চলেছে সাড়ে তিন অশ্বশক্তি।

যন্ত্র থাকুক, মানুষদুটোকে আগে দেখা যাক। দেখতে গিয়ে দেখা গেল, তরুণ চালকের শিরস্ত্রাণবিহীন করোটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে সংঘাতের ফলে— মগজ ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়।

বৃদ্ধের দেহে প্রাণ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। চুপচাপ চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছেন আকাশের দিকে মুখ করে। মাথা ভাঙেনি চালকের মতো, তবে...

পাঞ্জাবির পকেটে বলপয়েন্ট পেন নিয়ে বেরিয়েছিলেন বৃদ্ধ। আচমকা ধাক্কায় এই

পেনটাই সূচিতীক্ষ্ণ ছুরিকার মতোই বিদ্ধ হয়ে রয়েছে তাঁর বাম বক্ষে। বেরিয়ে রয়েছে কেবল ক্লিপের অংশটুকু—

অর্থাৎ পৌনে এক পাউন্ড ওজনের যে দেহযন্ত্রটি বছরে চার কোটি বিশ লক্ষ বার স্পন্দিত হয়ে একটা বিরাট ফুটবল স্টেডিয়াম ভাসিয়ে দেওয়ার মতো রক্ত পাম্প করে এসেছে এতদিন প্রায় দশ একর বিস্তৃত সূক্ষ্ম রক্তজালিকার মধ্যে দিয়ে— সামান্য একটা বলপয়েন্ট পেনের অনধিকার প্রবেশের ফলে অকস্মাৎ তা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে চিরতরে।

বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পৃথিবী এখন ছোট হয়ে গিয়েছে। শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদটা বলতে গেলে চক্ষের নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভূগোলকে। অগণিত গুণমুগ্ধ মানুষ ছুটে এল শেষ দর্শনের বাসনা নিয়ে, এল সাধারণ মানুষ দলে দলে শোকস্তব্ধ চিত্তে। সূর্য মুখার্জি তাঁদের কাছে একজন খাঁটি বাঙালি ছাড়া কিছুই নন— তেলে-জলে মানুষ, ডাল-ভাত-শুক্তো আর পলতার বড়া খাওয়া অতি সাধারণ বঙ্গসন্তান।

মৃতদেহ রেখে দেওয়া হল বাইরের ঘরে। কাতারে কাতারে মানুষ এল সারা সকাল, সারা দুপুর, সারা সন্ধে। রাতদুপুরে ক্ষীণ হয়ে এল জনস্রোত। রাত একটায় নিস্তব্ধ নির্জন হল সাদার্ন এভিন্যু। জনহীন রাস্তায় মৌন আলোকস্তম্ভগুলো কেবল শেষ পাহারা দিয়ে চলল সেই বৃদ্ধ দেহটিকে এতকাল যার শক্তসমর্থ দেহটা হন হন করে হেঁটে গিয়েছে তাদের শুষ্ক দীর্ঘ বপুর গা ঘেঁষে।

আচম্বিতে সচকিত হল মৌন আলোকস্তম্ভরা। সেই মূহূর্তে যদি ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা পেত জড়দেবতার কৃপায়, তা হলে আকাশফাঁটা চেঁচিয়ে তারা বলত— জাগো! জাগো! সবাই জাগো!

কিন্তু জড়দেহে প্রাণসঞ্চার তো সম্ভব নয়। তাই নিশীথ রাতের সেই আশ্চর্য কাণ্ডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া আলোকস্তম্ভগুলোর করণীয় আর কিছুই রইল না।

তারা দেখল, সভয়ে সবিস্ময়ে তারা দেখল, অকস্মাৎ প্রায় নিঃশব্দে কৃষ্ণকায় জাগুয়ারের মতো একটা মসীকৃষ্ণ গাড়ি এসে দাঁড়াল সূর্য মুখার্জির বাড়ির সামনে। গাড়ির ভেতর কোনও আলো নেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে খুলে গেল দরজা। নেমে এল কৃষ্ণপরিচ্ছদে আপাদমস্তক আবৃত শরীরী বিভীষিকার মতো চার ব্যক্তি। প্রত্যেকের পিঠে হাতখানেক লম্বা চোঙার মতো একটা বস্তু বেল্ট দিয়ে বাঁধা। চোঙা থেকে একটা নল বেরিয়ে এসেছে— নলের মুখ প্রত্যেকেই ধরে রয়েছে ডান হাতে। মুখে মুখোশ। সাধারণ মুখোশ নয়। গ্যাস মুখোশ। অন্ধকার রাতে তাই চারজনকে চারটে প্রেতচ্ছায়ার মতোই মনে হচ্ছে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মার্জারের মতো বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হল চারজন। হাতের নল থেকে ফুসফুস করে বেরিয়ে এল বর্ণহীন গ্যাস। গাঢ়তর হল বাড়ির লোকজনের নিদ্রা।

একটু পরেই বেরিয়ে এল চার আগন্তুক। ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এল ড. সূর্য মুখার্জির নশ্বর দেহ।

৪. রহস্যময় চিঠি

পরের দিন সকালে ঝরঝরে শরীরে নিদ্রাভঙ্গ ঘটল বাড়িশুদ্ধ লোকের। দীর্ঘকাল এমন ঘুম কেউ ঘুমোয়নি। শরীরে যেন নতুন শক্তি ফিরে এসেছে।

কিন্তু খটকা লাগল সূর্য মুখার্জির পালঙ্ক শূন্য দেখে। মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোবে সেইদিনই সকাল দশটায়। সেইভাবেই প্রস্তুতি হয়েছে। এত সকালে তো মৃতদেহ সরানোর কথা নয়।

দেহটা তবে গেল কোথায়? প্রথমে বিস্ময়, তারপর ভয়, সর্বশেষে দেখা দিল আতঙ্ক। সূর্য মুখার্জি উধাও হয়েছেন রাতারাতি।

এমন সময়ে একজন একটা চিরকুট আবিষ্কার করল রাশি রাশি ফুল ছড়ানো পালঙ্কের ওপর। সারাদিন ধরে কতজনে লেবেল লাগানো কত ফুলের মালা আর স্তবক রেখে গিয়েছে। সবাই ভেবেছিল এই কাগজটিও সেই ধরনের একটি লেবেল। কিন্তু একজনেরই খটকা লাগল কাগজটা আলপিন দিয়ে বালিশে গাঁথা রয়েছে দেখে। হেঁট হল। এবং দেখল ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে লেখা চার লাইনের ছোট চিঠি। কে লিখেছে বা কাকে লিখেছে, সেসব নামের বালাই নেই।

বাংলায় তর্জমা করলে চিরকুটের বয়ান এইরকম দাঁড়ায়:

'সূর্য মুখার্জি হিন্দুর ছেলে। হিন্দুমতেই তাঁকে দাহ করা হবে। সেই কারণেই দেহটা আর ফেরত দেওয়া হবে না।'

* * *

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রর ল্যাবরেটরি।

একহাতে নস্যির ডিবে নিয়ে আর এক হাতে ওঁর শিক্ষিত শিম্পাঞ্জি রবির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আমার কথা শুনছেন প্রফেসর। এতদিন উনি নিউ ইয়র্কে ছিলেন, বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। পরপর এতগুলো ঘটনা তাই ওঁকে বলতে পারিনি। কাল রাতে শুতে যাচ্ছি, এমন সময়ে হোঁক হোঁক আওয়াজ করতে করতে ঘরে ঢুকল রবি। ওর গলায় সবসময়ে ঝোলে খাতা পেনসিল। ঝপাঝপ লিখে জানালে, দীননাথদা, প্রফেসর এসে গেছেন।

সকালবেলা বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে রেডিয়োতে শুনলাম সূর্য মুখার্জির মৃতদেহ উধাও হওয়ার সংবাদ। বাড়ির কেউ জানে না কখন কে এসে এমন হৃষ্টপুষ্ট লাশটাকে নিয়ে ভাগলবা হয়েছে। কারও ঘুম ভাঙেনি— বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে ঘুমটা ভালই হয়েছে। চিরকুটটা না পাওয়া গেলে তো বোঝাই যেত না মৃতদেহ গেল কোথায়। পাছে সবাই ভেবে মরে, তাই দয়া করে শবদাহ-সংক্রান্ত বিষয়টি চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে চোরমহাপ্রভু।

কিন্তু কেন? মৃত্যুর পরেও কেন তাঁর দেহ নিয়ে টানাটানি?

প্রফেসর নস্যি নিলেন। কোনও কথা বললেন না।

আমি আপন মনেই বকে চললাম। সূর্য মুখার্জির ব্যাকরণ পড়েছি স্কুলে। বাংলা ভাষায় যদি কিছু জ্ঞানলাভ করে থাকি, তবে তাঁর মগজের কল্যাণেই।

ঠিক এই সময়ে প্রফেসর খুব আস্তে বললেন, 'ঠিক বলেছ। মগজটাই যত নষ্টের মূল।'

'মগজটা নষ্টের মূল হতে যাবে কোন দুঃখে?'

'উঁহু, আমার মন কিন্তু বলছে ওইরকম একখানা ব্রেন পেয়েছিলেন বলেই মরেও শান্তি পেলেন না তিনি।'

'তার মানে?'

'মার্শাল কনওয়ের ব্রেন চুরি হল কেন বলো।'

বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মগজের কোষে কোষে ঝলসে ইঠল মার্শাল কনওয়ের মগজ চুরির বৃত্তান্ত।

'আপনিও শুনেছেন?'

'বোকার মতো কথা বোলো না। মার্শাল কনওয়ের ব্রেনটা নিশ্চয় তোমার ব্রেন নয় যে চুরি গেলেও কাকপক্ষীও টের পাবে না?'

'না, তা ঠিক নয়,' আমতা আমতা করে বললাম, 'কিন্তু তার সঙ্গে এই ব্যাপারের কী সম্পর্ক?'

'ইডিয়ট।'

আমি চুপ করে রইলাম। মার্শাল কনওয়ের ব্রেন নিয়ে তেইশ বছর রিসার্চ করেও স্ট্রাহোভ কিছু করতে পারেননি বলেই সেই ব্রেন চুরি করেছে প্রতিপক্ষ কোনও বিজ্ঞানী। সেটা আলাদা ব্যাপার। প্রফেসর যেন জোর করে একটা ব্যাপারের সঙ্গে আর একটা ব্যাপার জোড়া লাগাতে যাচ্ছেন। সূর্য মুখার্জির মৃতদেহ চুরির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই; থাকতেও পারে না।

প্রফেসর সশব্দে নস্যি নিলেন। হোঁক হোঁক করে উঠল রবি। বাঁদর কোথাকার! যখন তখন এমন টিটকিরি দেয় যে গা-পিত্তি জ্বলে যায়।

নস্যগ্রহণ সমাপ্ত করে প্রফেসর মৃদু-মন্থর কণ্ঠে ফের বললেন, 'উজবুক!'

এবার গেলাম খেপে, 'বার বার গালাগাল দিচ্ছেন কেন?'

'তোমার পিগমি ব্রেনটাও যদি জ্যান্ত চুরি যেত, খুশি হতাম। ওটা নিয়েও রিসার্চ করা দরকার। তোমার চাইতে এই রবির ব্রেনও অনেক সরেস।'

'দেখুন প্রফেসর—'

'শাট আপ।— স্যার আইজ্যাক কারম্যানের কফিন চুরি যাওয়ার পরেও ফেরৎ এল কেন?'

'ব্ল্যাক ম্যাজিকে যারা বিশ্বাসী, তারাই নিয়ে গেছিল বলে, পরে এফবিআই আর পিনকারটনদের ভয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

'তোমার মাথা।— সব খবর পড়েছিলে?'

'আলবাৎ পড়েছি।'

‘লিটলরকের শেরিফ একটা চিঠি পেয়ে, গিয়ে দেখেছিলেন কফিন ফিরে এসেছে। কী লেখা ছিল চিঠিতে মনে আছে?’

‘অত কী মনে থাকে—’

‘সেইজন্যেই তোমার ব্রেনটা আমার দেখা দরকার। লেখা ছিল, অসামান্য মানুষটার সামান্য দেহটা আর দরকার নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তিনি মরেননি— পৃথিবীবাসী সে-প্রমাণ শিগগিরই পাবে।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই কথাই লেখা ছিল বটে।’

‘কেন লেখা ছিল?’

‘কেন আবার, অত বিখ্যাত লোকের লাশ লুকিয়ে রাখার সাহস হয়নি বলে।’

‘আচ্ছা মাথামোটা তো? পত্রলেখক লিখেছিল আর দরকার নেই। তার মানে কি এই নয় যে দরকারটা তার মিটে গেছে?’

‘কী দরকার?’ বললাম তেরিয়া মেজাজে। কত আর খ্যাঁকখ্যাকানি সওয়া যায়।

‘সেই জবাবটা জানবার জন্যেই লিটলরকে গিয়েছিলাম আমি।’

‘আপনি!’

‘হ্যাঁ। খবরটা কাগজে বেরোয়নি, রেডিয়োতে বলা হয়নি, টিভিতে প্রচার হয়নি— আমিই জানাইনি।’

‘কেন?’

‘কেননা আমি যা জেনেছি, তা শুনলে পৃথিবীর মানুষ ভয় পেয়ে যাবে বলে।’

‘কীসের ভয়?’

‘চিঠির শেষ লাইনটা অত্যন্ত রহস্যজনক। স্যার আইজ্যাক নাকি মরেননি— পৃথিবীবাসী সে-প্রমাণ শিগগিরই পাবে। মানে কী, দীননাথ?’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, ‘ওর মধ্যে কোনও রহস্য নেই। রহস্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে— আদতে ফক্কা ব্যাপার। মড়া বাঁচানোর বুজরুকিও এর মধ্যে নেই। সাদা কথায়, স্যার আইজ্যাক অমর হয়ে থাকবেন তাঁর কীর্তির মধ্যে— সোজা কথা বাঁকাভাবে ধরলে রহস্যজনক তো মনে হবেই।’

আমি একটু একটু করে রেগে যাচ্ছি দেখে প্রফেসর আর খোঁচালেন না। ঠান্ডা মাথায় বললেন, ‘তা নয়, দীননাথ, তোমার মতোই সবাই ওই মানে করে চুপচাপ থেকেছে। কিন্তু আমি ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেছি।’

‘কী দেখেছেন?’

প্রফেসর আমার দিকে অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করলেন এমন একটা ঘটনা যা শিহরন জাগিয়ে তুলল আমার প্রতিটি রোমকূপের গোড়ায়।

* * *

নিশীথ রাত।

লিটলরকের পনেরো লক্ষ বাসিন্দা সুখস্বপ্নে মগ্ন। প্রমোদকেন্দ্রে খোলা রয়েছে একটা নাইট ক্লাব। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ফুর্তি করছে একদঙ্গল নিগ্রো।

এ ছাড়া শহরে আর কেউ জেগে নেই।

আরকানসাস নদীর জল বয়ে চলেছে ছলছল শব্দে। অমাবস্যার রাত। তারার আলোয় দেখা যাচ্ছে কালো ছায়ার মতো জলযানগুলি স্রোতের টানে কেবল দুলছে আর দুলছে।

নদীর পাড়ে ছোট্ট গির্জার প্রাঙ্গণে সহসা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এলেন এক বৃদ্ধ। জ্বলে উঠল হাতের টর্চ। টর্চের আলো ফেলে কী যেন খুঁজছেন।

বৃদ্ধ একা নন। পেছনে রয়েছে দু'জন অসুরাকৃতি অনুচর।

একজন বললে চাপা গলায়, 'কবরখানা এদিকে নয়।'

'কোন দিকে?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

'পেছনে।'

'পথ দেখাও।'

দুই অনুচরের পেছন পেছন নিস্তব্ধ গির্জা প্রদক্ষিণ করে পেছনে পৌঁছলেন বৃদ্ধ। পাশাপাশি কয়েকটা কবর। ওপরে পাথরের ফলক।

টর্চের আলোয় ফলকে উৎকীর্ণ লেখা পড়তে পড়তে একটা কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ।

চাপা গলায় বললেন, 'এইটা। কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশিক্ষণ নয়।'

'গার্ডরা যদি এসে পড়ে?'

অস্ফুট হেসে একজন বললে, 'তারা এখন নাইট ক্লাবে। মদ গিলে বেহুঁশ।'

'গুড। ভোরের আগে না এলেই হয়।'

'আসবে না। আমার লোক সেখানেও আছে।'

'থ্যাংকস। হাত চালাও। তাড়াতাড়ি।'

দ্রুত হাত চলল ষণ্ডামার্কা দুই অনুচরের। কবরের পাথর সরিয়ে রাখল এক পাশে। স্পষ্ট দেখা গেল, একাজে তারা পোক্ত। হয়তো বা পাক্কা কবর-চোর।

কিন্তু বৃদ্ধ? ইনিও কি কবর-চোর?

বৃদ্ধের সৌম্য মুখ দেখে তা মনে হয় না। পরনে অদ্ভুত পোশাক। এদেশে এ পোশাক কেউ পরে না— পরে বাংলা বলে একটা হুজুগে দেশের অপদার্থ মানুষরা। ওদেশের ভাষায় ও পোশাকের নাম ধুতি আর পাঞ্জাবি।

অতএব বৃদ্ধ নিজেও বাঙালি। তোবড়ানো গাল। কথা বললে দেখা যায়, মাড়িতে কয়েকটা দাঁত নেই।

পাঠক নিশ্চয় চিনেছেন। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

উদ্বিগ্ন চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন প্রফেসর। ঝপাঝপ মাটি কেটে চলেছে দুই অনুচর। দেখতে দেখতে বেরিয়ে পড়ল কফিনের ডালা।

টর্চের ম্লান আভায় চোখ জ্বলে উঠল প্রফেসরের। দ্রুত হ্রস্বকণ্ঠে বললেন, 'ওঠাও।'

উঠে এল কফিন মাটির ওপর। শাবলের চাড় মেরে খুলে ফেলা হল ডালা। হেঁট হলেন প্রফেসর।

পচন আরম্ভ হয়েছে মৃতদেহে। সারা জীবন নিজের দুঃখের কাহিনি শুনিয়ে জগৎবাসীকে হাসিয়ে খাঁচা ফেলে উধাও হয়েছেন স্যার আইজ্যাক কারম্যান। দেহ নামক এই খাঁচাই একবার চুরি গিয়েছিল কফিনসমেত— আবার ফিরে এসেছে যথাস্থানে।

প্রফেসরের টর্চ ফোকাস করে রয়েছে কিন্তু দুর্গন্ধময় দেহপিঞ্জরের একটিমাত্র অংশে— করোটিতে।

অনুচর দু'জন সরে গেছে একটু তফাতে। সকৌতুকে লক্ষ করছে আধপাগলা লোকটার কাণ্ড। বিস্তর অর্থ পেয়েই তবে এসেছে তারা— কফিন চুরি করতে নয়— কফিন তুলে ভেতরের মৃতদেহ দেখাতে। বৃদ্ধ কথা দিয়েছেন, শুধু দেখবেন, কী যেন পরীক্ষা করবেন, তারপর কফিনসমেত মৃতদেহ কবরস্থ করে বিদায় নেবেন।

কী পরীক্ষা হবে, প্রফেসর তা বলেননি। এবার দেখল চোখের সামনে।

দেখল, মাটিতে টর্চ রেখে হাতের গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ খুলে ডাক্তারি ছুরি বার করছেন প্রফেসর।

দেখেই, বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল একজন অনুচর। খপ করে প্রফেসরের হাত চেপে ধরে বললে চাপা গলায়, 'কী করছেন?'

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে প্রফেসর বললেন, 'অন্ধ নাকি। দেখতে পাচ্ছ না?'

'কী দেখব?'

টর্চ তুলে ফের মৃতদেহের করোটির ওপর ফোকাস করলেন প্রফেসর।

'চোখে পড়ছে? আগেই আঁচ করেছিলাম।'

'কিছুই তো দেখছি না? কী আঁচ করেছিলেন?'

'দাগটা চোখে পড়ছে না?'

'দাগ! কোথায়?'

নাকে রুমাল চেপে ধরে হেঁট হল লোকটা। টর্চের আলো আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে গেলেন প্রফেসর। খুব সূক্ষ্ম একটা রেখা দেখা যাচ্ছে কপালের মাঝ বরাবর। চামড়া কুঁচকে পচতে শুরু করেছে বলেই দাগটা অস্পষ্ট।

'কীসের দাগ?'

ঘুরিয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর, 'এই দাগ দেখব বলেই এত কষ্ট করে এলাম।'

'দাগটা কীসের?'

'দেখে বুঝলে না?'

'আজ্ঞে না।'

'কফিন চুরি গিয়েছিল তো এইজন্যেই। মৃতদেহ আর দরকার নেই বলে ফিরিয়েও দেওয়া হয়েছে শুধু এইজন্যে।'

‘কী জন্যে এখনও কিন্তু বলেননি।’

‘তুমি যদি ডাক্তার হতে এখুনি বুঝতে। পোস্টমর্টেম কখনও দেখেছ?’

‘আজ্ঞে না।’

‘দাগটা খুলি খোলার দাগ।’

‘খুলি খোলার দাগ?’

‘হ্যাঁ, জনি। স্যার আইজ্যাকের ডেডবডি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শুধু এই জন্যেই। খুলিটা খোলা হবে বলে।’

‘কিন্তু কেন প্রফেসর? কেন?’

প্রফেসর তক্ষুনি জবাব দিলেন না। চোখে চোখে চেয়ে রইলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, ‘সেটা মুখে না বলে হাতেনাতে দেখাতে চাই।’

‘কীভাবে?’

‘খুলিটা ফের খুলে।’

জনি দ্বিধায় পড়ল। ডাকল অনুচ্চ কণ্ঠে, ‘জিম।’

চাপা গলায় জিম বললে পেছন থেকে, ‘সব শুনেছি। দেখাই যাক না।’

‘ও-কে প্রফেসর, ওপেন ইট,’ অস্ফুট কণ্ঠে বললে জনি।

‘টর্চটা ধরো।’

একহাতে নাকে রুমাল চেপে ধরে আর এক হাতে টর্চ ফোকাস করে রইল জনি। খুলি খোলার সব সরঞ্জাম নিয়ে হেঁট হলেন প্রফেসর।

মিনিটকয়েক পরেই শব্দ হল খট করে; খুলে গেছে করোটি। আগে থেকেই পরিষ্কারভাবে কেটে ফের জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই বেগ পেতে হয়নি প্রফেসরকে।

ঝপ করে টর্চ খসে পড়ল জনির হাত থেকে। শোনা গেল অস্ফুট চিৎকার, ‘ও গড!’

প্রফেসর যা দেখবার আগেই দেখে নিয়েছিলেন এবং এই দৃশ্য দেখবার আশা নিয়েই নিশীথ রাতের অভিযানের আয়োজন করেছিলেন।

টর্চটা তুলে ভাল করে ফেললেন খোলা খুলির ভেতরে।

দেখলেন— আবার দেখলেন— করোটি শূন্য।

বিলকুল শূন্য!

ব্রেন নামক বস্তুটির চিহ্নমাত্র নেই!

* * *

‘দীননাথ, এবার বুঝলে কেন এই তিনটে ঘটনাকে আমি এক লাইনে ফেলতে চাইছি?’

আমার গায়ে তখন কাঁটা দিচ্ছে— কথা বলব কী?

প্রফেসর আস্তে করে বললেন, ‘যখনই শুনলাম কফিন ফিরে এসেছে, ডেডবডি ফিরে এসেছে, চোর লিখে জানিয়েছে মৃতদেহের আর দরকার নেই— তখনি সন্দেহ হয়েছিল নিশ্চয় কিছু একটা নেওয়ার জন্যেই এত হেপাজত পুইয়েছে সে। কিন্তু জিনিসটা কী?’

একটু চুপ করে থেকে নিজেই জবাব দিলেন প্রফেসর, ‘প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো কোনও দেহযন্ত্র। কিন্তু দেহযন্ত্র চুরি করার জন্যে এত ডেডবডি থাকতে স্যার আইজ্যাকের ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার মতো ঝুঁকি নিতে গেল কেন চোর? বুড়ো বয়সে যিনি মারা গেছেন, তাঁর কোনও দেহযন্ত্রই সুস্থ থাকার কথা নয়। নিত্য কত ছেলেছোকরা অক্কা পাচ্ছে, বডি অর্গানের দরকার হলে তাদের ডেডবডি চুরি করলেই হত— ইনটারপোলের টনক নড়ত না। কিন্তু কেন? স্যার আইজ্যাকের মতো বৃদ্ধের ডেডবডি নিয়ে গিয়ে দরকার ফুরিয়ে যাওয়ার পর ফেরত দেওয়ার দরকার হল কেন?’

‘দীননাথ, সমস্যা যত গোলমেলেই হোক না কেন, ধাপে ধাপে চিন্তা করলে সমাধানে পৌঁছনো যায়। আমিও পৌঁছে গেলাম মূল সমাধানে। স্যার আইজ্যাক কারম্যানের জরাজীর্ণ দেহের একটি অংশের দাম বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমেনি, বরং বেড়েছে। সব বৃদ্ধের বাড়ে। শাস্ত্রেও আছে, পাকা চুলের দাম দিতে হয়। বুড়োরা কাঁচা যৌবন হারিয়ে যা পায়— তার নাম পাকা মাথা। দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে একটিই অংশ— যেমন হয়েছে আমার, এই বুড়ো বয়েসেও, বুঝেছ?’

‘ব্রেন,’ বললাম যন্ত্রচালিতের মতো।

‘ব্র্যাভো, দীননাথ, এই তো, ব্রেন আছে। দেশে দেশে বুড়োদের কদর তো শুধু এইজন্যেই— জীবনভোর অভিজ্ঞতা দিয়ে পাকানো মস্তিষ্কের জন্যেই। স্যার আইজ্যাক কারম্যানের মস্তিষ্ক নিঃসন্দেহে লুঠ করার মতোই মস্তিষ্ক। ডেডবডি লোপাট করে নিয়ে গিয়ে করোটি খুলে অমূল্য এই মগজটিকেই নিশ্চয় সরানো হয়েছে— তারপর ডেডবডি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীননাথ, তাই আমি কাউকে কিছু না বলে চুপিসারে লিটলরকে গিয়েছিলাম অনুমানটা ঠিক কিনা যাচাই করার জন্যে।’

‘গিয়ে দেখলেন সত্যিই মস্তিষ্ক উধাও!’

‘সেই থেকেই চিন্তায় পড়লাম। এত জিনিস থাকতে মস্তিষ্ক চুরি কেন? চোরের শেষকথাটাও বিলক্ষণ তাৎপর্যপূর্ণ। স্যার আইজ্যাক নাকি মরেননি— পৃথিবীবাসী সে প্রমাণ শিগগিরই পাবে। দীননাথ, এই লাস্ট লাইনটাই আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। মস্তিষ্ক চুরির জন্যে নয়— ওই কথাটার জন্যে।’

দু'হাতে রগ টিপে কিছুক্ষণ বসে রইলেন প্রফেসর। চোখ-মুখ রীতিমতো উদ্বিগ্ন উদ্‌ভ্রান্ত দেখলাম।

আস্তে আস্তে বললাম, ‘মার্শাল কনওয়ের মস্তিষ্কও কি একই লোক চুরি করেছে বলে আপনার বিশ্বাস?’

হাত নামিয়ে মুখ তুললেন প্রফেসর, ‘হ্যাঁ।’

‘প্রমাণ?’

‘প্রমাণ নেই, প্রমাণ নেই। সব অনুমানের ঝট করে প্রমাণ মেলে না। স্যার আইজ্যাকের মস্তিষ্ক চুরি গিয়েছে, এই প্রমাণ করার জন্যে ডেডবডি মাটি খুঁড়ে বার করতে হয়েছিল। সেটা প্রমাণ করতে হলে চোরের বাড়ি যেতে হয়। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, দীননাথ। কিন্তু যুক্তি বলছে, কীর্তিটা একজনেরই। ড. সূর্য মুখার্জির দেহ চুরিও সে করেছে।’

'আপনি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি। যুক্তি তাই বলছে। সারা পৃথিবীর লোক তাই বলবে দু'দিন পরে। একটু আগে বলে ফেলেছি বলেই আমাকে পাগল মনে হচ্ছে, তাই নয়?'

'না, না, পাগল মনে হবে কেন?'

'তবে অমন অবিশ্বাসের চোখে তাকানো হচ্ছে কেন? কী লেখা ছিল চিরকুটে? শবদাহ করবে চোর। কেন? শবদাহ তো এইখানেই হত— শব চুরির কী দরকার ছিল? দরকার শুধু ব্রেনটার জন্যে— দীননাথ, মস্তিষ্কের জন্যে। ড. মুখার্জির মস্তিষ্ক, স্যার আইজ্যাক কারম্যানের মস্তিষ্ক, মার্শাল কনওয়েের মস্তিষ্ক— এই তিনখানা মস্তিষ্ক এমন একজন সংগ্রহ করতে চায় যে মস্তিষ্ক নিয়ে হয় সংগ্রহশালা খুলছে, অথবা যার নিজের মস্তিষ্কটাও একেবারে বিগড়ে গিয়েছে। তিনটে মস্তিষ্ক পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। সাধনার ফলে মানুষ অতিমানুষ হয় ঠিকই— কিন্তু অতি মানুষ হয়ে যারা জন্মায় তারা যখন সাধনা করে, তখন যে কী হতে পারে— এই মহাপুরুষেরা তার নিদর্শন। এই তিনজনেরই মস্তিষ্ক দরকার হয়েছে একজনের— এমন একজনের যে অন্তত একটি ক্ষেত্রে বলে ফেলেছে, মস্তিষ্কের মালিক নাকি মরেননি— পৃথিবীবাসী সে প্রমাণ শিগগিরই পাবে। কী বুঝলে, দীননাথ, বলো কী বুঝলে?'

'কিসসু না।'

'ব্রেনলেস ইডিয়ট।'

৫. জ্যান্ত মানুষ গায়েব

প্রফেসরের মুখনাড়া খেয়ে তো বাড়ি ফিরলাম, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল অনেকগুলো কারণে। পৃথিবীর তিন অঞ্চল থেকে লুঠ হয়ে গেল তিন-তিনটি ব্রেন। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মস্তিষ্ক চুরি যে একজনের কীর্তি তা ধরতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর মতো ব্রেনওলা মানুষও ধরতে পারছেন না কেন এই নারকীয় ষড়যন্ত্র চলছে ভূলোকে। কেন মড়া নিয়ে গিয়ে মগজ খুলে নিয়ে মড়া পুড়িয়ে বা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে? কেন? কেন? কেন?

ছায়ার মতো অজানা অনেক আতঙ্ক ঘুরে-ফিরে আসতে লাগল মাথার মধ্যে। ভিত্তিহীন অনেকগুলো ভয় শিরশির করে পেঁচিয়ে ধরতে লাগল যুক্তি-বুদ্ধির গোড়া। মাথা যেন খারাপ হয়ে যেতে বসল বিরামহীন আকাশপাতাল চিন্তায়। ভাবনাই সার হল। ভেবে কূলকিনারা তো করতে পারলাম না। রাতটা কাটল যাচ্ছেতাইভাবে। অনেকরকম বিকট, বীভৎস দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠলাম বারবার। দেখলাম কারা যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসে খলখল করে হেসে হেসে বলছে, 'ও দীননাথ, দীননাথ! দে না তোর ব্রেনটা!' চেঁচিয়ে উঠে ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে আবার শুলাম। আবার আরম্ভ হল বিকট স্বপ্নের আনাগোনা। কালো পোশাক পরা দানবের মতো কতকগুলো আকৃতি যেন আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে

যাচ্ছে। একজন আমার খুলিটা ধরে মোচড় মারতেই খট করে একটা আওয়াজ হল। কী আশ্চর্য! আমার একটুও কষ্ট হল না। আমি যেন আমার বাইরে থেকে দেখলাম, কালো মূর্তিগুলো আমার সাদা ব্রেনটাকে চেটেপুটে খাচ্ছে আর ঢেকুর তুলছে। দেখেই ওয়াক ওয়াক করতে করতে উঠে বসলাম বিছানার ওপর। বাকি রাতটা আর ঘুমোতে পারলাম না। কোনও ভদ্দরলোকের ছেলে এ অবস্থায় ঘুমোতে পারে না।

সক্কালবেলা উঠে মাঠে গিয়ে একচক্কর দিলাম। অনেক বুড়োকে দেখলাম লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে হাঁটছে লেকের পাড়ে। দল বেঁধে গল্প করছে। হাসছে। নির্বিকার, নিশ্চিন্ত প্রত্যেকেই। যদি জানত এই পৃথিবীর এককোণে বসে এক পাষণ্ড-পাগল কেবল বুড়োদের ব্রেন সংগ্রহ করে চলেছে, তা হলে হাসি উড়ে যেত বাছাধনদের।

ব্রেন লুঠেরার উদ্দেশ্যটা কী কিছুতেই আঁচ করতে পারলাম না। বেশি ভাবতেও সাহস হল না। আমার মস্তিষ্কে আবার বিকার না দেখা যায়— সারা রাত যেভাবে চমকে উঠেছি, ও নিয়ে আর ভাবনা নয়। মরুক গে। মস্তিষ্ক চুরি যাচ্ছে বুড়োদের— তাও মরবার পর। কেউ যদি মড়াদের মগজ নিয়ে সাজিয়ে রাখতে চায় বাড়িতে— রাখুক না। কাউকে তো মেরে তারপর মগজ নিচ্ছে না।

ভেবে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। নিয়তি ঠাকরুণ আড়াল থেকে তখন মুচকি হাসি হাসলেন।

বাড়ি ফিরলাম। কাগজ এসে পড়ে রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় তেমন কিছু খবর নেই। রাজনীতির ছলনা আমার দু'চক্ষের বিষ। আমি আছি আমার জগতে— রাজনীতি থাকুক রাজনীতির জগতে।

পাতা ওলটাতে ওলটাতে এসে গেলাম পার্সোনাল কলমে। সম্পাদকীয় না পড়ে পার্সোনাল কলমটা আমি খুঁটিয়ে পড়ি অনেক ইন্টারেস্টিং খবর থাকে বলে। ওপর থেকে পড়তে পড়তে চোখ নামিয়ে আনলাম নীচের দিকে।

চোখ আটকে গেল একটা ঘোষণায়। একবার পড়লাম। সিধে হয়ে বসলাম। দু'বার পড়লাম। উঠে দাঁড়ালাম। তিনবার পড়লাম। কাগজ বগলে করে রাস্তা দিয়ে দৌড়োতে লাগলাম।

* * *

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও তখন নিমের দাঁতন দিয়ে আয়েশ করে কষের দাঁত মাজছেন। মাড়ি তো ফাঁকা— কষের দাঁতগুলোর ওপর তাই ওঁর অত মায়া।

আমি যেতেই থুক থু করে থুথু ছিটিয়ে বললেন, 'কী সংবাদ, বৎস?'

'প্রফেসর, প্রফেসর! ব্রেন চোরের সন্ধান পেয়েছি।'

'ব্রেন চোরের সন্ধান পেয়েছ!' মুখ থেকে নিমদাঁতন নামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন প্রফেসর।

আমি পার্সোনাল কলমটা মেলে ধরলাম ওঁর চোখের সামনে।

উনি বারেক চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, ‘চশমা নেই। তুমি পড়ো।’

আমি পড়লাম।

কী পড়লাম, তা শোনার আগে শুনুন তার আগের ঘটনাটুকু।

বেলেঘাটা মেন রোড শেয়ালদা থেকে বেরিয়ে রেল পোল আর খাল পোল পেরিয়ে নাকবরাবর সোজা পূর্বদিকে এসে জোড়া মন্দিরের পাশ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে— কলকাতারও শেষ সেখানে। তারপরই চব্বিশ পরগণা জেলা।

এইখানে, বেলেঘাটা মেন রোডের সঙ্গে সমকোণে যে রাস্তাটা উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত, এর নাম চাউলপট্টি রোড।

চাউলপট্টি রোডেই ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার। দু’পাশে সারি সারি চারতলা বাড়ি। প্রতিটি বাড়িতে একঘরের ছোট ছোট ফ্ল্যাট।

একতলার একটি ফ্ল্যাটে হরিবিনয় সাতসকালে উঠে গল্প লিখতে বসেছে। গল্প লেখা তার বাতিক। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই লেখাটা তাকে পেয়ে বসেছে। শূন্যস্থান পূর্ণ করার মতোই মন আর সময়কে ভরিয়ে রাখে হাবিজাবি গল্প লিখে। সম্পাদকেরা কখনও ছাপেন, কখনও ফিরিয়ে দেন। হরিবিনয় তবুও লিখে যায়। না লিখে পারে না। লেখাটা তার কাছে ট্র্যানকুলাইজারের কাজ করে। না লিখলেই স্নায়ুগুলো অস্থির হয়।

টেবিলের পাশেই ছেলে ঘুমোচ্ছে। সাত বছরের ছেলে। একবছর বয়েসে মা-হারা। দীর্ঘ ছ’টি বছর তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করছে হরিবিনয়। এই ছেলেই তার জীবনের সব। একে অবলম্বন করেই সে বেঁচে আছে।

হরিবিনয় আজকে যে গল্পটা লিখতে বসেছে, তা জীবন থেকে নেওয়া। মহামানুষদের অনেকগুলো মগজ মিলিয়ে সুপারম্যান তৈরি করছে উদ্ভট গল্পের মাধ্যমেই। এ ধরনের আজগুবি গল্প বড়রা পড়েন না, ছোটরা গোগ্রাসে গেলে। তাদের কল্পনাপ্রবণ মন সবকিছুই বিশ্বাস করে।

হরিবিনয় উদ্ভট আইডিয়াটা পেয়েছে কুড়িয়ে পাওয়া একটা খাতার মধ্যে। গত পরশু বালিগঞ্জ লেকে গিয়েছিল বেড়াতে। একা। অফিস থেকে বেরিয়ে বকুলগাছের তলায় বসেছিল চুপ করে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই এই একটা স্বভাব ওকে পেয়ে বসেছে। চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। ঠাকুর বলেছেন, ধ্যান করবে কোণে, মনে আর বনে। হরিবিনয়ও সময় পেলেই ঘরের কোণে ধ্যানে বসে, নয়তো মাঠেঘাটে গিয়ে চুপচাপ বসে আকাশের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে।

রাত হয়ে গিয়েছিল। ফুটবল খেলা শেষ করে বল নিয়ে ছেলেরা চলে গেল। অন্ধকার মাঠে জোড়া জোড়া মেয়ে-পুরুষ আসছে, বসছে গা ঘেঁষে। হরিবিনয় জানে এদের মধ্যে অনেকেই কলগার্ল। ওর কাছেও এখুনি কেউ আসবে। আশেপাশে ঘুরবে। চকিত চোখে তাকাবে। তাই উঠে পড়ল হরিবিনয়।

গাছতলা দিয়ে যেতে গিয়ে পায়ে কী যেন লাগল। ইট নয়, অন্য কিছু বলে মনে হল। হেঁট হয়ে জিনিসটা কুড়িয়ে নিল হরিবিনয়।

একটা খাতা। চামড়ায় বাঁধানো বেশ মোটা খাতা।

নিশ্চয় কলেজপালানো কারও সম্পত্তি। এসেছিল লেকে সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে নিয়ে। খাতা ফেলে চলে গেছে, খেয়াল নেই।

খাতাটা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরল হরিবিনয়।

স্কুল থেকে ছেলে ফিরে পথ চেয়ে বসেছিল বাপের জন্যে। তাকে সুপারম্যানের কমিকস থেকে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে কুড়িয়ে পাওয়া খাতাটা নিয়ে বসল হরিবিনয়। প্রথমে মাঝখান থেকে খুলেছিল। অনেক অঙ্ক কষা, অনেক ফর্মুলা লেখা।

তারপর খুলল প্রথম পৃষ্ঠা। কারও নাম নেই, ঠিকানাও নেই। বড় বড় অক্ষরে শুধু লেখা, ক্রিয়েশন অফ সুপারম্যান। অর্থাৎ সুপারম্যান সৃষ্টি।

স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল হরিবিনয়। একেই বলে কাকতালীয়। একটু আগেই সুপারম্যানের মজার গল্প শুনিয়েছে পুত্রকে। এখন হাতে এল সুপারম্যান তৈরির খাতা।

শিরোনামটা বিলক্ষণ কৌতূহলোদ্দীপক। পাতা ওলটাল হরিবিনয়। লেখক লিখছে:

'সুপারম্যান তৈরি কি একেবারেই অসম্ভব? আমার মনে হয় না। বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গিয়েছে। এক কোষ থেকে অসংখ্য কোষ সৃষ্টি হয়ে পূর্ণাবয়ব জীব সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এখন তো টেস্টটিউবেই হচ্ছে। কোষরহস্যও বৈজ্ঞানিকরা অনেকাংশে ভেদ করেছেন। জিন কী জিনিস বুঝতে পেরেছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব খুব একটা নাগালের বাইরে বলে আর মনে হয় না।

'কিন্তু বিজ্ঞান এখনও যে তত্ত্ব বিশ্বাস করে না, কল্পনাও করতে পারে না, তা আমি বিশ্বাস করি, ধারণায় আনতে পারি। টেস্টটিউবের মধ্যে এক কোষ থেকে বহু কোষ সৃষ্টি করে যদি মানুষ তৈরি সম্ভব হয়, মস্তিষ্ক বানানোও বা অসম্ভব হবে কেন? মহামানুষদের ব্রেন-সেলের মূল উপাদান একত্র করে অতি মহামানুষ সৃষ্টি সম্ভব হবে না কেন?

অসম্ভব কিছু নয়। আমি যে বিদ্যে জানি, যে বিদ্যে এতদিন হারিয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, তা দিয়ে সুপারম্যান তৈরি আমি করবই। কীভাবে করব, মোটামুটি তাই লিখে রাখছি এই খাতায়।'

এই গেল ভূমিকা। তারপরেই অত্যন্ত সৃষ্টিছাড়া এক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। সে তত্ত্ব এমনি উদ্ভট, অবিশ্বাস্য এবং দুরন্ত যে সুস্থ কল্পনায় তা শত চেষ্টাতেও আসে না। খাতার লেখক কিন্তু অবলীলাক্রমে সেই তত্ত্ব লিখেছেন জটিল অঙ্ক, ঘটনা এবং বহু শাস্ত্র থেকে দুর্বোধ নজির তুলে।

কিছুক্ষণ পড়বার পর ঘুম এসে গেল হরিবিনয়ের। হাই উঠতে লাগল বারবার। বিষয়টা গল্প-কাহিনি হিসেবে মন্দ নয়। ভোররাতে উঠে এই কাহিনিটাই এক নিশ্বাসে লিখে ফেলল হরিবিনয়। তারপর ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে স্নান করিয়ে, খাইয়ে, চুল আঁচড়ে, স্কুলড্রেস পরিয়ে স্কুলবাসে তুলে দিল। নিজে স্নান করে খেতে বসেছে, রেডিয়ো চলছে। বাংলায় খবর শুরু হল।

'খবর পড়ছি বিনয় গোস্বামী। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল, ভাষাতত্ত্ববিদ সূর্য মুখার্জির মৃতদেহ নিখোঁজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপুঞ্জে ভাষণ দিয়েছেন। চিন পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।'

বাকি খবরগুলো আর কানে ঢুকল না হরিবিনয়ের। ড. মুখার্জি তার পিতৃবন্ধু। হরিবিনয়কে

অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর শোচনীয় অপঘাত মৃত্যু স্তম্ভিত করেছিল তাকে। কিন্তু মৃতদেহ নিখোঁজ হল কেন?

বিস্তারিত খবর শুরু হল। হরিবিনয় ডাল-ভাত মেখেও রেখে দিল— স্তব্ধ হয়ে শুনল মৃতদেহ অন্তর্ধানের রহস্যজনক বিবরণ।

নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না হরিবিনয়। এও কি সম্ভব? ড. মুখার্জির মৃতদেহ চুরি করে কার কী লাভ, ভেবে পেল না। গতকাল ওঁর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শুনে মনটা খারাপ হয়েছিল বলেই লেকের মাঠে গিয়ে বসেছিল। সাদার্ন অ্যাভিনিউতে ডেডবডি দেখতেও যায়নি। খাঁচা থেকে পাখি উড়ে গেলে খাঁচার কদর যেমন কেউ করে না, দেহপিঞ্জর থেকে প্রাণপাখি উড়ে গেলে এ দেহের কদরও আর থাকে না। অন্তত হরিবিনয়ের কাছে নেই। আসল মানুষটাই নেই তো খোলসটাকে মালা পরিয়ে আর লাভ কী। তাই সে যায়নি।

কিন্তু এই শূন্য খাঁচাটার জন্যেও লালায়িত কেউ আছে তা হলে এই কলকাতায়? কী হবে এই প্রাণহীন পিঞ্জর নিয়ে?

আকাশ-পাতাল ভেবেও কূলকিনারা করতে পারল না হরিবিনয়। নাকে-মুখে গুঁজে উঠে পড়ল। ধড়া-চূড়া পরে ব্রিফকেস নিয়ে গেল অফিসে, সেখান থেকে বেয়ারার হাতে গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন পাঠাল ইংরেজি দৈনিকের পারসোনাল কলমে।

সেই বিজ্ঞাপনটাই পড়ে শোনালাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে। বাংলায় তর্জমা করে লিখছি এইখানে:

'একটা খাতা পাওয়া গেছে। মস্তিষ্ক একত্র করে সুপারম্যান সৃষ্টির অভিনব পরিকল্পনা কৌতূহলোদ্দীপক। হরিবিনয় মজুমদার, ৮/৯, সিআইটি বিল্ডিংস, কলকাতা ১০।'

প্রফেসরের হাত থেকে খসে পড়ল নিমের দাঁতন।

গলার স্বর নেমে এল খাদে, 'দীননাথ! এই সেই খাতা— ... ব্রেন-চোরের সিক্রেট-প্ল্যানের খাতা।'

'আমারও তাই বিশ্বাস, প্রফেসর।'

'তুমি রেডি?'

'হ্যাঁ।'

আধঘণ্টায় কলকাতার একদিক থেকে আর একদিকে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। সেদিন আমি আর প্রফেসর সেই অসাধ্যসাধন করলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার মিটার ডাউন করার আগেই হাতে একখানা বিশ টাকার নোট পেয়ে বুঝে নিলে কতখানি স্পিড তুললে আরও একখানা নোট প্রাপ্তি ঘটবে— ঠিক সেই স্পিডেই ট্রাফিক কনস্টেবলের তোয়াক্কা না রেখে কখনও বেলাইনে গিয়ে কখনও ফুটপাতের ওপর উঠে ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে এনে দিল সিআইটি বিল্ডিংসের সামনে।

ঠিক সেই সময়ে চওড়া রাস্তার ওপর ব্যাক করল একটা কালো গাড়ি। পাকা হাত। একবারেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ট্যাক্সির পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো শেয়ালদার দিকে যেন উড়ে গেল গাড়িখানা।

আমরা নামলাম। নেতাজি স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে গিয়ে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে নির্দিষ্ট নম্বরের ফ্ল্যাট খুঁজে নিয়ে দরজায় নক করলাম।

কেউ সাড়া দিল না।

ধাক্কা মারলাম। বর্ষার জলে কনট্রাক্টরের দেওয়া দরজার সস্তা কাঠ ফুলে উঠে এঁটে গিয়েছিল— দড়াম করে খুলে গেল।

আমি আর প্রফেসর ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলাম। নাকে একটা চেনা গন্ধ ভেসে এল।

ক্লোরোফর্মের গন্ধ। ডাকলাম, 'হরিবিনয়বাবু।'

কেউ সাড়া দিল না।

দরজার সামনে ছোট্ট একটা ঘর। ছ' ফুট বাই আট ফুট। হলুদ রঙের একটা ছোট দু' চাকার সাইকেল দাঁড় করানো রয়েছে। আমরা ঢুকলাম এই ঘরে।

সামনেই একটা বড় ঘর। একখানাই ঘর। রেডিয়ো চলছে মৃদু শব্দে। খোলা জানলা দিয়ে আলো আসছে। টেবিলে বই আর হলদে প্লাস্টিক ট্রে-তে সাদা কাগজের রাশ, চিনেমাটির ফুলদানিতে ফুলের বদলে একরাশ কলম আর পেনসিল, একটা কৃষ্ণনগরের কালো মৃন্ময় বুদ্ধমূর্তি এবং সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো রঙিন ছবিতে দেখা যাচ্ছে একখানা বেতের দোলনা ধরে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে। দু' পাশ থেকে সস্নেহ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে নিশ্চয় তার বাবা আর মা।

আমি ডাকলাম, 'হরিবিনয় মজুমদার আছেন?'

কেউ সাড়া দিল না।

প্রফেসর চাইলেন আমার চোখের দিকে। ইঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললেন এগিয়ে যেতে। ঢুকলাম বড় ঘরটায়। খাটটা এবার চোখে পড়ল। বেডকভার টানটান করে পাতা। তার ওপাশে বইয়ের আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, টেলিভিশন, রেডিয়ো। ঘরে কেউ ছিল— রেডিয়ো তাই চলছে। কিন্তু এখন নেই, রেডিয়ো তবুও চলছে।

আর রয়েছে ক্লোরোফর্মের গন্ধ। আগের চাইতেও উৎকট।

কথা বলার দরকার হল না। বুঝলাম, খাতার মালিক আমাদের চাইতেও ক্ষিপ্র। আমাদের আগেই এসেছে। বাজপাখি যেভাবে ছোঁ মারে, সেইভাবে ছোঁ মেরে খাতা উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।

সেইসঙ্গে খাতার প্রাপককেও।

ক্লোরোফর্মের উগ্র গন্ধই তার প্রমাণ। বেহুঁশ করে নিয়ে গেছে হরিবিনয় মজুমদারকে।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, সক্কালবেলা এত লোকের মাঝখান দিয়ে জলজ্যান্ত একটা লোককে অজ্ঞান করে নিয়ে গেল কয়েকজন দুর্বৃত্ত— অথচ কেউ বাধা দিল না? এ কী করে সম্ভব?

বললাম, 'প্রফেসর।'

প্রফেসর টেবিলের সামনে গিয়ে হলদে ট্রে-র মধ্যে রাখা লেখার সরঞ্জাম ঘাঁটছিলেন। বললেন, 'কী?'

'আপনি একটু দাঁড়ান। আমি খবর নিয়ে আসি।'

কী খবর জিজ্ঞেস করলেন না প্রফেসর। হেঁট হয়ে কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে শুধু বললেন, 'এসো।'

বেরিয়ে এলাম। ফ্ল্যাটের সামনেই রাস্তা। রাস্তার ওপাশে সারি সারি দোকান। মুদিখানা, সেলুন, ডাক্তারখানা, মিষ্টির দোকান ইত্যাদি। মুদিখানার দোকানদার সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে দেখে, তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'হরিবিনয় মজুমদারকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন?'

'না তো?'

'বাড়িতে কেউ এসেছিল?'

'এই তো এসেছিল। কালো গাড়ি করে। এক্ষুনি চলে গেল।'

'হরিবিনয়বাবু সঙ্গে যাননি?'

'না।'

'ক'জন এসেছিল?'

'চারজন। টেলিভিশন কোম্পানির লোক। একটা বড় টেলিভিশন বাক্স নিয়ে ঢুকল। বাক্স নিয়েই বেরিয়ে গেল।'

চোখের সামনে ভেসে উঠল হরিবিনয় মজুমদারের ঘরের দৃশ্য। টেলিভিশন আছে ঘরে। না থাকলেও রাস্তার লোকের সন্দেহই হবে না কারও বাড়িতে টেলিভিশনের শূন্য বাক্স নিয়ে ঢুকলে। বেরোনোর সময়ে অবশ্য বাক্সটা শূন্য থাকেনি। ক্লোরোফর্মে অচেতন হরিবিনয় মজুমদার ছিলেন তার মধ্যে। সবার চোখের সামনে দিয়েই দিনের আলোয় গায়েব হয়ে গেলেন চোখের নিমেষে।

মুদি লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?' সুরটা সন্দেহের।

কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'হরিবিনয়বাবু আমাদের আসতে বলে বেরিয়ে গেছেন বলেই জিজ্ঞেস করছিলাম। আচ্ছা আসি।'

ফিরে এলাম ন' নম্বর ফ্ল্যাটে। টেবিলের সামনে বসে পড়েছেন প্রফেসর। ঘাড় গুঁজে একমনে কী পড়ছেন।

পেছনে গিয়ে দেখলাম ফুলস্কেপ কাগজে লেখা একটা গল্প। শিরোনামা— মানুষের গড়া অতিমানুষ।

'প্রফেসর?'

চমকে উঠলাম প্রফেসর, 'কী হল?'

বললাম হরিবিনয়কে কিডন্যাপ করা হয়েছে কীভাবে। উনি শুনলেন। গল্পটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'তা হলে চলো।'

'ওটা কী হবে?'

'হরিবিনয় গল্প লিখতেন। খাতাটা পড়ে মাথায় আইডিয়া এসেছিল নিশ্চয়, এ গল্পে তাই লিখেছেন। পড়লে কাজ দেবে।'

'না বলে নিয়ে যাবেন?'

'কাকে বলব?'

ঠিক এই সময়ে কচি গলায় পেছন থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'কাকে চাই? বাবা কোথায়?'

পেছন ফিরলাম। বছর সাতেক বয়সের ফুটফুটে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। চোখদুটো বড়। ফরসা। রোগা। মুখের গড়নটি ভাল, বুদ্ধিদীপ্ত। পরনে সাদা স্কুল ড্রেস। গলায় ঘন-নীল রঙের টাই। হাতে ব্যাগ।

আমাদের দিকে তাকিয়ে ফের শুধোয় ছেলেটি, 'বাবা কোথায়?'

প্রফেসর তার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, 'কী নাম তোমার?'

'গাব্বা।'

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'বাবা চান করে পাঠিয়ে দিল ওপরে। জেঠিমার কাছে খেয়ে এলাম।— বাবা কোথায়?'

'তোমার মা নেই?'

'না। আকাশে গেছে। বাবা কোথায়?'

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল আমার। মা নেই, বাবাও গেল। আর কোনওদিন ফিরবে বলে মনে হয় না।

প্রফেসর গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'জেঠিমার কাছে চলো।'

'কেন? স্কুলের বাস আসবে যে।'

'আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। চলো।'

আধঘণ্টা পর এসে দাঁড়ালাম রাস্তায়। পেছন ফিরে দেখলাম গাব্বা তখনও চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

ও জানে, ওর বাবা দরকারি কাজে বেরিয়েছে, এখুনি আসবে।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে জেঠিমা আর জ্যাঠামশাই। তাঁরা জানেন হরিবিনয় মজুমদার অগস্ত্য যাত্রা করেছেন।

৬. ডক্টর রামা

প্রফেসর বাড়ি ফেরার পথেই ট্যাকসির মধ্যে গল্পটা পড়ে ফেললেন।

বাড়ি পৌঁছে বললেন, 'ব্রেন জুড়ে সুপার ব্রেন তৈরির উদ্ভট গল্প। গাঁজার দম। পাগল ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না।'

বললাম, 'গল্পটা কি ব্রেন-চোরের খাতা পড়েই লেখা?'

'হ্যাঁ। সেকথাও লেখা আছে। কুড়িয়ে পেয়েছিল লেকের মাঠে। যেদিন লিখেছে গল্পটা, পেয়েছে তার আগের রাতে, মানে যে রাতে সূর্য মুখার্জির মৃতদেহ চুরি হল, সেই রাতে।'

‘তাই নাকি! ব্রেনচোর তা হলে লেকের মাঠে বসেছিল সময় আর সুযোগের জন্যে, রাত হতেই টুক করে চলে এসেছে হিন্দুস্থান রোডে।’

‘এগজ্যাক্টলি। এ অঞ্চলে নির্জনে সময় কাটানোর একমাত্র সুযোগ আছে এই লেকে, ব্রেন-চোরের দল লেকেই বসেছিল। খাতাটা অন্ধকারে পড়ে গিয়েছিল। পার্সোনাল কলমে বিজ্ঞাপন দেখেই ছুটে এসে খাতা উদ্ধার তো করলই, হরিবিনয়কেও নিয়ে গেল। কেন বলো তো?’

‘খাতাটা পড়ে ফেলেছিল বলে।’

‘রাইট ইউ আর। তোমার মগজ আছে তা হলে।’

টিটকিরিটা গায়ে মাখলাম না। বললাম, ‘এখন কী করবেন?’

হরিবিনয়ের বাড়ি থেকে পুলিশে খবর দিচ্ছে। আমি খবর দিচ্ছি প্রাইভেট ডিটেকটিভকে।’

‘সূত্র পেয়েছেন?’

প্রফেসর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। একটু ভেবে নিয়ে আমার চোখে চোখে তাকিয়ে বললেন, ‘কিছুদিন ধরেই একজনের কথা আমার মাথায় ঘুর ঘুর করছে।’

‘কে বলুন তো?’

‘ড. রামা।’

‘সে কে?’

‘ব্যাংককে কখনও গেছ?’

‘না।’

‘গেলে আর জিজ্ঞেস করতে না। ড. রামার নাম সেখানকার ট্যাকসি ড্রাইভার থেকে আরম্ভ করে কলেজের প্রফেসর পর্যন্ত সবাই জানে। থাইল্যান্ডে অতবড় পণ্ডিত আজ পর্যন্ত জন্মাননি।’

‘কীসের পণ্ডিত?’

‘উনি ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের কর্ণধার। ব্যাংককে মোট পাঁচটা ইউনিভার্সিটি আছে। সব ইউনিভার্সিটি-কাউন্সিলেই উনি আছেন। ওঁকে ছাড়া থাইল্যান্ড কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর কথা ভাবতেই পারে না কিন্তু—’

‘কিন্তু কী?’

‘বছরখানেক আগে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বালতিস্তানে।’

‘বালতিস্তান! পাকিস্তানে নাকি? বালতি তৈরির জায়গা?’

‘তোমার মাথা!’ বিরক্ত সুরে বললেন প্রফেসর, ‘কিছুই যখন জানো না তখন একটু চুপ করে শুনলেই তো পারো।’

চুপ করেই গেলাম।

উনি দম নিয়ে বললেন, ‘প্রথমত, বালতিস্তান মানে বালতি তৈরির জায়গা নয়। দ্বিতীয়ত, বালতিস্তান পাকিস্তানের অঞ্চল নয়, ভারতীয় অঞ্চল। কাশ্মীরের পশ্চিমে লাদাখ জেলার একটা জায়গা। এখানে যারা থাকে তাদের আদি বাস তিব্বতে হলেও ধর্মে মুসলমান। এদের

নাম বালতি। বালতিরা থাকে বলেই জায়গাটার নাম বালতিস্তান। মাথায় ঢুকেছে?'

কথা বললাম না। কাঁহাতক আর মুখনাড়া খাওয়া যায়।

প্রফেসর আপন মনে বলে চললেন, 'আমি গেছিলাম প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানে। পাহাড়ি জায়গা তো। কারাকোরাম পর্বতমালার বড় বড় চুড়ো দেখবার মতো। বালতিস্তানে আছে কে-২ শিখর, উচ্চতাটা কিন্তু কম নয়, আঠাশ হাজার দুশো পঞ্চাশ ফুট। ভাবতে পারো?'

আমার মাথায় তখন হরিবিনয় মজুমদারের কথা ঘুরছে, বাচ্চা ছেলেটার আকুল ডাকটা ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলছে, কারাকোরাম পর্বতমালার কে-২ শিখর কত উঁচু, তা নিয়ে ভাববার সময় নেই, সদিচ্ছাও নেই।

প্রফেসর বললেন, 'স্কার্দু শহরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ড. রামার সঙ্গে।'

* * *

স্কার্দু শহর বালতিস্তানের প্রধান নগরী। নামেই নগর। একটা বড়সড় গ্রাম বললেই চলে। ঢালু ছাদের সামান্যই কিছু দোতলা বাড়ি। বেশিরভাগ বাড়িই একতলা। পাইন গাছই বেশি। সবসময়ে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে ডাল-পাতার ভেতর থেকে। চারিদিকে উঁচু উঁচু শৈলশিখর। তুষারমুকুট ঝকমক করছে রোদ্দুরে। সবার মাথা ছাড়িয়ে রয়েছে কে-২ গিরিশিখর— এই বুঝি লাফিয়ে পড়বে মাথার ওপর।

চটি, মানে, সরাইখানার সামনের বারান্দায় চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে এক প্রৌঢ়। কালচে গায়ের রং। চোখদুটো ঈষৎ তির্যক— মঙ্গোলীয় ধাঁচের। কাঁচাপাকা চুল উসকোখুসকো— আঁচড়ানোর সময় নেই যেন। অথবা খেয়াল নেই। ইনিই ড. রামা। থাইল্যান্ডের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী।

কে-২ শিখরের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে বসে আছেন ড. রামা। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। সে খেয়াল নেই। আজ ক'দিন ধরেই এমনি কাণ্ড চলছে। ড. রামা দিবারাত্র আকাশ-পাতাল ভাবছেন। চটি ছেড়ে বলতে গেলে বাইরেই বেরোন না।

চমকে উঠলেন পেছন থেকে গলা খাঁকারি শুনে, 'কী আশ্চর্য? ড. রামা নাকি! এখানে?'

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক বাঙালি বুড়ো। তোবড়ানো গাল। ফোকলা মাড়ি। পাগলাটে চেহারা। দেখলেই হাসি পায়।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন ড. রামা, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র! আপনি?'

'আমি তো এসেছি ন্যাচারাল গ্যাসের সন্ধানে। পেট্রল নিয়ে যা কাণ্ড চলছে। গভর্নমেন্টের পয়সায় তাই ঘুরতে এলাম। কিন্তু আপনি ব্যাংকক ছেড়ে বালতিস্তানে কেন?'

অপরাধীর হাসি হেসে চুপ করে রইলেন ড. রামা।

প্রফেসর সন্ধানী চোখে চেয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বলেন, 'চাকরি ছেড়ে দিলেন নাকি?'

চমকে উঠলেন ড. রামা, 'চাকরি!'

'ইউনিভার্সিটির চাকরি।'

কী যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন ডক্টর। প্রফেসর একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'খবরটা তা হলে মিথ্যে নয়।'

'কী খবর?' কৌতূহলের ঝিলিক দেখা যায় ড. রামার ঈষৎ-তির্যক চোখে।

'আপনি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গবেষণা করছেন। ইউনিভার্সিটির মামুলি চাকরি তাই বোধহয় আর ভাল লাগছে না।'

'সুযোগ নেই। প্রফেসর, কাজের কোনও সুযোগ নেই। একপাল ছেলে ঠেঙানো আর ভাল লাগছে না। মানুষ জাতটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, জীবনটা শুধু ছাত্র পড়িয়েই কাটালে চলবে কী করে?' উত্তেজিত হয়েছেন ডক্টর।

'মানুষ জাতটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন কীভাবে? জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার হয়ে?'

ঝুঁকে পড়লেন ডক্টর। চোখে চোখ রেখে বললেন, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, আজ থেকে তিনশো কোটি বছর আগে সমুদ্রের ভাসমান কিছু জেলি থেকে অ্যাক্সিডেন্টালি প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল। এককোষী অ্যামিবা থেকে আজকের মানুষের পর্যায়ে পৌঁছতে সময় লেগেছে তিনশো কোটি বছর। ভাবুন! তিনশো কোটি বছর! বড্ড বেশি সময় নয় কি?'

'বিবর্তন তো তুড়ি মেরে হয় না— সময় নেয়।'

'আমি চাই তুড়ি মেরে বিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।'

'অসম্ভব।'

'আপনি বৈজ্ঞানিক হয়ে একথা বলেন কী করে বুঝলাম না। তিনশো কোটি বছর পরেও মানুষ একটা জন্তু ছাড়া কিছুই নয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা জন্তু। প্লেটো বলেননি মানুষ মানে হল, 'চ্যাপটা নখওলা দু'পেয়ে একটা জানোয়ার?' অ্যারিস্টটল বলেননি মানুষ একটা 'রাজনৈতিক জানোয়ার?' কার্লাইল বলেননি 'মানুষ তো একটা সামাজিক জন্তু?' ফ্রাঙ্কলিন বলেননি 'মানুষ একটা যন্ত্র তৈরির জানোয়ার ছাড়া কিছুই নয়?' তিনশো কোটি বছরের বিবর্তনের এই তো ফল। মানুষ এখনও জন্তু! গরিলার চাইতে বিরাট ব্রেন নিয়েও মানুষ এখনও জন্তু! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

উত্তেজনায়, রাগে, ঘৃণায় গনগনে হয়ে উঠল ড. রামার মুখ।

প্রফেসর হাঁ করে শুনে গেলেন। এখন আস্তে আস্তে বললেন, 'খোদার ওপর খোদকারি করতে চান?'

'আলবাৎ করতে চাই। বনের জানোয়ারকে পোষ মানিয়ে খোদার ওপর খোদকারি করে কি আমাদের খারাপ হয়েছে? বনজঙ্গলের ওপর ভরসা না রেখে চাষ-আবাদের চেষ্টা করে কুফল ফলেছে? প্রকৃতির নিয়মকে বারবার লঙ্ঘন করেছি প্রগতির খাতিরে। এখনও করব। বিবর্তনকে আরও দশ হাজার বছর এগিয়ে নিয়ে যাব। চল্লিশ হাজার বছর আগে উচ্চকোটির স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে মনুষ্যপদবাচ্য হয়েও মানুষ সারাদিন খাওয়ার চিন্তা, শরীর থেকে আবর্জনা ত্যাগের চিন্তা, শরীরটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চিন্তা, বংশবৃদ্ধির চিন্তা আর শরীরটাকে বহাল তবিয়তে রাখার চিন্তাতেই মশগুল হয়ে রইল। যেন এই শরীরটাই

সব। এমন বড় একটা ব্রেন যেন শরীরকে নিয়ে ভাববার জন্যেই কেবল তৈরি হয়েছে। চার হাত-পায়ে হাঁটা ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে শিখল মানুষ দু'হাতের ভেলকি দেখাবে বলে। এখনও দু'হাতের কাজই চলছে, মাথার কাজ কমে আসছে। আমি চাই এই ব্রেনকে সুপার ব্রেন করতে, ব্রেনের কাজ বাড়াতে, মানুষ যেন একধাপে দশ হাজার বছরের স্লো বিবর্তন টপকে যেতে পারে, মানুষ যেন নিজে থেকেই স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করে দেবতা হয়ে যেতে পারে।'

হাঁফাচ্ছেন ড. রামা। আত্মসমাহিত মানুষটার মধ্যে ঘুমিয়েছিল উত্তেজনার আগ্নেয়গিরি, আচমকা যেন ফেটে উড়ে গিয়েছে তার জ্বালামুখ।

প্রফেসর শুধু বললেন, 'সুপার ব্রেনটা তৈরি করবেন কী করে?'

সঙ্গে সঙ্গে যেন নিভে গেলেন ড. রামা। আর একটি কথাও বললেন না।

প্রফেসর অন্য প্রসঙ্গে এলেন, 'অগামড়াদের এই জায়গায় এসে সুপার ব্রেন তৈরির স্বপ্ন দেখছেন আমি বিশ্বাস করি না। এখানে ল্যাবরেটরি নেই, বিজ্ঞানের 'ব'ও নেই। কেন এসেছেন জানতে পারি কি?'

ড. রামা আমতা আমতা করে বললেন, 'বেড়াতে।'

'অ।' প্রফেসরও আর কথা বাড়ালেন না। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। বৈজ্ঞানিকে বৈজ্ঞানিকে ওপর ওপর সদ্ভাব থাকলেও তলায় তলায় বৈরী মনোভাব থাকেই। কেউ কারও গোপন গবেষণা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে যায় না। যদি সাফাই হয়ে যায়?

ড. রামাও তাই তাঁকে বিশ্বাস করেছেন না। ঝোঁকের মাথায় যা বলেছেন। এখন হুঁশ হয়েছে, বেশি কথা বলা আর সমীচীন নয়। তাই মুখে চাবি দিয়েছেন। দিন গে। কারও হাঁড়ির খবর জানবার কোনও বাসনাই নেই প্রফেসরের।

পরের দিন থেকে ড. রামাকে আর বালতিস্তানে দেখা গেল না।

৭. গোয়েন্দা নিয়োগ

'গেলেন কোথায়? ব্যাংককে?' শুধোই আমি।

'না। সেখানে খোঁজ নিয়েছিলাম। শুনলাম থাইল্যান্ডের কোথাও আর ওঁকে দেখা যাচ্ছে না। আরও একটা খবর শুনলাম। আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ওয়ার্নিং দিয়েছে ড. রামাকে। জিন নিয়ে ঢালাও গবেষণা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এই সংস্থা। সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে পারে বলে কয়েকটা ব্যবস্থা সুপারিশ করেছে ওরা। কীভাবে কী নিয়ে গবেষণা করা দরকার, বলে দিয়েছে— তার বেশি বাড়াবাড়ি করা যেন না হয়। ড. রামা ব্যাকটেরিয়া নিয়ে বিপজ্জনক গবেষণা করতে গিয়ে দাবড়ানি খেয়েছেন তাদের কাছে। তারপর থেকেই উনিই দেশছাড়া।'

'জিন আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপারটা কী বুঝিয়ে দেবেন?'

প্রফেসর অনুকম্পাভরে চাইলেন আমার দিকে, 'বোঝালেও কি বুঝবে?'

'একেবারে ক-অক্ষর গোমাংস তো নই।'

'তা ঠিক। আমার সঙ্গে থেকে থেকে তোমারও ব্রেনে পালিশ লাগা উচিত অ্যাদ্দিনে। জিন মানে হল ডিএনএ মলিকিউল— মানে, যে মলিকিউলে জীব-সৃষ্টির নকশা আঁকা থাকে, যে ডিজাইন অনুসারে মানুষ থেকে মানুষ হয়, গোরু থেকে গোরু হয়, সন্তান বাপ-মায়ের ধারা পায়, বংশগতি অব্যাহত থাকে। ক্লিয়ার?'

বুদ্ধিটা আমার চিরকালই ভোঁতা। চট করে মাথায় কিছু ঢোকে না। প্রফেসর দাবড়ানি দিলেও দমে যাই না। বারবার জিজ্ঞেস করে জেনে নিই। ডিএনএ মলিকিউল নিয়ে যা বললেন, তাও মাথার মধ্যে এমন ঘোঁট পাকিয়ে তুলল যে গেল সব গোলমাল হয়ে।

ঢোঁক গিলে তাই বললাম, 'আজ্ঞে না।'

প্রফেসর রাগলেন না। বললেন, 'নকশা বোঝো?'

'মিথ্যে কথা বলা, চক্রান্ত করা, ধাপ্পা দেওয়া, মেয়ের চেহারা যেমন নকশাবাজ লোক।'

'ননসেন্স। ওইসব ছোটলোকি মানে জানতে চাইনি। নকশা মানে ডিজাইন, প্যাটার্ন, ব্লু-প্রিন্ট। এবার বুঝেছ? যা দেখে শাড়ি তৈরি হয়, মেশিন তৈরি হয়।'

'ও! আপনি প্ল্যানের কথা বলছেন?'

'জীবদেহগুলো যেন এক-একটা অটোমেটিক মেশিন। নিজেই নিজেদের বানিয়ে চলেছে। ব্লু-প্রিন্ট থাকে কোষের মধ্যে, এরই নাম ডিএনএ মলিকিউল। কেউ কেউ বলে জিন। বুঝলে?'

'হ্যাঁ, এবার বুঝেছি।'

'জীবদেহের এই নকশা নিয়ে নকশাবাজি করাটা কিন্তু বিপজ্জনক। যেমন ধরো ব্যাকটেরিয়া মানে, জীবাণু। ব্যাকটেরিয়া খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে এবং অল্প জায়গার মধ্যে করে। তাই জিন-বৈজ্ঞানিকরা ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন। দু' ধরনের জিন ভেঙে ফেলে, মিশিয়ে ফেলে নতুন জিন গড়তে লাগলেন। মানেটা বুঝলে? দু' রকমের নকশা মিশিয়ে নতুন নকশা বানালেন। নতুন নকশা থেকে নতুন ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করলেন, যার প্রকৃতি কেউ জানে না। ফলটা কতখানি বিপজ্জনক কল্পনা করতে পারো?'

আমি কিছু কিছু কল্পনা করতে পারলাম। পৃথিবীতে যে জীবাণু আছে তার ঠেলাতেই মানুষ হিমসিম খাচ্ছে, কত ওষুধপত্র তৈরি হচ্ছে তাদের ঘায়েল করার জন্যে। নতুন জীবাণু তৈরি হলে রক্ষে নেই।

বললাম, 'নতুন জীবাণু তৈরির দরকারটা কী?'

'গিনিপিগ, বাঁদর, ইঁদুরকে নিয়ে গবেষণা হয় কেন? ফলাফলটা মানুষের কাজে লাগানোর জন্যে তো? জীবাণু নিয়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াররাও গবেষণা করছিলেন সেই কারণেই। জিনের ধর্ম অনুযায়ী একই নকশা অনুসারে নতুন জিন হওয়া উচিত, মানে, গোরু থেকে গোরুই হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে নকশা থেকে নকশা তৈরির সময়ে একটু আধটু ভুল হয়ে যায়। তাই সৃষ্টি একটু একটু করে পালটাতে পালটাতে আজকের এই মানুষের সৃষ্টি।

তা যদি না হত, যদি নকশা অনুযায়ী একইভাবে জীব সৃষ্টি হত, তা হলে তিনশো কোটি বছর আগেকার এককোষী জীব থাকত— বহুকোষী মানুষ বা জীবজগৎ হত না। তার মানে, বিবর্তন কথাটারই সৃষ্টি হত না।'

প্রফেসর থামতেই লাফিয়ে উঠে বললাম, 'বুঝেছি। ড. রামা এই ধীরগতি বিবর্তনকে দশ হাজার বছর এগিয়ে নিয়ে যেতে চান? দশ হাজার বছর পরে মানুষ যা হবে, এখনই তা করতে চান? জিন পালটে দিয়ে অতিমানুষ সৃষ্টি করতে চান?'

'বুদ্ধি খুলেছে। অতিমানুষ শব্দটার ইংরেজি মানে কিন্তু সুপারম্যান। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'হরিবিনয় মজুমদার যে খাতা কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার প্রথম পাতায় কি লেখা ছিল? ক্রিয়েশন অফ সুপারম্যান— তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'খাতাটা কি তা হলে ড. রামার নয়?'

'প্রফেসর!'

'হ্যাঁ। দীননাথ, ক'দিন ধরেই ড. রামার কথা আমার বড় বেশি মনে পড়ছিল। বালতিস্থান থেকে ওঁর উধাও হওয়াটা অত্যন্ত রহস্যজনক। ওঁর গবেষণা আরও বেশি রহস্যজনক। উনি উত্তেজিত হয়ে মানুষের ব্রেন সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলে ফেলেছিলেন। ম্যান তখনই সুপারম্যান হয় যখন তার ব্রেনটা সুপার ব্রেন হয়ে যায়। তারপরেই ঘটল পরপর তিনটে অদ্ভুত চুরির ঘটনা— পৃথিবীর তিনদিক থেকে লোপাট হয়ে গেল তিন-তিনটে সুপার ব্রেন। দীননাথ, বলো তুমি, এর মানে কী?'

ড. রামা ব্রেন সংগ্রহ করছেন!'

'এগজ্যাক্টলি। একেবারে খাঁটি কথা বলেছ। সুপার ব্রেন তৈরি করতে গেলে সুপার ব্রেনের জিন দরকার, নকশা দরকার। সেইসব নকশা মিলিয়ে উনি নতুন যে নকশা বানাবেন, তা থেকে তৈরি হবে সুপার-সুপার ব্রেন। স্ট্রেঞ্জ! এ যে ভাবাও যায় না, দীননাথ।'

'বিশ্বাসও করা যায় না, প্রফেসর।'

'না, না, দীননাথ, অবিশ্বাস করাটা ঠিক হবে না— ভুল করে ফেলবে। কোনও বৈজ্ঞানিকই গবেষণা থামিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান না; সাধনা মাঝপথে ফেলে হিমালয় চলে যান না। ড. রামা অকারণে হিমালয় যাননি, গবেষণার খাতিরেই গেছিলেন। পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে চেনা-জানা কাউকে দেখতে পাবেন আশা করেননি, আমাকে দেখে তাই ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলেন। মুখ ফসকে গোপন গবেষণার কথাও বলে ফেলেছিলেন, কিন্তু গবেষণার ধারা কোনদিকে চলবে তা বলেননি। এখন সুপার-ব্রেন চুরি যাওয়ায় আঁচ করতে পারছি ওঁর মতলবটা কী।'

'তা হলে উপায়?'

প্রফেসর যেন আপন মনেই বলে চললেন, 'ড. রামা বিবাগী হওয়ায় পাত্র নন। দেশত্যাগী হয়েছেন গোপনে গবেষণা করবেন বলেই। গবেষণাও চলছে পুরোদমে, নইলে ব্রেন চুরি যেত না। এতখানি উদ্যোগী আমিও হতাম না, মরা মানুষের মগজ নিয়ে কেউ যদি মানুষকে

দশ হাজার বছর এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, আমার তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু ব্যাপারটা এখন অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে। হরিবিনয়ের বাচ্চা ছেলেটার মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। মা নেই। বাবা গায়েব হল। কেন? জলজ্যান্ত মানুষটাকে নিয়ে কী করতে চান ড. রামা? খুন? না, না, না— আমি তা হতে দেব না। ছেলেটার 'বাবা কোথায়?' কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমি ওকে বলে এসেছি তোর বাবা বেড়াতে গেছে, ধরে নিয়ে আসব আমি। সেকথা আমাকে রাখতেই হবে।'

হাঁপাতে লাগলেন প্রফেসর। তাঁর আর এক রূপ সেদিন দেখলাম। একটা শিশুর 'বাবা কোথায়' ডাক তাঁকে পাগল করে তুলেছে। বিপুল আকুলতায় ফেটে পড়তে চাইছেন।

আস্তে করে বললাম, 'কী করবেন ঠিক করেছেন? পাবেন কোথায় ড. রামাকে?'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগাব। প্ল্যানেট ডিটেকটিভ এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর চাঁদকুমার নিয়মিত বুলেটিন পাঠায় আমাকে। বড় দুঁদে লোক। ঠিক হদিশ বার করবে।'

* * *

মাসখানেক পরে চাঁদকুমার খবর দিয়ে গেলেন প্রফেসরকে। লোকটাকে পাঞ্জাবি বলে মনেই হয় না। ঠিক যেন সাহেবের মতো। জন্ম থেকে আমেরিকায় কাটিয়ে ডিটেকটিভগিরিটা ওইখানেই শিখে এখন গ্রহ জুড়ে গোয়েন্দাগিরির জাল পেতেছেন। করিৎকর্মা ব্যক্তি সন্দেহ নেই।

বেলেঘাটা মেন রোডের সিআইটি বিল্ডিংসে ভোরবেলা কালো গাড়ি এসে বেরিয়ে গিয়েছে, এই সূত্রটুকু ধরে ভদ্রলোক অসাধ্য সাধন করলেন। খবর পেলেন নিউ আলিপুরের গোপন আস্তানা থেকে দুশমনরা দমদম আসবে বিশেষ এক দিনে এবং পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে আকাশপথে যাবে নেপাল, যেন দেশ দেখতে বেরিয়েছে। সেখান থেকে প্লেনে করে সটকান দেবে ব্যাংককে।

খবর পেলেন ঠিকই, কিন্তু ধরতে পারলেন না চাঁদকুমার। পাঁকাল মাছের মতোই অদ্ভুত কৌশলে তারা হাওয়া হয়ে গেল থাইল্যান্ডে।

খোদ চাঁদকুমার নিজেই এলেন সেই খবর দিতে। কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'প্রফেসর, আমার মনে হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম সিন্ডিকেট আছে এর পেছনে। আমার মুভমেন্টের খবর আগেই পেয়েছিল। সটকেছে ঠিক তার আগের ফ্লাইটে।'

চুপ করে রইলেন প্রফেসর। আমার মাথার মধ্যে খালি ঘুরছে একটা ডাক। হরিবিনয়ের ছেলের সেই ডাক, 'বাবা কোথায়?'

চাঁদকুমার বললেন, 'আমি কিন্তু কেস ছাড়ছি না। নো, নো, পেমেন্ট নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ইট ইজ এ প্লেজার টু ওয়ার্ক ফর ইউ। তা ছাড়া ফয়সালা না হলে পেমেন্ট আমি নিই না।'

'দেখুন', দমে যাওয়া সুরে বললেন প্রফেসর।

উঠে দাঁড়ালেন চাঁদকুমার।

'তা হলে আমি থাইল্যান্ডে সার্চ চালিয়ে যাচ্ছি। খবর পেলেই আপনাকে কনট্যাক্ট করব।'

খবর আর এল না। দীর্ঘ এক বছরেও না।

তারপরেই শুরু হল নতুন ঘটনা।

শিউরে উঠল বিশ্ববাসী।

৮. কলির চার্বাক

মিস ডিমি আজ কলকাতায় আসছেন।

সবক'টা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হেডলাইনে ছাপা হল সেই সংবাদ, মিস ডিমি আজ কলকাতায় আসছেন।

মিস ডিমি কোন দেশের মেয়ে, কোথায় তাঁর শিক্ষা, কে তাঁর বাবা-মা, কেউ তা জানে না। ধূমকেতুর মতো সহসা তিনি আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বরঙ্গমঞ্চে। জ্বালাময়ী বক্তৃতা, ক্ষুরধার যুক্তি এবং অকল্পনীয় পাণ্ডিত্য আর বিস্ময়কর রূপলাবণ্য দিয়ে ঝড় তুলেছেন দেশে দেশে।

তাঁর কৃষ্ণ-কালো চোখের তারা দেখলে মনে হয় হয়তো বা ভারতীয়। কিন্তু উগ্রতা দেখে মনে হয় স্পেনের মেয়ে হওয়াও বিচিত্র নয়। বেদ-বেদান্ত নিয়ে যখন চুলচেরা আলোচনা করেন, তখন মনে হয় কাশীর পণ্ডিতের ঘরে তাঁর জন্ম, কিন্তু বাইবেলের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে যখন তীব্র শ্লেষ ছুড়তে থাকেন, তখন মনে হয় ভ্যাটিক্যান সিটিতে স্বয়ং পোপের কাছে বৃথাই দীক্ষা নিয়েছেন। কোনও পরিস্থিতিতেই তিনি বিচলিত বোধ করেন না, প্রবল ব্যক্তিত্ব অথবা অসামান্য অভিনয়দক্ষতার দৌলতে পেরিয়ে যান প্রচণ্ডতম বাধাবিঘ্নও। বিজ্ঞান প্রসঙ্গে তিনি যেন একটা চলমান বিশ্বকোষ— বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়েই ছিন্নভিন্ন করে ছাড়েন প্রতিপক্ষকে।

সবার ওপরে আছে তাঁর আশ্চর্য রূপ। এ রূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, দেখলে বিশ্বাস হয় না। মানুষ যে এক অঙ্গে এত রূপলাবণ্য নিয়ে মর্ত্যে বিচরণ করতে পারে, তা শত সহস্রবার প্রত্যক্ষ করেও মনের ধাঁধা ঘোচে না।

মিস ডিমি তাই একটা বিপুল বিস্ময়, একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। তাঁর লক্ষ্যই হল ভিনি, ভিডি, ভিসি। আসব, দেখব, জয় করব। অপরাজিতা তিনি সর্বত্র। বড় বড় তর্কসভায় তিনি আহ্বান জানিয়েছেন বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের। তাঁদেরই ভাষায় তাঁদেরই সাহিত্য থেকে নজির তুলে ধরে তাঁদের অস্ত্রেই তাঁদের ঘায়েল করে বেরিয়ে এসেছেন বিজয়মাল্য পরে।

এত অল্প বয়সে এত ভাষায় দখল, বিশ্বের সব সাহিত্য নখদর্পণে রাখার ঘটনা একান্তই বিরল। বিশ্বের ইতিহাসে মিস ডিমির মতো এমন মেয়ে আজও দেখা যায়নি। তার্কিকদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছেন উগ্র রূপের তীব্র জ্বালায়, বুদ্ধির গোড়ায় ঘোঁট পাকিয়েছেন সূক্ষ্ম যুক্তি, তীক্ষ্ণ খোঁচায়। তিনি একাই একশো। ৩৪টা ভাষায় তিনি গড়গড় করে কথা বলতে পারেন,

খসখস করে লিখে যেতে পারেন, বোঝাই যায় না কোনটা তাঁর মাতৃভাষা আর কোনটা অর্জিত ভাষা।

অথচ তাঁর বয়স পঁচিশও ছাড়ায়নি। অদ্ভুত সুন্দর মুখশ্রী। নিখুঁত চোখ-মুখ-ভুরু-নাক-চিবুক-কান। নির্লিপ্তের মতো তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে যায়। শরীরটা চাবুকের মতো নমনীয় অথচ ভয়াবহ। ধরতে গেলে পিছলে যায়, সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে যায়।

কে এই মিস ডিমি? পৃথিবী নামক সৌরজগতের এই তৃতীয় গ্রহে এ যাবৎ তো এমন বিস্ময় দেখা যায়নি! তিনি যেন আকাশ থেকে টুপ করে খসে পড়েছেন ধরণীতে, অথবা পাতাল ফুঁড়ে দুম করে উঠে এসেছেন ভূপৃষ্ঠে।

দেশে দেশে পরিভ্রমণ করছেন তিনি একা। অর্থের তাঁর অভাব নেই। কোত্থেকে যে এত অর্থ আসছে, কেউ তার হদিশ পায়নি। আইনের বেড়াজালে তাঁকে ধরাও যায় না, আইন তার নখদর্পণে। আইনবিদদের লজ্জায় ফেলে দেন আইনের সূক্ষ্ম বিচারে। পুলিশ অসহায় তার দুর্বার গতির সামনে। দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা যেন তাঁর কেনা গোলাম; তাঁর হুকুমের চাকর; তাঁর জো-হুকুম বান্দা। তিনি যা বলবেন, রাষ্ট্রপ্রধানরা তাই পালন করেন।

তাঁর রূপ, তাঁর যুক্তি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর বাগ্মিতার কাছে পরাভব স্বীকার করছে তামাম দুনিয়া।

সেই মিস ডিমি আজ আসছেন কলকাতায়। আসছেন ছুটন্ত উল্কার মতো, জ্বলন্ত নক্ষত্রের মতো, ধাবমান ধূমকেতুর মতো। আসছেন দেশে-দেশে বিজয়কেতন উড়িয়ে, পরাজয়ের গ্লানি ছড়িয়ে, প্রচণ্ড ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে। আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়া, চিন, জাপান, রাশিয়া, আফ্রিকা হয়ে আজ তিনি আসছেন কলকাতায়।

সারা কলকাতা তাই চনমনে চঞ্চল, প্রতীক্ষায় অস্থির, উত্তেজনায় উৎকণ্ঠিত। তিনি আসছেন। অলীক উপন্যাসের অসম্ভব নায়িকার মতোই তিনি আসছেন তাঁর বিপুল জ্ঞানের সম্ভার, অবর্ণনীয় রূপের ডালি আর অবিশ্বাস্য অভিনয়ের প্রতিভা নিয়ে।

শহরের জ্ঞানীগুণীরা জড়ো হয়েছেন শহরের ঠিক মাঝখানের ময়দানে, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। কেউকেটা না হলে এখানে মিটিং করার অধিকার মেলে না। কিন্তু মিস ডিমিকে কিছুই করতে হয়নি। তাঁর অগণিত ভক্তরা সব ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর চৌম্বকব্যক্তিত্বের কাছে নতি স্বীকার করেছে নাস্তিক-আস্তিক প্রত্যেকেই।

দুপুর হতে না হতেই দলে দলে মানুষ জড়ো হতে লাগল ময়দানে। ইতিপূর্বে কোনও রাষ্ট্রপ্রধান বা ফুটবল মরশুমও এত জনতা আকর্ষণ করতে পারেনি কখনও, পিলপিল করে মানুষ আসছে তো আসছেই। পঙ্গপালের মতো কাতারে কাতারে তারা আসছে ট্রেন, বাস, ট্রাম, মোটর, পদব্রজে। তারা আসছে শুনতে, দেখতে, অবাক হতে। কলকাতা বড় বিচিত্র শহর। হুজুগ এ শহরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আকাশে-বাতাসে, প্রতিটি ধূলিকণায়। নিত্যদিনের একঘেয়েমি তুচ্ছ কারণেও ভঙ্গ হলে তাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কলকাত্তাইওয়ালারা। মিস ডিমি তো একটা বৃহৎ কারণ; একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। সারা বিশ্ব জয় করে তিনি আসছেন বিকেল ঠিক চারটের সময়ে।

কিন্তু তিনি কেন আসছেন? কী নিয়ে ভূগোলক প্রদক্ষিণ করে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে

বেড়াচ্ছেন? কোন বিষয়ে পণ্ডিতেরা পরাভূত হচ্ছেন প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধের পর?

জবাব খুব ছোট্ট।

মিস ডিমি নাস্তিক।

তিনি ঈশ্বর মানেন না। পরলোক ফরলোক কিছুই স্বীকার করেন না।

তিনি কলির চার্বাক।

এসে গেছেন মিস ডিমি।

কীভাবে এলেন, আফগান হাউন্ডের মতো শিকারী সাংবাদিকরাও যে সংবাদ সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়েছিলেন। এখন যে কোত্থেকে জাদুমন্ত্রবলে তিনি ময়দানে আবির্ভূতা হলেন, সে-রহস্যও ভেদ করতে অক্ষম হলেন।

মিস ডিমি সত্যিই রহস্যময়ী। রহস্য তাঁর চলনে-বলনে, চেহারা-চরণে, অণুতে-পরমাণুতে।

মিস ডিমি উঠে দাঁড়িয়েছেন মঞ্চে। লক্ষ লক্ষ লোক বিপুল বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে দেখছে তাঁর ভুবনমোহিনী রূপ। পাঠকের কল্পনার ওপর সেই অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে আসি তাঁর বচনবৃত্তান্তে।

লাউডস্পিকারগুলো গমগম করে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। সংগীতে যে ক'টা সুর আছে, পাশাপাশি খেলা করতে লাগল তাঁর মন্ত্রময় বাক্যধারার মধ্যে। মন্ত্রমুগ্ধের মতোই শুনতে লাগল লক্ষ লক্ষ মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের অনস্তিত্বকে তিনি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, প্রবল যুক্তি আর পাহাড়প্রতিম বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছেন তিল তিল করে। প্রথমে তিনি বর্ণনা করলেন মানুষ যেদিন থেকে চিন্তা করবার শক্তি পেয়েছে, সেইদিন থেকেই কীভাবে চারপাশের প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে অশরীরী দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। এইভাবে বহু দেবতা-অপদেবতা-উপদেবতার মতো তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী কল্পনা করেছেন অজ্ঞ ভয়ার্ত মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে। অবশেষে এক ঈশ্বরের বাণী প্রচারিত হয়েছে জুডাইজম, খ্রিস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং অন্যান্য নানা ধর্মে। কিন্তু সব ভুয়ো, সব মিথ্যে। স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হাজার হাজার বছর ধরে ঠকিয়ে আসছে মানুষকে।

আত্মা নেই, পরলোক নেই, সচেতন দেহ ছাড়া কিসসু নেই। সুখই পরম পুরুষার্থ, প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ; পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি থেকেই সব পদার্থের সৃষ্টি— মৃত্যুর পর এর মধ্যেই সব লীন হয়ে যায়।

অতএব লুটে নাও, মজা লুটে নাও। হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়— হেসে- খেলে-গেয়ে-নেচে এ জীবনটাকে তারিয়ে তারিয়ে রসিয়ে রসিয়ে চেটেপুটে লুটেপুটে ভোগ করে নাও। খ্রিস্টজন্মের তিনশো বছর আগে গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস বলেননি একথা? বলেননি এ যুগের উদ্দেশ্য একটাই— আনন্দ করো— শুধু আনন্দ? বৃহস্পতি আর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য চার্বাক বলেননি এই একই কথা? শাস্ত্র যদি মানতে হয় তবে কেন ভণ্ডদের কৃচ্ছ্রসাধন মানতে যাবে? মানো চার্বাক দর্শন, ফলো করো এপিকিউরাসের দর্শন। শ্রবণ করো মিস ডিমির দর্শন।

সাদা কথায়, ফুর্তি করে নাও। এ জীবন যদ্দিনের, তদ্দিন যতরকমভাবে পারো সুখের চেষ্টা করে যাও। একদিন তো সকলকে মরতেই হবে। মৃত্যুর পর সাধের এই দেহ ছাই হয়ে গেলে কিছুই আর পড়ে থাকবে না। কীসের জন্যে তবে মরছ ভেবে? পরলোক? নেই, নেই, নেই। পরলোকই যখন নেই, তখন পারলৌকিক সুখলাভের চেষ্টায় ধর্মের পেছনে ছুটোছুটি করে ক্ষণিকের এই জীবন নষ্ট করাটা কি আহাম্মুকি নয়?

পুনর্জন্ম? ওরে মূর্খ! যে দেহ একবার ছাই হয়ে যায় তা কি আর ফিরে আসে? পুনর্জন্মটা হবে কী করে? স্থূল এই দেহটাই তো আত্মা— এ দেহের বাইরে আর কোনও আত্মা নেই। ক্ষিতি, জল, বহ্নি, বায়ু— এই চার ভূতের সম্মিলনে উৎপত্তি এই দেহের। যেমন হলদে হলুদ আর সাদা গুঁড়ো মিশে গেলে লালচে রং দেখা যায়, যেমন মাদকতাশূন্য গুড়, চাল থেকে সুরা তৈরি হলে তাতে মাদকগুণ থাকে, ঠিক তেমনি দেহের উৎপত্তি হলে তাতে চৈতন্যের বিকাশ হয়। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমান-টনুমানকে প্রমাণ বলে গণ্য করা হয় না। ভাল খাও, ভাল পরো, ফ্যামিলি নিয়ে মজাসে থাকো, এই থেকে যে সুখ, সেই সুখই পুরুষার্থ। এসব সুখের সঙ্গে দুঃখও এসে যায় ঠিকই। কিন্তু দুঃখ নিয়ে মাথা না ঘামালেই হল। দুঃখের ভয়ে সুখ ত্যাগ করবে নাকি? মাছে কাঁটা আছে বলে মাছ খাওয়া ছাড়তে পারবে? তুষ দিয়ে ঢাকা আছে বলে ধানকে কেউ ফেলে দিতে পারবে?

কিছু প্রতারক ধূর্ত পণ্ডিত নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পরলোক, নরক, স্বর্গ— এইসবের কল্পনা করে জনসমাজকে ভয় দেখিয়ে অন্ধ করে রেখেছে। এদের কথায় যারা নাচে, ধর্ম ধর্ম করে পাগল হয়, বেদ পড়ে, পইতে নেয়, গায়ত্রী জপ করে, যাগযজ্ঞ করে— তারা নির্বোধ, তাদের পুরুষকার নেই। প্রতারক শাস্ত্রকাররা বলে, যজ্ঞে যে জীবকে বলি দেওয়া হয়, সে জীবের স্বর্গলাভ হয়ে থাকে। উত্তম কথা। তাই যদি হয় তো তারা নিজেদের বাবা-মাকে বলি দিয়ে তাদের স্বর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে না কেন? রসনাতৃপ্তির জন্যে অসহায় ছাগল ভেড়াকে বলি দেওয়া হয় কেন? এভাবে বাপ-মাকে স্বর্গে পাঠাতে পারলে শ্রাদ্ধেরও তো আর দরকার হয় না। কিন্তু শ্রাদ্ধ জিনিসটাও যে এই ধূর্তদের পয়সা রোজগারের আর উদর পূরণের আর এক ফন্দি। শ্রাদ্ধ করলেই যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তা হলে কেউ বিদেশে গেলে তাকে পাথেয় না দিয়ে তার উদ্দেশ্যে বাড়িতে কোনও ব্রাহ্মণকে খাইয়ে দিলেই তো আর তৃপ্তি হতে পারে। তা ছাড়া প্রাঙ্গণে শ্রাদ্ধ করলেই যখন দোতলার লোকের তৃপ্তি হয় না, তখন তারও ওপরের স্বর্গবাসীর শ্রাদ্ধ করলে তার তৃপ্তি হবে কী করে?

অতএব হে বঙ্গবাসী, শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ হল ব্রাহ্মণদের ব্যাবসা চালানোর ফিকির। বেদশাস্ত্রটাও ভণ্ড, ধূর্ত আর রাক্ষস— এই তিন শ্রেণির লোকেরা লিখেছে।

এই দেহ ছাই হয়ে গেলে যখন কিছুই আর থাকে না, তখন:

যাবজ্জীবং সুখং জীবেদ্
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

যদ্দিন বেঁচে থাকা যায়, সুখেই দিন কাটাও। দরকার হলে ধার করে ঘি খেও, ভাল ভাল

খাবার টাঁসাও, এই দেহ ছাড়া আত্মা নেই। থাকলে বন্ধু-স্বজনের টানে মানুষ মৃত্যুর পর নিজের দেহেই ফিরে আসত।

সুতরাং বেদ শাস্ত্র সবই অপ্রামাণ্য; পরলোক, স্বর্গ, মুক্তি সবই অবাস্তব; অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সবই নিষ্ফল। বিশেষ এক মতবাদের রাজনীতিবিদরা যেমন এক চিন্তাধারার বশবর্তী থাকার জন্যে জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে জনসাধারণের ওপর— ধর্ম-প্রচারকরা তেমনি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে চালিয়ে যাচ্ছে ভণ্ডামির রাজত্ব। মৃত্যুর পরের জীবন আলোকিত হোক বলে পোপের মৃত্যুর পর খুব তো গান গাওয়া হল, তাই শুনে নীল হয়ে আসা পোপের মুখে আলোর আভাস দেখা গেল না কেন? কারণ কিচ্ছু নেই— পরলোক বলে কিছুই নেই। এ জীবনই সব, তারপর সব শেষ। অথচ এই ধর্ম দোর্দণ্ডপ্রতাপগোষ্ঠীর মাধ্যমে সামাজিক আর অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে চলেছে মানুষকে। নইলে ভাবতে পারো ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রে চার্চের দাপট বজায় রাখার জন্যে প্রত্যেক আমেরিকান নাগরিককে ট্যাক্স দিতে হয়? স্টেট মিটিং, স্কুল আর সিটি কাউন্সিল সভার আগে ঈশ্বরের চরণবন্দনা করতে হয়? আমেরিকান নোটের ওপর 'ইন গড উই ট্রাস্ট' কথাটা লেখা থাকে? এসবই কি অগণতান্ত্রিক, বেআইনি নয়? ধর্মের নামে কি জুলুমের স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে না দেশে দেশে? পোল্যান্ড আর হাঙ্গেরিতে ক্যাথেলিকরা কি কমিউনিস্টদের মতো অগণিত হয়ে ওঠেনি? ভ্যাটিকান কি রাশিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে না? ধর্মের মুখোশ পরে দলবদ্ধ স্বেচ্ছাচারীরা সারা পৃথিবীর ওপর একটু একটু করে থাবা বসাচ্ছে না? কিন্তু পরলোকই যখন নেই, তখন ভয় কাকে? রুখে দাঁড়ান, সুখে থাকুন, মুখোশধারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করুন।

এই বলে সামনে রাখা টেবিল থেকে এক খণ্ড গীতা তুলে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলেন মিস ডিমি। তারপর ছিঁড়লেন বাইবেলের সেন্ট ম্যাথুজ বুক। সবশেষে ত্রিপিটক সূত্র।

ক্ষণকাল ছুঁচ পড়ার আওয়াজও শোনা গেল না কয়েক লক্ষ লোকের মধ্যে। ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো হাওয়ার টানে উড়ে গেল জনতার মাথার ওপর দিয়ে।

তারপরই শুরু হল গুঞ্জন। একটু একটু করে তা রূপান্তরিত হল প্রবল হট্টগোলে। তুমুল হইচই, করতালি, চেঁচামেচির মধ্যে একজনকেই শুধু দেখা গেল গলার শির তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে মঞ্চের দিকে ছুটে আসছে।

'প্লেটো বলেছেন, নাস্তিকতা একটা রোগ। মিস ডিমি, এ রোগের ওষুধ আমার জানা আছে।'

লোকটা বয়সে বুড়ো। পাগলাটে চেহারা। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাঁপাতে হাঁপাতে ভিড় ঠেলে মঞ্চের কাছে এসে পৌঁছতেই চিনতে পারলাম তাঁকে।

গলা ফাটিয়ে জনকল্লোল ছাপিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র! আপনি?'

'দীননাথ! দীননাথ! কোথায় গেল, নাস্তিক মেয়েটা কোথায় গেল?'

ফিরে তাকালাম মঞ্চের দিকে।

মঞ্চ ফাঁকা।

যেভাবে এসেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই যেন হাওয়ায় মিশিয়ে গেছেন ডিমি।

৯. সুপারম্যান কারখানা

পৃথিবীর কোনও একটি অঞ্চলে দিনকয়েক পর মিস ডিমিকে বসে থাকতে দেখা গেল সুসজ্জিত একটি ভূগর্ভ কক্ষে।

বুদ্ধিমান পাঠক এবং বুদ্ধিমতী পাঠিকা নিশ্চয় বুঝেছেন পাতালঘরে যখন নিরুদ্দেশ এবং পরম রহস্যময়ী মিস ডিমির আবির্ভাব ঘটেছে, তখন ব্যাপারটা খুব সুবিধের নয়।

ভুবনমোহিনী মিস ডিমি বসে বসে লম্বা পাইপে লাগানো সিগারেট টানছেন আয়েস করে। তাঁর বসে থাকার পোজেও ব্যক্তিত্ব ঠিকরে যাচ্ছে। স্বয়ং ক্লিওপেট্রাও বুঝি ভুরু কুঁচকোতেন মিস ডিমির এ হেন সম্রাজ্ঞীসুলভ ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করলে।

মিস ডিমি বসে আছেন লাল মখমল মোড়া একটা ডিভানের ওপর। সামনে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ঘরটা ছোট, কিন্তু যত রাজ্যের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। টেবিলের ধারে গদিমোড়া কালো চেয়ারটা এই মুহূর্তে শূন্য।

আচম্বিতে মেঝে সরে গেল। লিফটের মতো একটা বস্তু উঠে এল তলা থেকে। লিফটে দাঁড়িয়ে বামনাকার এক ব্যক্তি। লিফট নেমে গেল পাতালে। সরে এল মেঝে।

বামন-ব্যক্তি এসে বসল কালো গদিচেয়ারে। প্রখর চোখে চেয়ে রইল মিস ডিমির পানে।

মিস ডিমি চেয়ে রইলেন অন্যদিকে।

বামন-ব্যক্তির দেহশ্রী বর্ণনা করা যাক। লোকটার মাথা চার ফুটও হবে কিনা সন্দেহ। হ্রস্বতা ম্যানেজ করে নিয়েছে প্রস্থের বিপুলতা দিয়ে। কাঁধটা ষাঁড়ের কাঁধের মতন, বুকটা সিংদরজার মতন, কোমরটা সিংহের কোমরের মতন।

চুল ধবধবে সাদা। গাত্রবর্ণ তথৈবচ। চোখের তারাও তাই। অপরিসীম ধূর্ততা, নিঃসীম নিষ্ঠুরতা আর সীমাহীন পৈশাচিকতা প্রকট দুই চোখের ধূসর তারায়।

বামন বলল, তার ছেঁড়া ভাঙা পিয়ানোর বেসুরো বিকট গলায় বললে, 'ডিমি, কলকাতা থেকে হঠাৎ চলে এলে কেন? কাজ তো তোমার শেষ হয়নি।'

মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে চোখ ফেরালেন মিস ডিমি, 'আটচল্লিশটা দেশের গোয়েন্দারা ফলো করেছিল আমাকে।'

'কেন?'

'অ্যারেস্ট করবে বলে। আর বাড়তে দেবে না বলে। ওরা খবর পেয়েছিল আন্তর্জাতিক নাস্তিকতা আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছে— রাষ্ট্রবিদ্রোহ এই প্রথম অন্য আকারে দেখা দিতে চলেছে। তাই আমাকে জেলে পুরে নাস্তিকতা সংগঠন ধূলিসাৎ করতে চেয়েছিল।'

হেসে উঠল বামন। ক্রূর ভীষণ, রক্ত-জলকরা হাসি। 'ইডিয়ট! নাস্তিকতা আন্দোলন তো আমাদের লক্ষ্য নয়। সেটা কি টের পেয়েছে?'

'না।'

'পাবেও না।' অট্ট অট্ট হেসে বললে বামন-পুরুষ। 'রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্যে লালায়িত নয় এই শর্মা। আমি চাই—'

‘ড. এক্স!’ শান্ত শীতল স্বরে বললেন মিস ডিমি।

‘কী?’

‘আমি জানি আপনার কী লক্ষ্য। আপনি কী চান।’

‘তা তো জানবেই।’

‘আপনি চান সারা পৃথিবীর মানুষ সুখে গা ঢেলে দিক, আপনি সেই সুখের রসদ জুগিয়ে দু’ হাতে টাকা রোজগার করে যান। এই তো।’

‘পাক্কা খবর।’

‘দারিদ্র্য পৃথিবীতে থাকবেই, জনসংখ্যা যত বাড়বে, অভাব-অনটন তত বাড়বেই। ভারতবর্ষে এইজন্যেই আমার বক্তৃতা এক সাড়া জাগিয়েছে। মণ মণ ঘি পুড়িয়ে, যাগযজ্ঞ করে আর কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভোটাভুটি করেও দেশের বেশিরভাগ মানুষই আধপেটা খেয়ে প্রায় ন্যাংটা হয়ে আছে। ধর্মের অনুশাসনে এতদিন তারা ভুলেছিল। আর ভুলতে চায় না। আপনি জুয়োর জাল পাততে চান সেইসব দেশেই বেশি করে, হাহাকার যেখানে বেশি। জুয়ো মানে, লটারি, মানে গেম অফ চান্স এইসব দেশেই ফলাও করে হয়— আপনার ব্যাবসাও তাই।’

চোখে চোখ রেখে অদ্ভুত হিমশীতল কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেলেন মিস ডিমি— সেই মিস ডিমি যার বক্তৃতার প্রভাবে সারা পৃথিবী তটস্থ— কিন্তু ড. এক্স নাম বামন-পুরুষ নির্বিকার মুখে শুনে যাচ্ছে তাঁর ভাষণ, ঠোঁটের কোণে আর চোখের তারায় ভাসছে পাতলা ছায়া।

মিস ডিমি বললেন, ‘আপনার ষড়যন্ত্রকে সার্থক করার জন্যেই আমার আবির্ভাব। রাষ্ট্রপ্রধান আর পুলিশপ্রধানরা আমার পদানত জেনেই এগিয়ে এসেছে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডার কর্তারা, তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে আমার গতিরোধ করার জন্যে। তাই আমি গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে এসেছি আপনার কাছে, শুধু একটা কথা জানতে।’

নির্নিমেষে চেয়ে রইল ড. এক্স নামধারী বিটলে বামন। বারেক জ্বলে উঠল সাদা চোখ।

মিস ডিমির চোখের পাতায় কাঁপন নেই, কাঁপন নেই গলার স্বরে।

‘আমি জানতে চাই আমি কে।’

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ড. এক্স। ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হল মুখবিবর, ঝকঝকে সাদা দাঁতে ভেসে গেল আশ্চর্য হাসি।

‘জানাটা কি একান্তই দরকার?’

‘হ্যাঁ, দরকার। আমি বুঝতে পারি বুদ্ধি, মেধা, জ্ঞান— এই তিন বিষয়ে আমাকে টেক্কা মারার মতো মানুষ দুনিয়ায় নেই, অন্তত এখনও তার সাক্ষাৎ আমি পাইনি। আমি জানি এ ছাড়াও আমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এমন অনেক শক্তি যার খবর আপনিও এখন পাননি—’

‘কী শক্তি?’ সাদা ভুরু বেঁকে গেল ড. এক্সের।

জবাব না দিয়ে কথার জের টেনে বলে চললেন মিস ডিমি, ‘আমি জানি হঠাৎ এই বিস্ময়কর শক্তি নিয়ে জাগ্রত হয়েছে আমার ব্রেন। কিন্তু তার আগের ইতিহাস আমার কিছু

মনে নেই। আমি জানতে চাই, আমি কে, কার সন্তান, কোথায় আমার জন্ম, কেন অতীত মনে করতে আমি অক্ষম।'

ড. এক্স হেলে পড়লেন গদিমোড়া চেয়ারে।

'আমি কে তা তো তুমি জানো?'

'জানি।'

'বলো তো শুনি।'

'আপনি ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় জুয়ো কোম্পানির মালিক। এ কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে পড়তে পায় না, ব্যালেন্স শীট দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যায়। হাই স্ট্রীটে আপনার অগুনতি বেটিং শপ আর গ্যাম্বলিং ক্যাসিনো আছে, মালটিন্যাশনাল কোম্পানি যেভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ব্রাঞ্চ চালায়, আপনিও সেইভাবে আপনার জুয়ো খেলার ব্রাঞ্চ চালান। আমি জানি আপনার একটা গ্যাম্বলিং ক্যাসিনো থেকে এক রাতে কুড়ি লক্ষ পাউন্ড হারিয়ে বেরিয়ে এসেছিল একজন আরব প্রিন্স, তা সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট আপনাকে খাতির করে, কেননা গ্যাম্বলিং ব্রিটেনে আইনত স্বীকৃত এবং সরকারের ঘরে প্রচুর খাজনা জমা পড়ে আপনার দৌলতে। টাকার আপনার শেষ নেই তা সত্ত্বেও আপনি বিরাট স্কেলে পৃথিবী জুড়ে গ্যাম্বলিং আরম্ভ করতে চান, সারা পৃথিবীর মানুষকে জুয়ো, মদ, ভোগের নেশায় মাতাল করতে চান। উদ্দেশ্য আপনার একটাই— টাকা, টাকা আরও টাকা।'

'যযাতির ভোগের ইচ্ছে আর কুবেরের টাকার ইচ্ছে কি কখনও যায়।' আবার উপহাসের ছুরি ঝলসে ওঠে বামন-চোখে।

'সেটা অন্য প্রশ্ন। এখন বলুন আমি কে?'

'আমি গ্যাম্বলিং কিং— ঠিক ধরেছ। আর কী জেনেছ?'

'আপনি শিকাগোর মস্তান-সম্রাট, মাফিয়া ক্রাইম সিন্ডিকেটের শিরোমণি। দুনিয়া জুড়ে জাল ছড়িয়েছেন আপনি হাজার জিনিসের স্মাগলিং চালানোর জন্যে। আপনার চেলাচামুণ্ডা অগণিত, কিন্তু কেউ জানে না সিন্ডিকেটের কর্তা কে। আপনার চেহারা দেখা তো দূরের কথা, আপনার নাম পর্যন্ত কেউ জানে না। কিন্তু আমি জানি। আপনি না বললেও আমি জানি আপনি বিশিষ্ট ব্রিটিশ নাগরিক, অথচ মাফিয়া ক্রাইম সিন্ডিকেটে পরিচিত ড. এক্স নামে। আপনি কোন শাস্ত্রে এই খেতাব অর্জন করেছেন, তা আপনি কোনওদিন আমাকে না বললেও আমি জানি বায়োনিক্স অর্থাৎ জীববিদ্যা আর যন্ত্রবিদ্যার সমন্বয়ে যে বিদ্যা, সেই বিদ্যায় আপনি পারঙ্গম। আপনি প্রকৃত পণ্ডিত, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যর্থতার মনোবেদনা আর আকাশপ্রতিম অর্থলিপ্সা আপনাকে টেনে এনেছে এই নরক গুলজারে। আমি সব জানি, কিন্তু জানি না আমি কে, কে আমার বাবা, কে আমার মা। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি মানুষ নই, জীব আর যন্ত্রের সমন্বয়ে তৈরি অত্যাশ্চর্য রোবট। আমি মানুষ হলে মানুষের মতোই বুদ্ধি ধরতাম, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধিতে কোনও মানুষই আমার সমকক্ষ নয়, এমনকী, আপনিও নন। হলে জানতে পারতেন আশ্চর্য আর এক শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমার মধ্যে।'

'কী শক্তি?' ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলেন ড. এক্স।

যেন শুনতে পাননি প্রশ্নটা এমনিভাবে কথার রেশ টেনে নিয়ে মিস ডিমি বললেন, 'এখনও প্রকাশ করিনি সেই শক্তি, কিন্তু প্রয়োজন হলে করতে দ্বিধা করব না।'

'শক্তিটা কী?' ঈষৎ চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করে ড. এক্স।

এই প্রথম উদ্বেগ দেখা যায় তার বেপরোয়া চোখে-মুখে।

'বলুন আমি কে, কী আমার পরিচয়।' মিস ডিমি যেন সত্যিই একটা যন্ত্র। তার কণ্ঠস্বর অতি-ভাবলেশহীন। চোখ নিরুত্তেজ।

পলকহীন চোখে একাধারে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী মিস ডিমির পানে চেয়ে রইল ড. এক্স। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ড. এক্সের দাপটে দুনিয়ার খুনে-গুণ্ডারা কাঁপে, কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে মিস ডিমির প্রাণে ভয়-ডর নেই। বরং অজ্ঞাত আশঙ্কার দূরায়ত পদধ্বনি ড. এক্সের অন্তরেই জাগিয়েছে ভয়ের আবর্ত। মিস ডিমি সাধারণ মেয়ে নয়, তার মধ্যে যদি অসাধারণ কোনও নতুন শক্তি জাগ্রত হয়ে থাকে, ড. এক্সের তা জানা দরকার—

কিন্তু এই প্রথম বিশ্বপরিক্রমা করে আসার পর তার কথার অবাধ্য হয়েছে মিস ডিমি। তিনবার একই প্রশ্ন করেছে ড. এক্স। তিনবারই এড়িয়ে গিয়েছে অসামান্যা মেয়েটা। কেন? নামহীন আশঙ্কাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ড. এক্স। বলল, 'আমার অনেক খবরই তুমি রাখো। কিন্তু মনে হচ্ছে দু'-একটা খবর এখনও রাখো না।'

'যেমন?'

'আমার চোখ সর্বত্র। পৃথিবীর উলটোদিকে গিয়েও তুমি আমার চোখের আড়াল হতে পারোনি। তুমি যা যা বলেছ, সবই আমি জানি। তোমার সব খবরই আমার কানে আসে। আমি জানি আটচল্লিশটা দেশের ব্লাডহাউন্ড ডিটেকটিভেরা তোমার পেছনে লেগেছে। কিন্তু তারা তোমায় ধরেও ধরতে পারছে না, তুমি হাওয়ার মতো আসো, হাওয়ার মতো যাও— তোমার এই দ্রুত মুভমেন্টে সাহায্য করে আমার লোকজন, তোমার অজ্ঞাতসারে।'

'অজ্ঞাতসারে নয়, আমি সব জানি। এটাও নিশ্চয় আপনি জানেন, প্রয়োজন হলে আপনার লোকজনের চোখে ধুলো দেওয়ার মতো ব্রেন আমার আছে।' শান্ত স্বর মিস ডিমির।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায় ড. এক্সের। দুর্দান্ত ড. এক্সকে নিয়ে যেন খেলছে মিস ডিমি। তারছেঁড়া বিকট বেসুরো গলায় জবাব দেয় ড. এক্স, 'তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কী চাও তুমি?'

'আমার পরিচয়।'

'সুপার ব্রেন নিয়েও কি তুমি তা জানো না?'

'আপনি বলুন।'

'এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব হল না।'

'আপনি বলুন।'

'কেন জানতে চাও?'

'জানাটাই যে আমার ধর্ম।'

চুপ করে রইল ড. এক্স। বুকের ভেতর এই প্রথম হৃদপিণ্ডকে উত্তাল হতে অনুভব করল।

মিস ডিমি কি হাতের মুঠোর বাইরে চলে যাচ্ছে?

বলল, 'যা বলছিলাম, অনেক খবরই তুমি এখনও রাখো না আমার সম্বন্ধে। তুমি জানো না আমার আবিষ্কার করা এনজাইম ইঞ্জেকশন দিয়ে তোমাকে আমি অক্ষয়যৌবনা রেখেছি। তুমি উর্বশীর মতো চিরযৌবনা থাকবে, যতদিন এই ইঞ্জেকশন নিয়ে যাবে। বছরে মাত্র একবার।'

'তার আর দরকার হবে না।'

চমকে উঠল ড. এক্স। প্রাণপণ চেষ্টায় সামলে নিল নিজেকে। মেয়েরা সব হারাতে পারে, গাড়ি গয়না স্বামী— স-ব— কিন্তু যৌবন হারাতে চায় না। চাবিকাঠিটি হাতে রেখেই প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছিল ড. এক্স— কিন্তু তা বুমেরাং হয়ে ফিরে এল ড. এক্সেরই কাছে।

ভেতরে ভেতরে এবার বিষম বিচলিত হয় ড. এক্স।

কী চায় মিস ডিমি?

যথাসম্ভব সহজ গলায় ড. বলে, 'ইঞ্জেকশনের দরকার আর নেই?'

'আমি কে?' এক প্রশ্ন মিস ডিমির।

'মিস ডিমি, তোমার মস্তিষ্কটা সাধারণ মস্তিষ্ক নয়, সুপার ব্রেন। তা নিশ্চয় বুঝেছ।'

চেয়ে রইল মিস ডিমি। জবাব নিষ্প্রয়োজন।

অস্বস্তি বোধ করে ড. এক্স।

বলে, 'তোমার এই সুপার ব্রেনের স্রষ্টা বলতে গেলে আমি।'

'আপনি?'

'মানে,' কথা জড়িয়ে গেল ড. এক্সের, 'আমি মদত দিয়েছি, সৃষ্টি করেছেন ড. রামা।'

'নাম শুনেছি। ব্যাংককের নিখোঁজ ড. রামা। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার ড. রামা।'

'রাইট। ড. রামা অত্যন্ত গরিব ঘরের ছেলে। ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বড় হয়েছেন। মেধার জোরে পরপর অনেক সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর একটা বদ নেশা ছিল, জুয়ো।'

'জানি!'

'লন্ডনে আমার একটা ক্যাসিনোয় তাঁকে আমি কবজা করি। তাঁর উচ্চ বাসনার কথা শুনি। অতিমানুষ তৈরির পরিকল্পনা শুনি। সুখের রাস্তায় সারা পৃথিবীর মানুষকে টেনে নামিয়ে দু' হাতে পয়সা রোজগারের পরিকল্পনাটা মাথায় আসে তখনই। এও এক ধরনের বিশ্ববিজয়। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবিস্তার, জাপান যেরকম করছে পৃথিবী জুড়ে। মাড়োয়াড়িরা যেভাবে করছে সারা ভারতবর্ষে। লড়াই এখন অন্য চেহারা নিয়েছে। আমি ব্রিটিশ। এককালে আমাদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যেত না। সে গৌরব ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করলাম। অতিমানুষ বানিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের মতিচ্ছন্ন ধরিয়ে টাকা শোষণের পন্থাটা কেউ বুঝতেও পারবে না, ধনী গরিব উভয় দেশ থেকেই স্রোতের মতো আসবে টাকা।'

ঘাড় কাত করে শুনছে মিস ডিমি।

'ড. রামাকে কথা দিলাম, যত টাকা লাগে লাগুক, গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। উনি বলেন, টাকার চাইতেও বেশি দরকার এখন খানকয়েক সুপার ব্রেনের নমুনা, কালচারের

জন্যে। আমি বললাম কুছ পরোয়া নেহি। কাদের ব্রেন চাই? মেরে আনতে হবে কি? উনি শিউরে উঠে বললেন, না, না। কাউকে মারতে হবে না। মারা যাওয়ার পর লুঠ করে নিতে হবে। আমি তাতেই রাজি হলাম। ফলে চুরি হয়ে গেল স্যার আইজ্যাক কারম্যান, মার্শাল কনওয়ে আর সূর্য মুখার্জির ব্রেন।'

'একটা প্রশ্ন,' বাধা দিলেন মিস ডিমি। 'হরিবিনয় মজুমদার বলে একজন লেখককে আপনিই গায়েব করেছেন?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?'

'জানাটাই আমার কাজ।—কেন করেছেন?'

কান লাল হয়ে উঠল ড. এক্সের। রূঢ় হতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে।

বলল, 'সূর্য মুখার্জির লাশ চুরির রাতে ড. রামার অতিমানুষ তৈরি সংক্রান্ত প্রথম লেখা খাতাটা হারিয়ে যায়। হরিবিনয় তা কুড়িয়ে পায়, পড়ে এবং কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু যেহেতু খাতায় বিষয়বস্তু সে জেনে ফেলেছিল, তাই তাকেও আসতে হয় আমাদের সঙ্গে।'

'বিষয়বস্তু কিন্তু অন্তত একজনের অজানা নেই।'

'কে সে?' ভুরু কুঁচকে ওঠে ড. এক্সের।

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

'দ্যাট ম্যাড প্রফেসর!'

'পাগল হলেও ছিনে জোঁক তিনি। দুনিয়ায় আর কাউকে ডরাই না আমি, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ককে সমীহ করি। লোকটার মস্তিষ্ক আছে— আমার সুপার ব্রেনের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো কিছুটা মস্তিষ্ক তাঁর আছে। হরিবিনয় মজুমদার ড. রামার খাতা পড়ে পরের দিন ভোরেই একটা গল্প লিখেছিল, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সে গল্প পড়েন। উনি গোয়েন্দাও লাগিয়েছিলেন। কলকাতার মিটিংয়ে আর একটু হলে আমাকে ধরে ফেলতেন।'

'তাই নাকি? তা হলে তো লোকটাকে সরিয়ে ফেলতে হয়।' শক্ত হয়ে ওঠে ড. এক্সের চোয়ালের হাড়।

'ড. এক্স।' শান্ত স্বরে ডাকেন মিস ডিমি। 'ড. হরিবিনয় কোথায়? ইহলোকে, না পরলোকে?'

বাঁকা হাসি হাসেন বামনপুরুষ, 'পরলোক মানো তুমি?'

'সোজা জবাব দিন।'

'ইহলোকে। মেরে ফেললেই ল্যাটা চুকে যেত, কিন্তু ড. রামা বেঁকে বসলেন। লোকটার মা-মরা একটা বাচ্চা ছেলে আছে নাকি। ড. রামার পায়ে পড়ে সে বেঁচে থাকতে চাইল শুধু সেই ছেলেটার জন্যে। চিপ সেন্টিমেন্ট। ড. রামার কথায় রাজি না হয়ে পারলাম না। কেমিক্যাল এক্সটা তিনি এখনও ফাঁস করেননি—'

'কেমিক্যাল এক্স!'

'আরে হ্যাঁ। তিনরকম ব্রেন মিশিয়ে উনি একটা বিশেষ এনজাইম ইনজেক্ট করেছিলেন তাতে। আমার নামে কেমিক্যালটার নাম দিয়েছি কেমিক্যাল এক্স। এই কেমিক্যালটার

ফর্মুলা উনি নিজের ব্রেনে রেখে দিয়েছেন। যদ্দিন না জানতে পারছি, তদ্দিন ওঁকে ঘায়েল করতে পারছি না।'

'ঘায়েল করবেন?'

'তা ছাড়া আর তাঁর দরকারটা কী? কেমিক্যাল এক্স উনি আবিষ্কার করেছিলেন হিমালয়ে গিয়ে, বিশেষ এক ধরনের জড়িবুটির নির্যাস থেকে— হিমালয়ের সেই বনৌষধি আর কোথাও পাওয়া যায় না। শুনেছি ভারতবর্ষের মুনিঋষিরা হিমালয় গিয়ে তপস্যা করে যুগ যুগ ধরে শুধু এই বনৌষধির দৌলতেই। ড. রামার মাথা থেকে এই খবরগুলো বার করতে পারলেই ওকে বিদায় দেব জন্মের মতো, বিদেয় করব হরিবিনয়কেও, একাই বানাব সুপারম্যানের পর সুপারম্যান, সুপারম্যানের সেই কারখানায় প্রথমেই বানাব তোমার একজন পুরুষসঙ্গী, সুপার ব্রেন থাকবে যার করোটিতে।'

নিমীলিত নয়নে চেয়ে আছেন মিস ডিমি। মৃদুকণ্ঠে এখন বললেন, 'হরিবিনয়কে ছেড়ে দেবেন, তার বাচ্চা ছেলেটার জন্যে।'

'তোমার হুকুমে?' এই প্রথম বজ্রধ্বনি শোনা যায় ডক্টরের কণ্ঠস্বরে।

'আপনার স্বার্থেই ছাড়বেন। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বাচ্চাটাকে কথা দিয়েছেন তার বাবাকে ফিরিয়ে এনে দেবেন।'

'আই উইল কিল দ্যাট ব্লাইটার।'

'প্রফেসরকে খুন করার ক্ষমতা আপনার নেই, ড. এক্স। আপনার চাইতে অনেক শক্তিশালী তাঁর মগজ। হরিবিনয়কে তো উনি উদ্ধার করবেনই, আপনিও রেহাই পাবেন না।'

খলখল হেসে ড. এক্স বললেন, 'আমার শক্তি সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা নেই। এই ঘাঁটির সন্ধান পৃথিবীর কেউ জানে না, তুমি ছাড়া।'

'ড. রামা জানেন, হরিবিনয় জানে।'

'তারা আমার পায়ের তলায়,' পা দিয়ে মাটি ঠুকে বললে ড. এক্স, 'আরও পাতালে। ওখান থেকে এ জন্মে তাদের বেরোতে হবে না।'

এতক্ষণ একদম হাসেননি মিস ডিমি।

এখন হাসলেন। খুব মিষ্টি হাসি।

কিন্তু গা ছমছম করে উঠল ড. এক্সের।

মিস ডিমি বললেন, 'এবার আমার শেষ প্রশ্ন।'

'বলো।'

'আমার মা কোথায়? বাবা কে?'

দম নিয়ে ড. এক্স বললে, 'তোমার মা, স্বর্গ যদি বলে কিছু থাকে, এখন সেইখানে। ভারতবর্ষের মেয়ে ছিল সে, আশ্চর্য রূপসী।'

'আর বাবা?'

'তোমার সামনে।'

১০. সুপার পাওয়ার

ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস ডিমি। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন টেবিলের সামনে। ঈষৎ ঝুঁকে ড. এক্সের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আপনি...তুমি আমার বাবা!'

'হ্যাঁ মা, আমিই তোর বাবা। অবিকল তোর মায়ের মতোই দেখতে হয়েছিস বলে, তোর মধ্যেই তোর মাকে আমি দেখতে পাই, তাই তোকে চিরযৌবনা বানিয়েছি। আর তোর করোটির মধ্যে টেস্টটিউব মেথডে তৈরি সুপার ব্রেন বসিয়েছি। তাই তোকে আমি এত নজরে নজরে রাখি, আমার এই গোপন বিষয়ের সন্ধান শুধু তোকেই জানিয়েছি।'

বামনের শুষ্ক চোখ স্নেহকোমল হয়ে আসে শেষ ক'টি কথার পর।

মিস ডিমি সেইভাবেই ঝুঁকে থেকে শুধু বলে, 'তুমি আমার বাবা?'

চেয়ারে বসেই সস্নেহে চেয়ে রইল বামনপুরুষ।

মিস ডিমি যেন আপন মনে বলে চলেন, 'কিন্তু তা কী করে হয়।'

'কেন হয় না?'

'আমার ব্রেনে তো তোমার ব্রেনের ব্লু-প্রিন্ট নেই— আমি তো কেমিক্যাল ব্রেন নিয়ে বেঁচে আছি।'

'তাতে কী? হার্ট, কিডনি পালটে গেলেও মানুষ তো পালটায় না। তুই আমারই মেয়ে, ডিমি।' গলা কেঁপে গেল ড. এক্সের।

একইভাবে টেবিল ধরে ঝুঁকে থেকে অনড় ভঙ্গিমায় মিস ডিমি বললেন, 'ব্রেনই সব, সুপার ব্রেন নিয়ে আমি এখন সুপার উওম্যান, তোমার মেয়ে তো নেই।'

'না না না।' চেয়ার ছেড়ে ছিটকে সটান দাঁড়িয়ে উঠে কদাকার বামনপুরুষ।

হেঁট হয়ে চার ফুট উঁচু বিটলের চোখে চোখে তাকিয়ে আশ্চর্য শান্ত স্বরে মিস ডিমি বলেন, 'ব্রেনই সব। দশ হাজার বছর এগিয়ে যাওয়া সুপার ব্রেন নিয়ে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছি আমি— এই ব্রেনই আমাকে দিয়েছে আরও আশ্চর্য এক শক্তি, ফলে ব্রেনকে আঁকড়ে পড়ে থাকারও দরকার নেই।'

দুই চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে ড. এক্সের, 'কী— সেই শক্তি?'

'বলব, এবার বলব সেই শক্তিকাহিনি। তার আগে একটা কথা বলে রাখি। হরিবিনয়ের ছেলেকে ভালবাসাটা তোমার কাছে সস্তার সেন্টিমেন্টই যদি হয়, আমার প্রতিও তোমার কোনও সেন্টিমেন্ট থাকাটা উচিত নয়। কারণ—'

'না, না, না!' গলা চিরে যায় ড. এক্সের। একে তো ভয়াল স্বর, তারপর বিষম উত্তেজনায় স্বরভঙ্গ ঘটায় মনে হয় যেন একই সঙ্গে কাড়ানাকাড়ার জগঝম্প বেজে উঠল ঘরের মধ্যে।

ভ্রূক্ষেপ না করে চোখে চোখে চেয়ে দ্রিমি দ্রিমি কণ্ঠে বলেন মিস ডিমি, 'আমি কেউ নই তোমার— এ পৃথিবীর কারওর আত্মজা আমি নই। দশহাজার বছরের ধারা বিবর্তনকে একলাফে পেরিয়ে আসা আমি একটা অতিমানুষ— সাধারণ মানুষের এই সংসারে তাই আমার ঠাঁই নেই, এরা কেউ আমার আপন নয়, হতে পারে না। সারা পৃথিবী জুড়ে যে বাণী আমি ছড়িয়ে এসেছি, আমি জানি তা সত্যি নয়। তোমরা আমার ব্রেন সৃষ্টি করেছ বলে

বড়াই করছ, কিন্তু তোমাদেরও ব্রেন যিনি সৃষ্টি করেছেন, আমি সেই পরম সৃষ্টিকর্তাকে পূজা করি। তাই যাওয়ার আগে বলে যাই খোদার ওপর খোদকারি করার প্রতিফল অন্যদিক দিয়ে আসে, যেমন তুমি পাবে এখুনি। তোমরা ভেবেছ অতিমগজ সৃষ্টি করেছ। কিন্তু তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিই তোমাদের হাত দিয়ে সৃষ্টি করান নিজের সৃষ্টি, তোমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তোমরা সুপারব্রেন তৈরি করে উৎফুল্ল হলে, তিনি তোমাদের হাত দিয়ে সূক্ষ্ম অতিমগজ গড়ে নিয়ে সূক্ষ্ম শরীরে তা সঞ্চারিত করে দিলেন। স্থূল মস্তিষ্কের সব শক্তিই রইল এই সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে, রইল আরও একটা বাড়তি শক্তি, যে শক্তি ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা যোগবিভূতির ফলে অর্জন করতেন, সেই শক্তিই আপনা হতে এসে গেল আমার মধ্যে। ফলে—'

বলে ক্ষণেক নীরব হলেন মিস ডিমি। নিষ্পলকে ড. এক্সের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'আমি যখন খুশি এই স্থূলদেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে আশ্রয় নিতে পারি।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ড. এক্সের, ঠেলে বেরিয়ে আসে যেন সাদাটে চোখ।

মিস ডিমি আশ্চর্য শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি বলতে যে এই রক্তমাংসের আমি নই— সে জ্ঞান আমি পেয়েছি অতিমগজ পাওয়ার পর থেকেই। এই দেহটা আমার বাহন, একটা যন্ত্র। দরকারমতো বাহন যা যন্ত্র বা বস্ত্র পরিত্যাগের মতোই কলেবর ত্যাগ করে নতুন শরীর অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা আমায় ঈশ্বর দিয়েছেন। দশহাজার বছরের বিবর্তনের পথে বেয়ে মানুষ অতিমানুষ হলে যে শক্তি পেত, ঋষিরা সাধনা করে যে শক্তি পান, আমি তাই পেয়েছি পরম সৃষ্টিকর্তার খেয়ালে। আমি এই মুহূর্তে চলে যেতে পারি তোমার শরীরে, আমার সুপার ব্রেনের সমস্ত শক্তি যাবে আমার সঙ্গে, তুমি তোমার পিশাচ ব্রেন নিয়ে চলে আসবে আমার দেহে।'

একইভাবে চেয়ে রইলেন মিস ডিমি। চেঁচাতে গেল ড. এক্স, স্বরযন্ত্রে স্বর ফুটল না। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল মিস ডিমিকে, ইচ্ছাশক্তি লোপ পাওয়ায় আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারল না। মনে হল যেন চুম্বকের টানে সমস্ত সত্তা চলে যাচ্ছে মিস ডিমির দিকে।

স্তিমিত নয়নে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে চোখের পাতা বন্ধ করলেন মিস ডিমি, যন্ত্রচালিতের মতো চোখের পাতা বন্ধ করতে হল ড. এক্সকেও। ক্ষণেকের জন্য অন্ধকারে নিমজ্জিত হল চেতনা, মাথাটা ঘুরে গেল মুহূর্তের জন্যে।

তারপর চোখ খুলল ড. এক্স। দেখল হেঁট হয়ে তাকিয়ে আছে নিজের দিকে, ড. এক্সের আত্মস্থ বামন-মূর্তির দিকে।

নিজের গালে, গায়ে, বুকে হাত বুলিয়ে শিউরে উঠল ড. এক্স। বাইরেটা তার মিস ডিমির মতো— নারীদেহ।

ঝকঝকে দাঁত বার করে ভয়ানক হাসি হেসে কোটের পকেট থেকে রিভলভার বার করে মিস ডিমির দেহ লক্ষ্য করে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলিবর্ষণ করল ড. এক্স, একবার...দু'বার...তিনবার!

১১. শেষ দেহবদল

পাতাল কুঠরির লিফট নিয়ে আরও পাতালে নেমে গেল ড. এক্সের কলেবর।

আপনা থেকেই থেমে গেল লিফট। খুলে গেল দরজা। সামনে আলোকিত করিডর। দু'পাশে সারি সারি আলোকোজ্জ্বল ঘর।

ধীর চরণে করিডর বেয়ে এগিয়ে গেল ড. এক্সের কলেবর। অত্যাধুনিক সরঞ্জাম বোঝাই ল্যাবরেটরির পর ল্যাবরেটরি পেরিয়ে এসে দাঁড়াল লোহার গরাদ দেওয়া পাশাপাশি দু'টো ঘরের মধ্যে।

ঘরে আলো জ্বলছে। প্রথম ঘরের ভেতর টেবিলের সামনে হেঁট হয়ে বসে একজন প্রৌঢ়। পদশব্দে শীর্ণ মুখ তুলে তাকিয়ে ছুঁয়ে এল গরাদ দেওয়া দরজার সামনে। কান্না-জড়ানো স্বরে বলল, 'ছেড়ে দিন! দোহাই আপনার, ছেলেটা আমাকে ছাড়া ঘুমোতে পারে না! ওর কেউ নেই, আত্মীয়স্বজন কাউকে আর বিশ্বাস করি না, পায়ে পড়ি আপনার, ছেড়ে দিন!'

হরিবিনয় মজুমদার! একদৃষ্টে চেয়ে রইল ড. এক্সের শ্বেতচক্ষু।

হরিবিনয় বিস্মিত হল সাদা চোখের চাহনি দেখে। এতদিন তো এমনভাবে তাকায়নি বিকট বামনটা! সে চোখে ছিল নারকীয় উল্লাস, পৈশাচিক আনন্দ, নির্মম তৃপ্তি।

অকস্মাৎ কেন মমতামাখানো চোখে চেয়ে আছে পিশাচ-শিরোমণি ড. এক্স? কেন তার সাদা চোখের তারায় তারায় এমন বিচিত্র সহানুভূতির ব্যঞ্জনা?

গরাদের সামনে থেকে সরে গেল ড. এক্স। কানে ভেসে এল পাশের ঘরের গরাদ দেওয়া দরজার তালা খোলার শব্দ।

আধঘণ্টা পর সিধে হয়ে হনহন করে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ড. রামা।

আশ্চর্য! অথচ ঘণ্টাখানেক আগেও ড. এক্স বলে গেছিল, ড. রামা আর বাঁচবেন না। আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর মৃত্যু ঘটলেই হরিবিনয়কেও মরতে হবে। কোনও উপায় নেই।

অথচ ড. রামা দিব্বি সুস্থ মানুষের মতোই হেঁটে বেরিয়ে গেলেন সামনে দিয়ে। সৌম্য, শান্ত মুখে বারেক তাকিয়ে গেলেন হরিবিনয়ের পানে, চাহনির মধ্যে ঝরে পড়ল অভয় আর আশ্বাস।

কিন্তু একটি কথাও বললেন না।

কেন?

১২. শেষ

রবি এসে হোঁক হোঁক করে টেনে তুলল আমাকে ঘুম থেকে। সেই রবি, প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের লেখাপড়া জানা শিম্পাঞ্জি।

গলায় ঝোলানো পেনসিল নিয়ে প্যাডে লিখল, ‘জবর খবর, চট করে এসো। প্রফেসর তুরুক নাচ নাচছেন।’

ছুটতে ছুটতে গেলাম প্রফেসরের বাড়ি। উনি ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখেই একটা খাম এগিয়ে দিলেন। হাতে নিয়ে দেখলাম বেশ ভারী খাম। ভেতরে কয়েক তা কাগজে লেখা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পর মিস ডিমির জীবনে যা ঘটেছিল, রোমাঞ্চকর সেই কাহিনি, যে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এই উপাখ্যানের নবম, দশম এবং একাদশ পরিচ্ছেদে।

তার তলায় একটা ছোট্ট চিঠি। লেখা হয়েছে প্রফেসরকে।

প্রিয় প্রফেসর নাটবল্টু চক্র,

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আমার মুণ্ডপাত করতে করতে যখনই ছুটে এসেছিলেন, সেই মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেলেছিলাম আমি। আমাকে আর আপনি ধরতে পারবেন না। আমি সব ধরার বাইরে চলে যাচ্ছি।

কলেবর বদল হিন্দু পুরাণে নতুন কিছু নয়, এ যুগেও এ ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। কলেবর ত্যাগ করে এদিক-ওদিক ঘুরে ফের নিজের কলেবরে ফিরে এসেছিলেন থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কৃষ্ণমূর্তি। দৃষ্টান্ত আছে ভূরি ভূরি, অজ্ঞজন হলে দিতাম, আপনি বিজ্ঞ বলেই বিরত রইলাম।

হ্যাঁ, আমিই আমার দেহকে হত্যা করেছি, সে দেহের খাঁচায় বন্দি করেছিলাম এ যুগের দুর্বৃত্তসম্রাট, বিকৃত-বিজ্ঞানী ড. এক্সকে।

ড. এক্সের কলেবর গ্রহণ করে ড. রামার ঘরে গিয়ে যখন দেখলাম তিনি মুমূর্ষু— মানসিক অত্যাচারে আয়ু নিঃশেষিত, তখন তাঁর কলেবর আমি গ্রহণ করলাম, ড. এক্সের কলেবরে তাঁকে এনে ফেললাম।

কারণ ছিল। প্রথমত, মিস ডিমি আর ড. এক্সকে পুলিশ জেলে পুরবেই আপনি সব কাহিনি ব্যক্ত করলে, আইনের চোখে কলেবর বদল গ্রাহ্য হয় না, উদ্ভট কাহিনিকে পাত্তা দেওয়া হয় না, উন্মত্তের প্রলাপ বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সুতরাং এই দুটি কলেবরই আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। তা ছাড়া সুন্দরীদের পেছনে সংসারের সব শয়তান ঘোরে, আমি সেই দেহ চাই না।

ড. রামার কলেবর নেওয়ার দ্বিতীয় কারণটা আগেই বলেছি। উনি মরতে চলেছিলেন। ড. এক্স তা গোপন করেছিল আমার কাছে পাছে রেগে যাই বলে। যখন দেখলাম কলেবরটা শূন্য হতে চলেছে, আমি তা গ্রহণ করলাম। ড. এক্সের কলেবরে প্রবেশ করার পরেই উনি দেহত্যাগ করেন।

কেমিক্যাল এক্সের গোপন ফর্মুলা অবশ্য আমাকে জানিয়ে গেছেন। অতিমগজ বানাতে গিয়ে যে প্রকৃতই অতিমানুষ বানিয়ে ফেলেছেন, মৃত্যুর আগে উনি তা জেনে গেছেন। শান্তিতে চোখ বুজেছেন।

সব নিয়ে আমি চললাম হিমালয়ে। জন্মেছিলাম ভারতবর্ষের মেয়ের গর্ভে। ভারতের ধূলিকণা তাই আমার কাছে পবিত্র। যে পরম সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে লীন হওয়ার সাধনায় মহামানুষেরা চিরকাল হিমালয়ে সাধন করে গেছেন, আমি চললাম সেই হিমালয়ে স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি করতে।

মিস ডিমি আর ড. এক্সের প্রাণহীন দেহপিঞ্জর যেখানে পড়ে, সেই পাতাল-বিবরের ঠিকানা অপর পৃষ্ঠায় দিলাম। মার্শাল কনওয়ের ব্রেন সেইখানেই পাবেন। আর পাবেন হরিবিনয় মজুমদারকে। বিদায়।—

আপনার মিস ডিমি।
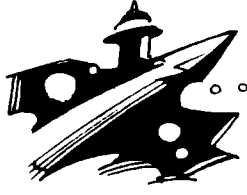
পুষ্পক রথের দেশে

তারা এসেছিল, তারা আসছে, তারা আসবে......

কাহিনিটা লিখব কিনা, এই নিয়ে বড় দোটানায় পড়েছি। বলাবাহুল্য এ কাহিনিও প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের। তাঁর সব কাহিনির মতো এ কাহিনিও শুধু উদ্ভট, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব হলে ল্যাটা চুকে যেত। কিন্তু ঠিক এ ধরনের ভয়ংকর সম্ভাবনাময় রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে এর আগে কখনও আমি জড়িয়ে পড়িনি। ক'দিন ধরেই ভাবছি, লিখে ভুল করব না তো?

শেষমেশ মনকে বুঝিয়েছি, যা ঘটতে চলেছে, এবং যা ঘটবেই, তা রোধ করার ক্ষমতা পৃথিবীর মানুষের নেই। সুতরাং আগে-ভাগে তা জেনে রাখলে ক্ষতি কী? হয়তো উৎকণ্ঠা বাড়বে, উদ্বেগে ঘুম হবে না, আতঙ্কে আঁতকে উঠতে হবে দূর আকাশে ঈষৎ ছায়া দেখলেও। তবুও জেনে রাখা ভাল, তারা এসেছিল, তারা আসছে, তারা আসবে...

গত শীতে শুরু আশ্চর্য এই উপাখ্যানের। 'কাঁকড়া কারখানার দ্বীপে' সেই অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টটা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার পর থেকেই প্রফেসর গুম হয়ে গিয়েছিলেন। সারা পৃথিবীতে তিনি ম্যাড সায়েন্টিস্ট নামে বিখ্যাত। আমি কিন্তু তাঁকে কখনও পাগলা বৈজ্ঞানিক বলে মনে করতাম না। যদিও তাঁর দাঁত ফোকলা, গাল তোবড়ানো, চেহারা হ্যাংলা, তবুও আমি জানতাম পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই তাঁর মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের সবটুকুই ব্যবহার করতে শিখেছেন, মস্তিষ্কের মধ্যে সুপ্ত অনন্ত শক্তির আধার উন্মোচন করতে পেরেছেন। অন্যে যা আজও পারেনি, দশভাগের মাত্র একভাগ ধূসর পদার্থকে কাজে লাগিয়েই ভেবেছে কী না কী হলাম।

এ হেন প্রফেসরই যখন নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিনরাত ছাদে বসে থাকতে আরম্ভ করলেন, তখন আমার একটু ভাবনা হল বই কী। 'কাঁকড়া কারখানা'র পরই 'লুপ্ত দেশের গুপ্ত রহস্য' নিয়েও তিনি একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। মাধ্যাকর্ষণকে কচু দেখানোর সেই আশ্চর্য আবিষ্কার যখন সবেগে ধাবিত হল চন্দ্র অভিমুখে, তখন থেকেই উনি কীরকম হয়ে গেলেন। কাহিনিটা মনে আছে তো? একটা পিরামিড থেকে উনি একটা ফলক উদ্ধার করেছিলেন। তাতে উৎকীর্ণ ছিল মাধ্যাকর্ষণকে বশে এনে শূন্যে ওড়ার কৌশল। উনি সেই মন্ত্রগুপ্তি অনুসারে একটা রোবট আর একটা মোটর গাড়ি বানিয়েছিলেন। হঠাৎ কিছু

দুর্বৃত্তের আক্রমণে মোটরসমেত রোবটটা অমূল্য সেই ফলক নিয়ে উড়ে গিয়েছিল চাঁদের দিকে।

রোবট-কাঁকড়াদের শোকও সহ্য করেছিলেন প্রফেসর, পারেননি রহস্যময় এই ফলক হারানোর ধাক্কা। দিবারাত্র ছাদে বসে চেয়ে থাকতেন আকাশের দিকে। দশ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে অন্বেষণ করতেন ওঁর হারিয়ে যাওয়া জগদ্দল মোটরটিকে। কিন্তু কোথায় মোটর? যে যায় সে আর ফিরে আসে না। মহাশূন্যের অনন্ত পথে পৃথিবীর চার চাকার গাড়ি এখনও হয়তো উড়ে চলেছে... চলেছে... চলেছে...

আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই প্রফেসরের মাথায় নতুন ভূত চাপল। আকাশচর্চার ভূত। বাড়িতে দূরবিন ছিল, কিন্তু রেডিয়ো দূরবিন ছিল না। তাই বলা নেই কওয়া নেই একদিন নিপাত্তা হয়ে গেলেন।

খামখেয়ালি প্রফেসরকে চিনতে আমার বাকি নেই। উদব্যস্ত না হয়ে বসে রইলাম চুপচাপ। তারপরেই এল বহু প্রতীক্ষিত চিঠিটা। কোত্থেকে চিঠি লিখছেন, আগে দেখলাম সেই জায়গাটার নাম। মাথা ঘুরে গেল দেখে। সামান্য একটা খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে মানুষ এতদূরেও যায়?

জায়গাটার নাম আপাতত গোপন রাখছি। প্রফেসর লিখছেন:

প্রিয় দীননাথ,

আমি এ চিঠি লিখছি পশ্চিম ভার্জিনিয়া থেকে। আমার সামনে পিডমোন্ট প্লেটোর তরঙ্গায়িত ভূমি দিগন্তে বিলীন হয়েছে... ধোঁয়াটে রেখার মতো ব্লু-রিজ পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছি আরও পশ্চিমে।

জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন। জনবসতি নেই। শুধু একটা গবেষণাগার— পাহাড়ের মাথায়। রেডিয়ো-দূরবিনটার সাইজ পঁচিশ ফুট। শুধু এই জন্যেই এসেছি দেশ ছেড়ে এত দূরে। কেন? বলব বলেই তো লিখছি এই চিঠি।

আমাদের এই রেডিয়ো টেলিস্কোপটি কিন্তু আকারে জড্রেল ব্যাঙ্কের রেডিয়ো দূরবিনের চাইতে কোনও অংশে কম নয়। প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টরের মুখ ঘোরানো রয়েছে প্লায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। গবেষণার নামে যেন গোয়েন্দাগিরি। চোখে দেখা যায় যেসব জিনিস, তা ধরা পড়বে রিফ্লেক্টরে। রেডিয়ো ওয়েভগুলো ঠিকরে গিয়ে ফোকাসড হবে অ্যান্টেনায়, রেডিয়ো সিগন্যাল রিসিভারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মুভিং কাগজের ফিতের উপর রেখাচিত্রর আকারে আঁকা হয়ে যাবে।

জানি না এখনও ওরা পাঠাচ্ছে কিনা সিগন্যাল। রেডিয়ো-স্টার থেকে আরম্ভ করে মহাশূন্যের গর্ভ হতে কত বার্তাই তো ভেসে আসছে। এতদিন কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। পৃথিবী ছাড়াও বুদ্ধিমান জীব আছে ছায়াপথে, ইলেকট্রনিক মেসেজ পাঠিয়ে চলেছে তারা যুগ যুগ ধরে। তারা বলছে আমরা আছি... আমরা আছি...কে কোথায় আছ...সাড়া দাও!

কেউ দেয়নি। কিন্তু আমি দেব। ওরা যে এসেছিল, এই ধরণীর ধূলায় পদচিহ্ন এঁকেই

শুধু বিদায় নেয়নি। আমরা চাঁদে গিয়ে শুধু হেঁটেই এসেছি, কিন্তু ওরা যা করেছে, কে তার হিসেব রাখে?

দীননাথ, আমি জানি এই মুহূর্তে তুমি কী ভাবছ। ভাবছ, বুড়োটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। শুধু তুমি কেন, সবাই তাই ভাববে। নতুন কোনও ধারণাকে গ্রহণ করতে না পারলেই টিটকিরি দেবে। যেমন দিয়েছিল অ্যালকেমিস্টদের স্বপ্নকে। অ্যালকেমি, মানে, পরাবিদ্যায় যারা গবেষক ছিলেন, তাঁরা বলতেন এক ধাতুকে আরেক ধাতুতে পরিবর্তন করা যায়। তাঁরা চেয়েছিলেন লোহা বা সিসে থেকে সোনা বা রুপো তৈরি করতে। সত্যি সত্যিই শেষ পর্যন্ত অ্যাটম-স্ম্যাশারের সাহায্য নিয়ে, অ্যাটম-বুলেট দিয়ে পারদকে সোনা বানিয়ে ছেড়েছিলেন ড. কেনেথ ব্রিনব্রিজ ১৯৪১ সালে। অসম্ভব তো সম্ভব হয়েছিল!

যাকগে, কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছি। আমি এখানে এসেছি তোমাকে লুকিয়ে, কারণ তুমি মেয়েছেলেরও বেহদ্দ। কথা গোপন রাখতে পারো না। কিন্তু এখন যা ঘটছে, তা আমিও আর পেটে ধরে রাখতে পারছি না।

অনেকদিন ধরেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, বাইরের জগৎ থেকে এ পৃথিবীতে বার্তা আসছে। অতি উন্নত কোনও গ্রহ থেকে কারা যেন ইলেকট্রনিক মেসেজ আর রেডিয়ো মেসেজ দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। হয়তো আসা-যাওয়াও করছে।

সন্দেহটা শেকড় গেড়ে মনের মধ্যে বসে গেল। 'লুপ্ত দেশের গুপ্ত রহস্য'র সেই চাঞ্চল্যকর ব্যর্থতার পর থেকেই। গবেষণা ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল তোমার জন্যেই। কিন্তু সেই ফলকটার কথা মনে আছে? অতি পুরাতন পিরামিডের গর্ভগৃহ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম ফলকটা। তাতে গুপ্তরহস্যটা লেখা ছিল কিউনিফর্ম হরফে।

কিউনিফর্ম আজকের হরফ নয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। প্রাচীন সুমেরীয়দের ভাষা!

তোমার জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় তো আমার জানা আছে। তাই অবগতির জন্যে জানাই, পাঁচহাজার বছর আগে ব্যাবিলনের দক্ষিণ দিকে মেসোপটেমিয়ায় গড়ে উঠেছিল সুমেরীয়দের বিস্তীর্ণ সভ্যতা। রহস্যময় এই জাতির ঠিকানা আজও রহস্যে ঢাকা। কিন্তু তাদের বৈজ্ঞানিক কীর্তি ভাবিয়ে তুলল আমাকে।

যেমন ধরো, পনেরো অঙ্কের বিরাট একটা অঙ্ক। ভাবতে পারো? এতবড় অঙ্ক কষতে গেলে যে কম্পিউটার রাখা দরকার। কিন্তু পাঁচহাজার বছর আগে গণকযন্ত্র কেউ কি কল্পনাতেও আনতে পেরেছিল? তা হলে?

এ অঙ্ক হল তা হলে এমন ব্যক্তিদের মাথা থেকে বেরিয়েছে যাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল, একথা মানতেই হবে। অথবা, তর্কের খাতিরে ধরে নিতে হবে গণকযন্ত্র তারাও বানিয়েছিল!

হাসছ? হাসো...এরপর যা বলব, ট্যারা হয়ে যাবে।

শুধু অঙ্ক কেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও নাকি বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ছিল সুমেরীয়দের!

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য? গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে হঠাৎ এত মাথাব্যথা হতে গেল কেন সুমেরীয়দের?

শুধু তাই নয়। প্রবাদ আছে, সুমেরীয়রা নাকি আকারে ছিল অসুরের মতো; বাঁচত

হাজার বছর এবং তাদের পুরাণ কাহিনির সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন পুরাণের।

তার মানে কি?

না, একই গল্প শুনছি পৃথিবীর আদিম মানুষদের মুখে।

কী সেই গল্প?

সে গল্প গ্রহান্তরের মানুষদের নিয়ে। তারা নাকি এসেছিল আকাশ থেকে। তারাদের রাজ্য থেকে নেমেছিল পৃথিবীর বুকে উড়ন্ত যন্ত্র চেপে।

কীরকম উড়ন্ত যন্ত্র?

রকেটের মতো। প্রচণ্ড গর্জন শোনা যেত উড়ুক্কু যানের আকাশ বিহারের সময়, আর দেখা যেত আগুনের ছটা!

আধুনিক রকেট বিমান নাকি?

সোজাসুজি সেকথা লেখা হয়নি। কোথাও না। রংচঙে উপকথার মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই গল্প শোনা যাবে পৃথিবীর সর্বত্র, আদি মানুষরা এসেছিল নাকি পৃথিবীর বাইরে থেকে।

এইখান থেকেই শুরু হল আসল রহস্য। তারা কারা? এসেছিল কোন নক্ষত্রলোক থেকে? কোন গ্রহ থেকে?

পাগলের মতো বই ঘাঁটতে লাগলাম। পুরনো পুথি পড়বার জন্যে সারা পৃথিবী চক্কর দিলাম। শেষ পর্যন্ত জবাবটা পেলাম প্রাক-ইন্‌কা ধর্মপুরাণে।

হ্যাঁ, তারা লিখেছে সেই প্রাচীন দেবতাদের ঠিকানা। মহাকাশে ওই যে প্লায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জ?...দেবতারা এসেছেন সেইখান থেকে।

প্লায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জ! শুনেই মাথা ঘুরে গেল নাকি? আকাশে চোখ তুলে কোনওদিন তাকিয়েছ? নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান নিয়ে মাথা ঘামিয়েছ?

ঘামিয়েও বিশেষ সুবিধে হবে না। বরং আমার ল্যাবরেটরিতে যাও। লাইব্রেরিতে ১৮৫০ সালে ছাপা একটা নক্ষত্রমণ্ডলীর ম্যাপ দেখতে পাবে। শিল্পী নক্ষত্রপুঞ্জগুলোকে এক-একরকম প্রাণী কল্পনা করেছেন। ষাঁড়ের যে ছবিটা, তার ঘাড়ের কাছে দেখতে পাবে খানকয়েক তারা,ওই হল Pleiades নক্ষত্রপুঞ্জ।

শুধু চোখে কিন্তু ছ'টার বেশি তারা দেখা যায় না। মোটামুটি ভাল একটা দূরবিন পেলে দেখতে পাবে তিনশোরও বেশি নক্ষত্র! কল্পনা করতে পারছ ব্যাপারটা? আমাদের সৌরলোকে শুধু একটা সূর্যই তার ছানাপোনা নিয়ে এত জায়গা জুড়ে আছে যে ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায় আমার। প্লায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জে রয়েছে এমনি তিনশোটিরও বেশি সূর্য!

এবং প্রতিটি সূর্যকে বেষ্টন করে ঘুরছে গ্রহ-উপগ্রহ!

দূরবিন চোখে লাগিয়ে তুমি আরও একটা জিনিস দেখতে পাবে। ঝকঝকে প্লায়াডিসকে ঘিরে কুয়াশার মতো নীহারিকা বস্তু ভাসছে মহাশূন্যে। কী আছে ওখানে, আজও কেউ জানে না।

নক্ষত্রপুঞ্জর তো অভাব নেই আকাশে। তা সত্ত্বেও শুধু প্লায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জকেই কেন কল্পনায় স্থান দিল প্রাক-ইন্‌কা ধর্মপুরাণ লেখকরা?

তবে কি তা নিছক কল্পনা নয়? সত্যিই কি দেবতাদের আবির্ভাব ঘটেছিল সুদূর ওই নক্ষত্রসহ কোনও এক অতি উন্নত দেশ থেকে?

দীননাথ, ভাবতে ভাবতে আমি সত্যিই যেন পাগল হয়ে গেলাম। এ কী রহস্য! নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে ডুবে রইলাম প্রাচীন পুথির মধ্যে। রাশি রাশি বই ঘেঁটে কী জানলাম জানো?

সুমেরিয়, আসিরীও, বেবিলনীয়, মিশরীয় ইত্যাদি সব সুপ্রাচীন শিলালিপিতেই উৎকীর্ণ রয়েছে একই কথা—

দেবতারা নাকি আসতেন মহাশূন্য থেকে!

বেশি বড় বড় রেফারেন্স টেনে তো লাভ নেই, মনে করবে বুড়ো দাঁতভাঙা নাম আউড়ে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতলব আছে। তিব্বতের এক মঠে ঢুকে কী পেলাম জানো?

দুটি অত্যন্ত প্রাচীন পুথি। তন্তুয় আর কন্তুয়।

দুটি পুথিতেই আছে প্রাগৈতিহাসিক উড়ুক্কু যন্ত্রের বর্ণনা!

কী? এবার বিশ্বাস হচ্ছে? তিব্বতের লামারা নিশ্চয় গাঁজার ভক্ত নয়। তন্তুয় এবং কন্তুয় দুটিই অত্যন্ত সিরিয়াস তত্ত্বের পুথি। তার মধ্যে যা লেখা আছে, তাও নিশ্চয় সিরিয়াসলি লেখা হয়েছে, গালগল্প নয়।

আরও একটা পুথির নাম করছি। এর জন্যে তিব্বতে যেতে হলেও পুথিটা লেখা সংস্কৃত ভাষায়। 'নাম সমরাঙ্গন সূত্রধারা'।

তাতে পেলাম আধুনিক রকেট প্লেন আর জেট প্লেনের বৃত্তান্ত!!!

দীননাথ, এইসব পড়বার পর আমি কাকে পাগল বলব বলতে পারো? নিজেকে? না, ওই পুথির লেখকদের? আধুনিক ব্যোমযানের বর্ণনা কি নিছক কল্পনা? না বাস্তবেই ছিল? সায়েন্স-ফিকশন এ যুগেই মানায় দীননাথ— কারণ এটা বিজ্ঞানের যুগ!

তা হলে উড়ুক্কু যন্ত্রের বর্ণনা নিশ্চয় সায়েন্স-ফিকশন নয়— খাঁটি সায়েন্স— তাই নয় কি?

ভাবতে ভাবতে পরপর আরও কতকগুলো সম্ভাবনা মাথার মধ্যে পাক দিতে লাগল। এই পৃথিবীতেই এমন অনেক বিস্ময় ছড়ানো রয়েছে, যার অতলান্ত রহস্য নিয়ে কোনওদিনই আমরা মাথা ঘামাইনি।

যেমন, পিরামিড রহস্য।

পিরামিড কি নিছক সমাধিমন্দির? না, নিশানা-চিহ্ন? অমন নিখুঁত তেকোনা সূচ্যগ্র কৃত্রিম পাহাড় আকাশের তারার মতো পরপর সাজিয়ে রাখার আসল রহস্য কি তা হলে আকাশ থেকে যাঁরা নামবেন, তাঁদের সুবিধের জন্যে? যেমন আধুনিক বিমানবন্দরে নিশানা থাকে রানওয়ের দুপাশে, পিরামিডগুলোও কি সে নিশানা-পর্বত? অত ভারী, মসৃণ, প্রকাণ্ড পাথরগুলোকে কে তুলল ওপরে? কোন যন্ত্র দিয়ে? মানুষের হাতে ওই পাথর অত উঁচুতে তোলা তো সম্ভব নয়।

সেই প্রথম সন্দেহের বীজ ফুটে অঙ্কুর দেখা দিল মাথার মধ্যে।

দেবতা কারা? গ্রহান্তরের ধীমান মানুষরা? ওঁরা দেবতা নন, অতিমানুষ, ভিনগ্রহের বাসিন্দা। তাঁদের অসামান্য বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপ দেখে শিউরে উঠেছে পৃথিবীর আদিমতম অধিবাসীরা, ভয়ে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় বলেছে, ওগো তোমরা মানুষ নও, দেবতা। আকাশের দেবতা!

পুষ্পক রথ? অগ্নিময় রকেটকে পুষ্পক রথ আখ্যা দেওয়া কি খুব অন্যায়?

ইন্দ্রের অস্ত্রের নাম নাকি বজ্র! ইন্দ্র তো আকাশের দেবতা। মৎস্যপুরাণে বলেছে, সহস্র কিরণযুক্ত সূর্যতেজ বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের শূল আর বজ্ররূপে পরিণত হয়েছিল। এই বজ্র কি তা হলে অসাধারণ কোনও আগ্নেয়াস্ত্র?

মহাদেব ব্রহ্মশির অস্ত্র দিয়েছিলেন অর্জুনকে, দ্রোণও এই অস্ত্র দিয়েছিলেন নিজের ছেলে অশ্বত্থামাকে, কিন্তু নিষেধ করেছিলেন নিতান্ত বিপন্ন হলেও যেন এই অস্ত্র প্রয়োগ করা না হয়। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভয় পেয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন অশ্বত্থামা, সঙ্গে সঙ্গে উদ্গত হল কালান্তক যমের মতো অগ্নি...

অ্যাটম বোমা নাকি?

ভাবতে ভাবতে কাহিল হয়ে পড়ল আমার অবস্থা। ব্লাডপ্রেসার তো বেড়ে গেলই, অবস্থাটা হল ঠিক পাগলের মতো। কুয়াশার মতো অস্পষ্ট ওই মহাসত্যর রহস্য যদি আমি ভেদ করতে পারি, দীননাথ, মানুষের ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত উলটে যাবে। কে ওই দেবতারা? গ্রহান্তরের জীবরা? তা হলে তো ভগবান বলে কিছুরই অস্তিত্ব আর থাকে না...

অথচ প্রমাণগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, আমি যা ভাবছি, তা পাগলের পাগলামি নয়। আদ্দিকালে ঘোড়ার ছবি দেখেছ? দেখতে অবিকল শেয়ালের মতো। খ্যাঁকশেয়ালের মতো পুঁচকে ঘোড়াগুলো লক্ষ লক্ষ বছর পরে এত বড় ঘোড়া হয়ে গিয়েছে।

কী করে তা সম্ভব হল? আমরা তো জানি, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সবকিছুই পর্বতপ্রমাণ ছিল, ছোট হতে হতে আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে (তিমি ছাড়া)।

কিন্তু ঘোড়ার ক্ষেত্রে এই উলটো ফল হল কেন?

আমি বলছি কেন? ক্রস-ব্রিড বলে একটা কথা বিজ্ঞানমহলে সবাই জানে। যেমন ঘোড়া আর গাধা থেকে অশ্বতর। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নিশ্চয় একদল বৈজ্ঞানিক এই ক্রস-ব্রিডের এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে আদ্দিকালের ঘোড়াকে নিয়ে। ক্রমে ক্রমে পাওয়া গিয়েছে আজকের ঘোড়া।

এমনি রহস্য আরও আছে দীননাথ। কত আর বলব। তুমি তো জানো মিসিং লিঙ্ক নিয়ে তাবড় বৈজ্ঞানিকরা এখনও অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন। ডারউইন বলেছেন বটে বাঁদর ধাপে ধাপে বিবর্তনের সিঁড়ি ভেঙে মানুষ হয়েছে। কিন্তু মাঝখানের একটা ধাপের রহস্য তিনি ভেদ করতে পারেননি, সেই ধাপে যে কী ঘটেছে, কী করে বানর সেই ধাপ পেরিয়ে নর শ্রেণিতে উন্নীত হল, তা আজও জানা যায়নি।

আমার কী মনে হয় জানো? উন্মাদ ভেবো না, দোহাই তোমার। গ্রহান্তরের অতি-ধীমান

জীবরা নিজেদের অতি-উন্নত মগজ বানরের মগজে স্থাপন করে আজকের মানুষ সৃষ্টি করেননি তো? এমনও তো হতে পারে, এই পৃথিবী তাঁদের ল্যাবরেটরি ছিল, জীবজন্তু-মানুষপাখি নিয়ে গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন সবুজ পৃথিবীকে?

তা হলে কি ধরে নেব, দূর নভোজগৎ থেকে সুদূর অতীতে অতিমানুষেরা এসেছিলেন এই পৃথিবীর লস্ট আটলান্টিস অঞ্চলে? সুমেরীয় অঞ্চলে? দক্ষিণ আমেরিকার গুয়াতেমালা আর যুকাটানের জঙ্গলে? পক্ষী মানবের দেশ, ঈস্টার দ্বীপে? আশ্চর্য কিছুই নয়। ফোটন রকেটও তো আলোর গতির সমান বেগে ছুটতে পারবে অদূর ভবিষ্যতে।

আজকের যা কিছু অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক, তার পেছনে কোথাও না কোথাও একটা সত্য আছে। নিশ্চয় কেউ বা কারা এসেছিল এই পৃথিবীতে, সঙ্গে এনেছিল অপূর্ব কারিগরি দক্ষতা। সুমেরীয় এলাকায় ৪০,০০০ বছর আগেও ছিল বেশ কয়েকটা আধা বর্বর জাতের বাস। হঠাৎ আবির্ভূত হল অতিমানুষ সুমেরীয়রা। কোত্থেকে এল তারা? সারা পৃথিবীতে অব্যাখ্যাত বিস্তর রহস্যপুঞ্জ কি তারাই সৃষ্টি করে গিয়েছে? সেইজন্যেই কি মিশরে আর ইরাকে পাওয়া গিয়েছে অতি আধুনিক স্ফটিক-কাটা লেন্স? বাগদাদে ইলেকট্রিক ড্রাই ব্যাটারি? দিল্লিতে ফসফরাস আর গন্ধকবিহীন অশোকস্তম্ভ? নেভাদা ডেথ ভ্যালিতে আর গোবি মরুভূমির খারাখোটায় অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের নিদর্শন?

দীননাথ, আমি জানি, এত তত্ত্ব পড়তে তোমার ভাল লাগছে না। কথার কচকচি মাথায় ঢোকাতে না পারলেও শুধু একটা রহস্য নিয়ে তোমাকে ভাবতে বলব! রাজস্থানের মরুভূমিতে আমরা অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছি। দশ কোটি ডিগ্রি উত্তাপে সেখানকার বালি স্ফটিকে পরিণত হয়েছে। ঠিক একই ঘটনা দেখা গিয়েছে নেভাদার ডেথ ভ্যালিতে। একটা প্রাগৈতিহাসিক শহর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেন গুঁড়িয়ে গিয়েছে, দারুণ উত্তাপে বালি স্ফটিক হয়ে গিয়েছে, পাথর গলে গিয়েছে। অ্যাটম বোমা নাকি? কিন্তু কে তার উদ্ভাবক?

মহাভারতের প্রাচীন অস্ত্রগুলোর কথা ভুলো না। সে যুগের ব্রহ্মশির অস্ত্র আর আগ্নেয়াস্ত্র আজকের অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা, তখনকার 'মুশাল' আজকের মিশাইল—ক্ষেপণাস্ত্র। পুষ্পকরথ যে কী জিনিস, তা তোমার মতো মাথামোটাকেও নিশ্চয় বোঝাতে হবে না। সবই কি মিথ্যে? সবই অলীক? কিন্তু প্রমাণগুলো তো অবাস্তব নয়। তা ছাড়া, একই কল্পনা, একই কাহিনি, একই বর্ণনা দেশ-বিদেশের প্রাচীন ধর্মপুরাণে লেখা থাকে কেন?

এইসব ভেবেই চোখ ফেরালাম দূর আকাশের দিকে। নিশ্চয় আকাশ থেকে কেউ এসেছিল। অজ্ঞান অসভ্য মানুষকে শিখিয়ে পড়িয়ে উন্নত করেছিল। দেখি তাদের নিশানা পাই কিনা।

বহির্বিশ্বের সেই অজানা বুদ্ধিমান জীবদের কাছ থেকে সংকেতধ্বনি ধরবার আশায় রেডিয়ো-দূরবিন চালিয়ে বসে রইলাম আমি আর কুইস্বী, নাসা-কেন্দ্রের এক্সোবায়োলজিস্ট।

কুইম্বী শেষকালে বিরক্ত হয়েই বিদায় নিলে। ১৫০ ঘণ্টা একটানা নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করার পর ওর আর ধৈর্য ছিল না।

কিন্তু আমার ছিল। আমাকে চেনো তো দীননাথ। বুড়ো বয়সেও অসীম জেদ আমার। তাই যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে রইলাম একাই।

তারপরেই এল সেই সংকেত। দীননাথ, দীননাথ, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হল এতদিনে।

এর বেশি জানতে চেয়ো না। হাতে আর সময়ও নেই! সে বসে আছে। আমি চললাম। মাঝে মাঝে আমার চিঠি পাবে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র

পুনশ্চ: প্রতিবারে তোমার কৌতূহল আমাকে বিপদে ফেলেছে। এবারে সে গুড়ে বালি। আমার টিকিও ধরতে পারবে না। গোয়েন্দা লাগালেও পারবে না। গোয়েন্দাদের বাবারাও এলে বার করতে পারবে না আমার পথের হদিশ।

মিছে সময় নষ্ট না করে বরং একটু পড়াশুনো করো। ১৯০৮ সালের ৩০ জুন সাইবেরিয়ার তাইগাতে একটা রহস্যজনক উল্কা ফেটে পড়েছিল। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড অনেক দূর থেকে দেখা গিয়েছিল। ৫৫০ মাইল দূর থেকেও ভূমিকম্পের ধাক্কায় ভূকম্পলিখের কাঁটা কেঁপেছিল একঘণ্টা ধরে। ১৯২৭ সালে একটা বৈজ্ঞানিক অভিযান যায় সেখানে। গিয়ে দেখেছিল বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে সাঁইত্রিশ মাইল দূরেও গাছগুলো একেবারে নেড়া। জমি বন্ধ্যা। গাছ তো নয়, যেন চাঁচাছোলা টেলিগ্রাফ পোস্ট। মজবুত গাছের মগডালগুলোকেও কে যেন উলটোদিকে মট করে ভেঙে দিয়েছে। আরও কাছে প্রকাণ্ড বিস্ফোরণের অনেক চিহ্ন এবং তেজস্ক্রিয়তার স্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬১ আর ১৯৬৩ সালে অভিযাত্রীরা নতুন করে হানা দিলে সেখানে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি দিয়ে মেপে-জুপে তারা বললে, বিস্ফোরণটা পারমাণবিক— উল্কাপাতের দরুন নয়!

১৯০৮ সালে পারমাণবিক বিস্ফোরণ? দীননাথ, বলো দিকি এ কী রহস্য! রহস্যের চাবিকাঠি পকেটে নিয়েই বেরোচ্ছি বিশ্বপর্যটনে।

প্রফেসরের চিঠি ওইখানেই শেষ। চিঠি পড়ে মাথা ঠান্ডা হওয়া দূরে থাকুক, আরও গরম হয়ে গেল।

আমারও গোঁ কম নয়। প্রফেসরের টিকির সন্ধান না পাই, তাঁর মতো কর্মবীর নিশ্চয় হাওয়ায় ভেসে থাকবেন না। কেউ না কেউ দেখতে পাবেই। খবরের কাগজে খবর বেরোবে। আমি নজর রাখলাম কাগজের পাতায়।

যে-খবরটা বেরোল দু'দিন পরে সব কাগজেই, তা পিলে চমকানো হলেও প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। মেক্সিকো সিটি থেকে তিরিশ মাইল দূরে টিওটিহুআকানের পিরামিডের ধারে নাকি অদ্ভুত একটা গর্ত দেখা গেছে। গর্তটার ব্যাস ১৫ ফুট। কিনারা দু' ফুট গভীর। কতকগুলো চার ইঞ্চি গভীর খাল

বেরিয়ে গেছে কিনারা থেকে। ঠিক যেন একটা ভারী বস্তু চেপে বসেছিল নরম মাটিতে। গভীর গর্তটায় কিছু হলদে বেগুনি গুঁড়োও পাওয়া গেছে।

সবচাইতে আশ্চর্য, একটা লাল আলোর গোলাকে ভাসতে ভাসতে জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখা গেছে আগের রাত্রে। এক ভদ্রমহিলা মোটর হাঁকিয়ে আসছিলেন। লাল আলোর বলটা তাড়া করেছিল তাঁকে দশ মাইল পর্যন্ত। তারপর মিলিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে।

সংবাদদাতাদের ঘোর সন্দেহ উড়ন চাকতি আবার দেখা দিয়েছে। অনেক বছর ধরেই দেশে-বিদেশে রহস্যজনক অজানা উড়ন্ত বস্তু উড়ে এসেছে, ধরা না দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু টিওটিহুআকানের পিরামিডের পাশে গোলাকার দাগটা কীসের? উড়ন চাকতির পায়া-র দাগ নয় তো?

ফের উড়ন চাকতি! চনমনে খবরে প্রফেসরের কথা মন থেকে সরে গেল। কিন্তু পুরোপুরি নয়। কেননা প্রফেসরের চিঠিটা পেলাম তারপরেই। কোত্থেকে? উড়ন চাকতিকে যেখানে দেখা গেছে, সেই টিওটিহুআকান থেকে।

প্রফেসর লিখেছেন:

টিওটিহুআকান, মেক্সিকো

প্রিয় দীননাথ,

আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল মায়াদের অন্তর্লেখ মন্দির দেখে। বেশি কথা বলব না। যা দেখেছি তা যথেষ্ট। শুধু একটা প্রমাণ দিচ্ছি। অন্তর্লেখ মন্দিরের পাঁচিলে একটা ছবি খোদাই করা আছে। ছবিটার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে রকেটের ভেতর আধুনিক নভশ্চরের।

সবচেয়ে বেশি রহস্য লুকিয়ে আছে এই টিওটিহুআকান শহরে। এখানকার পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা বিস্তর মূর্তির আঙুলের সংখ্যা মাত্র চারটে। এখানকার কিংবদন্তিও বলছে, আকাশ থেকে সোনার রথ নেমে এসেছিল। তাতে ছিল একজন মেয়ে। তার দু' হাতে চারটে করে আঙুল, তাও হাঁসের পায়ের মতো জোড়া।

'সে' আমার সঙ্গেই আছে। তার দৌলতেই আমি আমার এতদিনের কৌতূহল মিটিয়ে নিচ্ছি। আমার ছানাবড়া চক্ষু দেখে মুচকি মুচকি হাসছে। কিছু বলছে না। ভারী দুষ্টু! মেয়েটাকে ওভাবে তাড়া না করলেই পারত!

চললাম।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র

কে 'সে?' এ কার সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন প্রফেসর? চার আঙুলে মূর্তি দেখে কেন সে অবাক হয় না? কেন হাসে? উড়ন চাকতিকেই বা ওখানে দেখা যাচ্ছে কেন? কোন মেয়েটাকে 'সে' তাড়া করেছিল? উড়ন চাকতির তাড়া খাওয়া মেয়েটা নয় তো?

ভাবতে ভাবতে একটা ভীষণ সন্দেহ এসে মাথার চুলগুলো খাড়া করে দিল আমার।

এরপর কিছুদিন অন্তর অন্তর চিঠি আসতে লাগল প্রফেসরের। কখনও রয়েছেন তুর্কিস্তানে। পীরি রইসের সেই ম্যাপখানা তিনি দেখেছেন। উপগ্রহ থেকে তোলা কায়রোর ফোটোগ্রাফের সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে সেই ম্যাপের। কিন্তু পীরি রইসের পূর্বপুরুষেরা আকাশে উড়তে জানতেন নাকি?

নাজকা থেকে লিখলেন, ৩৭ মাইল জায়গা জুড়ে চ্যাটালো জমির ওপর অদ্ভুত জ্যামিতিক রেখাঙ্কন দেখে মনে হচ্ছে, অবিকল আধুনিক বিমানঘাঁটি। স্মরণাতীত কালে কারা যেন নভশ্চরদের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল এখানে।

পিস্কো উপসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে লিখলেন, ৮২০ ফুট দীর্ঘ বিরাট চিহ্নটা পাহাড়ের গায়ে কে খোদাই করলে বলো তো? ঠিক যেন দেখিয়ে দিচ্ছে নীচের সমতলভূমি।

ঈস্টার দ্বীপ থেকে লিখলেন, দীননাথ, বিশাল বিশাল মূর্তি ছড়ানো দ্বীপে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর, নিঃসঙ্গ এই দ্বীপের একটা নিজস্ব লিপি আছে, আজও তা অপঠিত। 'সে' কিন্তু ফের মুচকি মুচকি হাসছে আমার কাণ্ড দেখে।

উজবেকিস্তান থেকে লিখছেন, অদ্ভুত একটা ছবি দেখলাম এখানে। অতি প্রাচীন ছবি। কিন্তু আধুনিক নভশ্চরের সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

দিল্লি থেকে লিখছেন, কুতুবমিনারের সামনে অশোকস্তম্ভ খুব ভাল করে দেখলাম। আশ্চর্য! এতটুকু মরচে কোথাও নেই। বয়স কত লোহার থামটার? কোন কারখানায় তৈরি হয়েছিল বিস্ময়কর এই স্তম্ভ? 'সে' এখনও হাসছে।

প্রতি চিঠি পড়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল আমার। কেননা সব চিঠিতেই উনি 'সে' নামক এক অজ্ঞাত ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একবারও বলেননি লোকটা কে। 'সে' যেই হোক না, পৃথিবীর বিস্ময় নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথাই নেই।

মাথাব্যথা শুধু আমার। কেননা, প্রফেসর যেখান থেকে 'সে' নামক এই কুলাঙ্গারটিকে নিয়ে চিঠি লিখেছেন, ঠিক সেইদিনই সেই জায়গায় গভীর রাতে দেখা গিয়েছে একটা উড়ন্ত, ভাসন্ত জ্বলন্ত লালগোলা। সেই উড়ন চাকতি। নিঃশব্দে জমি স্পর্শ করেছে। নিঃশব্দে আকাশে উধাও হয়েছে। পরদিন সকালে পাওয়া গেছে পনেরো ফুট ব্যাসের একটা ভারী বস্তুর গভীর ছাপ, কিনারায় চার ইঞ্চি খাল। গর্তের মধ্যে হলদে বেগনি গুঁড়ো, যা নিয়ে আজও রসায়নবিদরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, স্বরূপ ধরতে পারছে না।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথার চুল পেকে যাওয়ার উপক্রম হল। বেশ বুঝলাম, অজানা উড়ন চাকতি, 'সে' আর প্রফেসরের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সম্পর্কটা আদতে যে কী, কিছুতেই তা ভেবে পেলাম না।

জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল বারো ফেব্রুয়ারি। প্রফেসরের শেষ চিঠি পেলাম। কোত্থেকে লিখছেন, তা লেখেননি। শুধু লিখেছেন, তেরো ফেব্রুয়ারি রাত ঠিক দশটার সময়ে বেহালা সিভিল এয়ারপোর্টে হাজির থাকবে। 'সে' রাজি হয়েছে তোমাকে সঙ্গে নিতে। তবে একটা শর্ত। দশটা থেকে দশটা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত তুমি চোখে ফেটি বেঁধে থাকবে, নইলে ভয় পেতে পারো। শুধু একটা টর্চ জ্বালিয়ে কাছে রেখে দেবে।

খবরদার। কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবে।

বেহালা সিভিল এয়ারপোর্টে দু'মাস আগেও গিয়েছিলাম এরো-মডেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের খেলনা বিমানের প্রতিযোগিতা দেখতে। তারাতলা রোডের পোল থেকে নেমেই বাঁহাতের সরু রাস্তা দিয়ে ঢুকতে হয়। বাজার পেরিয়ে সিধে গিয়ে ডাইনে মোড় নিয়ে খানিকটা গেলেই ফাঁকা মাঠে ঘেঁস ফেলে রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে। বেশ সমতল জায়গা। অনেক দূরে দূরে গাছপালা, গ্রাম।

জায়গাটা দিনের বেলাতেও নির্জন। রাত্রে তো কথাই নেই। গা ছমছম করতে লাগল আমার। কিন্তু প্রফেসর জায়গাটা বেছেছেন ভাল। কীটপতঙ্গ ছাড়া কেউই জানতে পারবে না তাঁর নৈশ অভিযানের বৃত্তান্ত। অথচ শহরের এত কাছে। শুধু বুঝতে পারলাম না এত জায়গা থাকতে তিনি এয়ারপোর্টকে বেছে নিলেন কেন।

নিঝুম বিমানক্ষেত্রে পৌঁছলাম রাত সাড়ে ন'টায়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে তারার আলোটুকুই ভরসা। আমি কিন্তু ঠায় চেয়ে রইলাম তারাদের রাজ্যের দিকে। কেন, সে যুক্তি দিতে পারব না। থেকে থেকে কেবল কেঁপে উঠতে লাগলাম হি হি করে। কাঁপুনিটা যে শীতের জন্যে নয়। তা না বললেও চলে।

রাত দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ঈশান কোণে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম চোখের কোণ দিয়ে। চোখ ফেরাতেই আবিষ্কার করলাম চাঞ্চল্যের কারণ। একটা নক্ষত্র কাঁপছে। দুলছে, নড়ছে...না, না, এগিয়ে আসছে...অতি দ্রুত এগোচ্ছে... স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে লাল রঙটা।...

লাল চুমকিটা আরও কাছে এগিয়ে আসতেই বুঝলাম ভীষণ গতিবেগে কি একটা এগিয়ে আসছে আমার পানে। আকাশের অত উঁচু থেকে বিমানক্ষেত্রের ঠিক ওপরেই পৌঁছল লাল বর্তুলটা। দু' মিনিটও লাগল না পৌঁছতে। নক্ষত্রবেগ একেই বলে।

তারপরেই যেন তারা খসে পড়ল মাথার ওপর। লাল তারা, অত্যুজ্জ্বল লোহিত দীপ্তিতে আগুন-রাঙা হয়ে উঠল কালো ঘেঁষ ঢাকা রানওয়ে। সুবিশাল একটা বস্তু নিঃশব্দে এসে পড়ল মাথার ঠিক ওপরে। সভয়ে চোখ বুজলাম আমি। ফেটিটা টেনে নামিয়ে দিলাম চোখের ওপর।

চোখ বন্ধ। সর্বাঙ্গে কাঁটা। কানে ভেসে এল একটা মৃদু থপ শব্দ। যেন একটা গুরুভার বস্তু মাটি স্পর্শ করেছে এইমাত্র।

পরপর আরও কতকগুলো দুর্বোধ্য শব্দ শুনতে পেলাম। ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির ঠনঠন শব্দ, ঘেঁষের ওপর জুতোর শব্দ। তারপরেই হাত পড়ল কাঁধের ওপর।

নরম কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'এসো, দীননাথ।'

চোখ খুললাম না। খুলতে সাহস পেলাম না। কৌতূহল মরে গেল মনের মধ্যেই। প্রফেসর হাত ধরে নিয়ে এলেন আমায়। যেন একটা লিফটের মধ্যে উঠে দাঁড়ালাম। খুট করে দরজা বন্ধ হল। মেঝে উঠে এল ওপরদিকে। খুট করে দরজা খুলে গেল। প্রফেসরের হাত ধরে এসে দাঁড়ালাম একটা অত্যন্ত নরম মেঝের ওপর।

খুটখাট ঠং ঠং শব্দ শুনলাম সেকেন্ড কয়েক। তারপর আচমকা মেঝে দুলে উঠল পায়ের তলায়। সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা প্রচণ্ড চাপ অনুভব করলাম। যেন বাতাসের চাপে থেঁতো হয়ে যাচ্ছি আমি। এ চাপ কীসের তা জানি। প্লেন পাইলটটাও জানে।

বিষম আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'প্রফেসর! প্রফেসর!! আমরা কি পৃথিবী ছাড়িয়ে যাচ্ছি?'

'না', স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন বললে, 'পৃথিবীর আরেক দিকে যাচ্ছি।'

বক্তা কাঁধে হাত রাখল। একটানে চোখের বাঁধন খুলে দিলে। ঝলমলে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও অসহ্য লাগল না। চোখ পিটপিট করলাম, কিন্তু চোখ বন্ধ করলাম না, করতে পারলামও না। চেয়ে রইলাম শান্ত সুন্দর কিন্তু হীরক উজ্জ্বল একজোড়া নয়নমণির দিকে।

মণি ছাড়া সে নয়নকে আর কিছু বলা যায় না। এত সুন্দর এত প্রদীপ্ত এত ভাস্বর এত তেজোময় চোখ আমি কখনও দেখিনি। মানুষটার বয়স বেশি নয়। আমার সমবয়েসি। কষ্টিপাথরের মতো কালো রং। কিন্তু চুলগুলো অ্যালুমিনিয়াম-শুভ্র। নাক-মুখ হাড়ের গঠন পরিপাটি। দু' হাতে সাদা দস্তানা। অদ্ভুত দস্তানা।

পাঁচ আঙুলের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ঘর নেই। শুধু দুটি ঘর। একটিতে বুড়ো আঙুল। বাকি আঙুল কটির জন্যে আর একটি ঘর।

আমার চাহনি অনুসরণ করেই তার হীরক চক্ষুতে কৌতুক ভেসে গেল। হাত নামিয়ে নিয়ে বললে, 'হাতের আঙুলগুলো জখম হয়েছে ধরে নাও বন্ধু। তাই এই দস্তানা।'

বন্ধু! বন্ধু ডাকের মধ্যে এত মিষ্টতা আছে জানতাম না। শুধু মিষ্টতা নয়, সম্মোহন আছে। আমি যেন জাদুতে ভুলে গেলাম। বুঝলাম, প্রফেসরের 'সে' এখন আমারই সামনে দাঁড়িয়ে।

বুঝিয়ে বলার আর দরকার আছে কী? আমি উড়ে চলেছি উড়ন চাকতির মধ্যে। বহু বিতর্কিত অ-উ-ব অর্থাৎ অজানা উড়ন্ত বস্তুদের একটির উদরদেশে স্থান নিয়েছি আমি প্রফেসর এবং সে। এতবড় আকাশযানকে চালনা করছে 'সে' একা। আর কেউ নেই। কেবিন বলতে এইটাই। একদিকে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। আরেকদিকে অদ্ভুত দর্শন চেয়ার-বিছানা! শোয়া যায়, ঘুমোনোও যায়। আধুনিক কল পায়খানাও আছে একদিকে।

তারাদের খুব কাছে দেখছি মনে হচ্ছে। মাথার ওপর ছাদ। এতক্ষণ অস্বচ্ছ ছিল। আমি ভাবছিলাম, আহারে, যদি আকাশটাও দেখতে পেতাম।

'সে' একটু হাসল। অথচ আমি মুখে কিছু বলিনি। মৃদু হেসে গভীর চোখে আমার পানে তাকিয়ে একটা বোতাম স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে 'বু-উ-উ' করে একটা আওয়াজ হল। স্বচ্ছ হয়ে গেল মাথার চাঁদোয়া। আকাশগঙ্গাকে এত কাছ থেকে এভাবে কখনও দেখবার সৌভাগ্য হবে ভাবতেও পারিনি।

কিন্তু অবাক হতে গিয়েও পারলাম না। তার চেয়েও বড় বিস্ময় যে তখন মাথার মধ্যে

টাইফুন তুলেছে। 'সে' কি টেলিপ্যাথিও জানে? ১৯৫৯ সালের 'নটিলাস' পরীক্ষায় অবশ্য দেখা গেছে মানবমস্তিষ্কের যোগাযোগ করবার শক্তি রেডিয়ো তরঙ্গের শক্তির চেয়েও অনেক জোরালো। দিব্যদৃষ্টি বা টেলিপ্যাথি আর অলৌকিক কিছু নয়। 'সে' কি সেই বিদ্যায় বিদ্বান?

বড় ধাঁধায় পড়লাম আমি।

বেশিক্ষণ ধাঁধা রহস্য নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাতে হল না। অকস্মাৎ বড় ঘুম পেল। রাত হলে ঘুম পায় ঠিকই। কিন্তু এ ঘুম সে ঘুম নয়। চোখ যেন জুড়ে এল। শেষ মুহূর্তেও দেখলাম, প্রফেসর নাক ডাকাচ্ছেন পাশের চেয়ার-বিছানায়। আর 'সে' একদৃষ্টে স্মিতমুখে চেয়ে আছে আমার দিকে।

স্পষ্ট মনে হল, কতকগুলো অতি সূক্ষ্ম তড়িৎতরঙ্গ যেন সেই হীরক চক্ষু থেকে বেরিয়ে এসে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে।

ঘুম ভাঙার পর কী দেখলাম?

একটা প্রকাণ্ড হলঘর। হলঘর না বলে তাকে ময়দান বলাই উচিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ ময়দান। কিন্তু মাথাটা উপুড় করা বাটির মতো। পরিষ্কার হল? একটা প্রকাণ্ড জামবাটি উপুড় করে দিলে কীরকম দেখায়? জামবাটির তলায় দাঁড়িয়ে ওপরে তাকালে ছাদটা কীরকম মনে হয়? আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তার ছাদটাও তেমনি। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের ছাদের মতো গোল হয়ে নেমে এসেছে মেঝের ওপর। প্রকাণ্ড ছাদে হরেকরকম আলো, ছায়াছবি আর রঙের খেলা চলছে বিরাম বিহীনভাবে। নীহারিকামণ্ডলী, ছায়াপথ, গ্রহনক্ষত্র ছায়াছবির আকারে ফুটে রয়েছে ছাদ জুড়ে। মিলিয়ে যাচ্ছে, নড়ছে, সরছে। যেন সঞ্চরমাণ ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মাঝখানে রয়েছি আমি।

আমি শুয়ে আছি সেই চেয়ার বিছানায়। আমার পাশে প্রফেসর। 'সে' দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। মুখে সেই হাসি। চোখে সেই জ্যোতি। সম্মোহন নিদ্রা থেকে জাগ্রত করল শুধু চোখের চাহনি দিয়ে। কে এই 'সে'?

তার অ্যালুমিনিয়াম শুভ্র মাথার চুলে কীসের ছায়া পড়ল। তাকিয়ে দেখলাম একটা উড়ন চাকতি। লাল বলের মতো। উজ্জ্বল কিন্তু চোখধাঁধানো নয়। নিঃশব্দে ভাসতে ভাসতে চলে গেল 'প্ল্যানেটেরিয়ামে'র অপরদিকে। দেখলাম, সেদিকে বিস্তর উড়ন চাকতি উঠছে, নামছে, ভাসছে, ছুটছে!

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল সেই দৃশ্য দেখে। সটান উঠে বসলাম চেয়ার বিছানায়!

অমনি স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বললে সে, 'অত তাড়া কীসের বন্ধু? সব দেখাব, সব বলব।'

'স-ব?' এই প্রথম 'সে'-র সঙ্গে কথা বললাম আমি।

'হ্যাঁ, সব। এখুনি জানবে আমি কে, আমরা কারা, কেন এই চাকতি এবং কেনই বা এত প্রস্তুতি।'

প্রফেসরও উঠে বসেছেন। একগাল হেসে বললেন, 'সমস্ত বলবে তো?'

'বললাম তো।'

'তা হলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'জিজ্ঞেস করার দরকার নেই,' অদ্ভুত দস্তানা মোড়া হাতজোড়া সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল 'সে'— 'টানুন। খুলে দেখুন ক'টা আঙুল।'

একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে দুটো দস্তানা ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন প্রফেসর।

ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলাম আমি? 'সে'র হাত এখন নিরাবরণ। এক-এক হাতে চারটে করে আঙুল।

প্রফেসর কিন্তু চমকালেন না। ফোকলা মাড়ি বার করে বিজ্ঞের মতো হেসে শুধু বললেন, 'আগেই জানতাম। টিওটিহুআকানের পাহাড়ে যাদের মূর্তি খোদাই করা, তাদেরও আঙুলের সংখ্যা চার।'

চেয়ে রইল 'সে'। মাথার ওপর লাল আলো ছড়িয়ে ভেসে গেল একটা লাল গোলক। অত্যুজ্জ্বল আলোকশিখায় সহসা ঝলসে উঠল নক্ষত্রঅঙ্কিত ছাদ।

'সে' বললে, 'আমরা কিন্তু 'তারা' নই।'

'তবে কারা?'

গূঢ় হাসল 'সে', 'আপনি জানেন। যাচাই করছেন তো? তবে শুনুন। আমরা আপনাদেরই বংশধর।'

'মানুষ?'

'হ্যাঁ, মানুষ। তবে ভিন্ন মানুষ। আপনারাও ভিন্ন মানুষ। 'ওঁরা' আসবার আগে পৃথিবীর আদিম মানুষেরা যা ছিল, আপনারা তা নন। 'ওঁরা' এলেন তারাদের রাজ্য থেকে।'

'প্লায়াডীস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে, তাই না?'

'হ্যাঁ। এলেন ৭০ হাজার বছর আগে। পৃথিবীর তখন আদিম অবস্থা। আটলান্টিস অঞ্চলে, সুমেরু অঞ্চলে পৃথিবীর সব নরবানরের নমুনা জড়ো করলেন। নিজেদের রক্ত মিশিয়ে দিলেন তাদের রক্তে। সৃষ্টি হল নতুন মানুষের। মানুষ জাতি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। 'মিসিং লিঙ্ক' নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা হাবুডুবু খাচ্ছেন। বানর কী করে হঠাৎ মানুষ হল ভেবে পাচ্ছেন না। কল্পনাও করতে পারছেন না, গ্রহান্তরের অতিমানুষেরাই নিজেদের মগজ দু' পেয়ে জীবদের মগজে ঢুকিয়ে সৃষ্টি করেছেন আধুনিক মানুষ। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথা শুনবেন? আসুন আমাদের কর্মকাণ্ডের আরও কিছু দেখে যান।' বলতে না বলতেই একটা খুদে উড়ন চাকতি উড়ে এসে নামল পায়ের কাছে। স্বচ্ছ ঢাকনি খুলে ভেতরে ঢুকে বসল 'সে'। বিমূঢ়ের মতো আমি রইলাম পেছনে। সব শেষে প্রফেসর।

উড়ন চাকতি বেলুনের মতো হাওয়ায় ভর করে উড়ল আকাশে।

'সে' বললে, 'ওঁরা এ পৃথিবীর মানুষ নন। এই পৃথিবীটাকে ল্যাবরেটরি বানিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চললেন 'ওঁরা'। মাঝে মাঝে ফিরে যেতেন প্লায়াডীস নক্ষত্রের গ্রহে। ফিরে আসতেন অনেকদিন পরে। কেউ কেউ হিমঘুমে ঘুমিয়ে থাকতেন হাজার হাজার বছর—'

ফট করে বলে উঠলেন প্রফেসর, 'জানি। সেইজন্যেই তো ১৯৫৪ সালের জুন মাসে সাক্কারার কবর খুলে পিলে চমকে গিয়েছিল অভিযাত্রীদের। কবরে চোর ঢোকেনি, কিন্তু

শবাধার একদম ফাঁকা। সোনাদানা যেমন তেমন রয়েছে, ম্যমিরা পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে বললে ভুল বলা হবে। নিজের দেশে ফিরে গেছিল', বলল সে। হীরক চক্ষু সামনে নিবদ্ধ। পায়ের তলায় বিলীন হচ্ছে উড়ন চাকতির বিপুল কারখানা। কলের মানুষ কাজ করছে বিরামবিহীনভাবে। 'আপনারাও তো গবেষণা করে দেখেছেন, ম্যমিদের দেহ তাজা থাকে।'

চোখ বড় বড় করে বললেন প্রফেসর, 'সবই জানো দেখছি। গবেষণাটা হয়েছিল ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কয়েক হাজার বছর আগে মৃত মিশর রাজকুমারী মীনির দেহকোষগুলোকে নাকি এখনও জীবন্ত করা সম্ভব, বলেছিলেন জীববিজ্ঞানীরা।'

উড়ন চাকতি এবার নেমে গেল পাতালগর্ভে। মেঝের ফোকর দিয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো নামতে লাগল পৃথিবীর জঠরে। নীলাভ আলোয় শুধু দেখলাম 'সে'-র ভাবলেশহীন মুখ।

'তাঁরা বারবার এসেছেন। পরীক্ষা ব্যর্থ হলে অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে তা নিশ্চিহ্ন করেছেন। নেভাদার ডেথভ্যালিতে বা সাইবেরিয়ার তাইগা অঞ্চলে অথবা গোবি মরুভূমির খারাখোটায় অ্যাটম বিস্ফোরণ ঘটেছিল ওই কারণেই। একই কারণে ঈস্টার দ্বীপে প্রস্তরমূর্তি ছড়িয়ে আছে, ইন্‌কা-রা সাজানো শহর ফেলে সরে গেছে। দামাস্কাসের উত্তরে দু' হাজার টন ওজনের বড় বড় টালি দিয়ে প্রকাণ্ড চত্বরটা তাঁদেরই বিমান অবতরণের ক্ষেত্র ছিল। নাজকায় ছিল আর একটা এয়ারপোর্ট।'

'জানি, জানি, সব জানি,' ফোড়ন দিলেন প্রফেসর। 'ব্রহ্মশির অস্ত্র আর আগ্নেয়াস্ত্র মানেই তো অ্যাটম বোমা আর হাইড্রোজেন বোমা। পুষ্পকরথ মানে এই উড়ন চাকতি।'

'পুষ্পকরথ এর চাইতেও বড় বিমান। রকেট বিমান। মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত', বললে 'সে'। 'লোকমুখে তাঁদের কথাই পুরাণ উপকথায় আজ কিংবদন্তির রূপ নিয়েছে। বিশালদেহী অশ্বত্থামা কিন্তু অলীক নয়, সুমেরীয়রাও ছিলেন আকারে প্রকাণ্ড, ঈস্টার দ্বীপের পক্ষীমানবরাও বিশালদেহী।'

'প্লায়াডীস নক্ষত্রবাসীরা তা হলে বিশালদেহী?' প্রফেসর যেন ন্যাকা।

'নিশ্চয়। কুন্তীকে সন্তান দিতে এসেছিলেন স্বয়ং সূর্যদেব। মায়াপুরাণেও বলে, কোয়েট্‌জেল কোআট্‌ল্‌ এসেছিল অজানা সূর্যের দেশ থেকে। গিল-গামেশের মহাকাব্যেও সেই কথা। হিন্দুরা যাকে বলছে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, খ্রিস্টানরা তাকে বলছে আদম। এই আদম বা ব্রহ্মা আসলে রূপক, আসলে এঁরা প্লায়াডীসের মহামানব, নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে এসেছিলেন পৃথিবীতে। তাই মোজেসের জন্মের কাহিনির সঙ্গে অত মিল কর্ণের জন্মকাহিনির।'

উড়ন চাকতি সহসা স্তব্ধ হল। প্রকাণ্ড একটা ঘরে থমথমে নীরবতা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনেক দূরে এককোণে একটা অদ্ভুত পাথর থেকে আশ্চর্য প্রভা বেরোচ্ছে। সেই আভায় দেখা যাচ্ছে এক বিরাটকায় জীবের ছায়ামূর্তি। যেন অন্ধকারের পুঞ্জে নিহিত তমিস্রাদানব। মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু অবয়ব থেকে বোঝা যাচ্ছে দেখতে তাঁকে মানুষের মতোই, যদিও তিনি মানুষ নন।

উড়ন চাকতি থেকে একে একে নেমে দাঁড়ালাম আমরা। বাচাল প্রফেসরও বোবা হয়ে গেলেন হিমতুহিন পাতালকক্ষের বিরাটাকৃতি ছায়াপুরুষকে দেখে।

ফিসফিস করে শুধোলেন 'সে'-কে 'ইনিই কি তিনি?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁর মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'দেখলে সহ্য করতে পারবেন না বলে। গিলগামেশের পঞ্চম ফলকে কী লেখা ছিল ভুলে গেলেন? বাইবেলের যাত্রাপুস্তকেও সেই একই নিষেধ। মানুষ ওঁর মুখ দেখলে বাঁচে না।'

'আমিও বাঁচতে চাই না, কিন্তু ওঁকে দেখতে চাই।' বলেই আচমকা সবেগে সামনে ছুটে গেলেন প্রফেসর।

অন্ধকারের পুঞ্জ সহসা চঞ্চল হল। রন্ধ্রহীন অন্ধকারে আবৃত ছায়াপথিকের রহস্যময় মুখ আচম্বিতে নড়ে উঠল। তমিস্রার আবরণ থেকে ভেসে এল শুধু একটি শব্দ—

'তিষ্ঠ!'

বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত সেই শব্দ শোনবার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন। বিহ্বল চোখে শুধু চেয়ে রইলেন।

সহসা অন্ধকারের যবনিকা নেমে এল আমার চোখের সামনে! আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম কলকাতার বাড়িতে শুয়ে আছি। প্রফেসর এককাপ কফি নিয়ে চুকচুক করে খাচ্ছেন আমার বিছানার পাশে। তাঁর প্রিয় কুকুরটা জুল জুল করে চেয়ে আছে তাঁর হাতের কাপের দিকে।

চোখ চেয়েই সব মনে পড়ল। ভাবলাম, দুঃস্বপ্ন। কিন্তু প্রফেসর যা বললেন, তা শোনবার পর বুঝলাম, স্বপ্ন নয়, সত্যি।

এককাপ কফি এগিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'দীননাথ, উঠে পড়ো। তৈরি হও।'

'কীসের জন্যে?'

'পৃথিবীর ধ্বংস দেখার জন্যে। মরবার জন্যে।'

'কারা ধ্বংস করবে? উড়ন চাকতিওয়ালারা?'

'ন্যাকামি করো না। ওদের বর্তমান এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হয়েছে। শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়া হয়েছে। মানুষ জাতটা নিজেদের মধ্যেই হানাহানি নিয়ে ব্যস্ত। একই পৃথিবীর মানুষে-মানুষে এত ভেদাভেদ থাকলে অন্য গ্রহের মানুষকে ভালবাসবে কী করে? তাই ওরা পৃথিবী ধ্বংস করবে। আমাদের পুরাণে অবশ্য অনেক আগেই সে সম্ভাবনার কথা লেখা আছে, আমরা বুঝেও বুঝিনি।'

'কী সম্ভাবনা?' আবার বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কলিযুগ...কলিযুগ...কলিযুগের শেষ আসন্ন, খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'দু' পাতা ইংরেজি পড়ে লায়েক হয়েছ, না? পুরাণ মানো না?'

আমতা আমতা করে বললাম, 'কিন্তু একটা কথা তো বুঝতে পারছি না।'

‘কী কথা?’

‘আপনাকে ডেকে এত কথা বলার দরকার কী ছিল?’

‘সেকথা বললেই তো নিজের ঢাক নিজে পেটা হবে হে। পশ্চিম ভার্জিনিয়া থেকে রেডিয়ো টেলিস্কোপের মেসেজ পেয়েই ওঁদের টনক নড়েছিল। খবর পাঠিয়েছেন পৃথিবীর ঘাঁটিতে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে, আমাকে দলে টানবার জন্যে। পৃথিবী ধ্বংস করার আগে ওঁরা সবরকম মানুষ আর জীবের নমুনা রেখে দেবে ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্যে। আমি ছিলাম ওঁদের পছন্দসই মানুষ। নোয়া-র গল্প ভুলে গেছ? মহাপ্লাবন ওঁদেরই সৃষ্টি। প্রমাণ আছে। এবারেও ওঁরা চেয়েছিলেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে অতিমানুষ তৈরির জন্যে।’

‘গেলেই পারতেন,’ মুখ গোঁজ করে বললাম।

মুখটা শুকিয়ে গেল প্রফেসরের, ‘তোমাকে যে নিতে চাইল না।’ বলতে বলতে গলা ধরে এল। আমি চেয়ে দেখলাম, চোখ ছলছল করছে ওঁর।

কিছুক্ষণ আমিও কথা বলতে পারলাম না। আমি যে জানি দিনরাত দাঁতে পিষলেও প্রফেসর আমাকে ছেলের চেয়েও বেশি ভালবাসেন।

অনেকক্ষণ পরে শুধোলাম অস্পষ্ট কণ্ঠে, ‘ওই ছেলেটা কে? ওর হাতে চারটে আঙুল কেন? কেন বলল, ‘ও’ পৃথিবীর ভাবী মানুষ?’

চোখের জল মুছে নিয়ে প্রফেসর বললেন, ‘আদ্দিকালের ঘোড়া ছিল শেয়ালের মতো। প্লায়াডীসের আদিপুরুষেরা অনেকরকম এক্সপেরিমেন্ট করে আজকের ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন। ঠিক তেমনি উন্নত মানুষের স্রষ্টাও ওঁরা— নিজেদের গায়ের রক্ত আর মাথার মগজ মিশিয়ে। ক্রমাগত পরীক্ষার ফলে হঠাৎ জন্ম নিয়েছে এই চার-আঙুলে মানুষরা। এদের একটা আঙুল কম, প্লায়াডীসের আদিপুরুষদের মতোই। মস্তিষ্কের ক্ষমতাও তাঁদের মতো। অর্থাৎ রেডিয়োতরঙ্গ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গকেও হার মানিয়ে দিতে পারে ওদের মস্তিষ্কের টেলিপ্যাথি শক্তি আর সম্মোহনী শক্তি।’

আমি আর কোনও কথা জিজ্ঞেস করিনি। প্রফেসরও আর কোনও কথা বলেননি। সেই থেকে দু’জনেই কিন্তু চেয়ে থাকি আকাশের দিকে। অথচ দু’জনেই জানি, মহাপ্রলয় আকাশ থেকে নেমে আসবে না, ধেয়ে আসবে পৃথিবীরই আরেক অঞ্চল থেকে, মহাপ্লাবন বা অগ্ন্যুৎসব বা মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের আকারে।

কিন্তু সে অঞ্চল কোথায়? পৃথিবীর কোন প্রত্যন্ত প্রদেশের পাতালজঠরে অহর্নিশ উড়ন চাকতি বানিয়ে চলেছে যন্ত্রমানবেরা শেষের সেদিনের প্রতীক্ষায়?

জানি না। শুধু জানি, বেহালার সিভিল এয়ারপোর্টের ঘেঁষফেলা মাটির ওপর উড়ন চাকতি নামার দাগটা আজও ভাবিয়ে তুলেছে ফোর্ট উইলিয়ামকে। দাগটা গোলাকার, ব্যাস পনেরো ফুট, কিনারায় চার ইঞ্চি গভীর খাল, দাগের মধ্যে হলদে বেগনি অপার্থিব গুঁড়ো...

সময়-গাড়ি

১
কল্পতরু

আমার এই ছোট্ট জীবনে অনেক দেখলাম, অনেক শিখলাম, অনেক ঘুরলাম। এই পৃথিবী নামক গ্রহটার ওপরে বহু চরকিপাক দিয়েছি, বহু দেশ দেখেছি, বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। বহু বিস্ময়, বহু বিচিত্র বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি, মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত করেছি, তারই কিছু কিছু পরিবেশন করেছি ছোট্ট পাঠক পাঠিকাদের যারা বিস্মিত হতে জানে, অবাক পৃথিবীর অবাক ব্যাপার জেনে অবাক হতে পারে। অবিশ্বাস করে না। কেননা তারা জানে, শুধু তারাই জানে, পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কিছু নেই। সব সম্ভব, সব সম্ভব, সব সম্ভব।

আমার এই অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কাহিনিও লিখছি শুধু তাদের জন্যে। বিশ্বাসের যষ্টি উঁচিয়ে যারা একপায়ে খাড়া, তাদের হাতে লগুড়াঘাত খাওয়ার বাসনা আমার নেই। আমি যে দেখেছি, এ পৃথিবীতে আজ যা অবিশ্বাস্য, কাল তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে; আজ যা অসম্ভব, কাল তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এই বিচিত্র কাহিনিও তাই উৎসর্গ করছি আমার মতোই মনের আর বিশ্বাসের মানুষদের উদ্দেশে— ছোট্ট মানুষেরা অন্তত তাচ্ছিল্যের বঙ্কিম হাস্য দিয়ে বিদ্ধ করবে না আমাকে, ব্যঙ্গের বিদ্রুপবাণে জর্জরিত করবে না আমার বহুদর্শী সত্তাটাকে।

অনেক দেখেছি বলেই আজ আমি জেনেছি, এই পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা প্রদীপের মতো। তেল থাকে, সলতে থাকে, কিন্তু নিজে থেকে বিরামবিহীনভাবে কখনও জ্বলে যেতে পারেন না। মাঝে মাঝে কাঠি দিয়ে উসকে দিতে হয়। প্রদীপ তখন আবার প্রোজ্জ্বল হয়।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র হলেন সেই জাতীয় পুরুষ। বিপুল প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতিতে নির্ভরশীল শিশুর মতনই। সুবিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো কথা বলতে শিখেই কেবল ‘পেন্সিল পেন্সিল’ করে চেঁচাতেন।* এই পেন্সিলকে সম্বল করেই উত্তর জীবনে তিনি

* ওঁর প্রথম কথা ছিল piz, piz; এটি স্পেনীয় ভাষায় lapiz-এর ভাঙা অংশ। কথাটির অর্থ পেন্সিল।

জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে শৈশবে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও 'ল্যাব ল্যাব' করে চেঁচিয়েছিলেন। কেননা, এই ল্যাবরেটরিকেই ধ্যানধারণা করে তিনি আজ জগদ্বিখ্যাত। অন্তত ছোটদের কাছে— তাদের কাছেই তো প্রফেসরের কীর্তিকলাপ বারবার পৌঁছে দিয়েছি।

তিনি বড় বৈজ্ঞানিক নিঃসন্দেহে। তাঁর মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারের ওজন নিলেও স্তম্ভিত হতে হবে অবশ্যই। আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক সংরক্ষিত হয়েছে যখন, তাঁর মস্তিষ্কও একদিন না একদিন আরকে ভিজিয়ে রেখে দেওয়া হবে মহত্তর গবেষণার জন্য।

কিন্তু এত ধীশক্তি নিয়েও তিনি কখনও কখনও নিড়বিড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে উসকে দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং এই কর্মটি করতে হয় আমাকে। আমি, শ্রীহীন দীননাথ, মাঝে মধ্যে তাঁর পশ্চাতে লাগি, সূক্ষ্ম বাক্যবাণে বিদ্ধ করি, কথার শরজালে নাস্তানাবুদ করি, প্রফেসর উত্তপ্ত হন, আমাকে বিবিধ অপ্রীতিকর বিশেষণে ভূষিত করেন। কিন্তু কাজ হয়। তাঁর ধীশক্তি নতুন তেজে আবার বিচ্ছুরিত হয়, প্রসাদ পায় বিশ্বের মানব। নতুন আবিষ্কার, নতুন অ্যাডভেঞ্চার, নতুন কীর্তিকলাপের সন্ধান পায় আমার ছোট্ট বন্ধুরা।

গত নভেম্বরে একটি কল্পবিজ্ঞানের শারদীয় সংখ্যায় এইচ জি ওয়েলস লিখিত অমর কাহিনি 'টাইম মেশিন' অনূদিত হয়েছিল। পত্রিকাটি একদল পাগল দ্বারা পরিচালিত হয়। পাগল অর্থে বিকৃত মস্তিষ্ক নয়— কল্পবিজ্ঞান-পাগল। বলাবাহুল্য, আমিও সেই পাগলদের অন্যতম। তাই 'টাইম মেশিন' কাহিনিটা গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করেছিলাম।

করবার পর আমার মাথা ঘুরে গেল। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ পাড়ি দেওয়ার মতো মেশিন নির্মাণ সম্ভব তা হলে? কল্পনায় যা সম্ভব হয়, বাস্তবে তা সম্ভব হবে না কেন? কেন সময়ের পথে পাড়ি দিয়ে ঘুরে আসা যাবে না বিস্মৃত অতীতে, অথবা অজ্ঞাত ভবিষ্যতে?

স্বর্গের কল্পতরুর নাম শুনেছি— চোখে কখনও দেখিনি। কল্পান্ত স্থায়ী এই তরু উত্থিত হয়েছিল সমুদ্রমন্থন থেকে— সমুদ্রগর্ভেই নিমজ্জিত হয় কল্পান্ত হলে। এই জন্যেই এর নাম কল্পতরু। অভীষ্টদায়ক এই বৃক্ষের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তা বিফলে যায় না— কল্পতরু বাঞ্ছাপূরণ করে— অভীষ্ট লাভ হয়।

স্বর্গের কল্পতরু না দেখলেও বসুমতীর কোলে লালিত এক কল্পতরুর সন্ধান আমি জানি। মহীরুহ তিনি নন— মানুষ। কিন্তু মহীরুহের মতোই বিশাল, উদার এবং বিস্ময়কর। তাঁর নাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

স্থির করলাম, কল্পতরু হেন এই অতিমানুষটির কাছেই হাত পাতা যাক। বড়ই কৃপণ এবং অলস মানুষ তিনি। ভিক্ষা দেন না— অনুরোধ রাখবার জন্যে সক্রিয় হতেও চান না। অতএব তাঁকে উদ্দীপ্ত করতে হবে।

তাই কল্পবিজ্ঞানের শারদীয় সংখ্যাটি হাতে নিয়ে হানা দিলাম তাঁর বীক্ষণাগারে।

যা ভেবেছিলাম, গিয়ে ঠিক তাই দেখলাম। ইজিচেয়ারে শুয়ে একটি আমেরিকান পত্রিকা বুকের ওপর রেখে ঘুমোচ্ছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা।

এতই অলস যে কয়েকদিন ক্ষৌরকর্ম করার প্রবৃত্তিও হয়নি। কর্কশ দাড়িগোঁফে গাল

ছেয়ে গেছে। হাঁ করে ঘুমোনোর ফলে কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে পাঞ্জাবিতে। দন্তহীন মাড়ির শোভা তাতে প্রকটতর হয়েছে। তোবড়ানো গণ্ডদুটো অবশ্য স্পষ্টতর হয়নি অযত্নবর্ধিত আগাছার দৌলতে। দেখে মায়া হল। কর্মহীনতার অস্থিরতা কাটাতে শার্লক হোমস মর্ফিন ইঞ্জেকশন নিতেন— এই মানুষটি নিজেকে সেইসব মুহূর্তে নিক্ষেপ করেন নিদ্রার নিতল গহ্বরে।

আমি তাঁকে সেই গহ্বর থেকে টেনে তুললাম। তারপর কী কৌশলে কথার মারপ্যাঁচে সরল মানুষটাকে ক্ষিপ্ত করলাম, সেই কাহিনি বিন্যাস করে সুদীর্ঘ এই কাহিনিকে সুদীর্ঘতর করতে চাই না। সংক্ষেপে বলি, পরিশেষে তিনি আমাকে 'ইডিয়ট', 'মূর্খ', 'গবেট' ইত্যাদি বহুপ্রকার দেশি-বিদেশি বাক্যালংকারে সুসজ্জিত করে বীক্ষণাগার থেকে ঠেলে বার করে দিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

টাইম মেশিনের আবির্ভাব ঘটল তার পরেই।

২
অদ্ভুত যন্ত্র

'দীননাথ, খামটা খোলো।'

একটা লেফাফা এগিয়ে দিলেন প্রফেসর। বড় আকারের খাম এবং বেশ ভারী। মুখটা খোলাই ছিল। ভেতর থেকে টেনে বার করলাম চারটে ফটোগ্রাফ। প্রথমটা একটা ছেলের। দ্বিতীয়টায় দেখা গেল তার বয়স আরও বেড়েছে। তৃতীয়টায় সে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। চতুর্থটা প্রৌঢ় বয়সের ছবি। একই ব্যক্তির চার-বয়সের চারটে ছবি।

তা সত্ত্বেও প্রশ্ন করলাম, 'একজনেরই ছবি মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' বললেন প্রফেসর। 'আমার এক বন্ধুপুত্রের ছবি। চার বয়েসের চারখানা ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরার সামনে বসতে আপত্তি করেনি ছেলেমানুষ বলেই।'

ছবি চারটে নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম, 'কিন্তু চারখানা ছবিই দেখছি সদ্য তোলা। ছেলেবেলার ছবির কোয়ালিটি তো খারাপ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

'তা ছিল।'

'কিন্তু তা তো হয়নি। কেন?'

'কেননা চারখানা ছবিই তোলা হয়েছে আধঘণ্টার মধ্যে।'

'চার বয়েসের ছবি আধঘণ্টার মধ্যে? ছেলেটা কি আধঘণ্টার মধ্যে যুবক হয়ে প্রৌঢ় হয়ে গেল?'

'তা গেল।' গম্ভীরভাবে বললেন প্রফেসর। মুখে পরিহাসের বাষ্পটুকুও নেই। আমি বিমূঢ় চোখে কেবল চেয়ে রইলাম।

আমার মুখভাব নিরীক্ষণ করে মৃদু হাস্য করলেন প্রফেসর, ঠিক এই ধরনের নিগূঢ় হাস্যভাব লক্ষ করেছিলাম আজ যখন উনি আমাকে তাঁর এই নতুন বীক্ষণাগারে ট্যাক্সিতে

চড়িয়ে নিয়ে আসেন। জায়গাটা সল্টলেকের সেকটর চারে। ঝিলমিলের পুবে— চারপাশে ঝিল— মাঝখানে একটা দ্বীপ। নৌকোয় চাপিয়ে দ্বীপে এনেছেন মুখে একটিও বাক্য উচ্চারণ না করে। প্রায় একতলা সমান উঁচু শরবন দুলছে হাওয়ায় দ্বীপের চারদিকে। আর রয়েছে বিস্তর গাছ। তাই বাইরে থেকে বোঝা যায়নি ভেতরের কাণ্ডকারখানা। গাছ আর শরবনের মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ মাড়িয়ে দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় আসতেই দেখেছিলাম একটা বিশাল কাচের গম্বুজগৃহ— অনেকটা মানমন্দিরের মতো। পরে জেনেছিলাম সেটা কাচ নয়— কাচের মতোই স্বচ্ছ কিন্তু অভঙ্গুর প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ।

আঙুল তুলে প্রফেসর বলেছিলেন, 'এই আমার নতুন খেলাঘর।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'কবে করলেন এত কাণ্ড?'

উদাসীন ভাবে প্রফেসর বলেছিলেন, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের অঙ্গুলি হেলনেই সব হয়ে যায় হে দীননাথ। আমি শুধু হুকুম দিয়েই খালাস।'

তা আর জানি না। এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের দাপট যে সময়বিশেষে কত প্রচণ্ড হতে পারে, তার সাক্ষী তো আমি স্বয়ং। তখন আর তিনি অকর্মণ্য, অকেজো, অন্যমনস্ক নন। তখন আর তাঁকে সংসারানভিজ্ঞ উদাসীন বলে কার সাধ্য!

বললাম, 'কিন্তু খাস কলকাতা ছেড়ে এই বিজন বিভুঁয়ে কেন?'

'কারণ এখানে উঁকিঝুঁকি মারার কেউ নেই, উৎসুকদের উৎপাত নেই, সকাল সন্ধ্যায় পাখির ডাক শোনা যায়, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের অজস্র রঙের খেলা দেখা যায়, আর—' একটু থেমে গাঢ় স্বরে বললেন, 'আপন মনে বিজ্ঞান নিয়ে খেলা করা যায়।'

বলতে বলতে মুখচ্ছবি পালটে গেল বৃদ্ধের। শিশুর মতোই সরল সহজ সুন্দর হয়ে উঠলেন যেন। খেলতে ভালবাসে শিশুরা। এই বৃদ্ধও ভালবাসেন খেলা— বিজ্ঞানের খেলা। তাঁর কাছে যা নিছক খেলা, অবসর বিনোদন এবং চিত্তরঞ্জন ছাড়া কিছুই নয়— বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে তা পরম বিস্ময়— সভ্যতাকে লম্ফ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পন্থা।

এ ঘটনার শুরু প্রফেসরকে টাইম মেশিন নিয়ে খেপিয়ে দেওয়ার বেশ কয়েক মাস পরে। এই কটা মাস প্রফেসর নিপাত্তা হয়ে গেছিলেন বললেই চলে। তারপরেই আজকে বাড়ি বয়ে হাজির— ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল বাইরে। আমাকে একবস্ত্রে গাড়িতে তুলে এনে ফেললেন এই মনোরম প্রাকৃতিক নিকুঞ্জে।

মুগ্ধ চোখে নীরবে প্রফেসরের পেছন পেছন প্রবেশ করেছিলাম তাঁর বিজ্ঞানের খেলাঘরে।

এবং, তারপরেই বিনা আড়ম্বরে লেফাফা-ভর্তি চারখানা ফটোগ্রাফ আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

অনিমেষে আমার হতচকিত মুখভাব কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন প্রফেসর। তারপর যেন দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'দীননাথ, বিজ্ঞানের ভাণ্ডার অসীম, তাকে সসীম করে তুলেছে কল্পনাহীন কিছু বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আশ্চর্য কি জানো, কল্পনার মনপবনে গা ভাসিয়ে দিতে

যারা ভালবাসে, যারা কৌতূহলী মন নিয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে— তারাই আবার কখনও কখনও অন্ধ বৈজ্ঞানিকদের চক্ষু উন্মীলন করে ছাড়ে। যেমন করেছ তুমি। টাইম মেশিনে আগ্রহ জাগ্রত করেছ আমার।'

টাইম মেশিন! মনটা চাঙা হয়ে উঠল আমার। প্রফেসর সস্নেহ চোখে নীরবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি কথা বললাম না।

উনি বললেন, 'আজকাল বিজ্ঞান-শিক্ষা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কিন্তু কেউ বুঝছে না, ছোটদের মনে বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা জাগাতে হবে সর্বাগ্রে— তত্ত্বকথা পরে। অনুসন্ধিৎসা জাগলেই তারা প্রশ্ন করবে— বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা আপনিই জেনে নেবে। দীননাথ, তোমার টাইম মেশিনের গল্প সেই উপকারটাই করেছে আমার— এই বুড়ো বয়েসেও আমার ইচ্ছে হয়েছিল টাইম মেশিন বানাবো।'

'বানিয়েছেন?' আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না আমার পক্ষে।

প্রফেসর বোধহয় শুনতে পেলেন না। নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'টাইম মেশিন নির্মাণ করতে গেলে আগে প্রয়োজন ফোর্থ ডাইমেনশন সম্পর্কে সম্যক ধারণা। সংক্ষেপে, যে কোনও আদত বস্তুর চারদিকে চার রকমের ব্যাপ্তি থাকতেই হবে। অর্থাৎ, দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ ছাড়াও থাকবে স্থায়িত্ব। প্রথম তিনটে স্থানের বা স্পেসের ওপর। চতুর্থটা হল সময় বা টাইমের ওপর। প্রথম তিনটে মাত্রা বা ডাইমেনশনের সঙ্গে সমকোণে রয়েছে সময় মাত্রা বা ডাইমেনশন। সুতরাং সময়ের ওপর পর্যটন কোনও বস্তুর পক্ষে অসম্ভব নয়।'

হেঁট হয়ে ফটো চারটে হাতে নিয়ে ফের বললেন প্রফেসর, 'দীননাথ, ফটোগুলোর কোয়ালিটি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জন্যে প্রশংসা জানাই। কিন্তু যা তুমি বুঝতে পারোনি, তা এবার ব্যাখ্যা করি। চারটে ফটোই ফোর্থ ডাইমেনশনের ক্রস-সেকশন; অর্থাৎ সময় মাত্রার সঙ্গে সমকোণে কাটা অংশ!'

ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হল না। অথবা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করল না। মুখে তা প্রকাশ করলাম না। প্রফেসর একচোখে কৌতুকতরলিত হাসি, আর একচোখে অপার গাম্ভীর্য নিয়ে চেয়ে রইলেন আমার পানে।

তারপর মৃদু অস্ফুট স্বরে বললেন, 'সময়... চির রহস্যময় সময়। কিন্তু এ রহস্য আর রহস্য নয় আমার কাছে। এই যে ছবিগুলো দেখছ, এগুলো এক ত্রিমাত্রিক ব্যক্তির দ্বিমাত্রিক প্রতিমূর্তি। প্রত্যেকটা ছবিতেই তুমি উচ্চতা আর বিস্তার দেখতে পাচ্ছো, বেধ সম্বন্ধেও সামান্য আভাস পাচ্ছ— কিন্তু চ্যাপটা প্রতিমূর্তির বেশি তা নয়— দ্বিমাত্রিক কাগজের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়। শৈশব থেকে প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত সময়পথে পর্যটনের কোনও আভাসও আলাদা করে ফুটে ওঠেনি কোনও ছবিতে। কিন্তু একত্র অবস্থায় ফোর্থ ডাইমেনশন সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজি ধারণা সৃষ্টি করছে। ঠিক কিনা?'

আমার জবাবের অপেক্ষা না রেখে ছবি চারটে হাতে নিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন প্রফেসর। এঘর তাঁর বীক্ষণাগার নয়— গ্রন্থাগার। দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো একটা বুককেসের মাথার ওপর ফটো চারটে পাশাপাশি রেখে বললেন, 'টাইম আর স্পেস— সময় আর স্থান আদতে একই জিনিস— আলাদা করা যায় না। এই যে ঘরের

মধ্যে হেঁটে এলাম মাত্র কয়েক ফুট, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সময়ের ওপর দিয়েও সরে এলাম কয়েক সেকেন্ড। কী বলতে চাই বুঝতে পারছ তো?'

'একটা গতি আর একটা গতির পূরক?' বললাম আমতা আমতা করে।

'এক্কেবারে ঠিক!' সোল্লাসে বললেন প্রফেসর। পরীক্ষায় ছেলে ফুল মার্ক পেলে বাবার যে রকম আনন্দ হয়, যেন সেই আনন্দে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'আমি এই দুটোকেই আলাদা করতে চেয়েছি। যাতে সময়পথ থেকে সরে এসে স্থানের ওপর ঘুরে বেড়াতে পারি, আবার স্থান থেকে সরে গিয়ে সময়পথে পর্যটন করতে পারি। এই নিয়েই খেলা করেছি অ্যাদ্দিন আমার এই নতুন খেলাঘরে। খেলাটা তোমাকে না দেখালে বুঝবে না।' বলেই, বেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রফেসর।

আমার বুক দুরদুর করতে লাগল। দূরে দড়াম করে দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ায় শব্দ শোনা গেল। সেকেন্ড কয়েক পরেই আবার শোনা গেল সেই শব্দ পরম্পরা। পরক্ষণেই বায়ুবেগে ঘরে প্রবেশ করলেন প্রফেসর। হাতে একটা কাঠের হোমিওপ্যাথিক বাক্স। বেশ বড় সাইজের। বাক্সটা রাখবার জায়গা খুঁজছেন দেখে আমি লাফিয়ে গিয়ে একটা তেপায়া তুলে এনে রাখলাম তাঁর সামনে। বাক্সটা তিনি ঠিক মাঝখানে রেখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন সামনে। খড়ের আগুন যেমন দপ করে জ্বলে উঠেই ধপ করে নিভে যায়, চকিতে তাঁর চোখ মুখের উত্তেজনা অপসৃত হয়ে ফুটে উঠল নিবিড় প্রশান্তি।

সস্নেহে বাক্সটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'দীননাথ, তাকাও এদিকে।'

বললাম, 'হোমিওপ্যাথির চর্চা করছেন নাকি?'

নিমেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল প্রফেসরের, 'ননসেন্স! ফালতু কথা একদম বলবে না! তাকাও এদিকে।'

সুবোধ বালকের মতো তাকালাম। বুড়োর মুখনাড়া মাঝে মাঝে মর্মবেদনার কারণ হয়ে ওঠে। এখন খুঁচোনো ঠিক হবে না। খেলায় তন্ময় তো!

'শুধু তাকিয়ে থাকো— হাত দিয়ো না। অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র।'

সন্তর্পণে খুললেন ডালাটা। ভেতরটা মখমলের মতো নরম বস্তুর প্যাড দিয়ে মোড়া। মাঝখানে রয়েছে একটা ছোট্ট যন্ত্র। প্রথম দর্শনে মনে হল একটা ঘড়ির যন্ত্র।

৩
টাইম মেশিন

আধার থেকে অতি সন্তর্পণে বস্তুটাকে বার করলেন প্রফেসর। কোহিনূর হিরে হাতে পেলেও এত মমতা দিয়ে হাতে নিতেন কিনা সন্দেহ। আস্তে আস্তে রাখলেন টেবিলের ওপর।

আমি ঝুঁকে পড়লাম। খুব কাছ থেকে সংকুচিত চোখে চেয়ে দেখলাম। জিনিসটার বেশিরভাগ নির্মিত হয়েছে অদ্ভুত এক ক্রিস্ট্যাল পদার্থ দিয়ে। প্রত্যেকটা দানার মধ্যে যেন রামধনুর সাতরঙের ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছে। পলকে পলকে বহুবর্ণ ঠিকরে যাচ্ছে। আশ্চর্য

এই ক্রিস্ট্যাল কখনও দেখিনি।

প্রথম দর্শনে যাকে মনে হয়েছিল ঘড়ি-যন্ত্র, তন্নিষ্ঠ হয়ে দেখতে গিয়ে দেখলাম, ধারণাটা ভুল। ঘড়ি-যন্ত্র মনে হওয়ার কারণ জিনিসটার অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারিকুরি— যা কেবলমাত্র ঘড়ি-যন্ত্রেই দেখা যায়। ছোট্ট ছোট্ট অংশগুলো নিখুঁতভাবে অতিশয় নিপুণ হাতে পরস্পরসংলগ্ন— ধাতুর পার্টস আর বিচিত্র সেই ক্রিস্ট্যালের সমভিব্যাহার নিতান্তই অনুপম, অতুলনীয় এবং অকল্পনীয়। কী বিপুল নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং কারিগরি দক্ষতার দৌলতে অদ্ভুত এই যন্ত্রের সৃষ্টি, তা কল্পনা করেও বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

ধাতুগুলোকে কিন্তু ঠাহর করেও চিনতে পারলাম না। পুঁচকে কয়েকটা রড মনে হল নিকেল দিয়ে তৈরি। কয়েকটা যন্ত্রাংশ খুব চকচকে ভাবে পালিশ করা পেতলের। দাঁতের মতো খাঁজকাটা একটা চেকনাই-দেওয়া কগ-হুইলকে মনে হল ক্রোম বা রুপোয় নির্মিত। কিছু অংশ গড়া হয়েছে একটা সাদা বস্তু দিয়ে— খুব সম্ভব তা হাতির দাঁত। তলদেশটা শক্ত, আবলুষ কাঠের মতো শক্ত কাঠের— কালো, পালিশ করা।

জিনিসটার বর্ণনা দেওয়া সহজ নয়। যেদিক থেকেই দেখি না কেন, অদ্ভুত কোয়ার্জের মতো বস্তুগুলোর সাতরঙা ঝিকিমিকি চোখ ধাঁধিয়ে দিল আমার। পলকাটা দামি পাথরের মতো বহুপলবিশিষ্ট দুর্জ্ঞেয় এই ক্রিস্ট্যাল বিভিন্ন কোণ থেকে রকমারি জলুস ছড়িয়ে এমন চক্ষুভ্রমের সৃষ্টি করল যে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম আমি।

উঠে দাঁড়ালাম। কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে তফাৎ থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইলাম। তখন কিন্তু আবার জিনিসটাকে ঘড়ি-যন্ত্র বলেই মনে হল।

তফাৎ শুধু কলকবজার অসাধারণত্বে— এমন মুনশিয়ানা বিশ্বের সূক্ষ্মতম ঘড়ি-যন্ত্রেও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

'ভারী সুন্দর তো,' বললাম মুগ্ধ স্বরে।

'বালক,' (প্রফেসর মাঝে মাঝে থিয়েটারি ঢঙে আমাকে এমন সব নামে সম্বোধন করেন যেন আমি একটা দুগ্ধপোষ্য অপোগণ্ড) 'এই পৃথিবীর তুমিই অন্যতম প্রথম ব্যক্তি যার সৌভাগ্য হল ফোর্থ ডাইমেনশনকে সম্ভবপর করে তোলার যন্ত্র প্রত্যক্ষ করার।'

'কাজ হবে এতে?' সংশয়জড়িত স্বরে বললাম আমি। 'সত্যিই হবে?'

কি ভাগ্যিস ফোঁস করে উঠলেন না প্রফেসর আমার সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর শুনে। নিমীলিত নয়নে অনুপম যন্ত্রটার দিকে চেয়ে স্বপ্নের ঘোরে যেন বললেন, 'হবে কি হে, হয়েছে। টেস্ট করেছি, সাকসেসফুল হয়েছি। সময়পথে এই ইঞ্জিনের সাহায্যেই এখন আমি পর্যটন করতে পারব। সামনে যাবো কি, পেছনে যাবো— সেটা অবশ্য নির্ভর করবে আমার ইচ্ছের ওপর।'

'হাতে-কলমে দেখান না কেন,' সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললাম আমি।

উত্তর দিলেন না প্রফেসর। হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে। সূচ্যগ্র চোখে চেয়ে রইলেন ঝিকমিক নক্ষত্রপুঞ্জের মতো বিচিত্র যন্ত্রটার দিকে। আবিষ্ট চক্ষু। কী যেন ভাবছেন। কপাল কুঁচকে গেল চিন্তার আলোড়নে। পুরো পাঁচ মিনিট ঠিক এইভাবে চোখ কুঁচকে, কপাল কুঁচকে বসে রইলেন। জলজ্যান্ত একটা মানুষ যে তাঁর সামনে বসে কৌতূহলে ছটফট

করছে, তার অস্তিত্বও যেন তিনি ভুলে গেলেন। শুধু ওই যন্ত্র ছাড়া তাঁর চোখের সামনে থেকে বিশ্বসংসার যেন মুছে গেল। একবার ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে, খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলেন বাহারি কলকবজাগুলো— এমনভাবে দেখতে লাগলেন যেন বিশ্বকর্মা কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না নিজের শিল্পসৃষ্টিতে— বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন আপন মনে। ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করি— খুঁত ধরেছেন বুঝি? কিন্তু নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করার সাহস হল না। বিশ্বকর্মা নিমেষ মধ্যে বিশ্বামিত্র হয়ে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করে দিতেন আমায়— এমন সব অগ্নিবাক্য প্রয়োগ করবেন যে গায়ে ছ্যাঁকা পড়বেই। তাই নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। উনি কল-টাকে দু'হাতে আলতো করে ধরে তুলে ধরলেন চোখের সামনে। জানলার দিকে ফিরিয়ে ধরলেন। দিনের আলোয় আরও ঝলমলে দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য রত্নসম মনে হল বিচিত্র যন্ত্রটাকে। একহাতে রুপোর কগ-হুইলটা স্পর্শ করতে গিয়েও করলেন না, যেন দ্বিধায় পড়লেন। হাত সরিয়ে নিয়ে যন্ত্র নামিয়ে রাখলেন টেবিলের মাঝখানে। আবার চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে ধ্যানমগ্ন চোখে তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন। যন্ত্রের সত্তার সঙ্গে তাঁর সত্তা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে মনে হল।

এইভাবে এবার কিন্তু বসে রইলেন ঝাড়া দশ মিনিট। উসখুসুনি শুরু হল আমার। কাঁহাতক দারু-পুত্তলির মতো ঠায় বসে থাকা যায়। এই মুহূর্তে আমি তাঁর কাছে অবাঞ্ছিত কিনা, সে চিন্তাও ঘুরঘুর করতে লাগল মনের মধ্যে।

শেষকালে উনি আবার ঝুঁকে বসলেন, যন্ত্রটা কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখলেন এবং উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, দীননাথ। ছোট্ট একটা মডিফিকেশনের আইডিয়া মাথায় এসেছে।'

'আমি এখন আসি তা হলে?'

'না, না, যাবে কেন? বোসো।'

কাঠের বাক্সটা দু'হাতে তুলে নিয়ে দ্রুতপথে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রফেসর। ডোর-ক্লোজার ফিট করা দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

দীর্ঘ এতগুলো মিনিটের টেনশন বড় কম যায়নি। উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে বসেছিলাম এতক্ষণ। এবার এলিয়ে পড়লাম চেয়ারে। প্রফেসর চিরকালই ছিটগ্রস্ত মানুষ। প্রতিভাধর এবং ছিটগ্রস্ত শব্দদুটো সমার্থক মনে হয় এই কারণেই। কিন্তু আজকে তাঁর যে ধ্যানতন্ময় মূর্তি এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ মুখচ্ছবি দেখলাম, তেমনটি কখনও দেখিনি। তাঁর যুক্তিপরম্পরা এবং আচরণের মধ্যেও খাপছাড়া কিছু দেখলাম না— যা তাঁর বৈশিষ্ট্য।

প্রফেসর বাস্তবিকই আবিষ্কার করেছেন টাইম মেশিন। এখন বাকি শুধু সময় পথে পর্যটন।

কিন্তু তার আর কত দেরি?

৪
রামায়ণের সাল তারিখ

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। দীর্ঘক্ষণ হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হল না। মিনিট দশেকের মাথায় আস্তে আস্তে খুলে গেল দরজা। স্খলিত চরণে প্রবেশ করলেন প্রফেসর। চোখ মুখের আলো যেন নিভে গেছে।

সোজা হয়ে বসলাম। এই দশ মিনিটের মধ্যে এমনকী ঘটল যে এত মিইয়ে গেলেন প্রফেসর?

শুধোলাম, 'কী হয়েছে?'

দু'হাত উলটে মুখখানা করুণ করে প্রফেসর বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে জবর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল। কিন্তু একটা জিনিসের জন্য কেবল কাজ আটকে যাচ্ছে।'

এই কাণ্ড! উদ্বেগ খানিকটা কমল আমার। একেবারেই শিশুপ্রকৃতি প্রফেসরের! শিশুর মতোই সামান্য কারণে ভেঙে পড়েন।

সহজ গলায় বললাম, 'কী জিনিস? বলুন আমাকে, এনে দিচ্ছি।'

জুল জুল করে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। জবাব দিলেন না।

আমি আবার বললাম, 'বিশ্বাস করতে পারছেন না বুঝি?'

প্রফেসর মুখ টিপে বললেন, 'সে কী কথা! বিশ্বাস করি বলেই তো বর্তমান পৃথিবীর কাউকে যা দেখাইনি, তোমাকে তা দেখালাম।'

টিপে টিপে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলেছিলেন বলেই একটা শব্দ কানে লেগে রইল। 'বর্তমান' শব্দটা যেন একটু জোর দিয়েই উচ্চারণ করলেন প্রফেসর। বর্তমান পৃথিবীর কাউকে যা দেখাননি, আমাকে তা দেখিয়েছেন— কথাটার মানে কী? অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের প্রশ্ন তুলছেন কেন?

তাই একটু বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল। সহজভাবে বললাম, 'অতীত বা ভবিষ্যতের অনেককেই নিশ্চয় দেখিয়ে এনেছেন?'

বারকয়েক চোখের পাতা ফেলে নিরীহ গলায় প্রফেসর বললেন, 'ভবিষ্যতে যাবো বলেই তো প্ল্যান করছি— তোমায় নিয়ে যাবো। অতীতে দেখিয়েছি কয়েকজনকে।'

ভেতর ভেতর চমকে উঠলেও বাইরে তা প্রকাশ করলাম না। মুখখানা যদ্দূর সম্ভব স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাদের বলুন তো?'

কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'যেমন ধরো রামকে।'

'রাম!'

'হ্যাঁ, হে, হ্যাঁ। শ্রীরামচন্দ্রকে।'

'রামায়ণের রামচন্দ্রকে?'

'আঁতকে উঠলে কেন?'

অভিনয় আমার দ্বারা কস্মিনকালেও হয় না। তাই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বিষম চেঁচিয়ে বললাম, 'আ-আপনি রামায়ণের যুগে বেড়িয়ে এসেছেন?'

এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর। এবার বসলেন। আমার থর-থর কম্পিত মুখচ্ছবি দেখে সস্নেহে আমাকে হাতের ইশারায় বসতে আজ্ঞা করলেন। ধপ্ করে বসে পড়লাম চেয়ারে। উনি পিটপিট করে চেয়ে থেকে বললেন, 'দীননাথ, অতীত দেখবার ইচ্ছে হলেই সবাই ডাইনোসরের যুগ দেখে আসতে চায়। বড় একঘেয়ে ইচ্ছে। আমার ইচ্ছে ছিল আমার দেশের প্রাচীন মহাকাব্যের যুগগুলোয় ঘুরে আসা। কিন্তু আন্দাজে তা সম্ভব নয়। সাল-তারিখ না জানলে কী করে যাই বলো। তাই অ্যাসট্রো-ম্যাথমেটিকস-এর শরণ নিলাম। পুনার ডাক্তার পি ভি ভার্তাকের নাম শুনেছ?'

ঘাড় নাড়লাম। জীবনে অমন অদ্ভুত নাম শুনিনি।

প্রফেসর বললেন, 'খবরটা ইউ এন আই থেকে প্রথম বেরোয়। ডাক্তার ভার্তাক নাকি অ্যাসট্রো-ম্যাথমেটিকস নিয়ে গবেষণা করছেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বললাম, রামায়ণ আর মহাভারতের ঘটনাগুলো কোন কোন তারিখে ঘটেছে, অংক কষে আমাকে বলে দিতে হবে।'

'বলে দিলেন?' প্রফেসর দম নেওয়ার জন্যে থামতেই আমি দম ছেড়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, দিলেন। সে এক লম্বা লিস্ট। ডায়েরিতে লিখে রেখেছি। দু'-একটা মনে আছে। শুনবে?'

'নিশ্চয়।'

'তার আগে একটা কথা বলে রাখি। কার্বন-ডেটিং পদ্ধতিতে প্রাচীনকালের মহাযুগগুলির সাল-তারিখের সঠিকতা কিন্তু এখনও প্রমাণিত হয়নি। গ্রহ অবস্থান বিচার করে তা নির্ভুলভাবে বলা যায়। ডাক্তার ভার্তাক ১১ বছর ধরে গবেষণা করছিলেন এই সম্পর্কে। বিভিন্ন প্রাচ্য এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক সম্মেলনে আর কংগ্রেসে তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফলও প্রকাশ করেছেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' অধীর কণ্ঠে বললাম আমি। 'আগে বলুন রাম কবে জন্মেছিল?'

'মঙ্গলবারে। চৌঠা ডিসেম্বর। যিশুখ্রিস্ট তখনও জন্মাননি। তাঁর জন্মের ৭৩২৩ বছর আগে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার, 'এত সঠিক ভাবে বলা কি যায়?'

অবাক হয়ে প্রফেসর বললেন, 'সঠিক কি বেঠিক, আমি তার প্রমাণ। আমি দেখে এসেছি ঠিক ওই তারিখেই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদৃশ্য।'

অবিশ্বাসী গলায় বললাম, 'চোদ্দো বছরের বনবাসে গেল কবে?'

'বেস্পতিবার, খ্রিস্টপূর্ব ৭৩০৬ সালের ২৯ নভেম্বর তারিখে।'

'দশরথ মারা গেল কবে?'

'তার ঠিক ছ'দিন পরে— পাঁচুই ডিসেম্বরের বুধবারে।'

আমার তখন খাবি খাওয়ার অবস্থা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'মহাভারতের সাল-তারিখও জানেন?'

'সব কি আর মনে আছে? বুড়ো বয়েসে ব্রেনের কোষগুলো মরে গিয়ে তো আর জন্মাচ্ছে না।'

'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কবে?'

একটু ভেবে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ষোলই অক্টোবর, রোববার। যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার ৫৫৬১ বছর আগে।' বলেই আমাকে আর প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি বললেন, 'কিন্তু সাল-তারিখের পরীক্ষা দিতে বসলে কাজের কথা যে শিকেয় উঠবে। ডাক্তার ভার্তাক ভুল করেননি— কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখে তবে আমি সেখান থেকে টাইম মেশিন নিয়ে গেছিলাম দণ্ডকারণ্যে।'

'দণ্ডকারণ্যে কেন গেলেন?'

'সেটা আর বলতে দিচ্ছ কই। দণ্ডকারণ্যে গিয়েই তো পেলাম বিশেষ সেই উদ্ভিদ যার নির্যাস থেকে ক্রিস্ট্যাল বানিয়ে প্ল্যান করেছি ভবিষ্যতে টহল দিয়ে আসব।'

'গাছের নির্যাস থেকে টাইম মেশিনের ক্রিস্ট্যাল! বলছেন কী?'

'গতকাল কাগজে পড়লাম, কলকাতার নেভি ফেস্টিভ্যালে এক ভদ্রলোক দু-মিনিটে বত্রিশটা রসগোল্লা খেয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করেছে। তোমার হাঁ-এর সাইজ দেখে মনে হচ্ছে, বিশ্ব-রেকর্ড এবার তুমিও ভঙ্গ করবে।'

টপ্ করে হাঁ বন্ধ করে বললাম, 'দণ্ডকারণ্য কখনও যাইনি। দেখাবেন আমাকে?'

'আমিও তো তাই ভাবছিলাম। আর একটু নির্যাস ওখান থেকে জোগাড় করে আনতে হবে— নইলে আইডিয়া অনুসারে টাইম মেশিনের মডিফিকেশন সম্ভব হবে না।'

মনে পড়ল, মুখখানা চুন করে ঘরে ঢুকেছিলেন প্রফেসর। সে কি দণ্ডকারণ্যে ফের গিয়ে নির্যাস আনবার কথা ভেবেই?

জিজ্ঞেস করলাম। উনি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'ধরেছ ঠিক। বর্তমান যুগের দণ্ডকারণ্যে সে গাছ আর নেই— কাঠুরেরা কেটে সাবাড় করেছে। আমাকে যেতে হবে রামায়ণের যুগে।'

'তা যান।'

আমতা আমতা করে প্রফেসর বললেন, 'বড় বিপজ্জনক জায়গা হে। রাক্ষস-রাক্ষসীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেখানে। গতবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। তাই ভাবছিলাম, এবার তোমায় নিয়ে যাব।'

লাফিয়ে উঠলাম। পরক্ষণেই বসে পড়লাম।

'ওই টুকু মেশিনে যাব কী করে?'

অবাক হলেন প্রফেসর, 'ওইটুকু মেশিন মানে?'

'কাঠের বাক্সের মধ্যে যে মেশিন দেখালেন—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'তুমি একটা আস্ত ইডিয়ট। ওটা তো মডেল।

আসল টাইম মেশিন পাশের ঘরে।'

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে গিয়ে বললাম, 'কোথায়? কোথায়?'

'এসো আমার সঙ্গে।'

৫
স্থির বিদ্যুৎ

গ্রন্থাগার থেকে গেলাম গবেষণাগারে— সরু একটা গলিপথের শেষে। দূর থেকে যে কাচের গম্বুজ ঘরটা দেখে চোখ কপালে তুলে ছিলাম— এই সেই ঘর।

ঘর তো নয়, একটা ইঞ্জিনিয়ারের কারখানা। মাথার ওপরে লোহার বীম থেকে চামড়ার ফিতেয় ঝুলছে ইলেকট্রিক মোটর। শক্তির জোগান যাচ্ছে সেখান থেকে নিচে একটা পেল্লায় বেঞ্চির ওপর রাখা সারি সারি অনেকগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং কলকবজায়— তাদের কয়েকটা চিনতে পারলাম। ধাতু চাঁচাছোলা করার লেদ। পাশেই ধাতুর পাত পিটোনোর একটা স্ট্যাম্প। একাধিক অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং যন্ত্র পড়ে আছে ঘরের এদিকে-সেদিকে। দুটো অতিকায় 'বাইস' অর্থাৎ চেপে ধরার যন্ত্র দেখবার মতো। অজস্র যন্ত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ঘরময়। ঘরের মেঝে ভর্তি ধাতুর কুচি। এক কোণে বাতিল ধাতুর টুকরোটাকরার একটা স্তূপ। আর এক কোণে রাসায়নিক সরঞ্জাম সাজানো এলোমেলো ভাবে। কোথাও বোতলভর্তি কোহল, ফটকিরি আর পারদমিশ্র; কোথাও রসাঞ্জন, কৃষ্ণসীস আর দস্তা-রজ কাচকুপী, মুচি আর কাচীয় পাত্রে রক্ষিত; একপাশে রয়েছে একটা মারুত চুল্লি— বাঁকনল আর বকযন্ত্রের হিসেব নেই দেখলাম— যত্র তত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এ যেন এক পাগলের কারখানা— বৈজ্ঞানিকের খেলাঘর কে বলবে। মাথার ওপর কাচসদৃশ সেই গম্বুজ— বিজাপুরের গোলগম্বুজের মতো প্রকাণ্ড। আকাশ দেখা যাচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে। রাত্রে তারা আর চন্দ্রও দেখা যায়। বাদলার দিনে তো আরও মজা। গায়ে জল পড়বে না কিন্তু বৃষ্টির তলায় বসে থাকা যাবে।

কিন্তু টাইম মেশিনটা কই?

আমার মনের কথা টের পেয়েই যেন প্রফেসর বললেন, 'তোমার পাশে দেখ।'

সচমকে দেখলাম বাতিল মেট্যালের আর একটা স্তূপ মনে করে যেদিকে আর ফিরেও তাকাইনি, সেটা আসলে একটা যন্ত্র। হঠাৎ দেখে বোঝা যায় না, ঠাহর করে বোঝা যায়— গ্রন্থাগারে যে মডেলটা দেখে এসেছিলাম— তার সঙ্গে মিল রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু পেল্লায় বলেই স্থূল আকৃতি নিয়েছে। বিচিত্র সেই কোয়ার্জ পাথর এর সারা গায়ে ফিট করা— রোশনাই ঠিকরে যাচ্ছে পড়ন্ত রোদের আলোয়। ঘরে ঢুকে এই রোশনাইকেই হরেক ধাতুর চেকনাই ভেবে ভুল করেছিলাম। ভুল হওয়াটা যদিও ঠিক হয়নি। কেননা, আশ্চর্য এই ক্রিস্ট্যালের ঝিলমিলে দৃশ্যের সঙ্গে বিশ্বের কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। অদ্ভুত কারখানায় আচম্বিতে প্রবেশ করায় মাথা ঘুরে গিয়েছিল বলেই আসল জিনিসটাকেই বাজে জিনিস

ভেবে বাজে জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম এতক্ষণ।

মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলাম বিশ্বের বৃহত্তম বিস্ময় টাইম মেশিনের দিকে— যে মেশিনের প্রত্যেকটা অংশ ঝকঝক করছে বারবার পালিশ করার ফলে। বৃদ্ধ প্রফেসর যে কী অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, তা ওই চকচকে ঝকঝকে পার্টসগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

লম্বায় সময়-যন্ত্রটা সাত থেকে আটফুট। চওড়ায় ফুট পাঁচেক। মেঝে থেকে প্রায় ছ-ফুট উঁচু। মেটাল ফ্রেমের জন্যেই অত উঁচু মনে হচ্ছে। আসল কলকবজা ফুট তিনেকের বেশি উঁচু নয়।

কাজের পার্টসগুলো সবই দেখা যাচ্ছে— অথচ বর্ণনা করার মতো ভাষা খুঁজে পেলাম না। প্রয়োজনও দেখি না। মডেলের মধ্যে যা যা দেখেছিলাম, এখানেও ঠিক সেইসব যন্ত্রাংশই রয়েছে। যেন একটা প্রহেলিকা। যন্ত্রাংশের গোলকধাঁধা। সব কিছুরই গায়ে ফিট করা আশ্চর্য দ্যুতিময় সেই কোয়ার্জ পাথর— ফলে ঝিকিমিকি প্রভায় অনেকগুলো পার্টস ভালভাবে বোঝাও যাচ্ছে না। চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। হাজার হাজার সূক্ষ্ম তার আর পুঁচকে রড নানান ভাবে পরস্পরসংলগ্ন থাকায় মাথার মধ্যে যেন গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর মাথা ঘুরে গেল। কিছু বুঝলাম না।

বুঝলাম শুধু সময়-যন্ত্র চালনার কন্ট্রোল ব্যবস্থা। চেনা চেনা মনে হল।

মেট্যাল ফ্রেমের প্রান্তে একটা চামড়া-ঢাকা গদি-আসন। মোটর সাইকেলের সিটের মতো দুপাশে গোল করা— লম্বাটে ধাঁচের। তার চারদিক ঘিরে অনেকগুলো লিভার, রড আর ডায়াল।

মেন কন্ট্রোলটা মনে হল একটা বড় সাইজের লিভার— রয়েছে গদির ঠিক সামনে। তার মাথায় লাগানো রয়েছে এমন একটা জিনিস যা এই জটিল কলকবজার পটভূমিকায় নেহাতই বেমানান— একটা সাইকেলের হ্যান্ডল-বার। আন্দাজ করে নিলাম, লিভারটাকে হাতের মুঠোয় কষে চেপে ধরার জন্যেই আজব হ্যান্ডল-বারটাকে ফিট করেছেন প্রফেসর। লিভারের দু-পাশে ডজনখানেক করে ছোট ছোট রড— প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে জয়েন্টে লাগানো— যাতে লিভার নড়লেই প্রতিটা রডে চাপ পড়বে এবং ঘুরবে।

এইসব জটিলতায় নিবিষ্ট হয়ে থাকার ফলে প্রফেসরের অস্তিত্ব মুছে গেছিল মন থেকে। চমকে উঠলাম তাঁর কথায়— বেশ আত্মম্ভরিতার সঙ্গেই বললেন, 'কি হে ছোঁড়া, জমাটি যন্ত্র, তাই না?'

'কদ্দিন লাগল বানাতে?'

'যেদিন আইডিয়াটা মাথায় ঢোকালে, তার পরের দিন থেকেই। পার্টসগুলো নানান লেদমেশিন ফার্ম থেকে করিয়ে এনে ফিনিশ করেছি এখানে— তাই এত তাড়াতাড়ি করতে পারলাম। মেশিনের মূল সূত্রটা জলের মতো সোজা— এত সোজা যে তোমাকে বললেই তাই নিয়ে গল্প ফেঁদে বসবে— আমার সিক্রেট হাটে বাজারে ছড়িয়ে যাবে— তাই তোমাকে বলব না। ওই যে কোয়ার্জ পাথরগুলো দেখছ, ওগুলোই কেবল এখানে বানিয়েছি। উপাদানগুলো কলকাতায় পাওয়া যায়— নাম জিজ্ঞেস কোরো না— বলব না।'

'বলতে আপনাকে হবে না। কিন্তু লোহালক্করের এই মেশিন অতীত আর ভবিষ্যতে পাড়ি দিতে পারে। ভাবতেও অবাক লাগছে।'

আহত কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'লোহালক্কর কি হে, ওর মধ্যে যে সব মেট্যাল আছে, তার মধ্যে এক চিলতে বাজে জিনিস নেই। এ আমার জীবন্ত যন্ত্র— হাত দিলেই বুঝবে।'

'হাত দিলেই বুঝব মানে?'

'হাত দিয়েই দেখ না।'

ভয় হল। মতলব কি বুড়োর? শক-টক লাগবে নাকি? প্রফেসর আমার মুখভাব নিরীক্ষণ করে অভয় দিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু হবে না, এই রডটা কেবল ছুঁয়ে দেখো।'

বলে, আমার হাতটা টেনে নিয়ে ধরিয়ে দিলেন ফ্রেম-সংলগ্ন একটা পেতলের রডে। মুখখানা পেঁচার মতো করে আঙুলগুলো সবে ছুঁইয়েছি, অমনি গোটা মেশিনটা সজীব প্রাণীর মতোই দৃষ্টত এবং স্পষ্টত শিউরে উঠল। ঝট করে আঙুল টেনে নিলাম আমি।

অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল গলা দিয়ে, 'একী!'

'ফিজিক্সে 'অ্যাটেনুয়েশন' বলে একটা শব্দ আছে। জানা আছে?'

আমতা আমতা করে বললেন, 'মনে পড়ছে না।'

'বস্তুর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে শক্তি হ্রাস পায় রেডিয়েশনের ফলে, তাকেই বলে অ্যাটেনুয়েশন। টাইম মেশিন ফোর্থ ডাইমেনশনে রয়েছে বলে তারও এখন অ্যাটেনুয়েশন অবস্থা প্রাপ্তি ঘটেছে। এ মেশিন বাস্তব, কিন্তু বাস্তব জগৎ বলে যে জগৎটাকে চিনি— তার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব নয়— এর অস্তিত্ব ফোর্থ ডাইমেনশনে। বিষয়টা তোমার মাথায় না ঢোকাতে পারলে সময়পথে পর্যটন সুখের হবে না।'

ঢোঁক গিলে বললাম, 'আর একটু স্পষ্ট করবেন?'

করুণামিশ্রিত চাহনি দিয়ে আমাকে নিষিক্ত করে প্রফেসর বললেন, 'সংক্ষেপে এই— টাইম মেশিন তোমার সামনে আমাদের মতোই খাড়া আছে বলে ভেবো না— সে নিষ্ক্রিয়। টাইম মেশিন চলেছে এই মুহূর্তে সময়ের পথ বেয়ে— গড়িয়ে চলেছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।'

'কিন্তু... কিন্তু সময়পথে সময়-যন্ত্র চালু থাকলে আমাদের সামনে খাড়া থাকে কী করে? এও কি সম্ভব?'

'খুব সম্ভব, বৎস, খুবই সম্ভব। টাইম মেশিন খাড়া আছে ঠিকই— কিন্তু সে চলছে, চলবে। এই দিকে দেখো,' বলে যে রুপোর কগ-হুইলটা উনি দেখালেন, তার সূক্ষ্ম সংস্করণ দেখেছি ক্ষুদে মডেলে। 'কগ-হুইল কিন্তু ঘুরছে। দেখতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুরছে বটে।' ঝুঁকে পড়ে বললাম চাপা বিস্ময়ে— খুব বেশি ঝুঁকতেও সাহস হল না— সজীব যন্ত্র আরও কী করে বসে জানি না তো।' স্পষ্ট দেখলাম, বিরাট খাঁজকাটা চাকাটা খুব আস্তে আস্তে আবর্তিত হচ্ছে— এত আস্তে যে ভাল করে ঠাহর না করলে বোঝাও যায় না।

'চাকা যদি না ঘুরত,' কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন প্রফেসর, 'সময়-যন্ত্র তা হলে সময়পথে স্তব্ধ হয়ে যেত। ফলটা কী হত জানো? মেশিনটা তা হলে অতীতে হারিয়ে যেত। কেননা, আমরা তো সময়পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে গড়িয়ে চলেছি— বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি। সময়যন্ত্রকে সেই গতিতেই বেঁধে রাখা হয়েছে। তোমার প্রিয়

ওয়েলস সাহেব কিন্তু এই ব্যাপারটা মাথায় আনতে পারেননি। তাই তাঁর গল্পটা চমকপ্রদ হলেও অবাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

লেখক সম্বন্ধে এ ধরনের কাদাছোঁড়া মন্তব্য হামেশাই প্রফেসরের মুখে শুনি— বিশেষ করে আমার লেখনিকে উনি বংশদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেন যখন তখন। কিন্তু প্রিয় লেখক সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি শুনে গা জ্বলে গেল আমার।

তীব্র গলার বললাম, 'ওয়েলস সাহেব শুনলে কিন্তু দুঃখ পেতেন।'

'তা পেয়েছেন।'

'তার মানে?' ধোঁকা লাগল বৃদ্ধের বক্র কণ্ঠস্বরে।

'মানে অতি সোজা। আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে বলে এসেছি বাচ্চাদের মাথা খাওয়ার জন্য এইসব ছাইপাঁশ লেখা তাঁর উচিত হয়নি।'

'কিন্তু...কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন।'

'গেলেই বা। যখন বেঁচেছিলেন, সেই অতীতে গিয়ে তাঁকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে এলাম।'

মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল আমার, 'এখান থেকে ইংল্যান্ডে চলে গেলেন?'

'যাবোই তো। এই ব্যাপারেও তো টেক্কা মেরেছি তোমার ওয়েলস সাহেবকে। তাঁর আজব সময়যন্ত্র এক জায়গাতেই থাকত। নড়ার ক্ষমতা ছিল না বলেই তো মর্লকদের খপ্পরে পড়েছিলেন তাঁর সময়-পর্যটক মশায়। কিন্তু আমার যন্ত্র শুধু সময়পথে নয়, স্থানপথেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে। কলকাতা থেকে ইংল্যান্ড তো সামান্য কথা, দরকার হলে মঙ্গলগ্রহ-শনিগ্রহেও ঘুরে আসতে পারে।'

নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। প্রফেসর উন্মাদ নন— বেখাপ্পা আচার-আচরণ দেখে তাই মনে হয় অবশ্য। আসলে তিনি খেয়ালি। খেয়াল-খেলা নিয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করে থাকেন। কিন্তু এই খেয়াল-খেলা খেলতে বসেই তিনি যে যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসে আছেন, তা ভাবতেও মাথা ঘুরে গেল আমার, বিস্ময় শ্রদ্ধায় মূক হয়ে গেলাম।

বাইরে তখন সূর্য ডুবছে। রক্তলাল অস্তাচলের কিরণ অজস্র অদ্ভুত বর্ণে অপরূপ করে তুলেছে সময়যন্ত্রকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি চেয়ে রইলাম সেদিকে। চোখের কোণ দিয়ে বুঝলাম, প্রফেসরও সস্নেহে চেয়ে আছেন সন্তানসম সময়যন্ত্রের দিকে।

সময়যন্ত্রের ঝলমলে রূপটা হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে এল। লাল পশ্চিমাকাশের লোহিত কিরণবর্ষণ যেন সহসা হ্রাস পেল। অজ্ঞাতসারেই চোখ তুললাম আকাশের দিকে। দেখলাম, একতাল কালো মেঘ ঢেকে ফেলেছে লাল আকাশকে। কালো বললাম বটে, কিন্তু এ যেন তার চাইতেও নিবিড়। এত মিশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ কখনও দেখিনি। মেঘের যে এরকম চেহারা হয়, তাও কখনও দেখিনি। মেঘ তো নয়, যেন অতিকায় একটা তমিস্রাপিণ্ড ভাসছে রক্তলাল আকাশ আর মর্তের মাঝে। অরুণকিরণ শুষে নিচ্ছে নিঃশেষে।

খুটখাট আওয়াজে সম্বিৎ ফিরল। প্রফেসর উঠে বসেছেন সময়যন্ত্রের গদি-আসনে। আমি তাকাতেই ফিক করে হাসে বললেন, 'চলো, ঘুরে আসি একপাক।' এমনভাবে বললেন যেন ট্রায়াল দিতে ময়দানে যাচ্ছেন।

বিদঘুটে মেঘের কথা বিস্মৃত হয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে উঠে পড়লাম সময়যন্ত্রে। আজও মনে আছে, ধাতুর ফ্রেমে পা দিয়ে হাত দিয়ে ফ্রেম চেপে ধরতেই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। প্রতিটি অণুপরমাণুতে বিচিত্র শিহরন আমার মগজের কোষে কোষে একটা ধাক্কা দিয়ে গেছিল।

কিন্তু সে অনুভূতি ক্ষণেকের। পরমুহূর্তেই লাফিয়ে গিয়ে বসলাম বিজ্ঞানপাগল বৃদ্ধের পাশে।

ঠিক সেই সময়ে মাথার ওপর থেকে একটা বিদ্যুৎ নেমে এসে স্পর্শ করে রইল প্রফেসরের করোটি। বিদ্যুৎচমক কথাটাই সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যুতের চক্ষের পলকে আবির্ভূত হয়েই মিলিয়ে যাওয়া থেকে। বিদ্যুৎ আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসে সহসা, মিলিয়েও যায় তৎক্ষণাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ লকলকে শুঁড় মেলে স্পর্শ করে রইল প্রফেসরের ব্রহ্মতালু। বেশ কয়েক সেকেন্ড।

প্রফেসর টের পাননি। উনি একহাতে হ্যান্ডল-বার খামচে ধরে, আর এক হাতে খুটখাট করে সুইচ টিপছিলেন, লিভারে চাপ দিচ্ছিলেন। আশ্চর্য বিদ্যুৎ শিখার উৎস অন্বেষণ করতে আমি তাই আকাশ পানে চাইলাম।

পিণ্ডাকারে নিরন্ধ্র তমাল কালো মেঘ পুঞ্জ ভেদ করে এঁকেবেঁকে বিদ্যুৎ শিখা নেমে আসছে... আসছে... আসছে! স্পর্শ করে রয়েছে প্রফেসরের ব্রহ্মতালু। তারপর, আমার চোখের সামনেই মিলিয়ে গেল বিদ্যুৎ শিখা।

চোখ নামিয়ে দেখলাম, প্রফেসরের মাথা ঘিরে বলয়াকারে দ্যুতিমান সেই বিদ্যুৎ শিখা। আংটির মতো ঘিরে রয়েছে কপালের ওপর দিয়ে। বহু ছবিতে দেখেছি এই দৃশ্য। বড় সাধকদের মাথা ঘিরে জ্যোতির ছটা। ইংরেজিতে যাকে বলে 'হ্যালো'। কিন্তু সে জ্যোতির রং শুভ্র। আর চোখের সামনে দীপ্যমান এই জ্যোতি অশুভ রঙের— গাঢ় নীল— ঈষৎ কালচে। শক্তির বিস্ফোরণ ঘটছে যেন তার মুহুর্মুহু। কেঁপে কেঁপে উঠছে এবং চক্রাকারে পাক খাচ্ছে কপালের ওপর দিয়ে।

'প্রফেসর!' ভাঙা গলায় বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি। প্রফেসর সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'ভয় পেও না। এখুনি যাত্রা হবে শুরু।'

আমি প্রফেসরকে ধাক্কা মারতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিলাম। হঠাৎ সেই অশুভ অপার্থিব বর্ণের বিদ্যুৎ বলয় প্রফেসরের সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। আপাদমস্তক মণ্ডিত করে থির থির করে কাঁপতে লাগল। কালচে নীলাভ অগ্নিচ্ছটায় প্রফেসর ছেয়ে গেলেন।

উসখুস করে উঠলেন প্রফেসর। অন্যমনস্ক ভাবে বললেন নিজের মনেই— 'মাথাটা টিপ টিপ করে কেন?' বলে, কীরকম অদ্ভুত চোখে তাকালেন আমার দিকে। তাঁর দুচোখের মধ্যেও দেখলাম নেই ঘন কালচে-নীলাভ বিদ্যুতের স্ফুরণ। অপার্থিব সেই চাহনি প্রফেসরের চোখে অন্তত কখনও দেখিনি।

বার কয়েক মাথা ঝাঁকালেন। আমার তখন চেঁচাবার শক্তিও লোপ পেয়েছে। তারপরেই কথা নেই বার্তা নেই, টিপ করে কন্ট্রোলের ওপর মাথা ঠুকে পড়ে গেলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। আর নড়লেন না।

তার আগেই নিশ্চয় মেশিন চালিয়ে দিয়েছিলেন। টিপ করে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ঠোকায় এবং হাতের বেমক্কা ধাক্কায় অন্যান্য কলকবজাও নিশ্চয় চালু হয়ে গেছিল।

আমার অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য এবং অবিস্মরণীয় অ্যাডভেঞ্চার পর্বের শুরু হল তৎক্ষণাৎ।

৬
সময়-গাড়ির ব্যায়রাম

গোটা টাইম মেশিনটা আচম্বিতে সামনের দিকে টলে পড়ল। মনে হল যেন পাতালগহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। প্রফেসরকে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললাম, 'প্রফেসর! প্রফেসর!' প্রফেসর নিস্পন্দ হয়ে রইলেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘিরে থাকা বিদ্যুৎমন্ডলটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল বললে সঠিক বলা হবে না, কালচে-নীল বর্ণচ্ছটা যেন তাল গোল পাকিয়ে গুটিয়ে যেতে লাগল। তারপর আতঙ্ক আমার চরমে উঠল যখন দেখলাম, মহাশূন্যের বিস্ময় তাঁর ভেতরেই প্রবেশ করছে। দ্রুত হতে দ্রুততর হচ্ছে ঢুকে যাওয়ার গতিবেগ। হু হু করে সমস্ত ছটা যেন তাঁর প্রতিটি লোমকূপের মধ্যে দিয়ে উধাও হল শরীরের অভ্যন্তরে।

চোখের ওপর ঝিকিমিকি আঘাতে ফিরে তাকালাম ল্যাবরেটরির দিকে। সবিস্ময়ে দেখলাম, সময়যন্ত্র তখনও খাড়া বীক্ষণাগারে। দৃঢ় অবস্থানে তিলমাত্র বিচ্যুতি ঘটেনি। বেঞ্চির ওপর রাখা বড় ঘড়িটার কাঁটা দুটো উন্মাদের মতো সামনের দিকে ঘুরে চলেছে। গম্বুজঘরের পেছন দিক থেকে সূর্য উঠে এসে মাথার ওপর দিয়ে দ্রুত চলে গেল সামনের দিকে। আমার দৃষ্টি তার গতিপথ অনুসরণ করার আগেই আবার অন্ধকার আবির্ভূত হল এবং গাঢ় আঁধারে ঢেকে গেল গম্বুজ গৃহ।

ভয়ে বিস্ময়ে অবশ হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্ক সক্রিয় ছিল। তাই বুঝলাম, ফোর্থ ডাইমেনশনে এসে পড়েছি। ছুটে চলেছি সময়পথে— প্রফেসর এই অবস্থাকেই বলেছিলেন অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশন। সীমাহীন নৈঃশব্দ্যে থমথমে সেই চার-মাত্রিক জগতের বর্ণনা দেওয়ায় ভাষা আমার ভাণ্ডারে নেই।

সূর্য আবার উঠল। অস্তমিত হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী অন্ধকারের সময় হল সংক্ষিপ্ততর। তারপরের দিবালোক হল আরও সংক্ষিপ্ত। ভবিষ্যতের গর্ভে ধেয়ে চলেছে টাইম মেশিন!

দিন এবং রাতের শোভাযাত্রা পরম্পরা স্থায়ী হল মাত্র কয়েক সেকেন্ড ব্যাপী। অবশেষে সেকেন্ডে সেকেন্ডে এল দিন, এল রাত। তারপর এত দ্রুত হল পরম্পরা যে চোখ দিয়ে ঠাহর করতেও আর পারলাম না। ধূসর গোধূলির মতোই জাগ্রত রইল কেবল পরিপার্শ্ব। আবছা হয়ে এল চারপাশের বীক্ষণাগার। সূর্যের গতিপথ শুধু একটা স্থির আলোকবর্ত্ম হয়ে ফুটে রইল গাঢ় নীল আকাশের বুকে।

প্রফেসর তো নড়বার নাম করেন না। বেঁচে আছেন তো? হেঁট হয়ে বুকে কান পাতলাম। চোখের পাতা টেনে দেখলাম। চক্ষুতারকা কপালের ভেতরে প্রায় ঢুকে রয়েছে বললেই চলে। কিন্তু বেঁচে আছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

টাইম মেশিন ছুটে চলেছে সময়ের পথে। কোথায় চলেছে? সুদূর ভবিষ্যতের কোন অধ্যায়ে আবির্ভূত হতে চলেছে? ডায়ালগুলোর দিকে তাকালাম। সমুজ্জ্বল ডায়ালের পর ডায়ালে সাল-তারিখ-সময়-গতিবেগ এবং বিস্তর অজানা বিষয় লেখা। একটা ডায়াল দেখলাম বছরের হিসাবে। কাঁটাটা বোধহয় হাতির দাঁতে তৈরি। প্লাস্টিক অমন সুন্দর হয় না। কাঁটাটা থিরথির করে কাঁপছে ২৭৩২ সালের ঘরে!

২৭৩২ সালে পৌঁছেছি তা হলে। কিন্তু বিচিত্র বিদ্যুতাহত প্রফেসরকে নিয়ে দূরভবিষ্যতের পৃথিবীতে পৌঁছে কি সুবিধে করতে পারব? তার চাইতে নিজেই চেষ্টা করি না কেন টাইম মেশিন চালিয়ে ১৯৮১-তে ফিরে আসার? চালাতে গিয়ে নতুন বিভ্রাট যদি ঘটে?

দোনামোনায় পড়লাম। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে পেছনে অগুনতি ডায়ালগুলো লক্ষ করলাম। প্রত্যেকটা ডায়ালের তলায় দেখলাম একটা করে ধাতুর ছোট্ট নব। দুহাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল-বারের মতো কন্ট্রোল চেপে ধরলাম প্রথমে, তারপর সাল-লেখা ডায়ালের নবটা ধরে টানাটানি করতে গিয়ে দেখলাম নব অনড়।

সাল-লেখা পাশের আর একটা ডায়ালের ওপর কাঁটা এতবেগে ঘুরছে যে দেখাই যাচ্ছে না— যেন ফুলস্পিডে টেবিল ফ্যান ঘুরছে। এর তলায় ফিট করা নবটা ধরে টানাটানি করলাম— নড়াতে পারলাম না।

জেদ চেপে গেল। হ্যান্ডল-বার ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে দুটো নব ধরে হ্যাঁচকা টান মারলাম।

আচম্বিতে সময়যন্ত্র প্রচণ্ড দুলে উঠল। পরক্ষণেই যেন ডিগবাজি খেল পরপর কয়েকবার। আমি ধড়াম করে আছড়ে পড়লাম কন্ট্রোলের ওপর। পা দিয়ে সামলাতে গিয়ে বুটের ঠোক্কর লাগল পায়ের কাছে একটা নিকেল রডে— মূল লিভারের সঙ্গে লাগানো ছিল লিভারটা। চোখের পলক ফেলার আগেই টাইম মেশিন একপাশে হেলে পড়ে যেন তলিয়ে গেল নিতল খাদের মধ্যে। অন্ধকার নামল আমার চোখের পাতায়।

না, আমি জ্ঞান হারাইনি। কিন্তু ঘূর্ণিরোগে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। মাথার প্রতিটি কোষে একযোগে যেন জগঝম্প বেজে উঠল, উন্মাদ তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেল। আস্তে আস্তে কাটল চোখের আঁধার।

কিন্তু ল্যাবরেটরি আর দেখতে পেলাম না। অদৃশ্য হয়ে গেছে। দিবস ও রজনীর শোভাযাত্রাও স্থগিত হয়েছে। আমি রয়েছি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এবং নিটোল নীরবতার মধ্যে।

ঘূর্ণিরোগ আর নেই, কিন্তু অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করলাম, ডাইনে-বাঁয়ে দুলছি। অর্থাৎ সময়পথে সময়যন্ত্রের উন্মাদ গতি রয়েছে অব্যাহত। দুলুনিটা মোটেই সুখপ্রদ নয়। অসহ্য। যা থাকে কপালে বলে দুহাতে আবার হ্যান্ডল-বার চেপে ধরে সাইকেলের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার মতোই টাইম দুলুনি বন্ধ করতে গেলাম।

ফল হল উলটো। নতুন গতিবেগের মধ্যে ঠিকরে গেলাম। অত্যন্ত জটিল উলটে উলটে পড়ার গতিবেগ। সেইসঙ্গে তীব্রতর হল ডাইনে-বাঁয়ে দুলুনি।

হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, সময়যন্ত্র সত্যিই যেন জীবন্ত প্রাণী। তার ইচ্ছায় বাদ সাধবার ক্ষমতা আমার নেই। ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতোই ছুটছে সে— আটকানোর ক্ষমতা আমার নেই। এ ক্ষমতা আছে কেবল প্রফেসরের— কিন্তু তিনি কি জীবিত?

পায়ের ঠোক্করে যে নিকেল রডটা এই অবস্থায় এনে ফেলেছে সময়যন্ত্রকে, হেঁট হয়ে সেটা খুঁজতে যাচ্ছি, এমন সময়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন প্রফেসর।

ইচ্ছে হল আনন্দে নৃত্য করে উঠি। পরক্ষণেই সংশয়াচ্ছন্ন হলাম। সংজ্ঞালোপের আগে প্রফেসরের চক্ষুতারকায় যে নীলাভ স্ফুরণ দেখেছিলাম, যে অপার্থিব চাহনি লক্ষ করেছিলাম, এখন আর তা নেই বটে, কিন্তু সেই চিরপরিচিত চাহনিও নেই। উনি একান্ত অপরিচিতের মতো চেয়ে আছেন আমার দিকে।

'প্রফেসর... প্রফেসর... আমি দীননাথ।'

প্রফেসরের দু'-চোখ ঈষৎ কুঞ্চিত হল। ললাট ভাঁজ খেয়ে গেল। যেন ভাবছেন। চেনবার চেষ্টা করছেন।

'প্রফেসর... আমি দীননাথ...দীননাথ।'

সহসা উজ্জ্বল হল দৃষ্টি। স্খলিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর— 'দী... দী—'

'দীননাথ।'

'দীননাথ,' বলার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে এল যেন প্রফেসরের, অপসৃত হল মস্তিষ্কের ধোঁয়া। স্পষ্ট চাহনি মেলে স্পষ্টতর কণ্ঠে বললেন, 'কী হয়েছে?'

আনন্দে চোখে প্রায় জল এসে গেল আমার। গলা বুজে গেল। প্রফেসর আমাকে চিনতে পেরেছেন। মহাশূন্যের অপার্থিব বিদ্যুৎশিখা তাঁর চেতনা হরণ করতে পারেনি, যদিও সেই বেল্লিক বিদ্যুৎ এখনও তাঁর শরীর আশ্রয় করে আছে নিশ্চয়।

সংক্ষেপে, ছোট্ট ছোট্ট কথায়, বিবৃত করলাম আনুপূর্বিক ঘটনাবৃত্তান্ত। পরম্পরাক্রমে বলে গেলাম বদমাশ বিদ্যুতের আবির্ভাব থেকে শুরু করে বর্তমান বেয়াড়া অবস্থা পর্যন্ত। ওঁর ললাট এবং চক্ষুকুঞ্চন অব্যাহত রইল। একটি কথাও বললেন না। হেঁট হয়ে হাতড়ে হাতড়ে ফুটবোর্ড থেকে একটা ভাঙা নিকেলের ডান্ডা তুলে এনে বললেন, 'লাথি মেরে শেষকালে ভাঙলে, ছোকরা।'

ছোকরা কেন, সেই মুহূর্তে উনি আমাকে ওঁর নিজস্ব আভিধানিকবিশেষ বিশেষণমালায় ভূষিত করলেও হর্ষে রোমাঞ্চিত হতাম, উল্লাসে নৃত্য করতাম। উনি ওঁর সহজ অবস্থা ফিরে পেয়েছেন, এইটাই আমার বড় পাওয়া— গালাগাল নয়।

হাসিমুখে তাই বললাম, 'হ্যাঁ, ভেঙেছি।' ভাবখানা, আরও একটু বকুন তা হলেই ভয় ভাঙবে আমার।

উনি কিন্তু ততক্ষণে মেশিন নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছেন। অশুভ বিদ্যুৎ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখালেন না— এ-ডায়াল সে-ডায়াল দেখতে লাগলেন, এ-নব সে-নব নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

তারপর বললেন, 'মূর্খ।'

খুব খুশি হলাম আমি।

উনি ফের বললেন, 'ইডিয়ট।'

আরও খুশি হলাম আমি।

উনি আবার বললেন, 'গবেট।'

আনন্দে প্রাণটা জল হয়ে গেল। বললাম, 'খামোকা গালাগাল দিচ্ছেন কেন?'

'খামোকা? বোকচন্দর, টাইম মেশিন সাল-তারিখ বাঁধা হয়ে একবার ছুটে চললে আর তাকে ফেরানো যায়? সে নিজেই থামবে। মাঝপথে তাকে থামাতে গেলেই বিপত্তি তো ঘটবেই।'

'আপনিই তো খামোকা অজ্ঞান হয়ে গেলেন।'

'সে প্রশ্নে পরে আসছি।'

'সেই প্রশ্নটারই আগে সমাধান হোক।'

'বলছি না পরে কথা হবে?' খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর। আমি কিন্তু বড়ই পুলকিত হলাম। আহা, প্রফেসরের মাড়ি-খিঁচুনি যে এত মধুর, তা এই ফোর্থ-ডাইমেনশন্যাল ট্র্যাভেলে এসে না পড়লে কি কখনও এমনভাবে উপলব্ধি করতাম?

গজগজ করতে করতে লাগলেন প্রফেসর, 'ভাগ্যিস মেশিনের বাইরে ছিটকে যাওনি— যতক্ষণ ভেতরে আছো, কোনও ক্ষতি নেই।'

'কিন্তু ধাক্কা লাগতে পারে তো?'

'না, লাগবে না। ফুঁড়ে বেরিয়ে যাব। অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে আছি যে।'

'কিন্তু কেন এমন হল জানতে পারি?'

'নিশ্চয় পারো, তোমার মতো আকাট মূর্খের তা জানা দরকার বই কি। যে নিকেল রডটা তুমি লাথি মেরে ভেঙেছো, তার কাজ স্থানের মধ্যে দিয়ে টাইম মেশিনকে নিয়ে যাওয়া। তুমি তাকেই ভেঙে আমাদের এনে ফেলেছ স্থান-মাত্রায়— কলকাতা থেকে প্রচণ্ড বেগে সরে যাচ্ছি তাই।'

শুনে কিন্তু আর পুলকিত বোধ করলাম না। বিশেষ করে হতচ্ছাড়া মেশিনটার সমানে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে ঝাঁকুনির ফলে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত মনে হচ্ছিল উগড়ে দিতে হবে যে কোনও মুহূর্তে।

প্রফেসরের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এ হেন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিও উনি যেন সমস্ত সত্তা দিয়ে উপভোগ করছেন মনে হল। যেন জেট বিমানে চেপে আকাশবিহারে বেরিয়েছেন, ভাবখানা সেই রকম। সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে দুলছেন আর নিশ্চিন্ত মনে কথা বলে যাচ্ছেন। অথচ যে কোনও মুহূর্তে প্রলয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। ভাবতেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল আমার।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে বলুন আপনার সাধের খোকা থামবে কোন চুলোয়? কবে? কোন সালে?'

কথাটা বোধ করি কানে ঢুকল না প্রফেসরের। বললেন, 'কোনও ভয় নেই। পাগলের

মতো মেশিন ছুটছে বটে, কিন্তু আর কিছু গোলমাল ঘটেনি। কন্ট্রোলে হাত দিয়েই তুমি ওকে খেপিয়ে দিয়েছ। আর কখনও হাত দিয়ো না।'

বয়ে গেছে আমার হাত দিতে, মনে মনে বললাম আমি।

উনি বললেন, 'স্থানের মধ্যে দিয়ে ছুটছি যখন, এক সময় গাড়ি থামবেই। হাজার খানেক মাইল দূরে এলেও থামবে। তখন ফিরে যাওয়া যাবে। কিন্তু তখন যেন টপ করে গাড়ি থেমে নেমে পোড়ো না।'

'কেন?'

'অটোমেটিক রিটার্ন চালু হয়ে গেছে।'

'সেটা আবার কী?'

'আগে থেকেই যদি মেশিন 'সেট' করে দেওয়া যায়, তা হলে গন্তব্যস্থানে আর সময়ে পৌঁছে আপনা থেকেই আবার শুরু হওয়ার স্থান আর সময়ে পৌঁছে যেতে পারে টাইম মেশিন— মানে ১৯৮১ সালের ল্যাবরেটরিতে। রডটা ভাঙবার আগে আর কিছুতে হাত দিয়েছিলে?'

আমতা আমতা করে বললাম, 'তা দিয়েছিলাম।'

'উদ্ধার করেছ তা হলে,' আবার সেই দাঁত, থুড়ি, মাড়ি-খিঁচুনি দর্শন করলাম— এবার কিন্তু পুলকিত হতে পারলাম না— ভয় পেলাম। দরকার নেই বাবা সময়-গাড়ি থেকে নেমে। বিদেশে বিসময়ে পড়ে প্রাণটা হারাতে কে চায়।

ভাঙা নিকেল রডটা নিয়ে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছিলেন প্রফেসর। কিছুক্ষণ খুটখাট করে সিধে হয়ে বসে বললেন, 'ভাঙেনি— প্যাঁচ খুলে গেছিল।'

'প্যাঁচে লেগেছে?' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম।

'মনে তো হয়। ঠিকভাবে প্যাঁচ কাটা হয়নি বলেই বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। নইলে নির্ঘাৎ ভাঙত— যা গোদা পায়ের লাথি। এ মেশিনে তোমাকে পা দিতে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে।'

মেশিন তখনও টলমল করছে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে জাহাজ যেমন আছাড়িপিছাড়ি খায়, ঠিক সেইভাবে। কিন্তু আগের চাইতে কম। অত্যুজ্জ্বল কতকগুলো আলোকবিন্দুর সঞ্চরণ দেখা যাচ্ছে— যদিও খুব অস্পষ্ট। চোখ পাকিয়ে দেখতে হচ্ছে। বিন্দুগুলো তীব্র দ্যুতিসম্পন্ন— চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রফেসর কি শেষ পর্যন্ত সময় গাড়ির ব্যায়রাম নিরাময় করতে পারলেন? সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল না।

আমার ঠিক সামনেই ফ্লাই-হুইলটা তখনও আবর্তিত হচ্ছে দ্রুতবেগে। কিন্তু দিবস রজনীর শোভাযাত্রা পরম্পরার সেই পূর্বাবস্থা ফিরে আসেনি।

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললাম, 'পরিস্থিতি এখন অনেকটা নিরাপদ মনে হচ্ছে।' মুখে বললেও মন কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইল না।

প্রফেসর বললেন, 'সময়-গাড়ি এখুনি হল্ট করবে। ছটফট না করে চুপটি করে বসে থেকো। অটোমেটিক রিটার্ন চালু আছে তো, তিন মিনিট পরেই টাইম মেশিন নিজে থেকেই ফিরে যাবে ১৯৮১-র কলকাতায়।'

প্রাণটা নেচে উঠল ময়ূরের মতো পেখম মেলে— 'মাত্র তিন মিনিট?'

জবাবে প্রফেসর যা বললেন, শুনে পেখম গুটিয়ে নেতিয়ে পড়ল মনময়ূর— মুখ শুকিয়ে গেল আমার— 'অটোমেটিক রিটার্ন যদি বিগড়ে গিয়ে না থাকে, তা হলেই তিন মিনিট। নইলে যে কত মিনিট, তা আমিও বলতে পারব না।'

একি গেরোয় পড়লাম রে বাবা? অনন্তকাল টাইম মেশিনে বসে থাকতে হবে নাকি? যদি আর না ফেরে?

অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার টলমল করে উঠল সময়যন্ত্র। আমি তো বটেই, প্রফেসর অঁক করে দমবন্ধ করে ফেললেন। নিরুদ্ধ নিশ্বাস দুজনেরই। দেখলাম, সামনের ফ্লাই হুইল স্থির হয়ে আসছে।

ইন্সট্রুমেন্ট রিডিং দেখতে লাগলেন প্রফেসর ক্ষিপ্তের মতো।

জ্বরগ্রস্ত রুগীর মতো আমিও চিৎকার করে উঠলাম অস্থির মস্তিষ্কে, 'প্রফেসর— কোথায় এলাম বলুন।'

'পৃথিবীর সৌরজগতের কিনারায়— শনিগ্রহের কাছাকাছি... প্রায় ৫০০০ খ্রিস্টাব্দে।' চোখে চোখ রেখে বললেন অস্বাভাবিক ধীর মৃদু স্বরে, 'দীননাথ ৫০০০ খ্রিস্টাব্দের শনিগ্রহে নামতে চলেছি আমরা।'

৭
সৌরজগতের কিনারায়

৫০০০ খ্রিস্টাব্দের শনিগ্রহ!

হতভম্ব হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ! বলেন কি প্রফেসর! ৫০০০ খ্রিস্টাব্দের শনিগ্রহে নামতে চলেছে সময়গাড়ি! আরে বাবা ১৯৮১ সালেই শনিগ্রহ সম্বন্ধে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা যে জ্ঞানসংগ্রহ করেছিলেন, তা এতই ভাসাভাসা এবং অসম্পূর্ণ যে নিজেরাই লজ্জিত ছিলেন। ৫০০০ সালে না জানি কী দেখব সেখানে।

আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ। কেতাব-টেতাব পড়ে শনিগ্রহ সম্বন্ধে যা জানি, তা আরও অস্পষ্ট। শনিগ্রহ নাকি একটা অতিকায় গ্রহ। গ্যাসের একটা প্রকাণ্ড গোলক। পৃথিবী নামক গোলাটা মহাশূন্যে যতখানি স্থান জুড়ে রয়েছে তার সাড়ে সাতশো গুণ জায়গা জুড়ে রয়েছে একা শনিগ্রহ। অগণিত বরফ কনকনে কণিকা গঠিত সুবিখ্যাত 'আংটি' থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে নিষ্প্রভ সূর্যালোক। আংটি ছাড়াও শনিগ্রহ প্রখ্যাত তার অনেকগুলি চন্দ্রের জন্যে। মোট দশটা চাঁদ আছে। তাদের মধ্যে বৃহত্তমটির নাম টাইটান। টাইটান শুধু যে শনিগ্রহের সবচেয়ে বড় চাঁদ, তা নয়— তামাম সৌরপরিবারে তার চেয়ে বিপুলকায় চন্দ্রদেব আর নেই। বৃহত্তম উপগ্রহ বলা যায় এককথায়। বুধগ্রহের চাইতেও বৃহৎ এই টাইটানের নিজস্ব মেঘবৎ বায়ুমণ্ডল আছে— যার মূল উপাদান হাইড্রোজেন আর মিথেন গ্যাস।

টাইটান... চিররহস্যময় টাইটান আমার মন দখল করেছিল বলেই প্রফেসরের অস্তিত্ব

পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলাম। সহসা সম্বিৎ ফিরল কালচে নীলাভ বিদ্যুতের ঝলকে। অপার্থিব সেই বিদ্যুৎ ঝলক পৃথিবীর বুকে প্রথম দেখেছিলাম আকাশের মেঘ থেকে এঁকেবেঁকে নেমে এসে প্রফেসরের করোটি স্পর্শ করে থাকতে।

চোখের কোণ দিয়ে হঠাৎ সেই বিদ্যুৎঝলকের পুনরাবির্ভাব দেখে সচমকে চোখ তুললাম উৎসসন্ধানে। এবং পাথর হয়ে গেলাম।

প্রফেসর... প্রফেসর নাটবল্টু চক্র... আমার একান্ত আপনজন, আমার পরম সুহৃদ, আমার পিতৃপ্রতিম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র স্থির নয়নে অবলোকন করছেন আমাকে। চোখের পাতা সম্পূর্ণ খুলে গেছে। চক্ষুতারকা বিস্ফারিত। সম্পূর্ণ চাহনি নিবদ্ধ আমার ওপর।

কিন্তু সেকী চাহনি। সাগরের নিতলতা, মহাশূন্যের রহস্যময়তা দিয়েও পরিমাপ করা যায় না দুর্জ্ঞেয় সেই চাহনির। স্থির, নির্ভাষ সেই চাহনির মধ্যে পার্থিব ছাপ তিরোহিত হয়েছে পুরোপুরি— পৃথিবীর কোনও মানুষ, কোনও না-মানুষের চোখে এহেন চাহনি দেখা যায় না। অমানুষ, অতিমানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণীর চোখেও এ জাতীয় চাহনি কল্পনা করা দুষ্কর। আমার চিরপরিচিত প্রফেসরের চোখে একান্ত অপরিচিত সেই চাহনি লক্ষ করে থ হয়ে গেলাম আমি।

সেই সঙ্গে অসাড় হয়ে এল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। না, চাহনি-নিক্ষিপ্ত সম্মোহনী শক্তির প্রসাদে নয়— ভয়ে। অপরিসীম আতঙ্কে, নিঃসীম বিভীষিকায় আমার প্রতিটি স্নায়ুকোষ, প্রতিটি পেশিকোষ যেন সাময়িকভাবে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল। কেন না...

অপার্থিব সেই বিদ্যুৎলহরী এবারে এঁকে বেঁকে ধেয়ে আসছে প্রফেসরের ললাটকেন্দ্র থেকে। যে বিদ্যুৎদাম মণ্ডলাকারে ঘিরে ধরেছিল প্রফেসরের সর্বদেহ ১৯৮১ সালের পৃথিবীতে, যা আমার চোখের সামনেই লক্ষ সর্পের মতো, অযুত ঘূর্ণির মতো পাক খেতে খেতে দ্রুত বিলীন হয়েছিল প্রফেসরের শরীর অভ্যন্তরে— অলৌকিক সেই বিজলিরেখাই এবার লকলকিয়ে স্পার্ক দিচ্ছে প্রফেসরের কপালের ঠিক মাঝখানে। শরীরের মধ্যে আশ্রিত অশুভ তড়িৎপুঞ্জ যেন এবার পুষ্ট এবং লালিত হয়ে দ্বিগুণ তেজে নির্গত হচ্ছে কপাল ফুঁড়ে। এবং...

ধেয়ে আসছে আমার ললাট লক্ষ করে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার ললাটই কৃষ্ণাভ নীলাভ এই তড়িৎরেখার লক্ষ্যস্থল। লকলকে স্থির বিদ্যুৎ ঝলসে ঝলসে উঠছে আমার কপাল স্পর্শ করে। কিন্তু বিদ্যুতের আঁচ অনুভব করছি না... কোনও ভাবান্তরও ঘটছে না... শুধু বিস্মিত, ভীত এবং অবশ হয়ে গেছি চিরপরিচিত প্রফেসরের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ করে। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছি, ইনি আমার চেনা প্রফেসর নন— তাঁর দেহ আশ্রিত আর একটা সত্তা নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এবং আমাকে কবজায় আনার চেষ্টা করছে বিদ্যুৎজালে জর্জরিত করে।

ঠিক সেই সময়ে আচম্বিতে ভয়ানকভাবে টলমল করে উঠেই পরপর কয়েকটা ডিগবাজি খেল সময়গাড়ি। আমি ছিটকে গেলাম আচমকা সংঘাতে এবং মাথায় প্রচণ্ড চোট পেয়ে সংজ্ঞা হারালাম।

প্রথম জ্ঞান ফিরল আমার।

চোখ মেলে দেখলাম আমি শুয়ে আছি একটা অদ্ভুতদর্শন ঘরে। ঘর বলতে আমরা বুঝি চারটে দেওয়াল থাকবে, একটা মেঝে আর একটা সিলিং থাকবে। কিন্তু এই ঘরের সঙ্গে আমার সেই ধারণার কোনও মিল নেই। মেঝে একটা আছে, যে মেঝেতে শুয়ে আছি আমি, একমাত্র সেই মেঝেটাই যা চ্যাটালো। কিন্তু চার দেওয়ালের পরিবর্তে বহু দেওয়াল এবং সবগুলো দেওয়ালই বিভিন্ন কোণে বাঁক নিতে নিতে সিলিং বানিয়ে ফেলেছে। গম্বুজ নয়, ঘর নয়— মাঝামাঝি। একখণ্ড কাটাই হিরের ভেতরটা যদি ফোঁপরা হত, তা হলে যে রকম দেখতে হত, এ যেন ঠিক তাই। দেওয়াল, মেঝে, ছাত— সবই শুভ্র নরমদ্যুতি সম্পন্ন কোনও ধাতু দিয়ে নির্মিত। বহু দেওয়ালের প্রতিটির সঙ্গে সাঁটা রকমারি যন্ত্রপাতি— মায় বহু কোণওয়ালা ছাতেও। তারামণ্ডলের প্রোজেকটর যারা দেখেছে, তারা অদ্ভুত মেশিনে ভর্তি এই ঘরটায় খানিকটা ধারণা মনে মনে গড়ে নিতে পারবে।

আশ্চর্য এই ঘর নেহাত ছোট নয়— তারামণ্ডলের হলঘরের মতোই প্রকাণ্ড। অতবড় ঘরের কোথাও কোনও আলো নেই, অথচ ঘরটা নরম আলোয় উদ্ভাসিত। ভাল করে ঠাহর করতে গিয়ে দেখলাম, আলো বেরোচ্ছে আশ্চর্য ধাতুর গা থেকে— এমনকী মেঝে থেকেও। পুরো ঘরটাই একটা আলোক বাতি— স্নিগ্ধ প্রভায় সমুজ্জ্বল প্রতিটি দেওয়াল— সমান আলোয় আলোকিত সমস্ত ঘরটা।

ভীষণ অবাক হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে প্রথমেই দেখলাম প্রফেসরকে— তারপর দেখলাম টাইম মেশিনকে।

অটল অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে টাইম মেশিন। প্রকাণ্ড ফ্লাই হুইল খুব আস্তে আস্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। গদি চেয়ারে ত্রিভঙ্গ মুরারির মতো যন্ত্রপাতির মধ্যে লটকে আছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

দেখেই তড়াক করে এমন ভাবে লাফিয়ে উঠলাম যেন পায়ে কাঁকড়াবিছে কামড়েছে। রবারের বলের মতো ছিটকে গেলাম টাইম মেশিনের দিকে— হুমড়ি খেয়ে পড়লাম প্রফেসরের ওপর।

প্রফেসর চোখ বুজিয়ে যেন ঘুমোচ্ছেন। এইরকম অবস্থায় সময়গাড়ির মধ্যেও পড়েছিলাম। তখন বুকে কান পেতেও প্রাণের স্পন্দন টের পাইনি। পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রফেসর বিহ্বল চোখে তাকিয়েছিলেন— প্রথমটা আমাকে চিনতেও পারেননি।

কে জানে আবার সেই হাল তাঁর হয়েছে কিনা। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই দুহাতে তাঁকে ধরে উপর্যুপরি কয়েকবার রামঝাঁকুনি দিয়ে তারস্বরে ডাকলাম— 'প্রফেসর... ও প্রফেসর... উঠুন... কোথায় এসেছি দেখুন।'

তারপরেই খেয়াল হল, জাগাচ্ছি কাকে! প্রফেসর কি আর প্রফেসর আছেন? এই তো কিছুক্ষণ আগেই অমানুষিক চাহনি দিয়ে আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছিলেন। কপাল থেকে হতচ্ছাড়া বিদ্যুৎনিক্ষেপ করে আমাকে দগ্ধ করার চেষ্টা করে ছিলেন। এখন কিন্তু তাঁর কপালে বিদ্যুৎলতার চিহ্নমাত্র নেই। চোখমুখ বেশ প্রশান্ত। পাজীর পাঝাড়া বিদ্যুৎ-আগন্তুক কি তা হলে চম্পট দিয়েছে?

মনটা আশায় দুলে উঠল। আবার ওঁর নড়া চেপে ধরলাম। টেনে খাড়া করে বসালাম এবং কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কানের পর্দাফাটানো স্বরে চেঁচিয়ে বললাম, 'প্রফেসর... প্রফেসর নাটবল্টু চক্র... চেয়ে দেখুন... টাইম মেশিন থেমেছে।'

যার যা ওষুধ। অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে জ্ঞান ফিরে আসে, প্রফেসরের জ্ঞান ফিরে এল টাইম মেশিন মন্ত্রটা উচ্চারণ করতে না করতেই। সটান চোখ খুলে স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'কী বললে? টাইম মেশিন থেমেছে?'

রাগ হয়ে গেল— 'মটকা মেরে পড়েছিলেন নাকি? টাইম মেশিন নাম শুনেই চোখ খুলে ফেললেন?'

জুলজুল করে ইতি উতি তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। আমার কথা এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গেল যেন। আশ্চর্য ঘরের অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, উদ্ভট জটিল সৃষ্টিছাড়া যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন পরম আগ্রহে, তারপর খুট খুট করে নেমে এলেন টাইম মেশিন থেকে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন যন্ত্রপাতিতে, মৃদু-ঘুরন্ত ফ্লাইহুইলটা দেখলেন কিছুক্ষণ।

বললেন ঘাড় নেড়ে, 'নাহে, অটোমেটিক রিটার্ন বিগড়েছে মনে হচ্ছে। তিন মিনিট তো কোনকালে পার হয়ে গেল— মেশিন তো জগদ্দল।'

বলতে বলতে নিজের রগ টিপে ধরে মাথা ঝাঁকুনি দিলেন প্রফেসর।

'কী হল?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধোই আমি। মনের চোখে ভেসে ওঠে প্রফেসরের সেই নির্নিমেষ অপার্থিব চাহনি। আবার উৎপাতটা ফিরে আসছে নাকি?

'আমার কী হয়েছে বলো তো?' স্খলিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

'প্রশ্নটা আমিই আপনাকে করব ভাবছিলাম।'

আনমনে প্রফেসর বললেন, 'সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে।'

'কী রকম গোলমাল বলুন তো?'

'সঠিক বলতে পারব না। কিন্তু টের পাচ্ছি কিছু একটা হয়েছে।'

'আমি জানি কী হয়েছে।'

চকিত চোখে প্রফেসর বললেন, 'তুমি জানো?'

'হ্যাঁ, জানি,' বলে সংক্ষেপে বললাম কালচে-নীলচে লক্ষ্মীছাড়া বিদ্যুতের কাহিনি। কলকাতার আকাশ থেকে ছিনেজোঁকের মতো পেছন নিয়েছে। প্রফেসরের মাথা ঘিরে থেকেই আশ মেটেনি, শরীরের মধ্যে ঢুকে ঘাঁটি গেড়েছে, তাতেও বিটলে বিদ্যুতের খাঁই মেটেনি— কপাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমাকেও কুপোকাৎ করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি কেবল আমার এই মজবুত ইস্পাত কঠিন শরীরটার জন্যে— বুড়ো হাবড়া হলে কি রেহাই থাকত?

গড় গড় করে বলতে বলতে থেমে গেলাম। গলায় কথা আটকে গেল বলেই থেমে গেলাম। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সারা শরীর ঘিরে আবার জ্যোতির্বলয় দেখা দিয়েছে। কালচে-নীলাভ দীপ্তিটা প্রখর হতে হতে আবার নিভু-নিভু হয়ে মিলিয়ে গেল। জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রফেসর খেঁকিয়ে উঠলেন, 'চোখদুটো ওরকম ছানাবড়ার মতো হয়ে গেল কেন?'

'সেই আলোটা—' গলা কেঁপে গেল আমার— 'আপনার সমস্ত শরীর ঘিরে সেই আলোটা ফুটি ফুটি হয়েও আবার মিলিয়ে গেল।'

'ও কিছু নয়। স্পেস-স্ট্যাটিক। গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপারই নয়।'

'কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম সারা শরীর ঘিরে একটা ছটা—'

'সেন্ট এলমোর আগুনের মতো কিছু একটা হবে। সমুদ্রে আকছার দেখা যায়।'

'সেন্ট এলমোর?'

'হ্যাঁ। মাস্তুলের ডগায় জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে।'

'আকাশের নচ্ছার মেঘ থেকে যে বিটলে বিদ্যুৎটা নেমে এসে আপনার ভেতরে ঢুকে পড়ল, সেটাও কি সেন্ট এলমোর আগুন? আপনি যে কিছুক্ষণ মড়া হয়ে থেকেও আবার জ্যান্ত হয়ে উঠলেন, সেটাও কি সেন্ট এলমোরের আগুনের জন্য? বিচ্ছিরিভাবে চেয়ে থেকে কপাল থেকে স্পার্ক ছাড়লেন, তাও কি সেন্ট এলমোর বলে চালাবেন?' রাগে ফুঁসতে থাকি আমি।

'ছিঃ! দীননাথ, বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে ওরকম মাথা গরম করতে নেই। তোমার প্রশ্নের জবাব হাজার হাজার বছর আগে বোলতারা দিয়ে গেছে।'

'বোলতা! বোলতাদের কথা এখানে আসছে কী করে?'

'মানে, ঠিক এই ধরনের অ্যানাসথেসিয়া তারাও আবিষ্কার করেছিল হাজার হাজার বছর আগে স্রেফ জীব বিবর্তনের তাগিদে।'

'অ্যানাসথেসিয়া!'

'ইয়েস মাই বয়, অ্যানাসথেসিয়া। আকাশের বিদ্যুৎ আমাকে মারেনি কিন্তু মড়া বানিয়ে রেখেছিল— তার জের এখনও চলছে— হ্যাংওভার বলতে পারো। বেশি মদ গিললে যা হয় আর কি। রেশ কাটেনি এখনও— এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে—'

'প্রফেসর—'

আমাকে আর কথা বলতে না দিয়ে তড়বড় করে প্রফেসর বলে গেলেন, 'শিকারি বোলতাদের বহু হাজার বছর আগেকার এই আবিষ্কারকেই মানুষ সম্প্রতি নতুন করে আবিষ্কার করেছে— যার নাম দিয়েছে অ্যানাসথেসিয়া—'

'ধুত্তোর অ্যানাসথেসিয়া—।'

'শিকারি বোলতা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে যখন কোনও মাছি বা মাকড়শার ওপর পড়ে তখনই তাকে খতম করে না পুট করে একটা হুল ফুটিয়ে ইঞ্জেকশন দেয়। কিন্তু কী আশ্চর্য! হতভাগ্য মাছি বা মাকড়শা তাতে মোটেই অক্কা পায় না— শুধু অবশ অসাড় হয়ে যায়। মা-বোলতা তখন সেই অচৈতন্য প্রাণীটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় নিজের বাসায়। এইভাবে সাত-আটটা অচৈতন্য মাছি বা মাকড়শাকে পর পর সাজিয়ে রেখে সীল করে বন্ধ করে দেয় বাসার মুখ। অদ্ভুত ব্যাপারটা কী জানো?'

বলে, দম নেবার জন্যে একটু থামলেন প্রফেসর। কিন্তু আমি দম ছাড়বার আগেই আবার শুরু করে দিলেন— 'দেখা গেছে, ওই অচৈতন্য জীবগুলোর সংখ্যা আর বোলতার ডিমের পরিমাণ হুবহু একটা অঙ্কের হিসেবে ছকে নেওয়া— অর্থাৎ ডিম্বস্থ অজাত শিশু

বোলতারা 'লারভা' অবস্থায় যেন খাবারের অভাবে পটল না তোলে, অথবা গেন্ডে মুন্ডে গিলে যেন পেট ফুলে পঞ্চত্বপ্রাপ্তও না হয়— সে হিসেব পাকা গণিতবিদের মতোই করে নেয় অশিক্ষিত মা-বোলতা।'

'বোলতা...বোলতা... বোলতা! আমি জানতে চাই—'

'চেঁচিও না। ব্যাড হ্যাবিট। জীববিজ্ঞানীরা ওই বাসা ভেঙে অচৈতন্য প্রাণীগুলোকে পরীক্ষা করে দেখে তাজ্জব হয়ে গেছেন। দেখেছেন, তারা মারা যায়নি, অথচ প্রাণের যেসব লক্ষণ বাইরে থেকে দেখা যায়, তাও দেখা যাচ্ছে না! এমনই ইঞ্জেকশনের মহিমা যে প্রাণীগুলো জ্ঞান হারিয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকে, অথচ খাবারের অভাবে নিজেরা অক্কা পায় না! পুরো সাত-আট সপ্তাহ তারা পড়ে থাকে অসাড় অবস্থায় মড়ার মতো। মরণঘুমের মধ্যে জানতেও পারে না কখন বোলতার বাচ্চা ডিম ছেড়ে লারভা হল, কখন তারা এগিয়ে এল, এবং ধীরে সুস্থে 'ফ্রিজ' করা সারবন্দি তাজা জ্যান্ত খাবার খেতে শুরু করল। মৃত্যু আসে জ্যান্ত অবস্থাতেই, কিন্তু টের পায় না। অদ্ভুত, তাই না দীননাথ?'

'যেমন আপনাকে মরণঘুম পাড়িয়ে ভূতুড়ে বিদ্যুৎ দখল করছে আপনার সত্তাকে— তখন আর আমাকে চিনতেও পারেন না— উলটে আমাকেও মরণঘুম পাড়ানোর মতলব আঁটেন। কিন্তু এই হাতের গুলিটা দেখেছেন তো,' বলে বাইসেপস ফুলিয়ে দেখাই আমি— 'বিদ্যুতের বাবার ক্ষমতা নেই আমাকে কুপোকাৎ করার।'

অন্যমনস্ক চোখে আমার হাতের গুলির দিকে চেয়ে থেকে প্রফেসর বললেন, 'উঁহু, হাতের মাসল মোটা বলে তুমি রেহাই পেয়েছ বলে আমার মনে হয় না। বুদ্ধি মোটা বলেই—'

'কী বললেন?'

প্রফেসর আর কিছু বললেন না। একেবারে স্থির হয়ে গেলেন। এতক্ষণ মুখে খই ফুটছিল, অকস্মাৎ বোবা হয়ে গেলেন। মুখের চামড়া ঝুলে পড়ল। চোখের চাহনি পালটে গেল আস্তে আস্তে। আস্তে আস্তে চোখ তুললেন আমার দিকে। সভয়ে দেখলাম, ভয়াবহ সেই কৃষ্ণাভ নীলাভ দ্যুতি দেখা দিয়েছে চোখের তারকায়— প্রফেসর আর চেয়ে নেই আমার দিকে। হঠাৎ সমস্ত শরীরটা বিপুলভাবে ঝাঁকুনি খেল একবার... দুবার... তিনবার। প্রফেসর দু'হাতে নিজের দুটো রগ টিপে ধরে ভাঙা গলায় ককিয়ে উঠলেন, 'না... না... না!' পরক্ষণেই আবার সেই অশুভবর্ণের বিদ্যুৎবলয় মাথা ঘিরে ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গেল— পরমুহূর্তেই শরীর ঘিরে বিদ্যুৎ বহ্নি চাপা আভার মতো বিচ্ছুরিত হল সেকেন্ড কয়েকের জন্যে। তাও মিলিয়ে গেল অবশেষে।

প্রফেসর কিন্তু সমানে নিমেষহীন নয়নে চেয়ে আছেন আমার দিকে। না, প্রফেসর চেয়ে নেই— সেই অলপ্পেয়ে বিদ্যুৎটাই তাঁর ঘাড়ে ভর করে চেয়ে আছে আমার দিকে। কেননা হাজার চেষ্টা করেও প্রফেসর হেন সরল মানুষ অমন বক্র কুটিল, ভয়ংকর চাহনি দুচোখের তারায় ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না।

অকস্মাৎ হেসে উঠলেন প্রফেসর। খলখল করে সেকী অট্টহাসি। বিকৃত কণ্ঠের ভয়াল সেই অট্টহাসি শ্রবণ করে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। হাতের বাইসেপস ফুটো

বেলুনের মতোই চুপসে গেল। বুড়ো হাবড়া বলে যে বৃদ্ধকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলাম, অজ্ঞাতসারেই কয়েক পা পেছিয়ে এলাম তাঁর সামনে থেকে।

প্রফেসরের চোখ দিয়ে দুরাত্মা পামরটা তা অবলোকন করল এবং আর এক পশলা অট্টহাসি বর্ষণ করল নির্মম ভঙ্গিমায়।

তারপরেই যেন কেটল-ড্রাম বেজে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। কোনও প্রাণীর কথা বলা যে এমন কর্কশ কানঝালাপালা করা বিকট হতে পারে তা না শুনলে প্রত্যয় হবে না। কট কট ক্যাট ক্যাট ঝন ঝন ঝন শব্দে 'প্রফেসর' বললেন, 'ছোকরা, তোমার গুরু ঠিকই বলেছেন, বুদ্ধি তোমার মোটা বলেই রেহাই পেয়ে গেলে।'

উচ্চারণ জড়িত, শব্দগুলোও অস্ফুট, প্রফেসর সাত জন্ম ভেনট্রিলোকুইজম্ সাধনা করলেও অমন রক্ত-জল করা কণ্ঠস্বর রপ্ত করতে পারবেন না।

গলা শুকিয়ে গেছিল। ঢোঁক গিললাম কেবল।

কণ্ঠস্বর বললে, 'আমি দখল করি কেবল মনকে, মেধাকে— তোমার মতো নিরেট মাথায় তাই আমার ব্রহ্মাস্ত্র প্রবেশ করল না। আশা করি তোমার মতো হেঁড়ে মাথা পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।'

গা-পিত্তি জ্বলে গেল। রেগে তিনটে হয়ে বললাম, 'তুমি কে হে ছোকরা?'

'ছোকরা!' আবার সেই কাড়া-নাকাড়া মার্কা কর্কশ হাসি। 'ছোকরা কী হে! আমার বয়স শুনলে যে এখুনি ভিরমি খাবে।'

'কত বয়স?' একটু একটু সাহস সঞ্চিত হতে থাকে আমার। রেগে গেলে যা হয় আর কি!

'তা কি আর আমারও মনে আছে ছাই। কত লক্ষ বছর যে মহাশূন্যে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি, সে হিসেব আমিও ভুলে মেরে দিয়েছি।'

'মহাশূন্যের জীব তুমি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি কি ভেবেছিলে?'

'ভূত-প্রেত হবে,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম বটে, কিন্তু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

'ভূত প্রেত? তোমাদের পৃথিবীর অভিধানে যাকে বলে অশরীরী? বিদেহী? হাঃ হাঃ হাঃ? অশরীরী তো আমিও। আমার শরীর নেই— কিন্তু আমি ভয়ংকর! আমার দেহ নেই বলেই তো চাই এমন একটা দেহ যার মাথায় গোবর নেই— বুদ্ধি আছে, মন আছে, মেধা আছে। আমার ক্ষিদে শুধু মন আর মেধা— আর কিচ্ছু নয়। হাঃ, হাঃ, হাঃ!'

'যে চুলোয় ছিলে অ্যাদ্দিন, সেই চুলোয় বিদেয় হও। প্রফেসরকে রেহাই দাও।'

'আমার চুলোর কি ঠিক আছে হে? আমি ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি নক্ষত্রদের পাশ দিয়ে, ছায়াপথের পর ছায়াপথের মধ্যে দিয়ে, কত তারকার জন্ম দেখেছি, কত তারকার বিস্ফোরণ দেখেছি, কত ধূমকেতুর উড়ে যাওয়া দেখেছি, কত গ্রহকে ধূমকেতুর ধাক্কায় নতুন রূপ নিতে দেখেছি— যেমন ঘটেছিল তোমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে— ধূমকেতুর ধাক্কায় মহাপ্লাবন হল, অগ্ন্যুৎপাত ঘটল, আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি হল, পেট্রল বৃষ্টি হল, পৃথিবীটা লন্ডভন্ড হয়ে গেল— আমি তখন পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলাম। দেখলাম সমুদ্র ফুটছে, মহাদেশ

তেতে লাল হয়ে গেছে, পাথর গলে যাচ্ছে, জঙ্গল পুড়ছে। আমি দেখলাম বৃহস্পতি গ্রহের খানিকটা অংশ ছিটকে এসে ধূমকেতু হয়ে গেল— পৃথিবীটাকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে নিজে হয়ে গেল আর একটা গ্রহ— তোমাদের শুক্রগ্রহ। পৃথিবীতে পালে পালে মানুষ মরছে দেখে টহল দিতে গেলাম ছায়াপথের অন্য অঞ্চলে। ফিরে এসে দেখি পৃথিবীতে আবার মেধার সৃষ্টি হয়েছে। সারা গ্রহটাকে চরকিপাক দিয়ে সন্ধান পেলাম তোমার এই গুরুদেবের— যার চাইতে বড় মেধা আজও কোথাও পাইনি। হে মূর্খ, আমার মধ্যে শক্তি আছে। তবুও আমি অসহায়— কারণ আমার দেহ নেই। আমি সর্বশক্তিমান হয়েও নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকেছি। প্রাণময় হয়েও নিষ্প্রাণ হয়ে থেকেছি— মন আর মেধার সন্ধানে বুভুক্ষের মতো হন্যে হয়ে এক নক্ষত্রজগৎ থেকে আরেক নক্ষত্রজগতে পাড়ি জমিয়েছি। আজ আমায় অভিযান সার্থক হয়েছে— পেয়েছি উপযুক্ত আধার— প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এখন আমার।'

'না, আমার!' ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করে বললাম আমি।

অট্ট অট্ট হাসি হাসল কণ্ঠস্বর, 'বালক, তোমাকে আমার দরকার নেই। তোমার মন নেই, মেধাও নেই। আছে গুচ্ছের মাংসপেশি— যা সংহার করতে পারি চোখের নিমেষে।'

ধূর্ত চোখে তাকিয়ে মুখ বেঁকিয়ে হাসলাম এতক্ষণ পরে— 'কচু পারো। তা পারলে কি আর এতক্ষণ টিকিয়ে রাখতে? তোমার কুচুটে বিদ্যুতের দৌড় তো দেখলাম। আমার এই গুচ্ছের মাংসপেশির কাছে তোমার অশরীরী কেরামতি—'

আমার গলার আওয়াজ ডুবিয়ে এমন একখানা বিচ্ছিরি হাসি হাসল হতচ্ছাড়া কণ্ঠস্বর যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। কট কট ক্যাট ক্যাট ঝন ঝন ঝ্যান ঝ্যান মার্কা সৃষ্টি ছাড়া জগঝম্প বাজনা বাজিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'হে বিখ্যাত মূর্খ, শরীর দরকার তো সেই জন্যেই।'

'শরীর! মূর্খাধিপতি কুচুন্ডে, তোমার শরীর তো এক বৃদ্ধের। আমার এই বাইসেপসের মাপটা জানো?'

এবার গোটা ঘরটাই ঝন ঝন করে উঠল হাসির দমকে। মহাকাশের ভূত বাবাজী খুব রসিক যা হোক। কথায় কথায় তামাশা করতে পারে। হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি। তাল সামলাতে না পেরে টলমল করে ঠিকরে গেল দেওয়ালের দিকে। দড়াম করে ধাক্কা খেল দেওয়ালের গায়ে। এবং পরক্ষণেই ঝড়াং করে সিধে হয়ে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে।

হাতের মুঠোয় দেখলাম একটা রে-গান। ১৯৮১-র পৃথিবীতে বাচ্চারা যে রে গান নিয়ে লড়াই লড়াই খেলা করে, অবিকল সেই ডিজাইনের। দেওয়ালের গায়ে অগুনতি বিদঘুটে যন্ত্রের মাঝে ক্লিপে আটকানো ছিল, মহাশূন্যের ভূত আমার সঙ্গে মশকরা করার অছিলায় ছিটকে গিয়ে এই অস্ত্রটিই দেওয়াল থেকে খসিয়ে এনে তাগ করে ধরেছে আমার দিকে।

খেলনা দেখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। তবুও ভয় পেলাম। ১৯৮১-র মেদিনীতে যা খেলনা, ৫০০০ সালের টাইটান উপগ্রহে তা কি আর নিছক খেলনা? সুতরাং হুঁশিয়ার হওয়াই ভাল।

বাইরে কিন্তু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, 'লড়াই লড়াই খেলবে বুঝি? কিন্তু কীরকম

আক্কেল তোমার? শুধু হাতে খেলা যায়? দাও আমাকে আর একটা।'

বলেই এক-পা বাড়ালাম দেওয়ালের দিকে— যেদিকে আর একখানা রে-গান দেখেছিলাম ক্লিপে-সাঁটা অবস্থায়।

কিন্তু ওই এক-পা-র বেশি আর এগোতে হল না। যেন সর্পরাজ কালীয় গর্জে উঠল সহস্র ফণায়। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দিলে কালীয়'র সহস্র ফণা দিয়ে আগুন আর ধোঁয়া ঠিকরে এসেছিল— কিন্তু ভূতাবিষ্ট প্রফেসরের দুটো চোখ দিয়ে কেবল ঠিকরে এল কালচে-নীল স্ফুলিঙ্গ— ধোঁয়াটারই যা কেবল আবির্ভাব ঘটল না ব্যাদিত মুখগহ্বরে।

ভীষণ গর্জে উঠে, রে-গান আমার দিকে নির্ভুল লক্ষ্যে তাগ করে বললে মহাশূন্যের ভৌতিক কণ্ঠস্বর, 'খবরদার! তোমার হাড় মাস পিণ্ডি পাকাতে বাহুবলের প্রয়োজন হবে না— অস্ত্রবলই যথেষ্ট। এখন বুঝেছ দেহধারণ করার প্রয়োজন কেন?'

আমার তখন হাঁটু পর্যন্ত অবশ হয়ে এসেছে। ওই গর্জন আর ওই স্ফুলিঙ্গ দেখে আমি তো আমি, ভীম-কুম্ভকর্ণ-হারকিউলিসরাও পিঠটান দিত।

এমন সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আচমকা থরথর করে কেঁপে উঠল প্রফেসরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। খুব জোরে বারদুয়েক মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর— এত জোরে যে ভয় হল ঘাড় থেকে মাথাখানা খসে না পড়ে। ওই তো পলকা ঘাড়।

পরক্ষণেই চোখ বুজে ককিয়ে উঠলেন প্রফেসর তাঁর চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে, 'না...কক্ষনও না! দীননাথ, আমি পারছি না... সরে যাও... পালাও!'

বলতে না বলতেই আবার সেই ঝাঁকুনি। বুড়োর ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যাবে যে! আবার কয়েক ঝলক নীলাভ-কালচে বিদ্যুৎ বহ্নি বিচ্ছুরিত হল সারা গা ঘিরে— সেই সঙ্গে মাথা বেড় দিয়ে লিকলিক করে উঠল অলক্ষণে সেই বিদ্যুৎ বলয়। নেতিয়ে পড়লেন প্রফেসর— ক্ষণেকের জন্যে ঠিক যেন গলা টিপে ঘাড় গুঁজে ধরে পায়ে টিপে শায়েস্তা করা হল বেচারি প্রফেসরকে। চোখ আবার খুলে গেল, আবার নির্গত হল স্ফুলিঙ্গ, সিধে হল শিরদাঁড়া। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়াল কণ্ঠস্বর, 'জাহান্নমে যা!'

বলেই, রে-গানের ট্রিগার টিপে দিল প্রফেসরের আঙুল।

কিন্তু তার আগের কয়েক সেকেন্ডের প্রচণ্ড খেঁচুনি আর দুটো সত্তার মধ্যে ধস্তাধস্তির ফলে লক্ষ্য আর ঠিক থাকেনি। একচুলের জন্যে বেঁচে গেলাম আমি। কড় কড় কড়াৎ শুধু একটা আওয়াজ হল, আগুন-টাগুন কিচ্ছু দেখতে পেলাম না রে-গানের মুখে। আমার পায়ের কাছ থেকে খানিকটা মেঝে হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেল। দেখা গেল একটা গহ্বর। ভক করে একতাল কটু গ্যাস ঘরে ঢুকল তার মধ্যে দিয়ে। আমার নাকে লাগতেই খকখক করে কাশতে কাশতে চোখে ধোঁয়া দেখলাম। টলে পড়ে যেতে যেতে যেন কুয়াশার মধ্যে দেখলাম ভূতাবিষ্ট প্রফেসরও সটান আছড়ে পড়লেন মেঝেতে— রে-গান ঠিকরে গেল হাত থেকে। তারপর তার মনে নেই।

৮

মহাশূন্যের ভূত

চোখ মেলে দেখলাম আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে অনেকগুলো মুণ্ড। মাথার ওপর জ্বলছে ঘরের ছাদ— পুরো ছাদটাই মৃদু আলোয় আলোকিত। মুণ্ডগুলোর মুখে মৃদু হাসি। অভয়ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কারও মুখ কালো, কারও সাদা। চুলও হরেক রঙের। প্রত্যেকের কপালে একটা সাদা পটি— তাতে লাল রেড ক্রশ।

দেখে তো অবাক! এ আবার কোথায় এলাম? জ্ঞান হারানোর আগে তো মুণ্ডধারীদের কাউকে দেখিনি। প্রত্যেকটা মুণ্ডুই মানুষের। পোশাকও বিংশশতাব্দীর পোশাকের মতো— শুধু যা ঢিলেঢালা এবং মসৃণ উজ্জ্বল কোনও ধাতু নির্মিত। বয়নশিল্পেও অভিনবত্ব আছে। এক এক জনের পোশাক এক এক রকমের। তাক লেগে যায়। পোশাকের ডেসক্রিপশন দিতে গেলে এ কাহিনি লম্বা হয়ে যাবে— তাই বাদ দিলাম।

একটা মুণ্ড হাসি হাসি মুখে বললে, 'স্বাগতম।'

স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে ছিটকে উঠে বসলাম। বলে কি লোকটা! স্বাগতম! টাইটান উপগ্রহে খাঁটি বঙ্গভাষায় আপ্যায়ন জানায়, এ কোন আদমি রে বাবা!

বিষম বিস্ময়টা কথা হয়ে ঠিকরে এল গলা দিয়ে— 'মানে?'

'মানে, টাইটানে স্বাগতম জানাই পৃথিবীর মানুষকে।'

এবার কিন্তু আমি বাকরহিত হয়ে গেলাম। বাকযন্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। চোখদুটোও নিশ্চয় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল এবং হাস্যকর হয়ে উঠেছিল মুখভাব। কেননা, মুণ্ডধারী অভয়দ চাহনি দিয়ে নিষিক্ত করতে করতে ফিক করে হেসে ফেলল— 'এত অবাক হচ্ছেন কেন?'

বিদ্রোহী বাকযন্ত্রকে দমন করে আবার সরব হল আমার কণ্ঠস্বর, 'এরপরেও বলছেন অবাক হচ্ছি কেন?'

'কেন বলুন তো?'

'এ সালটা খেয়াল আছে?'

'পৃথিবীর হিসেবে, মানে, যিশুখ্রিস্টের জন্মের হিসেব ধরে, ৫৩২১ সাল।'

'আমি এসেছি পৃথিবীর ১৯৮১ সাল থেকে।'

'তাতে হয়েছে কী?'

'হওয়ার আর বাকি রাখলেন কী? তিন হাজার তিনশো চল্লিশ বছর পরেও বাংলা শুনতে হচ্ছে বারো হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি লক্ষ কিলোমিটার দূরের গ্রহ শনিগ্রহের টাইটানে! আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? নাকি আমি মরে ভূত হয়ে গেছি?'

'কোনওটাই হননি। আমরি বাংলা ভাষা আরও হাজার হাজার বাঁচবে— ছায়াপথের যেখানে যেখানে মানুষ কলোনি গড়ে তুলছে— সব জায়গায় বাংলাভাষাই আমাদের কথোপকথনের একমাত্র ভাষা।'

'তার মানে আপনি বলতে চান আপনি... আপনারা বাঙালি?'

'আমরা পৃথিবীর মানুষ।'

সাদা কালো মুখ এবং হরেক রঙের চুল লক্ষ করলাম। মুখের গঠনও বিভিন্ন রকমের। নিগ্রো, ককেশীয়, ভারতীয়— সব জাতের মানুষই আছে এদের মধ্যে।

বললাম, 'পৃথিবীর সব জাতের মানুষ?'

'হাজার হাজার বছর আগে অনেক জাত ছিল বটে পৃথিবীতে, এখন নেই। এখন সেখানে একটাই জাত— মানুষ জাত। একটাই ভাষা— বাংলা ভাষা।'

'কিন্তু সামান্য একটা প্রাদেশিক ভাষা বিশ্বজনীন ভাষা হল কী করে তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'খুব সহজে। বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষাই ছিল একমাত্র ভাষা যার মধ্যে উন্নাসিকতা ছিল না, সংকীর্ণতা ছিল না, কূপমণ্ডুকতা ছিল না। বাংলা ভাষাই ছিল একমাত্র ভাষা যে ভাষার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছিল বিবিধ অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। মনে-প্রাণে বাঙালিরা ছিল উদার এবং প্রেমিক। নিজেদের দেশে বিশ্বের সব জাতকে ঠাঁই দিয়ে তাদের যেমন আপন করে মাটির মানুষ করে নিয়েছিল, বিশ্বের সব ভাষাকেই বাংলা ভাষায় মিশিয়ে আদি ভাষার পুষ্টিসাধন করে উন্নত করেছিল। একদল গোঁড়া সংরক্ষণশীল বাঙালি যদিও পরিভাষা নিয়ে খুব মাতামাতি জুড়েছিল— কিন্তু খটমট দাঁতভাঙা দুর্বোধ্য পরিভাষার চাইতে বিদেশি শব্দগুলো যে অনেক অর্থবহ, প্রাঞ্জল এবং সহজ, এই সত্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল দেশের মানুষ— তাই পরিভাষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকেনি— ভাষা সম্প্রসারিত হয়েছে, চৌহদ্দি বিস্তৃত হয়েছে, ক্রমশ তা সমৃদ্ধ হয়েছে। শেষে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যখন বিশ্বের সব মানুষই তাদের ভাষার ভাণ্ডার দেখতে পেয়েছে বঙ্গভাষার মধ্যেও, বঙ্গভাষাকে আর বিদেশি ভাষা বলে মনে হয়নি— উপরন্তু ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত-ভিত্তিক বঙ্গভাষা এমন উৎকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বিশ্বের সব মানুষকে যখন একভাষার সূত্রে গাঁথার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন ভাষাবিদরা বঙ্গভাষার বিকল্প আর খুঁজে পেল না। হাজার হাজার বছর পরে তাই বাংলাভাষাই মানুষ জাতের একমাত্র ভাষা— যে ভাষার মধ্যে পাবেন বাংলা বানানে বহু বিদেশি শব্দ— প্রতিশব্দ নয়। ফলে প্রতিটা শব্দই প্রকৃত অর্থবোধক। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ঐশ্বর্য তাই এত বৃদ্ধি পেয়েছে, আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দসম্ভার বাংলাভাষার অঙ্গীভূত হয়ে অনেক অসুবিধে দূর করেছে।'

দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বক্তা স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, খাড়া নাক, চওড়া কপাল, ধারালো চিবুক এবং চাহনি বেশ তীক্ষ্ণ। মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায় না কোন দেশের মানুষ। খাড়া নাকের জন্য মনে হয় ইউরোপীয়ও বটে, আবার পুরু ঠোঁট আর উঁচু হনুর জন্য নিগ্রোও বটে, কৃষ্ণচক্ষুর জন্যে স্পেনীয় বা ভারতীয়ও হতে পারে। অমন খাসা সোনালি রেশমী চুলের জন্যে ইংরেজ বলেও ভাবা যায়। হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে সব জাত মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে— তার জীবন্ত নিদর্শন চোখের সামনে।

প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে বক্তা বললে, 'আরও জিজ্ঞাস্য আছে নাকি?'

‘ক্রমশ প্রকাশ্য,’ বললাম আমি। ‘সবার আগে যা জানতে চাওয়া উচিত ছিল, এবার তা জিজ্ঞেস করছি। প্রফেসর কোথায়?’ বললাম খুব কুণ্ঠার সঙ্গে। বিস্ময়ের তাড়নায় মূল জিজ্ঞাস্যটাই বিস্মৃত হয়েছিলাম এতক্ষণ।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল বক্তার। জ্বলজ্বল করতে লাগল ভুরু জোড়ার ওপরে লাল রেডক্রশ। হাজার হাজার বছর আগেকার রেডক্রশ। চিকিৎসার প্রতীক। আজও তা অব্যাহত— এবং সুদূর টাইটানে। আমিও যে চিকিৎসাকেন্দ্রে আছি, তা ওই রেডক্রশ চিহ্ন দেখেই মালুম হয়েছিল। এদের জিম্মায় বহাল তবিয়তে নিশ্চয় আছেন— অবচেতন মনের কারসাজিতেই তাঁর কথা নিশ্চয় এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। কুণ্ঠা ঈষৎ স্তিমিত হল।

ভ্রূভঙ্গি করে বক্তা বললে, ‘বৃদ্ধ ভদ্রলোক তা হলে শিক্ষাবিদ? কীসের প্রফেসর?’

‘কিচ্ছুর না। উনি শখের বৈজ্ঞানিক।’

‘নাম?’

‘প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।’

চিন্তান্বিত মুখে স্বগতোক্তি করল বক্তা। ‘নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর অনেক অদ্ভুত কাণ্ড কারখানার স্রষ্টা দ্য গ্রেট বেঙ্গলি ব্রেন?’

বুকটা দশ হাত হয়ে গেল প্রফেসরের সুখ্যাতিতে। পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালে সুদূর টাইটান গ্রহেও তা হলে ওঁর নাম পৌঁছেছে!

বললাম বুক ফুলিয়ে, ‘হ্যাঁ, তিনিই।’

সাগ্রহে বললে বক্তা, ‘আমাদের পরম সৌভাগ্য তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার জন্যে। কিন্তু তিনি হঠাৎ ওই জবরজং টাইম মেশিনটা আবিষ্কার করতে গেলেন কেন?’

বেশ শরীফ ছিল মেজাজটা, গেল খিঁচড়ে সময়গাড়িকে জবরজং বলায়। যদিও ওই বিদখুটে কলখানা বিকল হওয়ার ফলেই সময়স্রোতে এবং ঘটনাস্রোতে ভাসতে ভাসতে এতদূর চলে এসেছি, তবুও তাকে জবরজং বললে রাগ তো হবেই।

কাষ্ঠকণ্ঠে বললাম, ‘জবরজংয়ের কি দেখলেন? অমন মেশিন পারবেন আপনারা আর একটা আবিষ্কার করতে?’

আমার উষ্মা দেখে মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে বক্তা বললে, ‘আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে কথাটা বলিনি। অন্যায় হয়েছে, মাপ চাইছি, কিন্তু কি জানেন— আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।’

‘দীননাথ।’

‘আমার নাম কৌ। ডক্টর কৌ।’

‘কৌ! এ আবার কি নাম? ছেলেবেলায় আমার ক্লাসে কৌস্তভ নামে একটা ছেলে ছিল। তাকে শর্টকাটে ডাকতাম কৌ বলে— আপনারাও ওই ভাবে নাম শর্টকাট করেছেন নাকি?’’

‘ঠিক ধরেছেন। আজকাল নামকেও কেটে ছেঁটে ছোট করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আপনারা যেমন ‘কুমার’ বাদ দিয়েছিলেন নামের প্রথম আর শেষ শব্দ দুটোর মাঝখান থেকে— সেইরকম ভাবে আমারও পুরো নামটাকেই সংক্ষিপ্ত করে এনেছি সময় বাঁচানোর জন্যে। যাক, যা বলছিলাম দীননাথবাবু।’

'বলুন, বলুন। টাইম মেশিনকে জবরজং বললেন কেন? জানেন ১৯৮১-র পৃথিবীতে টাইম মেশিন এখনও একটা কপোলকল্পনা? অলীক বিস্ময়? টাইম মেশিন যে সম্ভবপর হতে পারে, কোনও সিরিয়াস বৈজ্ঞানিক তা বিশ্বাস করেন না।? কিন্তু প্রফেসর সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন স্রেফ ঝোঁকে পড়ে। আর আপনি বলছেন কিনা মেশিনটা জবরজং? প্রথম আবিষ্কার ওই রকমই হয়। পরে ঠিক হয়ে যায়। যেমন মোটর, এরোপ্লেন, সাবমেরিন।'

নরম হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে নিশ্চুপে আমার কথার ফুলঝুরি শুনছিলেন ড. কৌ। আমি গজগজ করতে করতে স্তব্ধ হতেই বললেন মোলায়েম গলায়, 'খুব রেগেছেন দেখছি। কিন্তু আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন।'

'তবে?'

'প্রথম আবিষ্কার ওই রকমই হয়। এখনকার টাইম মেশিন অনেক উন্নত।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার, 'টাইম মেশিন আপনারাও করেছেন নাকি?'

চোখ নাচিয়ে ড. কৌ বললেন 'করেছি বইকি। কিন্তু আমরা তাকে টাইম মেশিন বলি না।'

'কী বলেন?'

'স্পেস মেশিন।'

'কেন?'

'কেননা ওই মেশিনে চেপেই গ্রহ-গ্রহান্তরে চক্ষের নিমেষে উপস্থিত হই আমরা। স্পেসশিপে চেপে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়া আর ডিঙি নৌকোয় চেপে মহাসাগর পাড়ি দেওয়া একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তাই নয় কি? গতির যুগে তাই স্পেসশিপ এখন অচল— এসেছে স্পেস মেশিন।'

'স্পেস মেশিনে চেপে গ্রহ-গ্রহান্তরে পাড়ি!' বিমূঢ়ের মতো বললাম আমি।

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? ভর্টেক্সের নাম শুনছেন?'

'ভর্টেক্স!' ঢোঁক গেলে বললাম, 'না তো!' সেই মুহূর্তে মনে পড়ল আমার প্রতি প্রফেসরের একটি প্রিয় গালাগাল। খুব রেগে গেলে সংস্কৃত ঝাড়েন প্রফেসর। আমাকে সংস্কৃত গালাগালি দিয়ে বলেন, কিং জীবিতেন পুরুষস্য নিরক্ষরেণ। বাংলাটাও করে দেন সঙ্গে সঙ্গে— মূর্খ পুরুষের জীবনধারণ নিষ্ফল। ড. কৌয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে মরমে মরে গেলাম আমি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প্রফেসর থাকলে কি এ অবস্থায় পড়তে হতো!

আমার মুখভাব অবলোকন করে আমার মনের কথা যেন আঁচ করে ফেললেন ড. কৌ। এবং কী আশ্চর্য! জবাবও দিলেন সংস্কৃতে।

বললেন, 'ন হি সর্ববিদঃ সর্বে।'

'মানে?' আচমকা প্রশ্নটা ছিটকে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। বলে ফেলেই কানের ডগা পর্যন্ত লাল করে ফেলেছিলাম নিশ্চয়, কেননা ড. কৌ অনেকটা সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'মানে হল, সকলেই সব বিষয় জানে না।'

'তা ঠিক,' বললাম কাষ্ঠ হেসে, 'কিন্তু ওই কর্টেক্স মানেটা?'

'কর্টেক্স নয়— ভর্টেক্স', মোলায়েম হাসি হাসলেন ড. কৌ। 'ভর্টেক্স হল স্পেস আর

টাইমের মধ্যে সেই রহস্যজনক অঞ্চল যেখানে এই দুটো মিলে এক হয়ে গেছে। আমাদের স্পেস মেশিন এই ভর্টেক্সের মধ্যে দিয়ে ট্র্যাভেল করে— চকিতে পৌঁছে যায় এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে— ছায়াপথের দূর দূরান্তের গ্রহে। কোটি কোটি টাকার জ্বালানি পুড়িয়ে গরিব পৃথিবীকে আরও গরিব করার আর দরকার হয় না। ভর্টেক্স নামটা কিন্তু আপনার জানা উচিত ছিল দীননাথবাবু। প্রফেসরের সঙ্গে যখন টাইম মেশিনে সময়পথের পর্যটক হয়েছেন, সায়েন্স ফিকশনে নিশ্চয় অনুরাগ আছে?'

'আছে বই কী। আমি নিজে তো লিখি।' গর্বের সঙ্গে বললাম।

'তা হলে তো ভর্টেক্স নামটা জানা উচিত ছিল। এই নামেই বিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে একটা সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল। তা ছাড়া, ভর্টেক্স, হাইপার স্পেস ইত্যাদি শব্দগুলো আপনার যুগের সায়েন্স ফিকশন মহলেই তো বেশি প্রচলিত— বিজ্ঞানীমহল নিশ্চয় নাক সিঁটকোন?'

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম মৃদু ভর্ৎসনায়। কী করে লোককে বলি যে আমরা যারা সায়েন্স ফিকশন লিখি, তারা না জেনেই লিখি। তাই তো বাংলার সায়েন্স ফিকশন অপাংক্তেয় রইল— জাতে আর উঠল না। এই সুযোগে কিছু ব্যক্তি সায়েন্স ঠেসেঠুসে সায়েন্স ফিকশনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফিকশনকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছেন। ফলে সায়েন্স ফিকশন হচ্ছে না-সায়েন্স না-ফিকশন— সে এক উদ্ভট বস্তু। কিন্তু ড. কৌ-এর কাছে আমাদের দুরবস্থার কথা ফাঁস করা ঠিক হবে না। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন হওয়ার অভিনয় করে বললাম, 'কিন্তু প্রফেসর কোথায়?'

সৌম্যদর্শন ড. কৌ অতিশয় ধড়িবাজ। আমার মতলব বুঝে শুধু একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, 'দেখবেন?'

'নিশ্চয়! চলুন, যাই।'

'যেতে হবে না। এখানে বসেই দেখবেন।'

৯
অজ্ঞাত জীবাণু

আশ্চর্য শৃঙ্খলাবোধ বটে ড. কৌ-এর সঙ্গীদের। এতক্ষণ কথা বলে গেলেন ড. কৌ একাই, ঘরশুদ্ধ কেউ টুঁ শব্দটি করেনি। হাজার হোক আমি তাদের দেশে আগন্তুক। মামুলি আগন্তুক নই— তিন হাজার তিনশো সাত চল্লিশ বছর আগেকার প্রাচীন পৃথিবী থেকে এসেছি। ১৯৮১-র পৃথিবীতে পৌরাণিক যুগের বৈদেশিক দর্শনপ্রণেতা কণাদমুনি সহসা টাইম মেশিনে চেপে উপস্থিত হলে নিশ্চয় কেউ মুখে চাবি এঁটে বসে থাকতাম না। পরমাণুবাদী কণাদকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করতাম। জিজ্ঞেস করতাম, সত্যিই কি তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পরমাণুবাদের প্রচারক? জানতে চাইতাম, কেন তাঁর দর্শনে, মানে কণাদ-দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় না? কোন তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি 'বিশেষ' নামক এক অতিরিক্ত

পদার্থ স্বীকার করেছেন? কোন প্রমাণের বলে তিনি বলেন যে একমাত্র পরমাণুই সৎস্বরূপ নিত্যপদার্থ, তার আর কারণ নেই? কী কী পরীক্ষা করবার পর তিনি বলতে শুরু করেন যে সমস্ত জড়পদার্থই পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে— বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে— তারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলে প্রতীতি হয়? হাজার জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলে নাজেহাল করে দিতাম তন্ডুলকণা, ভক্ষক মহর্ষি কণাদকে— বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আমাদের এমনিতেই বড় প্রবল— প্রবলতর আমাদের শৃঙ্খলাবোধহীনতা। কিন্তু টাইটানের এই এক-জাত এক-মানুষ সম্প্রদায়ের মানুষগুলি যেন অন্য ধাতুতে গড়া। দীর্ঘ বাক্যবিনিময়ের মধ্যে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল— বাক্যস্ফূর্তি ঘটল না কারও কণ্ঠে— আঙুল পর্যন্ত নাড়িয়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল না। ক্রমবিবর্তন মানুষকে দেখছি অনেক সম্পদ দান করেছে, তার মধ্যে পেয়েছে তিনটি মহাশক্তি— ধৈর্য, তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতা।

দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বললাম, 'কই দেখান?'

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আন্দোলনে সংকেত করলেন ড. কৌ। শ্যামলবরণ না-নিগ্রো না-ইউরোপীয় এক পুরুষ গিয়ে দাঁড়াল মৌচাকের খোপের মতো দেওয়ালের সামনে। হাত বাড়িয়ে একটা বোতাম স্পর্শ করতেই ড. কৌ বলে উঠলেন, 'ঋ, দাঁড়াও। ভিসিফোন পরে, আগে স্পেস রাডার স্ক্রীন।'

হাত সরিয়ে নিয়ে তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে প্রায়-অদৃশ্য একটি বোতাম স্পর্শ করল ঋ নামক না-নিগ্রো না-ইউরোপীয় যুবকটি। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের একটা আয়তাকার অংশ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল বহুবর্ণের ছটায়। অপরূপ দৃশ্য ভেসে উঠল পর্দার বুকে। কালার টেলিভিশন যারা দেখেছে, তারাও হতবাক হয়ে যাবে সেই বিচিত্র বর্ণসমাহার দেখে। চুলের মতো সূক্ষ্ম রেখাগুলি পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল পর্দার ছবিতে। ছবিটা শনিগ্রহের। বিশাল গ্রহ ভাসছে মহাশূন্যে। জ্যোতির্বলয়ের মতো একটা আংটির বেড় রয়েছে চারদিকে। এত কাছ থেকে এত স্পষ্টভাবে রহস্যাবৃত এই গ্রহকে ১৯৮১-র কোনও বৈজ্ঞানিক আজ পর্যন্ত দেখেননি। তাঁরা দেখেছেন উড়ন্ত মহাকাশযান থেকে পাঠানো ঝাপসা ছবি— আর আমি দেখছি সরাসরি সুস্পষ্ট শনি-চিত্র। মুগ্ধ চোখে তাই চেয়ে রইলাম।

সম্বিৎ ফিরল ড. কৌ-এর কণ্ঠস্বরে। আত্মসমাহিত ভাবগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'এই আমাদের বর্তমান উপনিবেশ। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবী থেকে অভিযানে বেরিয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষ। মহাশূন্যের বহু গ্রহ-উপগ্রহে কলোনি সৃষ্টি করেছিল— মর্তের মানুষ তাই আজ স্বর্গকেও অধিকার করেছে। পৌরাণিক যুগে আকাশকেই তো আপনারা স্বর্গ বলতেন, তাই না দীননাথবাবু? সেই আকাশ, মহাকাশ, মহাশূন্য, ছায়াপথ এবং কোটি কোটি নক্ষত্রলোকে আজ আমরা যথেচ্ছ বিচরণ করি শুধু স্পেস মেশিনের দৌলতে। পৃথিবীতে আর আমরা ফিরে যেতে চাই না স্বর্গলোক ছেড়ে। ঋ, টাইটান দেখাও।'

ঋ স্পর্শ করল আর একটা বোতাম। সমুজ্জ্বল হল আর একটা ধাতব পর্দা। বিপুল উপগ্রহ টাইটান ঝলমল করতে লাগল চোখের সামনে। দ্রুত তা কাছে এগিয়ে এল... আরও

কাছে... আরও। দানবিক ফ্যান দেখলাম অনেকগুলো। সারা উপগ্রহ-পৃষ্ঠ জুড়ে খাড়া রয়েছে অতিকায় ফ্যানের পর ফ্যান।

গাঢ় স্বরে কানের কাছে বললেন ড. কৌ— 'হাইড্রোজেন-মিথেন বায়ুমণ্ডলকে শুষে নেওয়া হচ্ছে, সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে দিয়ে জমা করা হচ্ছে স্টোরেজ ট্যাঙ্কে। এই থেকেই তৈরি হচ্ছে কেমিক্যাল বুস্টার ফুয়েল— এর শেষ নেই— শেষ নেই আমাদের শক্তিরও। বিংশ শতাব্দীর পাওয়ার প্রবলেম, পেট্রল সমস্যা, ইলেকট্রিসিটির বিপর্যয় আমাদের পীড়িত করে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ইলেকট্রিসিটিও একদিন এইভাবে আহরণ করে সমস্ত গ্রহটাকে ঝলমলে করে তোলা হয়েছিল— সেই পদ্ধতিই আমরা প্রয়োগ করেছি টাইটানে। এখানকার পাথরের গভীরে যন্ত্রপাতি আর ঘর বাড়ি বানিয়ে থাকি— পেট্রল আর কয়লার জন্যে খোঁড়াখুড়ি করি না। জ্বালানি আসে মাথার ওপরকার বায়ুমণ্ডল থেকে। গ্যাস পাইপ, মেট্যাল করিডর, গোলকধাঁধার মতো সুড়ঙ্গে ঝাঁঝরা করে রেখেছি টাইটানকে— এই আমাদের ঘরবাড়ি, এই আমাদের স্বর্গ, এই আমাদের সব।'

আবেগে গমগমে হয়ে উঠল ড. কৌ-এর কণ্ঠস্বর। টাইটানকে যে তিনি কী পরিমাণে ভালবাসেন, তা এতক্ষণ বুঝিনি। বুঝলাম, টাইটান প্রসঙ্গ আসতেই তাঁর বিচলিত হওয়া দেখে, আবেগমথিত থরথর কণ্ঠস্বর শুনে। সংযত করে নিলেন নিজেকে সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'ঋ, এবার গ্যালাক্সি হাসপাতালের দ্বিতীয় স্তর।' বলেই বললেন, 'না, দাঁড়াও, দীননাথবাবুকে তার আগে একটা কথা বলে নিই। দীননাথবাবু, আমার সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও আপনাকে দেওয়া হয়নি। আমি পৃথিবীর ধন্বন্তরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টাইটানে এসেছি অ্যাসটেরয়েড বেল্টে নতুন আর দুষ্প্রাপ্য ব্যাধির সন্ধানে। জীবাণু গবেষণাই আমার সাধনা। আপনাদের নিয়ে তাই আমার এত আগ্রহ।'

'কেন?' ঔৎসুক্য বাঁধভাঙা বন্যার মতো তোড়ে বেরিয়ে এল ওই একটিমাত্র শব্দের মধ্যে।

ড. কৌ নিবিড় চোখে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের দুজনকেই পেয়েছি প্রকোষ্ঠের একটিতে অজ্ঞান অবস্থায়। যদিও আপনারা ফোর্থ ডাইমেনশনের মধ্যে দিয়ে এসেছেন, কিন্তু কোনও অজানা জীবাণু বহন করে এনেছেন কিনা, তা আমার দেখার দরকার ছিল। তাই আপনাদের দুজনকে আলাদা রেখে পরীক্ষা চলেছে। আপনাকেও এতক্ষণ পরীক্ষা করছিলাম।'

'পরীক্ষা করছিলেন!' বলে কি লোকটা! বকবক করার নাম পরীক্ষা।

গম্ভীর মুখে ড. কৌ বললেন, 'আপনি সুস্থ। সম্পূর্ণ সুস্থ। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, আপনি তা থেকে মুক্ত। ধাঁধাটা সেইখানেই। একই পথের সঙ্গী হয়ে আপনি নীরোগ, কিন্তু তিনি এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন?'

'বলব?' ধড়ফড় করে বললাম আমি।

উজ্জ্বল হল ড. কৌ-এর চাহনি— 'আপনি জানেন?'

'হাড়ে হাড়ে জানি,' বলে বিবৃত করলাম সমস্ত ঘটনা। কলকাতার আকাশে সেই অলক্ষণে বিদ্যুতের আবির্ভাব থেকে টাইটানে মহাকাশভূতের সঙ্গে রে-গান যুদ্ধ পর্যন্ত— কিচ্ছু বাদ

দিলাম না। নিবিড় আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি কথা শ্রবণ করলেন ড. কৌ— বাগড়া দিলেন না, কৌতূহল প্রকাশ করলেন না অযথা প্রশ্ন করে। আমি সবশেষে বললাম, 'ওই ব্যাটা ভূতটাই সব নষ্টের মূল। ভূতে মেধা চায়, এই প্রথম শুনলাম। আমি বেঁচে গেছি, ওই বস্তুটা আমার মাথায় একটু কম আছে, তাই।' সত্যি কথা বলতে কি, শেষের কথাগুলো বলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ডাক্তার-উকিলের সামনে কিছু গোপন করতে নেই— পৃথিবীতে শেখা এই আপ্তবাক্যটি স্মরণ করেই নিজের নিন্দা নিজেই করলাম স্রেফ প্রফেসরের নীরোগ কামনায়।

ড. কৌ-এর অটল আত্মবিশ্বাসে যে চিড় ধরাতে পেরেছি, তা লক্ষ করে কিন্তু পরক্ষণেই উল্লসিত হলাম। কেন না, উনি মস্তক কণ্ডূয়ন করলেন, মানে, মাথা চুলকোলেন। স্পষ্টত ধাঁধায় পড়েছেন। খুব যে বড়াই করে বলছিলেন একটু আগে, নতুন আর দুষ্প্রাপ্য রোগসন্ধানই তাঁর সাধনা। এখন এমন বিরল ব্যাধির খপ্পরে পড়েছেন যে সাধনা মাথায় উঠেছে মনে হল।

মাথা-টাথা চুলকে উসকোখুসকো করে ফেলে অবশেষে বললেন কাষ্ঠ হেসে, 'খুবই জটিল কেস। ভিসিফোনে দেখে আর কাজ নেই, চলুন, স্বচক্ষে দেখবেন চলুন।'

আমিও তো তাই চাই!

১০
অমানুষ প্রফেসর

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখলেও খবরদার কাউকে বলতে যেয়ো না। অজ্ঞানীরা তো বিশ্বাস করবেই না— শুধুমুধু হাস্যাস্পদ হবে, মিথ্যুক বদনাম রটবে। কিন্তু আমার আক্কেল জিনিসটা চিরকালই একটু কম— বিশেষ করে অসম্ভব কাণ্ড বলার ব্যাপারে। তাই লোকে হাসে, টিটকিরি দেয়। কিন্তু দুনিয়ায় আর এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা সব অসম্ভবই সম্ভবপর হতে পারে বলে মনে করে— তাদের অভিধানে অসম্ভব শব্দটা নেই। তারাই আমার দুরন্ত দুঃসাহসী ছোট্ট বন্ধুরা— যারা এই পৃথিবীতে চিরকাল ছিল... আছে... থাকবে। অবিশ্বাস্য এই কাণ্ড শুধু তাদের জন্যেই লিখছি। তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে গ্যালাক্সি হাসপাতাল সম্বন্ধে দু'-চারটি কথা আগে বলে নিই— তারপর এই কাহিনির যবনিকা তোলা হবে বিচিত্রতর এক অধ্যায়ে।

টাইটানে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়েছিল কোনও এক সময়ে। সে কাহিনি যথা সময়ে বিবৃত করব। লোমহর্ষক সেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি আমার ছোট্ট বন্ধুরা আজ পর্যন্ত কোনও অ্যাডভেঞ্চার গ্রন্থে পাঠ করেনি। একটু ধৈর্য ধরতে হবে কিন্তু। ঘটনা পরম্পরার তাল কেটে গেলে রসভঙ্গ ঘটতে পারে।

সেই সময়ে ব্লাস্টার (রে-গান বলে যাকে এর আগে লিখেছি আসলে তার নাম ব্লাস্টার) হাতে টাইটানপৃষ্ঠের মিথেন কুয়াশা আমি দেখেছিলাম ভিসিফোনে। প্রাণটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে। আফ্রিকার জঙ্গলে, হিমালয়ের বরফে অথবা সাহারার মরুপ্রান্তরে অ্যাডভেঞ্চারের

চাইতেও সে অ্যাডভেঞ্চার অনেক রুদ্ধশ্বাসী, অনেক ভয়াবহ। টাইটানপৃষ্ঠে অবতরণের সময়ে টাইম মেশিন থেকে গ্যালাক্সি হাসপাতালের বহু সহস্র আলোকিত জানলা আমি দেখেছিলাম। শূন্যে ভাসছে যেন একটা বৃহদাকার প্রস্তর গোলক। মহাশূন্যের নিবিড় তমিস্রার মধ্যে ঝলমলে বাতায়নগুলোর ঠেলে বেরিয়ে থাকার দৃশ্য দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। একটা ক্ষুদে উপগ্রহের মধ্যস্থল ফোঁপরা করে নির্মিত গ্যালাক্সি হাসপাতালের এলাহি কাণ্ডকারখানা। গ্যালাক্সি অর্থাৎ ছায়াপথের বৃহত্তম রিসার্চ হাসপাতাল এটি। দেখে অভিভূত হওয়ার মতো। পৃথিবীর সঙ্গে ব্যাবসায়িক সূত্রে আবদ্ধ এই হাসপাতালে বিবিধ বিচিত্র ব্যাধি নিরাময় এবং আহতের সেবাশুশ্রূষার চমকপ্রদ ব্যবস্থা আছে। পৃথিবী থেকে বেরিয়ে অন্যান্য গ্রহে অভিযানের সময়ে মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যস্থ গ্রহাণুপুঞ্জে অনেক অদ্ভুত অসুখে আক্রান্ত হয়ে অথবা জখম হয়ে অভিযাত্রীরা আসে এখানে। রুটিন চিকিৎসায় যা সারে না— গবেষণামূলক চিকিৎসায় তা আরোগ্য করা হয়।

হাসপাতালটার বহু স্তর। স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হয়েছে গ্রহের কেন্দ্র পর্যন্ত। সে যে কী বিরাট ব্যাপার, বলে বোঝাতে পারব না। বাইরের হাজার হাজার আলোকিত জানলা দেখে যাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়, তারা ভেতরে প্রবেশ করবার পর থ হয়ে যায়। ১৯৮১-র পৃথিবীতে নির্মিত কোনও হাসপাতাল দিয়ে সেই বিরাট হাসপাতালের আন্দাজ করা যাবে না। হাসপাতাল অট্টালিকার ঠিক মাঝখানে অষ্টপ্রহর জ্বলজ্বল করছে একটা অতিকায় রেডক্রশ— মানবজাতির রোগ নিরাময়ের আদিমতম প্রতীক।

ড. কৌ কেবল আমাকে নিয়ে রওনা হলেন এই গ্যালাক্সি হাসপাতালের অন্য এক স্তর-অভিমুখে। ঘর থেকে বেরোনোর সময়ে সেকী বিপত্তি! দরজা খুঁজে পাই না। দেওয়াল তো মৌচাকের খোপের মতো বাঁক নিতে নিতে সিলিং হয়ে গেছে। মসৃণ ধাতব দেওয়ালে দরজা বলে পরিচিত বস্তুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে না পেরে কাঁচুমাচু মুখে হাল ছেড়ে দিলাম। তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে লম্ফ দিয়ে নেমে বেরোতে গিয়ে এই ঝামেলা। ড. কৌ তখন সঙ্গীসাথীদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমি দেওয়াল হাতড়াচ্ছি দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'কী খুঁজছেন?'

'বেরোনোর পথ।'

দেওয়ালের গায়ে মিলানো একটা ছোট্ট চাকা দেখিয়ে ড. কৌ বললেন, 'এটা ঘোরান।'

লকিং মেক্যানিজম! চাকাটা একপাক ঘোরাতে না ঘোরাতেই দেওয়ালের একটা অংশ ধীরে ধীরে সরে গেল দেওয়ালেরই মধ্যে। সামনেই করিডর। শ্বেত পরিচ্ছদ পরা একজন নার্স ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কপালে রেডক্রশ-আঁকা পটি। ড. কৌ-কে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করে ট্রলি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা ছোট্ট কুঠুরির সামনে। ট্রলি ঠেলে ঢোকাল ভেতরে। পরক্ষণেই একটা হু-উ-উ-শ শব্দ শুনলাম। দেখলাম, ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ উধাও হয়েছে নার্স এবং ট্রলিকে নিয়ে।

লিফট নাকি? জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম ড. কৌ-এর দিকে। উনি মৃদু হেসে বললেন, 'প্রশ্ন আছে?'

‘লিফট এ-যুগেও?’

‘আপনাদের যুগে যে-লিফট, সে-লিফট নয়। আপনাদের ছিল ইলেকট্রিক লিফট— আমাদের হল নিউম্যাটিক লিফট।’

‘নিউম্যাটিক লিফট! নিউম্যাটিক মানে তো বায়ুবিজ্ঞান।’

‘এ-লিফটও বায়ুচালিত লিফট। তাই ওই হু-উ-উ-শ আওয়াজটা শুনলেন।’

‘অ,’ বলে চুপ মেরে গেলাম। আমার এই ‘অ’ বলা নিয়ে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আমাকে কম ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেননি। যখনই কোনও জটিল বিষয় বোঝান, আমার মোটা মাথায় বিন্দু-বিসর্গ ঢোকে না। তখন প্রশ্ন করলে পাছে যা মুখে আসে তাই বলে বসেন, এই ভয়ে বলে উঠি— ‘অ’। ভাবখানা যেন, সব বুঝেছি। প্রফেসর কিন্তু শিশুর মতো সরল হলেও মাঝে মাঝে যাচ্ছেতাই রকমের ঘোড়েল হয়ে ওঠেন। আমার ওই ‘অ’ অক্ষরটির অপার অর্থ যে আমার সীমাহীন অজ্ঞানতা তা উনি চকিতে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে টিটকিরি দেন সঙ্গে সঙ্গে— ‘অ, মানে, বোঝা গেল না— এই তো?’

ভাগ্যিস ড. কৌ এখনও আমার ‘অ’ অক্ষরের সম্যক অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি! বায়ুবিজ্ঞান নিয়ে তাই আর বাড়াবাড়ি করলেন না। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নিউম্যাটিক লিফট অগুনতি রয়েছে করিডরে। আমাকে নিয়ে কৌ ঢুকলেন একটার ভেতরে। দেওয়ালের গায়ে বোতাম ছুঁতে না ছুঁতেই হু-উ-উ-শ শব্দ শুনলাম এবং মনে হল খাদে পড়ে যাচ্ছি। কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের মতো গতিবেগ। এ গতিবেগ বিংশ শতাব্দীর লিফটনির্মাতা এখনও অর্জন করতে পারেননি। সিক্রেটটা শিখে নিয়ে যাব মনে মনে ঠিক করেছিলাম— কিন্তু মস্তিষ্কের জড়তা আর সময়-সুযোগের অভাবে তা সম্ভব হয়নি। নইলে বিংশ শতাব্দীর লিফট বিজ্ঞান একধাপে এগিয়ে যেত অনেকখানি।

ধাবমান প্রকোষ্ঠ স্তব্ধ হল এক সময়ে। আমরা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম একটা প্রশস্ত কক্ষে। কক্ষ মানে মৌচাকের খুপরি। এখানকার সব ঘরই এইরকম ডিজাইনের। চতুষ্কোণের ভক্ত নয় এ যুগের মানুষ— বহু কোণের সমাদর বড্ড বেশি।

রিশেপসন ডেস্কের মতো একটা লম্বা টেবিলের সামনে বরফঠাণ্ডা মুখে বসেছিল একটি তরুণী। ভাবলেশহীন মুখ। টেবিল ভর্তি হাজার রকম যোগাযোগের যন্ত্রপাতি— কমিউনিকেশন ডিভাইস। পেল্লায় হাসপাতালের ঘরে ঘরে যোগাযোগ রেখে চলেছে এই একটি মেয়ে একটিমাত্র টেবিলের সামনে বসে। অনেক রঙের পোশাক পরা ডাক্তার আর নার্সরা ব্যস্ত ভাবে যাতায়াত করছে ঘরের মধ্যে দিয়ে। এদিকে সেদিকে ছড়ানো বেঞ্চিতে বসে রুগীরা। হাজার হাজার বছর পরেও হাসপাতালের মুল দৃশ্যটা দেখছি একটুও পালটায়নি।

আমার পৌরাণিক পরিচ্ছদ দেখে বিস্মিত হল সবাই। কিন্তু প্রশ্নবর্ষণে বিড়ম্বিত করার প্রয়াস দেখা গেল না কারও মধ্যেই। শৃঙ্খলাবোধের আর একটি নিদর্শন।

ড. কৌ গটগট করে গিয়ে দাঁড়ালেন রিসিভিং অফিসার সেই তুহিন-আনন ললনাটির সামনে— ‘আইসোলেশন চেম্বারেই আছেন তো তিনি?’

‘হ্যাঁ। লেভেল টু।’ বলেই মেয়েটি একটা কন্ট্রোল স্পর্শ করল। মিউজিক্যাল বিপ-বিপ-

বিপ ধ্বনি শোনা গেল প্রথমে। সংগীতময় বিচিত্র শব্দলহরী শেষ হতে না হতেই উদ্ভাসিত হল একটা মনিটর স্ক্রিন। দেখলাম শয্যায় শায়িত প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে। চারপাশে স্বয়ংক্রিয় ডায়াগনোসটিক ইন্সট্রুমেন্টের সরঞ্জাম— রোগ নিদানের বিপুল আয়োজন। মেয়েটি বললে, 'এখনও ড্যাটালাইজ করা হচ্ছে ওঁকে।'

'ড্যাটালাইজ! সেটা আবার কী?' ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা। সজনে ডাঁটার সঙ্গে সম্পর্ক আছেন নাকি?

মেয়েটি আমার অজ্ঞতার জবাব না দিলেও পারত। কিন্তু সৌজন্য প্রদর্শন হাসপাতাল কর্মচারীদের একটা বড় সম্পদ— যা বিংশ শতাব্দীর কলকাতার হাসপাতালে একেবারেই অনুপস্থিত। রুগীর ধৃষ্টতা সেখানে সহ্য করা হয় না— সৌজন্য দেখানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েটি কিন্তু সুমিষ্ট হাসি ফুটিয়ে তুলল তুহিন-শীতল মুখে। বললে, 'চিকিৎসা চলেছে। ড. কৌ যখন আপনার সঙ্গে রয়েছেন, উনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। উনি আমাদের এক্সট্রা-টেরেসট্রিয়াল প্যাথলজিক্যাল এনডোমরফিজম স্পেশ্যালিস্ট।'

দমাদম শব্দে কানের কাছে মেশিনগান বর্ষণ করলেও কানটা বুঝি এতটা ঝালাপালা হত না। হতভম্ব মুখে তাকালাম ড. কৌ-এর পানে। উনি সস্মিত মুখে বললেন, 'বুঝতে পারলেন না বুঝি? আপনাদের যুগের বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোর অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখার ফলেই দুর্বোধ্য মনে হল। যাকগে, মানে করে দিচ্ছি আমি। আভ্যন্তরীণ মরফিন আসক্তি যখন অপার্থিব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তখন তার রোগনিরূপণ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ আমি।' একটু থেমে আমার অসহায় মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করে সকৌতুকে বললেন, 'আরও খটমট লাগল তো? লাগবেই তো। এই অসুবিধের জন্যেই তো বাংলাভাষাকে পরিভাষা কবলমুক্ত করেছিলেন আপনার পরবর্তী যুগের ভাষা সংস্কারকেরা। যাকগে, আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে, সব বুঝতে পারবেন। এখন চলুন প্রফেসর কী অবস্থায় আছেন দেখা যাক।'

সবিস্ময় অনুকম্পার চোখে ললনাটি চেয়ে রইল আমার পানে। আমার সীমাহীন অজ্ঞতা যে শেষ পর্যন্ত তার তুহিন-কঠিন ভাবলেশহীনতার অবসান ঘটাতে পেরেছে দেখে ওই অবস্থাতেও যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা অনুভব করলাম।

বিংশ শতাব্দীর পাঠক-পাঠিকাদের কিন্তু আমার মতো বিড়ম্বনায় ফেলার অভিপ্রায় আমার নেই। তাই 'আইসোলেশন' শব্দটার তর্জমা করে দিচ্ছি। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অর্থাৎ পৃথকভাবে রুগীদের যেখানে রাখা হয়, হাসপাতালের সেই অঞ্চলটিকে বলা হয় আইসোলেশন ওয়ার্ড বা আইসোলেশন উইং। রিসেপশন প্রকোষ্ঠ থেকে রশ্মিরেখার মতো বিচ্ছুরিত বহু অলিন্দপথের একটিতে প্রবেশ করে ড. কৌ আমাকে নিয়ে এলেন এই আইসোলেশন ওয়ার্ডে।

অচৈতন্য প্রফেসর শুয়েছিলেন শয্যায়। বিরল এবং নবীন রোগের সন্ধানী ড. কৌ ঝুঁকে দাঁড়ালেন শয্যাপার্শ্বে। আবিল মুখচ্ছবি দেখে স্পষ্ট বুঝলাম প্রফেসরের বিরল ব্যাধি তাঁকে যথেষ্ট পীড়িত করে তুলেছে।

শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে রইল ম্যা— ড. কৌ-এর তরুণ সহকারী— নামটা বোধহয় কোনও কালে ম্যাকসন বা ওই জাতীয় কিছু ছিল। এখন তার সংক্ষেপিত রূপ 'ম্যা' হাস্যউদ্রেককারী

সন্দেহ নেই— কিন্তু গুরুগম্ভীর থমথমে পরিবেশে হাসতে পারলাম না। ম্যা-এর পাশে দাঁড়িয়ে একজন সিনিয়র নার্স। উৎকট গম্ভীর মুখ। ছোট্ট এই দলটায় আছে আর একটি জীব। এর প্রসঙ্গে আসার আগে আবার বলি, ছোট্ট বন্ধুরা যেন ভুলেও মনে না করে যে আমি মিথ্যার বুনট রচনা করে চলেছি। মিথ্যার এমনই মহিমা যে এক মিথ্যাকে ঢাকতে হলে আরেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। আমার এই বিচিত্র কাহিনি অবিরাম মিথ্যা কখন মনে হতে পারে— কেননা বিংশ শতাব্দীর পার্থিব কোনও অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তো তার সাদৃশ্য নেই। কিন্তু আমি নিরুপায়। এ ঘটনা পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালের টাইটান উপগ্রহের। পৃথিবী-বহির্ভূত আখ্যায়িকা তো অপার্থিব হবেই। তা ছাড়া মিথ্যাচার করলে যে যমালয়ে গরম তেলে আমাকে ভাজবে যমদূতেরা, আমার তা জানা আছে। অন্তত সেই ভয়াবহ নরকযন্ত্রণার ভয়েই যে মিথ্যা বলছি না, এইটা যেন খেয়াল রাখে কল্পনাপিয়াসী ছোট্ট বন্ধুরা।

আমাদের ছোট্ট দলের অন্যতম শরিকটি একটি বেঁটেখাটো চ্যাপটা চৌকোনো ধাতুর তৈরি কুকুর। শয্যার তলদেশে পায়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বিচিত্র জীবটাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। দেখতে তাকে অদ্ভুত রকমের ধাতুর তৈরি চৌকোনো সারমেয়র মতন। চোখের জায়গায় কম্পিউটারের কারসাজি, কানে আর লেজের জায়গায় তিনটে খাড়া অ্যান্টেনা। আমি যখন তাকে দর্শন করে হতভম্ব সে তখন নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে প্রফেসরের নিস্পন্দ দেহটাকে নিয়ে। পর্যবেক্ষণ করছে মাথায় সেট করা একসারি ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে। অতশত সেই মুহূর্তে আমার মাথায় ঢোকেনি— ড. কৌ পরে প্রাঞ্জল করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ খর্ খর্ খর্ খর্ আওয়াজ হতেই আর একদফা চমকে উঠলাম। তারপরেই দেখি মেট্যাল-কুত্তার মুখবিবর দিয়ে বেরিয়ে আসছে কম্পিউটারে ছাপা ফিতে-কাগজ— আচমকা দেখলে মনে হবে যেন লকলকে জিভ বার করেই চলেছে বিরামবিহীনভাবে।

আপনা থেকেই এক সময়ে স্তব্ধ হল ফিতে কাগজের বেরিয়ে আসা। হেঁট হলেন ড. কৌ। ধাতব-সারমেয়র মস্তক চাপড়ে আদর জানালেন এবং পড়াৎ করে মুখের কাছ থেকে ছিঁড়ে নিলেন কাগজখানা।

বেশ বারকয়েক কাগজে ছাপা তথ্যাবলিতে দৃষ্টি সঞ্চালন করে হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন ড. কৌ। শান্ত সৌম্য মানুষটার এ হেন আকস্মিক পরিবর্তন দেখে তখন অবাক হলেও পরে জেনেছিলাম, উনি দ্বৈত ব্যক্তিত্বের পুরুষ। রোগ আর রুগীর সান্নিধ্যে এলে খিটখিটে, অন্য সময়ে সহজ, স্বাভাবিক। অধিকাংশ প্রতিভাধর যা হন আর কি। আমরা সাধারণ মানুষরা এঁদের বলি খ্যাপা উন্মাদ। আমাদের প্রফেসর নাটবল্টু চক্রই বা কম যান কীসে। তাঁর মেজাজের নাগাল ধরতেই তো জান কয়লা হয়ে গেল আমার।

যা বলছিলাম, কাগজখানা বারকয়েক পাঠ করবার পর ক্ষিপ্ত হলেন কৌ। বললেন তিরিক্ষে গলায়, 'ইডিয়ট কোথাকার।'

কে ইডিয়ট? আমি বিমূঢ় চোখে চেয়েছিলাম ম্যা আর নার্সের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে। দুজনেই ডক্টরের এই জাতীয় মেজাজী বিস্ফোরণের সঙ্গে সমধিক পরিচিত ছিল বলেই

নির্বিকার মুখে চেয়ে রইল শূন্য পানে। বুদ্ধিমত্তার প্রশংসিকাটা যেন কর্ণকুহরে প্রবেশই করেনি।

এবার আমাকেই উদ্দেশ করলেন ড. কৌ, 'আপনার গুরু তো দেখছি মহা-ঘোড়েল লোক।'

হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল আমার। এ কী অশিষ্ট মন্তব্য। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি, উনি তার আগেই বলে উঠলেন, 'এই বুড়ো বয়েসেও সেল্ফ-ইনডিউসড কোমা প্র্যাকটিস করে বসে আছেন!'

'কমা?' রাগের চেয়ে বিস্ময়টাই এবার প্রবল হল। কমা দাঁড়ি সেমিকোলনের প্রশ্ন আসছে কেন এখানে?

'কমা নয়, কোমা' খেঁকিয়ে উঠলেন ড. কৌ। 'কোমা কি তাও জানেন না? জ্বালাতন! কোমা মানে হল ডিপ স্লিপ— গভীর নিদ্রা। সংজ্ঞার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি মৃগীর আক্রমণ হওয়ার পর, অথবা বেশি মদ খেলে, ডায়াবেটিস হলে বা কঠিন রোগে কোমা দেখা যায়। আর আপনার গুরুদেব আত্মঘটিত কোমায় সংজ্ঞা হারিয়ে রয়েছেন— নিজেই নিজের কোমা ঘটিয়েছেন! গুরুদেব লোক বটে!'

শুনে রাগ হওয়া দূরে থাক, খুশির প্রাণ ফুর্তিতে গড়ের মাঠ হয় আর কী! প্রফেসর গুণবান পুরুষ নিঃসন্দেহে, নিজের জ্ঞান নিজেই লোপ করার বিদ্যে যে আয়ত্ত করেছেন, তা আর আশ্চর্য কী! নাটবল্টু চক্র একটা জীবন্ত বিস্ময়— ওঁকে বুঝে উঠতে আমি পারলাম না— আর ড. কৌ, তুমি পারবে? মনটা তাই খুব হালকা হয়ে গেল, কিন্তু খামকা কোনও উদ্ভট ক্রিয়াকর্ম তো উনি করেন না, স্বেচ্ছা-সংজ্ঞালোপের আশ্রয় নিলেন কেন? প্রশ্নটা করতে যাচ্ছি ড. কৌ নামক দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের বৈজ্ঞানিকটিকে— তার আগেই উনি গজর গজর করতে করতে বললেন— 'ভাগ্যিস পরিচয়টা পেয়েছিলাম আপনার কাছে, নইলে ধরে নিতাম অপদার্থ স্পেসনিক জুটেছে আর একটা।'

স্পেসনিক আবার কীরে বাবা! থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম। ড. কৌ হঠাৎ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু দেখে ফেললেন ভ্যাবাচাকা মুখখানা। চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সেকী কথা! স্পেসনিক কাকে বলে তাও জানেন না?'

আরে সর্বনাশ! এযে দেখছি প্রফেসরের ওপরে যায়! তুলোধোনা করে ছাড়ছে আমার অজ্ঞতা নিয়ে। আমতা আমতা করে কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'না... মানে... ওই আর কী...।'

'থাক, থাক, বুঝতে পেরেছি। বিংশ শতাব্দীর মানুষ যখন বিটনিকদের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?'

'বিটনিক!' বীট-চিনির নাম জানি, বীট-শেকড়ের বৃত্তান্তও জানা আছে, কিন্তু বিটনিক! সে কী বস্তু?

আমার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আর তিলমাত্র সংশয় রইল না ড. কৌ-এর। বঙ্কিম ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'শব্দটা আমেরিকান। ১৯৫০-এর দশকে যেসব বোহেমিয়ান, কবি ইত্যাদি সমসাময়িক সমাজের লক্ষ্য থেকে নিজেদের আলাদা করে এনেছিল, তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে বিট জেনারেশন। পরে বিটনিক বলা হত সেইসব তরুণ-তরুণীদের

'সেই আলোটা—' গলা কেঁপে গেল আমার— 'আপনার সমস্ত শরীর ঘিরে সেই আলোটা ফুটি ফুটি হয়েও আবার মিলিয়ে গেল।'

'ও কিছু নয়। স্পেস-স্ট্যাটিক। গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপারই নয়।'

'কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম সারা শরীর ঘিরে একটা ছটা—'

'সেন্ট এলমোর আগুনের মতো কিছু একটা হবে। সমুদ্রে আকছার দেখা যায়।'

'সেন্ট এলমোর?'

'হ্যাঁ। মাস্তুলের ডগায় জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে।'

'আকাশের নচ্ছার মেঘ থেকে যে বিটলে বিদ্যুৎটা নেমে এসে আপনার ভেতরে ঢুকে পড়ল, সেটাও কি সেন্ট এলমোর আগুন? আপনি যে কিছুক্ষণ মড়া হয়ে থেকেও আবার জ্যান্ত হয়ে উঠলেন, সেটাও কি সেন্ট এলমোরের আগুনের জন্য? বিচ্ছিরিভাবে চেয়ে থেকে কপাল থেকে স্পার্ক ছাড়লেন, তাও কি সেন্ট এলমোর বলে চালাবেন?' রাগে ফুঁসতে থাকি আমি।

'ছিঃ! দীননাথ, বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে ওরকম মাথা গরম করতে নেই। তোমার প্রশ্নের জবাব হাজার হাজার বছর আগে বোলতারা দিয়ে গেছে।'

'বোলতা! বোলতাদের কথা এখানে আসছে কী করে?'

'মানে, ঠিক এই ধরনের অ্যানাসথেসিয়া তারাও আবিষ্কার করেছিল হাজার হাজার বছর আগে স্রেফ জীব বিবর্তনের তাগিদে।'

'অ্যানাসথেসিয়া!'

'ইয়েস মাই বয়, অ্যানাসথেসিয়া। আকাশের বিদ্যুৎ আমাকে মারেনি কিন্তু মড়া বানিয়ে রেখেছিল— তার জের এখনও চলছে— হ্যাংওভার বলতে পারো। বেশি মদ গিললে যা হয় আর কি। রেশ কাটেনি এখনও— এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে—'

'প্রফেসর—'

আমাকে আর কথা বলতে না দিয়ে তড়বড় করে প্রফেসর বলে গেলেন, 'শিকারি বোলতাদের বহু হাজার বছর আগেকার এই আবিষ্কারকেই মানুষ সম্প্রতি নতুন করে আবিষ্কার করেছে— যার নাম দিয়েছে অ্যানাসথেসিয়া—'

'ধুত্তোর অ্যানাসথেসিয়া—।'

'শিকারি বোলতা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে যখন কোনও মাছি বা মাকড়শার ওপর পড়ে তখনই তাকে খতম করে না পুট করে একটা হুল ফুটিয়ে ইঞ্জেকশন দেয়। কিন্তু কী আশ্চর্য! হতভাগ্য মাছি বা মাকড়শা তাতে মোটেই অক্কা পায় না— শুধু অবশ অসাড় হয়ে যায়। মা-বোলতা তখন সেই অচৈতন্য প্রাণীটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় নিজের বাসায়। এইভাবে সাত-আটটা অচৈতন্য মাছি বা মাকড়শাকে পর পর সাজিয়ে রেখে সীল করে বন্ধ করে দেয় বাসার মুখ। অদ্ভুত ব্যাপারটা কী জানো?'

বলে, দম নেবার জন্যে একটু থামলেন প্রফেসর। কিন্তু আমি দম ছাড়বার আগেই আবার শুরু করে দিলেন— 'দেখা গেছে, ওই অচৈতন্য জীবগুলোর সংখ্যা আর বোলতার ডিমের পরিমাণ হুবহু একটা অঙ্কের হিসেবে ছকে নেওয়া— অর্থাৎ ডিম্বস্থ অজাত শিশু

বোলতারা 'লারভা' অবস্থায় যেন খাবারের অভাবে পটল না তোলে, অথবা গেন্ডে মুন্ডে গিলে যেন পেট ফুলে পঞ্চত্বপ্রাপ্তও না হয়— সে হিসেব পাকা গণিতবিদের মতোই করে নেয় অশিক্ষিত মা-বোলতা।'

'বোলতা...বোলতা... বোলতা! আমি জানতে চাই—'

'চেঁচিও না। ব্যাড হ্যাবিট। জীববিজ্ঞানীরা ওই বাসা ভেঙে অচৈতন্য প্রাণীগুলোকে পরীক্ষা করে দেখে তাজ্জব হয়ে গেছেন। দেখেছেন, তারা মারা যায়নি, অথচ প্রাণের যেসব লক্ষণ বাইরে থেকে দেখা যায়, তাও দেখা যাচ্ছে না! এমনই ইঞ্জেকশনের মহিমা যে প্রাণীগুলো জ্ঞান হারিয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকে, অথচ খাবারের অভাবে নিজেরা অক্কা পায় না! পুরো সাত-আট সপ্তাহ তারা পড়ে থাকে অসাড় অবস্থায় মড়ার মতো। মরণঘুমের মধ্যে জানতেও পারে না কখন বোলতার বাচ্চা ডিম ছেড়ে লারভা হল, কখন তারা এগিয়ে এল, এবং ধীরে সুস্থে 'ফ্রিজ' করা সারবন্দি তাজা জ্যান্ত খাবার খেতে শুরু করল। মৃত্যু আসে জ্যান্ত অবস্থাতেই, কিন্তু টের পায় না। অদ্ভুত, তাই না দীননাথ?'

'যেমন আপনাকে মরণঘুম পাড়িয়ে ভূতুড়ে বিদ্যুৎ দখল করছে আপনার সত্তাকে— তখন আর আমাকে চিনতেও পারেন না— উলটে আমাকেও মরণঘুম পাড়ানোর মতলব আঁটেন। কিন্তু এই হাতের গুলিটা দেখেছেন তো,' বলে বাইসেপস ফুলিয়ে দেখাই আমি— 'বিদ্যুতের বাবার ক্ষমতা নেই আমাকে কুপোকাৎ করার।'

অন্যমনস্ক চোখে আমার হাতের গুলির দিকে চেয়ে থেকে প্রফেসর বললেন, 'উঁহু, হাতের মাসল মোটা বলে তুমি রেহাই পেয়েছ বলে আমার মনে হয় না। বুদ্ধি মোটা বলেই—'

'কী বললেন?'

প্রফেসর আর কিছু বললেন না। একেবারে স্থির হয়ে গেলেন। এতক্ষণ মুখে খই ফুটছিল, অকস্মাৎ বোবা হয়ে গেলেন। মুখের চামড়া ঝুলে পড়ল। চোখের চাহনি পালটে গেল আস্তে আস্তে। আস্তে আস্তে চোখ তুললেন আমার দিকে। সভয়ে দেখলাম, ভয়াবহ সেই কৃষ্ণাভ নীলাভ দ্যুতি দেখা দিয়েছে চোখের তারকায়— প্রফেসর আর চেয়ে নেই আমার দিকে। হঠাৎ সমস্ত শরীরটা বিপুলভাবে ঝাঁকুনি খেল একবার... দুবার... তিনবার। প্রফেসর দু'হাতে নিজের দুটো রগ টিপে ধরে ভাঙা গলায় ককিয়ে উঠলেন, 'না... না... না!' পরক্ষণেই আবার সেই অশুভবর্ণের বিদ্যুৎবলয় মাথা ঘিরে ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গেল— পরমুহূর্তেই শরীর ঘিরে বিদ্যুৎ বহ্নি চাপা আভার মতো বিচ্ছুরিত হল সেকেন্ড কয়েকের জন্যে। তাও মিলিয়ে গেল অবশেষে।

প্রফেসর কিন্তু সমানে নিমেষহীন নয়নে চেয়ে আছেন আমার দিকে। না, প্রফেসর চেয়ে নেই— সেই অলপ্পেয়ে বিদ্যুৎটাই তাঁর ঘাড়ে ভর করে চেয়ে আছে আমার দিকে। কেননা হাজার চেষ্টা করেও প্রফেসর হেন সরল মানুষ অমন বক্র কুটিল, ভয়ংকর চাহনি দুচোখের তারায় ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না।

অকস্মাৎ হেসে উঠলেন প্রফেসর। খলখল করে সেকী অট্টহাসি। বিকৃত কণ্ঠের ভয়াল সেই অট্টহাসি শ্রবণ করে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। হাতের বাইসেপস ফুটো

বেলুনের মতোই চুপসে গেল। বুড়ো হাবড়া বলে যে বৃদ্ধকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলাম, অজ্ঞাতসারেই কয়েক পা পেছিয়ে এলাম তাঁর সামনে থেকে।

প্রফেসরের চোখ দিয়ে দুরাত্মা পামরটা তা অবলোকন করল এবং আর এক পশলা অট্টহাসি বর্ষণ করল নির্মম ভঙ্গিমায়।

তারপরেই যেন কেটল-ড্রাম বেজে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। কোনও প্রাণীর কথা বলা যে এমন কর্কশ কানঝালাপালা করা বিকট হতে পারে তা না শুনলে প্রত্যয় হবে না। কট কট ক্যাট ক্যাট ঝন ঝন ঝন শব্দে 'প্রফেসর' বললেন, 'ছোকরা, তোমার গুরু ঠিকই বলেছেন, বুদ্ধি তোমার মোটা বলেই রেহাই পেয়ে গেলে।'

উচ্চারণ জড়িত, শব্দগুলোও অস্ফুট, প্রফেসর সাত জন্ম ভেনট্রিলোকুইজম্ সাধনা করলেও অমন রক্ত-জল করা কণ্ঠস্বর রপ্ত করতে পারবেন না।

গলা শুকিয়ে গেছিল। ঢোঁক গিললাম কেবল।

কণ্ঠস্বর বললে, 'আমি দখল করি কেবল মনকে, মেধাকে— তোমার মতো নিরেট মাথায় তাই আমার ব্রহ্মাস্ত্র প্রবেশ করল না। আশা করি তোমার মতো হেঁড়ে মাথা পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।'

গা-পিত্তি জ্বলে গেল। রেগে তিনটে হয়ে বললাম, 'তুমি কে হে ছোকরা?'

'ছোকরা!' আবার সেই কাড়া-নাকাড়া মার্কা কর্কশ হাসি। 'ছোকরা কী হে! আমার বয়স শুনলে যে এখুনি ভিরমি খাবে।'

'কত বয়স?' একটু একটু সাহস সঞ্চিত হতে থাকে আমার। রেগে গেলে যা হয় আর কি!

'তা কি আর আমারও মনে আছে ছাই। কত লক্ষ বছর যে মহাশূন্যে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি, সে হিসেব আমিও ভুলে মেরে দিয়েছি।'

'মহাশূন্যের জীব তুমি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি কি ভেবেছিলে?'

'ভূত-প্রেত হবে,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম বটে, কিন্তু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

'ভূত প্রেত? তোমাদের পৃথিবীর অভিধানে যাকে বলে অশরীরী? বিদেহী? হাঃ হাঃ হাঃ? অশরীরী তো আমিও। আমার শরীর নেই— কিন্তু আমি ভয়ংকর! আমার দেহ নেই বলেই তো চাই এমন একটা দেহ যার মাথায় গোবর নেই— বুদ্ধি আছে, মন আছে, মেধা আছে। আমার ক্ষিদে শুধু মন আর মেধা— আর কিচ্ছু নয়। হাঃ, হাঃ, হাঃ!'

'যে চুলোয় ছিলে অ্যাদ্দিন, সেই চুলোয় বিদেয় হও। প্রফেসরকে রেহাই দাও।'

'আমার চুলোর কি ঠিক আছে হে? আমি ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি নক্ষত্রদের পাশ দিয়ে, ছায়াপথের পর ছায়াপথের মধ্যে দিয়ে, কত তারকার জন্ম দেখেছি, কত তারকার বিস্ফোরণ দেখেছি, কত ধূমকেতুর উড়ে যাওয়া দেখেছি, কত গ্রহকে ধূমকেতুর ধাক্কায় নতুন রূপ নিতে দেখেছি— যেমন ঘটেছিল তোমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে— ধূমকেতুর ধাক্কায় মহাপ্লাবন হল, অগ্ন্যুৎপাত ঘটল, আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি হল, পেট্রল বৃষ্টি হল, পৃথিবীটা লন্ডভন্ড হয়ে গেল— আমি তখন পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলাম। দেখলাম সমুদ্র ফুটছে, মহাদেশ

তেতে লাল হয়ে গেছে, পাথর গলে যাচ্ছে, জঙ্গল পুড়ছে। আমি দেখলাম বৃহস্পতি গ্রহের খানিকটা অংশ ছিটকে এসে ধূমকেতু হয়ে গেল— পৃথিবীটাকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে নিজে হয়ে গেল আর একটা গ্রহ— তোমাদের শুক্রগ্রহ। পৃথিবীতে পালে পালে মানুষ মরছে দেখে টহল দিতে গেলাম ছায়াপথের অন্য অঞ্চলে। ফিরে এসে দেখি পৃথিবীতে আবার মেধার সৃষ্টি হয়েছে। সারা গ্রহটাকে চরকিপাক দিয়ে সন্ধান পেলাম তোমার এই গুরুদেবের— যার চাইতে বড় মেধা আজও কোথাও পাইনি। হে মূর্খ, আমার মধ্যে শক্তি আছে। তবুও আমি অসহায়— কারণ আমার দেহ নেই। আমি সর্বশক্তিমান হয়েও নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকেছি। প্রাণময় হয়েও নিষ্প্রাণ হয়ে থেকেছি— মন আর মেধার সন্ধানে বুভুক্ষের মতো হন্যে হয়ে এক নক্ষত্রজগৎ থেকে আরেক নক্ষত্রজগতে পাড়ি জমিয়েছি। আজ আমায় অভিযান সার্থক হয়েছে— পেয়েছি উপযুক্ত আধার— প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এখন আমার।'

'না, আমার!' ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করে বললাম আমি।

অট্ট অট্ট হাসি হাসল কণ্ঠস্বর, 'বালক, তোমাকে আমার দরকার নেই। তোমার মন নেই, মেধাও নেই। আছে গুচ্ছের মাংসপেশি— যা সংহার করতে পারি চোখের নিমেষে।'

ধূর্ত চোখে তাকিয়ে মুখ বেঁকিয়ে হাসলাম এতক্ষণ পরে— 'কচু পারো। তা পারলে কি আর এতক্ষণ টিকিয়ে রাখতে? তোমার কুচুটে বিদ্যুতের দৌড় তো দেখলাম। আমার এই গুচ্ছের মাংসপেশির কাছে তোমার অশরীরী কেরামতি—'

আমার গলার আওয়াজ ডুবিয়ে এমন একখানা বিচ্ছিরি হাসি হাসল হতচ্ছাড়া কণ্ঠস্বর যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। কট কট ক্যাট ক্যাট ঝন ঝন ঝ্যান ঝ্যান মার্কা সৃষ্টি ছাড়া জগঝম্প বাজনা বাজিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'হে বিখ্যাত মূর্খ, শরীর দরকার তো সেই জন্যেই।'

'শরীর! মূর্খাধিপতি কুচুন্ডে, তোমার শরীর তো এক বৃদ্ধের। আমার এই বাইসেপসের মাপটা জানো?'

এবার গোটা ঘরটাই ঝন ঝন করে উঠল হাসির দমকে। মহাকাশের ভূত বাবাজী খুব রসিক যা হোক। কথায় কথায় তামাশা করতে পারে। হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি। তাল সামলাতে না পেরে টলমল করে ঠিকরে গেল দেওয়ালের দিকে। দড়াম করে ধাক্কা খেল দেওয়ালের গায়ে। এবং পরক্ষণেই ঝড়াং করে সিধে হয়ে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে।

হাতের মুঠোয় দেখলাম একটা রে-গান। ১৯৮১-র পৃথিবীতে বাচ্চারা যে রে গান নিয়ে লড়াই লড়াই খেলা করে, অবিকল সেই ডিজাইনের। দেওয়ালের গায়ে অগুনতি বিদঘুটে যন্ত্রের মাঝে ক্লিপে আটকানো ছিল, মহাশূন্যের ভূত আমার সঙ্গে মশকরা করার অছিলায় ছিটকে গিয়ে এই অস্ত্রটিই দেওয়াল থেকে খসিয়ে এনে তাগ করে ধরেছে আমার দিকে।

খেলনা দেখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। তবুও ভয় পেলাম। ১৯৮১-র মেদিনীতে যা খেলনা, ৫০০০ সালের টাইটান উপগ্রহে তা কি আর নিছক খেলনা? সুতরাং হুঁশিয়ার হওয়াই ভাল।

বাইরে কিন্তু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, 'লড়াই লড়াই খেলবে বুঝি? কিন্তু কীরকম

আক্কেল তোমার? শুধু হাতে খেলা যায়? দাও আমাকে আর একটা।'

বলেই এক-পা বাড়ালাম দেওয়ালের দিকে— যেদিকে আর একখানা রে-গান দেখেছিলাম ক্লিপে-সাঁটা অবস্থায়।

কিন্তু ওই এক-পা-র বেশি আর এগোতে হল না। যেন সর্পরাজ কালীয় গর্জে উঠল সহস্র ফণায়। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দিলে কালীয়'র সহস্র ফণা দিয়ে আগুন আর ধোঁয়া ঠিকরে এসেছিল— কিন্তু ভূতাবিষ্ট প্রফেসরের দুটো চোখ দিয়ে কেবল ঠিকরে এল কালচে-নীল স্ফুলিঙ্গ— ধোঁয়াটারই যা কেবল আবির্ভাব ঘটল না ব্যাদিত মুখগহ্বরে।

ভীষণ গর্জে উঠে, রে-গান আমার দিকে নির্ভুল লক্ষ্যে তাগ করে বললে মহাশূন্যের ভৌতিক কণ্ঠস্বর, 'খবরদার! তোমার হাড় মাস পিণ্ডি পাকাতে বাহুবলের প্রয়োজন হবে না— অস্ত্রবলই যথেষ্ট। এখন বুঝেছ দেহধারণ করার প্রয়োজন কেন?'

আমার তখন হাঁটু পর্যন্ত অবশ হয়ে এসেছে। ওই গর্জন আর ওই স্ফুলিঙ্গ দেখে আমি তো আমি, ভীম-কুম্ভকর্ণ-হারকিউলিসরাও পিঠটান দিত।

এমন সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আচমকা থরথর করে কেঁপে উঠল প্রফেসরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। খুব জোরে বারদুয়েক মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর— এত জোরে যে ভয় হল ঘাড় থেকে মাথাখানা খসে না পড়ে। ওই তো পলকা ঘাড়।

পরক্ষণেই চোখ বুজে ককিয়ে উঠলেন প্রফেসর তাঁর চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে, 'না...কক্ষনও না! দীননাথ, আমি পারছি না... সরে যাও... পালাও!'

বলতে না বলতেই আবার সেই ঝাঁকুনি। বুড়োর ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যাবে যে! আবার কয়েক ঝলক নীলাভ-কালচে বিদ্যুৎ বহ্নি বিচ্ছুরিত হল সারা গা ঘিরে— সেই সঙ্গে মাথা বেড় দিয়ে লিকলিক করে উঠল অলক্ষণে সেই বিদ্যুৎ বলয়। নেতিয়ে পড়লেন প্রফেসর— ক্ষণেকের জন্যে ঠিক যেন গলা টিপে ঘাড় গুঁজে ধরে পায়ে টিপে শায়েস্তা করা হল বেচারি প্রফেসরকে। চোখ আবার খুলে গেল, আবার নির্গত হল স্ফুলিঙ্গ, সিধে হল শিরদাঁড়া। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়াল কণ্ঠস্বর, 'জাহান্নমে যা!'

বলেই, রে-গানের ট্রিগার টিপে দিল প্রফেসরের আঙুল।

কিন্তু তার আগের কয়েক সেকেন্ডের প্রচণ্ড খেঁচুনি আর দুটো সত্তার মধ্যে ধস্তাধস্তির ফলে লক্ষ্য আর ঠিক থাকেনি। একচুলের জন্যে বেঁচে গেলাম আমি। কড় কড় কড়াৎ শুধু একটা আওয়াজ হল, আগুন-টাগুন কিচ্ছু দেখতে পেলাম না রে-গানের মুখে। আমার পায়ের কাছ থেকে খানিকটা মেঝে হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেল। দেখা গেল একটা গহ্বর। ভক করে একতাল কটু গ্যাস ঘরে ঢুকল তার মধ্যে দিয়ে। আমার নাকে লাগতেই খকখক করে কাশতে কাশতে চোখে ধোঁয়া দেখলাম। টলে পড়ে যেতে যেতে যেন কুয়াশার মধ্যে দেখলাম ভূতাবিষ্ট প্রফেসরও সটান আছড়ে পড়লেন মেঝেতে— রে-গান ঠিকরে গেল হাত থেকে। তারপর তার মনে নেই।

৮
মহাশূন্যের ভূত

চোখ মেলে দেখলাম আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে অনেকগুলো মুণ্ড। মাথার ওপর জ্বলছে ঘরের ছাদ— পুরো ছাদটাই মৃদু আলোয় আলোকিত। মুণ্ডগুলোর মুখে মৃদু হাসি। অভয়ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কারও মুখ কালো, কারও সাদা। চুলও হরেক রঙের। প্রত্যেকের কপালে একটা সাদা পটি— তাতে লাল রেড ক্রশ।

দেখে তো অবাক! এ আবার কোথায় এলাম? জ্ঞান হারানোর আগে তো মুণ্ডধারীদের কাউকে দেখিনি। প্রত্যেকটা মুণ্ডই মানুষের। পোশাকও বিংশশতাব্দীর পোশাকের মতো— শুধু যা ঢিলেঢালা এবং মসৃণ উজ্জ্বল কোনও ধাতু নির্মিত। বয়নশিল্পেও অভিনবত্ব আছে। এক এক জনের পোশাক এক এক রকমের। তাক লেগে যায়। পোশাকের ডেসক্রিপশন দিতে গেলে এ কাহিনি লম্বা হয়ে যাবে— তাই বাদ দিলাম।

একটা মুণ্ড হাসি হাসি মুখে বললে, 'স্বাগতম।'

স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে ছিটকে উঠে বসলাম। বলে কি লোকটা! স্বাগতম! টাইটান উপগ্রহে খাঁটি বঙ্গভাষায় আপ্যায়ন জানায়, এ কোন আদমি রে বাবা!

বিষম বিস্ময়টা কথা হয়ে ঠিকরে এল গলা দিয়ে— 'মানে?'

'মানে, টাইটানে স্বাগতম জানাই পৃথিবীর মানুষকে।'

এবার কিন্তু আমি বাকরহিত হয়ে গেলাম। বাকযন্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। চোখদুটোও নিশ্চয় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল এবং হাস্যকর হয়ে উঠেছিল মুখভাব। কেননা, মুণ্ডধারী অভয়দ চাহনি দিয়ে নিষিক্ত করতে করতে ফিক করে হেসে ফেলল— 'এত অবাক হচ্ছেন কেন?'

বিদ্রোহী বাকযন্ত্রকে দমন করে আবার সরব হল আমার কণ্ঠস্বর, 'এরপরেও বলছেন অবাক হচ্ছি কেন?'

'কেন বলুন তো?'

'এ সালটা খেয়াল আছে?'

'পৃথিবীর হিসেবে, মানে, যিশুখ্রিস্টের জন্মের হিসেব ধরে, ৫৩২১ সাল।'

'আমি এসেছি পৃথিবীর ১৯৮১ সাল থেকে।'

'তাতে হয়েছে কী?'

'হওয়ার আর বাকি রাখলেন কী? তিন হাজার তিনশো চল্লিশ বছর পরেও বাংলা শুনতে হচ্ছে বারো হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি লক্ষ কিলোমিটার দূরের গ্রহ শনিগ্রহের টাইটানে! আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? নাকি আমি মরে ভূত হয়ে গেছি?'

'কোনওটাই হননি। আমরি বাংলা ভাষা আরও হাজার হাজার বাঁচবে— ছায়াপথের যেখানে যেখানে মানুষ কলোনি গড়ে তুলছে— সব জায়গায় বাংলাভাষাই আমাদের কথোপকথনের একমাত্র ভাষা।'

'তার মানে আপনি বলতে চান আপনি... আপনারা বাঙালি?'

'আমরা পৃথিবীর মানুষ।'

সাদা কালো মুখ এবং হরেক রঙের চুল লক্ষ করলাম। মুখের গঠনও বিভিন্ন রকমের। নিগ্রো, ককেশীয়, ভারতীয়— সব জাতের মানুষই আছে এদের মধ্যে।

বললাম, 'পৃথিবীর সব জাতের মানুষ?'

'হাজার হাজার বছর আগে অনেক জাত ছিল বটে পৃথিবীতে, এখন নেই। এখন সেখানে একটাই জাত— মানুষ জাত। একটাই ভাষা— বাংলা ভাষা।'

'কিন্তু সামান্য একটা প্রাদেশিক ভাষা বিশ্বজনীন ভাষা হল কী করে তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'খুব সহজে। বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষাই ছিল একমাত্র ভাষা যার মধ্যে উন্নাসিকতা ছিল না, সংকীর্ণতা ছিল না, কূপমণ্ডুকতা ছিল না। বাংলা ভাষাই ছিল একমাত্র ভাষা যে ভাষার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছিল বিবিধ অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। মনে-প্রাণে বাঙালিরা ছিল উদার এবং প্রেমিক। নিজেদের দেশে বিশ্বের সব জাতকে ঠাঁই দিয়ে তাদের যেমন আপন করে মাটির মানুষ করে নিয়েছিল, বিশ্বের সব ভাষাকেই বাংলা ভাষায় মিশিয়ে আদি ভাষার পুষ্টিসাধন করে উন্নত করেছিল। একদল গোঁড়া সংরক্ষণশীল বাঙালি যদিও পরিভাষা নিয়ে খুব মাতামাতি জুড়েছিল— কিন্তু খটমট দাঁতভাঙা দুর্বোধ্য পরিভাষার চাইতে বিদেশি শব্দগুলো যে অনেক অর্থবহ, প্রাঞ্জল এবং সহজ, এই সত্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল দেশের মানুষ— তাই পরিভাষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকেনি— ভাষা সম্প্রসারিত হয়েছে, চৌহদ্দি বিস্তৃত হয়েছে, ক্রমশ তা সমৃদ্ধ হয়েছে। শেষে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যখন বিশ্বের সব মানুষই তাদের ভাষার ভাণ্ডার দেখতে পেয়েছে বঙ্গভাষার মধ্যেও, বঙ্গভাষাকে আর বিদেশি ভাষা বলে মনে হয়নি— উপরন্তু ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত-ভিত্তিক বঙ্গভাষা এমন উৎকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বিশ্বের সব মানুষকে যখন একভাষার সূত্রে গাঁথার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন ভাষাবিদরা বঙ্গভাষার বিকল্প আর খুঁজে পেল না। হাজার হাজার বছর পরে তাই বাংলাভাষাই মানুষ জাতের একমাত্র ভাষা— যে ভাষার মধ্যে পাবেন বাংলা বানানে বহু বিদেশি শব্দ— প্রতিশব্দ নয়। ফলে প্রতিটা শব্দই প্রকৃত অর্থবোধক। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ঐশ্বর্য তাই এত বৃদ্ধি পেয়েছে, আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দসম্ভার বাংলাভাষার অঙ্গীভূত হয়ে অনেক অসুবিধে দূর করেছে।'

দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বক্তা স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, খাড়া নাক, চওড়া কপাল, ধারালো চিবুক এবং চাহনি বেশ তীক্ষ্ণ। মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায় না কোন দেশের মানুষ। খাড়া নাকের জন্য মনে হয় ইউরোপীয়ও বটে, আবার পুরু ঠোঁট আর উঁচু হনুর জন্য নিগ্রোও বটে, কৃষ্ণচক্ষুর জন্যে স্পেনীয় বা ভারতীয়ও হতে পারে। অমন খাসা সোনালি রেশমী চুলের জন্যে ইংরেজ বলেও ভাবা যায়। হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে সব জাত মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে— তার জীবন্ত নিদর্শন চোখের সামনে।

প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে বক্তা বললে, 'আরও জিজ্ঞাস্য আছে নাকি?'

'ক্রমশ প্রকাশ্য,' বললাম আমি। 'সবার আগে যা জানতে চাওয়া উচিত ছিল, এবার তা জিজ্ঞেস করছি। প্রফেসর কোথায়?' বললাম খুব কুণ্ঠার সঙ্গে। বিস্ময়ের তাড়নায় মূল জিজ্ঞাস্যটাই বিস্মৃত হয়েছিলাম এতক্ষণ।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল বক্তার। জ্বলজ্বল করতে লাগল ভুরু জোড়ার ওপরে লাল রেডক্রশ। হাজার হাজার বছর আগেকার রেডক্রশ। চিকিৎসার প্রতীক। আজও তা অব্যাহত— এবং সুদূর টাইটানে। আমিও যে চিকিৎসাকেন্দ্রে আছি, তা ওই রেডক্রশ চিহ্ন দেখেই মালুম হয়েছিল। এদের জিম্মায় বহাল তবিয়তে নিশ্চয় আছেন— অবচেতন মনের কারসাজিতেই তাঁর কথা নিশ্চয় এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। কুণ্ঠা ঈষৎ স্তিমিত হল।

ভ্রূভঙ্গি করে বক্তা বললে, 'বৃদ্ধ ভদ্রলোক তা হলে শিক্ষাবিদ? কীসের প্রফেসর?'

'কিচ্ছুর না। উনি শখের বৈজ্ঞানিক।'

'নাম?'

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

চিন্তান্বিত মুখে স্বগতোক্তি করল বক্তা। 'নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর অনেক অদ্ভুত কাণ্ড কারখানার স্রষ্টা দ্য গ্রেট বেঙ্গলি ব্রেন?'

বুকটা দশ হাত হয়ে গেল প্রফেসরের সুখ্যাতিতে। পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালে সুদূর টাইটান গ্রহেও তা হলে ওঁর নাম পৌঁছেছে!

বললাম বুক ফুলিয়ে, 'হ্যাঁ, তিনিই।'

সাগ্রহে বললে বক্তা, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার জন্যে। কিন্তু তিনি হঠাৎ ওই জবরজং টাইম মেশিনটা আবিষ্কার করতে গেলেন কেন?'

বেশ শরীফ ছিল মেজাজটা, গেল খিঁচড়ে সময়গাড়িকে জবরজং বলায়। যদিও ওই বিদখুটে কলখানা বিকল হওয়ার ফলেই সময়স্রোতে এবং ঘটনাস্রোতে ভাসতে ভাসতে এতদূর চলে এসেছি, তবুও তাকে জবরজং বললে রাগ তো হবেই।

কাষ্ঠকণ্ঠে বললাম, 'জবরজংয়ের কি দেখলেন? অমন মেশিন পারবেন আপনারা আর একটা আবিষ্কার করতে?'

আমার উষ্মা দেখে মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে বক্তা বললে, 'আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে কথাটা বলিনি। অন্যায় হয়েছে, মাপ চাইছি, কিন্তু কি জানেন— আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।'

'দীননাথ।'

'আমার নাম কৌ। ডক্টর কৌ।'

'কৌ! এ আবার কি নাম? ছেলেবেলায় আমার ক্লাসে কৌস্তভ নামে একটা ছেলে ছিল। তাকে শর্টকাটে ডাকতাম কৌ বলে— আপনারাও ওই ভাবে নাম শর্টকাট করেছেন নাকি?"

'ঠিক ধরেছেন। আজকাল নামকেও কেটে ছেঁটে ছোট করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আপনারা যেমন 'কুমার' বাদ দিয়েছিলেন নামের প্রথম আর শেষ শব্দ দুটোর মাঝখান থেকে— সেইরকম ভাবে আমারও পুরো নামটাকেই সংক্ষিপ্ত করে এনেছি সময় বাঁচানোর জন্যে। যাক, যা বলছিলাম দীননাথবাবু।'

‘বলুন, বলুন। টাইম মেশিনকে জবরজং বললেন কেন? জানেন ১৯৮১-র পৃথিবীতে টাইম মেশিন এখনও একটা কপোলকল্পনা? অলীক বিস্ময়? টাইম মেশিন যে সম্ভবপর হতে পারে, কোনও সিরিয়াস বৈজ্ঞানিক তা বিশ্বাস করেন না।? কিন্তু প্রফেসর সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন স্রেফ ঝোঁকে পড়ে। আর আপনি বলছেন কিনা মেশিনটা জবরজং? প্রথম আবিষ্কার ওই রকমই হয়। পরে ঠিক হয়ে যায়। যেমন মোটর, এরোপ্লেন, সাবমেরিন।’

নরম হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে নিশ্চুপে আমার কথার ফুলঝুরি শুনছিলেন ড. কৌ। আমি গজগজ করতে করতে স্তব্ধ হতেই বললেন মোলায়েম গলায়, ‘খুব রেগেছেন দেখছি। কিন্তু আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন।’

‘তবে?’

‘প্রথম আবিষ্কার ওই রকমই হয়। এখনকার টাইম মেশিন অনেক উন্নত।’

চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার, ‘টাইম মেশিন আপনারাও করেছেন নাকি?’

চোখ নাচিয়ে ড. কৌ বললেন ‘করেছি বইকি। কিন্তু আমরা তাকে টাইম মেশিন বলি না।’

‘কী বলেন?’

‘স্পেস মেশিন।’

‘কেন?’

‘কেননা ওই মেশিনে চেপেই গ্রহ-গ্রহান্তরে চক্ষের নিমেষে উপস্থিত হই আমরা। স্পেসশিপে চেপে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়া আর ডিঙি নৌকোয় চেপে মহাসাগর পাড়ি দেওয়া একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তাই নয় কি? গতির যুগে তাই স্পেসশিপ এখন অচল— এসেছে স্পেস মেশিন।’

‘স্পেস মেশিনে চেপে গ্রহ-গ্রহান্তরে পাড়ি!’ বিমূঢ়ের মতো বললাম আমি।

‘এতে অবাক হওয়ার কি আছে? ভর্টেক্সের নাম শুনছেন?’

‘ভর্টেক্স!’ ঢোঁক গেলে বললাম, ‘না তো!’ সেই মুহূর্তে মনে পড়ল আমার প্রতি প্রফেসরের একটি প্রিয় গালাগাল। খুব রেগে গেলে সংস্কৃত ঝাড়েন প্রফেসর। আমাকে সংস্কৃত গালাগালি দিয়ে বলেন, কিং জীবিতেন পুরুষস্য নিরক্ষরেণ। বাংলাটাও করে দেন সঙ্গে সঙ্গে— মূর্খ পুরুষের জীবনধারণ নিষ্ফল। ড. কৌয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে মরমে মরে গেলাম আমি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প্রফেসর থাকলে কি এ অবস্থায় পড়তে হতো!

আমার মুখভাব অবলোকন করে আমার মনের কথা যেন আঁচ করে ফেললেন ড. কৌ। এবং কী আশ্চর্য! জবাবও দিলেন সংস্কৃতে।

বললেন, ‘ন হি সর্ববিদঃ সর্বে।’

‘মানে?’ আচমকা প্রশ্নটা ছিটকে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। বলে ফেলেই কানের ডগা পর্যন্ত লাল করে ফেলেছিলাম নিশ্চয়, কেননা ড. কৌ অনেকটা সান্ত্বনার সুরে বললেন, ‘মানে হল, সকলেই সব বিষয় জানে না।’

‘তা ঠিক,’ বললাম কাষ্ঠ হেসে, ‘কিন্তু ওই কর্টেক্স মানেটা?’

‘কর্টেক্স নয়— ভর্টেক্স’, মোলায়েম হাসি হাসলেন ড. কৌ। ‘ভর্টেক্স হল স্পেস আর

টাইমের মধ্যে সেই রহস্যজনক অঞ্চল যেখানে এই দুটো মিলে এক হয়ে গেছে। আমাদের স্পেস মেশিন এই ভর্টেক্সের মধ্যে দিয়ে ট্র্যাভেল করে— চকিতে পৌঁছে যায় এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে— ছায়াপথের দূর দূরান্তের গ্রহে। কোটি কোটি টাকার জ্বালানি পুড়িয়ে গরিব পৃথিবীকে আরও গরিব করার আর দরকার হয় না। ভর্টেক্স নামটা কিন্তু আপনার জানা উচিত ছিল দীননাথবাবু। প্রফেসরের সঙ্গে যখন টাইম মেশিনে সময়পথের পর্যটক হয়েছেন, সায়েন্স ফিকশনে নিশ্চয় অনুরাগ আছে?'

'আছে বই কী। আমি নিজে তো লিখি।' গর্বের সঙ্গে বললাম।

'তা হলে তো ভর্টেক্স নামটা জানা উচিত ছিল। এই নামেই বিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে একটা সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল। তা ছাড়া, ভর্টেক্স, হাইপার স্পেস ইত্যাদি শব্দগুলো আপনার যুগের সায়েন্স ফিকশন মহলেই তো বেশি প্রচলিত— বিজ্ঞানীমহল নিশ্চয় নাক সিঁটকোন?'

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম মৃদু ভর্ৎসনায়। কী করে লোককে বলি যে আমরা যারা সায়েন্স ফিকশন লিখি, তারা না জেনেই লিখি। তাই তো বাংলার সায়েন্স ফিকশন অপাংক্তেয় রইল— জাতে আর উঠল না। এই সুযোগে কিছু ব্যক্তি সায়েন্স ঠেসেঠুসে সায়েন্স ফিকশনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফিকশনকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছেন। ফলে সায়েন্স ফিকশন হচ্ছে না-সায়েন্স না-ফিকশন— সে এক উদ্ভট বস্তু। কিন্তু ড. কৌ-এর কাছে আমাদের দূরবস্থার কথা ফাঁস করা ঠিক হবে না। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন হওয়ার অভিনয় করে বললাম, 'কিন্তু প্রফেসর কোথায়?'

সৌম্যদর্শন ড. কৌ অতিশয় ধড়িবাজ। আমার মতলব বুঝে শুধু একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, 'দেখবেন?'

'নিশ্চয়! চলুন, যাই।'

'যেতে হবে না। এখানে বসেই দেখবেন।'

৯

অজ্ঞাত জীবাণু

আশ্চর্য শৃঙ্খলাবোধ বটে ড. কৌ-এর সঙ্গীদের। এতক্ষণ কথা বলে গেলেন ড. কৌ একাই, ঘরশুদ্ধ কেউ টুঁ শব্দটি করেনি। হাজার হোক আমি তাদের দেশে আগন্তুক। মামুলি আগন্তুক নই— তিন হাজার তিনশো সাত চল্লিশ বছর আগেকার প্রাচীন পৃথিবী থেকে এসেছি। ১৯৮১-র পৃথিবীতে পৌরাণিক যুগের বৈদেশিক দর্শনপ্রণেতা কণাদমুনি সহসা টাইম মেশিনে চেপে উপস্থিত হলে নিশ্চয় কেউ মুখে চাবি এঁটে বসে থাকতাম না। পরমাণুবাদী কণাদকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করতাম। জিজ্ঞেস করতাম, সত্যিই কি তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পরমাণুবাদের প্রচারক? জানতে চাইতাম, কেন তাঁর দর্শনে, মানে কণাদ-দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় না? কোন তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি 'বিশেষ' নামক এক অতিরিক্ত

পদার্থ স্বীকার করেছেন? কোন প্রমাণের বলে তিনি বলেন যে একমাত্র পরমাণুই সৎস্বরূপ নিত্যপদার্থ, তার আর কারণ নেই? কী কী পরীক্ষা করবার পর তিনি বলতে শুরু করেন যে সমস্ত জড়পদার্থই পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে— বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে— তারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলে প্রতীতি হয়? হাজার জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলে নাজেহাল করে দিতাম তণ্ডুলকণা, ভক্ষক মহর্ষি কণাদকে— বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আমাদের এমনিতেই বড় প্রবল— প্রবলতর আমাদের শৃঙ্খলাবোধহীনতা। কিন্তু টাইটানের এই এক-জাত এক-মানুষ সম্প্রদায়ের মানুষগুলি যেন অন্য ধাতুতে গড়া। দীর্ঘ বাক্যবিনিময়ের মধ্যে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল— বাক্যস্ফূর্তি ঘটল না কারও কণ্ঠে— আঙুল পর্যন্ত নাড়িয়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল না। ক্রমবিবর্তন মানুষকে দেখছি অনেক সম্পদ দান করেছে, তার মধ্যে পেয়েছে তিনটি মহাশক্তি— ধৈর্য, তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতা।

দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বললাম, 'কই দেখান?'

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আন্দোলনে সংকেত করলেন ড. কৌ। শ্যামলবরণ না-নিগ্রো না-ইউরোপীয় এক পুরুষ গিয়ে দাঁড়াল মৌচাকের খোপের মতো দেওয়ালের সামনে। হাত বাড়িয়ে একটা বোতাম স্পর্শ করতেই ড. কৌ বলে উঠলেন, 'ঋ, দাঁড়াও। ভিসিফোন পরে, আগে স্পেস রাডার স্ক্রীন।'

হাত সরিয়ে নিয়ে তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে প্রায়-অদৃশ্য একটি বোতাম স্পর্শ করল ঋ নামক না-নিগ্রো না-ইউরোপীয় যুবকটি। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের একটা আয়তাকার অংশ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল বহুবর্ণের ছটায়। অপরূপ দৃশ্য ভেসে উঠল পর্দার বুকে। কালার টেলিভিশন যারা দেখেছে, তারাও হতবাক হয়ে যাবে সেই বিচিত্র বর্ণসমাহার দেখে। চুলের মতো সূক্ষ্ম রেখাগুলি পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল পর্দার ছবিতে। ছবিটা শনিগ্রহের। বিশাল গ্রহ ভাসছে মহাশূন্যে। জ্যোতির্বলয়ের মতো একটা আংটির বেড় রয়েছে চারদিকে। এত কাছ থেকে এত স্পষ্টভাবে রহস্যাবৃত এই গ্রহকে ১৯৮১-র কোনও বৈজ্ঞানিক আজ পর্যন্ত দেখেননি। তাঁরা দেখেছেন উড়ন্ত মহাকাশযান থেকে পাঠানো ঝাপসা ছবি— আর আমি দেখছি সরাসরি সুস্পষ্ট শনি-চিত্র। মুগ্ধ চোখে তাই চেয়ে রইলাম।

সম্বিৎ ফিরল ড. কৌ-এর কণ্ঠস্বরে। আত্মসমাহিত ভাবগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'এই আমাদের বর্তমান উপনিবেশ। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবী থেকে অভিযানে বেরিয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষ। মহাশূন্যের বহু গ্রহ-উপগ্রহে কলোনি সৃষ্টি করেছিল— মর্তের মানুষ তাই আজ স্বর্গকেও অধিকার করেছে। পৌরাণিক যুগে আকাশকেই তো আপনারা স্বর্গ বলতেন, তাই না দীননাথবাবু? সেই আকাশ, মহাকাশ, মহাশূন্য, ছায়াপথ এবং কোটি কোটি নক্ষত্রলোকে আজ আমরা যথেচ্ছ বিচরণ করি শুধু স্পেস মেশিনের দৌলতে। পৃথিবীতে আর আমরা ফিরে যেতে চাই না স্বর্গলোক ছেড়ে। ঋ, টাইটান দেখাও।'

ঋ স্পর্শ করল আর একটা বোতাম। সমুজ্জ্বল হল আর একটা ধাতব পর্দা। বিপুল উপগ্রহ টাইটান ঝলমল করতে লাগল চোখের সামনে। দ্রুত তা কাছে এগিয়ে এল... আরও

কাছে... আরও। দানবিক ফ্যান দেখলাম অনেকগুলো। সারা উপগ্রহ-পৃষ্ঠ জুড়ে খাড়া রয়েছে অতিকায় ফ্যানের পর ফ্যান।

গাঢ় স্বরে কানের কাছে বললেন ড. কৌ— 'হাইড্রোজেন-মিথেন বায়ুমণ্ডলকে শুষে নেওয়া হচ্ছে, সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে দিয়ে জমা করা হচ্ছে স্টোরেজ ট্যাঙ্কে। এই থেকেই তৈরি হচ্ছে কেমিক্যাল বুস্টার ফুয়েল— এর শেষ নেই— শেষ নেই আমাদের শক্তিরও। বিংশ শতাব্দীর পাওয়ার প্রবলেম, পেট্রল সমস্যা, ইলেকট্রিসিটির বিপর্যয় আমাদের পীড়িত করে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ইলেকট্রিসিটিও একদিন এইভাবে আহরণ করে সমস্ত গ্রহটাকে ঝলমলে করে তোলা হয়েছিল— সেই পদ্ধতিই আমরা প্রয়োগ করেছি টাইটানে। এখানকার পাথরের গভীরে যন্ত্রপাতি আর ঘর বাড়ি বানিয়ে থাকি— পেট্রল আর কয়লার জন্যে খোঁড়াখুড়ি করি না। জ্বালানি আসে মাথার ওপরকার বায়ুমণ্ডল থেকে। গ্যাস পাইপ, মেট্যাল করিডর, গোলকধাঁধার মতো সুড়ঙ্গে ঝাঁঝরা করে রেখেছি টাইটানকে— এই আমাদের ঘরবাড়ি, এই আমাদের স্বর্গ, এই আমাদের সব।'

আবেগে গমগমে হয়ে উঠল ড. কৌ-এর কণ্ঠস্বর। টাইটানকে যে তিনি কী পরিমাণে ভালবাসেন, তা এতক্ষণ বুঝিনি। বুঝলাম, টাইটান প্রসঙ্গ আসতেই তাঁর বিচলিত হওয়া দেখে, আবেগমথিত থরথর কণ্ঠস্বর শুনে। সংযত করে নিলেন নিজেকে সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'ঋ, এবার গ্যালাক্সি হাসপাতালের দ্বিতীয় স্তর।' বলেই বললেন, 'না, দাঁড়াও, দীননাথবাবুকে তার আগে একটা কথা বলে নিই। দীননাথবাবু, আমার সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও আপনাকে দেওয়া হয়নি। আমি পৃথিবীর ধন্বন্তরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টাইটানে এসেছি অ্যাসটেরয়েড বেল্টে নতুন আর দুষ্প্রাপ্য ব্যাধির সন্ধানে। জীবাণু গবেষণাই আমার সাধনা। আপনাদের নিয়ে তাই আমার এত আগ্রহ।'

'কেন?' ঔৎসুক্য বাঁধভাঙা বন্যার মতো তোড়ে বেরিয়ে এল ওই একটিমাত্র শব্দের মধ্যে।

ড. কৌ নিবিড় চোখে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের দুজনকেই পেয়েছি প্রকোষ্ঠের একটিতে অজ্ঞান অবস্থায়। যদিও আপনারা ফোর্থ ডাইমেনশনের মধ্যে দিয়ে এসেছেন, কিন্তু কোনও অজানা জীবাণু বহন করে এনেছেন কিনা, তা আমার দেখার দরকার ছিল। তাই আপনাদের দুজনকে আলাদা রেখে পরীক্ষা চলেছে। আপনাকেও এতক্ষণ পরীক্ষা করছিলাম।'

'পরীক্ষা করছিলেন!' বলে কি লোকটা! বকবক করার নাম পরীক্ষা।

গম্ভীর মুখে ড. কৌ বললেন, 'আপনি সুস্থ। সম্পূর্ণ সুস্থ। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, আপনি তা থেকে মুক্ত। ধাঁধাটা সেইখানেই। একই পথের সঙ্গী হয়ে আপনি নীরোগ, কিন্তু তিনি এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন?'

'বলব?' ধড়ফড় করে বললাম আমি।

উজ্জ্বল হল ড. কৌ-এর চাহনি— 'আপনি জানেন?'

'হাড়ে হাড়ে জানি,' বলে বিবৃত করলাম সমস্ত ঘটনা। কলকাতার আকাশে সেই অলক্ষণে বিদ্যুতের আবির্ভাব থেকে টাইটানে মহাকাশভূতের সঙ্গে রে-গান যুদ্ধ পর্যন্ত— কিচ্ছু বাদ

দিলাম না। নিবিড় আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি কথা শ্রবণ করলেন ড. কৌ— বাগড়া দিলেন না, কৌতূহল প্রকাশ করলেন না অযথা প্রশ্ন করে। আমি সবশেষে বললাম, 'ওই ব্যাটা ভূতটাই সব নষ্টের মূল। ভূতে মেধা চায়, এই প্রথম শুনলাম। আমি বেঁচে গেছি, ওই বস্তুটা আমার মাথায় একটু কম আছে, তাই।' সত্যি কথা বলতে কি, শেষের কথাগুলো বলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ডাক্তার-উকিলের সামনে কিছু গোপন করতে নেই— পৃথিবীতে শেখা এই আপ্তবাক্যটি স্মরণ করেই নিজের নিন্দা নিজেই করলাম স্রেফ প্রফেসরের নীরোগ কামনায়।

ড. কৌ-এর অটল আত্মবিশ্বাসে যে চিড় ধরাতে পেরেছি, তা লক্ষ করে কিন্তু পরক্ষণেই উল্লসিত হলাম। কেন না, উনি মস্তক কণ্ডূয়ন করলেন, মানে, মাথা চুলকোলেন। স্পষ্টত ধাঁধায় পড়েছেন। খুব যে বড়াই করে বলছিলেন একটু আগে, নতুন আর দুষ্প্রাপ্য রোগসন্ধানই তাঁর সাধনা। এখন এমন বিরল ব্যাধির খপ্পরে পড়েছেন যে সাধনা মাথায় উঠেছে মনে হল।

মাথা-টাথা চুলকে উসকোখুসকো করে ফেলে অবশেষে বললেন কাষ্ঠ হেসে, 'খুবই জটিল কেস। ভিসিফোনে দেখে আর কাজ নেই, চলুন, স্বচক্ষে দেখবেন চলুন।'

আমিও তো তাই চাই!

১০
অমানুষ প্রফেসর

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখলেও খবরদার কাউকে বলতে যেয়ো না। অজ্ঞানীরা তো বিশ্বাস করবেই না— শুধুমুধু হাস্যাস্পদ হবে, মিথ্যুক বদনাম রটবে। কিন্তু আমার আক্কেল জিনিসটা চিরকালই একটু কম— বিশেষ করে অসম্ভব কাণ্ড বলার ব্যাপারে। তাই লোকে হাসে, টিটকিরি দেয়। কিন্তু দুনিয়ায় আর এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা সব অসম্ভবই সম্ভবপর হতে পারে বলে মনে করে— তাদের অভিধানে অসম্ভব শব্দটা নেই। তারাই আমার দুরন্ত দুঃসাহসী ছোট্ট বন্ধুরা— যারা এই পৃথিবীতে চিরকাল ছিল... আছে... থাকবে। অবিশ্বাস্য এই কাণ্ড শুধু তাদের জন্যেই লিখছি। তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে গ্যালাক্সি হাসপাতাল সম্বন্ধে দু'-চারটি কথা আগে বলে নিই— তারপর এই কাহিনির যবনিকা তোলা হবে বিচিত্রতর এক অধ্যায়ে।

টাইটানে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়েছিল কোনও এক সময়ে। সে কাহিনি যথা সময়ে বিবৃত করব। লোমহর্ষক সেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি আমার ছোট্ট বন্ধুরা আজ পর্যন্ত কোনও অ্যাডভেঞ্চার গ্রন্থে পাঠ করেনি। একটু ধৈর্য ধরতে হবে কিন্তু। ঘটনা পরম্পরার তাল কেটে গেলে রসভঙ্গ ঘটতে পারে।

সেই সময়ে ব্লাস্টার (রে-গান বলে যাকে এর আগে লিখেছি আসলে তার নাম ব্লাস্টার) হাতে টাইটানপৃষ্ঠের মিথেন কুয়াশা আমি দেখেছিলাম ভিসিফোনে। প্রাণটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে। আফ্রিকার জঙ্গলে, হিমালয়ের বরফে অথবা সাহারার মরুপ্রান্তরে অ্যাডভেঞ্চারের

চাইতেও সে অ্যাডভেঞ্চার অনেক রুদ্ধশ্বাসী, অনেক ভয়াবহ। টাইটানপৃষ্ঠে অবতরণের সময়ে টাইম মেশিন থেকে গ্যালাক্সি হাসপাতালের বহু সহস্র আলোকিত জানলা আমি দেখেছিলাম। শূন্যে ভাসছে যেন একটা বৃহদাকার প্রস্তর গোলক। মহাশূন্যের নিবিড় তমিস্রার মধ্যে ঝলমলে বাতায়নগুলোর ঠেলে বেরিয়ে থাকার দৃশ্য দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। একটা ক্ষুদে উপগ্রহের মধ্যস্থল ফোঁপরা করে নির্মিত গ্যালাক্সি হাসপাতালের এলাহি কাণ্ডকারখানা। গ্যালাক্সি অর্থাৎ ছায়াপথের বৃহত্তম রিসার্চ হাসপাতাল এটি। দেখে অভিভূত হওয়ার মতো। পৃথিবীর সঙ্গে ব্যাবসায়িক সূত্রে আবদ্ধ এই হাসপাতালে বিবিধ বিচিত্র ব্যাধি নিরাময় এবং আহতের সেবাশুশ্রূষার চমকপ্রদ ব্যবস্থা আছে। পৃথিবী থেকে বেরিয়ে অন্যান্য গ্রহে অভিযানের সময়ে মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যস্থ গ্রহাণুপুঞ্জে অনেক অদ্ভুত অসুখে আক্রান্ত হয়ে অথবা জখম হয়ে অভিযাত্রীরা আসে এখানে। রুটিন চিকিৎসায় যা সারে না— গবেষণামূলক চিকিৎসায় তা আরোগ্য করা হয়।

হাসপাতালটার বহু স্তর। স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হয়েছে গ্রহের কেন্দ্র পর্যন্ত। সে যে কী বিরাট ব্যাপার, বলে বোঝাতে পারব না। বাইরের হাজার হাজার আলোকিত জানলা দেখে যাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়, তারা ভেতরে প্রবেশ করবার পর থ হয়ে যায়। ১৯৮১-র পৃথিবীতে নির্মিত কোনও হাসপাতাল দিয়ে সেই বিরাট হাসপাতালের আন্দাজ করা যাবে না। হাসপাতাল অট্টালিকার ঠিক মাঝখানে অষ্টপ্রহর জ্বলজ্বল করছে একটা অতিকায় রেডক্রশ— মানবজাতির রোগ নিরাময়ের আদিমতম প্রতীক।

ড. কৌ কেবল আমাকে নিয়ে রওনা হলেন এই গ্যালাক্সি হাসপাতালের অন্য এক স্তর-অভিমুখে। ঘর থেকে বেরোনোর সময়ে সেকী বিপত্তি! দরজা খুঁজে পাই না। দেওয়াল তো মৌচাকের খোপের মতো বাঁক নিতে নিতে সিলিং হয়ে গেছে। মসৃণ ধাতব দেওয়ালে দরজা বলে পরিচিত বস্তুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে না পেরে কাঁচুমাচু মুখে হাল ছেড়ে দিলাম। তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে লম্ফ দিয়ে নেমে বেরোতে গিয়ে এই ঝামেলা। ড. কৌ তখন সঙ্গীসাথীদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমি দেওয়াল হাতড়াচ্ছি দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'কী খুঁজছেন?'

'বেরোনোর পথ।'

দেওয়ালের গায়ে মিলানো একটা ছোট্ট চাকা দেখিয়ে ড. কৌ বললেন, 'এটা ঘোরান।'

লকিং মেক্যানিজম! চাকাটা একপাক ঘোরাতে না ঘোরাতেই দেওয়ালের একটা অংশ ধীরে ধীরে সরে গেল দেওয়ালেরই মধ্যে। সামনেই করিডর। শ্বেত পরিচ্ছদ পরা একজন নার্স ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কপালে রেডক্রশ-আঁকা পটি। ড. কৌ-কে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করে ট্রলি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা ছোট্ট কুঠুরির সামনে। ট্রলি ঠেলে ঢোকাল ভেতরে। পরক্ষণেই একটা হু-উ-উ-শ শব্দ শুনলাম। দেখলাম, ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ উধাও হয়েছে নার্স এবং ট্রলিকে নিয়ে।

লিফট নাকি? জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম ড. কৌ-এর দিকে। উনি মৃদু হেসে বললেন, 'প্রশ্ন আছে?'

'লিফট এ-যুগেও?'

'আপনাদের যুগে যে-লিফট, সে-লিফট নয়। আপনাদের ছিল ইলেকট্রিক লিফট— আমাদের হল নিউম্যাটিক লিফট।'

'নিউম্যাটিক লিফট! নিউম্যাটিক মানে তো বায়ুবিজ্ঞান।'

'এ-লিফটও বায়ুচালিত লিফট। তাই ওই হু-উ-উ-শ আওয়াজটা শুনলেন।'

'অ,' বলে চুপ মেরে গেলাম। আমার এই 'অ' বলা নিয়ে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আমাকে কম ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেননি। যখনই কোনও জটিল বিষয় বোঝান, আমার মোটা মাথায় বিন্দু-বিসর্গ ঢোকে না। তখন প্রশ্ন করলে পাছে যা মুখে আসে তাই বলে বসেন, এই ভয়ে বলে উঠি— 'অ'। ভাবখানা যেন, সব বুঝেছি। প্রফেসর কিন্তু শিশুর মতো সরল হলেও মাঝে মাঝে যাচ্ছেতাই রকমের ঘোড়েল হয়ে ওঠেন। আমার ওই 'অ' অক্ষরটির অপার অর্থ যে আমার সীমাহীন অজ্ঞানতা তা উনি চকিতে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে টিটকিরি দেন সঙ্গে সঙ্গে— 'অ, মানে, বোঝা গেল না— এই তো?'

ভাগ্যিস ড. কৌ এখনও আমার 'অ' অক্ষরের সম্যক অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি! বায়ুবিজ্ঞান নিয়ে তাই আর বাড়াবাড়ি করলেন না। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নিউম্যাটিক লিফট অগুনতি রয়েছে করিডরে। আমাকে নিয়ে কৌ ঢুকলেন একটার ভেতরে। দেওয়ালের গায়ে বোতাম ছুঁতে না ছুঁতেই হু-উ-উ-শ শব্দ শুনলাম এবং মনে হল খাদে পড়ে যাচ্ছি। কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের মতো গতিবেগ। এ গতিবেগ বিংশ শতাব্দীর লিফটনির্মাতা এখনও অর্জন করতে পারেননি। সিক্রেটটা শিখে নিয়ে যাব মনে মনে ঠিক করেছিলাম— কিন্তু মস্তিষ্কের জড়তা আর সময়-সুযোগের অভাবে তা সম্ভব হয়নি। নইলে বিংশ শতাব্দীর লিফট বিজ্ঞান একধাপে এগিয়ে যেত অনেকখানি।

ধাবমান প্রকোষ্ঠ স্তব্ধ হল এক সময়ে। আমরা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম একটা প্রশস্ত কক্ষে। কক্ষ মানে মৌচাকের খুপরি। এখানকার সব ঘরই এইরকম ডিজাইনের। চতুষ্কোণের ভক্ত নয় এ যুগের মানুষ— বহু কোণের সমাদর বড্ড বেশি।

রিশেপসন ডেস্কের মতো একটা লম্বা টেবিলের সামনে বরফঠাণ্ডা মুখে বসেছিল একটি তরুণী। ভাবলেশহীন মুখ। টেবিল ভর্তি হাজার রকম যোগাযোগের যন্ত্রপাতি— কমিউনিকেশন ডিভাইস। পেল্লায় হাসপাতালের ঘরে ঘরে যোগাযোগ রেখে চলেছে এই একটি মেয়ে একটিমাত্র টেবিলের সামনে বসে। অনেক রঙের পোশাক পরা ডাক্তার আর নার্সরা ব্যস্ত ভাবে যাতায়াত করছে ঘরের মধ্যে দিয়ে। এদিকে সেদিকে ছড়ানো বেঞ্চিতে বসে রুগীরা। হাজার হাজার বছর পরেও হাসপাতালের মূল দৃশ্যটা দেখছি একটুও পালটায়নি।

আমার পৌরাণিক পরিচ্ছদ দেখে বিস্মিত হল সবাই। কিন্তু প্রশ্নবর্ষণে বিড়ম্বিত করার প্রয়াস দেখা গেল না কারও মধ্যেই। শৃঙ্খলাবোধের আর একটি নিদর্শন।

ড. কৌ গটগট করে গিয়ে দাঁড়ালেন রিসিভিং অফিসার সেই তুহিন-আনন ললনাটির সামনে— 'আইসোলেশন চেম্বারেই আছেন তো তিনি?'

'হ্যাঁ। লেভেল টু।' বলেই মেয়েটি একটা কন্ট্রোল স্পর্শ করল। মিউজিক্যাল বিপ-বিপ-

বিপ ধ্বনি শোনা গেল প্রথমে। সংগীতময় বিচিত্র শব্দলহরী শেষ হতে না হতেই উদ্ভাসিত হল একটা মনিটর স্ক্রিন। দেখলাম শয্যায় শায়িত প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে। চারপাশে স্বয়ংক্রিয় ডায়াগনোসটিক ইন্সট্রুমেন্টের সরঞ্জাম— রোগ নিদানের বিপুল আয়োজন। মেয়েটি বললে, 'এখনও ড্যাটালাইজ করা হচ্ছে ওঁকে।'

'ড্যাটালাইজ! সেটা আবার কী?' ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা। সজনে ডাঁটার সঙ্গে সম্পর্ক আছেন নাকি?

মেয়েটি আমার অজ্ঞতার জবাব না দিলেও পারত। কিন্তু সৌজন্য প্রদর্শন হাসপাতাল কর্মচারীদের একটা বড় সম্পদ— যা বিংশ শতাব্দীর কলকাতার হাসপাতালে একেবারেই অনুপস্থিত। রুগীর ধৃষ্টতা সেখানে সহ্য করা হয় না— সৌজন্য দেখানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েটি কিন্তু সুমিষ্ট হাসি ফুটিয়ে তুলল তুহিন-শীতল মুখে। বললে, 'চিকিৎসা চলেছে। ড. কৌ যখন আপনার সঙ্গে রয়েছেন, উনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। উনি আমাদের এক্সট্রা-টেরেসট্রিয়াল প্যাথলজিক্যাল এনডোমরফিজম স্পেশ্যালিস্ট।'

দমাদম শব্দে কানের কাছে মেশিনগান বর্ষণ করলেও কানটা বুঝি এতটা ঝালাপালা হত না। হতভম্ব মুখে তাকালাম ড. কৌ-এর পানে। উনি সস্মিত মুখে বললেন, 'বুঝতে পারলেন না বুঝি? আপনাদের যুগের বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোর অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখার ফলেই দুর্বোধ্য মনে হল। যাকগে, মানে করে দিচ্ছি আমি। আভ্যন্তরীণ মরফিন আসক্তি যখন অপার্থিব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তখন তার রোগনিরূপণ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ আমি।' একটু থেমে আমার অসহায় মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করে সকৌতুকে বললেন, 'আরও খটমট লাগল তো? লাগবেই তো। এই অসুবিধের জন্যেই তো বাংলাভাষাকে পরিভাষা কবলমুক্ত করেছিলেন আপনার পরবর্তী যুগের ভাষা সংস্কারকেরা। যাকগে, আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে, সব বুঝতে পারবেন। এখন চলুন প্রফেসর কী অবস্থায় আছেন দেখা যাক।'

সবিস্ময় অনুকম্পার চোখে ললনাটি চেয়ে রইল আমার পানে। আমার সীমাহীন অজ্ঞতা যে শেষ পর্যন্ত তার তুহিন-কঠিন ভাবলেশহীনতার অবসান ঘটাতে পেরেছে দেখে ওই অবস্থাতেও যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা অনুভব করলাম।

বিংশ শতাব্দীর পাঠক-পাঠিকাদের কিন্তু আমার মতো বিড়ম্বনায় ফেলার অভিপ্রায় আমার নেই। তাই 'আইসোলেশন' শব্দটার তর্জমা করে দিচ্ছি। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অর্থাৎ পৃথকভাবে রুগীদের যেখানে রাখা হয়, হাসপাতালের সেই অঞ্চলটিকে বলা হয় আইসোলেশন ওয়ার্ড বা আইসোলেশন উইং। রিসেপশন প্রকোষ্ঠ থেকে রশ্মিরেখার মতো বিচ্ছুরিত বহু অলিন্দপথের একটিতে প্রবেশ করে ড. কৌ আমাকে নিয়ে এলেন এই আইসোলেশন ওয়ার্ডে।

অচৈতন্য প্রফেসর শুয়েছিলেন শয্যায়। বিরল এবং নবীন রোগের সন্ধানী ড. কৌ ঝুঁকে দাঁড়ালেন শয্যাপার্শ্বে। আবিল মুখচ্ছবি দেখে স্পষ্ট বুঝলাম প্রফেসরের বিরল ব্যাধি তাঁকে যথেষ্ট পীড়িত করে তুলেছে।

শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে রইল ম্যা— ড. কৌ-এর তরুণ সহকারী— নামটা বোধহয় কোনও কালে ম্যাকসন বা ওই জাতীয় কিছু ছিল। এখন তার সংক্ষেপিত রূপ 'ম্যা' হাস্যউদ্রেককারী

সন্দেহ নেই— কিন্তু গুরুগম্ভীর থমথমে পরিবেশে হাসতে পারলাম না। ম্যা-এর পাশে দাঁড়িয়ে একজন সিনিয়র নার্স। উৎকট গম্ভীর মুখ। ছোট্ট এই দলটায় আছে আর একটি জীব। এর প্রসঙ্গে আসার আগে আবার বলি, ছোট্ট বন্ধুরা যেন ভুলেও মনে না করে যে আমি মিথ্যার বুনট রচনা করে চলেছি। মিথ্যার এমনই মহিমা যে এক মিথ্যাকে ঢাকতে হলে আরেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। আমার এই বিচিত্র কাহিনি অবিরাম মিথ্যা কখন মনে হতে পারে— কেননা বিংশ শতাব্দীর পার্থিব কোনও অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তো তার সাদৃশ্য নেই। কিন্তু আমি নিরুপায়। এ ঘটনা পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালের টাইটান উপগ্রহের। পৃথিবী-বহির্ভূত আখ্যায়িকা তো অপার্থিব হবেই। তা ছাড়া মিথ্যাচার করলে যে যমালয়ে গরম তেলে আমাকে ভাজবে যমদূতেরা, আমার তা জানা আছে। অন্তত সেই ভয়াবহ নরকযন্ত্রণার ভয়েই যে মিথ্যা বলছি না, এইটা যেন খেয়াল রাখে কল্পনাপিয়াসী ছোট্ট বন্ধুরা।

আমাদের ছোট্ট দলের অন্যতম শরিকটি একটি বেঁটেখাটো চ্যাপটা চৌকোনো ধাতুর তৈরি কুকুর। শয্যার তলদেশে পায়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বিচিত্র জীবটাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। দেখতে তাকে অদ্ভুত রকমের ধাতুর তৈরি চৌকোনো সারমেয়র মতন। চোখের জায়গায় কম্পিউটারের কারসাজি, কানে আর লেজের জায়গায় তিনটে খাড়া অ্যান্টেনা। আমি যখন তাকে দর্শন করে হতভম্ব সে তখন নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে প্রফেসরের নিস্পন্দ দেহটাকে নিয়ে। পর্যবেক্ষণ করছে মাথায় সেট করা একসারি ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে। অতশত সেই মুহূর্তে আমার মাথায় ঢোকেনি— ড. কৌ পরে প্রাঞ্জল করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ খর্ খর্ খর্ খর্ আওয়াজ হতেই আর একদফা চমকে উঠলাম। তারপরেই দেখি মেট্যাল-কুত্তার মুখবিবর দিয়ে বেরিয়ে আসছে কম্পিউটারে ছাপা ফিতে-কাগজ— আচমকা দেখলে মনে হবে যেন লকলকে জিভ বার করেই চলেছে বিরামবিহীনভাবে।

আপনা থেকেই এক সময়ে স্তব্ধ হল ফিতে কাগজের বেরিয়ে আসা। হেঁট হলেন ড. কৌ। ধাতব-সারমেয়র মস্তক চাপড়ে আদর জানালেন এবং পড়াৎ করে মুখের কাছ থেকে ছিঁড়ে নিলেন কাগজখানা।

বেশ বারকয়েক কাগজে ছাপা তথ্যাবলিতে দৃষ্টি সঞ্চালন করে হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন ড. কৌ। শান্ত সৌম্য মানুষটার এ হেন আকস্মিক পরিবর্তন দেখে তখন অবাক হলেও পরে জেনেছিলাম, উনি দ্বৈত ব্যক্তিত্বের পুরুষ। রোগ আর রুগীর সান্নিধ্যে এলে খিটখিটে, অন্য সময়ে সহজ, স্বাভাবিক। অধিকাংশ প্রতিভাধর যা হন আর কি। আমরা সাধারণ মানুষরা এঁদের বলি খ্যাপা উন্মাদ। আমাদের প্রফেসর নাটবল্টু চক্রই বা কম যান কীসে! তাঁর মেজাজের নাগাল ধরতেই তো জান কয়লা হয়ে গেল আমার।

যা বলছিলাম, কাগজখানা বারকয়েক পাঠ করবার পর ক্ষিপ্ত হলেন কৌ। বললেন তিরিক্ষে গলায়, 'ইডিয়ট কোথাকার।'

কে ইডিয়ট? আমি বিমূঢ় চোখে চেয়েছিলাম ম্যা আর নার্সের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে। দুজনেই ডক্টরের এই জাতীয় মেজাজী বিস্ফোরণের সঙ্গে সমধিক পরিচিত ছিল বলেই

নির্বিকার মুখে চেয়ে রইল শূন্য পানে। বুদ্ধিমত্তার প্রশংসিকাটা যেন কর্ণকুহরে প্রবেশই করেনি।

এবার আমাকেই উদ্দেশ করলেন ড. কৌ, 'আপনার গুরু তো দেখছি মহা-ঘোড়েল লোক।'

হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল আমার। এ কী অশিষ্ট মন্তব্য। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি, উনি তার আগেই বলে উঠলেন, 'এই বুড়ো বয়েসেও সেল্ফ-ইনডিউসড কোমা প্র্যাকটিস করে বসে আছেন!'

'কমা?' রাগের চেয়ে বিস্ময়টাই এবার প্রবল হল। কমা দাঁড়ি সেমিকোলনের প্রশ্ন আসছে কেন এখানে?

'কমা নয়, কোমা' খেঁকিয়ে উঠলেন ড. কৌ। 'কোমা কি তাও জানেন না? জ্বালাতন! কোমা মানে হল ডিপ স্লিপ— গভীর নিদ্রা। সংজ্ঞার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি মৃগীর আক্রমণ হওয়ার পর, অথবা বেশি মদ খেলে, ডায়াবেটিস হলে বা কঠিন রোগে কোমা দেখা যায়। আর আপনার গুরুদেব আত্মঘটিত কোমায় সংজ্ঞা হারিয়ে রয়েছেন— নিজেই নিজের কোমা ঘটিয়েছেন! গুরুদেব লোক বটে!'

শুনে রাগ হওয়া দূরে থাক, খুশির প্রাণ ফুর্তিতে গড়ের মাঠ হয় আর কী! প্রফেসর গুণবান পুরুষ নিঃসন্দেহে, নিজের জ্ঞান নিজেই লোপ করার বিদ্যে যে আয়ত্ত করেছেন, তা আর আশ্চর্য কী! নাটবল্টু চক্র একটা জীবন্ত বিস্ময়— ওঁকে বুঝে উঠতে আমি পারলাম না— আর ড. কৌ, তুমি পারবে? মনটা তাই খুব হালকা হয়ে গেল, কিন্তু খামকা কোনও উদ্ভট ক্রিয়াকর্ম তো উনি করেন না, স্বেচ্ছা-সংজ্ঞালোপের আশ্রয় নিলেন কেন? প্রশ্নটা করতে যাচ্ছি ড. কৌ নামক দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের বৈজ্ঞানিকটিকে— তার আগেই উনি গজর গজর করতে করতে বললেন— 'ভাগ্যিস পরিচয়টা পেয়েছিলাম আপনার কাছে, নইলে ধরে নিতাম অপদার্থ স্পেসনিক জুটেছে আর একটা।'

স্পেসনিক আবার কীরে বাবা! থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম। ড. কৌ হঠাৎ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু দেখে ফেললেন ভ্যাবাচাকা মুখখানা। চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সেকী কথা! স্পেসনিক কাকে বলে তাও জানেন না?'

আরে সর্বনাশ! এযে দেখছি প্রফেসরের ওপরে যায়! তুলোধোনা করে ছাড়ছে আমার অজ্ঞতা নিয়ে। আমতা আমতা করে কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'না... মানে... ওই আর কী...।'

'থাক, থাক, বুঝতে পেরেছি। বিংশ শতাব্দীর মানুষ যখন বিটনিকদের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?'

'বিটনিক!' বীট-চিনির নাম জানি, বীট-শেকড়ের বৃত্তান্তও জানা আছে, কিন্তু বিটনিক! সে কী বস্তু?

আমার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আর তিলমাত্র সংশয় রইল না ড. কৌ-এর। বঙ্কিম ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'শব্দটা আমেরিকান। ১৯৫০-এর দশকে যেসব বোহেমিয়ান, কবি ইত্যাদি সমসাময়িক সমাজের লক্ষ্য থেকে নিজেদের আলাদা করে এনেছিল, তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে বিট জেনারেশন। পরে বিটনিক বলা হত সেইসব তরুণ-তরুণীদের

যাদের আচরণ, পোশাক প্রচলিত রীতির সঙ্গে খাপ খেত না। এখন বুঝেছেন কাকে বলে বিটনিক?'

ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলাম নীরবে।

ড. কৌ জের টেনে নিয়ে বললেন একই রকম হাড়জ্বালানো গলায়, 'বিংশ শতাব্দীর বিটনিকদের উত্তরসূরি হল এই যুগের স্পেসনিক। তখন ছিল যারা হিপি আর বিটনিক— এখন তারাই হয়েছে স্পেসনিক। গাঁজাচরস খেয়ে বাউন্ডুলে হয়ে হিপি আর বিটনিকরা ঘুরত দেশে দেশে, স্পেসনিকরা কপর্দকহীন অবস্থায় চুপিসারে ঢুকে পড়ে নানা ধরনের স্পেস মেশিনে— ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ধারের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে স্পেস মেশিনের পর স্পেস মেশিন— হতচ্ছাড়া স্পেসনিকগুলো সেই সুযোগে বেড়িয়ে নেয় মহাকাশের দিকে দিকে। কিন্তু ব্যাটাদের ভাঁড়ে তো মা ভবানী, ট্যাঁক গড়ের মাঠ— কারিগরি বিদ্যেতেও অষ্টরম্ভা। ফলে ঝামেলায় পড়ে শেষকালে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে তাদের ফেরৎ পাঠানোর ভার নেয় পৃথ্বী সরকার।'

শেষ শব্দদুটোই কেবল ভাল করে বুঝলাম। পৃথ্বী সরকার মানে, পৃথিবীর গভর্নমেন্ট। পৃথিবীটায় তা হলে গভর্নমেন্ট বলতে এখন একটাই— শয়ে শয়ে গভর্নমেন্টদের যুগ ফুরিয়েছে। অহো! সুসংবাদ নিঃসন্দেহে! সেই আদ্দিকালে পৃথিবীতে ছিল মোট দুটো গভর্নমেন্ট— অসুর আর দেবতা। অসভ্য আর সভ্য দুই গভর্নমেন্টে লড়াই লেগেই থাকত। তারপর গণ্ডায় গণ্ডায় গভর্নমেন্টে ছেয়ে গেল ভূপৃষ্ঠ। এখন আর দুটোও নেই— মোটে একটা। পৃথিবী তা হলে নিশ্চয় এখন শান্তির রাজ্য। দেশে দেশে অ্যাটম বোমার স্তূপ রচনার প্রলয়ংকর প্রতিযোগিতাও নিশ্চয় আর নেই! অহো! স্বর্গরাজ্য তা হলে স্থাপিত হয়েছে পৃথিবীতে।

আমাকে জ্ঞান দেওয়া সাঙ্গ করে প্রফেসরের নোংরা কলেবরের দিকে তাচ্ছিল্য-কুঞ্চিত মুখে ড. কৌ এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন বলেই সুখচিন্তায় নিমগ্ন থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। সম্বিৎ ফিরল তাঁর অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠস্বরে, 'কী আপদ! কী আপদ! খামোখা এতটা সময় নষ্ট করলাম! এতক্ষণে অনেকটা এগিয়ে যেত আমার গবেষণা!'

মরণ দশা আর কী! ছাই গবেষক তুমি! প্রফেসরের কী হয়েছে, তাই এতক্ষণ ধরতে পারোনি, বচনই সার তোমার! ভাগ্যিস ওই কলের কুকুরটা কম্পিউটার দিয়ে বলে দিল— তার আগে পর্যন্ত তো মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিলে!

ফের খেঁকিয়ে উঠলেন ড. কৌ। না, আমার দিকে নয়— ওই রোবট কুকুরটার দিকে।

'ক-৫।'

অনেকটা কুত্তার ডাকের মতোই কুঁই-মুই করে উঠল ক-৫। আসলে সেটা ইলেকট্রনিক আওয়াজ।

'আর কিছু খবর আছে?'

ক-৫-এর মুখ দিয়ে খর খর শব্দে আবার বেরিয়ে এল একফালি ছাপা কাগজ। ম্যা হেঁট হয়ে পড়াৎ করে কাগজখানা ছিঁড়ে নিল। পড়ল। বললে, 'স্যার—'

'বলো, বলো।'

‘ক-৫ বলছে, রুগী মানুষ জাতির মধ্যে পড়ে না।’

অ্যাঁ! আঁতকে উঠলাম আমি! প্রফেসর মানুষ নয়! বলে কী?

ভুরু কুঁচকে ফ্যাঁস করে উঠলেন ড. কৌ পর্যন্ত, ‘ননসেন্স! নিজের চোখ দিয়ে দেখো উনি মানুষ কিনা।’

ম্যা কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, ‘পড়ে দেখুন। দুটো হৃৎপিণ্ড রয়েছে। কোষের গঠন এমন যে নিজেই নিজেদের নতুন করে সৃষ্টি করতে পারে।’

কাগজ হাতে না নিয়ে ক-৫-এর দিকে চোখ নামালেন ড. কৌ।

‘কিরে, তাই নাকি?’

ঠন ঠন শব্দ করে কাঁসি বাজানো গলায় ক্ষুদে রোবট বললে, ‘নির্জলা সত্য, প্রভু।’

ড. কৌ এবার যেন ধাতস্থ হলেন মনে হল। কৌতূহল জাগ্রত হল। তন্ময় হয়ে পরীক্ষা করলেন প্রফেসরকে। আর আমি ভাবতে লাগলাম, এ-ও কি সম্ভব? দুটো হৃৎপিণ্ড আছে প্রফেসরের? মানুষের থাকে একটা হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস হয় এক জোড়া। প্রফেসরের জোড়া হৃৎপিণ্ড আবার কবে হল? রোবট-কুকুর যান্ত্রিক সিদ্ধান্তে তাই তাঁকে বলছে অমানুষ। কিন্তু—

ডক্টর ঠাণ্ডা মেরে গেলেন। বললেন গলা নামিয়ে, ‘অ-মানুষ! বটে! উৎপত্তি কোথায়?’

‘সৌরজগতের বাইরে,’ কাঁসি বাজানো গলায় বললে ক-৫।

ব্যঙ্গের সুরে ড. কৌ বললেন, ‘বহুৎ ধন্যবাদ, ক-৫।’

রোবটদের ব্যঙ্গ করলে তারা বোঝে না। যন্ত্র তো! ঠন ঠন শব্দে কৃতার্থ স্বরে ক-৫ বললে, ‘ধন্যবাদ, প্রভু।’

নার্সের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ড. কৌ, ‘এনকেফালোগ্রাফ লাগান রুগীর ওপর।’

একটা নমনীয় যান্ত্রিক বাহুর ওপর ফিট করা জটিল একটা যন্ত্র ঘুরিয়ে প্রফেসরের মাথার ওপর রাখল নার্স।

রেজাল্ট বেরিয়ে এল কিন্তু ক-৫-এর মুখ দিয়ে— ‘ভাইরাস ধরনের সংক্রমণ। অজ্ঞাত ভাইরাস। বৈশিষ্ট্য, নোয়েটিক। বর্তমান অবস্থান— মন-মস্তিষ্কের মাঝামাঝি— তাই গড়ন বা আয়তন নির্ধারণ করা যাচ্ছে না।’

দু-হাত কচলে উৎফুল্ল কণ্ঠে ডক্টর বললেন, ‘কৌতূহলোদ্দীপক কেস! অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক! রোজ রোজ এমন টাটকা তাজা নতুন সংক্রমণের দেখা পাওয়াই ভার, তাই না, ম্যা?’

বিনীত কণ্ঠে ম্যা সায় দিলে, ‘তা তো বটেই।’

এমন সময়ে চোখ মেলে তাকালেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। বললেন প্রফুল্ল স্বরে, ‘কী ব্যাপার? এত ফুর্তি কীসের?’

১১
ভাইরাসের গোলাম

আনন্দে উপচে উঠলেন ড. কৌ, 'নমস্কার!'

বিছানার চারদিকে খাড়া করা অজস্র ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের জটিল গোলকধাঁধার দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বললেন, 'পাওয়া গেল কিছু?'

'না, মশাই, না। এখনও পাইনি, তবে শিগগিরই পাবো!' প্রফেসরের পায়ের দিকে রাখা চার্টটা দেখে নিলেন ড. কৌ, 'আপনি প্রফেসর?'

'বলা বাহুল্য! ঝেড়ে কাশুন মশায়, কী পেলেন আগে তাই বলুন।'

'ক্যাটালেপটিক ট্রান্স?' চোখ নাচিয়ে বললেন কৌ।

'হ্যাঁ।' সায় দিলেন প্রফেসর।

'স্বয়ংঘটিত?'

'নিশ্চয়।'

'কেন?'

প্রফেসর জবাব দেওয়ার আগেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমাকে আগে বুঝতে দিন। ক্যাটা... ক্যাটা... কী যেন বললেন?— মানে কী?'

'ক্যাটালেপটিক ট্রান্স,' মিষ্টি করে বললেন প্রফেসর— 'মনোবিজ্ঞানীদের ভাষা হে ছোকরা! একটানা নট-নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে থাকা। সম্মোহ বলতে পারো। বাড়ি ফিরে বুঝিয়ে দেব। এখন থামো। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন আপনি?' শেষ প্রশ্নটা নিক্ষিপ্ত হল ড. কৌয়ের উদ্দেশে।

কৌ তখন আবার অমায়িক হয়ে উঠেছেন। কত রূপই জানেন ভদ্রলোক। স্মিত মুখে বললেন, 'ক্যাটালেপটিক ট্রান্সের দরকার হল কেন?'

'আত্মরক্ষার তাগিদে— আত্ম-সংরক্ষণও বলতে পারেন। কার খপ্পরে এত ভোগান্তি বুঝতে পারছি না ঠিকই, তবে সেই মহাশয় উৎপাতটি যে আমার মনের সক্রিয়তা দিয়ে নিজেকে পুষ্ট করে বেশ জাঁকিয়ে বসছে, তা টের পেয়েছি। তাই এই মানসিক নিষ্ক্রিয়তা। সমাধিস্থ হয়ে যাওয়া।'

চমৎকৃত হলেন ডক্টর, 'বটে! বটে! আপনি মনকে যত খাটাচ্ছেন, যত চিন্তার গভীরে প্রবেশ করছেন, উটকো উৎপাতটা ততই কায়েমি হয়ে বসছে— তাই তো?'

'এক্কেবারে ঠিক। চিন্তার বিরতিই একমাত্র দাওয়াই উৎপাতটাকে বিদায় করার। কিন্তু অনন্তকাল কি মন-হীন হয়ে থাকতে পারি আমি? বলুন আপনি?'

চুকচুক শব্দ করে কৌ বললেন, 'তা তো বটেই... তা তো বটেই। আমার এই কম্পিউটার, বলে তাকালেন ধাতব-সারমেয় ক-৫-এর দিকে।'

কৌ-এর দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রফেসরও তাকিয়েছিলেন খাটের প্রান্তে। আজব কুত্তাটা দেখে চোখ কপালে তুলে ফেললেন— 'রোবট কুকুর! নমস্কার, নমস্কার!'

বিনীতভাবে প্রতি-নমস্কার জানাল ক-৫, 'নমস্কার।'

'খবর ভাল তো?'

ক-৫ জবাব দেওয়ার আগেই সামাজিক শিষ্টাচার বিনিময়ে বাগড়া দিলেন ডক্টর। বললেন, 'প্রফেসর, যা বলছিলাম, ক-৫-এর বিশ্বাস ভাইরাসটা নোয়েটিক টাইপের— যার মানে, সজ্ঞান থাকার সময়েই কেবল তাকে আবিষ্কার করা যাবে।'

প্রফেসর ঈষৎ চটিতং কণ্ঠে বললেন, 'নোয়েটিক মানেটা আমার জানা আছে।'

'দুঃখিত।'

ক্ষমাপ্রার্থনা কানে না তুলে প্রফেসর বললেন, 'ভাইরাসটা তা হলে রয়েছে মন-মস্তিষ্কের সীমান্ত অঞ্চলে?'

'যদি এ ধরনের ভাইরাসের আদৌ অস্তিত্ব থাকে, তবেই—'

প্রফেসর কিন্তু নিজের অবরোহ-সিদ্ধান্ত নিয়েই তন্ময় হয়ে রইলেন, 'কী স্টুপিড আমি! এই কারণেই টাইম মেশিনে বসে থাকার সময়ে অ্যাটাক শুরু হয় আমার ওপর— ঠিক তখনি তো আমার মনের কাজ তুঙ্গে পৌঁছেছিল— ভীষণ সক্রিয় ছিলাম মাথার কাজে—'

'ব্যাপারটা শুনেছি।'

'আমি ভেবেছিলাম স্ট্যাটিক কাণ্ডকারখানা। টাইম মেশিন যখন ফোর্থ ডাইমেনশনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে, তখনও হতচ্ছাড়া উৎপাতটা আমাকে কবজায় আনবার চেষ্টা চালিয়ে গেছে, কেননা মেন্ট্যাল অ্যাকটিভিটি তখনও খুব বেশি। কিন্তু দীননাথ পার পেয়ে গেছে।'

গলা খাঁকারি দিয়ে আমি বললাম, 'কেন বলুন তো?'

'কারণটা শুনলে তো আবার রেগে যাবে। তোমার ব্রেন থাকলে তো মন কাজ করবে। ব্রেন নেই, মনের অ্যাকটিভিটিও নেই। তাই ভাইরাসের বজ্জাতি তোমার ওপর খাটেনি।'

নিজের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে এই জাতীয় প্রশংসা শুনলে কেউ প্রসন্ন হতে পারে না। আমিও বিষণ্ণ হলাম।

উল্লসিত হলেন কিন্তু প্রফেসর, 'এবার পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল!'

ড. কৌ-এর কাছে তখনও বোধহয় ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়নি— তাই মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হতে পারে... হতে পারে।... ভাল কথা, এ ভাইরাসে আর কেউ আক্রান্ত হয়েছে কিনা জানেন?'

'দীননাথের ওপর যে আক্রমণ চলেছিল, সেটা আবার আপনাদের ওপরেও শুরু হতে পারে।' বলতে না বলতেই প্রফেসরের মুখচোখের চেহারা আবার পালটে যেতে লাগল। আবার চোখের তারায় সেই নীলচে স্পার্ক দেখা দিল। ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলে আর সময় দিতে রাজি নয়— প্রফেসর হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন টের পেয়ে বোধহয় চাঙা হয়ে উঠল— আক্রমণ এবার শুরু হবে ড. কৌ-এর ওপর— হাজার হোক তাঁর ব্রেনখানা তো সরেস। প্রফেসরও কম ধুরন্ধর এবং চটপটে নন। সক্রিয় মনের সুযোগ নিয়ে অজ্ঞাত ভাইরাস আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে টের পেয়েই স্বেচ্ছা-সংজ্ঞালোপের শরণ নিলেন। মাথা হেলে পড়ল বালিশে— বন্ধ হল চোখের পাতা। মেন্ট্যাল এনার্জির অভাব ঘটিয়ে অপার্থিব শক্তিকে উপবাসে রাখার পরিকল্পনায় তিনি বদ্ধপরিকর।

নিরাশ গলায় ড. বললেন, ‘যাচ্চলে, দেখছি ঘুমিয়ে পড়লেন। ম্যা, ওঁকে চব্বিশ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখতে হবে— পুরো মনিটরিং দরকার। তোমার দ্বারা হবে না। ক-৫!’

‘হুকুম করুন, প্রভু,’ কলের কুকুর তো নয়, যেন গোলাম হোসেন।

‘কী বললাম শুনেছ?’ ক-৫-এর কানের অ্যান্টেনা লটপট করে উঠল প্রত্যুত্তরে, ‘চব্বিশ ঘণ্টা অবজারভেশনে থাকবেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।’

আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর। ঘরের মধ্যে রইল নার্স, ম্যা আর ক-৫। তারপর যা ঘটেছিল, তা নানা সূত্রে টুকরোটাকরা ভাবে সংগ্রহ করে জোড়াতালা দিয়ে যা দাঁড় করিয়েছিলাম, তা এই:

ঘর নিস্তব্ধ। ম্যা আর নার্স পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে প্রফেসরের দিকে। এমন সময়ে তাঁর কপাল ঘিরে বলয়াকারে ফুটে উঠল নীলাভ-কৃষ্ণাভ ন্যক্কারজনক সেই বিদ্যুৎপ্রভা। দেখেই তো চোখ ছানাবড়া হওয়ার দাখিল দুজনের। মুখ দিয়ে কথা সরল না। ফ্যালফ্যাল শুধু চেয়ে রইল প্রফেসরের দিকে— মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

আস্তে আস্তে খুলে গেল তাঁর দু-চোখের পাতা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে এল দুচোখের তারা দিয়ে। পরক্ষণেই ঝলসে উঠল অশুভবর্ণের লকলকে বিদ্যুৎরেখা কপালের মাঝখানে। পরপর ছুঁয়ে গেল ম্যা আর নার্সের ললাটদেশ। দুজনেই মুখ থুবড়ে পড়ল বিছানার ওপর।

সেকেন্ডকয়েক পরেই একই সঙ্গে মুখ তুলল দুজনে। চোখ ভাবলেশহীন মড়ার চোখের মতন। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল পাথরে পাথরে ঘর্ষণের মতো কর্কশ কণ্ঠস্বর, ‘গোলাম হাজির। আদেশ করুন।’ অপার্থিব ভয়াল চাপা গলায় প্রফেসর বললেন, ‘আমার প্রথম কাঁটা সরাও সবার আগে— তারপর দখল করো এই উপগ্রহ।’

‘প্রথমে কাকে?’

‘ওই কলের কুকুরটাকে। তারপর দীননাথ মূর্খটাকে। তারপর ড. কৌ-কে ধরে নিয়ে এসো আমার সামনে— তার ব্রেনটাও আমার দরকার।’

যন্ত্রবৎ ঘুরে দাঁড়াল দুজনে। ঘরের এককোণে চারপায়ে দাঁড়িয়ে প্রফেসরকে এতক্ষণে অবজারভেশনে রেখেছিল ক-৫। তার চোখের টিভি ক্যামেরায় পুরো দৃশ্যটার ছবি উঠে গেছিল ভিডিও টেপে— মায় কথাবার্তাশুদ্ধ। এই টেপ থেকেই ড. কৌ জানতে পারেন পুরো নাটকটা।

ম্যা আর নার্স এক পা এগিয়েছিল ক-৫-এর দিকে। রোবট তৈরি করার সময়ে তাদের যান্ত্রিক মগজে ছেপে দেওয়া হয় কে শত্রু আর কে মিত্র। ভুলেও তারা মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। তাই এতক্ষণ চুপ করেছিল। কিন্তু যেই নার্স আর ম্যা অমানুষে পরিণত হল, সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হল ক-৫। ইলেকট্রনিক গজরানি শোনা গেল ধাতব কণ্ঠে।

‘নেগেটিভ...নেগেটিভ...নেগেটিভ। আর এগিয়ো না!’

থমকে গেল আগুয়ান দুই মূর্তি। দৃষ্টি বিনিময় করল নিঃশব্দে। পরক্ষণেই ফস করে কোমর থেকে ব্ল্যাস্টার টেনে বার করল ম্যা।

তীক্ষ্ণ ধাতব কণ্ঠে এবার চেঁচিয়ে উঠল ক-৫, ‘খবরদার! সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু!’

ব্ল্যাস্টার তাগ করল ম্যা। ক-৫-এর যান্ত্রিক চক্ষু নিবদ্ধ হল সেই দিকেই। বললে

ক্যানেস্তারা-বাজানো গলায়, 'আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আমার মধ্যেও আছে।' কথা শেষ হতে না হতেই নাকের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ব্ল্যাস্টারের নল। 'হুঁশিয়ার করে দিয়েছি আগেই। খবরদার, অস্ত্র নামাও!'

ট্রিগার টিপল ম্যা। কিন্তু ক-৫-এর ইলেকট্রনিক অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হল তার এক ভগ্নাংশ সেকেন্ড আগে। মানুষের চোখ আর রিফ্লেক্স এত দ্রুত কাজ করে না। ম্যা-এর আঙুল ট্রিগারে চেপে বসতে না বসতেই আত্মরক্ষার তাগিদে ব্ল্যাস্টার নিক্ষেপ করল ক-৫। পর পর দু-বার। দুটো কবন্ধ দেহ লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে— মুণ্ড উড়ে গেছে ব্ল্যাস্টারের অদৃশ্য রশ্মিতে!

প্রফেসরের স্বেচ্ছা-সংজ্ঞালোপও সম্পূর্ণ হল এতক্ষণে। সংজ্ঞালোপ ঘটছিল ধীরে ধীরে, হতচ্ছাড়া ভাইরাস মাথা তুলেছিল সেই ফাঁকে। প্রফেসরের মন পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতেই জারিজুরি আর রইল না তার। মিলিয়ে গেল কপালের বিদ্যুৎবহ্নি। বন্ধ হল চোখের পাতা।

ঠিক এই সময়ে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর। ক-৫ আক্রান্ত হতেই অ্যালার্ম-বেল বেজে উঠেছিল তাঁর ইলেকট্রনিক হাতঘড়িতে। তাই দৌড়ে এসেছেন ঊর্ধ্বশ্বাসে।

অ্যালার্মসংকেত আমিও শুনেছিলাম। পাগলা ঘণ্টি বেজে ওঠার মতো মিউজিক্যাল বিপ বিপ ধ্বনিটাও যেন ক্ষেপে উঠেছিল। কোথায় লাগে আফ্রিকার জংলি বাজনা। ড. তখন আমাকে বোঝাচ্ছিলেন। বিদ্যুৎবহ্নি যেহেতু আমাকেও স্পর্শ করেছে, অতএব বাহ্যত নীরোগ থাকলেও এবং মনের দিক দিয়ে নির্মল থাকলেও আমাকে ড্যাটালাইজ এবং স্ক্যানিং করা দরকার। হাজার হোক অজ্ঞাত ভাইরাস তো! প্রচ্ছন্নভাবে কোথাও যদি ঘাপটি মেরে থাকে, ঠিক ধরা পড়ে যাবে। আমি কিন্তু বেঁকে বসেছিলাম। উনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলেছিলেন, 'বুঝেছি। প্রফেসর ঠিকই বলেছেন। আপনার ব্রেনের দৌলতেই রোগ প্রতিষেধ শক্তি এই ক্ষেত্রে আপনার মধ্যে প্রবল।' ঠিক এই সময়ে ইলেকট্রনিক অ্যালার্ম বাজনা বাজিয়ে দিল আফ্রিকান জঙ্গি বাজনার কায়দায়। ডক্টরের সেই মুহূর্তের ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়টা ছবি তুলে রাখার মতন।

ফিরে এসে বললেন সব ঘটনা। শুনে আমি খুব একটা অবাক হলাম না। পাজি নচ্ছার ভাইরাসটার সঙ্গে মোকাবিলা এর আগেও তো আমার হয়েছে। তবে সেই থেকে ডক্টর এমন ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগলেন আমাকে একপ্রস্থ ড্যাটালাইজ আর স্ক্যানিং করার জন্যে যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল আমার। রাজি হলাম শুধু কান আর মনটাকে কিছুক্ষণ জিরেন দেওয়ার জন্যে।

শুয়ে পড়েছিলাম একটা কোচে। প্রফেসরের দেহ ঘিরে যেসব উদ্ভট জটিল যন্ত্রপাতি দেখেছিলাম, আমাকেও ঘিরে ধরেছিল সেই ধরনের রাশি রাশি কলকবজা। তারপর জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখি, প্রফেসরের ঘরেই নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে। উনি তখনও অচেতন। আমার খাটের পায়ার কাছে চারপায়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে রয়েছে ক-৫।

আমি চোখ খুলে ইতি উতি তাকাতেই ডক্টর বললেন ক্লাশে ছাত্র পড়ানোর ঢঙে, 'ক-৫,

ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রামিত হওয়ার পুরো সুযোগ পেয়েছিলেন দীননাথবাবু, স্ক্যানিংয়ের রেজাল্ট কী?'

দপ করে আলো ফ্ল্যাশ দিল, খর খর ঝন ঝন কড়াৎ কড়াৎ করে আওয়াজ হল, বিবিধ ইন্সট্রুমেন্ট রকমারি আওয়াজ করে অশ্রুতপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করল। ক-৫ বললে কাংস কণ্ঠে, 'নেগেটিভ রেজাল্ট— ইমিউনিটি কমপ্লিট। প্রতিষেধব্যবস্থা সুদৃঢ়— রুগী নীরোগ।'

ব্যাজার গলায় ডক্টর বললেন, 'কিন্তু ভাইরাসের ছিটেফোঁটাও কি নেই ব্রেনে?'

'নিরেট মাথা... ভাইরাস নেই!' কাংস কণ্ঠের সেই প্রতিবেদন শুনে ইচ্ছে হল খাট থেকে লাফিয়ে গিয়ে গলা টিপে ধরি হতভাগা ক-৫-এর। কিন্তু সাহস হল না। যার নাকের তলা দিয়ে ব্ল্যাস্টারের চোঙ বেরিয়ে এসে অদৃশ্য রশ্মি উগরে দেয় চক্ষের নিমেষে— তার গলা টিপে ধরার চেষ্টা করা আর আত্মহত্যা করা নামান্তর মাত্র।

নিরাশ হলেন ডক্টর। শায়িত প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের একমাত্র গিনিপিগ তা হলে উনিই। রোগটা শুধু ওঁকেই কাবু করতে পেরেছে— আর যে দুজন কাবু হয়েছিল, তারা তো এখন পরপারে। তবে বাহাদুরি আছে প্রফেসরের। কাবু হয়েও গোলাম বনেননি— সমানে লড়ে যাচ্ছেন। চমৎকার কেস! দীননাথবাবু যখন নীরোগ, তখন অপারেশন করব প্রফেসরকেই!'

১২
অপারেশন ভণ্ডুল

অজ্ঞাত ভাইরাসের শক্তি যে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছোয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই।

চমকপ্রদ সেই বিবরণ উপস্থাপিত করার আগে ছোট্ট বন্ধুদের কাছে সসংকোচে একটি নিবেদন রাখি। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। কাহিনি প্রসঙ্গে দু'-একটা বিষয় প্রাঞ্জল করা দরকার। উদ্ভট আখ্যায়িকার দুর্বোধ্যতা তাতে দূরীভূত হবে।

অজ্ঞাত ভাইরাস-আক্রান্ত প্রফেসরের ললাটে ঘিরে বিদ্যুৎবহ্নি, দেহ ঘিরে বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ এবং কপাল ফুঁড়ে বিদ্যুৎলতা নিক্ষেপ-কাহিনি পড়ে যারা গঞ্জিকা-প্রসূত কাহিনি মনে করছে, তারা যেন খেয়াল রাখে এই বিংশ শতাব্দীতেই রাশিয়ার কিরলিয়ান দম্পতি এমন একটা ফটোগ্রাফিক কলাকৌশল আবিষ্কার করেছেন যার দৌলতে মনুষ্যেতর প্রাণী, উদ্ভিদ এবং খনিজের গা থেকে ঠিকরে আসা প্রাণঃজ্যোতির বহুবর্ণ আলোকচিত্র স্বচক্ষে দেখা সম্ভব। তাঁরা দেখিয়েছেন, যাঁরা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁদের আঙুলের ডগা দিয়ে এবং চোখের মধ্যে দিয়ে অগ্নিশিখার মতো জ্যোতি লকলকিয়ে ঠিকরে আসে। মনে হয় যেন ভলকে ভলকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে চলেছে আঙুলের ডগায় বা চোখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অনেকগুলি ক্ষুদে আগ্নেয়গিরি। অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিরা মনোসংযোগ করলেই আশ্চর্য এই অগ্নিশিখাবিচ্ছুরণ বৃদ্ধি পায়— সাদা চোখে কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। এই শক্তিধারাকে কেউ বলেন অডিক ফোর্স। জগদ্বিখ্যাত উরি গেলার শুধু অঙ্গুলি হেলনে চামচ বেঁকিয়ে দিতে পারেন নাকি

এই ভয়ংকর শক্তির প্রতাপেই। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর ‘পাওয়ার অফ মাইন্ড’ পুস্তিকায় বলেছেন, মনের শক্তি অসীম। দূরস্থিত বস্তু স্থানচ্যুত করা যায় কেবল মনোসংযোগের ফলে। যোগীপুরুষরা চেয়ে থেকে কোনও বস্তুতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারেন, এমন ঘটনাও আমার জানা আছে। এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কিছু নেই— সবটাই বৈজ্ঞানিক ব্যাপার— কিন্তু সসীম বুদ্ধিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করতে অক্ষম। কিন্তু ঘটনাকে তো অস্বীকার করা যায় না।

যে অডিক ফোর্স বা প্রাণশক্তি বিশ্বের সব বস্তুর মধ্যে বিরাজমান, তা অজ্ঞাতকুলশীল মহাশূন্যের এক ভাইরাসের মধ্যেও থাকবে না কেন? মন জিনিসটা আজও দুর্জ্ঞেয়, চিররহস্যে ভরা। এই নিতল প্রহেলিকার গভীরতায় বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা আজও হাবুডুবু খাচ্ছেন— থই পাচ্ছেন না। অসীম ক্ষমতা এই মনের। সেই ক্ষমতা দখলের প্রয়াস মহাশূন্যের ভাইরাস যদি করে থাকে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে কি? অজ্ঞাত ভাইরাস নিজেকে শক্তিমান করে তুলতে চায় মনের এই ক্ষমতা সংগ্রহ করে। মনের ক্ষমতাই তার একমাত্র খোরাক। মনই তার একমাত্র আহার। মনই তার জীবনধারণের এবং পুষ্টিসাধনের একমাত্র উৎস। কেননা, ভাইরাসরা তো সজীব দেহ আশ্রয় না করে বাঁচে না। ভাইরাস নানাজাতীয় আছে। এরা আকারে ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া থেকেও ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণেও সাধারণত এদের দেখা যায় না। অবশ্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে আজকাল কোনও কোনও ভাইরাসকে বহুগুণ বর্ধিতাকারে দেখা সম্ভব হয়েছে। সজীবদেহ আশ্রয় না করলে ভাইরাসরা বাঁচতে পারে না, বংশবৃদ্ধিও করতে পারে না। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে মনে হয়েছে, এরা অতি জটিল গঠনের সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ, হয়তো বিশেষ একরকমের জীবধর্মী প্রোটিন কণিকা। মহাকাশের আগন্তুক এই অজ্ঞাতকুলশীল ভাইরাসটিও তার ব্যতিক্রম হবে কেন? শুধু যা লক্ষ কোটি বছরেও এর মৃত্যু হয়নি— ভেসে ভেসে বেরিয়েছে মহাশূন্যের দিকে দিকে গুটি আকারে— উপযুক্ত পরিবেশে এবং মন নামক খোরাকের সান্নিধ্যে এসে আবার বিপুল তেজে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। মানুষ কি আজও তার চেনাজানা পৃথিবীতে সব মাইক্রোঅরগ্যানিজমের হদিশ পেয়েছে? পায়নি। মহাসাগরের তলদেশে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছোয় না, যেখানে মাথার ওপর ৩৮,০০০ টন জলের ভয়ংকর চাপ— সেখানেও সম্প্রতি অভিযান চালিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক নতুন মাইক্রোঅরগ্যানিজম— ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব। তবে কেন অজানা মহাকাশ থেকে ভেসে আসবে না এমন এক আপাত নিষ্ক্রিয় বুভুক্ষু ভাইরাস যার একমাত্র আহার মন— যে মনের মধ্যেকার অসীম শক্তিভাণ্ডারের সন্ধান কেবল সে রাখে— মনের মালিক মানুষ এখনও রাখে না?

কাহিনির প্রথম প্যারাগ্রাফেই তাই বলেছি, এ পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কিছু নেই। সব সম্ভব, সব সম্ভব, সব সম্ভব।

মেডিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্ট ড. অ্যানড্রিজা পুহারিক মনের শক্তি নিয়ে বহু গবেষণা করে চমৎকৃত হয়েছেন। উরি গেলারের মানসিক ক্ষমতায় তিনি অভিভূত হয়েছেন। মনের এই শক্তিকে কেউ কেউ বলেন রেডিওনিক এনার্জি। হিরোনিমাস নামে এক ব্যক্তি ১৯৪৯

সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২,৪৮২,৭৭৩ নম্বর পেটেন্ট করেন বস্তু থেকে শক্তি বিচ্ছুরণ-সংক্রান্ত আবিষ্কারটির। তিনি দেখেন, দূর থেকে রেডিওনিক এনার্জি ফোকাস করে পোকামাকড় অদৃশ্য করে দেওয়া যায়। স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন হিরোনিমাস এই আবিষ্কারের পর। মানুষ পর্যন্ত তো তা হলে অদৃশ্য করে দেওয়া সম্ভব মনের রেডিয়োনিক এনার্জির সংহত শক্তিবলে? ভয়ের চোটে তাঁর আবিষ্কারের মূল সূত্রগুলি বেমালুম চেপে গেছেন হিরোনিমাস।

এই রেডিয়োনিক এনার্জি বা অডিক ফোর্স জীবদেহের বায়োইলেকট্রিসিটি, না, ম্যাগনেটিজম তা নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আজও কেউ পৌঁছতে পারেননি। একটা অজ্ঞাত শক্তিধারা যে আমাদের দেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, মনের তেজ যে তারই বহিঃপ্রকাশ— এরকম ধারণা করে নেওয়া হয়েছে। বায়োইলেকট্রিসিটি বা শরীরের তড়িৎ নতুন কোনও কথা নয়। অনেক জীব বিবর্তনের তাগিদে ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেছে, যখন মানুষ কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেত, গায়ে জামা কাপড় চাপাতেও শেখেনি— তখন থেকে। যেমন, টর্পেডো মাছ। দেখলে মনে হবে স্টীমারের তলায় পড়ে চেপটে যাওয়া একটা থালা। অল্প জলে বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে। শত্রুকে আক্রমণ করে ইলেকট্রিক ডিসচার্জে। নিজেরা কিন্তু শক খায় না। সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে ইলেকট্রিক ঈল— যদিও তারা আদৌ ঈল নয়— মাছ। দেখতে ঈলের মতো— লম্বা, কালো, প্রায় সাপের মতো। দক্ষিণ আমেরিকার কোনও কোনও নদীতে এদের সাক্ষাৎ মেলে। লম্বায় আট ফুট পর্যন্ত হয়, গতরে পূর্ণবয়স্ক মানুষের জানুর মতো মোটাসোটা। ইলেকট্রিক ডিসচার্জে এরা একটা ঘোড়াকে পেড়ে ফেলতে পারে, মানুষকে তো বটেই। ছ'শো ভোল্ট বিদ্যুৎ-বজ্র দিয়ে 'বিজলি ঈল' যে কোনও শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। লন্ডন জু-তে এরকম একটা বিজলি ঈল আছে। জ্যান্ত মাছ সামনে এলেই তার সর্বাঙ্গ একবার থরথর করে কেঁপে ওঠে— যেন একটা শক্তিশালী ডায়নামো পুরোদমে চালু হয়ে যায় শরীরের মধ্যে। মাছটা নিথর হয়ে যায় চক্ষের নিমেষে— যেন বজ্রাহত হয়েছে এমনিভাবে ধীরে ধীরে উলটে গিয়ে ভাসতে থাকে। ঈল এসে তাকে কোঁৎ করে গিলে নেয়।

মানুষও তো জীব। তার মধ্যেও বিজলি শক্তি আছে বৈকি। তবে কম মাত্রায়। কাজেই মানুষকেও বলা যায় জীবন্ত ইলেকট্রিক ব্যাটারি। বিশেষ অবস্থায় জীবদেহের এই বিদ্যুৎ, এককথায় যার নাম বায়োইলেকট্রিসিটি, বিচ্ছুরিত করা যায়। ক্ষীণ তড়িৎশক্তিও গ্যালভানোমিটারে মাপা যায়— এই পদ্ধতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে ইলেকট্রোকারডিওগ্রাফ— হৃদযন্ত্রের ইলেকট্রিসিটি মাপবার যন্ত্র। হার্টের মাসল ছাড়াও অন্যান্য পেশিও ইলেকট্রিক কারেন্টে ভরপুর। ধড় আর হাত-পায়ের শক্তিশালী পেশি থেকে যে-পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি বিচ্ছুরিত হয়, তা দিয়ে নকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষুদে মোটর চালানো যায়। মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছুরিত তড়িৎ প্রবাহ মূলত তিনটে তরঙ্গাকারে বিচ্ছুরিত হয়— আলফা, বিটা এবং ডেলটা। এ ছাড়াও আছে গামা ওয়েভ, থিটা ওয়েভ। আলফা ওয়েভে থাকে ১০ থেকে ১০০ মাইক্রোভোল্ট তড়িৎপ্রবাহ— ডেলটায় থাকে ২০ থেকে ২০০ মাইক্রোভোল্ট। মানসিক প্রয়াসে আলফা ওয়েভকে অদৃশ্য করে দেওয়া যায়। তাই যদি হয়, মানসিক চেষ্টায় তড়িৎপ্রবাহকে বাড়ানো যাবে না কেন? এই সম্ভাবনা যে অযৌক্তিক নয়,

আশ্চর্য এই কাহিনিই কি তার প্রমাণ নয়? অজ্ঞাত ভাইরাস প্রচণ্ড মনঃশক্তির অধিকারী মানুষের মন-মস্তিষ্কে জাঁকিয়ে বসে তারই বায়োইলেকট্রিসিটিকে বহুগুণে বর্ধিত করে নিক্ষেপ করছে শত্রুর ওপর, অবশ করছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জয় করছে তার মস্তিষ্ক। আরও আছে, আরও আছে, সুবিশাল এই তত্ত্বকথা পরিবেশনের পর আসা যাক সেই প্রসঙ্গে। প্রফেসরের দেহাশ্রিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস যে কী প্রলয়ংকর বিপর্যয় ডেকে এনেছিল টাইটান গ্রহের গ্যালাক্সি হাসপাতালে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে— এবার শুরু হোক সেই লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা।...

প্রফেসরকে অপারেশন করবেন, ডক্টর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনতিকাল পরেই শুরু হল রোমাঞ্চকর ঘটনাপরম্পরা...

গ্যালাক্সি রিসার্চ হসপিটালের রসদ বহন করে আনছিল রবীন্দ্রসাটল। সুবিশাল স্পেস মেশিন। স্পেস এবং টাইমের রহস্যাবৃত অঞ্চল ভর্টেক্সের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে চক্ষের নিমেষে এসে পৌঁছেছে সৌরজগতের দূরতম প্রান্তে। মহাকাশপোতটি একাধারে টাইম মেশিন এবং স্পেসশিপ। দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার সময়ে টাইম মেশিন— আবার গন্তব্যস্থলের অনতিদূরে এসেই দৃশ্যমান হয় স্পেসশিপ রূপে— ধীরে ধীরে অবতরণ করে স্টেশন ডকিং বে'তে— পরস্পরবদ্ধ হয়ে যায় মাস্টার কম্পিউটারের যান্ত্রিক নৈপুণ্যে। কড়াং কড়াং করে আওয়াজ শোনা যায়, মহাকাশপোতের এয়ারলকের সঙ্গে ডকিং বে'র এয়ারলক যুক্ত হয়ে গেলেই হিস হিস শব্দ শোনা যায়। কন্ট্রোল কেবিনে কম্পিউটার হেঁড়ে গলায় হেঁকে ওঠে, 'ডকিং কমপ্লিট। শিপ লকড-অন।' ক্রুম্যান-রা হেলমেট আর স্পেস গন্টলেট মাথায়-মুখে পরে নেয়। স্পেসস্যুটের পকেটে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে এয়ারলক দরজার কাছে আসে। দরজা খুলে ছোট্ট সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে। আর একটা দরজা খুলে ঢুকে পড়ে ধাতব অলিন্দে। নিকটস্থ লাউডস্পিকারে ধ্বনিত হয় প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর, 'স্বাগতম টাইটান!'

বরাবর এই রকমই হয়ে আসছে। পৃথিবীগ্রহ থেকে শনিগ্রহের যাত্রীদের এইভাবেই সাদর অভ্যর্থনা জানানোর রেওয়াজ। তাই স্পেসমেশিন টাইটানের কাছে এসেই নাটকীয়ভাবে দৃশ্যমান হয় স্পেসশিপ রূপে— হেলতে দুলতে নেমে আসে রাজকীয় অভ্যর্থনার লোভে। এ রীতির অন্যথা কখনও হয়নি। কিন্তু এইবার হল।

পুরনো প্রথার ব্যতিক্রম ঘটতে চলছে অভাবনীয়ভাবে, রবীন্দ্র সাটল-এর ক্যাপ্টেন হ তা জানবেন কী করে? তিনি তো আর জ্যোতিষী নন। কম্যান্ড চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে আরাম করছিলেন ভদ্রলোক। দুজন ক্রু মেম্বার তাঁর ঠিক পশ্চাতেই অ্যাকসিলারেশন কোচে বসে ঢুলছে। অ্যাসটরয়েড কে-৪০৬৭ এসে গেল বলে— এবার তাই এই আয়েসি ব্যবস্থা— শরীর এলিয়ে দেওয়ার আয়োজন। বিংশ শতাব্দীতে রোলস রয়েস এসে গেলেও অশ্বশকটের জাঁকজমক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পছন্দ করতেন— স্পেস মেশিনের যুগেও তাই পুরনো প্রথা চলে আসছে। তিনজনেই গা ঢেলে দিয়েছে সেই কারণেই তাই। আদ্দিকালের স্পেসশিপের মতো ডকিং-এর প্রাক্কালে যন্ত্রপাতি নিয়ে উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে বসে থাকতে হয়

না কাউকে— মাস্টার কম্পিউটার মসৃণ দক্ষতায় সেকাজ সম্পন্ন করবে। সবই রুটিনমাফিক কাজ। টাইটানের রাজকীয় অভ্যর্থনার সুখস্বপ্নে তিনজনেই মশগুল।...

বাইরে, মহাশূন্যের নিরন্ধ্র তমিস্রায়, একটা ভাসমান নিরাকার শৈত্য সহসা আবির্ভূত হল। কোত্থেকে যে এত ঠান্ডার আবির্ভাব, তা কিন্তু বোঝা গেল না। সাটলের গমনপথের সামনেই আচম্বিতে তা আকার গ্রহণ করতে লাগল। সাটল প্রবেশ করল তার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের মধ্যে থেকে বিদ্যুৎরেখা লকলকিয়ে ছিটকে এল, মহাকাশপোত বেষ্টন করে নৃত্য করে চলল পরমানন্দে...

হঠাৎ খেয়াল হল ক্যাপ্টেনের। মহাকাশপোতের গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চূড়ান্ত পাওয়ারড্রাইভে পৌঁছেছে। সোজা ধেয়ে যাচ্ছে অ্যাসটেরয়েড অভিমুখে।

আতঙ্কে উন্মাদপ্রায় ক্যাপ্টেন সুইচ টিপে কম্পিউটারচালিত কন্ট্রোলকে হস্ত চালিত অবস্থায় আনবার চেষ্টা করলেন। অনেকগুলো বিদ্যুৎশুঁড় ফ্ল্যাশ দিল কম্পিউটারের কীবোর্ডে, বলয়াকারে নৃত্য করতে লাগল ক্যাপ্টেন এবং ঢুলন্ত দুই সঙ্গীর মাথা ঘিরে। চোখে ধোঁয়া দেখলেন ক্যাপ্টেন। চেতনা যখন লুপ্তপ্রায়, কানে ভেসে এল কম্পিউটারের হেঁড়ে গলা, 'গোলাম হাজির। হুকুম তামিল করলাম।' কেটে গেল চোখের ধোঁয়া— প্রশান্ত ভঙ্গিমায় ঠেস দিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন হ। শান্ত দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন, স্পেসশিপ উল্কা বেগে ধেয়ে চলেছে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। 'গোলাম হাজির— আদেশ করুন'— বিড় বিড় করে আউড়ে গেলেন ভদ্রলোক। আদেশ এসে গেছে— তা পালন করাও হচ্ছে... সব ঠিক আছে... এখন শুধু সংঘাতের প্রতীক্ষা...

ব্রেন অপারেশন চাট্টিখানি কথা নয়। দীর্ঘ সময় লাগে প্রস্তুতিপর্বে। প্রফেসরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ডক্টর ভারী হুঁশিয়ার পুরুষ। বারংবার স্ক্যান করলেন প্রফেসরের ব্রেন— তাঁর প্রযত্ন এবং অতি-সাবধানতায় প্রফেসরের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার উপক্রম হল। ডক্টর কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বিকার থাকতে পারলেন না। আগের মতোই বেজায় খিটখিটে হয়ে উঠলেন প্রফেসরের বালকোচিত অধৈর্যতা দেখে। দাবড়ানিও দিলেন কয়েকবার। তিনি তো জানেন মরিয়া হয়ে অপারেশন করতে চলেছেন— শেষ চেষ্টাও বলা যায়। অপারেশন-অন্তে প্রফেসর জীবিত নাও থাকতে পারেন— এমন সম্ভাবনাও মাথার মধ্যে ঘুরপাক দিচ্ছে বলেই আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দু-চারটে ধমক দিতেই প্রফেসরও তাঁর বিখ্যাত খিটখিটে মেজাজের যৎসামান্য নিদর্শন হাজির করলেন। লেগে গেল দুই বৈজ্ঞানিকে, সে এক দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড! শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, এই নিয়ে আমি পড়লাম মহাফ্যাসাদে।

ডক্টরই জিতলেন শেষ পর্যন্ত। আশ্চর্য লোক বটে! প্রথমে যাঁকে শান্ত সৌম্য, অমায়িক দেখেছিলাম, পরে তাঁকে দেখেছিলাম খিটখিটে বদমেজাজি রূপে। এখন দেখলাম তাঁর কড়া, জবরদস্ত সার্জন রূপ। এ আর এক মূর্তি। প্রফেসরের চেঁচামেচির তোয়াক্কা করলেন না। পরে তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন, এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। প্রফেসর বড় ভয়ংকর বিপদে পড়েছিলেন। হয় তাঁকে মহাকাশের ভাইরাস ভূতের খপ্পরে থেকে যেতে হবে মনের দিক দিয়ে— গোলাম হয়ে থাকতে হবে যাবজ্জীবন; অথবা, প্রফেসরের নিজের ভাষাতেই— অনন্তকাল মনঃহীন হয়ে থাকতে হবে।

শেষকালে নাচার হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন প্রফেসর। অস্ত্রচিকিৎসকের ধড়াচূড়া পরে, মুখে মুখোশ এঁটে, ডক্টর প্রফেসরকে টেবিলে শুইয়ে ঝুঁকে পড়লেন তাঁর ওপর। ক-৫ একপাশে চতুষ্পদে খাড়া রইল অপারেশন মনিটর করার জন্যে। বিষম অস্বস্তি নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার কাছে। ডক্টর আমাকে অন্যত্র যেতে বলেছিলেন, কিন্তু প্রফেসরকে পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালের অপারেশন টেবিলে শুইয়ে আমি কোথাও যেতে পারলাম না। কাকুতি মিনতি করে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার কাছে।

শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন ডক্টর, 'নার্স, এখন কোনও অ্যানেসথেটিক নয়! সমাধিস্থ রয়েছেন প্রফেসর। ক-৫, ব্রেন মনিটর করো। সম্মোহ কাটিয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা গেলেই হুঁশিয়ার করে দেবে আমাকে তক্ষুনি— নইলে এমন শক পাবেন যে মারা যাবেন।'

'তথাস্তু, প্রভু।' রোবটের কণ্ঠে এমন মুনিসুলভ বরাভয় শুনে ভীষণ হাসি পেল ওই অবস্থাতেও। চীজ বটে একখানা! কখনও বরদান করছে, কখনও গোলাম হোসেন সাজছে। যেমন ডক্টর, তেমনি তাঁর চ্যালা!

ঝুঁকে পড়লেন ডক্টর। প্রফেসরের মস্তিষ্কে লেজার মাইক্রোতদন্তের প্রথম পর্যায়ে অতি-সূক্ষ্ম ছুরি চালানোর জন্যে প্রস্তুত হলেন। এমন সময়ে লাউডস্পিকারে গাঁক-গাঁক করে ধ্বনিত হল একটা কণ্ঠস্বর— 'এমারজেন্সি! এমারজেন্সি! সমস্ত স্টেশন! সমস্ত স্টেশন! এমারজেন্সি! সমস্ত স্টেশন। স্টেশন! এমারজেন্সি! সাপ্লাই-সাট্‌ল্‌ ঘাঁটির দিকে সংঘাতরেখায় ছুটে আসছে। মনে হচ্ছে কন্ট্রোল নষ্ট হয়েছে। সিগন্যালের সাড়া দিচ্ছে না! জখম ডিপার্টমেন্টে ডাক্তার আর নার্সরা এখুনি রিপোর্ট করুন। আবার বলছি, ডাক্তার আর নার্সরা এখুনি চলে আসুন! এমারজেন্সি! এমারজেন্সি!'

স্ক্যালপেল নামিয়ে রেখে গুঙিয়ে উঠলেন ডক্টর, 'ঠিক এই সময়ে এমারজেন্সি? কেন? কেন? কেন?'

দ্বিধায় পড়লেন ভদ্রলোক। অপারেশন চালিয়ে যাবেন? লাউডস্পিকারের গাঁক গাঁক চিৎকার আবার শুরু হতেই ধুত্তোর বলে ফেলে দিলেন স্ক্যালপেল। এই হট্টগোলের মধ্যে এত সূক্ষ্ম ব্রেন অপারেশন সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সংঘাত ঘটলে কী ধরনের ক্ষতি হবে, সে ভবিষ্যৎবাণীও করা যাচ্ছে না। পাওয়ার সাপ্লাই যদি ব্যাহত হয়? অন্ধকারে অপারেশন চালাতে গিয়ে প্রফেসরকে মেরে ফেলবেন নাকি?

স্পিকার কণ্ঠস্বর তখনও তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে, 'এমারজেন্সি! এমারজেন্সি! সমস্ত মেডিক্যাল স্টাফ ক্যাজুয়ালটি অ্যাটেন্ড করুন এখুনি!'

ছটফট করছিল নার্স। এবার সরব হল, 'স্যার, আমাদের যাওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাওয়া দরকার। ক-৫, তোমার চার্জে রইলেন প্রফেসর। কাউকে কাছে আসতে দিয়ো না। বুঝেছো?'

'তথাস্তু!'

স্পেস বিদীর্ণ করে তীক্ষ্ণ শব্দে বেরিয়ে এল সাপ্লাই-সাট্‌ল্‌। আছড়ে পড়ল গ্যালাক্সি রিসার্চ হসপিটালের একপ্রান্তে। বিশাল বিল্ডিং ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল

ওপর দিকে, ভেসে গেল মহাশূন্যে। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের বায়ুচাপ নষ্ট হয়ে যেতেই মহাশূন্য সোঁ সোঁ করে টেনে নিল যন্ত্রপাতি, কড়িবরগা, এমনকী মানুষকেও।

বিল্ডিংয়ের একপাশে গভীরভাবে গেঁথে গেল সাটল্‌টা। কিন্তু সংঘাতের স্থান আগে থেকেই অঙ্ক কষে হিসেব করা ছিল বলেই আসল জায়গাটা বেঁচে গেল— প্রফেসর নিস্পন্দ দেহে প্রশান্ত মুখে সমাধিস্থ অবস্থায় শুয়ে রইলেন অপারেশন টেবিলে।

বিপুল সংঘর্ষের ভয়ানক আওয়াজে কানের পর্দা যেন ফালাফালা হয়ে গেল। সেইসঙ্গে চিৎকার, আর্তনাদ। মড়মড় করে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ধাতু আর প্লাস্টিক। সারা ঘরটা কেঁপে উঠল থর থর করে। দপ দপ করে আলোগুলো নিভে গিয়েই ফের জ্বলে উঠল। সটান আছড়ে পড়লাম আমি। তড়াক করে ফের লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। কিন্তু সিধে হয়ে দাঁড়ানোও তখন প্রাণান্তকর ব্যাপার। প্রচণ্ড সেই ঝাঁকুনিতে মড়া মানুষ জেগে ওঠে, প্রফেসরেরও সমাধিভঙ্গ হল। চোখ মেললেন তিনি। পিটপিট করে চেয়ে থেকে বললেন মিন মিন করে, 'ব্যাপারটা কী?'

চোখের চাউনিটা আগে লক্ষ করলাম। না, অমানুষিক চাউনি এখন নেই। নির্ভয়ে কাছে গেলাম। বললাম, 'অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। একটা সাটল আছড়ে পড়েছে! ডক্টর গেছেন সেখানে।'

'আছড়ে পড়ল কোথায়?'

জবাবটা দিল ক-৫, 'তিন নম্বর লেভেলে। বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে, ফলে এই অঞ্চল এখন বিচ্ছিন্ন।'

'সেকী!' বলেই সটান উঠে বসলেন প্রফেসর।

কিন্তু স্পিকারের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়নি। আবার ধ্বনিত হল তার গমগমে গলা, 'যে যেখানে আছেন, তিন নম্বর লেভেলের অ্যাকসিডেন্ট অঞ্চলে চলে আসুন এখুনি। আবার বলছি, তিন নম্বর লেভেল।'

প্রফেসর সামলে উঠেছিলেন। বললেন, 'উঁহু, নিছক অ্যাকসিডেন্ট বলে মনে হয় না আমার।'

'কেন মনে হয় না?' আমার প্রশ্ন।

'আমার মাথার মধ্যে যা রয়েছে, তার সঙ্গে নিশ্চয় এর সম্পর্ক আছে,' প্রফেসরের কথার ধরনে রসিকতার ছিটেফোঁটাও নেই। 'ক-৫, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি?'

'তথাস্তু।' কাংসকণ্ঠে বরদান শুনে বাস্তবিকই হাস্যসংবরণ করা কঠিন।

'ক্লোনিং টেকনিক, ক-৫, ক্লোনিং টেকনিক। ক্লোনিং-এর কায়দা কানুনগুলো একটু ঝালিয়ে নিতে চাই। সাহায্য করো, প্লিজ, যা জানো, শিখিয়ে পড়িয়ে দাও— ঝটপট!'

কলের কুকুর ক-৫-এর মগজ ঠাসা রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক তথ্যে। কেউ যদি তা থেকে কিছু ধার চায়, দিতে কার্পণ্য করে না ক-৫। বরং খুশি হয়। রোবট-তৃপ্তিতে ভরপুর হল ক-৫। হঠাৎ বিপ বিপ আওয়াজ করে উঠল এমনভাবে যেন কেশে গলা সাফ করছে।

বললে, 'ক্লোন শব্দটা গ্রিক, মানে— নবপল্লব। ব্যক্তিবিশেষের একটিমাত্র কোষ থেকে সেই ব্যক্তিটির হুবহু নকল তৈরি করাকে ক্লোনিং বলে। সজীব প্রতিমূর্তি তৈরির বিজ্ঞান।

ব্যক্তিবিশেষের একটিমাত্র কোষকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেই ছাঁচ থেকে বহু সৃষ্টি হয়। একটিমাত্র কোষ বিভাজন হয়েই বহু কোষ সমন্বিত প্রাণীর সৃষ্টি। তাই যে কোনও প্রাণীর একটিমাত্র কোষকে নকল করতে পারলেই নকলকোষ বিভাজন করে হুবহু নকল প্রাণী তৈরি হয়। আসল প্রাণীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে ক্লোন প্রাণীর মধ্যে।'

'তারপর? তারপর?' অধীর কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

'প্রাণীদের কোষের মধ্যে ডি এন এ মলিকিউলরা বংশগতির পুরো তথ্য নিজেদের মধ্যে রেখে দেয়। ক্লোনের মধ্যে তার অনুলিপি সৃষ্টি করা যায়। বিংশ শতাব্দীর 'আটলান্টিক' মাসিক পত্রিকায় জেমস ওয়াটসন ক্লোনিং সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে সাড়া জাগিয়েছিলেন। জেমস ওয়াটসন সাধারণ মানুষ ছিলেন না—'

'জানি, জানি।' অস্থির কণ্ঠ প্রফেসরের, 'ডি এন এ গঠন সম্পর্কে গবেষণা করে নোবেল প্রাইজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। তারপর?'

কাংসকণ্ঠে বলে চলল ক-৫, 'ওয়াটসন সাহেব মানুষ ক্লোনিংয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। ভয়ানক ভয় পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, বেশ কিছু জীববিজ্ঞানী আর চিকিৎসাবিজ্ঞানী ক্লোনিং-বিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ করবেই। তখন শিব গড়তে বাঁদর গড়া হবে। মানুষ গড়তে গিয়ে মানুষের গড়া দৈত্য সৃষ্টি হবে। হাজার হাজার লাখ লাখ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পৃথিবী ছেয়ে যাবে।'

শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার।

কাঁসি বাজানো ঢং ঢং গলায় ক-৫ তখনও মহোৎসাহে বলে চলেছে (প্রফেসর উশখুশ করা সত্ত্বেও), 'ক্লোনিং বিজ্ঞানকে কিন্তু যেসব বৈজ্ঞানিকরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জে বি এস হ্যালডেনের মতো বিংশ শতাব্দীর ব্রিলিয়ান্ট বৈজ্ঞানিক— ইনি ভারতের মাটিতে দীর্ঘ সময় থেকেছেন। দীর্ঘদেহী আধপাগলা এই বৈজ্ঞানিক পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে কলকাতায় ঘুরেও বেরিয়েছেন—'

'তাই নাকি!' আমি আর বিস্ময় রোধ করতে পারলাম না।

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'চোপরাও।— ক-৫, দোহাই তোমার, কাজের কথাগুলো বলো। সময় খুব কম!'

ক-৫-এর ভ্রূক্ষেপ নেই। জ্ঞানদানের সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে? বিলম্বিত লয়ে ফাটা কাঁসি বেজেই চলল, 'হ্যালডেন সাহেব বলেছিলেন, 'স্পেশ্যাল এফেক্ট' সহ মানুষ-ক্লোনিং করা দরকার। এমন মানুষ তৈরি করা দরকার যাদের নৈশদৃষ্টি থাকবে, যন্ত্রণাবোধের অনুভূতি থাকবে না। নিকট-ভবিষ্যতে যুদ্ধবাজ মানুষেরা যখন আলট্রাসনিক অর্থাৎ অতি-সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ সমন্বিত অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করবে, তখন এমন মানুষ তৈরি করা দরকার যাদের শ্রবণযন্ত্র ওই শব্দতরঙ্গ শুনতে পাবে না। এ ছাড়াও বামন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে ক্লোনিং বিজ্ঞানের কৃপায় যাতে নতুন কোনও গ্রহে গিয়ে সেখানকার অতি-মাধ্যাকর্ষণেও কলোনি স্থাপন করতে অসুবিধে না হয়। ফরাসি বায়োলজিস্ট জাঁ রোস্ট্যান্ড আরও চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বলেছিলেন, মানুষকে অমরত্ব দান করতে পারে ক্লোনিং-বিজ্ঞান। অনেকগুলো ধারাবাহিক 'নকল' তৈরি করে রাখলেই ল্যাঠা চুকে যায়। একটা 'নকল'

যখনই জীর্ণ হবে, তার বদলে আর একটা 'নকল' চলে আসবে। এইভাবে মানুষ অমৃত পান না করেও অমর হয়ে যাবে।'

প্রফেসরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হল এবার। আমার কিন্তু বেশ লাগছিল কাংসকণ্ঠের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা।

ক-৫ প্রফেসরের ভ্রূনৃত্য দেখেও দেখল না, 'নোবেল প্রাইজ ধন্য ড. যোশুয়া লেডালবার্গও স্নায়ুর অনুলিপি বানিয়ে ক্লোন মানুষকে সাহায্য করার আইডিয়া দান করেছিলেন বিজ্ঞানীমহলকে। এ ছাড়াও, ড. ইলোফ অ্যাক্সেল কার্লসন একটা বড় ভয়ংকর প্রস্তাব এনেছিলেন। আঁতকে ওঠার মতো প্রস্তাব। মড়াকে জাগানো হোক ক্লোনিং বিজ্ঞান দিয়ে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানুষদের কবর খুলে কিছু না কিছু ডিএনএ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। মিশরের ফারাও টুটেনখামেনের ম্যমীদেহ থেকে হাজার হাজার টুটেনখামেন সৃষ্টি তখন সম্ভব হবে।'

'ক-৫?' প্রফেসর গলা তুললেন। স্পষ্টত ধৈর্য ফুরিয়েছে।

আর একপর্দা গলা চড়িয়ে ক-৫ বললে, 'এই সব কপোলকল্পনার মাঝে কর্নওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এফ সি স্টুয়ার্ড ১৯৬০ সালে কিছু কাজের কাজ করলেন। গাজরের কোষ রাখলেন নারকেলের দুধ এবং আরও কয়েকটা পোষ্টাই জিনিসের মধ্যে। আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখা গেল তখনই। কোষবিভাজন আরম্ভ হয়ে গেল আপনা থেকেই পুষ্পরেণুতে আবৃত না হওয়া সত্ত্বেও। অচিরেই অঙ্কুরিত হল এবং নবপল্লবও দেখা গেল। ড. স্টুয়ার্ডের এই পদ্ধতিকে বলা হয় ক্লোনিং— উৎপন্ন দ্রব্যগুলোর নাম দেওয়া হল 'ক্লোন'। যার গ্রিক মানে নবপল্লব, কাটা ডালপালা ইত্যাদি... আধুনিক মানে দেহকোষ থেকে উৎপন্ন একগুচ্ছ কোষ বা জীবদেহ।'

'হয়েছে! হয়েছে!' প্রফেসর এবার চেঁচালেন।

ক-৫-এর ডংকা বাজল তারও উঁচু পর্দায়, 'শুরু সেই ১৯৬০ সালে। তারপর দুজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক— ড. আর ব্রিগস এবং ড. টি-জে কিঙ ক্লোনিং নিয়ে পুরোধা স্বরূপ কাজ করলেন। তারপর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ড. জে বি গার্ডন ক্লোন করলেন আফ্রিকার থাবাওলা একটা ব্যাঙকে।'

'গোল্লায় যাক আফ্রিকার ব্যাং!'

'পিলে চমকানো এই এক্সপেরিমেন্টের পরেই সুপ্রসিদ্ধ ক্যাল টেক জীববিজ্ঞানী ড. রবার্ট সিন্সহাইমার ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন ১৯৬৮ সালে— মানুষ-ক্লোন সম্ভব হবে আর মাত্র দশ বছরের মধ্যেই। নিউ ইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োলজির বিখ্যাত প্রফেসর ড. বেন্টলিগ্লাস কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, সর্বনাশ হবে যে তা হলে! জনপ্রিয় চিত্রতারকা, রাজনীতিবিদদের চামড়ার চাহিদা বেড়ে যাবে। তা ছাড়া, অত্যাচারী গভর্নমেন্টরা খেয়াল খুশিমতো দুর্ধর্ষ ব্যক্তিদের চামড়া থেকে লাখ লাখ অত্যাচারী মানুষ তৈরি করতে থাকবে। অতএব, সাধু সাবধান! কিন্তু কেউ তাঁর সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করেনি।'

এবার দু'হাত শূন্যে ছুড়তে ছুড়তে প্রফেসর উন্মাদ নৃত্য শুরু করে দিলেন, 'ক-৫! ক-৫! তুমি এবার থামবে কিনা?'

থমকে গেল ক-৫। যান্ত্রিক চোখে কিছুক্ষণ উপভোগ করল বোধহয় বিখ্যাত নাটবল্টু চক্র নৃত্য। তারপর বললে গলা নামিয়ে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্যে, 'শুধু একটা খবর বাকি আছে এখনও।'

'আর কোনও খবর আমি শুনতে—'

'সম্প্রতি হলোগ্রাফ-ক্লোনিং সম্ভবপর হয়েছে কিলব্রাকেন টেকনিকের কৃপায়।'

এতক্ষণে উৎকর্ণ হলেন প্রফেসর। সংকুচিত চোখে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ব্যাপারটাই জানতে চাই।' তাঁর চোখমুখের অবস্থা দেখে স্পষ্ট বুঝলাম, একটা অভিনব প্ল্যান এসেছে মাথায়। যে আগন্তুক শক্তি তাঁকে দখল করতে চলেছে, তাকে পরাভূত করার একটা জবর পরিকল্পনা ঝলসে উঠেছে তাঁর মস্তিষ্কের দিগন্তে। তাই কানখাড়া করে শুনে গেলেন হলোগ্রাফ ক্লোনিংয়ের বিশদ বৃত্তান্ত।

কটর মটর বক্তৃতা থেকে হলোগ্রাফি সম্বন্ধে আমি যা জানলাম, তা এই: ক্যামেরা বা লেন্স ছাড়াই ত্রিমাত্রিক প্রতিমূর্তি সৃষ্টির নাম হলোগ্রাফি। প্রতিমূর্তিকে তখন কাগজের বুকে চ্যাপটা ছবি বলে মনে হয় না— আসল মূর্তির মতোই তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ থাকে।

এরপরেই শুরু হল এই চমকপ্রদ কাহিনির বিচিত্রতম পর্ব— হলোগ্রাফ প্রফেসরের আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা! এ পর্ব এমনই অত্যদ্ভুত যে ছোট্ট পাঠক পাঠিকারা যেন মনের দিক দিয়ে চমক খাওয়ার জন্যে তৈরি থাকে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আজ পর্যন্ত এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার অভিযান কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। অদ্ভুত সেই অভিযানপর্ব যাতে অবিশ্বাস্য মনে না হয়, তাই ক্লোনিং সম্পর্কে ক-৫-এর দীর্ঘ জ্ঞানদান সংক্ষেপিত না করে উপস্থাপিত করা হল।

এবার শুরু হোক সেই আখ্যান! বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর, এবং... অবিশ্বাস্য!!

১৩
ক্লোন

সূর্যকান্ত মণি যেমন সূর্যের তেজ আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি চিত্তের একাগ্রতা দিয়ে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়, অনেক শক্তি আহরণ করা যায়। তিল মধ্যে বারবার সুগন্ধি পুষ্প নিক্ষেপ করলে যেমন ক্রমশ সুগন্ধের আতিশয্য হয়, ঠিক তেমনি বিশুদ্ধ চিত্তে অনেক বিচিত্র গুণের আধিক্য হয়ে থাকে। কিরণজাল যেমন সূর্য তেজে কদাপি অন্তর্হিত হয় না, তেমনি শক্তির বীজ একাগ্রচিত্র উদ্‌যোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিতদেরকে কখনও পরিত্যাগ করে না।

এসব তত্ত্বকথা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নাটবল্টু চক্রের মুখে শুনে শুনে কান পচে গিয়েছিল। অবিশ্বাস্য অভিযানে বেরিয়ে তাঁর প্রতিটি উপদেশ বাক্যের যাথার্থ্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। অজ্ঞাত ভাইরাস স্বীয় শক্তিবীজবলে কেবলমাত্র ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন করেই ক্ষান্ত হয়নি, বিশাল ভূমণ্ডলের সূর্যসম প্রফেসরের মস্তিষ্ক আর মনের সন্ধান ঠিক পেয়েছে এবং তাঁর

প্রতিই কেবল আকৃষ্ট হয়েছে। এই শক্তিবীজবলেই টাইটানে সে ধ্বংসলীলা দেখিয়েছে— চারপাশের শক্তি আকর্ষণ করে নির্ভুল লক্ষ্যে নিক্ষেপ করেছে সাপ্লাই সাট্ল্ অভিমুখে— ভণ্ডুল করেছে প্রফেসরের মস্তিষ্ক অপারেশন যাতে তার নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়।

সেই মুহূর্তে প্রফেসর তাই এই শক্তির বীজটাকেই অন্বেষণের মনস্থ করেছিলেন— শক্তিকে শক্তি দিয়ে টক্করের ব্যর্থ প্রয়াসে সচেষ্ট হননি। সূর্যকান্ত মণিস্বরূপ যে শক্তির বীজটি মহাবিশ্বের বিপুল এবং অজ্ঞাত শক্তিকে আকর্ষণ করে প্রলয়ংকর বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, তাঁর মতো মেধাকেও মুঠোয় আনতে পারে— সেই মণিসদৃশ ভাইরাসটিকে খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন অত্যন্ত অভিনব পন্থায়। তাই আশ্রয় নিয়েছিলেন হলোগ্রাফ-ক্লোনিংয়ের।

ক-৫ প্রদত্ত বক্তৃতার তাই শেষাংশটুকু উদ্ধৃত করছি বোঝবার সুবিধের জন্যে।

'হলোগ্রাফ-ক্লোনিং টেকনিক বর্তমানে অত্যন্ত সহজ, কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়।'

'কেন নয়? কেন নয়?' প্রফেসরের অস্থিরতা আবার বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাইরে দুমদাম আওয়াজ শুনলাম। কারা যেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পরে জেনেছিলাম, গ্যালাক্সি রিসার্চ হসপিটালের একপ্রান্তে সাপ্লাই সাট্ল্ গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন ডক্টর। তা সত্ত্বেও খুঁজে বার করেছিলেন। কিন্তু কন্ট্রোল থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষণপ্রভ বিদ্যুৎবহ্নি তাঁর এক সহকারীকে স্পর্শ করতেই তিনি উপলব্ধি করেন অ্যাকসিডেন্টটা ঘটিয়েছে প্রফেসরের মস্তিষ্কমধ্যস্থ অজ্ঞাত ভাইরাস— অকারণে যন্ত্র বিকল হয়নি। ঘটিয়েছে এমন সময়ে যখন প্রফেসরের মগজে অপারেশন করার জন্যে তিনি ছুরি হাতে নিয়েছেন। কাজেই ভাইরাসের উদ্দেশ্য অপারেশন ভন্ডুল করা। এই সারসত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছিলেন আইসোলেশন ওয়ার্ডের দিকে— প্রফেসর যেখানে আত্মসম্মোহে আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে আছেন বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি তখনও জানতেন না, দুর্ঘটনার মূল যে আগন্তুক ভাইরাস— তা প্রফেসর তাঁর আগেই আন্দাজ করে নিয়ে ভাইরাস অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন নিজে থেকেই।

হলোগ্রাফ-ক্লোনিং টেকনিক সহজ অথচ অনির্ভরযোগ্য, ক-৫-এর এই বিবৃতির ব্যাখ্যা যখন দাবি করলেন প্রফেসর, তখন দরজার ওপারে পৌঁছে গেছেন ডক্টর। পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ শুনেই তাই অধীর হলেন প্রফেসর। ক-৫ কিন্তু নির্বিকার গলায় বললে ধীরে সুস্থে, 'কয়েকটা অতীন্দ্রিয় সমস্যার সমাধান আজও হয়ে ওঠেনি বলে হলোগ্রাফ প্রতিমূর্তিরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না।'

'কতক্ষণ পারে না? কতক্ষণ পারে না?'

'দশ মিনিট— দীর্ঘতম অস্তিত্বের সময় এর বেশি আজও সম্ভব হয়নি।'

ঠিক এই সময়ে হুড়মুড় করে ঘরে প্রবেশ করলেন ডক্টর। ক-৫-এর শেষের কথাটা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। তাই ত্রুটি সংশোধন করে দিলেন হাঁপাতে হাঁপাতে, 'দশ মিনিট ছাপান্নো সেকেন্ড।'

সাগ্রহে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর, 'মশায়, আমাকে—'

খেঁকিয়ে উঠলে ডক্টর, 'আমার নাম ডক্টর।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' অমায়িক কিন্তু ক্ষিপ্রস্বরে বললেন প্রফেসর, 'ড. কই—'

'কই নয় কৌ।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ড. কৌ, আমাকে ক্লোন করতে পারেন?'

স্পষ্টত টলমল করে উঠলেন ডক্টর। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের সমাধি দেখেই তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছিল, এখন আবার একী বায়না?

থতমত খেয়ে বললেন, 'ক্লোন করব? আপনাকে? কেন? কী হয়েছে?'

'বলছি। আগে বলুন, ক্লোন করতে জানেন কিনা।'

ব্যস, আর যায় কোথা! রেগে টং হলেন ডক্টর। এ-যেন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। কথায় কথায় দপ করে জ্বলে উঠে উগ্রমূর্তি ধারণ করছেন। আর প্রফেসর যেন বশিষ্ঠ। কঠোর এবং অন্যায় পরীক্ষা করতে বসেছেন বিশ্বামিত্রকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী বিশ্বামিত্রের তখন ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা। ফলে পাছে দুজনেই দুজনকে অভিশাপ দিয়ে বসেন এবং দুজনেই পক্ষীতে পরিণত হয়ে যুদ্ধে রত হন, এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে আমি শশব্যস্তে বললাম, 'ড. কৌ, প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের বিশ্বাস, এই অ্যাকসিডেন্টের মূলে পাজি ভাইরাসটার হাত আছে।'

মুখ লম্বা হয়ে গেল ডক্টরের, 'তাই নাকি? আমি তো নিজের চোখে দেখে এলাম। কন্ট্রোল থেকে বিদ্যুৎ ছিটকে এসে সাপটে ধরল আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে। এতক্ষণে তার অবস্থা নিশ্চয় ওঁর মতোই হয়েছে। তাই তো ছুটতে ছুটতে আসছি। ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়ার আগেই ওঁকে অপারেশন করতে চাই। নিন, শুয়ে পড়ুন।'

হাত তুলে আগুয়ান ডক্টরকে নিরস্ত করলেন প্রফেসর। বললেন বজ্রকণ্ঠে, 'পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালের বৈজ্ঞানিকদের ব্রেন এত মন্থর, জানা ছিল না। ভাইরাসের কারসাজি দেখবার জন্যে ছুটে যাওয়ার দরকার ছিল না, এখানে বসেই আন্দাজ করা যেত।'

'কী... কী বললেন!' তোতলা হয়ে গেলেন কৌ প্রচণ্ড অপমানে।

প্রফেসরকে তখন নিষ্ঠুরতায় পেয়ে বসেছে। সাক্ষাৎ বশিষ্ঠই বটে। এই লাগে সেই লাগে অবস্থা দেখে আমার হল ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। কড়া গলায় ততক্ষণে বলে ফেলেছেন প্রফেসর, 'আপনার এলেম বোঝা গেল মশায়, খবরদার বলছি, আমার ব্রেনে ছুরি চালাতে আসবেন না। আমার ব্রেনে আমিই ঢুকবো।'

এবার আমি তো থ হলামই, কৌ পর্যন্ত আমতা আমতা করে উঠলেন 'তা-তার মানে?'

'মানে-ফানে বলবার সময় আমার নেই। উফ! এমন স্লো সায়ান্টিস্ট আমি লাইফে দেখিনি! যা জিজ্ঞেস করলাম, আগে তার জবাব দিন। ক্লোন করতে জানেন?'

শুনেছি, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা-নির্মিত বৈবস্বত যমের শত যোজন ব্যাপী মনোহারিণী যমসভায় উগ্রতপাঃ সন্ন্যাসীরাও মহাত্মা যমের উপাসনা করেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস যমলোকে হাজির হয়ে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যদি উগ্রমূর্তি ধারণ করেন, তা হলে স্বয়ং যমও প্রণিপাত হবেন প্রফেসরের চরণতলে— এমনই কীর্তিমান পুরুষ আমাদের এই প্রফেসর। ডক্টর তো কোন ছার। তিনি তাঁর ওই অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখেই যেন নিভে গেলেন। তোতলাতে তোতলাতে বলে উঠলেন, 'তা-হ্যাঁ... জানি বৈকি।'

‘আমাকে করতে পারেন?’ প্রফেসরের গলায় যেন দুন্দুভি বেজে উঠল।

একটু সামলে নিয়েছিলেন ডক্টর। বললেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঈষৎ আত্মম্ভরিতার সঙ্গে, ‘তা করতে পারি। কিলব্রাকেন টেকনিকটা তো জলের মতো সোজা। কিন্তু—’

‘কিন্তু আবার কী?’ এক দাবড়ানি দিলেন প্রফেসর।

ডক্টর যেন শুনতেই পেলেন না— অহো! দাবড়ানি-দাওয়াইয়ের মাহাত্ম্য দেখে বড়ই হৃষ্ট হলাম আমি। রেশ টেনে নিয়ে আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডক্টর বললেন, ‘পুরো ব্যাপারটা সার্কাসের খেলার মতন— চিকিৎসকের কাছে মূল্যহীন।’

‘সেটা আমি বুঝব। আমাকে ক্লোন করতে পারেন? এখুনি?’

‘এখুনি?’

‘হ্যাঁ, এখুনি। কারণ জলবৎ তরলম্। এখনি যদি না করেন, ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে পেয়ে বসবে। আমাকে যদি পুরোপুরি কবজায় আনে’ বলে, একটু থেমে নাটকীয় ঢঙে থেমে থেমে শিশির ভাদুড়ী কায়দায় বললেন প্রফেসর, ‘পুরো ঘাঁটিকে কব্জায় আনতে তার দেরি হবে না।’

ডক্টর যে বিলক্ষণ আঁতকে উঠলেন, তা তাঁর মুখচ্ছবিতেই সুস্পষ্ট হল। যদিও প্রাণপণ চেষ্টায় সে ভাবটা দমন করার চেষ্টা করে পেছন ফিরে দরজার দিকে একবার তাকালেন। অলপ্লেয়ে বিদ্যুৎবহ্নি-আশ্রিত তাঁর অনুচরটা তেড়ে আসছে কিনা, বোধহয় দেখে নিলেন। তারপর ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘাড় গুঁজে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে যখন মুখ তুললেন, তখন মুখচোখ দেখে মনে হল যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন।

হঠাৎ হেঁকে উঠলেন কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে, ‘ক-৫! কুলপাংশুল!’

‘তথাস্তু, প্রভু!’ জবাব দিল ক-৫।

ভুরু কুঁচকে প্রফেসর বললেন, ‘মানেটা কী?’

‘শব্দটা অপ্রচলিত, প্রচলিত মানে হল, অপোগণ্ড।’ বিজ্ঞের মতো হাসলেন ডক্টর। ‘এখানে যা মানে করা হল, ও তা জানে।’

‘কোড ল্যাংগুয়েজ?’

‘হ্যাঁ।’

সংকেত-শব্দটার গূঢ় তাৎপর্য যে কী, তা অকস্মাৎ লক্ষ করে রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। ক-৫-এর নাকের নিচে চোঙটা আবার বেরিয়ে এসেছে, তাগ করে রয়েছে সটান আমার দিকে।

মতলব কী কৌ-এর?

আমার পাংশু মুখবর্ণ দেখে সহসা অট্টহাস্য করে উঠলেন ডক্টর, ‘ভয় নেই! ভয় নেই! ক-৫ তৈরি হচ্ছে আসন্ন সংগ্রামের জন্যে। বলা যায় না কী বিপদ এগিয়ে আসছে এদিকে। তাই এই প্রস্তুতিপর্ব। ঠিক আছে ক-৫, এবার রওনা হও।’

চোঙ ঘুরে গেল আমার দিক থেকে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন আমার। কুকুর জাতটাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না, তার ওপরে যন্ত্রকুকুর।

সারমেয়-ট্যাংকের মতো ব্লাস্টার উঁচিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল ক-৫।

ঠিক সেই সময়ে একটা হট্টগোল শুনলাম বাইরের করিডরে।

ডক্টরের আশঙ্কা অমূলক নয়।

বিদ্যুৎ-এর আর এক নাম ক্ষণপ্রভা অর্থাৎ ক্ষণিকের প্রভা। কিন্তু অদৃশ্য আগন্তুক নিক্ষিপ্ত এই বিদ্যুৎবহ্নি উদ্ভাসিত হয়েই অদৃশ্য হয় না, লকলকিয়ে লেপটে থাকে মানুষের মাথা এবং দেহ ঘিরে। রূপান্তর ঘটে তার পরেই। ভেতর দখল করে নেয় অদৃশ্য ভাইরাস— দাসানুদাস যন্ত্রবৎ সে তখন হুকুম তামিল করে।

এ কাণ্ড এর আগেও ঘটেছে। বাহ্যিক রূপ পাল্টায়নি— মন আর মস্তিষ্ক দখল করে একটার পর একটা নারকীয় কাণ্ড-কারখানার সৃষ্টি করে গেছে বজ্জাত ভাইরাস। কিন্তু তার পরবর্তী পরিবর্তনটুকু দেখবার সুযোগ দেননি— ভাইরাস মাথা চাড়া দিচ্ছে টের পেয়েই সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছেন স্বইচ্ছায়। ভাইরাস মহাশয় তার পরবর্তী খেলটুকু তাঁর শরীরে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পায়নি।

ম্যা আর নার্স ভাইরাসের কবজায় গিয়েই নিহত হয়েছে ক-৫-এর ব্ল্যাস্টার নিক্ষেপে— দুজনেই কবন্ধে পরিণত হয়েছে শূন্যে। কাজেই এই দুজনের ক্ষেত্রেও তাদের মুখের বাহ্যিক কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি।

সাপ্লাই সাট্‌ল্‌-এর ক্রু আর ক্যাপ্টেন গোলাম বনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে প্রলয়ংকর সংঘর্ষে। তাদের ক্ষেত্রেও এই অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি।

লক্ষ করা গেল ঠিক তারপরেই। কন্ট্রোল কম্পিউটার থেকে বিদ্যুৎশিখা লম্ফ দিয়ে বেড় দিয়েছিল ডক্টরের অনুচরকে। সভয়ে সেই দৃশ্য দেখেই চম্পট দিয়েছিলেন তিনি— যদি না দিতেন, তা হলে যে অদ্ভুত দৃশ্যটি স্বচক্ষে দেখতে পেতেন, তা এই:

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল বিমূঢ় অনুচর। নাম তার মু। ক্ষণকাল পরেই স্তিমিত হল বিদ্যুতের তেজ। অমনি নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হল প্রভুবন্দনা, 'গোলাম হাজির, হুকুম করুন।'

সচমকে দাঁড়িয়ে গেল পেছনে আরও কয়েকজন অনুচর। এ আবার কী? মু তো এভাবে কখনও কথা বলে না!

কন্ট্রোল কম্পিউটার বললে হেঁড়ে গলায় সজীব প্রাণীর মতো, 'আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের ওপর অপারেশন বন্ধ করো। ডক্টরকে আমার সামনে এনে দাও। আর, গোলাম সংখ্যা আরও বাড়াও। এই ঘাঁটি দখল করো। এখান থেকেই শুরু করব আমি ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ের অভিযান।'

যন্ত্রচালিতের মতো ঘুরে দাঁড়াল মু। অর্ধচন্দ্রাকারে সামনে দাঁড়িয়ে সঙ্গীরা। হতচকিত প্রত্যেকেই। অদৃশ্য ভাইরাসের বৃত্তান্ত তারা জানত না। তাই সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মাথায় আসেনি। যারা উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে লম্বা দেওয়ার কথা ভাবছিল, তারা সে সুযোগও পেল না।

আচম্বিতে মু-এর মড়ার মতো প্রাণহীন চোখদুটো প্রদীপ্ত হল। নীলাভ-কালচে স্ফুলিঙ্গ

বিচ্ছুরিত হল চক্ষু-প্রত্যঙ্গ থেকে। একই সঙ্গে কপাল ফুঁড়ে ধেয়ে এল বিদ্যুৎ শিখা। চক্ষের পলক ফেলবার আগেই বহুমুখ ভুজঙ্গের মতোই তা দংশন করল উপস্থিত প্রত্যেককে। সাপের জিভ যেন জড়িয়ে ধরল সবাইকেই।

ব্যস, নড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেল প্রত্যেকের। একটু পরেই বললে সমস্বরে, 'গোলাম হাজির, হুকুম চাই।'

হুকুম দিল মু, 'ব্লাস্টার হাতে নাও। প্রভু বিপন্ন। দখল করো এই ঘাঁটি। ব্রহ্মাণ্ড বিজয় হবে এখান থেকেই। চলো যাই আইসোলেশন ওয়ার্ডে।'

নিঃশব্দে ব্লাস্টার হাতে নিল সবাই। কুচকাওয়াজ করে বেরিয়ে এল অলিন্দ পথে।

তাড়া লাগাল মু, 'দৌড়োও। সময় খুব কম। আগে চাই ডক্টরকে।'

দৌড়ল সবাই। পরিবর্তনটা এল দৌড়োনোর সময়ে। খুব দ্রুত। ভাইরাসের শক্তিবৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরোত্তর। এবার তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল উত্তপ্ত শরীরে।

প্রথম পরিবর্তনটা দেখা গেল মু-এর মুখে। ভুরু দুটো শতপদী তেঁতুলে বিছের মতো মোটা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। লালচে লোমে ছেয়ে গেল সারা মুখ।

অমানুষিক পরিবর্তনটা এরপরেই এল অন্যান্যের মুখে।

ভাইরাস ফুটে বেরোচ্ছে এখন প্রত্যেকের মুখে। লোমশমুখ জ্বলন্ত চক্ষু একদল দানব ধেয়ে এল আইসোলেশন ওয়ার্ডের দিকে। মস্তিষ্কে বাজছে ভাইরাসের রণডঙ্কা।

উঁকি মেরে এই দৃশ্যই দেখলাম আমি।

ঠিক সময়েই করিডরে বেরিয়ে গিয়েছিল ক-৫। হানাদাররা ব্লাস্টার উঁচিয়ে হইহই করে তেড়ে আসতেই চলমান সারমেয়-ট্যাঙ্কের নাসিকা নিম্নস্থ ব্লাস্টার থেকে নির্গত হল তেজঃপুঞ্জ। ধাবমান দানবরা নিশ্চিত ছিল এ যুদ্ধে তারা জিতবেই, ঘাঁটি দখল করবেই। তাই অতটা খেয়াল করেনি। ক-৫-এর ব্লাস্টার বর্ষণে তাই প্রথমেই কুপোকাৎ হল মু-এর আগে আগে যে দৌড়োচ্ছিল সে। পুরোদলটা তাই দেখে থমকে যেতেই ব্লাস্টার নিক্ষেপ করল মু। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই আর দাঁড়াল না। পিঠটান দিল কালান্তক যমের মতো ক-৫-এর সামনে থেকে। মোড় ঘুরে দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে মু, 'এদিক দিয়ে তো যাওয়া যাবে না। ভিসিফোন দরকার।'

চক্ষু-উপদেষ্টা চৌ বললে, 'আমার অফিসে চলো।'

সদলবলে মু ছুটল সেইদিকে।

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। লোমশমুখ জ্বলন্তচক্ষু মানুষ-দানবদের দেখে তখনও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। বিকটাকার প্রাণীগুলোর ভয়াল মুখচ্ছবি অবশ করে এনেছে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ভাগ্যিস ক-৫ রুখে দাঁড়িয়েছিল, আমার ক্ষমতা ছিল না ওই বিভীষণদের ঠেকানো।

টেলিফোন 'বুথ' বাক্সের মতো একটা যন্ত্র ঠিকঠাক করছিলেন ডক্টর এবং নার্স। চারপাশ অর্ধস্বচ্ছ প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ দিয়ে মোড়া। পাশে একটা ক্ষুদে কন্ট্রোল প্যানেল।

'তাড়াতাড়ি, কৌ তাড়াতাড়ি!' অস্থির পঞ্চানন প্রফেসর প্রায় নৃত্য করতে লাগলেন বিষম উৎকণ্ঠায়। সময় যে ফুরিয়ে এল! কাহিল হয়ে পড়ছেন অতি দ্রুত। শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে

ভাইরাসের। প্রভুত্ব কায়েমি করার জন্যে মাথা চাড়া দিচ্ছে ভেতর থেকে। প্রফেসর আর পারছেন না। তাই এই উত্তেজনা, এত অস্থিরতা।

সার্কিট কানেকশনগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিলেন ডক্টর। ইন্সট্রুমেন্ট ট্রে বাড়িয়ে ধরল নার্স। একটা স্ক্যালপেল তুলে নিলেন ডক্টর। প্রফেসরের চামড়া থেকে কেটে তুলে নিলেন সামান্য একটু স্যাম্পেল।

বললেন ধীর স্থির কণ্ঠে, 'প্রফেসর, একটা ব্যাপার কিন্তু খেয়াল রাখবেন। ক্লোন বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু হবে না। যা হবে তার মূল উপাদান কার্বন। ছাপা ছবি বলতে পারেন। ত্রিমাত্রিক ফটোগ্রাফ— ছবির মতো দ্বিমাত্রিক নয়। কিন্তু জীবন্ত— তবে ক্ষণস্থায়ী।'

প্রফেসরের অবস্থা ততক্ষণে রীতিমতো কাহিল। চিঁ চিঁ করে বললেন, 'দীননাথকে দরকার... দীননাথ... দীননাথ।' ব্যস, ওর বেশি আর কথা ফুটল না মুখে। জ্ঞান হারালেন!

একটু আগেই করিডরে দেখা দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বিংশ শতাব্দীর পুতুলনাচের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। পাপেট থিয়েটার একটা অতি প্রাচীন শিল্পকলা। হাজার হাজার বছর আগে তার শুরু। খুব সম্ভব ভারতবর্ষ বা চিনদেশে অথবা প্রাচ্যের কোথাও তার প্রথম জয়যাত্রা শুরু হয়, সঠিক কেউ জানে না। কেউ বলেন বুজরুক পুরুতঠাকুররা আড়াল থেকে বিগ্রহ-পুতুল নাচিয়ে ভক্তদের বিহ্বল করে তুলত। সেই থেকে পুতুলনাচের উৎপত্তি। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের বৃহত্তম পাপেট কোম্পানি ছিল মস্কোতে। দুশো অনুচর নিয়ে ও ব্রাসজোভ নামক পুতুল-নাচিয়ে ছোট-বড় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নাচাতেন রড-পাপেট। পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালের টাইটানে আমি যা দেখছি, তা যেন গ্লোভ-পাপেট! অথবা দস্তানা-পুতুল। অথবা হাত পুতুল। মানুষ তো নয়— যেন দস্তানা— নচ্ছার ভাইরাসটা ঠিক সেইভাবেই খেলাচ্ছে দস্তানার মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে পুতুল নাচানোর মতোই, বিটলে ভাইরাস নিজের সত্তা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নাচিয়ে চলেছে তাদের। নিজে ঢুকে বসে রয়েছে আর একটা মানুষের মধ্যে— ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

ভাবতে ভাবতেই রোমাঞ্চ দেখা দিল সর্বাঙ্গে। ভাঙা গলায় বললাম, 'একটা ব্ল্যাস্টার দিতে পারেন?'

গম্ভীর মুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ডক্টর। মুখ দেখে যেন মনের ভাব টের পেলেন। কোনও কথা জিজ্ঞেস করলেন না। জোব্বার ভেতর থেকে খুব ছোট্ট একটা অবিকল খেলনার মতোই ব্ল্যাস্টার বার করে আমার হাতে তুলে দিলেন।

জিনিসটা উলটে পালটে দেখে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে প্রফেসরের দরকার কেন বলতে পারেন?'

'খুব সম্ভব প্রতিষেধ ব্যবস্থাটা আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ বলে। আমার তো মনে হয় আপনাকেও ক্লোন করতে চান উনি।'

বলেই, স্ক্যালপেল নিয়ে আমার হাতের দিকে হাত বাড়ালেন কৌ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু আসল 'আমি'টার— কী হবে?'

'কিচ্ছু হবে না,' অভয় দিলেন ডক্টর।

'ক্লোন কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, একটু আগেই বললেন আপনি।'

চামড়ার নমুনা বিশেষ ধরনের ক্লোনিং ডিশে স্থাপন করলেন ডক্টর। প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর সলিউশন ঢাললেন তার ওপর। মুখের কিন্তু বিরাম রইল না— 'তত্ত্বগতভাবে স্থায়ী ক্লোন বা নকল অসম্ভব। বহু বছর লাগবে তা সম্ভব করতে— কারণ, এক্সপেরিমেন্ট নিয়মিত ভাবে হয়নি— মাঝে মাঝে শিকেয় তুলে রাখা হয়েছিল দানব সৃষ্টির ভয়ে।' বলতে বলতে পাত্রগুলো টেলিফোন বুথের মতো যন্ত্রটার দিকে নিয়ে গেলেন। 'আপাতত এইভাবেই আমরা কোনওমতে বংশগতি আর অভিজ্ঞতাকে চালান করি মূল দেহ থেকে ক্লোন দেহে— কিন্তু চালান হয় অস্থায়ী।'

'মানেটা বুঝলাম না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কৌ। আমার মস্তিষ্ক নিয়ে কিন্তু আর কটাক্ষ করলেন না।

বললেন, 'মানেটা এই— আপনার ফটোকপি যমজ খুব জোর দশ থেকে এগারো মিনিট বাঁচবে, তারপর ভেঙেচুরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

সম্ভাবনাটা খুব সুখের মনে হল না। নিজেকে ভেঙেচুরে বিলীন হয়ে যেতে দেখাটা খুব কি প্রীতিপ্রদ ব্যাপার? বিনীতভাবে বললাম, 'তা হলে অত ঝঞ্ঝাটে যেতে চাই না। আমি বরং ক-৫-এর সঙ্গেই থাকি— আপনার কাজে আসতেও তো পারি।'

অসহিষ্ণু হলেন ডক্টর। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' প্রথম ক্লোনিং ডিশটা বয়ে নিয়ে গেলেন টেলিফোন বক্সের মতো 'বুথ'-এর দিকে, রাখলেন ভেতরে। ইঙ্গিত করলেন নার্সকে। টিপে দেওয়া হল সুইচ। গুম গুম আওয়াজ শুনলাম 'বুথ'-এর ভেতরে। আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল বিপ বিপ শব্দ। চোখ ধাঁধানো আলোয় ভেসে গেল 'বুথ'টা। তীব্র দ্যুতির মধ্যে ভেতরে আকার গ্রহণ করতে লাগল একটা মনুষ্যমূর্তি...

ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে লাগল মূর্তিটা। নিরেট হয়ে উঠল বাষ্পাকার আকৃতি। সেকেন্ডকয়েক পরেই 'বুথ' থেকে দীর্ঘ পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। দ্বিতীয় মূর্তিটা হুবহু শয্যায় শায়িত প্রথম মূর্তির মতোই— মায় জামাকাপড় পর্যন্ত। বাহাদুরি আছে বটে কিলব্রাকেন কলা কৌশলের। নয়া প্রফেসর মাথা হেলিয়ে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানালেন ডক্টরকে এবং অগ্রসর হলেন দরজা অভিমুখে।

'চললেন কোথায়?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধোলেন ডক্টর।

ঘুরে দাঁড়ালেন নয়া প্রফেসর, 'ডক্টর, বিশ্বাস রাখুন আমার ওপর— ভরসা রাখুন— ঠকবেন না।' বলেই উধাও হলেন করিডরে।

প্রফেসরের প্রতি পদক্ষেপে আত্মপ্রত্যয়। চোখ-মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লোকটাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। একটা কঠিন সংকল্প যে ওঁর অণুপরমাণুতে জাঁকিয়ে বসেছে তা আঁচ করেই বাধা দিলাম না। এই মহা বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় এখন তিনিই কেবল উদ্ভাবন করতে পারেন, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু ডক্টর সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন, 'কী জানি কী ঝামেলা সৃষ্টি করতে চললেন প্রফেসর। যাক গে, নার্স, এবার দীননাথবাবুকে ক্লোন করা যাক।'

প্রফেসরের যমজকে দেখে আমারও তখন ইচ্ছে হয়েছিল ক্লোন হবার। তাই আর আপত্তি করলাম না। আর যাই হোক, দানব হয়ে তো যাব না।

ডক্টর দ্বিতীয় ক্লোনিং ডিশটা তুলে নিলেন। বুথের ভেতরে রাখলেন।

সুইচ টিপতে যাচ্ছেন ডক্টর, এমন সময়ে আবার ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর। হুবহু সেই প্রফেসর। কে বলবে কার্বন কপি। যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।

'ডক্টর।'

'আবার কী হল?'

'একটা প্রশ্ন।'

'করে ফেলুন।'

'আমার টাইম মেশিনটা কোথায়?'

অদ্ভুত চোখে তাকালেন ডক্টর, 'টাইম মেশিনে কী দরকার?'

'দরকার আছে। কোন জায়গায় আছে বলুন, নিজেই যাচ্ছি।'

ডক্টর আর কথা বাড়ালেন না। বলে দিলেন, কোন অঞ্চলে পড়ে রয়েছে টাইম মেশিন। বেশিদূরে নয়— দুটো ঘর পরেই। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে শুনলেন প্রফেসর। নিরুত্তরে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

এদিকে অন্য কাণ্ড চলছিল কনসালট্যান্টের ঘরে। চক্ষু-উপদেষ্টা চৌ সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঢুকতেই তার ছাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। লোমশ মুখ জ্বলন্ত চক্ষু নরাকার দানবদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বললে, 'একী! এ অবস্থা হল কী করে?'

আর কি করে! অত ব্যাখ্যা শোনাবার সময় কোথা! চৌ বললে সংক্ষেপে, 'তাকাও আমার দিকে।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ছাত্রটি। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। নরাকার প্রাণীগুলো ঘিরে ধরল তাকে। চৌ-এর কপাল থেকে হিসহিস করে বেরিয়ে এল বিদ্যুৎবহ্নি। স্পর্শ করল ছাত্রর ললাটদেশ...

ততক্ষণে আমার কার্বনকপি তৈরি হয়ে গেছে বুথের মধ্যে। অর্ধস্বচ্ছ আধারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমার ক্লোন-সত্তাকে। ডক্টর বুথ থেকে তাকে বার করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে বিষম আতঙ্কে চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল নার্স মেয়েটা, 'ডক্টর!'

'কী হল?' চমকে হাত নামালেন ডক্টর।

'প্রফেসরকে দেখুন।'

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন ডক্টর। আমিও। দেখলাম সেই অসম্ভব দৃশ্য। ক্লোন সৃষ্টি নিয়ে তন্ময় থাকার ফলে আসল প্রফেসরের দিকে তাকানোর সময় পাইনি এতক্ষণ। সেই ফাঁকে ভয়াবহ দ্রুত বেগে তাঁর শরীর দখল করেছে শয়তান ভাইরাস। করিডরে যে দানবদের দেখে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল, হুবহু সেই জাতীয় একটা বিকটাকার দানবে পরিণত হয়েছেন আমার প্রাণপ্রিয় প্রফেসর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো শরীরটা গামছা নিঙড়োনোর মতো মুচড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, বিকৃত বীভৎস হয়ে উঠছে। তারের মতো শক্ত ধাতব লোমে হাত আর মুখ ঢেকে যাচ্ছে। চোখের সামনেই একটা বিকট ভয়াবহ অজ্ঞাত পশুর রূপ নিচ্ছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। সমস্ত শরীরটা এমন প্রচণ্ড শক্তিতে থরথর করে কাঁপছে, মড়মড়

মটাস করে মোচড় দিচ্ছে, গামছা নিঙড়োনোর মতো মুচড়ে উঠে ধনুষ্টংকার রুগীর মতো তেড়ে বেঁকে আছড়ে পড়ছে যে ভয় হল, শিরদাঁড়া না ভেঙে যায়, হাত-পা জয়েন্ট থেকে খুলে না বেরিয়ে আসে।

ক্ষিপ্তের মতো তাই চিৎকার করে বললাম, 'ডক্টর! ডক্টর! বেঁধে ফেলুন। বেঁধে ফেলুন প্রফেসরকে।'

চৈনিক পুতুলের মতো বিস্ফারিত চোখে প্রফেসরের লোমহর্ষক রূপান্তর দৃশ্য দেখছিলেন কৌ। চোয়াল ঝুলে পড়েছিল, কথা বলার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছিল। ভাইরাস যে এত দ্রুত শরীরে তার লক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে পারে, এ অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। লাফিয়ে গিয়ে ডক্টরের কলার চেপে ধরে রামঝাঁকুনি দিয়ে বললাম কানের কাছে কানাডিয়ান স্টীম ইঞ্জিনের মতো তীব্র গলায়, 'হাঁ করে দেখছেন কী? দড়ি দিন— দড়ি! বেঁধে ফেলি প্রফেসরকে!'

সম্বিৎ ফিরে পেলেন ডক্টর। স্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'দড়ি! দড়ি তো নেই! সে বিংশ শতাব্দীর জিনিস!'

'তবে কি আছে? বাঁধবার জিনিস কী আছে?'

নার্সের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখলাম ডক্টরের চাইতেও বেশি। আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায়নি। উপস্থিত বুদ্ধি হারায়নি। দৌড়ে গেল দেওয়ালের কাছে। লকার খুলে একতাল ভারী প্লাস্টিক ফিতে নিয়ে ফিরে এল, 'এই নিন।'

ডক্টর ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। একযোগে আমি, তিনি আর নার্স দোমড়ানো মোচড়ানো পাকসাট খাওয়া মূর্তিটাকে বাঁধতে লাগলাম খাটের সঙ্গে।

লড়াই শুরু হয়ে গেল বলা যায়। কাল ঘাম ছুটে গেল হাড় জিরজিরে প্রফেসরকে সামলাতে গিয়ে। দানবের শক্তি যেন ভর করেছে তাঁর হাতে-পায়ে। কিন্তু তিনজনের সঙ্গে তিনি পারবেন কেন। বিশেষ করে আমি তখন নিষ্ঠুর হয়ে গেছি। যে প্রফেসরের চরণস্পর্শ করে ধন্য হয়ে যাই, তাঁরই দেহটাকে পিছমোড়া করে বাঁধতে লাগলাম নির্মম কসাইয়ের মতো— একটুকু মায়া দয়া দেখলাম না।

প্রফেসর এতক্ষণ ধস্তাধস্তিই করছিলেন, কথা বলেননি। বাঁধা যখন প্রায় সাঙ্গ, তখন ঘরঘরে আওয়াজে ভয়াল যে শব্দগুলো জাগ্রত হল তাঁর কণ্ঠস্বরে, হলফ করে বলতে পারি, তা তাঁর কথা নয়। তাঁর রক্তে এমন স্বর, এমন শব্দ কখনও সম্ভব নয়। যেন দম আটকে আসছে, খাবি খাচ্ছেন নিশ্বাসের অভাবে, যেন জলে ডুবে যাচ্ছেন অসহায় ভাবে— এমনি আর্ত ভাঙা স্বরে বলল সেই কণ্ঠস্বর, 'ছেড়ে দাও এই দেহটা... তোমরা কেউ টিকবে না... কেউ পারবে না আমাকে ধরে রাখতে। আমি এই অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র শক্তি যার বিনাশ নেই। যার লয় নেই, যার সমকক্ষ শক্তি আর নেই। লক্ষ্যে পৌঁছোতে দাও আমাকে! বহুযুগের ওপার হতে আমি এসেছি, আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে! অমৃত পান না করেও আমি অমর, সূর্যের মতোই আমি মহাবল, মহাঘোর, মহাপ্রলয়! আমায় বেঁধো না— ছেড়ে দাও। নিয়তি আমায় যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেতে দাও সেই লক্ষ্যে! মহামূর্খের দল, খুলে দাও বাঁধন! আমি সর্বভক্ষ, রবিকিরণ সংস্পর্শে যেমন সমস্ত বস্তু শুচি হয়, তেমনি

আমার শিখায় তোমরা শুচি হবে। আমিই হুতাশন, আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ তেজঃ পদার্থ! আমি নিজের প্রভাবেই বিনির্গত হয়েছি, আমিই ত্রিলোকেশ হুতাবহ! আমিই সর্বলোকের ঈশ্বর, সর্বজীবের গতিস্বরূপ। আমি সর্বদাই পবিত্র— আমার শিখা পবিত্র করবে তোমাদেরও! আমি অবধ্য, আমি বজ্রজ্যোতি, আমি পরমগতি, আমি অক্ষয় অমৃত, আমি পরমপূজিত! মায়াজালে কৃতান্তকে যেমন বেঁধে রাখা যায় না, আমাকেও তেমনি আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। আমি এসেছি যখন, বহু কলেবরে আমি প্রকাশিত হবই। নিরেট গাধার দল, ছেড়ে দাও আমাকে!'

মহাভারতে বেদব্যাস গ্রন্থগ্রন্থিস্বরূপ কূটশ্লোক রচনা করেছিলেন বিঘ্ননাশক গণেশকে জব্দ করার জন্যে। ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলের খটমট-ভয়াল বক্তৃতা শুনে আমার অবস্থা হয়েছিল গণেশ বেচারার মতো। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু শেষের কথাটা শুনেই হাড়পিত্তি জ্বলে গেল, কেননা সেটা বাচ্চাছেলেও বুঝতে পারে।

'কাকে গাধা বলছিসরে হারামজাদা!' রাগে উন্মাদ হয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি।

অবিচলিত কণ্ঠে নার্স এই সময়ে বলে উঠল, 'ডক্টর, ঘুমের ইঞ্জেকশন দেব?'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তখন প্লাস্টিক বেল্টের সর্বশেষ বাকল আঁটছেন ডক্টর। কথার জবাব দিলেন না। হ্যাঁচকা টানে বাঁধন শেষ করে বললেন, 'না, না, এখন নয়।'

'সংক্রমণের বিপদ রয়েছে কিন্তু।'

'মোটেই না। এই অবস্থায় এ রোগের সংক্রমণের সম্ভাবনা যদি থাকত, তা হলে আমরা কেউ টিকতাম না। ভাইরাসের শক্তির সঙ্গে এখনও সমানে লড়ে যাচ্ছে প্রফেসরের আত্মসম্মোহ— তা না হলে—'

প্রফেসর তখনও তেউড়ে যাচ্ছেন। সেদিকে তাকিয়ে থেকে নার্স বললে, 'ভাইরাসের যদি নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা থাকে, তা হলে প্রফেসরকে দখল করেছে নিশ্চয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।'

'তা ঠিক। প্রফেসরের বুদ্ধিমত্তারও তো নাগাল ধরা মুশকিল দেখছি। ঠিক আধারই খুঁজে বার করেছে ভাইরাস। এখন টক্কর লেগেছে সেয়ানে সেয়ানে,' শেষ কথাটা যেন একটু তৃপ্তির আমেজ নিয়েই বললেন ডক্টর। প্রফেসরের দুরবস্থা দেখে যেন মনে মনে খুশি হয়েছেন। বৈজ্ঞানিকরা বড্ড ঈর্ষাপরায়ণ হয়। একটা ধীশক্তি আর একটা ধীশক্তিকে দেখতে পারে না। জব্দ হলে মজা পায়। পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালের টাইটানেও নেই তার ব্যতিক্রম। তোবা! তোবা!

চমক ভাঙল রক্তজমানো অমানুষিক কণ্ঠস্বরে, 'আমার লক্ষ্য— আমার উদ্দেশ্য... বাধা দিয়ো না... দেরি করিয়ে দিয়ো না... ঘাঁটি প্রস্তুত... চাক বাঁধার সময় এবার হয়েছে... আমি সর্বভূত ভয়ংকর অতিভীষণ দুঃসহ মায়াবী... আমি কোপাবিষ্ট হলে তোমাদের রক্ষা নাই...।'

পাপিষ্ঠ ভাইরাস যখন লম্বা লম্বা বোলচালে গগন মাৎ করে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে টাইম মেশিন থেকে নেমে এলেন প্রফেসর। প্রফেসর মানে তাঁর কার্বন-কপি। হাতে একটা

ইলেকট্রনিক যন্ত্র। যন্ত্রটাকে বুকের কাছে আগলে ধরে হেঁট হয়ে ছুটলেন করিডর বেয়ে।

দপ করে আলো জ্বলে উঠল আইসোলেশন ওয়ার্ডের ভিসিফোনে। স্ক্রিনে দেখা গেল মু-এর মূর্তি। লালচে কর্কশ লোমে মুখ প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। অঙ্গারের মতো নীলচে চোখ দুটো জ্বলছে কোটরের মধ্যে। বাচ্চা কেউটের মতো কিলবিল করছে জোড়া ভুরু। বীভৎস! সত্যিই বীভৎস! মানুষ বলে আর চেনাই যায় না— প্রফেসরের অবস্থাও প্রায় তাই।

'ডক্টর,' কর্কশ কণ্ঠের নিনাদ শোনা গেল স্পিকারে। 'ডক্টর, শ্রবণ করুন।'

ওরে বাবা! ভাইরাস সংক্রমণের মহিমা তো কম নয়! ইনিও বেশ সাধু ভাষা ছাড়ছেন!

ভ্রূকুটি করে ভীষণ কণ্ঠে মু বললে, 'ডক্টর, কথা কানে যাচ্ছে?'

'যাচ্ছে,' প্রফেসরের আছাড়িপিছাড়ি শরীরটাকে প্রাণপণে চেপে ধরে রেখে রুদ্ধশ্বাসে বললেন ডক্টর।

'প্রফেসরকে এখুনি মুক্তি দিন— এ-খু-নি!'

'ক-ক-খো-নো না!' সমান তেজে জবাব দিলেন ডক্টর।

'হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি... এ ঘাঁটি এখন আমাদের দখলে। অ্যাটমিক জেনারেটর টেকনিশিয়ানরাও এতক্ষণে আমাদের দলে চলে এসেছে। যা বলছি, যদি তা না করেন— তা হলে এই হসপিটাল আমরা ধ্বংস করে দেব।'

'যা...যা...,' সেকি তেরিয়া মেজাজ ডক্টরের। গোয়াবাগানের গুণ্ডাদেরও এমনি তড়পানি দেখিনি!

ভারী যন্ত্রটা কোলে করে এইরকম একটা নাটকীয় মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন প্রফেসরের কার্বন কপি। দেখেই চিনলাম। টাইম মেশিনের কন্ট্রোল প্যানেলে লাগানো ছিল। সেখান থেকেই খুলে এনেছেন।

ভিসিফোনে তখনও লম্ফঝম্প করছে মু, 'পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। ঠিক করুন কী করবেন! হয় প্রফেসরকে দিন আমাদের হাতে— নইলে এই হসপিটাল শূন্যে উড়ে যাবে।' বলার সঙ্গে সঙ্গে ফুস করে নিভে গেল ভিসিফোনের আলো, অন্ধকার হল পর্দা।

কিন্তু সেদিকে দৃকপাত না করে কোলকুঁজো নাম্বার টু প্রফেসর দৌড়ে গেলেন ক্লোনিং বুথের দিকে— বুকের কাছে সেই যন্ত্র।

পেছন নিলে ডক্টর, 'কী ব্যাপার বলুন তো আপনার? শুনলেন তো? পাঁচ মিনিট মোটে সময়।'

'ঘাবড়াইয়ে মাৎ।'

'মানে?'

বুঝলাম, হিন্দির মৃত্যু ঘটেছে পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালে।

বুঝলেন প্রফেসরের কার্বন কপিও। তর্জমা করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে—

'ভয় পাবেন না। এতেও যদি কাজ না হয়, হসপিটাল ধূলিসাৎ হবে এমনিতেই!'

'কিন্তু মতলবটা কি আপনার?' বিদঘুটে মেশিনটার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে থেকে বললেন ডক্টর। এরকম যন্ত্র বোধহয় জীবনে এই প্রথম দেখলেন!

বুঝিয়ে দিলেন প্রফেসর, 'এক ডাইমেনশন থেকে আরেক ডাইমেনশনে যাওয়ার এই যে যন্ত্র দেখছেন, এটা আমার টাইম মেশিনের ইমপরট্যান্ট পার্টস।'

'কী কাজ এর?'

'এক ডাইমেনশন থেকে আরেক ডাইমেনশনে যাওয়ার বাধা ভেঙে দেয়।'

কৌ-এর শূন্য চাহনি দেখে বুঝলাম, মগজে কিছু ঢোকেনি।

প্রফেসর তখন আরও প্রাঞ্জল করলেন, 'ভারী সোজা থিয়োরি। পরে আলোচনা করব। এখন শুধু এইটুকুই শুনে রাখুন, ইচ্ছেমতো আমি আমার সাইজ বড় করতে পারি! ছোটও করতে পারি।' বলে, বুথের দরজা খুলতেই মুখোমুখি হলেন রাগত মুখ আমার কার্বন কপির সঙ্গে।

তেড়ে উঠল আমার কার্বন কপি, 'এত দেরি কেন? কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকব?' বাস রে! কার্বন কপি তো দেখছি আমার ওপরে যায়!

'বেশিক্ষণ নয়,' কথা বলতে বলতেই প্রফেসরের কার্বন কপি ইলেকট্রনিক যন্ত্রটা নামিয়ে রাখলেন বুথের ভেতর। এটা-ওটা টিপে যন্ত্র চালু করতে করতে বললেন, 'ডক্টর, কান খাড়া করে এবার শুনুন। এ মেশিন আমিই চালাব। সেট করলাম এমনভাবে যাতে আমি ছোট্ট হতে হতে অণুমাত্রা, মানে, মাইক্রো-ডাইমেনশনে পৌঁছে যাব। দীননাথও আমার সঙ্গে ছোট হয়ে যাবে। আপনার তখন কাজ হবে, আমাদের দুজনকেই চেঁচে তুলে নিয়ে ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া।'

'কার মধ্যে?' সত্যি সত্যিই ডক্টরের কান দুটো খাড়া হয়ে গেছে মনে হল প্রফেসরের কিম্ভূত পরিকল্পনা শুনতে শুনতে।

'আমার মাস্টার-প্রিন্টের মধ্যে। যার নকল আমি, তার মধ্যে। বুঝেছেন?'

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন ডক্টর। একবার অপাঙ্গে দেখে নিলেন শায়িত নিঝুম প্রফেসরকে। নিজের সঙ্গেই এতক্ষণ ধস্তাধস্তি করে নির্জীবের মতো পড়ে রয়েছেন। প্রফেসরের কার্বন কপি বললেন, 'ফিরে যখন আসব, এই মেশিনের এই লিভারটা এই দিকে ঠেলে দেবেন— তা হলেই মেশিন চলবে উলটো দিকে— আমরাও আগের সাইজ ফিরে পাব। কোনও প্রশ্ন থাকবে তাড়াতাড়ি বলুন।'

একটাই প্রশ্ন ছিল ডক্টরের, 'দীননাথবাবুকে ল্যাজে বাঁধছেন কেন?'

কথার কি ছিরি! হাড় জ্বলে গেল শুনে। প্রফেসর জবাব দিলেন ঝটিতি, 'কারণ ভাইরাস ওকে স্পর্শ করতে পারবে না— প্রতিষেধ ও নিজেই। তা ছাড়া পালোয়ানও বটে।'

মাথা দোলাতে দোলাতে সায় দিলেন ডক্টর, 'তা ঠিক... তা ঠিক। যাকগে, এবার শুরু করা যাক। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আর কিছু করণীয় আছে আমার?'

'আছে। এইখানে চুপটি করে বসে থাকুন রোগ-প্রতিষেধক নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত। যাচ্ছি তো বিষঘ্ন ওষুধেরই সন্ধানে। আর হ্যাঁ, ফিরব কিন্তু অশ্রুনালির মধ্যে দিয়ে। খেয়াল থাকে যেন।'

'থাকবে। জয় হোক আপনার!'

কার্বন কপি 'আমি'র পাশে দাঁড়ালেন প্রফেসরের কার্বন কপি।

বুথের মধ্যে অনেক মেশিন চলার গুঞ্জন শোনা গেল। দেখতে দেখতে অস্পষ্ট হয়ে এল দুটি মূর্তি— মিলিয়ে গেল শূন্যে।

১৪
মন শিকারে অভিযান

গা শিরশির করে উঠল আমার। হাত তুলে দেখি লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

এ দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ছোট্ট পাঠক-পাঠিকারা মুচকি হাসছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার সেই সময়ে হাসি পায়নি, গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেন দেখলাম আমার প্রতিবিম্ব শূন্যে বিলীন হল। অথচ সেই 'আমি' নিছক প্রতিবিম্ব নয়, ছায়া নয়— আর একটা জলজ্যান্ত 'আমি'। অজান্তে হাত তুলে তাই দেখেছিলাম, চক্ষুভ্রম কিনা, সত্যিই আমি মিলিয়ে গেলাম কিনা। দেখলাম, আমি আছি, শুধু যা লোম-টোম সব খাড়া হয়ে গেছে।

জয় হোক হলোগ্রাফ-ক্লোনিং টেকনিকের!

ডক্টর নিবিড় দৃষ্টি মেলে সেকেন্ডকয়েক চেয়ে রইলেন বুথের দিকে। রোমাঞ্চিত-কলেবর তিনিও। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের যে আবিষ্কারটি এইমাত্র তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালেও নিশ্চয় তা কল্পনারও অতীত। সেকালের মুনি-ঋষিরাও যোগবলে কি বিজ্ঞান বলে জানা নেই, অণিমা সিদ্ধাইয়ের কৃপায় অণুর মতো ছোট্ট হয়ে যেতে পারতেন। পুরাণ যদি ইতিহাস হয়, তা হলে ঘটনাটা সত্যি। বিংশ শতাব্দীর কাণ্ডকারখানাও তো পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালে পৌরাণিক কাণ্ডকারখানা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যক্ষ না করলে ডক্টর নিজেও কি বিশ্বাস করতেন? যন্ত্রবলে অণু হয়ে যাওয়া কি বিশ্বাসযোগ্য? অজ্ঞাত প্রাকৃতিক শক্তির নিয়মকানুনের রহস্য যাঁরা আয়ত্ত করেছেন, সেই যোগীরা অবশ্য বলেন, সম্ভব বৈকি! প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও নিশ্চয় যোগীদের এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আওতায় এনে ফেলেছেন। তাই আত্মসম্মোহ সমাধিপ্রাপ্তি আয়ত্ত করে নচ্ছার ভাইরাসকে পুরোপুরি শরীর আর মন দখল করতে দিচ্ছেন না। প্রাচীন ভারতের যোগ-ঐতিহ্যকে মনে মনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালাম।

বিস্ময়াচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠে বুথ অভিমুখে অগ্রসর হলেন ডক্টর। পাল্লা খুলে ফেললেন। বুথ শূন্য। মেঝের ঠিক মাঝখানে ছোট্ট ডিশে টলটল করছে কেবল একটু সিরাম। সতর্কভাবে তা তুলে নিলেন ডক্টর। বিশেষভাবে নির্মিত একটা নিউম্যাটিক, মানে, বায়ুচালিত সিরিঞ্জ হাতে ধরিয়ে দিল নার্স মেয়েটা। ডিশ থেকে বেরঙ তরল পদার্থটা সিরিঞ্জে টেনে নিলেন ডক্টর। নিয়ে গেলেন শায়িত প্রফেসরের সামনে। পর্যায়ক্রমে তাকালেন আমার আর নার্সের দিকে। উত্তেজনায় মুখ লাল হয়ে গেছে দেখলাম। বললেন মৃদু চাপা কণ্ঠে, 'যাত্রা হল শুরু! প্রফেসর, জয় হোক আপনার!' প্রফেসরের ঘাড়ের কাছে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন সিরিঞ্জের।

ভিসিফোন স্ক্রিনে এই সময়ে ফুটে উঠল মু-এর পাশব আনন। ধ্বনিত হল অপার্থিব

কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'সময় ফুরিয়েছে ডক্টর। প্রফেসরকে সমর্পণ করুন!'

প্রফেসর আর আমার কার্বন কপি অণু-আকৃতি তখন ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ধাবমান লোহিত ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে যাচ্ছে... ছুটে চলেছে প্রফেসরের রক্তপ্রবাহ... অণু-আকৃতি মূর্তি দুটো সেই প্রবাহের টানে ধেয়ে চলেছে শিরদাঁড়া দিয়ে মস্তিষ্ক অভিমুখে— যেখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অতিভীষণ মহাঘোর দুর্মদ মায়াবী...

খরস্রোত নদী সাঁতরে যেন পারে উঠে এলাম আমি আর প্রফেসর। লাল টকটকে জোয়ার যেন আমাদের ঠেলে এনে ফেলে দিয়ে গেল পিণ্ডময়, শক্ত, নীল আর ফ্যাকাশে লাল ডাঙায়— জায়গাটা একটা অন্ধকারময়, প্রতিধ্বনিমুখর সুড়ঙ্গ।

আমাকে টেনেটুনে খাড়া করলেন প্রফেসর। বললেন, 'মেরুদণ্ডের মাথার কাছে কোথায় এসে পড়েছি নিশ্চয়।' দুইচোখে অসীম কৌতূহল নিয়ে ইতি উতি দেখে নিলেন, 'কী রকম বুঝছো হে ছোকরা?'

কি আবার বুঝব? বোঝবার মতো অবস্থা কি তখন আছে? আলগাভাবে বললাম, 'খুব ভাল না।'

'কেন? কেন? কেন?'

'কারও মাথার মধ্যে এর আগে তো কখনও ঢুকিনি।'

'সেইটাই তো ইন্টারেস্টিং।'

'তা হবে।' প্রফেসরের কার্বন কপি প্রফেসরেরই মাথার মধ্যে ঢুকে জ্ঞান দিচ্ছেন এবং আমার কার্বন কপি তা শুনছে, ভাবতেই তো মাথা ঘুরে যায়। আমারও তখন সেই অবস্থা।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতরে চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে প্রফেসর হৃষ্ট কণ্ঠে ফের বললেন, 'ইন্টারেস্টিং।'

বিদেশে-বিভুঁয়ে মেজাজ খারাপ করা সমীচীন বোধ করলাম না। তাই বললাম বিনয় ক্ষরিত কণ্ঠে, 'একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্য লাগছে।'

'যথা?'

'ভিজে সপসপে হওয়া তো দূরের কথা, গায়ে এক ফোঁটা রক্তও লেগে নেই কেন? অথচ রক্তের জোয়ারেই তো ভেসে এলাম।'

'সারফেস টেনশন কাকে বলে জানা আছে?'

আরে গেল যা! এখানেও পরীক্ষা দিতে হবে?

যাও বা জানতাম, ওই অবস্থায় কিছুই মনে পড়ল না। ফ্যালফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইলাম।

প্রফেসর নিমীলিত চোখে বললেন, 'যে কোনও তরল পদার্থের অণুদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণীশক্তির ফল হল এই সারফেস টেনশন— যা সব তরল পদার্থের সীমানা-উপরিভাগে বিদ্যমান। ফলে মনে হয় যেন একটা স্থিতিস্থাপক মিহি চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে তরল পদার্থের সীমানা দেশ। এই কারণেই খুব সরু ছুঁচ জলের ওপর ভাসিয়ে দেওয়া যায়, সারফেস টেনশন ভেঙে জলের ভেতর ঢুকতে পারে না। দীননাথ, আমরাও

সারফেস টেনশন ভাঙতে পারিনি... কারণ আমরা অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছি।'

'অ।'

কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আমার ওপর। 'অ' অক্ষরটার অর্থ যে আমি কিসসু বুঝতে পারিনি, প্রফেসরের আবার তা মনে পড়েছে— এই কার্বন-কপি অবস্থাতেও। কিন্তু বাক্যশলাকায় আর বিদ্ধ করলেন না 'স্বদেশ'-দর্শনের বাসনাটা প্রবলতর হওয়ায়।

আচমকা একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিজলি ঝলসে উঠল মাথার ওপর— এঁকে বেঁকে মিলিয়ে গেল দূরে।

বলতে লজ্জা নেই, বিষম আঁতকে উঠেছিলাম আমি।

'ওকী! প্রফেসর ওটা কী? এখানেও ঝড়জল হয় নাকি?'

'আরে না, না।' উল্লাসে আটখানা হয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর, 'ঝড়জলের বিদ্যুৎ ওটা নয়।'

'তবে কীসের?'

'চিন্তার। চিন্তা ছুটে গেল ব্রেনে। সাইনাপস মানে, দুটো পাশাপাশি নিউরোনের যোগাযোগ পয়েন্টের ইলেকট্রোকেমিক্যাল প্রতিক্রিয়া।' নিউরোন কাকে বলে, জিজ্ঞেস করার সাহস হল না পাছে মুখনাড়া খেতে হয়। বাড়ি ফিরে মেডিক্যাল ডিকশনারি দেখে নেব ঠিক করলাম। যদ্দুর মনে পড়ল, কোনও স্নায়ুকোষে বার্তা নিয়ে যায়, সেখান থেকে বার্তা নিয়ে আসে।

প্রফেসর নিজের মনেই বললেন, 'খুব সম্ভব আমার মাস্টারপ্রিন্ট পা নাড়তে চাইছে...'

সত্যিই তাই। ঠিক সেই সময়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা প্রফেসর (নম্বর ওয়ান) রাম-লাথি ছুড়ে প্লাস্টিক ফিতে ছেঁড়বার চেষ্টা করেছিলেন। বিপুল বিক্রম দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন ডক্টর। বেশিক্ষণ আর বেঁধে রাখা যাবে কি? ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলে তো বেশ জাঁকিয়ে বসছে— আগের চেয়েও অবস্থা তার অনেক ভাল— অনেকখানি কবজায় এনে ফেলেছে প্রফেসরের শরীরটাকে।

ভিসিফোনের চিৎকারে সম্বিৎ ফিরল ডক্টরের। মু চেঁচাচ্ছে তারস্বরে।

'ডক্টর! চরম হুঁশিয়ারির জবাব এখনও দেননি। পুরো ঘাঁটি কিন্তু এক্ষুনি ধ্বংস করে দিতে পারি, সেটা কি খেয়াল আছে?'

বোকারাই গোঁয়ার হয়, চালাকরা হয় না। ডক্টর নির্বোধ নন। তাই গোয়াবাগানের তড়পানির পুনরাবৃত্তি করলেন না। পেছন ফিরে দু'হাত তুলে বললেন শশব্যস্ত হওয়ার নিখুঁত ঢঙে, 'আরে না, না! অত তাড়াতাড়ি কীসের? শর্ত মেনে নিচ্ছি তোমার। প্রফেসরকে আটকে রেখে আমার আর কোনও লাভ নেই। নিয়ে যাও যখন খুশি।'

ক্রুর হাসি ফুটে উঠল মু-এর মুখে। সে-হাসির সমতুল্য হাসি ইহজীবনে প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য হয়নি ডক্টরের, 'এতক্ষণে আক্কেল হল তা হলে! এবার বলুন, অপদার্থ দীননাথ ছোঁড়া আপনার সঙ্গেই আছে তো?' রাস্কেলটা আমায় দেখতে পায়নি— আমি তখন দরজার সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে।

অম্লানবদনে মিথ্যে বললেন ডক্টর, 'দেখতেই পাচ্ছো, এখানে নেই। নার্স ছাড়া আমার

সঙ্গে আর কেউ নেই। হাসপাতালের কোথাও ঘুরঘুর করছে নিশ্চয়। কোথায় আছে বলতে পারব না।’

‘আমরা ঠিক খুঁজে নেব, নিপাতও করব। একেবারেই অপদার্থ— কোনও কাজে আসবে না আমাদের। আপনি যেখানে আছেন, ওইখানেই থাকুন— আমরা আসছি।’

অন্ধকার হয়ে গেল ভিসিফোন।

আমি তখন রোমাঞ্চিত কলেবরে অন্ধকার সুড়ঙ্গে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি। রক্ত-জোয়ারে হু-উ-উ-শ করে ভেসে আসার সময়ে মনে হয়েছিল ঠিক যেন গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছি। যে গঙ্গায় ফি বছর ৩০০০ আধপোড়া মড়া ভেসে যায় পুণ্যতীর্থ কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাট আর মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে। সেই সঙ্গে ৩০০ টন ছাই আর আধপোড়া মড়াদের ২০০ টন মাংস। সব মিলিয়ে মোট ৬০০০ মড়া ভাসিয়ে দেওয়া হয় গঙ্গার জলে প্রতিবছর, সেই সঙ্গে দু’পাড়ের ১৫০০ কলকারখানার ময়লা পড়ে গঙ্গায়— এক রাজঘাট থেকেই ঢেলে দেওয়া হয় ৩৫০০ গ্যালন আবর্জনা! এত রোগের জীবাণু গঙ্গার জলে সেই কারণেই।

আমরাও দুটো জীবাণুর মতো ভেসে এসেছি রক্তপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে। না জানি এবার জীবাণুসংহারের কি আয়োজনের মধ্যে পড়তে হয়। ভাবতেই ফের কাঁটা দিল গায়ে।

ভিসিফোন নিভে যেতেই ডক্টর মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন আমাকে, ‘দীননাথবাবু!’

‘বলুন।’ দরজার বাইরে ঘাপটি মেরে ছিলাম এতক্ষণ। ডাক শুনে গুটিগুটি ঢুকলাম ভেতরে। পেছন পেছন এল ক-৫।

ক্ষিপ্রকণ্ঠে বললেন কৌ, ‘ওরা আসছে।’

আমি বললাম, ‘আমাকে সাবাড় করতে।’

‘হ্যাঁ। অন্ততপক্ষে মিনিট দশেক হারামজাদাদের আটকে রাখতে হবে। পারবেন?’

‘যদি ক-৫-এর সাহায্য পাই, তা হলে পারব।’

‘নিশ্চয় পাবেন। ক-৫, দীননাথবাবুকে সাহায্য করো।’

‘তথাস্তু, প্রভু।’ প্রভুকে কেউ বর দেয় না, এই আক্কেলটাও কুকুর যন্ত্রের নেই শুনে তখন কিন্তু হাসবার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। যাই হোক, নতুন স্যাঙাতের দিকে ফিরলাম।

বললাম, ‘ক-৫, ওরা আসবে করিডর দিয়ে, তাই তো?’

‘নির্ভুল।’

‘ওখানেই আমরা দাঁড়াব। একটা বাধা যদি খাড়া করতে পারতাম—’

রণকৌশল জিনিসটা ক-৫-এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল, ‘সার্ভিস সুড়ঙ্গটা আগে ধ্বংস করে দেওয়া যাক।’

খুশি হলাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে। বললাম, ‘ঠিক বলেছ। নইলে পেছন থেকে চড়াও হতে পারে। আমরা—’

অধীর কণ্ঠে বললেন ডক্টর, ‘যা করবার তাড়াতাড়ি করুন। আমার হাতে সময় বেশি নেই।’

ঝটিতি বললাম, 'ক-৫, সুড়ঙ্গটা ধ্বংস করে এসো তুমি। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে।'

বিদ্যুৎবেগে অন্তর্হিত হল ক-৫। ইলেকট্রনিক ব্রেন তো কথা বুঝে কাজ করে ঝড়ের মতো। মন্থরতা ধাতে নেই।

সে তুলনায় আমি কিঞ্চিৎ মন্থর। লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি। তাই ক-৫ নিমেষে উধাও হওয়ার পর দরজার দিকে মনুষ্যবেগে ধেয়ে যেতে যেতে থমকে গেলাম নার্স মেয়েটার সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরে, 'ডক্টর, বড় ভয় করছে।'

'কেন?' অনেকটা অহীন চৌধুরীর বিখ্যাত ঢঙে বলে উঠলেন ডক্টর।

'ওরা পারবে তো? একজন তো আদিম বর্বর, আরেকজন রোবট কুকুর। বাকি দুজন অদ্ভুত দুটো ক্লোন— অণুর মতো ছোট।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমাকে আদিম বর্বর বলায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়— পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালের আদমির কাছে এক হাজার নশো একাশি সালের মানুষ তো আদিম বর্বরই। কিন্তু স্বকর্ণে এহেন বিশেষণ শুনে কেউ স্থির থাকতে পারে না। আমিও পারলাম না। স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হলাম। রামায়ণে বর্ণিত আদিম বর্বর রাক্ষুসে-নিনাদ ছেড়ে বললাম, 'খবরদার! মুখ সামলে!'

সে কী নিনাদ! ভীষণ চমকে উঠল নার্স মেয়েটা! মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, চোখ ঠেলে এল। তারপর যখন দাঁত কিড়মিড় করে বাজখাঁই স্বরে গর্জে উঠলাম, 'কাকে আদিম বর্বর বলছেন?' তখন মেয়েটার নিশ্চয় মনে হয়েছিল রাক্ষসদের মতোই এবার বোধ হয় তাকে কাঁচা খেয়ে ফেলব— কেননা, কাঁপতে কাঁপতে সরে গেল ডক্টরের আড়ালে।

পরিস্থিতি সামলে নিলেন ডক্টর পলক ফেলবার আগেই। টান মেরে একটা সিকিউরিটি লকার খুললেন। ভেতর থেকে দুটো ছোট ছোট ব্ল্যাস্টার বার করলেন। নার্সের হাতে একটা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'কখনও চালিয়েছ? অভ্যেস আছে? বেশ বেশ! যদি দেখো, ভাইরাস আমাকে দখল করে ফেলেছে, বিনা দ্বিধায় ব্ল্যাস্টার চালাবে আমার ওপর। ভাইরাস যদি তোমাকে দখল করে আমিও চালাব তোমার ওপর। যাই ঘটুক না কেন, প্রফেসরকে দশ মিনিট সময় দিতেই হবে।'

ব্ল্যাস্টারটা আলগোছে আমার দিকে তাগ করে রেখে নার্স বললে, 'বুঝেছি।'

যেখানে মেয়েমানুষের হাতে অস্ত্র থাকে, সেখানে আমি দাঁড়াই না। সবেগে বেরিয়ে এলাম করিডরে।

আমার আর প্রফেসরের ক্লোন-আকৃতি তখন পা টেনে টেনে অতিকষ্টে চলেছে একটা পাতালগহ্বরের মধ্যে দিয়ে। নরম কাদা প্যাচপেচে জলাভূমির মতো অঞ্চল। চারপাশে নিশানের মতো ঝুলছে কলাতন্তু আর ছত্রাকরূপী জাল। নিকষ অন্ধকারে কোথায় পা ফেলছি, দেখবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে চিন্তাঝলক উজ্জ্বল বিদ্যুৎরেখার মতো ঝলসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। ওই আলোতেই যেটুকু দেখা যায়। তারপরেই অন্ধকারকে আরও গাঢ় মনে হচ্ছে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার ফলে। অবর্ণনীয় সেই অভিজ্ঞতা আমি আমার এই দুর্বল লেখনিতে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারছি না। সেই মুহূর্তের গা-

ছমছমে রোমাঞ্চক অনুভূতিও বিচিত্র এই আখ্যানের রুদ্ধশ্বাস পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারছি না— আমি নিরুপায়।

একবার তো হুমড়ি খেয়ে পড়েই গেলাম। ঝাল ঝাড়লাম প্রফেসরের ওপরেই, 'কোন চুলোয় চলেছি, বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু আমি পারছি,' পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'চলেছি আমারই নিউরনের স্নায়ুপথ বেয়ে। খুঁজছি একটা ব্রিজের মতো কিছু— যার ওপর দিয়ে মস্তিষ্কের বাঁদিকের আর ডানদিকের দুটো ভাগের মধ্যে যাতায়াত করা যায়।'

'আপনার কি মনে হয় ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলে সেখানেই আছে?'

'আন্দাজ তো তাই।'

'আন্দাজ? স্রেফ আন্দাজের ওপর এই বিপদ মাথায় নিলেন?'

'বৎস দীননাথ,' সুমিষ্ট কণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'ভাগ্য সহায় হয় তারই, যে সাহসী। এক্ষেত্রেও সাহস সম্বল করেই এই বিপদে পা বাড়িয়েছি। আর কী করার আছে বলো? আমার আন্দাজ, ভাইরাসটা নিশ্চয় আমার চেতন আর অচেতন দুটো কাজই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাকে সীমান্ত অঞ্চলেই খোঁজা উচিত নয় কি? লঘুমস্তিষ্কের কাজই তো সূক্ষ্ম ঐচ্ছিক নড়াচড়া আর অঙ্গস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা। এই লঘুমস্তিষ্ক রয়েছে গুরুমস্তিষ্কের নীচের দিকে। আর আমরা রয়েছি এখন লঘুমস্তিষ্ক আর সুষুম্নাকাণ্ডের মাঝামাঝি অঞ্চলে।'

'লেকচারটা বন্ধ করবেন?' অন্ধকার গহ্বরে কাঁহাতক শারীরবৃত্তের বক্তৃতা শোনা যায়? মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি সেই কারণেই। তার ওপর ক্ষণে ক্ষণে মাথার ওপর ঝলসে উঠছে চিন্তাবিদ্যুৎ।

সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলেন প্রফেসর। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চললেন সামনে। অন্ধের মতো এগিয়ে চলা যাকে বলে।

গজগজ করলাম কিছুক্ষণ আপন মনে। তারপর বললাম, 'ধরুন যদি ভাইরাস ব্যাটার সামনে গিয়ে পড়ি?'

'এখনও তো পড়িনি। এক্ষুনি তাকে দেখতে পাবো বলেও মনে হয় না। সে ঢুকেছে চোখের স্নায়ু দিয়ে— দু'চোখের মাঝে বিদ্যুতের মধ্যে দিয়ে। আর আমরা রয়েছি সুষুম্নাকাণ্ড আর লঘুমস্তিষ্কের মাঝামাঝি অঞ্চলে। কিন্তু চোখ খোলা রাখো— নষ্ট হয়ে যাওয়া কলাতন্তু দেখলেই বলবে।'

ঠিক এই সময়ে সড়াৎ করে একটা চিন্তাবিদ্যুৎ খেলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ক্ষণপ্রভার চকিত আলোকে দেখলাম পায়ের কাছে কালচে হয়ে যাওয়া একতাল কলাতন্তু। তার মধ্যে ঘ্যাঁচ করে গোড়ালির লাথি মেরে বললাম, 'এইরকম কি?'

অঁক করে উঠলেন প্রফেসর, 'সামলে! সামলে! লাথি মারছ আমাকেই— খেয়াল থাকে যেন।'

'সরি!'

ক্ষণিক বিজলি প্রভায় প্রফেসর তখন যা দেখেছিলেন, আমাকে বলেননি পাছে আঁতকে উঠি, তাই। পেছন ফিরলে আমিও দেখতে পেতাম সেই দৃশ্য।

আকারহীন কতকগুলো মূর্তি জড়ো হচ্ছে আমাদের পেছনে। দল বৃদ্ধি হচ্ছে দ্রুত, নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে পেছন পেছন— স্নায়ুপথ বেয়ে।

বহিরাগত আততায়ী আমরা। তাই আমাদের নিকেশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে প্রফেসরের দেহ...।

মনুষ্যবেগে যা অপিচ সম্ভব নয়, রোবটবেগে সেই দুরূহ কর্ম পলকের মধ্যে সমাধা করে ফিরে এল ক-৫। করিডরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সরসর করে এসে ব্রেক কষল আমার সামনে।

'প্রভু, সার্ভিস সুড়ঙ্গ ধ্বংস করে এলাম।'

'এক হাজার একখানা ধন্যবাদ রইল, ক-৫। এবার একটা বাধা তৈরি করতে হবে— একটা ব্যারিয়ার খাড়া করতে হবে। পারবে?'

নিরুত্তরে সক্রিয় হল ক-৫। ব্লাস্টার-চোঙ ঠেলে বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ফুল ফোর্সে শক্তি বিচ্ছুরিত হতেই উড়ে গেল বিপরীত দেওয়াল আর কড়িকাঠ। বাদবাকি হুড়মুড় করে ভেঙে নেমে এল করিডরে। আবার শক্তিবর্ষণ করল ক-৫। দেওয়ালের একটা বিরাট অংশ দমাস করে এসে পড়ল তার ওপর। রাবিশের স্তূপ রচনা হয়ে গেল করিডরে।

'চলবে?'

'চমৎকার! আবার সহস্র এক ধন্যবাদ, ক-৫।'

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন, আমি রোবট।'

করিডরের সামনে পেছনে দৃষ্টিচালনা করতে করতে বললাম, 'সত্যি?'

'ভাবাবেগের কোনও সার্কিট আমার ভেতরে নেই, আছে শুধু স্মৃতি আর সজাগ থাকার সার্কিট,' মৃদু মৃদু নড়তে লাগল ক-৫-এর লেজের অ্যান্টেনা। করিডরের সামনে পেছনে শত্রু আসছে কিনা লক্ষ করছে। মনুষ্য চোখে তাদের আবির্ভাব ধরা পড়ার আগেই, রোবট-সেন্সরে সে খবর এসে গেল। 'হুঁশিয়ার! শত্রু আসছে!'

পেছিয়ে গেল ক-৫। ঝটপট এক চাঙড়া রাবিশের আড়ালে গা-ঢাকা দিলাম আমি। মু আবির্ভূত হল সঙ্গে সঙ্গে। চৌ আর অন্যান্য স্যাঙাতরা রয়েছে পেছনে। প্রত্যেকের চোখ ঘিরে কর্কশ লালচে লোমের আচ্ছাদন। ভুরু কিলবিল করছে বাচ্চা কেউটের মতো। এবং প্রত্যেকের হাতেই উদ্যত রয়েছে ভয়াবহ মারণাস্ত্র— ব্লাস্টার। হাত তুলে ক্ষুদে ফৌজের পথরোধ করল মু। বললে অপার্থিব গলায়, 'অপদার্থ জঞ্জালটাকে সরানো দরকার সবার আগে।' বলেই সন্তর্পণে সামনে এগিয়ে উঁকি মারলে মারল রাবিশ প্রতিবন্ধকের ফাঁক দিয়ে, 'দীননাথ, হেই দীননাথ, ভাল ছেলের মতো প্রফেসরকে এনে দাও বলছি।'

হাড়পিত্তি জ্বলে গেল আমাকে 'দীননাথবাবু' না বলায়। বিটলে বাঁদরামি সহ্য করতে পারলাম না। আড়াল থেকেই পালটা চিৎকার করে উঠলাম গলার শির তুলে, 'সাহস থাকে তো এগিয়ে এসে নিয়ে যা!' বলেই মুখ বাড়িয়ে ব্লাস্টার-বর্ষণ করলাম অমানুষগুলোকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম। অনভ্যস্ত হাতে কলকাতার প্যারা-মিলিটারি, মানে, পুলিশরাই পা

টিপ করতে গিয়ে অন্য বাড়ির নিরীহ লোকের মাথা উড়িয়ে দেয়। আমার আর দোষ কী!

চকিতে পালটা ব্ল্যাস্টার বর্ষণ করল মু আর দলবল। ফুসফাস দুমদাম করে আশপাশ থেকে উড়ে গেল রাবিশ। আমিও ছাড়লাম না।

ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ!

এদিকে বাঁধা অবস্থাতেই গুঙিয়ে উঠে ছটফট করতে লাগলেন প্রফেসর।

কব্জিতে বাঁধা ক্রোনোমিটার দেখলেন ডক্টর।

বললেন নার্সকে, 'আট মিনিটেরও কম সময় এখনও হাতে আছে। কিছু পেলে?'

নার্স মেয়েটা তন্ময় হয়ে ঝুঁকেছিল ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে। সাধারণ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নয়— কম্পিউটারচালিত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ— যে বস্তু এ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের ধারণার অতীত। আমার কলাতন্তুর একটা নমুনা নিয়ে উন্মাদিনীর মতো আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে আমার রোগ-প্রতিষেধের মূলটা— কেন ভাইরাস ব্যাটা কবজায় আনতে পারছে না আমাকে কিছুতেই। কম্পিউটারের ফলাফল ফুটে উঠছিল একটা আলোকিত পর্দায়। সেই দিকে চোখ রেখে বললে মাথা চুলকোতে চুলকোতে— 'টিস্যুর সব খবরই কম্পিউটার দিচ্ছে। রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা রয়েছে প্রতিটি কোষের মধ্যে কিন্তু—'

শুষ্ক হেসে ডক্টর বললেন, 'দো-আঁশলা প্রাণী নিশ্চয়। এই কারণেই টিকে গেছে। কিন্তু দৈহিক প্রতিষেধের তো কোনও চিহ্নই দেখছি না।'

'রক্তের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা যাচাই করলে—'

'উঁহু। আমার তো মনে হয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা রয়েছে ওর মনের মধ্যে— পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থা। মাইক্রোস্কোপে ধরা পড়বে না।'

ঠিক সেই সময়ে ব্ল্যাস্টার যুদ্ধের আওয়াজ ভেসে এল ঘরের মধ্যে। রাবিশ ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে— দুমদাম শব্দে করিডর মুখর হয়ে উঠেছে। আমার মুচিপাড়া মস্তানি হুংকারও শোনা গেল সব কিছু ছাপিয়ে। জয়োল্লাসের হুংকার!

চমকে উঠে নার্স বললে, 'আক্রমণ শুরু হয়ে গেল!'

আত্মস্থ কণ্ঠে ডক্টর বললেন, 'হ্যাঁ। দীননাথের হিম্মৎটা দেখেছ? আদিম শিকারীদের রক্ত বইছে ধমনিতে— হুংকার শুনলেই রক্তহিম হয়ে যায়!'

চিন্তাবিদ্যুৎ আবার মাথার ওপর ঝলসে উঠতেই আপনা থেকেই আমার পুরো শরীরটা ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়েছিল।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কিন্তু একখানা চীজ বটে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বিজয়গর্বে এমনভাবে চারপাশ নিরীক্ষণ করে নিলেন যেন রণক্ষেত্রে গোলাগুলির মাঝে উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

বললেন অতীব হৃষ্ট কণ্ঠে, 'সর্বাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেমেও এমনটা দেখতে পাবে না, নাকি বলো দীননাথ?'

কর্ণপাত না করে সামনের দিকে ঝুলন্ত পিণ্ডিপাকানো একদলা কলাতন্তু দেখিয়ে বললাম, 'ওটা আবার কী?'

'আমার ব্রেন তোমার ব্রেনের চাইতে এত উন্নত ওর জন্যেই। ওর নাম সুপার গ্যাংলিয়ন— অতি-সহযোগী নার্ভ সেন্টার— যার মধ্যে নার্ভ ফাইবার আসছে আবার বেরিয়েও যাচ্ছে। এর জন্যেই—'

আমার সর্বাঙ্গ তখন টানটান হয়ে গেছে আসন্ন বিপদ সম্ভাবনায়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চিরকালই আমার মধ্যে একটু বেশি সজাগ— মেয়েদের মতোই। চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা- নাসিকা-ত্বক নামক পঞ্চেন্দ্রিয় তা টের পায় না— আমি তা টের পাই আগে ভাগেই— প্রফেসর এই জন্যেই আমাকে বলেন ভয়কাতুরে— ছায়া দেখে চমকে উঠি। অথচ আমার এই ভয়কাতুরে সত্তাটির জন্যে কতবার কত বিপদ যে এড়িয়ে গেছেন, অকৃতজ্ঞ প্রফেসর তা স্মরণে রাখেন না। এই ক্ষেত্রেও সহসা আমার শরীরের অণু-পরমাণু পর্যন্ত শিহরিত হল নামহীন আগুয়ান আতঙ্কের বিভীষিকায়। ফিসফিস করে বলে উঠলাম, 'বিপদ আসছে। প্রফেসর, ভীষণ বিপদ আসছে!'

'বড় বাজে বকো ছোকরা। আমার ব্রেনের খবর আমি জানি না, আর তুমি সব জেনে বসে আছ? কোনও বিপদ নেই এ অঞ্চলে। ব্রেনের কোন অঞ্চলে কী থাকে, জানা আছে?'

এ তো মহাজ্বালা! প্রফেসরের বদমেজাজটাও ক্লোন সংস্করণে চলে এসেছে!

উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও তাই বলতে হল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

'উত্তেজিত হব না? যতবার খুশি, ততবার হব। ব্রেনটা আমার, খেয়াল থাকে যেন! ব্রেন সম্বন্ধে কী জানতে চাও বলো, সব আমার নখদর্পণে!'

প্রমাদ গনলাম, 'থাক, থাক, এখন আর লেখাপড়ায় দরকার নেই!'

'হাজারবার আছে। লেখাপড়ার আবার সময় আছে নাকি? চা খাওয়ার যেমন নির্দিষ্ট সময় নেই, লেখাপড়ারও তেমনি কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। যখনি সুযোগ পাবে, তখনি গ্রহণ করবে—'

'আমি বলছিলাম—'

'কথার মাঝে একদম কথা বলবে না। ভেরি ব্যাড হ্যাবিট! কোনও এক বেল্লিক কোনও এক সময়ে অবিকল ব্রেনের মতোই নিপুণ একখানা মেশিন তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। ঝামেলা হল সাইজ নিয়ে। মেশিনখানা নাকি করতে হবে কলকাতা শহরের চাইতেও বড় সাইজের— আর তাকে ইলেকট্রিসিটি জোগাতে হবে গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত হাই-টেনশন কেবল থেকে! অত করেও তৈরি হবে মামুলি একখানা মানুষের ব্রেন— আর আমার হল গিয়ে অতিমানুষের ব্রেন— আরও জটিল। ডানদিকের আর বাঁদিকের অংশ মিলেমিশে কাজ করে চলেছে বিশেষ ধরনের এই স্নায়ু গ্যাংলিয়া মারফৎ— যুক্তি বুদ্ধি আইকিউ তাই সুষ্ঠ, নিখুঁত—' বলতে বলতে স্তব্ধ হলেন প্রফেসর, 'কথাগুলো শুনছো তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছি,' আসলে একটা বর্ণও কানে তুলিনি আমি।

ভয়ে ভয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছেছি আর একটা জটিল গঠনের বিরাটকায় সপ্রভ দলা

পাকানো গ্যাংলিয়ার সামনে। মিউজিয়ামের গাইড যে ভাবে মুকুটমণি দেখায়, সেইভাবেই হস্ত সঞ্চালন করে প্রফেসর বলে উঠলেন, 'ওই হল রিফ্লেক্স লিঙ্ক, কী হল? হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন? রিফ্লেক্স লিঙ্ক মানেও বোঝো না? পরিভাষা পণ্ডিতরা তোমার মাথাটি খেয়ে বসে আছে দেখছি। প্রতিবর্ত ক্রিয়া... প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংযোজক— ওর দৌলতেই তো আমি আমার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে রয়েছি— হাজারটা সুপার-ব্রেন এক হয়ে রয়েছে একখানা জায়গায়।'

অতিকষ্টে ধৈর্যরক্ষা করে বললাম বিনীত কণ্ঠে, 'সেই বুদ্ধিমত্তার একটুখানি এক্ষুনি যদি কাজে লাগাতেন—'

বলছি কাকে? প্রফেসর তখন চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছেন সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে ঝুলন্ত আর একটা বিশাল গ্যাংলিয়ার দিকে। কথার জবাব না দিয়ে বললেন, 'দীননাথ, দেখে যাও— কাণ্ড দেখো। এই সংযোজকগুলো দেখছি কেটে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে।' ছেঁড়া জায়গাটা ভাল করে দেখতে দেখতে বললেন সবিস্ময়ে, 'কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!'

ছিন্ন ফাঁকটার অপর দিক দিয়ে মুণ্ড গলিয়ে দিয়ে আমি বললাম, 'কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!'

রেগে গেলেন প্রফেসর, 'ইয়ারকি মারার সময় এটা নয়।'

'জানি। কিন্তু সময় নষ্ট করছেন আপনিই। এখন দাঁড়াবার সময়ও নেই— চরৈবেতি— চরৈবেতি! শুধু এগিয়ে চলুন।'

'মোটেই না। এখনই তো দাঁড়ানোর সময়। মূর্খ, দেখতে পাচ্ছ না জখমটা টাটকা?'

'ভাইরাসের কাণ্ড বলতে চান?'

'তা ছাড়া আর কার কাণ্ড? আমরা খুব কাছেই চলে এসেছি!'

ঠিক এই সময়ে একটা সাদা ফোঁটা ধপ করে কোত্থেকে যেন খসে পড়ল আমার কাঁধে। ককিয়ে উঠে ঝেড়ে ফেলতে গেলাম, তার আগেই আর একটা ফোঁটা-বস্তু পড়ল আর এক কাঁধে... তারপরেই আর একটা... আবার... আবার... আবার... দেখতে দেখতে দেখতে ফুলো ফুলো তরল পদার্থের ফোঁটার মতো সাদা আকৃতিতে ছেয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ। আকাশফাটা চিৎকার করে চললাম সমানে, 'বাঁচান! বাঁচান! প্রফেসর, আমাকে বাঁচান!'

নির্বিকার গলায় প্রফেসর বলেন, 'কী করে বাঁচাই বলো? আমার দেহের প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে আমার অস্ত্রধারণ কি সমীচীন? মরে গেলেও পারব না। আমার নিজের ফ্যাগোসাইট যে ওরা— ওদের কাজ অন্য কোষ আর কলাতন্তুর জঞ্জাল গিলে খাওয়া—'

'আমাকেও গিলছে যে— ' বিষম আর্তনাদ করে উঠলাম।

সান্ত্বনার সুরে প্রফেসর বললেন, 'তা তো। গিলবেই। হাজার হোক আমার ফ্যাগোসাইট—'

'প্রফেসর!'

'চেঁচিয়ো না! ছুরি থাকে তো চালাও— আমি দেখছি।'

ছুরি একটা ছিল পকেটে। সবসময়ে রাখি। অতিকষ্টে পকেট থেকে বার করলাম এবং মরিয়া হয়ে এলোপাতাড়ি চালিয়ে চালিয়ে গেলাম। কিন্তু সংখ্যায় বেড়ে চলল হারামজাদা

ফ্যাগোসাইটরা— অগণন, অসংখ্য, অন্তহীন তাদের আবির্ভাব... দেখতে দেখতে শ্বেত আকৃতিদের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলাম আমি।

নিজের দুর্ধর্ষ প্রতিরক্ষাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ দেখে এতক্ষণ যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছিলেন প্রফেসর। কিন্তু আর যখন দেখতে পেলেন না আমাকে, তখন টনক নড়ল। প্রাণাধিক প্রিয় তো আমি। তাই ধাঁ করে ধেয়ে গেলেন সুড়ঙ্গের উলটোদিকে, দুটো দোদুল্যমান স্নায়ুপ্রান্ত দু'হাতে খামচে ধরে পরস্পর ঠেসে ধরলেন। কড়কড় শব্দে একটা ফ্ল্যাশ দেখা গেল। ফ্যাগোসাইট ফৌজ তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করে দলে দলে ছুটল সুড়ঙ্গ বরাবর— দেখতে দেখতে উধাও হল দূর থেকে দূরে— যেন দূরে কোথাও বিপদ সংকেত বেজেছে— জরুরি ডাক পড়েছে।

সস্নেহে আমার ধরাশায়ী মূর্তিটাকে টেনেটুনে খাড়া করলেন প্রফেসর।

আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললাম, 'কী ম্যাজিক দেখালেন বলুন তো?'

'ভাঁওতা দিলাম ফ্যাগোসাইটদের। মিথ্যে ডাক দিলাম। আমার লিভার নষ্ট হতে বসেছে, এই খবরটা পাগলাঘণ্টি বাজিয়ে জানিয়ে দিতেই বাছারা ছুটল সেইদিকে— গিয়ে দেখবে অবিশ্যি লিভার আমার ভালই আছে।'

'বুদ্ধিটা একটু আগে খরচ করলে ভাল হত না?' ছুরিটা হাতে রেখেই বললাম তিক্তস্বরে।

'তা হলে ফ্যাগোসাইটদের শক্তিটা তো আর দেখা হত না। দেখলাম, পালোয়ান দীননাথও নাজেহাল আমার দেহরক্ষীদের হাতে!' খুবই খুশি খুশি গলায় বললেন প্রফেসর। তারপরেই আমার তেড়ে ওঠা বন্ধ করার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন, 'চলো, চলো এগিয়ে চলো।'

'আইসোলেশন ওয়ার্ডে ছটফটিয়ে উঠলেন প্রফেসর। পিঠের দুর্বলতম অঞ্চল ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন। তেউড়ে উঠল সারা দেহ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল গোঙানি।

'হল কী?' নার্সের প্রশ্ন।

মুখভঙ্গি করে ডক্টর বললেন, 'কে জানে। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে— ওঁরা এখন ওই জায়গায় পৌঁছেছেন। অনুভূতি-সচেতন এমন জায়গায় পৌঁছে কলকাঠি নাড়াচ্ছেন—'

কড়-কড়-কড়াৎ শব্দ শোনা গেল বাইরে। নতুন ধরনের ব্লাস্টার ছুড়ছে অমানুষিক বিভীষিকারা— নিঃশব্দে নয়— সশব্দে। শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ক-৫ আর আমি পিছু হটছি সম্মিলিত আক্রমণে।

ক্রোমোমিটার অবলোকন করলেন ডক্টর 'আর মোটে সাড়ে সাত মিনিট বাকি। আশার আলো তো দেখছি না—'

মুখ শুকিয়ে গেল নার্সের।

মু-য়ের দল বেড়েই চলেছিল। কাতারে কাতারে অমানুষরা ভিড় করেছে পেছনে। বিশাল ফৌজ। অগুনতি। ঘাঁটির সব্বাই বোধহয় রূপান্তরিত হয়েছে ভাইরাস আক্রমণে। তারা

আসছে তো আসছেই— বয়ে আনছে নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র— যেসব আমি কস্মিনকালেও দেখিনি। বেশ কয়েকজনকে খতম করেছি আমি আর ক-৫। তবু তাদের শেষ নেই। একজন ধরাশায়ী হচ্ছে তো তার জায়গা নিচ্ছে আর একজন। ঠিক যেন পঙ্গপাল। মরতে ভয় পায় না— মারণযজ্ঞে মত্ত হয়ে নিজেদের আহুতি দিয়েও যজ্ঞ শেষ করতে চায়।

চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডক্টর একটু বেশিরকম সংক্রামিত হয়েছে দেখা গেল। অতি-উৎসাহী। অন্যদের চাইতে বেশি উন্মত্ত। ক্ষিপ্তের মতো মরিয়া হয়ে বিরাট লাফ মেরে ব্যারিয়ার টপকে এসে পড়ল এপাশে। ক-৫ নির্ভুল লক্ষ্যে তাকে তৎক্ষণাৎ পেড়ে ফেলল মাটিতে। ডক্টর আছড়ে পড়ল ক-৫-এর সামনেই। আচম্বিতে বিদ্যুৎঝলক পট-পটাং শব্দে ঠিকরে এল দু'চোখের মাঝ দিয়ে— স্পর্শ করল ক-৫-এর চক্ষুপরদা।

স্খলিত, জড়িত গলায় ক-৫ বলে উঠল, 'গোলাম হাজির, হুজুর। হুকুম করুন!'

ব্যারিয়ারের ওদিক থেকে গলা ফাটিয়ে মু হুকুম দিল তৎক্ষণাৎ, 'দীননাথকে মারো, ক-৫! অপদার্থকে সাফ করো আগে— পথের কাঁটা।'

'তথাস্তু। অপদার্থ আগে মরুক!' বশংবদ কণ্ঠে ধুয়ো ধরল ক-৫। পুরো যান্ত্রিক দেহটা লাট্টুর মতো বাঁই-বাঁই করে ঘুরে গিয়ে স্থির হল আমার দিকে।

আমি তখন ব্লাস্টার বর্ষণ করতে করতে পালাচ্ছি। রাবিশের আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে ব্লাস্টার বর্ষণ করেই দৌড়োচ্ছি। লড়তে আমার চিরকালই ভাল লাগে। এই লড়াইতেও বেশ মজা পাচ্ছি। মজায় বুঁদ হয়ে থাকার ফলে লক্ষই করিনি ক-৫ হতভাগা আমার পিঠের দিকে ব্লাস্টার চোঙ তাগ করে সর সর করে ধেয়ে আসছে পেছন থেকে...

১৫
মন মস্তিষ্কের সীমান্তে

সুড়ঙ্গ দেওয়ালের একটা হাঁ-করা কালচে ফাঁকের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন প্রফেসর, 'দীননাথ, এগিয়ে চলো, পেছনে থাকব আমি।'

'ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'ভয় আবার কীসের?' জোর করে হাসি টেনে বললেন প্রফেসর, 'তবে কি জানো, এখন থেকেই তো ভাইরাসের চিহ্ন ফলো করতে হবে। এই সেই পথচিহ্ন।'

'পথের শেষ কোথায়?'

'যদি জানতাম, তা হলে তোমাকে সঙ্গে নিতাম না। ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় তোমার মধ্যে একটু প্রবল কিনা,' খোশামোদের সুরে বললেন প্রফেসর।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। এইরকমভাবেই বহু বিপদের সম্ভাবনায় আমার এই স্ত্রী-সুলভ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়েছেন উনি। পরে আবার টিটকিরিও দিয়েছেন।

নচ্ছার ফ্যাগোসাইটদের হামলার মধ্যেও ব্লাস্টার হাতছাড়া করিনি— সে বান্দাই নই আমি। ছুরিটাও ছিল একহাতে। দুই হাতে দুটি আদিম আর আধুনিক অস্ত্র নিয়ে পা বাড়ালাম রন্ধ্রপথে।

এদিকে করিডরে আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়ে একটু আগেই এত কথা বললাম, সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই বাঁচিয়ে দিল এ-যাত্রা। নইলে এ কাহিনি লেখবার জন্যে হাজির থাকতাম না।

পেছন পেছন অনুগত অনুচর ক-৫ ব্লাস্টার চোঙ উঁচিয়ে আমাকেই নিকেশ করতে এগিয়ে আসছে, পেছনে চোখ না থাকলেও ওইরকম একটা কিছু আঁচ করলাম আমার মজ্জাগত 'প্রিমনিশনে'র দৌলতে। আমার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, এইরকম একটা লোম-খাড়া-করা অনুভূতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগ্রত হতেই বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখেছিলাম, যমের দক্ষিণ দুয়ার— ব্লাস্টারের চোঙ।

ইলেকট্রনিক ব্রেন আর সময় দেয়নি। ট্রিগার টিপেছিল ক-৫। আমার আদিম অনুভূতি যে আধুনিক যন্ত্রকেও হার মানায়, সেদিন কিন্তু চরম পরীক্ষা হয়ে গেল। চোঙ দেখেই শূন্যে লাফ দিয়েছিলাম। সুপারম্যান যেভাবে শূন্যপথে উড়ে— এ হল সেই ভুবন ভোলানো লাফ।

ফল হল কী? না, ইলেকট্রনিক-ব্রেন চালিত ব্লাস্টার-বর্ষণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আমি বেমক্কা আছড়ে পড়লাম রাবিশের ওপর। আলগা রাবিশে পা মচকে গিয়ে সবেগে ঠিকরে গেলাম দেওয়ালের ওপর। মাথাটা মনে হল চৌচির হয়ে গেল। চাকার ওপর একপাক ঘুরে গেল ক-৫। মু-এর দিকে ফিরে বললে জড়িত গলায়, 'অপদার্থ খতম— ক-৫। বিকল— নিজেকে মেরামত করার সময় এখন।'

বলতে বলতেই নিভু নিভু হয়ে এল ক-৫-এর চক্ষু-পরদা। ঝুপ করে ঝুলে পড়ল সব ক'টা অ্যান্টেনা। চাকার ওপর পিছলে গিয়ে দমাস করে ধাক্কা খেল দেওয়ালে— আমার ঠিক পাশটিতেই— আর নড়ল না।

ব্যারিয়ার টপকে এসে মু দেখল আমি আর ক-৫ দু'জনেই নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু অবস্থায় পড়ে আছি। আসলে আমি মটকা মেরেছিলাম। বহু পুরনো রণকৌশল! অনেক ইতরপ্রাণীও এইটুকু বুদ্ধি খরচ করে নিশ্চিত মৃত্যু এড়িয়ে যায়। তা পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালের এই প্রাণীগুলোর কাছে বছরের হিসেবেও তো আমি ইতরপ্রাণীর সমতুল্য— তাই স্রেফ মৃতের অভিনয় করে বেঁচে গেলাম সে যাত্রা।

মু কাছে এল। নির্জীব, নিস্পন্দ, নিঃসাড় প্রাণী এবং যন্ত্র দেহদুটো দেখে পৌঁছে গেল অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে। অপদার্থ অক্কা পেয়েছে। রোবট নিজেকে মেরামত করছে। মরুক গে। তা নিয়ে মু-এর আর মাথাব্যথার দরকার নেই। কাজ তো হাসিল হয়েছে— গোল্লায় যাক যন্ত্র।

উল্লাস-নিবিড় কণ্ঠে তাই হিসহিসিয়ে উঠল পরক্ষণেই, 'সাবাস! এবার পালা প্রফেসরের।'

হাত নেড়ে ফৌজদের আইসোলেশন ওয়ার্ড দেখিয়ে দিয়ে নিজে অগ্রসর হল সেইদিকে।

প্রফেসরের দেহের মধ্যে 'ওরেব্বাব্' বলে হঠাৎ ককিয়ে উঠে মাথার পেছন দিক খামচে ধরলাম আমি— ছুরি আর ব্লাস্টার ঠিকরে গেল হাত থেকে।

হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন প্রফেসর, 'কী হল? কী হল? অমন করছ কেন?'

'ধাঁই করে মাথায় কে যেন মারল!... খুলিটা মনে হল চৌচির হয়ে গেল।'

আশ্বস্ত হলেন প্রফেসর, 'তাই বল। এখানে কেউ তোমার মাথায় মারেনি— বাইরের মাথায় চোট লেগেছে।'

বাইরের মাথা। সেইটাই তো আমার আসল মাথা! গেল নাকি খুলিটা দু'ফাঁক হয়ে! মহাভাবনায় পড়লাম। তা সত্ত্বেও সাহস দেখিয়ে তাচ্ছিল্য করলাম আঘাতটাকে, 'তাই বলুন। আমি ভাবলাম—'

প্রফেসর কিন্তু পরক্ষণেই বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন, 'না, না, অত তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরো না। ব্যাপারটা সিরিয়াস। ভুলে যেয়ো না, তোমার আমার দু'জনেরই এখানকার পরমায়ু খুব সীমিত। তোমার বাইরের দেহ আর এখানকার দেহ কিন্তু একই কলাতন্তু দিয়ে তৈরি। বাইরের দেহ যদি জখম হয়, ধাক্কা তোমার মধ্যেও পৌঁছোবে। হাড়ে হাড়ে টের পাবে। আর যদি বাইরের দেহটা পটল তোলে—'

হাড় পর্যন্ত হিম হয়ে গেল আমার, 'এখনও ছ'মিনিট বাকি, প্রফেসর। কথা বন্ধ করে চলুন যদ্দুর সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখি।'

শুরু হল পথচলা। ভাইরাস-জখম জায়গাগুলো কালচে মেরে গেছে। আমি চলেছি সেই চিহ্ন দেখে। সুস্পষ্ট চিহ্ন, তাই চলেছি দ্রুতবেগে। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম একটা প্রকাণ্ড পাতালগুহার মতো গহ্বরে। সেতুর মতো সংকীর্ণ কলাতন্তু ধনুকভঙ্গিমায় বেঁকে উঠে গেছে নিতল গহ্বরের ওপর দিয়ে। কিন্তু মাঝামাঝি গিয়েই স্তব্ধ হয়েছে ব্রিজ। সেতুবন্ধন আর হয়নি— আধাখ্যাঁচড়া অবস্থাতেই ঝুলছে শূন্যে। হু হু বাতাসে মথিত শূন্যস্থান। নিতল গহ্বরের তলদেশ থেকে হুহুংকারে উঠে আসছে দমকা বাতাস।

কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল আপনা থেকেই, 'এ কোথায় এলাম প্রফেসর?'

'আমার মনের একদিক থেকে আর একদিকে যাওয়ার ফাঁক যেখানে— সেইখানে।'

'কিন্তু অপর দিকে তো নিকষ অন্ধকার!'

'অন্ধকার তো থাকবেই। যুক্তি আর কল্পনার ফাঁক যে এটা। একদিক থেকে অপরদিক তো দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু সেই হতভাগা কি আছে এখানে? ওপারে কিছু আছে বলে মনে হয়?'

'দীননাথ, এই হল গিয়ে মন-মস্তিষ্কের সীমান্ত অঞ্চল। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।' দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে বললেন প্রফেসর, 'ওদিকে মন, এদিকে মস্তিষ্ক। দুটো একেবারে আলাদা জিনিস— অথচ একই জিনিসের অংশ।'

'সমুদ্র আর ডাঙার মতো?'

খুশি হলেন প্রফেসর আমি বুঝতে পেরেছি, দেখে। বললেন, 'ঠিক ধরেছ। এতক্ষণে একটা খাঁটি কথা বলেছ!'

এমনভাবে বললেন, যেন এতক্ষণ ঘাস কাটছিলাম। কিন্তু খোঁচাটা গায়ে মাখলাম না। গভীর খাদের তলদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললাম, 'তলা দেখা যাচ্ছে না তো!'

চিন্তান্বিত মুখে নিজের অবচেতন মনের অন্ধকার গভীরে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর

বললেন, 'তা ঠিক। মাঝে মাঝে আমিই আমাকে বুঝে উঠতে পারি না!'

আমার একহাত ধরে সংকীর্ণ সেতুপথে পা বাড়ালেন প্রফেসর। এবার কিন্তু উনি সামনে। এত ঘাবড়ে গেছি যে পা কাঁপছে। কলাতন্তু-সেতু এত সংকীর্ণ যে পা ফেলার পর যখন দেখছি পা ফেলতে ভরসা হয় না মোটেই— তখন গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসছে। আশপাশ দিয়ে গোঁ গোঁ করে ধেয়ে যাচ্ছে দামাল বাতাস— হাওয়ায় নিশানের মতো উড়ছে পরিধেয়— টানের চোটে বেশ কয়েকবার ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। পায়ের তলায় মুখ্যব্যাদান করা তলহীন ভয়ানক গহ্বর যেন আমাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করতে লাগল। কী কষ্টে যে মূর্ছিত হওয়া আটকে রাখলাম, তা আমি জানি আর ঈশ্বর জানেন।

ব্রিজ যেখানে শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হল, সেই পয়েন্টে পৌঁছে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আর এক কাণ্ড করে বসলেন। বিনা দ্বিধায়, এতটুকু ইতস্তত না করে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তমিস্রাময় শূন্যে পা রাখলেন এবং এগিয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হলেন নিকষ আঁধারে— দৃশ্যমান রইল কেবল যে হাতখানা আমি আঁকড়ে আছি, সেই হাতখানা। মহা দ্বিধায় পড়লাম আমি। কী করি এখন? জেনে শুনে চোখে দেখার পরেও অজ্ঞাত তিমিরে অদৃশ্য হই কী করে? কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার ফুরসতও দিলেন না। হ্যাঁচকা টান পড়ল হাতে। হিড়হিড় করে টানছেন প্রফেসর। অদৃশ্য অবস্থাতেও আমাকে ছাড়তে রাজি নন। কী জ্বালা! কী জ্বালা! শুধু একখানা হাত নিবিড় নিশার চাইতেও রহস্যময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে হেঁইও হেঁইও করে টান মারছে আমাকে— ওইটুকু সরু জায়গায় বাতাসের গোঙানির মধ্যে টলমল করতে করতে কাঁহাতক আর টাগ অফ ওয়ারে অংশ নেওয়া যায়! যা থাকে কপালে বলে কষে চোখ বন্ধ করে পা বাড়ালাম নিঃসীম শূন্যতার গর্ভে...

ক্রোনোমিটার দেখলেন কৌ। বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করার মতো বিশাল একখানা দীর্ঘনিশ্বাস ডবল সাইক্লোনের মতো হু-উ-উ-শ করে বেরিয়ে এল দুই নাসিকারন্ধ্র দিয়ে।

বললেন ধরা গলায়, 'আর মোটে পাঁচ মিনিট...।'

এমন সময়ে শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠের অপার্থিব বিজয়োল্লাস, 'খবরদার ডক্টর, একদম নড়বেন না।' দরজার সামনে ব্লাস্টার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে মু।

গাউনের তলা থেকে ব্লাস্টার টেনে বার করার চেষ্টা করেছিল নার্স মেয়েটা। কিন্তু হাজার হোক নারীজাতি তো, ক্ষিপ্রতায় মু-এর সঙ্গে পারবে কেন। গাউনের তলায় হাত ঢোকাতেই মু ব্লাস্টার নিক্ষেপ করল তাকে লক্ষ্য করে। মুণ্ডহীন নার্সের কবন্ধ লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। কৌ-এর দিকে চোঙ ফিরিয়ে শীতল কণ্ঠে মু বললে, 'ছেড়ে দিন প্রফেসরকে।'

নিমেষে ট্যাঁটা গোবিন্দ হয়ে গেলেন কৌ, 'না! কক্ষনও না!'

মূর্তিমান প্রেতের মতো এগিয়ে এল মু। দাঁড়াল ঘাড়বেঁকা ডক্টরের ঠিক সামনে। তিনি শিহরিত হলেন মু-এর অমানুষিক মুখচ্ছবি দেখে! বীভৎসতায় ভরে উঠেছে চেনা মুখখানা। চোখ নীলচে অঙ্গার, ভুরু বাচ্চা কেউটে, লালচে কর্কশ লোমে ঢাকা সমস্ত চামড়া। ভাইরাস আক্রমণ ঘটলে অনেক রকম 'র‍্যাশ' ফুটে উঠতে দেখেছেন রোগীর সারা গায়ে। গা

চুলকোয়, লাল হয়ে ওঠে, দাগড়া দাগড়া অথবা ডুমো ডুমো হয়ে ওঠে। কিন্তু এ 'র‍্যাশ' তিনি কখনও দেখেননি। তাই গবেষকের অনুসন্ধানী এবং কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে সূচ্যগ্র চাহনি মেলে নিরীক্ষণ করতে গেলেন বিকটদর্শন ভয়াল মুখখানা।

অমনি সড়াৎ করে বিদ্যুৎরেখা মু-এর কপাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে কৌ-এর কপাল স্পর্শ করে লকলকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মিলিয়ে গেল সেকেন্ডকয়েক পরেই।

চাপা গজরানির সুরে বলল মু, 'ছেড়ে দিন প্রফেসরকে।'

টেনে টেনে জড়ানো গলায় কৌ বললেন, 'গোলাম হাজির, হুকুম তামিল হোক!' দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন প্রফেসরের পাশে, খুলতে লাগলেন প্লাস্টিক ফিতের বাঁধন।

তাড়া লাগাল মু, 'জলদি করুন! হুজুরের সঙ্গে এখুনি কথা বলা দরকার।'

ভাইরাস-সংক্রামিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছিল কৌ-এর কাণ্ডজ্ঞান— আনুগত্য সমর্পিত হয়েছিল ভাইরাস-সেবকদের চরণে। তাই মু-এর কথার জবাব দিলেন এইভাবে, 'না। দাঁড়াও। হুজুর বিপদে পড়েছেন।'

'কী?' দাঁত খিঁচিয়ে হিংস্র নেকড়ের মতো গর্জে উঠল মু।

যেন হেঁচকি তুলে তুলে বললেন কৌ, 'মাইক্রো-ক্লোন কপি ব্রেনের মধ্যে ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে একটু আগে হুজুরকে খুঁজে বার করে ধ্বংস করার জন্যে। যদি সফল হয় ওদের অভিযান—'

'হবে না! ভণ্ডুল করতেই হবে ওদের অভিযান!'

আমতা আমতা করে কৌ বলেন, 'কিন্তু সময় আর নেই— ওদের আটকানোও যাবে না।'

'আটকাতেই হবে! আমি বলছি আটকাতে হবে!' বজ্রহুংকারে ঘর কাঁপিয়ে বলল মু।

বাইরের করিডরে ঠিক সেই সময়ে ঘটল আর একটা অঘটন।

ক-৫-এর ইলেকট্রনিক ব্রেন 'টিউন' করা ছিল কৌ-এর ব্রেনের সঙ্গে। অনুগত অনুচর তো। তাই মনিবের বিপদে অ্যালার্ম সংকেত দেখা দিত তার ব্রেনেও। ব্যবস্থাটা কৌ-এর। সার্কিটের মধ্যে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঢুকিয়ে রেখেছিলেন।

কৌ যখন গোলাম বনে গেল ভাইরাসের, ঠিক তখনই সম্বিৎ ফিরে এল ক-৫-এর। অমনি সচল হল জটিল ইলেকট্রনিক ব্রেন। ব্রেনের মধ্যে স্ক্রিনে ফুটে উঠল আইসোলেশন ওয়ার্ডের ভেতরের দৃশ্য। কৌ যে আর মানুষ নন, তা জানা হয়ে গেল পলকের মধ্যে। মানুষদের সেবা করার জন্যেই রোবটদের সৃষ্টি— অমানুষদের নয়। যান্ত্রিক মস্তিষ্কে তাই আর অমানুষ কৌ-এর প্রতি কোনও আনুগত্য রইল না।

আমি মটকা মেরে পড়ে থেকে দেখলাম আবার অ্যান্টেনা খাড়া হয়ে গেছে ক-৫-এর, দপ দপ করে জ্বলছে নিভছে চক্ষু-স্ক্রিন— রোবটদের ভাবাবেগ থাকলে বলতাম, শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

কিন্তু তা তো নয়। চক্ষের নিমেষে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নিয়ে কর্তব্য স্থির করে ফেললে ক-৫। গড় গড় করে চাকার ওপর গড়িয়ে এসে একটা অ্যান্টেনা ছোঁয়ালো আমার কপালে।

আমি মটকা মেরে পড়েই রইলাম। বেঁচে আছি জানলে ক্লোজ-রেঞ্জে ব্লাস্টার ছুড়লে আর কি বাঁচব?

কপালে মুখে অ্যান্টেনা বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে ক-৫ বললে যথাসম্ভব কোমল যান্ত্রিক কণ্ঠে, 'প্রভু!'

আমি নড়লাম না। যন্ত্র আর কুকুরকে আমি বিশ্বাস করি না।

ক-৫ তখন একটা বিচ্ছিরি নষ্টামি করে বসল। কোনও কলের কুকুরের পক্ষে কাজটা সমীচীন নয়। অ্যান্টেনার সরু ডগাটা নাকে ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতেই ভীষণ জোরে হেঁচে ফেললাম।

অমনি অ্যান্টেনাটা নাক থেকে বার করে নিয়ে কপালে মৃদু ইলেকট্রিক কারেন্ট চার্জ করল ক-৫। চনমনে হয়ে গেল মস্তিষ্ক। তড়াক লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। তেড়েমেড়ে বললাম, 'আগে বলো আমাকে টিপ করে ব্লাস্টার ছুড়েছিল কেন?'

'বাধ্য হয়েছিলাম বলে। সাময়িকভাবে আমার শক্তির ওপর আরও জোরালো একটা শক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার ইচ্ছের সার্কিটগুলো গোলমাল হয়ে গেছিল। নতুন শক্তি উৎপাদন করে নিয়েছি। হুকুম করুন। তামিল করব।'

'শত্রুগুলো গেল কোন চুলোয়? প্রফেসরকে পেয়েছে?'

বিষণ্ণ কণ্ঠে ক-৫ বললে, 'পেয়েছে। ড. কৌ ভাইরাস-সংক্রামিত হয়েছেন। নার্সকে মেরে ফেলেছেন।'

'বলো কী! এখন কী করছেন ডক্টর?'

'মু-কে ক্লোন করছেন। প্রফেসরের ব্রেনে তাকে ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেবেন।'

আইসোলেশন ওয়ার্ড অভিমুখে ধাবিত হলাম নক্ষত্র বেগে, 'আটকাতেই হবে ডক্টরকে।'

রেলগাড়ির মতো ফুলস্পিডে পেছন পেছন আসতে আসতে ক-৫ বললে, 'ও কাজ করবেন না।'

'কেন?'

'প্রফেসরের মাইক্রো-ক্লোন ভাইরাস-হুজুরকে ধ্বংস করতেও তো পারেন, সময়টা দেওয়া দরকার। এখন বাগড়া দেবেন না। ধৈর্য ধরুন।'

সংকীর্ণ সেতুর অপর দিক বরাবর প্রফেসরের ঠিক পেছনেই দেখতে পেলাম আমাকে। হিড়হিড় করে গায়ের জোরে টেনে নিয়ে চলেছেন। রোগাপটকা শরীরটায় যেন ম্যামথ-হস্তীর বল এসেছে। একটু আগেই দুশ্চিন্তায় ভুগছিলাম কোথায় যাচ্ছি দেখতে না পাওয়ায়। এখন ঠিক উলটো ব্যাপারটাই ঘটেছে! কোত্থেকে এলাম, পেছনকার সেই দৃশ্য কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। বেমালুম অদৃশ্য! বাতাস পুনরুদ্যমে আবার লক্ষ ফণা বাসুকির মতো ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ছাড়ছে আশপাশ দিয়ে। যাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না— সেই বাতাসের নিশ্বাসে যে এত গোঙানি, এত গজরানি থাকতে পারে, এ অভিজ্ঞতাও হল সেই মুহূর্তে। প্রচণ্ড ঝাপটায় মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে চরণযুগল বুঝি স্খলিত হয়ে শূন্যে

ঠিকরে যাবে। বিশাল খাদের অপর প্রান্ত চক্ষুগোচর হচ্ছে না একেবারেই— আদৌ হবে কি না সে সন্দেহও উঁকিঝুঁকি মারছে মনের মধ্যে। প্রফেসরের মন তো— তল পাওয়া কঠিন— এত বিশাল এর অবচেতন অঞ্চল যে এপার-ওপার দেখাও মুশকিল।

'কী হে ছোকরা, এখন কেমন লাগছে?' পরমোল্লাসে হেঁকে উঠলেন প্রফেসর— যেন হাওড়ার পোলে হাওয়া খাচ্ছেন।

দম আটকানো স্বরে বললাম, 'দারুণ!'

সগর্বে চারপাশ দেখলেন প্রফেসর। হিমালয়প্রতিম নিরেট খাড়াই তমিস্রা-গিরিপ্রাচীর সামনে। তমিস্রা মাথার ওপর এবং পায়ের নীচেও। যে দিকে তাকাই, সেইদিকেই।

সোল্লাসে ফের বললেন উনি, 'অপূর্ব! অপূর্ব! মন-মস্তিষ্কের কী আশ্চর্য সীমান্ত অঞ্চল! কোনও চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই এখানে... শান্ত... নিস্তব্ধ... নিস্তরঙ্গ! অহো! অহো!'

শান্ত! নিস্তব্ধ! নিস্তরঙ্গ! হু হু বাতাসে অধীর এই শূন্যতার কপালে অবশেষে এই বিশেষণ? ভদ্রলোকের বাংলা ব্যাকরণে দখল দেখছি আমার চাইতেও কম!

কাষ্ঠহেসে বললাম, 'চলেছি কোথায়?'

'স্বপ্ন আর কল্পলোকের আশ্চর্য রাজ্যে—'

হাতে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ নিয়ে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের ত্রিভঙ্গ মুরারি শায়িত বপুটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন ড. কৌ। সিরিঞ্জের মধ্যে বর্ণহীন তরল পদার্থের ভেতরে রয়েছে মু-এর মাইক্রো-ক্লোন দেহ। প্রফেসর মাথায় অতি সন্তর্পণে তরল পদার্থটা ফুঁড়ে ঢুকিয়ে দিলেন ডক্টর...

প্রফেসরের বিকৃত ব্যাদিত মুখগহ্বর থেকে তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এল ভয়াল ঘর্ঘরে চিৎকার, 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! ওরা যে কাছে এসে গেল! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!'

ভাইরাস-হুজুরের আতঙ্ক-বিকৃত কণ্ঠস্বরের তাগিদ তাড়িয়ে নিয়ে চলল মু-কে প্রফেসরের ব্রেনের মধ্যে দিয়ে। নিউরোন কলাতন্তুর কালচে মেরে যাওয়া ছিন্ন ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ বেগে ধেয়ে গেল রন্ধ্রপথে এবং ক্ষণপরেই আত্মবিস্মৃত উন্মাদের মতো বেপরোয়াভাবে ছুটল বায়ুবিক্ষুব্ধ সংকীর্ণ সেতুর ওপর দিয়ে...

ইতিমধ্যে আমি আর প্রফেসর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ঠিক যেন কালো, চকচকে পাথরের গিরিগুহা।

'প্রফেসর, এই কী আপনার স্বপ্নের দেশ?'

'সেইদিকেই তো চলেছি...'

শেষ হল সুড়ঙ্গপথ। আমরা বেরিয়ে এলাম একটা উন্মুক্ত অঞ্চলে। না, পুরোপুরি খোলা জায়গা নয়। সুবিশাল একটা গহ্বর— এত প্রকাণ্ড যে হাজারটা বিজাপুর-গোলগম্বুজ তার মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। অতিকায় রজতশুভ্র স্তম্ভ হারিয়ে গেছে দৃষ্টিপথের বাইরে।

কাছেই, গহ্বরের মেঝের ওপর, রয়েছে একটা পিণ্ডি পাকানো পাথুরে মৌচাক। এ অঞ্চলে অদ্ভুতদর্শন বস্তুটা একেবারেই খাপছাড়া— বিকৃত এবং সৃষ্টিছাড়া।

হঠাৎ খুব শান্ত হয়ে গেলেন প্রফেসর। এতক্ষণের এত উত্তেজনা নিমেষ মধ্যে তিরোহিত হল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখাবয়ব থেকে। নিমীলিত নয়নে অদ্ভুত পিণ্ডটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন ধীর স্থির প্রশান্ত কণ্ঠে, 'এই সেই উৎপাত!'

আমার অবস্থা হল কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। চরম মুহূর্তে প্রফেসর শান্ত হয়ে যান, আমি হই অশান্ত। প্রফেসরকে এবার টেনেহিঁচড়ে আমিই ছুটলাম আগন্তুক উৎপাতের দিকে— যে উৎপাত উনিশ শো একাশি সাল থেকে জীবন দুর্বিষহ করে চলেছে আমাদের।

কাছাকাছি আসতেই অযুত রন্ধ্রময় শিলাখণ্ডের মধ্যে একটা নড়াচড়া লক্ষ করলাম। জীবন্ত কিছু একটা সঞ্চরমান রয়েছে পাথরের মধ্যে। চকিতে দেখলাম আছড়ে পড়া কয়েকটা শুঁড়— আর একটা ইলেকট্রিক বাল্বের মতো বড় গোলাকার হাড়-হিম-করা অশুভ চক্ষুর দ্যুতি।

সঘন নিশ্বাস নিয়ে বললাম চাপা গলায়, 'সাপের চোখেও এত জিঘাংসা নেই, প্রফেসর।' বলে, একটু কানখাড়া করলাম। পরক্ষণেই বেগে পেছন ফিরে বললাম নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, 'ফাঁদে পড়েছি। পেছনে আসছে আর এক উৎপাত।'

১৬
ভাইরাস-হুজুর

বিপদের মুহূর্তে আমি অশান্ত হই অ্যাড্রেন্যালিন হরমোন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় বলে। তখন হাতে-পায়ে আকাশের বিদ্যুৎ খেলে যায়। বড়াই করছি না— পঙ্গপালসম ভাইরাস-গোলামদের সঙ্গে আমার মাস্টার প্রিন্টের লড়াই তার প্রমাণ।

আমার ক্লোন-কপিও কম যায় না। পেছনে আর এক উৎপাতের ধাবমান পদধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হতেই হুঁশিয়ার করলাম প্রফেসরকে এবং পরক্ষণেই তাঁর বাক্য নিঃসরণ ঘটবার আগেই জ্যামুক্ত শায়কের মতো ধাবিত হলাম ফেলে আসা সুড়ঙ্গ অভিমুখে— হাতে যুগপৎ উদ্যত রইল ব্লাস্টার এবং ছুরিকা।

প্রফেসর সেদিকে দৃকপাতও করলেন না। ওঁর সমস্ত সত্তা তখন কেন্দ্রীভূত হয়েছে হারামজাদা উৎপাতের কিম্ভূতকিমাকার আলয়ের দিকে। এই সেই গোপন আলয়, যেখানে ঘাপটি মেরে থেকে বেটাচ্ছেলে এতদিন নাজেহাল করে তুলেছে তাঁকে। মাইক্রো-ক্লোন আকারে তাকে অন্বেষণ করার দুরূহ অভিযানে ব্রতী না হলে কস্মিনকালেও তার হদিশ পেতেন না— আমৃত্যু গোলাম হয়ে হুকুম তামিল করে যেতে হত। ভয়ংকর মহাঘোর সেই করাল আততায়ীর সম্মুখীন হয়ে পশ্চাতে আগুয়ান বিপদ বিস্মৃত হলেন তিনি। আমিও আর তাঁকে টানাহ্যাঁচড়া করলাম না। একাই ছুটে গেলাম সুড়ঙ্গ অভিমুখে।

সুগভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে বিদঘুটে ভাইরাস-আলয়ের দিকে পায়ে পায়ে

এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। শত্রুর মোকাবিলা করার সময় এবার এসেছে। কাছে আসতেই লক্ষ করলেন, পিণ্ডাকৃতি মৌচাকের অসংখ্য ফুটো আর খাঁজ খোপের মধ্যে অদ্ভুতদর্শন একটা জীবন্ত প্রাণী নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছে— পুরো মৌচাক যেন তার একার দখলে— রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার নিশানা মিলছে। লক্ষ করলেন একটা শুঁড় দুলছে। চকচকে ভিজে ভিজে লাল মাংসের শুঁড়। আর লক্ষ করলেন, ইলেকট্রিক বাল্বের মতো একটা কৃষ্ণকায় চক্ষু প্রত্যঙ্গ— এদিক ওদিক দুলে খুঁজছে তাঁকে। এইটুকুই দেখেই প্রফেসর অনুমান করে নিলেন পৃথিবীর কোনও নৈশ-দুঃস্বপ্ন দিয়েও কল্পনা করা কঠিন অপার্থিব এই প্রাণীটার দেহাকার। শুধু একটা শুঁড় আর চক্ষু মেলে ধরেই আপাতত সে ক্ষান্ত বটে, প্রয়োজন হলে অযুত রন্ধ্রপথে ধেয়ে আসতে পারে আরও অনেক অজ্ঞাত দুঃস্বপ্নসম আকৃতি।

আমি হলে এমতাবস্থায় স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান থাকতাম। কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে নির্মিত প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। তাই অব্যাহত রইল অগ্রগতি। অচঞ্চল চরণে অগ্রসর হয়ে দাঁড়ালেন শিলাস্তূপের সামনে। হেঁকে বললেন, 'কে আছ হে ভেতরে! নাম কী তোমার?'

এরকম একটা উত্তেজনাময় মুহূর্তে, জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি চলছে, সেখানে এই ধরনের সংলাপ শোভন কেবল প্রফেসরের পক্ষেই।

শিলাখণ্ডে ঘাপটি মেরে থাকা বিটলে বোধহয় এই জাতীয় অকুতোভয় বিশ্রম্ভালাপের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই ক্ষণকাল নীরব রইল।

আবার অমায়িক কণ্ঠে আপ্যায়ন জানালেন প্রফেসর, 'ভয় কি? আমি তো নিরস্ত্র।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। বিভিন্ন রন্ধ্রে বারকয়েক উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল বেশ কয়েকটা টকটকে লাল মাংসের লিকলিকে শুঁড়। মিশকালো গোলক-চক্ষুটা উপর্যুপরি কয়েকবার নিষ্প্রভ এবং সপ্রভ হল। অদ্ভুত গাঢ় দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল সেই গোলক চক্ষুর সমতুল্য চক্ষু প্রফেসর তাঁর বহু আশ্চর্য অভিযানে বেরিয়েও কখনও দেখেননি।

তারপর যেন গভীর জলের মধ্যে বুদবুদ কাটল সশব্দে। ঢকঢক ঘটঘট ঘর্ঘরে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল উদ্ধত ভঙ্গিমায়, 'আমি হুজুর! আমিই কেন্দ্রিন! আমি সহস্রজ্যোতি! আমি কালকূট গরল! আমার কটুগন্ধে বিশ্বলোক মূর্ছিত হয়! আমি অতুল তেজাঃ! আমি অপ্রতিহতবীর্য! আমি—'

'থামো! থামো!' ভাইরাস-হুজুরের আত্মম্ভরিতা প্রথমবার শ্রবণ করার সৌভাগ্য হয়নি প্রফেসরের, তখন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন। এখন শুনে কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। কড়া গলায় দাবড়ানি দিয়ে বললেন, 'তুমি যেই হও না কেন, অনধিকার প্রবেশ করেছ, আমার অবচেতন মনের শান্তি নষ্ট করেছ, আমার বিপাকক্রিয়া বিঘ্নিত করেছ।' একটু বিরতি দিলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'কেন্দ্রিন বললে তুমি। কীসের কেন্দ্রিন শুনতে পারি?'

'ঝাঁকের কেন্দ্রিন।'

'কীসের ঝাঁক?'

'আমার গোলামদের! আমার তেজঃপুঞ্জের কেন্দ্রিন! আমি আত্মতেজে যাদের সৃষ্টি করে চলছি, তাদের কেন্দ্রিন! আমি সর্বসংহারক আবার আমিই সৃষ্টিকর্তা! আমার বশংবদ গোলামদের মহাপ্রভু কেন্দ্রিন আমিই! আমি প্রসন্ন থাকলে তোমার মঙ্গল হবে।'

'বটে! বটে! তা কেন্দ্রিন মহাপ্রভু, এত জায়গা থাকতে আমার ব্রেনটাকে তোমার পছন্দ হল কেন?'

'তোমার ধীশক্তির জন্যে।'

'তা ঠিক! তা ঠিক! কিন্তু আমার মস্তিষ্ক দখল করার তোমার কোনও অধিকার আছে কী?'

'আছে বইকী!'

'তোমার মতো অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্যের কোনও অধিকারই নেই আমার—'

উগ্রকণ্ঠ এবার বজ্রকণ্ঠে পরিণত হল, 'আমি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ! আমি বালখিল্য! রে রে মূঢ়! আমার কোপানলে সহস্র উল্কাপাত হয়, প্রলয়কালীন অতি ভীষণ মেঘের মতো ঘনঘোর মুষলধারে রক্তবৃষ্টি করতে থাকে, নভোমণ্ডল প্রকম্পিত হয়। অহংকারপরতন্ত্র হয়ে আমাকে পরিহাস বা অবমাননা করতে যেয়ো না। আমি খর্বাকৃতি এবং নিরাহার হলেও বজ্রস্বরূপ এবং কোপনস্বভাব!'

'সাধু! সাধু!' পটাপট শব্দে হাততালি দিলেন প্রফেসর, 'আপাতত তুমি গোষ্পদে আসীন হয়েছ এবং দুর্বলও হয়েছ। সুতরাং আবার বলছি, আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করার কোনও অধিকার তোমার নেই। এ মস্তিষ্ক তোমার মতো দস্যুর উপযুক্ত নয়।'

লক্ষ ভুজঙ্গ ফণাবিস্তার করল যেন লক্ষ রন্ধ্রপথে। বিষমক্রোধে মৌচাক সদৃশ শিলাখণ্ড নৃত্য করে উঠল তাথৈ তাথৈ ছন্দে, 'রে রে পাপিষ্ঠ! ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটা প্রাণীর অধিকার আছে নিজেকে টিকিয়ে রাখার, বংশবৃদ্ধি করার, নিজের প্রজাপতিকে অক্ষয় রাখার... ঠিক এইভাবেই তোদের পৃথিবীর আদিম প্রজাতিরা অস্তিত্ব রক্ষা করেছে নিজেদের। আমিও তাই। আমি ছিন্ধি, ভিন্ধি, প্রধাব, ঘাতয়, পাতয়, মারয় তত্ত্বে বিশ্বাসী।'

মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হল প্রফেসরের, 'কী তত্ত্ব?'

'ছিন্ধি, ভিন্ধি, প্রধাব, ঘাতয়, পাতয়, মারয়।'

'সেটা আবার কী? বৈজ্ঞানিক, না দার্শনিক তত্ত্ব?'

'বাঁচার তত্ত্ব।'

'মানেটা কী?'

'ছেদন কর, ভগ্ন কর, বেগে দৌড়ে অগ্রসর হও, আঘাত কর, পাতিত কর, বধ কর!'

'এ তো দেখছি রণনীতি!'

'চিরন্তন রণনীতি! বেঁচে থাকার নীতি। আমি আদিম, আমি ত্রিকাল, আমি—'

'শোনো, শোনো তোমার নীতিই তোমাকে শোনাই। বেঁচে থাকার অধিকার তোমার যেমন আছে, আমারও তেমনি আছে, ওই ছিন্ধি ভিন্ধি না কী যেন ছাই বললে, ও নীতি আমারও আছে। টিঁকে থাকার তাগিদে তোমাকেও আমি ছিন্দি ভিন্ধি করতে পারি তো?'

'সহস্রবার পারো। অস্তিত্ব রক্ষার নীতিই একমাত্র নীতি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে!'

ছপাং করে একটা চাবুকের মতো শুঁড় আছড়ে পড়ল প্রফেসরের গণ্ডদেশে। হাত বুলিয়ে নিয়ে উনি দেখলেন গাল কেটে গেছে রক্ত ঝরছে।

ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'ভারী অন্যায়।'

গর্জে উঠল জিঘাংসাপুঞ্জিত কণ্ঠস্বর, 'সময় তোমার ফুরিয়ে আসছে। আমাকে নিকেশ করার ক্ষমতা তোমার নেই। নিরস্ত্র তুমি— কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমার নিজের অস্তিত্বও থাকবে না।'

নীরব রইলেন প্রফেসর। সেই অবসরে আবার কান ঝালাপালা করা আত্মপ্রশস্তি শুরু করল কেন্দ্রিত মহাপ্রভু।

'আমি অবধ্য ভাইরাস। ঝাঁকের হুজুর। কোটি কোটি বছর সুপ্ত থেকেছি, গুপ্ত থেকেছি মহাশূন্যে। উপযুক্ত বাহকের প্রতীক্ষায় থেকেছি মহাকালের গর্ভে—'

আর সহ্য করতে পারলেন না প্রফেসর। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'বাহক মানে? আমি কী মুটে?'

কর্ণপাত করল না ভাইরাস-হুজুর, 'মানুষ এখন কী করছে? ঝাঁকে ঝাঁকে নিজের প্রজাতি পাঠিয়ে দিচ্ছে মহাকাশে— উপনিবেশের পর উপনিবেশ সৃষ্টি করে গ্রহে গ্রহে বিজয়কেতন উড়িয়ে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে নিজেদের— দিকে দিকে বাজছে তাদের জয়ডংকা— আধিপত্য বিস্তারে অনন্যমন আজকের মানুষ। আমারও তাই অধিকার আছে পরদেশলোভী এই মানুষকে জয় করার, গোলাম বানিয়ে রাখার। নক্ষত্রে নক্ষত্রে যারা হানা দিয়ে ছায়াপথের পর ছায়াপথ দখল করে চলেছে, আমার অধিকার আছে আমারই ঝাঁক দিয়ে তাদের পদানত করে রাখার।'

রাগ সামলে নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখলেন প্রফেসর। বললেন, 'মানুষ তো বাইরের দুনিয়া দখল করছে, কিন্তু তুমি যে বাইরের আর ভেতরের দুটো দুনিয়াই দখল করার প্ল্যান করেছ। সূক্ষ্মজগৎ থেকে আরম্ভ করে স্থূলজগৎ— সবই অধিকারে আনতে চাইছ। সেটা কি ঘোরতর অন্যায় নয়?'

'ন্যায়-অন্যায়ের বিচার অস্তিত্ব রক্ষার রণকৌশলে ঠাঁই পায় না। তোমাদের কৃষ্ণ কী করেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে? আমিও বহুকাল প্রতীক্ষায় থেকেছি। মহাশূন্যের করাল শীতল নিঃসীমতায় কালক্ষেপ করেছি, মনুষ্যজাতির প্রতীক্ষায় নিযুতবর্ষ অতিবাহিত করেছি। সময় হয়েছে নিকট— এখন শুধু মহাকাশ নয়, মহাকালও আমার হাতের মুঠোয়!'

'মহাকাল তোমার হাতের মুঠোয়? কীভাবে?'

'নির্বোধ! তুমি সেই মহাকালপতি! তুমিই এ যুগের এবং বহুযুগের টাইম-লর্ড! সময়-পথ তোমার পায়ের তলার! টাইম মেশিন তোমারই আবিষ্কার!'

'টাইম মেশিন!'

'হ্যাঁ, টাইম মেশিন! তোমার মধ্যে দিয়েই, তোমার ব্রেনের মধ্যে দিয়ে, তোমার টাইম মেশিনের দৌলতে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের একচ্ছত্র অধিপতি হব আমি— ভাইরাস-হুজুর, সময়াধিপতি, মহাভয়ংকর—'

মনস্থির করে ফেললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। কবন্ধ-কলেবর ক্রূর-শিরোমণি এই সর্বনাশকে নিপাত করতে হবে— আর দেরি নয়!

সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গপথের গাঢ় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বেশ কিছুক্ষণ ওত পেতে রইলাম আমি। উদ্যত রইল ছুরি আর ব্লাস্টার দু'হাতে। শিহরিত হল প্রতিটি লোমকূপ। অণুপরমাণু দিয়ে

অনুভব করলাম আগুয়ান আততায়ীর অস্তিত্ব। সে আসছে... সে আসছে... সে আসছে!

সহসা দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হল একটা নরাকৃতি মূর্তিমান আতঙ্ক। সঙ্গে সঙ্গে যেন গাণ্ডীবের টংকার জাগ্রত হল হাতে পায়ে— ঐরাবত গতিবেগে ধেয়ে গেলাম সেদিকে!

কিন্তু পরক্ষণেই বিষম আতঙ্কে পেছিয়ে এলাম ক্যাঙারু লাফ মেরে। এ কী দেখছি সামনে? দূর থেকে যাকে নর-কলেবরে মূর্তিমান দানো বলে মনে হয়েছিল— কাছাকাছি আসতেই দেখলাম তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে দ্রুত স্পন্দিত শ্বেতদেহী ফ্যাগোসাইটে। মু। মু-এর একী হাল হয়েছে? চেনা যায় না। আপাদমস্তকে ফ্যাগোসাইটদের বোঝা নিয়েও সে অগ্রসর হচ্ছে কেবলমাত্র উন্মত্ততার বলে বলীয়ান হয়ে— হলফ করে বলতে পারি, এ-অবস্থায় কোনও সুস্থ প্রাণীর পক্ষে একপদ অগ্রসর হওয়াও সম্ভব ছিল না। আমি কি পেরেছি? ভূলুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আর্ত চিৎকার করেছিলাম। প্রফেসর ফলস অ্যালার্ম না দিলে নিশ্চিহ্ন করে দিত আমাকে দুর্ধর্ষ ফ্যাগোসাইট ফৌজ।

অভিভূত হয়ে রইলাম তাই ভাইরাসের সংক্রমণ মহিমা দেখে।

কিন্তু তা কয়েক সেকেন্ডের জন্য। সহসা আমাকে আবির্ভূত হতে দেখে থমকে গিয়েছিল মু। পরমুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলেছিল ক্ষণিকের দ্বিধা। চারদিক থেকে সেঁটে থাকা ফুলে ফুলে ওঠা ফ্যাগোসাইট নাছোড়বান্দাদের পিণ্ডির মধ্যে দিয়েই হাতের ব্লাস্টার উদ্যত করেছিল আমার দিকে।

ব্যস, তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হল আমার প্রতিবর্ত ক্রিয়া। ফের চালু হয়ে গেল হাত আর পায়ের ডায়নামো। ঠিক সেই সময়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ব্লাস্টার বর্ষণ করল মু। কিন্তু আমার বডিতে তখন ফোর-ফর্টি ভোল্টকেও ম্লান করে দেওয়ার মতো ইলেকট্রিক কারেন্ট বইছে। চক্ষের নিমেষে গোঁত খেলাম মেঝের ওপর। ভূতল আশ্রয় করে লম্বমান অবস্থাতেই উপর্যুপরি ব্লাস্টার নিক্ষেপ করলাম শরীরী বিভীষিকাকে লক্ষ্য করে।

এত নিকট থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ব্লাস্টারের প্রতিটি তেজ-গোলক শূন্যে বিলীন করে দিল মু-এর এক-একটা দেহাংশ। আমি আর শেষ দেখার জন্য সময় ব্যয় করলাম না। ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে পবনবেগে ফিরে এলাম প্রফেসরের সমীপে।

উল্লাস-মন্থর কণ্ঠে তখন বিজয়ভাষণ সমাপ্ত করছে ভাইরাস-হুজুর, 'প্রফেসর, অতএব প্রণিধান করে দেখো, আমার এই অপ্রতিহত ঝাঁকের সঙ্গে পারবে কেন তোমাদের মতো নশ্বর ক্ষুদ্র প্রাণীরা? আমরাই এখন মহাকাশ, মহাকাল, মহাবিশ্বের একমাত্র নবীন অধিপতি। ভীমরুলের চাক হবে এই ঘাঁটি— আমাদের দপ্তর।'

'নবীন অধিপতি?' বঙ্কিমকণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'আমার সাহায্য পেলে তবেই তো!'

'তোমার সাহায্য তো পাবই হে কীটাণুকীট! তোমার এখানকার সময় তো ফুরিয়ে এসেছে। কথার জাল মেলে এতক্ষণ সময় নষ্ট করলাম তো ওই জন্যেই! ফাঁদে পা দিয়েছ হে গর্দভ। দেখছ না এরই মধ্যে তোমার অস্তিত্ব শেষ হতে চলেছে?'

মুখে হাত বোলালেন প্রফেসর। চামড়া যেন হাতে ঠেকল না— এত পাতলা কাগজের মতো ফিনফিনে। অনুভব করলেন, ফাটল আবির্ভূত হচ্ছে সর্বাঙ্গে। সভয়ে স্মরণ করলেন,

সীমিত পরমায়ুর নিছক একটা কার্বন কপি তিনি। চৈতন্য জাগ্রত হল কিন্তু বড় দেরিতে... বড় দেরিতে! আরব্ধ কর্ম সমাপন করার আগেই ফুরিয়ে এল পরমায়ু...

ঠিক এমনি একটা সংকটজনক শ্বাসরোধী নাটকীয় মুহূর্তে হনুমান জনক পবনদেবের গতিতে সোঁ সোঁ করে ছিটকে বেরিয়ে এলাম আমি। প্রবেশ করলাম কল্পনাতীত প্রকাণ্ড গম্বুজগহ্বরে। আমাকে দেখেই আর্ত চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, 'দীননাথ! দীননাথ! ব্লাস্টার আমাকে দাও!'

ব্লাস্টার হাতেই ছিল। কাছে গিয়ে দেওয়ার মতো সময়ও আর নেই তখন। দূর থেকেই ছুড়ে দিলাম তাঁর দিকে। বুড়োর হাড়ে যেন ভেলকি খেলে গেল শেষ মুহূর্তে। ক্রিকেট-টেস্টেও অমন দর্শনীয় ক্যাচ কেউ দেখেনি। শূন্যপথেই খপ করে ব্লাস্টার লুফে নিয়ে স্প্রিংয়ের মতো ঘুরে গেলেন বুড়ো বৈজ্ঞানিক এবং বর্ষণ করলেন শিলাখণ্ডের দিকে।

ভাইরাস-হুজুর তখন প্রস্তর-আলয় চৌচির করে বেরিয়ে আসছে বাইরে। যেন স্ফটিকপিণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ভেতরকার প্রচণ্ড প্রতাপে। পালানোর ফিকির এঁটেছে শয়তান শিরোমণি। চক্ষুগোলক হুতাশন-গোলকের মতোই দপদপ করছে প্রফেসরের সংহার মূর্তি দেখে!

প্রফেসর তখন অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে থর থর করে। নিস্তেজ হয়ে এসেছে দুই চক্ষুর হীরকদ্যুতি। সেই অবস্থাতেই চৌচির-হয়ে-আসা প্রস্তর-আলয় লক্ষ্য করে দেহের সর্বশক্তি দিয়ে ব্লাস্টার নিক্ষেপ করে বুকফাটা হাহাকার করে উঠলেন শেষবারের মতো, 'দূর হ'! দূর হ'! দূর হ' আমার ব্রেন থেকে!' ব্লাস্টার খসে পড়ে গেল হাত থেকে। টলমল করে উঠলেন প্রফেসর। লুটিয়ে পড়লেন ভূতলে।

দৌড়ে এসে নতজানু হয়ে বসলাম তাঁর পাশে। আমার দেহও তখন বিশুষ্ক এবং দ্রুত ফেটে ফুটে চলেছে। সর্বাঙ্গে আবির্ভূত হচ্ছে ছোট বড় অজস্র ফাটল। গা হাত-পা চড়-চড় করছে। বেশ বুঝছি, অনাবৃষ্টিতে বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রদাহে মেদিনীপৃষ্ঠ যেমন ফেটে চৌচির হয়ে যায়, আমার অবস্থাও হচ্ছে তথৈবচ। সেই সঙ্গে অনুভব করছি ভয়ংকর পরিণতিটা— আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছি আমিও— চলচ্চিত্রের রুপোলি পর্দায় ছায়াছবি যেমন ফেড-আউট হয়ে একটু একটু করে মিলিয়ে যায় অনস্তিত্বের গর্ভে— আমার অবস্থাও হচ্ছে হুবহু সেইরকম। তা সত্ত্বেও রুদ্ধশ্বাসে আর্তকণ্ঠে বিষম উত্তেজনায় যেন শ্মশান-ক্রন্দন করে উঠলাম তাঁর কানের কাছে, 'প্রফেসর! প্রফেসর! বিদেয় হয়েছে কি হারামজাদা?'

অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন প্রফেসর। ভীমরুলের চাকের মতো শিলাখণ্ড তখন শতধাবিদীর্ণ— খণ্ড খণ্ড আকারে প্রক্ষিপ্ত চারিদিকে এবং অংশগুলো অবিশ্বাস্য বেগে রেণু রেণু হয়ে গিয়ে পরিণত হচ্ছে কৃষ্ণধূলিতে। কালো ধুলো উড়ছে, ধীরে ধীরে থিতিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ধূলির মেঘের মধ্যে ভাইরাস-কেন্দ্রিনের কোনও চিহ্নই নেই।

অতিকষ্টে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন প্রফেসর— ক্ষীণ কণ্ঠে, নিঃশ্বাসের স্বরে, মিলিয়ে যাওয়া বাতাসের সুরে বললেন কোনও মতে, 'অশ্রুনালি... অশ্রুনালি...!'

ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু আমার দু'বাহুর মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন

উনি। পড়ে রইল কেবল ধড়াচূড়া। সেকেন্ড কয়েক পরেও তা-ও শূন্যতার শোষণে আকৃষ্ট হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

এরপরই অদৃশ্য হলাম আমি নিজে। আমার তখনকার অনুভূতি বর্ণনা করে খরস্রোতা এই কাহিনিতে ভাসমান পাঠক-পাঠিকাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে আর চাই না। তবে তারা অনুমান করে নিতে পারে, আমার অবয়ব বিলীন হয়ে যাওয়ার পর পড়েছিল ছুরি, ব্লাস্টার আর পোশাকগুলো ক্ষণেকের জন্য। তারপর তাও হারিয়ে গেল অনস্তিত্বের গর্ভে। অনচ্ছ, অস্পষ্ট হয়ে এসে বিলীন হল শূন্যে। আসল আমি আর প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তখনও লড়ছি আর ধস্তাধস্তি করছি রিসার্চ হসপিটালে— আমাদের কার্বন-কপিদের কিন্তু আর কোনও অস্তিত্বই রইল না।

রুধিরবর্ণ লোহিতকায় চকচকে একটা বস্তু কেবল পিছলে গড়িয়ে ধেয়ে গিয়েছিল প্রফেসরের মন-গহ্বরের মেঝে দিয়ে... অশ্রুনালি অভিমুখে।

আইসোলেশন ওয়ার্ড।

প্রফেসরের মুখাবয়ব লালচে কর্কশ তারের মতো শক্ত লোমে প্রায় ছেয়ে এসেছে। এক চোখের কোণে টল টল করে উঠল একবিন্দু অশ্রু। প্রস্তুত হয়েই ছিলেন কৌ। এইটুকু সময়ের মধ্যেই ভাইরাস সংক্রমণে তিনিও রূপান্তরিত হয়েছেন নরাকার দানবে। মুখমণ্ডল ছেয়ে গেছে লালচে কর্কশ শক্ত তারের মতো লোমে। কাচের রডে অশ্রুবিন্দু ধরে নিয়ে চালান করলেন একটা কাচের ডিশে।

আসল মু সবুজাভ অঙ্গার চক্ষু মেলে যেন অগ্নিবর্ষণ করল অশ্রুবিন্দুটার ওপর। বললে চাপা হিংস্র গলায়, ‘ধ্বংস করুন! এখুনি ধ্বংস করুন হতভাগাদের!’

মাথা নাড়লেন কৌ, ‘না। কী কী ঘটল ভেতরে, আগে তা জানা দরকার। পূর্ণ অবয়ব ফিরিয়ে দেওয়া দরকার সেই কারণেই। সময় থাকতে থাকতেই জেরা করে বার করে নিতে হবে সব খবর।’

কথা বলতে বলতে ডিশটাকে বয়ে নিয়ে গেলেন ক্লোনিং বুথে। প্রফেসর যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেইভাবে কন্ট্রোলের হাতল ধরে ঠেলে দিলেন উলটোদিকে। সুইচ টিপে মেশিন চালু করে দিয়ে পিছিয়ে এলেন তফাতে।

মেঘমন্দ্র গুঞ্জন ধ্বনি জাগ্রত হল মেশিনের মধ্যে। যেন লক্ষ ভীমরুল ধেয়ে আসছে, লক্ষ শব্দ সৃষ্টিকারী পতঙ্গ আকাশবাতাস তোলপাড় করছে। তার পরেই বুথের ভেতরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল একটা আকৃতি।

হ্যাঁ, একটা আকৃতি। একটা আকারহীন আকারও বলা চলে। কেননা, সে আকার আমার নয়, প্রফেসরেরও নয়... পার্থিব কোনও মনুষ্যকারই নয়... কথিত আছে, রামের জন্য সেতুবন্ধকালে নল-বানরকে সৃষ্টি করেছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও তিনি এহেন মূর্তি সৃষ্টি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ...

বুথের মধ্যে সেই সৃষ্টিছাড়া আকারটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। একই সময়ে ভাইরাস-সংক্রমণের যাবতীয় লক্ষণও মুছে যেতে লাগল শায়িত প্রফেসরের কলেবর থেকে

অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে। দেখতে দেখতে পুরোপুরি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হলেন তিনি। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত হয়ে গেল আগের মতো— আদি এবং অকৃত্রিম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ফিরে এল প্রভঞ্জন বেগে— পরিবর্তনটা এমনই আকস্মিক এবং বিস্ময়কর যে চক্ষুকর্ণ দিয়ে দেখেও যেন প্রত্যয় হয় না। উন্মুক্ত হল দু'চোখের পাতা। স্বাভাবিক সুস্থ চোখে দৃষ্টিপাত করলেন ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে। সতর্ক, হুঁশিয়ার চাহনিতে আবিলতার লেশমাত্র নেই।

বুথের দরজা খুলে ধরল মু। শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়, বিস্ময় যুগপৎ যেন বিনয়ের অবতারে পরিণত করল তার হিংস্র আকৃতিকে। সাক্ষাৎ ভগবান বুঝি দর্শন দানে ধন্য করেছে ভক্তকে। কৃতার্থ মু অবিকল সেই ধরনের ভক্তিভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ধীরপদে নতমস্তকে পেছিয়ে এল বুথের সামনে থেকে।

শুধু কি ভক্তি? ভয় জিনিসটাও আচ্ছন্ন করে তুলেছিল মু-এর মতো কাঠগোঁয়ার বেপরোয়া অমানুষটাকেও। নইলে অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে কেন? কেন সবুজাভ অঙ্গারসম চক্ষু প্রত্যঙ্গ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে আসবে নিরতিসীম আতঙ্কে?

বুথের ভেতরটা পুরোপুরি ভরে উঠেছে বীভৎস একটা আকৃতিতে। সে আকৃতি এমনই কদর্য এবং কিম্ভূতকিমাকার যে সহস্র বর্ণনা সত্ত্বেও মনে হয় অলীক, অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব। রুধির বর্ণে রঞ্জিত তার গাত্রবর্ণ। আকারে পূর্ণাবয়ব মানুষের মতো বিরাট। সমস্ত শরীরটা চকচকে। সর্বাঙ্গ থেকে আছড়ে আছড়ে পড়ছে অগুনতি শুঁড়— অনেকগুলো অক্টোপাসকে একত্র করলেও এহেন মূর্তিমান বিভীষিকা সৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রকাণ্ড গোলক-চক্ষু একটি নয়— একাধিক। সব ক'টি চক্ষুই ঘূর্ণিত হচ্ছে, দুলছে এবং নরকের অগ্নি যেন বর্ষণ করছে, আইসোলেশন ওয়ার্ডের চারিদিকে। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের অনুকরণ যন্ত্র বিপরীত দিকে সচল থাকায় অণু অবস্থা থেকে বিবর্ধিত হতে হতে বিরাটাকার প্রাপ্ত হয়েছে রৌরব-বিভীষিকা!

সিন্ধুর অতল থেকে যেন চাপা শব্দে বুদবুদ উঠে এল ওপরে— গুমগুম ঘর্ঘরে গলায় বললে কল্পনাতীত আতঙ্ক, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? দেখতে পাচ্ছ না নড়তে পারছি না? ধরে বার করো!'

অগ্রসর হল মু— সঙ্গে আর একজন সংক্রামিত স্যাঙাৎ। দু'জনেরই পা টলছে ভয়ে।

এমন সময়ে বৃদ্ধ প্রফেসরের কণ্ঠে জাগ্রত হল বাসুকির গর্জন, 'কৌ!'

বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন কৌ। আঁতকে উঠে প্রফেসর প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর কর্কশ লোম ছাওয়া মুখাকৃতি। গুঙিয়ে উঠলেন শিহরিত স্বরে, 'কী সর্বনাশ!'

পরিতৃপ্ত কণ্ঠে কিন্তু বললেন কৌ, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখন হুজুরের গোলাম। তাঁর আদেশই আমার একমাত্র পথনির্দেশ— উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়।'

চোখ ফেরালেন প্রফেসর। বুথের ভেতর থেকে দু'জনে দু'পাশ থেকে ধরে অবর্ণনীয় আকৃতিটাকে তখন বাইরে বার করছে! ফুলে ফুলে উঠছে বীভৎস মূর্তিটা নিয়মিত ছন্দে— স্পন্দিত হচ্ছে ভয়াল ভঙ্গিমায়।

নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। ধীরে ধীরে অপরিসীম ঘৃণায় আকুঞ্চিত হল

চোখমুখ। প্রবল বিবমিষায় যেন শিউরে উঠলেন। বললেন তাচ্ছিল্যের সুরে, 'কী আশ্চর্য! এই অসহায় চিংড়িটা আপনাদের হুজুর?'

ঘ্যাক করে উঠল মু, 'চোপরাও! মুখ সামলে কথা বলবেন! ঝাঁকের কেন্দ্রিন উনি—'

'ভীমরুলের চাক বলো! পালের গোদাটা তো দেখছি ভীমরুলের চাইতেও অসুন্দর!'

তেড়ে এল মু, ধকধক করে জ্বলে উঠল অঙ্গারচক্ষু। কিন্তু ঢক ঢক গুম গুম শব্দে তাকে নিরস্ত করল কেন্দ্রিন, 'দাঁড়াও! নিয়ে চল আমাকে ওর কাছে!'

অনুচরসহ মু বীভৎস প্রাণীটাকে বয়ে নিয়ে এল খাটে লম্বমান প্রফেসরের সামনে। প্রফেসরের চোখদুটো যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র হয়ে গেল। ভেতরকার বৈজ্ঞানিক সত্তাটা সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ডবল অণুবীক্ষণ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল কাঁকড়া-চিংড়ি-অক্টোপাসের সমাহার বিদঘুটে জীবটাকে। দেখেশুনে মনে হল, ভারী গতর নিয়ে এর পক্ষে স্বইচ্ছায় সঞ্চরণ তো অসম্ভব, সিধে হয়ে থাকাও সম্ভব নয়— কেউ না ধরে থাকলে তালগোল পাকিয়ে এখুনি দলা পাকিয়ে যাবে যেন। যে হারে আকৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে মনে হয় সম্ভবত পূর্ণ আকৃতি এখনও পায়নি কদাকার কেন্দ্রিন। সময়কালে নিশ্চয় পরিপার্শ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে... শক্তি সঞ্চয় করে বলীয়ান হয়ে উঠবে...

ভেবেচিন্তে সুর নরম করে প্রফেসর বললেন, 'স্থূলজগতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না? বেশ তো ছিলে সূক্ষ্মজগতে।'

'আপাতত হচ্ছে, সয়ে যাবে যথা সময়ে,' প্রফেসরকে আশ্বস্ত করল কেন্দ্রিন।

'ভেবেছিলাম তোমাকে নিশ্চিহ্ন করেছি।'

'ভুল! ভুল! যে পথে বেরিয়ে আসবে ঠিক করেছিলে, সেইপথেই পালিয়ে এসেছি আমি— তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে।'

দারুণ ভাবনায় পড়লেন যেন প্রফেসর, 'মনের মধ্যে বসেছিলে তো— সব খবরই জেনে গেছিলে—'

'আবার ভুল করলে হে সময়াধিপতি! এ ভুলের দাম তোমার কাছে অনেকখানি। যাই হোক, কৃতজ্ঞ রইলাম তোমার কাছে তোমার এই ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজার যন্ত্রটার জন্যে।'

প্রফেসর গুম হয়ে রইলেন। পাঠকপাঠিকারা যারা টেলিভিশনের বা রেফ্রিজারেটরের ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের সঙ্গে পরিচিত, ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজার নামটা তাদের কাছে কিম্ভূত নাও মনে হতে পারে। ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে চতুর্থ মাত্রিক জগতে যাতায়াতের সময়ে এই যন্ত্রটি প্রফেসরের উদ্ভাবিত টাইম মেশিনে অপরিহার্য। নচ্ছার ভাইরাস-হুজুর খটমট এই নামটাও জেনে বসে আছে প্রফেসরের মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করে থাকার সময়ে।

ক্রূর কপট হাসিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড মুখরিত করে ফের বললে কদাকার প্রাণীটা, 'খুবই অবাক হয়েছ হে মূর্খাধিপতি টাইম-লর্ড! তোমার মস্তিষ্কের নাড়িনক্ষত্র জেনে তবেই তো বহিরাগমন করলাম— তোমার আর নিস্তার নেই।'

দাঁত কিড়মিড় (মানে, মাড়িতে মাড়ি ঘষে— বিষম রাগ হলে উনি ঘর্ষণ করেন— দাঁত তো নেই) করে প্রফেসর বললেন, 'বাক্যিচচ্চড়ি থামাও!'

ঘর প্রকম্পিত হল ভয়াল অট্টাহাস্যে, 'কথাগুলো উপাদেয় না লাগাই স্বাভাবিক হে গর্দভস্য গর্দভ। তোমারই যন্ত্র তোমার শত্রুকে আজ বড় সুখের আলয়ে এনে ফেলেছে। অণুজগতে আর ঘাপটি মেরে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে হবে না আমাকে। আমার এই ঝাঁক যখন পালে পালে ডিম ফুটে বেরুবে টাইটানে, আর তাদের অদৃশ্য অতি-ক্ষুদ্র প্রাণী আকারে থাকতে হবে না— দুর্বল হয়ে থাকতে হবে না— হবে পরম বীর্যবান মহাশক্তিধর, অবধ্য অজেয় প্রাণী! অজেয়! খেয়াল রেখো হে নির্বোধ সম্রাট! অজেয় হবে আমার ঝাঁক! মনুষ্যযুগ অন্তে পৌঁছেছে— এবার শুরু হল ভাইরাস যুগ!'

ঘৃণায় নাক সিঁটিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ওসব বাগাড়ম্বর আগেই শোনা হয়ে গেছে হে কীটাণুকীট ভাইরাস শিরোমণি! তোমার মতোই তোমার ঝাঁকেদের প্রতিটা বদ্ধ উন্মাদকে কী করে টিপে মেরে ফেলতে হয়, তা আমি জানি!'

ভাইরাস-সংক্রমণের আর একটা লক্ষণ হল সব ক'টা রিপু উগ্র হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় রিপু ক্রোধটাও ভাইরাস-গোলামদের ক্ষিপ্ত করে তোলে পান থেকে চুন খসলেই। মু-এর উন্মত্ত আচরণে এই লক্ষণ বারংবার প্রকাশ পেয়েছে। এবার প্রকাশ পেল কৌ-এর ক্ষিপ্ততায়। হুজুরকে হেনস্থা যে করে, তাকে তো আর বরদাস্ত করা যায় না। ক্রোধে যেন বর্ণ পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেললেন কৌ। ঝুঁকে পড়লেন প্রফেসরের ওপর। একটা বিজলি ফ্ল্যাশ লকলকিয়ে খেলে গেল তাঁর আর প্রফেসরের চারচোখের মধ্যবর্তী শূন্যতায়— পরক্ষণেই বিজলি রেখা প্রতিহত হয়ে ফিরে এল কৌ-এর দুই ভুরুর মাঝখানে। যেন অদৃশ্য সংঘাতে ঠিকরে যেতে যেতে কোনওরকমে সামলে নিলেন নিজেকে।

বিমূঢ় প্রফেসর মুহূর্তে বুঝলেন কী ঘটে গেল। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো বিপুল আশার প্লাবনে ভেসে গেল তাঁর নিরাশ অন্তরের দু'কূল। 'ইমিউন' হয়ে গেছেন তিনি! রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা এসে গেছে তাঁর মধ্যেও। ভাইরাস-সংক্রমণ আর সম্ভব নয়! স্বয়ং ভাইরাস-হুজুর তাঁর মস্তিষ্কে নিবাস রচনা করে তাঁকে এই রোগ প্রতিষেধক শক্তি দান করে গেছে নিজের অজান্তেই। সোজা কথায় ভ্যাকসিন নেওয়া হয়ে গেছে তাঁর। বিশেষ বিশেষ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে সেইসব রোগাক্রান্ত জীবের দেহ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই রোগের নিস্তেজিকৃত জীবাণুরস নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়ার নামই তো 'ভ্যাকসিনেশন' বা 'টিকা নেওয়া'। প্রথম গো-বসন্তের টিকা আবিষ্কার করে ড. জেনার মানবজাতির মঙ্গল করেছিলেন, বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর বিভিন্ন রোগজীবাণুর টিকা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রবর্তন করেছিলেন। প্রথম দিকে কেবল জীবিত রোগজীবাণু নিয়েই টিকা দেওয়া হত। সেই প্রক্রিয়ায় স্বয়ং ভাইরাস কেন্দ্রিন তাঁর শরীরে অবস্থান করে তাঁকে সেই টিকা দিয়ে এসেছে। এখন তিনি ভাইরাসের অবধ্য। তাঁর মনকে দখল করার আর কোনও শক্তি নেই ভাইরাসের! এ লড়াইয়ে এখন তিনি হবে অপ্রতিহত, অজেয়! পালটা মার দেওয়ার সময় হয়েছে এতক্ষণে!

কিন্তু বড়ই স্বল্পস্থায়ী হল তাঁর স্বস্তিবোধ। মু হতভাগা বিজলির পরাজয়-বরণ দেখেই স্থির করে নিয়েছিল পরবর্তী কর্তব্য। চরম সিদ্ধান্ত নিল সঙ্গে সঙ্গে। ক্রোধে বিবর্ণ মুখে লাফিয়ে এগিয়ে এল উদ্যত ব্লাস্টার হাতে।

বিকট চিৎকার করে উঠল ভাইরাস-হুজুর, 'না! না! এখন না? টাইটানের ঝাঁকের সামনে ফেলে দাও অপদার্থটাকে— ছিঁড়ে খাক ওরা!'

এর চাইতে বরং চকিত মৃত্যুও যে পরম বরণীয় ছিল প্রফেসরের কাছে!

১৭
বিষণ্ণ ওষুধ

দূরদর্শন শক্তিবলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছিলেন বিদুর। আমিও আইসোলেশন ওয়ার্ডের বিস্ময়কর ঘটনাবলি জ্ঞাত হলাম ক-৫-এর ইলেকট্রনিক মগজের দৌলতে।

আমি তখন দাঁড়িয়ে আছি লকার-পাল্লার দর্পণের সামনে। সপ্রশংস চোখে নিজেই নিজেকে তারিফ করছি। রিসেপশন কক্ষে এই ফার্স্ট-এইড লকারের পাল্লা জোর করে ভেঙেছি একটু আগে। ভাইরাস সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যত কিছু মলম আর ড্রেসিং প্রয়োজন হয়, এলোপাতাড়ি ভাবে সেইসবের মধ্যে থেকে নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছি। ডাক্তারের পরিচ্ছদ অঙ্গে সংস্থাপন করেছি। ছদ্মবেশ এখন সম্পূর্ণ।

সহর্ষে জিজ্ঞেস করলাম ক-৫-কে, 'কীরকম লাগছে বলো তো আমাকে?'

প্রশ্নের তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারল না ক-৫। বললে সংক্ষেপে, 'বন্ধু।'

পরিচ্ছদের তলায় লুকোনো ব্লাস্টারটা হাত বুলিয়ে পরখ করে নিয়ে বললাম, 'কেন্দ্রিন ব্যাটাচ্ছেলের ধারেকাছেও যদি পৌঁছোতে পারি, বন্ধুত্ব কাকে বলে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব।'

টংকারকণ্ঠে সতর্কবাণী উচ্চারণ করল ক-৫, 'প্রভু, শত্রুরা আসছে এদিকে। সঙ্গে আছেন প্রফেসর।'

চকিতে একটা দরজার আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়ালাম দুজনে।

মূল অলিন্দ বরাবর অগ্রসর হচ্ছে অসাধারণ একটা শোভাযাত্রা। পুরোধা প্রাণী হল ভাইরাস-হুজুর স্বয়ং। মু আর তার স্যাঙাৎ দু'পাশ থেকে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে চলেছে। ফুলে ফুলে উঠছে তার কদাকার আকৃতি— আত্যন্তিক স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে মুহুর্মুহু। সঘন নিশ্বাস বুদবুদের মতো গুব গুব শব্দে ফেটে পড়ছে গলার মধ্যে। যেন পিপেভরতি তরল পদার্থ ছলকে ছলকে উঠছে নড়াচড়ার ফলে।

ঠিক পেছনেই হসপিটাল ট্রলিতে শুইয়ে প্রফেসরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে জান্তব চেহারার ড. কৌ।

অধীর কণ্ঠে বুদবুদ কাটা শব্দে ঘর্ঘর করছে কেন্দ্রিন মহাপ্রভু, 'সত্বর করো! বিলম্ব কোরো না! ডিম পাড়ার সময় হয়েছে নিকট! ভেক আর মৎস্যের ন্যায় রাশি রাশি ডিম পাড়ব! ত্বরা করে নিয়ে চল টাইটানের ডিম পাড়ার নির্দিষ্ট আঁতুড়ঘরে!'

পঞ্চাশের দশকের এক প্রবন্ধে বহুরূপী নাট্যসংস্থার প্রাতঃস্মরণীয় শম্ভু মিত্র একটা

চমৎকার শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, 'কণ্ঠ-বাদন'! ভাইরাসের কণ্ঠ-বাদন শুনলে নিশ্চয় আর একটা নতুন নাম তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে এসে যেত— কণ্ঠ-জগঝম্প! বিশ্বের সবকটা উদ্ভট বাদ্যযন্ত্র এক সঙ্গে বেতাল বেসুরে বাজলেও বোধহয় এরকম অপূর্ব কর্ণপটহবিদারী শব্দ সৃষ্টি সম্ভব হত না। বিচিত্র এই কণ্ঠ-বাদন ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই— আমার অক্ষমতার জন্য পাঠকপাঠিকারা যেন আমাকে ক্ষমা করে।

দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও কৌ-এর শাণিত দৃষ্টি এড়াতে পারিনি। অপাঙ্গে আমাকে দেখে নিয়েই হেঁকে উঠলেন কর্কশ কণ্ঠে, 'ডাক্তার, আসুন চটপট! হুজুরকে সাহায্য করতে হবে আমাকেই— আপনি ট্রলি ঠেলুন।'

মহাফাঁপড়ে পড়লাম। ছদ্মবেশ আমার সার্থক নিঃসন্দেহে। নইলে ডাক্তার বলে আমাকে ভুল করবেন কেন কৌ। আমাকে যে চিনতে পেরেছেন, এরকম কোনও লক্ষণই দেখালেন না। কতকটা আমার ছদ্মরূপের মহিমায়, কতকটা বোধহয় আত্মম্ভরিতার দরুন। যে অমানুষটা নিজেকে হুজুরের দক্ষিণ হস্ত মনে করে, সে কুচোকাচা নগণ্য ডাক্তারদের খুঁটিয়ে দেখতে যাবে কেন? প্রেস্টিজ নেই? কাজেই আমার হাতে ট্রলি সঁপে দিয়ে তিনি ছুটে গেলেন মু আর স্যাঙাতের পাশে— ধরাধরি করে নিয়ে চললেন বাগ্মী কেন্দ্রিনকে— লেকচারের বিরাম নেই ব্যাটাচ্ছেলের— সমানে গজ গজ করে অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে! বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে! ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায়, রাশি রাশি ডিম ছাড়ার সময় হয়েছে নিকট... অতএব...

চোখে চোখ রাখলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। বললেন ফিসফিস করে, 'ওহে দীননাথ, তোমার নকল ভুরু যে ঝুলে পড়ল!'

'চু-উ-উপ!' ভুরুটা টিপে টুপে বসিয়ে নিয়ে ঝটপট ছুরি বার করে ঘচাঘচ করে কাটতে লাগলাম প্রফেসরের বাঁধন।

টাইম মেশিন যে ঘরে পরিত্যক্ত, সেই ঘরের সামনে আসার আগেই বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলেন প্রফেসর।

এক ঝটকায় ট্রলি ঘুরিয়ে নিলাম টাইম মেশিনের ঘরের দিকে।

ঘুরে দাঁড়ালেন কৌ, 'ডাক্তার, ওদিকে নয়!'

কিন্তু তখন আর বাধা দেওয়ারও সময় নেই। তড়াক করে ট্রলি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন প্রফেসর, ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ঢুকে গেলেন ভেতরে। ক-৫ কোত্থেকে ঝড়ের বেগে এসে সাঁত করে খোলা দরজা দিয়ে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। গুরুভার ভাইরাস-হুজুরকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল বলে ঝপ করে পেছন নেওয়া সম্ভব হল না কৌ আর মু-এর পক্ষে। দল থেকে বেরিয়ে এসে ব্লাস্টার তুলে ধরল মু। কিন্তু তার আগেই ব্লাস্টার চলে এসেছে আমার হাতে, ট্রিগারও টিপলাম সঙ্গে সঙ্গে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম বটে, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত করে দিলাম মু-কে। সাঁই সাঁই করে তেজঃপুঞ্জ ধেয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। পরক্ষণেই লাফ দিয়ে ঢুকে পড়লাম টাইম মেশিনের ঘরে— দরজা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে।

পাল্লায় কান পেতে শোনারও দরকার হল না। শুনলাম মেদিনীকাঁপানো হুংকার ছাড়ল মু, 'পালাল! পালাল!''

'পালিয়ে যাবে কোথা?' শোনা গেল হুজুরের কণ্ঠ-জগঝম্প, 'ফাঁদে পড়েছে। ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজার না থাকলে টাইম মেশিন নড়বে না। কৌ, তুমি টহল দাও এখানে— প্রফেসর যেন পলায়ন করতে না পারে। প্রফেসর বেরিয়ে এলেই বলপূর্বক তাকে আনয়ন করো টাইটানে।'

দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল কণ্ঠ-জগঝম্প! ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায় ডিম পাড়ার জন্যে আকুলি বিকুলি ক্ষীণতর হয়ে স্তব্ধ হল এক সময়ে।

ডাক্তারের ছদ্মবেশ গা থেকে খসিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি।

বললাম, 'প্রফেসর, বলুন এবার কী হুকুম।'

গুম হয়ে রইলেন প্রফেসর। তাড়া লাগিয়ে বললাম, 'কী হল? বলুন কী করতে হবে?'

বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'কিছুই করার নেই। এখন।' একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন দেওয়ালে লাগানো আলোকিত টেলিভিশন পরদার মতো একটা স্ক্রিনের দিকে। চেয়ে রইলাম আমিও। দেখলাম রিসার্চ হসপিটালের এয়ারলক দেখা যাচ্ছে। একটা রকেটযান দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আকারে ছোট। অল্প পথ পাড়ি দেওয়ার যান নিশ্চয়। হাসপাতাল থেকে টাইটানে তো হামেশাই যাতায়াত করতে হয়— তার ব্যবস্থা।

সহসা দলবলসমেত এয়ারলক খুলে বেরিয়ে এল ভাইরাস-হুজুর— উঠল যন্ত্রযানে। বন্ধ হয়ে গেল এয়ারলকের দরজা।

অস্থির হয়ে বললাম, 'প্রফেসর, এখনও সময় আছে। এখনও যদি ওদের আগে টাইটানে পৌঁছোতে পারি, কদাকার জানোয়ারটাকে নিকেশ করতে পারব!'

'না, পারব না। ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজার ফেলে এসেছি আইসোলেশন ওয়ার্ডে— ওই জিনিস ছাড়া টাইম মেশিন একচুলও নড়বে না।'

'তা হলে কি ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে থাকব?' বিশ্বকর্মার প্রস্তুত করা শ্রীক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মূর্তি হতে হবে আমাকে, এই কল্পনায় অস্থির-পঞ্চম হয়ে উঠলাম আমি।

আমার হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো নৃত্য যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন প্রফেসর। তারপর ক-৫-কে ডেকে বললেন, 'ওহে ছোকরা, শোনো তো এদিকে।'

ক-৫ তখন ভীষণ ব্যস্ত। টাইম মেশিনের চারপাশে চাকার ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে জটিল যন্ত্রপাতিগুলো দেখছে, শুঁকছে, শুঁড় বুলিয়ে পরখ করছে। স্পষ্টত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। অথবা, চমৎকৃত হয়েছে। ভাবাবেগ জিনিসটা রোবটদের সার্কিটে তো থাকে না। প্রফেসরের অমায়িক আহ্বান শুনে মেশিন-পর্যবেক্ষণ স্থগিত রেখে গড় গড় করে এসে দাঁড়াল সামনে, 'হুকুম করুন, প্রভু।'

কী যেন ভাবতে ভাবতে প্রফেসর বললেন, 'বাইরে যেতে পারবে?'

'পারব।'

'কৌ-কে সরষেফুল দেখাতে পারবে?'

'ব্যাখ্যা করুন। সরষেফুল কী জিনিস?'

'জ্বালালে দেখছি। ওটা একটা বিশেষ শব্দগুচ্ছ— যার মানে মাথায় চোট পাওয়া— অজ্ঞান হওয়া। চোখে তারার ঝলক দেখা।'

'তথাস্তু। আমার অস্ত্রশালায় চার স্তরের অস্ত্র মজুদ আছে। বধ করার, অজ্ঞান করে দেওয়ার, পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেওয়ার—'

'তাই নাকি? তাই নাকি? তা হলে বাবা, বধ-টধ আর করতে যেয়ো না। ধাঁই করে মেরে কেবল অজ্ঞান করে দাও। কেমন? কৌ-কে আমার দরকার আছে।'

'তথাস্তু!'

'গুড ডগ।'

স্ক্যানার স্ক্রিনের দিকে ফের চোখ তুললেন প্রফেসর। রিসার্চ হসপিটালের সমস্ত অঞ্চলের দৃশ্য তন্নতন্ন করে পরিদর্শন করে চলেছে এই গোয়েন্দা-যন্ত্র, সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করছে, কোথাও কোনও গতানুগতিকতা বহির্ভূত ঘটনা ঘটলেই পরদায় ফুটিয়ে তুলছে। ক্ষণপূর্বে এই কারণেই এয়ারলকে ভাইরাস-হুজুরের মিছিল দেখা গিয়েছিল। এবার দেখা গেল টাইম মেশিনের ঘরের সামনের অলিন্দের দৃশ্য। ছটফট করছেন কৌ। পায়চারি করছেন। সারামুখে প্রকটিত জান্তব জিঘাংসা। অমায়িক সৌম্যদর্শন সেই কৌ-কে আর চেনাই যায় না। কিছুক্ষণ এইভাবে পদচারণা করার পর অগ্রসর হলেন রিসেপশন ডেস্ক অভিমুখে।

অমনি হুকুম ছাড়লেন প্রফেসর, 'বেরিয়ে যাও, ক-৫!' বলেই নিজেই ছিটকে গিয়ে তড়িঘড়ি খুলে দিলেন দরজা— গড়গড় করে চক্রপদে অন্তর্হিত হল ক-৫।

স্ক্যানার স্ক্রিনে দেখা গেল রিসেপশন ডেস্ক মাইক্রোফোনের সামনে উপবিষ্ট রয়েছেন কৌ। বলছেন, 'ড. কৌ বলছি... রিসেপশনের সিনিয়র স্টাফ সবাই শুনুন...'

ঠিক এই সময়ে স্ক্রিনে আবির্ভূত হল ক-৫। গড়িয়ে চলেছে কৌ-এর দিকে। শীতল চোখে তাকে নিরীক্ষণ করলেন কৌ। ভাইরাস-সংক্রামিত হওয়ায় তাঁর আর তখন বোঝবার ক্ষমতাও নেই কুকুরের চেহারায় কম্পিউটার সৃষ্টি কেন করেছেন তিনি— সেই সেন্টিমেন্টের বালাই আর নেই বলেই কড়াগলায় বললেন, 'ক-৫, তোমাকে আর দরকার নেই আমার—'

ক-৫-এর চোঙ থেকে বিচ্ছুরিত হল এক ঝলক হলুদ দ্যুতি। মুখ থুবড়ে ধরণী আশ্রয় করলেন কৌ— মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বেরল না।

দরজা খুলে বাঁই বাঁই করে দৌড়ে গেলাম আমি আর প্রফেসর। সে কী দৌড়! প্রফেসরের স্পিড দেখে মনে হল যেন জিরাফ দৌড়োচ্ছে। পায়ে যেন একাধিক জয়েন্ট আছে। আমার আগেই পৌঁছে গেলেন রিসেপশন কক্ষে। পেছন ফিরে হেঁকে বললেন, 'ট্রলিটা নিয়ে এসো।' ট্রলি ঠেলে নিয়ে এলাম চক্ষের পলকে। কৌ-কে ধরাধরি করে তুলে ফেললাম তার মধ্যে। করিডরে এসে ছুটতে ছুটতে ট্রলিসমেত কামানের গোলার মতো ঢুকে পড়লাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে। বিষম ব্যস্ততায় মুহূর্তের মধ্যে যেন বিস্ফারিত হলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। মা দুর্গার মতো যেন দশ হাতে কাজ করে চললেন ঝড়ের বেগে। নিজের আঙুল থেকে রক্তের নমুনা নিলেন, স্লাইডে রাখলেন, আমার দিকে ফিরলেন।

'এবার তোমার পালা, দীননাথ! আঙুলটা বাড়াও— তাড়াতাড়ি! আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না!'

বচন শুনে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। একটু আগেই গড়িমসি করছিলেন— এখন আর তর সইছে না। বাড়িয়ে দিলাম আঙুলটা। স্ক্যালপেল দিয়ে কচ করে আঙুলের ডগা চিরে দিলেন প্রফেসর। 'উঃ!' করে উঠলাম আমি।

দন্তহীন মুখখানা সুমিষ্ট হাসিতে ভরিয়ে তুলে প্রফেসর বললেন, 'ভয় কী? এতবড় পালোয়ান তুমি— একফোঁটা রক্ত দিতেও প্রাণ বেরিয়ে গেল?'

'তাড়াতাড়ি করুন না!' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললাম আমি। তারপর রক্তমাখা তর্জনীটা মুখে পুরে চুষতে লাগলাম জ্বালা কমানোর জন্যে।

কম্পিউটারচালিত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে আমার আর ওঁর নিজের রক্তের নমুনা মাখানো দু'খানা কাচের স্লাইড পাশাপাশি ঢুকিয়ে দিলেন প্রফেসর।

আঙুল চুষতে চুষতে হতবুদ্ধির মতো তাঁর কাণ্ড দেখতে দেখতে বললাম, 'একটু আগেই তো এসব হয়ে গেছে?'

'তখন আমার মধ্যে ভাইরাস ছিল— এখন আমি 'ইমিউন'— রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা এসে গেছে আমার মধ্যে। তুমি আর আমি যখন আমার মাথার মধ্যে অভিযান চালাচ্ছিলাম, নিশ্চয় তখন কিছু একটা ঘটেছে। আমি জানতে চাই সেটা কী!' মাইক্রোস্কোপ স্ক্রিনের সুইচ 'অন' করলেন প্রফেসর। তন্ময় চোখে আলোকোজ্জ্বল রেখাচিত্রগুলো পড়ে গেলেন। বললেন হৃষ্ট কণ্ঠে, 'বোর বুঝেছি! ইন্টারেস্টিং! রিয়ালি ইন্টারেস্টিং!'

স্ক্রিনে তখন ঝিলিমিলি আলোর খেলা চলছে। অজস্র আলোকপ্যাটার্ন ইলেকট্রনিক স্পিডে আসছে, আকার পরিবর্তন করছে, ছোট হচ্ছে, বড় হচ্ছে দ্রুত ধেয়ে যাচ্ছে, দূর থেকে ছুটে এসে বিরাট হতে হতে যেন চোখের ওপর আছড়ে পড়ছে। প্যাটার্ন পরিবর্তনের সেকী স্পিড! চেয়ে থাকতে থাকতে যেন চোখে ধাঁধা লেগে যায়, পা টলতে থাকে, মাথা ঘুরতে থাকে। যেন একটা ভীষণবেগে চলমান বায়ুযানে আসীন আমি, আশপাশ দিয়ে নক্ষত্রবেগে হরেক রকম প্যাটার্নের পর প্যাটার্ন ছুটে এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে... আবার আসছে... আবার আসছে... শেষ নেই... বিরাম নেই...

মাথা ঘুরে গেল আমার। রেখাচিত্রের ভাষা বোঝার ক্ষমতা আমার মোটা মগজে নেই। তাই হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, 'প্রফেসর! প্রফেসর! মানে বুঝিয়ে দিন!'

নিবিষ্ট দৃষ্টি মেলে ধরে প্রফেসর আত্মস্থ কণ্ঠে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আমার ব্লাড স্যাম্পল আর তোমার ব্লাড স্যাম্পেলের প্যাটার্ন একরকম হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ না?'

'না, না, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সব প্যাটার্নই তো আলাদা।'

'তোমার মুণ্ডু!' এবার বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল প্রফেসরের, 'ওই যে বঁড়শির মতো একটা আকৃতি দেখছ না? কিলবিল করছে? ওই হল অ্যান্টিবডি।'

'অ্যান্টিবডি!'

পূর্ণচোখে এবার আমার দিকে তাকালেন প্রফেসর, 'দীননাথ, তোমার মতো আকাট মূর্খ আমি খুব কম দেখেছি।'

মুখ চুন হয়ে গেল আমার! কিন্তু সত্যিই তো আমি জানি না অ্যান্টিবডি কাকে বলে।

প্রফেসর বললেন, 'ইমিউনিটি কাকে বলে, তাও নিশ্চয় জানো না। ইমিউনিটি হল

রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা। এরকম ক্ষমতা স্বাভাবিক বা জন্মগতও হতে পারে। আবার ভ্যাকসিন, টিকা ইত্যাদি প্রয়োগেও জন্মানো যায়। এই রোগ-প্রতিরোধ শক্তির তারতম্যের জন্যেই একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় থেকেও কেউ রোগাক্রান্ত থাকে, কেউ বা সুস্থ থাকে। বুঝলে?'

'হ্যাঁ।'

'এই ভাইরাস তোমাকে রোগাক্রান্ত করতে পারেনি, কেননা তোমার ইমিউনিটি জন্মগত— মস্তিষ্ক এত কম যে বুদ্ধি প্রায় নেই বললেই চলে। ভাগ্যক্রমে এই বিপদে সেটাই শাপে বর হয়েছে— তোমার যে ইমিউনিটি আছে, আমার ছিল না। কেন না, আমার মস্তিষ্ক—'

'জানি, জানি। কিন্তু অ্যান্টিবডি—'

'বলছি। বাগড়া দিয়ো না। বিভিন্ন রকমের রোগ প্রতিরোধক ইমিউনিটি স্বরূপ জীবের রক্তে রোগ-জীবাণু ঢুকলে স্বভাবতই যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদেরকেই বলা হয় অ্যান্টিবডি। রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুরা এদের প্রভাবে বিনষ্ট হয়, বা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় জীবাণুদের বিষ-রস নির্বিষ হয়ে পড়ে। মহামান্য এই অ্যান্টিবডি তোমার রক্তে ছিল আগে থেকেই— এখন দেখছি আমার রক্তেও তার আবির্ভাব ঘটেছে— আগে কিন্তু ছিল না।'

'কিন্তু আমার অ্যা-অ্যান্টিবডি আপনার রক্তে ঢুকল কী করে?'

'খুব সহজে, মূর্খ, খুবই সহজে। প্রশ্নটা নিজেই নিজেকে করলে জবাব পেয়ে যেতে। তোমার ক্লোন তো ঢুকেছিল আমার দেহে?'

'হ্যাঁ ঢুকেছিল।'

'তোমার ক্লোন তো তোমারই টিসু থেকে তৈরি হয়েছিল?'

'তা তো বটেই।'

'অত পণ্ডিতের মতো মাথা নেড়ো না। পণ্ডিতমূর্খ কোথাকার! তোমার সেই টিসু মিশে গেছে আমার রক্তে, ইমিউনিটি চালান হয়ে গেছে আমার মধ্যেও।'

'অ।'

'আবার 'অ' বললে? মানে, কিছু বোঝোনি?'

'না, না, বুঝেছি। আমার ইমিউনিটি পেয়ে আপনি এখন বর্তে গেছেন।'

খোঁচাটা গায়ে মাখলেন না প্রফেসর। বললেন, 'এখন একটাই কাজ করতে হবে আমাদের। আলাদা করতে হবে এই অ্যান্টিবডিকে, বিশ্লেষণ করতে হবে, নকল বানাতে হবে, কৌ-এর দেহে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তা হলে ও সুস্থ হলে, বাকি সবাইকেও একই ভাবে সারিয়ে তুলতে পারবে।'

'এত সহজ?' সত্যিই মন মানতে চাইল না প্রফেসরের পরিকল্পনায়। এত সহজে নচ্ছার ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে? আমারই— ইমিউনিটির দৌলতে? আমারই মূর্খতার অ্যান্টিবডির কাছে হার মানবে ভাইরাসের প্রবল পরাক্রম? ভাবতেও গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল— অবিশ্বাস্য! অসম্ভব!

বললাম, 'ভাইরাস হুজুর? সে ব্যাটা তো পার পেয়ে যাবে। টাইটানে তো সে এখন, ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায় লাখে লাখে ডিম পেড়ে চলেছে।'

'একটা একটা সমস্যার সুরাহা করা যাক। অত হড়বড় কোরো না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম! আগে নিজেদের বাঁচাই, তারপর ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায় ডিম পাড়ার গুষ্টিতুষ্টি করা যাবে খন।'

ভেকের ন্যায় মৎস্যের ন্যায় নির্বোধ চাহনি মেলে রইলাম আমি!

রিসার্চ হসপিটালের যন্ত্রযান তখন বেগে ধেয়ে চলেছে টাইটান অভিমুখে। পাশে লাল রেডক্রশ দেখা যাচ্ছে। ভেতরে ঠাসা বিচিত্র আরোহী। মু কন্ট্রোলে বসে যন্ত্রযান চালাচ্ছে। কেন্দ্রিন মহাপ্রভু ত্বরণ-কোচে আড় হয়ে পড়ে আছে। অ্যাক্সিলারেশন বললে হয়তো ইংরাজি মিডিয়ামের পাঠকপাঠিকারা বুঝতে পারবে। চলমান বস্তুর গতিবৃদ্ধির হারকে বলে অ্যাক্সিলারেশন। গতিবেগের এই ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেশন প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে ৩২ ফুট হারে বাড়ে। না বাড়লে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি প্রভৃতির গতি হবে স্থির, অর্থাৎ প্রারম্ভিক গতি বরাবর একই থাকবে। রকেটযানের আরোহীরা এই প্রচণ্ড ধাক্কা সইবার জন্যে নরম কোচে শুয়ে পড়ে— মনে হয় যেন হাড় পর্যন্ত মড় মড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে— সারা দেহ থেঁতলে যাচ্ছে। ভাইরাস-হুজুরের অবস্থাও হয়েছে তাই। অ্যাক্সিলারেশন কোচে পড়ে থেকেও খাবি খাচ্ছে ভীষণ ভাবে স্পন্দিত হচ্ছে বিপুল কলেবর— এই বুঝি থেঁতলে চটকে একাকার হয়ে গেল। চারপাশ থেকে গোলামবৃন্দ ধরে রেখেছে তাকে, সভয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার তো নেই। ওই অবস্থাতেই কিন্তু যন্ত্রযান নিনাদিত হচ্ছে তার কণ্ঠ জগঝম্প— 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! উল্লুকের বাচ্চা, আরও তাড়াতাড়ি চালা!'

গোলামদের সঙ্গে এইভাবেই কথা বলার রেওয়াজ। সুতরাং গণতন্ত্রের যুগের সমানাধিকার চেতনাসম্পন্ন পাঠকপাঠিকারা যেন শিউরে না ওঠে। ভাইরাস-হুজুর ব্রহ্মাণ্ড অধিপতি হলে এর চাইতেও জঘন্য গালাগাল আর অত্যাচারের জন্যে যেন প্রস্তুত থাকে মানবজাতি।

কিন্তু যন্ত্রযান তো পুরোদমেই ছুটছে! আর কত জোরে ছুটবে? 'উল্লুকের বাচ্চা' সম্বোধনে পরম-আপ্যায়িত হয়ে মু তাই বললে, 'এর চেয়ে বেশি জোরে যাওয়ার আর সম্ভব নয়, হুজুর। মোটর জ্বলে যাবে।'

'যাক! জ্বলে যাক! টাইটানে আগে পৌঁছোই, তারপর ট্যাঙ্ক ভরতি থুক থুক করবে আমার ডিম! অহো! অহো! ক'টা ট্যাঙ্ক রেডি রেখেছ?'

'হুকুম দিয়ে দিয়েছি। অনেক।'

'তাড়াতাড়ি! আরও তাড়াতাড়ি রে গাধার বাচ্চা!'

'প্রফেসরের কী হবে?'

'কৌ ওকে খাঁচায় পুরে নিয়ে আসবে টাইটানে। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! সব জ্বালানি ঢেলে দে! তাড়াতাড়ি চ' না রে শু—'

এই গালাগালটা লেখার অযোগ্য বলে আর 'রিপিট' করলাম না।

বিনীতভাবে স্পিড-কন্ট্রোলের লিভারটা সামনে ঠেলে দিল মু। ভীষণ গর্জনে ছুটন্ত তারার মতো ছিটকে গেল যন্ত্রযান— থরথর করে কেঁপে উঠল ছোট্ট কেবিনখানা।

আমি আর প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সেই মুহূর্তে মহা উদ্বেগে ঝুঁকে রয়েছি ড. কৌ-এর ওপর। কিছুক্ষণ আগেই বিষঘ্ন ওষুধ ফুঁড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর শরীরে। প্রতিক্রিয়া দর্শনের অভিলাষে এই সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

আচমকা লক্ষণটা দৃষ্টিগোচর হল আমারই চোখে। চাপা গলায় বললাম বিষম উত্তেজনায়, 'প্রফেসর! প্রফেসর! দেখেছেন?'

অবিশ্বাস্য গতিবেগে ভাইরাস-সংক্রমণের বাহ্যিক লক্ষণ তিরোহিত হচ্ছে কৌ-এর মুখমণ্ডল থেকে। বীভৎস ভুরু, কর্কশ লোম— হু হু করে যেন সেঁধিয়ে গেল শরীরের মধ্যেই। অচিরেই পূর্বাবস্থা ফিরে পেলেন কৌ।

জয় হোক আমার অ্যান্টিবডির! ইচ্ছে হল তুরুকনাচ নাচি!

কৃতিত্বটা কিন্তু অম্লানবদনে ছিনিয়ে নিলেন প্রফেসর। বললেন হৃষ্ট কণ্ঠে, 'বুঝলে হে দীননাথ, মাঝে মাঝে নিজেই চমকে যাই আমার প্রতিভা দেখে।'

দিতাম একখানা জবর জবাব, কিন্তু সময় পেলাম না। চোখ খুললেন কৌ। আবিল চোখে আচ্ছন্নের মতো পিটপিট করে প্রথমে তাকালেন আমার দিকে, তারপর প্রফেসরের দিকে।

বললেন স্খলিত কণ্ঠে, 'কী ব্যাপার বলুন তো?' বলতে বলতে উঠে বসলেন খাটের ওপর। চারপাশ দেখে নিলেন। 'আমার নার্স গেল কোথায়?'

'পরলোকে। কিচ্ছু মনে পড়ছে না?'

ভুরু কুঁচকোলেন কৌ, 'মু ঘরে ঢুকল মনে আছে— তারপর একটা ফ্ল্যাশ দেখলাম— তারপর আর কিচ্ছু না— প্রফেসর, এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল তো?'

'হ্যাঁও বটে, নাও বটে,' মুখভঙ্গি করে বললেন প্রফেসর। 'ভাইরাস-হুজুর বেটাচ্ছেলে চম্পট দিয়েছে, খারাপ খবর এইটাই। আমার তৈরি ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজারটাই যত নষ্টের মূল। বেটাচ্ছেলে তারই দৌলতে মানুষের মতো বড় হয়ে গেছে। রওনা হয়েছে টাইটানের দিকে— ডিম পাড়বে নাকি ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায়!'

'আর আমি? আমাকেও নিশ্চয় কবজায় এনে ফেলেছিল?' বলতে বলতে মুখের ওপর হাত চালিয়ে ডক্টর দেখে নিলেন স্বাভাবিক হয়েছেন কিনা।

'তা এসেছিল। কিছু সময়ের জন্যে। এখন আপনি কবলমুক্ত। কারণ কী জানেন? আমি ইমিউনিটি ফ্যাক্টর আবিষ্কার করেছি—'

সাত তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমারই অ্যান্টিবডি থেকে।'

অপ্রসন্ন চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'হ্যাঁ, দীননাথেরই মূর্খতার অ্যান্টিবডি থেকে।'

মুখ লাল হয়ে গেল আমার। কী জবাব দেব ভাবছি, প্রফেসর সে সময় আর দিলেন না। কৌ-কে বললেন, 'কাজেই কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত আমরা এখানে নিরাপদ।'

খুশি উপচে পড়ল কৌ-এর চোখে-মুখে, 'ইমিউনিটি ফ্যাক্টর যদি দীননাথবাবুর দৌলতে পেয়ে থাকি, তা হলে তাঁর ঋণ আমি—'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না প্রফেসর। বললেন নির্লজ্জের মতো— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যান্টিবডি ওরই, কিন্তু পেয়েছেন আমার দৌলতে। আমিই ভেবে-চিন্তে দেখলাম দীননাথের মধ্যে যা আছে, নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে তা নেই— তাই এই বিপত্তি।' বলে, দুধের মতো সাদা তরল পদার্থের একটা শিশি তুলে দিলেন কৌ-এর হাতে— 'এই সেই বিষঘ্ন ওষুধ— অ্যান্টিডোট। আপনার কাজ কিন্তু অনেক ডক্টর। এই অ্যান্টিডোট যদি ইমিউনিটি দান করতে পারে, তা হলে এথেকেই ভাইরাস-হুজুরকে আক্রমণ করার দাওয়াই বার করা যেতে পারে, ঠিক কিনা।'

আঁতকে উঠলেন কৌ, 'ভাইরাস-হুজুরকে আক্রমণ করবেন? ওরে বাবা, সে যে দারুণ বিপজ্জনক ব্যাপার, প্রফেসর।'

'বিপজ্জনক তো বটেই! কিন্তু তা না করে যদি ডিম পাড়তে দিই বেটাচ্ছেলেকে, আর সেই ডিম ফুটে যদি আরও ভাইরাস বেরিয়ে আসে, তা হলে দানব-পঙ্গপালের প্লেগে গোটা ছায়াপথটার বিপদ সমাসন্ন।'

'তা বটে! তা বটে!' বড় ভাবিত দেখাল কৌ-কে, 'আচ্ছা, ধরুন ভাইরাস ধ্বংস করার একটা পথ বার করা গেল, তখন কি এই অ্যান্টিডোট সময়মতো টাইটানে পৌঁছে দিতে পারবেন?'

'তা পারব বইকী!' বুক ফুলিয়ে বললেন প্রফেসর। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন বুথের সামনে। জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রটাকে সস্নেহে চাপড়ে বললেন, 'এই তো আমার হারানিধি— টাইম মেশিন আবার সচল হবে...'

হুজুর ডিম পাড়বে, কাতারে কাতারে ভাইরাস সেই ডিম ফুটে বেরুবে— একী চাট্টিখানি কথা? তাই বিপুল আয়োজন চলেছে টাইটানে সেই মুহূর্তে। বিরাট ট্যাঙ্কটা চারদিক থেকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ভেতরে ঢোকার পথ শুধু একটাই— একটা ধাতুর দরজা। যেমন পুরু, তেমনি মজবুত।

একজন গোলাম-বৈজ্ঞানিক পুরু প্লাস্টিক-কাচের জানালা দিয়ে তাকাল ভেতরে। ধাতুর দরজার গায়ে পোর্টহোলের মতো গোলাকার গবাক্ষ। দেখল, অতিকায় ট্যাঙ্কটা ফুটন্ত, বুদবুদময় তরল পদার্থে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। পাশেই আঁটা একটা কন্ট্রোল প্যানেলের রেখাচিত্র দেখে যেন নয়ন সার্থক হল অমানুষ বৈজ্ঞানিকের। তাপমাত্রা, পুষ্টিকর দ্রব্য, পরিবেশ— সমস্তই যথাবিহিত, যেমনটি হওয়া উচিত সেইরকম।

গর্বের হাসি হেসে গোলাম-বৈজ্ঞানিক গিয়ে দাঁড়াল কোণে রাখা স্পেস-রেডিয়োর সামনে। স্পিকার-মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে বললে জলদগম্ভীর স্বরে, 'চ বলছি টাইটান থেকে। চ বলছি টাইটান থেকে। মৌচাক প্রস্তুত। ডিম পাড়ার ট্যাঙ্কগুলোও প্রস্তুত। তাপমাত্রা আর আর্দ্রতা সঠিক।'

ঘাড় ফিরিয়ে সগর্বে ফুটন্ত দ্যুতিময় ট্যাঙ্কের চেহারাখানা দেখে নিয়ে ফের বললে গলা

চড়িয়ে, 'হুজুর, আপনার প্রতীক্ষায় প্রস্তুত আমরা— আসুন, শুরু হোক ঝাঁকের যুগ!'

যন্ত্রযানের মারাত্মক স্পিডে তখন ভয়ংকরভাবে কাঁপছে কন্ট্রোল কেবিন— এই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তাতেও সন্তুষ্ট নয় ভাইরাস-হুজুর। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'তাড়াতাড়ি! আরও তাড়াতাড়ি!' স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে জুতো খুলে সপেটা হুজুরের মুখে মারত মু। কিন্তু এখন যে গোলাম। তাই বললে অসহায় গলায়, 'এর বেশি জোরে তো আর চালাতে পারব না। চরম স্পিডে ছুটছি—'

'কোনও কথা শুনতে চাই না... আরও জোরে চালা বাঁদরের বাচ্চা! ডিম পাড়ার আর দেরি নেই...'

ভীমবেগে ধেয়ে চলল যন্ত্রযান। টাইটানে পৌঁছনোমাত্র কিন্তু শুরু হয়ে যাবে মানবজাতির শেষ লগ্ন...

পাঠকপাঠিকারা কি উৎকণ্ঠিত? আমি নিরুপায়!

১৮
মৌচাক

আইসোলেশন ওয়ার্ডে তখন আবার প্রবল ব্যস্ততা দেখা দিয়েছে। আমি, প্রফেসর আর ক-৫ রিসার্চ হসপিটাল থেকে সংক্রামিত ডাক্তারদের পাকড়াও করে আনছি অজ্ঞান অবস্থায়। পা টিপে টিপে আগে আমি দেখে নিচ্ছি, অমানুষ গোলামরা রয়েছে কোথায়, কোন ঘরে— পেছন থেকে ক-৫ সুড়ুৎ করে এগিয়ে গিয়ে হলুদ রশ্মি নিক্ষেপ করে তাদের চৈতন্যহরণ করছে। হিড়হিড় করে অচৈতন্য দেহগুলো আমি টেনে আনছি আইসোলেশন ওয়ার্ডে। প্যাঁট প্যাঁট করে অ্যান্টিডোট শরীরে ফুঁড়ে দিচ্ছেন কৌ। কিছু চিকিৎসককে এইভাবে নিরাময় করার পর তারাই আবার শশব্যস্তে আরও অ্যান্টিডোট উৎপাদন করছে, সতীর্থদের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ছে এবং তাদের আরোগ্য করছে। সময় লাগছে প্রচুর, ধীরে ধীরে কাজ এগোলেও রিসার্চ হসপিটালের স্বাভাবিকতা কিন্তু ফিরে আসছে একটু একটু করে।

এই পর্যন্ত বেশ লাগছিল আমার। লাফঝাঁপ করতে চিরকালই আমার ভাল লাগে। কিন্তু তারপরেই আবার অস্থির হলাম। ডক্টর আর প্রফেসর দু'জনে খুব ব্যস্ত মারণ-ভাইরাস উৎপাদন নিয়ে— এমন এক মারাত্মক হবে সেই মারণ-ভাইরাস যা কেন্দ্রিন মহাপ্রভু আর পুরো ঝাঁকটাকে সবংশে কবজায় আনবে। খুবই দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া। তাই আমার ধৈর্য ফুরিয়েছে। মুখোশপরা ডাক্তারদের ভাইরাস-কালচারের ডিশ হাতে ছুটোছুটি দেখতে দেখতে চোখ টাটিয়ে উঠেছে।

অধীর কণ্ঠে অবশেষে বলেই ফেললাম, 'আর কত দেরি, প্রফেসর?'

'তাড়া দিয়ো না। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি দ্রুতবেগেই চলছে— তাড়া দিয়েও কিছু হবে না।

কম্পিউটার-মাইক্রোস্কোপে ক-৫-কে কানেকশন করে দিয়েছি সবচেয়ে শক্তিশালী ভাইরাস প্রজাতি জন্মালেই খবর দেবে ও।'

আকাশপাতাল ভাবলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, 'অত ঝুটঝামেলায় দরকার কী? পুরো টাইটান-টাকেই বোমা মেরে উড়িয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। ভাইরাস-হুজুর, ডিমভরতি ট্যাঙ্ক— সব ধ্বংস হয়ে যাক।'

ধমকের সুরে প্রফেসর বললেন, 'বোমবাজিটা ভালই শিখেছ দেখছি। সব সমস্যার সমাধান একটাই জানো— মারো বোমা! পার্টি কর নাকি?'

'চট করে কাজ হাসিল হয় কিনা বলুন? চক্ষের পলকে শত্রু নিপাত।'

কৌ তেড়ে উঠলেন, 'বোমাটা কোথায়? এটা কি অস্ত্রাগার যে বারুদের ডিপো নিয়ে বসে আছি? হাসপাতালে গোলাগুলি থাকে?'

ডবল ধমক খেয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলাম, 'তা হলে কী করতে চান বলুন? লড়াইটা করবেন কী করে?'

এমন সময়ে ভারিক্কি চালে গড়গড়িয়ে সামনে চলে এল ক-৫। ভাবখানা যেন যুদ্ধজয় করে এল। বললে গম্ভীর গলায়, 'প্রজাতি নং ঙ-৩০৯ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।'

উত্তেজনায় প্রায় দুম করে ফেটে পড়েন আর কি কৌ। দৌড়ে গেলেন সারি সারি ভাইরাস-প্রজাতির দিকে। একঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়েই দু'হাত মাথার ওপর তুলে সৌমদর্শন বৈজ্ঞানিক গৌরাঙ্গ-ভঙ্গিমায় নৃত্য করতে করতে বললেন, 'প্রফেসর! মাই ডিয়ার প্রফেসর! এক লক্ষ অভিনন্দন গ্রহণ করুন! এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল।' পরক্ষণেই সহকারী ডাক্তারদের ওপর হুকুম ছাড়লেন, 'ব্যাচ নম্বর ঙ-৩০৯-এর উৎপাদন শুরু করে দিন সবাই মিলে। এখুনি! এখুনি! আর একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা চলবে না!'

মদন আর কী! এখন আর মোটে তর সইছে না!

প্রফেসর হেঁট হয়ে ক-৫-এর পিঠ চাপড়ে বললেন উত্তেজনা সামাল দিয়ে 'বেঁচে থাকো, বাবা, দীর্ঘজীবী হও!'

এসব নাটক দেখবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই তখন। তেড়ে উঠলাম, 'এবার কী করতে হবে, তাই বলুন।'

'ডিমভরতি ট্যাঙ্কে ঙ-৩০৯-কে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর ধৈর্য ধরতে হবে। ঠিক যেভাবে ভাইরাস-হুজুর আণুবীক্ষণিকভাবে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল— একই পন্থায় ঙ-৩০৯ চড়াও হবে ওদের ওপর— আণুবীক্ষণিকভাবে। পরিষ্কার কাজ, কী বলো হে ছোকরা?'

ব্যঙ্গের সুরে বললাম, 'খুব পরিষ্কার কী? সময় থাকতে যদি টাইটানে পৌঁছোতে পারি, মু-এর চোখে ধুলো দিতে পারি, ডিমের ট্যাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছোতে পারি, তবে তো ঙ-৩০৯-কে ঢালবেন। অত সোজা নয়, প্রফেসর। বোমা মেরে সবশুদ্ধ উড়িয়ে দেওয়া ওর চাইতে অনেক সোজা।'

'খুনখারাপি আমি পছন্দ করি না।'

'তবে এত হাঙ্গামা করছেন কেন?'

মোক্ষম প্রশ্ন। কোণঠাসা করতে পেরেছি এবার প্রফেসরকে। ওঁরই কথার প্যাঁচে জড়িয়ে দিয়েছি ওঁকে।

কিন্তু চিজ বটে একখানা প্রফেসর। বললেন সঙ্গে সঙ্গে, 'ভাইরাসেরও অধিকার আছে ভাইরাস হিসেবে থাকার— কিন্তু দানবঝাঁক নিয়ে ছায়াপথ দখল করার কোনও অধিকার তার নেই। মহাবিশ্বে প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট জায়গা আছে— নইলে ব্রহ্মাণ্ডের ভারসাম্যই নষ্ট হয়ে যাবে। ভাইরাস হুজুরকে তাই মারণ-ভাইরাস দিয়ে বলহীন করব— এক্কেবারে মারব না— প্রজাতি নম্বর ঙ-৩০৯-কে সেইভাবেই উৎপাদন করা হচ্ছে।'

চোখ কপালে উঠে গেল আমার। এমনকী কৌ পর্যন্ত চমকে উঠলেন। বললেন আতীক্ষ্ম কণ্ঠে, 'সে কী! ওই সর্বনাশকে টিকিয়ে রাখার দরকারটা কী?'

ভারিক্কি গলায় প্রফেসর বললেন, 'আছে, আছে, দরকার আছে।'

'কী দরকার?'

'সেটা কি এখনই জানা দরকার?'

'নিশ্চয়!'

'সময় খুব কম। প্ল্যানটা খালি শুনুন। ওকে ওর ডেরায় নিয়ে যাব।'

'ওর ডেরা! সে তো মহাশূন্যে!'

'আছে, আছে, ওরও একটা ডেরা আছে। যেখানে আছে ওরই মতো আরও ভাইরাস।'

'কিন্তু সেটা কোথায়?'

'পরে বলব।'

'কিন্তু ও তো তা বলেনি?'

'ও বলেনি— আমার ভয়ে। কিন্তু আমার এই ব্রেনখানা দেখেছেন।' নিজের উন্নত ললাটে টোকা মারলেন প্রফেসর— 'এই ব্রেনের কাছে কিছুই গোপন থাকে না।'

তিক্ত গলায় ডক্টর বললেন, 'বড়াই পরে করবেন। কী করবেন সেখানে ওকে নিয়ে গিয়ে?'

'নিস্তেজ ভাইরাসকে দিয়ে ওদের সাঙ্গপাঙ্গদের বুঝিয়ে দেব মানুষের পেছনে লাগতে এলে পরিমাণটা কী হয়। এরপর আমি আর দীননাথ দু'জনেই এখন ওদের অবধ্য— ঙ-৩০৯ ছড়িয়ে দেব যাতে প্রত্যেকেই নিস্তেজ শক্তিহীন হয়ে যায়— ভবিষ্যতে ডেরা থেকে কেউ আর ছিটকে বেরিয়ে এসে ছায়াপথের বিপদ ডেকে আনতে না পারে।'

প্ল্যানটা মনে ধরল ডক্টরের। আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু ডেরাটা কোথায় বলবেন তো?'

আবার এক ধমক লাগালেন প্রফেসর, 'এই দীননাথ অপোগণ্ডটার মতো এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন কেন? বললাম তো পরে বলব।'

কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'কী দরকার অত ঝামেলায়— সোজা বোমচার্জ করলেই ল্যাটা চুকে যায়!'

'থামো তুমি!'

কৌ দৌড়ে গিয়ে ভ্যাকুয়াম-পাত্রটা নিয়ে ফিরে এলেন, 'এই নিন প্রফেসর। ব্যাচ প্রস্তুত।'

পাত্রটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ আধবোজা চোখে সেদিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর বললেন স্বগতোক্তির সুরে, 'চমৎকার! চমৎকার! এবার যাত্রা শুরু হোক টাইম মেশিনের!'

এদিকে টাইটান ঘাঁটিতে শুরু হয়েছে আর এক রোমাঞ্চকর পর্ব।

কেন্দ্রিন শয়তান বেরিয়ে এল এয়ারলকের মধ্যে দিয়ে। অতি মন্থরগতিতে যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে এগিয়ে গেল করিডর বরাবর। পরম অনুগত বান্দারা চারপাশ থেকে ধরে তাকে নিয়ে চলল ট্যাঙ্কের দিকে। যেন ঠাকুর নিয়ে চলেছে বেদিতে বসিয়ে পুজো করবে বলে!

অতিকায় জ্বালানি ট্যাঙ্কের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল চ। বুক ফুলিয়ে হ্যাচ খুলে ধরল হুজুরকে দেখেই। হাঁসফাঁস করতে করতে ট্যাঙ্কের কিনারায় গিয়ে উঠল শয়তান শিরোমণি।

গলার মধ্যে জল নিয়ে গার্গল করলে যেরকম বিটকেল শব্দ হয়, অবিকল সেইরকম আওয়াজে বললে, 'মনে রাখিস, যতক্ষণ মৌচাকের মধ্যে থাকব, ততক্ষণ পাহারা দিতে হবে আমাকে। ঝাঁকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোদের হাতে।'

অপরিসীম শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে রইল মু, চ আর অন্যান্য গোলামবৃন্দ। পুষ্টিকর দ্রব্য বোঝাই ট্যাঙ্কের মধ্যে অন্তর্হিত হল কেন্দ্রিন।

পিছিয়ে এল চ। দরজা বন্ধ করে দিল সশ্রদ্ধ ভঙ্গিমায়।

ঝাঁক সৃষ্টি শুরু হতে আর দেরি নেই।

প্রফেসর তো নিমীলিত নয়নে বললেন, 'এবার যাত্রা শুরু হোক টাইম মেশিনের!' আমি কিন্তু ভরসা পেলাম না।

সদলবলে আমরা তখন এসে দাঁড়িয়েছি তারামণ্ডলের মতো বিরাট সেই হলঘর খানায়। যে-ঘরের চার দেওয়ালের বদলে বহু দেওয়াল এবং সবগুলো দেওয়ালই বিভিন্ন কোণে বাঁক নিতে নিতে সিলিং বানিয়ে ফেলেছে। গম্বুজ আর ঘরের মাঝামাঝি ধাতব-দেওয়ালের গা থেকে নরম দ্যুতি ঠিকরে আসছে। আমরা যেন এসে দাঁড়িয়েছি দ্যুতিময় একটা হীরকখণ্ডের ঠিক মাঝখানে।

সামনেই দাঁড়িয়ে আমাদের সময়গাড়ি— অটল, অনড়। খুব আস্তে আস্তে ঘুরছে প্রকাণ্ড ফ্লাই হুইলটা।

একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। মহাশূন্যে সময়পথে টলমল করতে করতে, ডিগবাজি খেতে খেতে ছুটছে সময়যন্ত্র। যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে একটা জাহাজ। অত্যুজ্জ্বল কতকগুলো আলোকবিন্দুর সঞ্চরণ দেখা যাচ্ছে... ফ্লাই হুইল ঘুরছে দ্রুতবেগে... প্রফেসর বললেন, 'সময়গাড়ি এখুনি হল্ট করবে। চুপ করে বসে থাকো। অটোমেটিক রিটার্ন চালু আছে। ঠিক তিন মিনিট পরেই টাইম মেশিন নিজে থেকেই ফিরে যাবে ১৯৮১-র কলকাতায়।' আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'মাত্র তিন

মিনিট?’ প্রফেসর বলেছিলেন, ‘অটোমেটিক রিটার্ন যদি বিগড়ে গিয়ে না থাকে, তবেই তিন মিনিট। নইলে যে কত মিনিট, তা আমিও বলতে পারব না।’

প্রফেসরের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে শেষ পর্যন্ত। অটোমেটিক রিটার্ন কিন্তু বিগড়েছে। নইলে সময়গাড়ি এখনও এখানে কেন? ফ্লাই হুইল তো চালু রয়েছে। কিন্তু ১৯৮১-র কলকাতায় তো সময়গাড়ি রওনা হয়নি! আর, অটোমেটিক রিটার্ন যদি বিকল থাকে, তা হলে সময়গাড়ির যন্ত্রপাতিও ঠিক আছে কিনা সন্দেহ। এই ঘরে থামবার সময়ে যা কয়েকখানা ডিগবাজি খেয়ে ঠিকরে গিয়েছিল— কলকবজার মধ্যে আরও ভাঙচুর হয়েছে কিনা, ঈশ্বর জানেন।

তাই ভরসা পেলাম না প্রফেসরের কথায়। টাইম মেশিনে চড়া আর নিরাপদ নয়। এই ভয়েই বারবার প্রস্তাব করছিলাম, এদেরই কোনও যন্ত্রযানে চেপে দূর থেকে বোমা ফেলা যাক।

কিন্তু প্রফেসর তো দেখছি নির্বিকার। বুক ফুলিয়ে চিবুক উঁচু করে বিরাট একটা কিছুর মতো গটগট করে গিয়ে উঠে বসলেন সময়গাড়ির গদিতে। হেঁকে বললেন, ‘পা যে আর নড়ছে না তোমার! উঠে এসো না।’

পাছে কৌ-এর সামনে আবার মুখনাড়া খেতে হয়, তাই কথা বাড়ালাম না। এক যাত্রায় আর পৃথক ফল হয় কেন, এই ভেবে উঠে বসলাম তাঁর পাশে। কানে কানে বললাম, ‘মেশিন ঠিক আছে তো?’

উচ্চকণ্ঠেই জবাব দিলেন প্রফেসর, ‘ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজার নিয়ে যাওয়ার সময়ে সেটা দেখে যাওয়া হয়েছে।’

‘অটোমেটিক রিটার্ন?’

জবাব দিলেন না প্রফেসর, বুঝলাম ওই ব্যাপারটায় এখনও উনি নিশ্চিত নন। মরুক গে, যাঁর গাড়ি, তিনিই যখন চালক— তখন তিনিই নিজে থেকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন’খন ১৯৮১-র কলকাতায়।

‘চললাম, ডক্টর,’ স্টার্টারে হাত রেখে বললেন প্রফেসর।

‘যাবার সময়ে যাই বলতে নেই প্রফেসর। বলুন, আসি।’ এক্কেবারে মা দিদিমা-র ঢং-এ বললেন কৌ। শুনেই মনটা কীরকম করে উঠল আমার।

মুচকি হাসলেন প্রফেসর।

বললেন, ‘দেখা যাক।’

কী দেখতে চান? ধাঁধায় পড়লাম।

‘জয় হোক আপনার,’ বললেন কৌ।

‘আপনারও হোক,’ বলে স্টার্টার ঠেলতে গিয়ে থমকে গেলেন প্রফেসর— ‘ডক্টর।’

‘বলুন!’

‘ক-৫’-কে ধার দিতে পারেন?’

‘কেন বলুন তো?’

‘বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছে আমার— মন কেমন করছে কি না, তাই।’

‘বেশ তো, সঙ্গে নিন না। ক-৫, প্রফেসর যা বলবেন, শুনবে। যাও।’

‘তথাস্তু, প্রভু,’ বলেই গড়গড়িয়ে লাফ দিয়ে ক-৫ উঠে এল সময়গাড়িতে।

কয়েক পা পেছিয়ে গেলেন কৌ।

স্টার্টার ঠেলে দিলেন প্রফেসর। গোটা টাইম মেশিনটা আচমকা যেন সামনের দিকে টলে পড়ল। এ-অনুভূতি আগেও হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন পাতালগহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। প্রফেসরকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। এখন সেসব কিছুই করলাম না। কাঠ হয়ে শুধু বসে রইলাম। বেশ বুঝলাম ফোর্থ ডাইমেনশনে এসে পড়েছি। অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনের মধ্যে রয়েছি। ছুটে চলেছি সময়পথে। থমথমে নীরবতার সেই চারমাত্রিক জগতের বর্ণনা আগেও দিতে পারিনি— এখনও পারব না।

টাইটান ঘাঁটির অলিন্দপথে গটমট করে তখন হেঁকে চলেছে মু— পেছনে সাঙ্গপাঙ্গ। প্রত্যেকের হাতে ব্লাস্টার। গোলকধাঁধার মতো গলিঘুঁজির গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে একজন করে গোলামকে পাহারায় রেখে যাচ্ছে।

হুজুরের হুকুম ঘাঁটি সুরক্ষিত রাখতে হবে। সে হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করে বিরাট জ্বালানি ট্যাঙ্কের সামনে আবার ফিরে এল মু। পোর্টহোল জানলা দিয়ে দেখল ভেতরে।

নির্জীবের মতো পড়ে রয়েছে হুজুর। ধূসর বর্ণের বুদবুদ কাটা জেলি সাগরে ধীর ছন্দে স্পন্দিত হয়ে চলেছে পরম স্বস্তিতে। চারপাশে ওপরে-নীচে থুক থুক করছে হাজার হাজার লাখ লাখ ডিম। গোলাকার সাদা ডিম। আকারে টেনিস বলের মতো বড়। ফুটন্ত জেলি ট্যাঙ্কে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে... আপনা থেকেই তা দেওয়া হয়ে চলেছে— সময় হলেই ডিম ফুটে বেরিয়ে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে...

বাহাদুর চালক বটে প্রফেসর। অদ্ভুত নৈপুণ্যে সময়গাড়িকে দৃশ্যমান করে তুললেন সুপারভাইজার মু-এর অফিস কক্ষে। টলমল করল না। গতবারের মতো থামবার সময়ে পর পর ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে ফেলে দিল না।

নেমে দাঁড়ালাম আমরা। অটোমেটিক রিটার্ন তো বিকল। ভয় কীসের? দেওয়ালের ভিসিফোন স্ক্রিনে দেখা গেল ডিম পাড়ার ট্যাঙ্কের ভেতরের দৃশ্য। ফুটন্ত জেলিতে ভাসমান অগুনতি ডিমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন প্রফেসর।

বললেন, ‘হুম! ডিম পাড়া পুরোদমেই চলেছে দেখছি।’

আমি কিন্তু রোমাঞ্চিত হলাম সেই গা-ঘিনঘিনে দৃশ্য দেখে। বললাম সভয়ে, ‘কী এটা?’

‘ঝাঁক। ডিম ফুটে বেরোনোর জন্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর দেরি করা সমীচীন হবে না।’

বলেই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ‘কী হল? অমন কাঠ হয়ে গেলে কেন?’

‘পায়ের আওয়াজ পাচ্ছেন না?’

‘কই না তো?’ অফিসঘরের দরজার দিকে তাকালেন প্রফেসর।

‘আমি পাচ্ছি। পাহারাদার আসছে এদিকে। সময়গাড়ির আওয়াজ নিশ্চয় কানে গেছে।’

হাতের ইশারায় ওঁকে পিছিয়ে যেতে বললাম। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম দরজার আড়ালে। হাতে রইল ব্লাস্টার।

ইঙ্গিত করতেই বুঝলেন প্রফেসর। ডাক দিলেন পরম ফুর্তিতে, ‘ভেতরে এসো হে!’

হাতে ব্লাস্টার নিয়ে চৌকাঠ পেরল প্রহরী। আমি ব্লাস্টার ছুড়লাম। নির্ভুল লক্ষ্য। টলমল করে উঠেই আবার সিধে হয়ে গেল কিন্তু সে— পড়ে গেল না। আবার ছুড়লাম ব্লাস্টার। আবার... আবার! এত কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু একবারও তাকে শোয়াতে পারলাম না। যন্ত্রণায় বীভৎস মুখটা কেবল বেঁকে গেল। হাতের ব্লাস্টার আস্তে আস্তে টিপ করল আমার দিকে। আবার ব্লাস্টার বর্ষণ করলাম। এবারও কোনও কাজ হল না।

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে কী করব ভাবছি, অবশ্য তখন পরলোকের কথাই কেবল ভাবা উচিত ছিল— প্রহরীর ব্লাস্টার চোঙ তখন উঠে আসছে আমার বুকের দিকে—

এমন সময়ে কাজ দিল ক-৫’-এর উপস্থিত বুদ্ধি। নিঃশব্দে গড়িয়ে এসে নাকের চোঙ থেকে ব্লাস্টার বর্ষণ করল। এবার আর প্রহরী বাছাধন পার পেল না। দড়াম করে পড়ল মুখ থুবড়ে— আর নড়ল না।

এতক্ষণ দম নিতেও পারিনি। মরণ সামনে দেখলে বুঝি এমনি অবস্থাই হয়। এবার গভীর শ্বাস নিয়ে বললাম, ‘ক-৫, তুমি না থাকলে আজ... কিন্তু প্রফেসর, ব্যাপার কী বলুন তো? ব্লাস্টার কাজ করল না কেন?’

নিস্পন্দ প্রহরীর দেহটা তখন উলটে পালটে দেখছেন প্রফেসর। ভাইরাস-সংক্রমণ খুব বেশি রকমের হয়েছে দেখা গেল। গা ফুটে সব চিহ্নই অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট। মুখ, হাত ঘন শক্ত তারের মতো কর্কশ লোমে ছেয়ে গেছে। ভুরু দুটোয় যেন দু’ আঁটি কালো খড় বাঁধা রয়েছে। বীভৎস! কদর্য! ভয়ংকর!

প্রফেসর বললেন, ‘মহাসমস্যায় পড়লাম হে দীননাথ।’

‘কী হয়েছে?’

‘ব্যাটাচ্ছেলেদের আভ্যন্তরীণ কোষ গঠন পালটে যাচ্ছে। বিকিরণ শক্তিকে রুখে দেওয়ার শক্তি কোষে কোষে জেগে উঠেছে।’

‘এখন উপায়?’

উপায়টা আর শোনা হল না। তার আগেই আরেকটা মহাসমস্যা এনে হাজির করল ক-৫, ‘প্রভু! আমার আক্রমণক্ষমতা দারুণ ভাবে কমে আসছে... রিজার্ভ ফুরিয়ে আসছে...।’ বলতে বলতে ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে এল বেচারির দুই চোখ, ঝুলে পড়ল সব ক’টা অ্যান্টেনা-শুঁড়, নড়নচড়নও প্রায় আর রইল না— যেন একটা নিস্পন্দ যন্ত্র!

‘সর্বনাশ।’ বললাম আমি, ‘ক-৫ তো খতম হতে চলল, আমার ব্লাস্টারও অকেজো। কী করি এখন বলুন তো?’

প্রফেসরের ঘোলাটে চোখে হীরক দ্যুতি দেখা গেল। এ দ্যুতি যখনই দেখা যায়, বুঝতে পারি প্রফেসরের উর্বর মস্তিষ্ক ভীষণ ভাবে সচল হয়েছে।

উজ্জ্বল চক্ষু আমার ওপর নিবদ্ধ রেখে বললেন উনি, 'দীননাথ।'

'বলুন।'

'আমার বুদ্ধিমত্তার ওপর আস্থা আছে?'

'কী বলছেন? আমার আস্থা থাকবে না তো—'

'তা হলে বুদ্ধির খানিকটা এবার খরচ করা যাক,' বলতে বলতে করিডরে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। পেছন পেছন দৌড়োলাম আমি। ক-৫-কেও ডেকে নিয়ে এলাম। খেপাটে প্রফেসর না জানি শত্রুপুরীতে আবার কী ঝামেলায় পড়েন।

কিছু দূর যেতে না যেতেই একটা চার মাথার মোড়ে এসে পৌঁছলাম। ব্লাস্টার হাতে রক্ষী মোতায়েন সেখানে। দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। ফিসফিস করে ক-৫-কে বললেন প্রফেসর, 'পাহারাদারকে দেখছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে ভুলিয়ে নিয়ে যাও অন্যদিকে।'

সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে রক্ষীর সামনে গড়িয়ে গেল ক-৫। হতভম্ব রক্ষী ক্ষণকাল বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থেকে ব্লাস্টারবর্ষণ করল। কোনওটাই কিন্তু স্পর্শ করল না ক-৫-কে। ছুটন্ত দুই মূর্তি দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল দূরে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম আমি আর প্রফেসর। এ করিডর শেষ হয়েছে বিশাল একটা গহ্বরে। ঘোলাটে অন্ধকারে ছাওয়া। আলো থেকেও নেই যেন। গহ্বরটা কেনটাকির ম্যামথগুহাকেও হার মানিয়ে দেয়— এত বড়। গা ঘেঁষে রয়েছে সারি সারি পেল্লায় গ্যাসভরতি ট্যাঙ্ক। কেন্দ্রে বসানো ডিম পাড়ার অতিকায় ট্যাঙ্কখানা। বাইরে পাহারা দিচ্ছে দুই মূর্তিমান— মু আর চ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রফেসর ভাবছেন এরপর কী করবেন, এমন সময়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে এসে পেছন হল্ট করল ক-৫। পিছু নেওয়া রক্ষীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছে। চৌকস কুকুর বটে!

'হুকুম তামিল করেছি, প্রভু।'

'গুড ডগ ক-৫। এবার তোমার পালা, দীননাথ।'

'কী করব?'

'কুকুরটাও দেখছি তোমার চাইতে তাড়াতাড়ি বোঝে!'

একটা যন্ত্রকুকুরের সঙ্গে তুলনা করায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে অপমানে চিড়বিড় করে উঠল আমার। মাথা ঠান্ডা রাখলাম অতি কষ্টে।

প্রফেসর বললেন, 'ক-৫ এখুনি যা করল, ঠিক তাই করো। পথ ভুলিয়ে ওই দুই মক্কেলকে অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে রাস্তা সাফ করে দাও আমার।'

'ওঃ! এই ব্যাপার,' বলেই রাগ-অপমান ভুলে পা বাড়ালাম তৎক্ষণাৎ। পেছন থেকে হাত ধরে টেনে ধরলেন প্রফেসর। বললেন স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে, 'টাইম-মেশিনে ফের দেখা হবে, কেমন? আগে যাও তুমি— কাজ সেরে যাচ্ছি আমি।' বলেই দুই চোখের নিবিড় দৃষ্টি মেলে ধরলেন আমার ওপর। স্থির গভীর চাহনি! আমি সে চাহনির মানে বুঝলাম

এবার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে। উনি মরণপণ করে এগোচ্ছেন। বড় বিপজ্জনক ঝুঁকি নিচ্ছেন। কী সেই ঝুঁকি আমি জানি না। আমাকে বলেননি। কিন্তু চোখের চাহনির নীরব ভাষা থেকে বুঝলাম— নাও ফিরতে পারেন।

আমি সব বুঝেও বাধা দিলাম না। একটা কথাও বললাম না। দিয়ে তো কোনও লাভ নেই। সেন্টিমেন্টের দাম ওঁর কাছে কানাকড়িও নেই। নীরবে শ্রদ্ধায় হাতদুটো শুধু চেপে পরক্ষণেই পেছন ফিরে দৌড়ে গেলাম খোলা জায়গায়।

চকিতে তৎপর হল চ। উঁচিয়ে ধরল ব্লাস্টার। শক্তিপুঞ্জ ধেয়ে এল আমাকে লক্ষ্য করে। আমি তার জন্যে তৈরি ছিলাম। মুহূর্তের মধ্যে মেঝেতে লাফ মেরে গড়িয়ে গিয়ে আবার উঠে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলাম পাশের আর একটা করিডরে। পেছন পেছন ছুটে এল চ।

মু কিন্তু নড়ল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ট্যাঙ্কের সামনে।

পরে শুনেছিলাম, প্ল্যান অনুযায়ী কাজ না হওয়ার বিষম মুষড়ে পড়েছিলেন প্রফেসর। রোবট হয়েও প্রফেসরের শুকনো মুখ দেখে মায়া হয়েছিল ক-৫-এর।

বলেছিল ফিসফিস করে, 'ভাবছেন কেন? আমি তো রয়েছি।'

'আমাকে একলা ফেলে যাবে?' রোবট বলেই অসংকোচে প্রাণের ভয় মুখে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন প্রফেসর।

প্রফেসরের হুকুমের অপেক্ষা না রেখেই সোজা মু-এর দিকে ছুটে গিয়েছিল ক-৫—

চোখের পলক ফেলবার আগেই ব্লাস্টার বর্ষণ করেছিল মু। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। ক-৫ ব্লাস্টার চালিয়েছিল ইলেকট্রনিক স্পিডে। কিন্তু শক্তির ভাঁড়ার ফুরিয়ে আসায় তার নিজের গতিই তখন মন্থর, লক্ষ্যও স্থির রাখতে পারেনি। মু কুপোকাৎ হওয়া দূরে থাকুক, উলটে এমন নির্ভুল লক্ষ্যে ব্লাস্টার বর্ষণ করেছিল যে চরকিপাক খেয়ে ঘুরতে আরম্ভ করেছিল ক-৫। আবার ব্লাস্টার ছুড়েছিল মু। এবার একেবারেই বেসামাল হয়ে সোজা ধেয়ে গিয়ে ট্যাঙ্কের দরজার কাছেই বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ক-৫, আর নড়েনি।

প্রফেসর এই সুযোগের অপব্যবহার করেননি। ক-৫ মরল কী বাঁচল, তা দেখবার ফুরসৎ তখন তাঁর ছিল না। অস্ত্রযুদ্ধ শুরু হতেই মু-এর দৃষ্টি চলে গিয়েছিল ক-৫-এর ওপর। সেই সুযোগে বাঁই বাঁই করে আড়াল থেকে বেরিয়ে ট্যাঙ্কের দরজার সামনে পৌঁছেছিলেন তিনি। একহাত ভ্যাকুয়াম বাক্স ধরে আরেক হাতে হ্যাচ নিয়ে টানাটানি করছেন—

এমন সময় আরও কয়েকবার শক্তিবর্ষণ করে ক-৫-কে সাবাড় করতে গিয়ে মু-এর চোখ পড়ে গিয়েছিল তাঁর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ার ছুড়েছিল তাঁকে টিপ করে। চকিত বর্ষণে লক্ষ্য ঠিক থাকেনি— প্রফেসরের প্রাণপাখি খাঁচায় থেকে গেছে— কিন্তু চুরমার হয়ে গেছে হাতের ভ্যাকুয়াম বাক্স। অমূল্য সিরাম গড়িয়ে গিয়েছে মেঝের ওপর দিয়ে।

'হায়, হায়' করে উঠেছিলেন প্রফেসর। মুহ্যমানের মতো চেয়েছিলেন মাটির দিকে— প্রাণের মায়াও বিস্মৃত হয়েছিলেন সেই মুহূর্তে।

তাঁর সেই স্থাণু বিমূঢ় অবস্থা দেখে মায়া হয়নি কিন্তু হতচ্ছাড়া মু-এর। হাতিয়ার তাঁর দিকে উঁচিয়ে রেখেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল সামনে। বলেছিল নির্দয় কণ্ঠে— 'হুজুরের খিদে এবার মেটা,' বলে, একহাতে খুলতে গিয়েছিল ডিমভরতি ট্যাঙ্কের দরজা।

সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিলেন প্রফেসর। সেইসঙ্গে রসজ্ঞান। ওই অবস্থাতেও। ভনিতা করে বলেছিলেন, 'ওর ভেতরে ঢোকার আমার কিন্তু ইচ্ছে নেই।'

'তোর ইচ্ছে-অনিচ্ছের কী দাম আছে রে?' গর্জে উঠেই হ্যাঁচকা টানে হ্যাচ খুলে ধরেছিল মু। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ভেসে এসেছিল রক্ত হিম করা লক্ষ পতঙ্গের গুঞ্জন।

যেন আগ্রহ আর বাগ মানতে চাইছে না, এমনি একখানা ভাব করে ভেতরে উঁকি মেরে দেখেছিলেন প্রফেসর। অনেকগুলো ডিম এর মধ্যেই ফুটে গেছে, ভেতরকার প্রাণীগুলো স্বচ্ছ ডানা নাড়ছে এত জোরে যে এরোপ্লেনের ঘুরন্ত প্রপেলারকেও হার মানিয়ে দেয়— দেখাই যাচ্ছে না ডানাগুলো।

প্রফেসর যেন খুশিতে ফেটে পড়েছিলেন অভূতপূর্ব এই দৃশ্য দেখে, 'দ্যাখো, দ্যাখো, কাণ্ড দ্যাখো! এর মধ্যেই ডিম ফুটে বেরোতে আরম্ভ করে দিয়েছে! অভিনন্দন জানাতে আপত্তি আছে?'

মু-এর তখন অমানুষিক অবস্থা। রসজ্ঞান থাকবে কেন? ঘ্যাঁক করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে, 'ঝাঁকের মধ্যে যা রে, গাধার বাচ্চা! চেটেপুটে যখন খাবে, তখন বোল চাল ঝাড়িস! হুজুর জিন্দাবাদ!' হাতিয়ার দিয়ে হ্যাচের মধ্যে প্রফেসরকে সুড় সুড় করে ঢুকে পড়তে বাধ্য করেছিল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে।

অপরূপ সেই দাঁতখিঁচুনি দেখেও নাকি বিচলিত হননি প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। আসলে মরতে হবে জেনেই মরিয়া হয়ে গেছিলেন। সবারই তাই হয়। মরার আগে ভয় পায়, মরার সময় আর ভয় থাকে না।

এটাও ঠিক যে, যে নির্ভয়, ভাগ্য তারই সহায়। এক্ষেত্রেও ভাগ্য সদয় হলেন প্রফেসরের ওপর। নইলে এ কাহিনি পড়বার সুযোগ আর কেউ পেত না।

প্রফেসরকে দাঁতখিঁচুনি দেখানোর জন্যে, ক-৫-কে ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল মু। তাই পেছন ফিরেও এতক্ষণ দেখেনি তর্জন গর্জনে তন্ময় থাকায়। তাই দেখতে পায়নি, ঠিক পেছনেই ঈষৎ নড়ে উঠেছিল ক-৫। অসাড় হয়ে পড়ে থাকলেও একেবারে খতম তো সে হয়নি— শক্তিবর্ষণ তাকে সংহার করতে পারেনি— নিস্তেজ করে দিয়েছিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলো। কিন্তু রোবটমাত্রেরই ক্ষমতা থাকে নিজেকে মেরামত করে নেওয়ার— অন্তত কিছুটা। তাই ঐটুকু সময়ের মধ্যেই ঝিমুনি কাটিয়ে নড়ে উঠেছিল ক-৫। স্তিমিত চক্ষুপরদায় আলোকঝিলিক দেখা গিয়েছিল। প্রফেসরের অসহায় অবস্থা দেখেই টনক নড়েছিল। স্টোরেজ ব্যাটারিতে যেটুকু শক্তি তখনও অবশিষ্ট ছিল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাই জড়ো করেছিল নাকের হাতিয়ার-চোঙে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসেছিল নলচোঁটা, স্থির হয়েছিল মু-এর পিঠের দিকে এবং ভলকে ভলকে বেরিয়ে এসেছিল মারণ-রশ্মি— যা অদৃশ্য কিন্তু ভয়ংকর। একবার নয়... দু'বার নয়... বারবার রশ্মিবর্ষণ করে চলেছিল ক-৫, যতক্ষণ না স্টোরেজ ব্যাটারি নিঃশেষিত হয়।

মু-এর ভগবান ভাইরাস-হুজুরও এই সংহার রশ্মির অতগুলো বর্ষণ হজম করে সিধে থাকতে পারত না। কাজেই যেন কাটা কলাগাছ ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। মুখ দিয়ে রক্ত-জল-করা গোঙানি শোনা গিয়েছিল কয়েকবার। তারপর মুণ্ডহীন, হাতহীন, পা-

হীন একখানা ভয়াবহ বিকটাকৃতি ধড় পড়ে রইল মেঝের ওপর। .

পাপিষ্ঠ মু-এর দিকে চেয়ে কিন্তু যেন দুঃখই পেয়েছিলেন প্রফেসর। হাজার হোক মানুষ হয়ে তো জন্মেছিল— রোগে পড়ে এমনি হয়ে গিয়েছিল— অ্যান্টিডোট চিকিৎসায় আবার ভাল করে তোলা যেত।

মনটা তাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রফেসরের। তারপরেই হুঁশ হয়েছিল ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকার সময় এটা নয়। দৌড়ে গিয়ে আগে দমাস দমাস করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন ট্যাঙ্কের দরজা। তারপর ক-৫ কে বলেছিলেন— 'সাবাস। এবার চলো পালাই। এখনও সময় আছে। মিনিটখানেকের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটবে—'

ক্ষীণ স্বরে বলেছিল ক-৫, 'উপায় নেই, প্রফেসর। আমার সব শক্তি শেষ। যেতে পারব না।'

'যেতেই হবে,' কান পাকড়ানোর মতো ক-৫-এর একটা অ্যান্টেনা-শুঁড় পাকড়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে দৌড় দিয়েছিলেন প্রফেসর।

অমনি ডিমভরতি ট্যাঙ্কের মধ্যে থেকে শোনা গিয়েছিল ভাইরাস-হুজুরের জগঝম্প কণ্ঠের গার্গল-করা হুহুংকার, 'ফিরে আয় রে প্রফেসর! ফিরে আয়! ওরে আয়! আয়! তোকে যে আমাদের বড্ড দরকার!'

সেই অপার্থিব নিনাদ শুনেই প্রফেসরের নাকি তখন জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আর কি দাঁড়ান তিনি? পড়পড়িয়ে দৌড়েছিলেন ক-৫-কে টেনে হিঁচড়ে।

প্রফেসরের মনখারাপ হয়েছিল বটে মু-এর পতন দেখে, আমি কিন্তু হতাম না। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, শাস্ত্রে আছে। যে রুগী আমাকে মারতে আসে, তাকে ছেড়ে কথা কইব কেন?

তাই ছুরি হাতে দাঁড়িয়েছিলাম অন্ধকারে ঘাপটি মেরে। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রফেসর এসে দাঁড়ালেন আমার পেছনে। সংক্ষেপে শুনে নিলাম, পরিকল্পনা তাঁর ফেঁসে গেছে। সিরাম মাটিতে গড়াচ্ছে। এখন উপায়? উপায় একটাই ছিল। আমার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রফেসরকে বলতেই মুখিয়ে উঠলেন তিনি, 'তোমার মতো উজবুক আর দুটো দেখিনি। হাজার হাজার শত্রুকে একা তুমি ছুরি মেরে সাবাড় করতে পারবে? তা ছাড়া—'

ঠিক এই সময়ে প্রফেসরের অসাবধানী চিৎকার শুনে পাঁই পাঁই করে দৌড়ে এল চ। ব্যস, আমার অস্ত্র হাতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাচ করে বসিয়ে দিলাম হারামজাদার বুকে— হাত থেকে হাতিয়ার ঠিকরে গেল মাটিতে।

রক্তমাখা ছুরিটা জামায় মুছতে মুছতে বললাম ঠান্ডা গলায়, 'দেখলেন তো, কত কম সময়ে কাম ফতে—'

'দীননাথ!'

'আপনার প্ল্যান ফেঁসে গেছে, এবার আমার প্ল্যান—'

'আরেকটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।'

'আবার! আপনার প্ল্যান আর দরকার নেই। আমি একাই—'

'দীননাথ!' কড়া গলায় ধমকে উঠলেন প্রফেসর। 'ছেলেমানুষি কোরো না।' ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলাম আমি। উবে গেল অমানুষ বধের উৎসাহ। একটা কুকুরের সামনে মুখনাড়া কাঁহাতক আর সহ্য হয়।

প্রফেসর দ্রুত বললেন, 'সময় খুব কম। এদিকে ক-৫-এরও শক্তির ভাঁড়ার খালি—ওকে চাঙা করা দরকার। তুমি ওকে নিয়ে ফিরে যাও টাইম মেশিনে—'

'কিন্তু প্রফেসর—'

'যা বলছি, তাই করো।'

'জো হুকুম', সেলাম ঠুকে ব্যাজার মুখে ক-৫-কে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়োলাম সময়গাড়ির দিকে। যেতে যেতে পেছন ফিরে দেখলাম, চ-এর ঠিকরে যাওয়া হাতিয়ারটা তুলে নিয়ে উলটো দিকে দৌড়োচ্ছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

কোথায় যাচ্ছেন, পরে জেনেছিলাম। মৃত্যুপণ করেও শেষ সম্ভাবনাটা সফল করার জন্যে উনি ফিরে যাচ্ছিলেন যমের মুখে...

১৯
নরকের আগুন

বিশাল গহ্বরের মধ্যে সারি সারি ট্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর। স্থির চোখে দেখে গেলেন একটার পর একটা ট্যাঙ্ক। চোখ আটকে গেল একটা ট্যাঙ্কের ওপর। মনে মনে বললেন, 'পেয়েছি। এই সেই ট্যাঙ্ক।' ট্যাঙ্কের গায়ে লাগানো একটা চাকা ঘোরাতেই শোনা গেল হিসহিস শব্দ। গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ।

এবার এসে দাঁড়ালেন ডিমভরতি ট্যাঙ্কটার পেছনে। এখানেও একটা ট্যাঙ্কের স্টপকক খুলে দিলেন। সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে এল গ্যাস...

দৌড়ে এলেন মাঝের ডিমভরতি ট্যাঙ্কের সামনে। হ্যাচটা যেখানে তলার কবজার ওপর ঘুরে যায় খোলবার সময়ে, ধাতুর তৈরি সেই ফ্রেমে ঠেসে গুঁজে দিলেন রশ্মি-অস্ত্রটা। পকেট হাতড়ে বার করলেন একটা সরু নাইলন সুতোর গোলা। লম্বা সফরে বেরুলেই সামান্য এই জিনিসটা পকেটে রাখেন প্রফেসর। অনেক কাজে লাগে। যারা দেশ বেড়ানোর বাতিকে ভোগে, এই অভ্যেসটা তাদেরও আছে।

সুতোর একপ্রান্তে বাঁধলেন হ্যাচের হ্যান্ডেলের সঙ্গে। সেই ফাঁকে পোর্টহোল দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন ভেতরে। আরও ডিম ফুটেছে। আরও প্রাণী ভন ভন করছে। ডানা আছড়াচ্ছে। ছানাপোনার মধ্যে গা এলিয়ে পড়ে আছে ভাইরাস-হুজুর। আকারে আরও বেড়ে উঠেছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই। এত বড় যে গতর নাড়ানোর ক্ষমতাও আর নেই।

দেখেই শিউরে উঠলেন প্রফেসর। সরে এলেন। সুতো টানটান করে বাঁধতে লাগলেন রশ্মি-বন্দুকের ট্রিগারে।

পোর্টহোল খোলাই ছিল। প্লাস্টিক-কাচের মধ্যে দিয়ে প্রফেসরের আদল দেখেই ধুমধাম

আওয়াজ করে হেঁকে উঠল ভাইরাস-হুজুর, 'কে গো? প্রফেসর নাকি?'

'ও বাবা! গলায় যে মধু ঝরছে,' সুতোয় গিঁটি দিতে দিতে আবোল তাবোল কথা আরম্ভ করে দিলেন প্রফেসর। সময় খুব কম। পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে পোকাগুলোকে— দানবিক গঙ্গা ফড়িংয়ের মতো আকার হয়েছে এক-একজনের। সেকেন্ডে সেকেন্ডে আরও ডিম ফুটছে, আরও ভাইরাস-ছানা ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে।

জগঝম্প-কণ্ঠ এবার প্রকৃতই জগঝম্প-নিনাদে পরিণত হল, 'ওরে বেল্লিক! ওরে শূকর! ওরে মর্কট! তোর আর রেহাই নেই!'

পুলকিত স্বরে গলার স্বর চড়িয়ে প্রফেসর বললেন, 'ওরে খোকন! ওরে শিশু! ওরে নির্বোধ! জ্যোতিষী আমার হাত গুনে বলেছে শতবর্ষ পরমায়ু আমার।' বলতে বলতে শেষ গিঁটটা কষে বাঁধা হয়ে গেল। ফ্রেমের খাঁজে রশ্মি-বন্দুক চেপে বসেছে কিনা, পরখ করাও হয়ে গেল। নলচেটা ঠিক দিকে ফেরানো আছে, তাও দেখা হয়ে গেল।

যেন গার্গল করতে করতে বিকট গলায় বাজখাঁই চিৎকার ছাড়ল এবার ভাইরাস-হুজুর, 'ওরে গাধা! ওরে পাঁঠা! ওরে শুয়োর! পালিয়ে তুই যাবি কোথা? আমার ঝাঁকই তোকে শুষে নেবে—'

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পেছিয়ে এলেন প্রফেসর, 'আগে তুই বেরো ভেতর থেকে— তবে তো তোর ঝাঁক নাগাল পাবে আমার!'

'আহাম্মক! আহাম্মক! আহাম্মক!' বিশাল গহ্বর মনে হল যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে চেঁচানির ঠেলায়, 'ধাতুর তৈরি সামান্য এই দেওয়ালটা আমার গতিরোধ করে থাকবে, এই ধারণা তোর মস্তিষ্কে এল কি করে রে অর্বাচীন—'

যাকে অর্বাচীন বলা হল, তিনি কিন্তু ততক্ষণে অলিম্পিক-দৌড় দৌড়োচ্ছেন টাইম মেশিনের দিকে।

যেন সহস্র অক্টোপাসের অগুনতি শুঁড় প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল ফুটন্ত জেলির মধ্যে, সহস্র কৃষ্ণকায় গোলকচক্ষুর মধ্যে থেকে বিচ্ছুরিত হল উন্মত্ত ক্রোধাগ্নি। স্বয়ং রৌরব-অধিপতিও সেই ভয়ংকর মূর্তি দেখলে বুঝি আঁতকে উঠে মূর্ছা যেতেন। পর মুহূর্তেই দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ভীম বেগে ভাইরাস-হুজুর নিজের বিপুল দেহটাকে নিক্ষেপ করল হ্যাচ-দরজার ভেতর দিকে। সেকী প্রচণ্ড সংঘাত! মড় মড় করে উঠল পুরু ধাতুর প্রাচীর। তেউড়ে বেঁকে ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরের দিকে!

কেন্দ্রিন ক্ষিপ্ত হয়েছে, সুতরাং ঝাঁক তো হবেই। পঙ্গপালের মতো শব্দ সৃষ্টিকারী পতঙ্গবাহিনিও বিষম রাগে ফেটে পড়ল তৎক্ষণাৎ। আচম্বিতে লক্ষগুণ বৃদ্ধি পেল গুঞ্জনধ্বনি। হাজার হাজার কনকর্ড জেটবিমানের কর্ণবধিরকারী প্রলয়ংকর শব্দে ধাতুর ট্যাঙ্ক তো বটেই, বিশাল গহ্বরের শৈলপ্রাচীরও বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হল সেই মুহূর্তে। ভীষণ সেই আওয়াজকে কোনও ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শুধু সেই আওয়াজই যে কোনও জীবের আত্মারামকে খাঁচাছাড়া করার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রফেসর অবিশ্বাস্য বেগে দৌড়ে ফিরে এলেন টাইম মেশিনে। আমি আর ক-৫ আগেভাগেই উঠে গ্যাঁট হয়ে বসেছিলাম। আমার অবশ্য হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল

অশ্রুতপূর্ব সেই ভয়ংকর আওয়াজে। গোটা টাইটান উপগ্রহটাই বুঝি থরথর করে কাঁপছিল। সেকী শব্দ! গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়! এখনও আমার কলম কাঁপছে লিখতে লিখতে।

প্রফেসর তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই স্টার্টার ঠেলে দিলেন একধাক্কায়, সঙ্গে সঙ্গে যেন সামনে হেলে পড়ল সময়গাড়ি। চারপাশ ধোঁয়াটে হয়ে এল। অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে তো এলামই, সেইসঙ্গে সময়গাড়িকে রকেটগাড়ির মতোই নক্ষত্রবেগে মহাশূন্যে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন প্রফেসর।

অনেক উঁচু থেকে তাই দেখলাম অকল্পনীয় এক আতশবাজির খেলা। বাজি পোড়ানো পৌষ মেলায় দেখেছি, নেতাজির জন্মদিবসেও দেখেছি, গড়ের মাঠে ফৌজি তারাবাজিও দেখেছি। কিন্তু সেদিন যে আগুন আর আলোর খেলা দেখেছিলাম, তেমনটি কখনও দেখিনি।

তার আগে যা ঘটেছিল বিশাল গহ্বরের ভেতরে, প্রফেসরের মুখে তার সরস বর্ণনা শুনেছিলাম। ভাইরাস-হুজুর শিকার পলায়মান দেখে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে ধাতুর ট্যাঙ্ক গায়ের জোরে ভেঙে বেরিয়ে আসতে গিয়েছিল। আগে ভেঙে ঠিকরে গিয়েছিল হ্যাচ-দরজা। তৎক্ষণাৎ সুতোয় টান পড়তেই ব্লাস্টারের ট্রিগার টানাও হয়ে গিয়েছিল। উপর্যুপরি ব্লাস্টার বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল সটান মিথেনভরতি ট্যাঙ্কের দিকে— যেদিকে নলচেটা ফিরিয়ে রেখে এসেছিলেন ধুরন্ধর প্রফেসর। মিথেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বিদীর্ণ হতেই ভীষণ সোঁ সোঁ শব্দে ভরে উঠেছিল গহ্বর— লকলকে আগুনের স্তম্ভ লাফ দিয়ে উঠেছিল ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে। ঠিক সেই সময়ে ডিমভরতি ট্যাঙ্ক ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল ভাইরাস-কেন্দ্রিন— মুহূর্তের মধ্যে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে আগুন ধরে উঠেছিল তার চারপাশের পুঞ্জ পুঞ্জ গ্যাসে...

আগুন... আগুন... শুধুই আগুন! অতবড় গহ্বরটা ভরে উঠেছিল লেলিহান পুঞ্জিত অগ্ন্যুৎসবে। অনেকগুলো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত একসঙ্গে স্বল্প পরিসরে ঘটলে যে নারকীয় অগ্নিলীলা দেখা যয়, সেই ধরনের বেড়াজালে হারিয়ে গিয়েছিল ভাইরাস-হুজুর আর তার অগুনতি ছানাপোনা। অসহ্য যন্ত্রণায় শেষ আর্তনাদ ত্যাগ করেছিল হুজুর— লক্ষ রাক্ষসের কণ্ঠে গার্গল-করার মতো সেই অবর্ণনীয় আর্ত চিৎকারই ভাইরাস-হুজুরের শেষ চিৎকার— পরক্ষণেই গর্জমান অগ্নিসমুদ্র গ্রাস করেছিল পুরো ঝাঁকসহ তাকে— অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সর্বভুক অগ্নিদেবতার জঠরে...

নিরাপদ দূরত্বে ভেসে থেকে দেখলাম তার পরবর্তী দৃশ্য। বিস্ফোরণের দৃশ্য। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সবার আগে স্টোরেজ স্টেশনে ফেটে উড়ে গিয়ে লেলিহান অগ্নিশিখা মেলে ধরল লক্ষ সূর্যমুখী ফুলের মতো। অহো! অহো! সেকী অপরূপ বর্ণসুষমা! আগুনের মধ্যেও যে এত রঙের বাহার, এত অজস্র আকারের তারাবাজি থাকতে পারে, তা কি কেউ কখনও ভেবেছে? পাঁচ হাজার তিনশো একুশ সালের টাইটানের প্রলয়াগ্নি দেখে সত্যিই সেদিন আমার নয়ন সার্থক হয়েছিল। এত কষ্ট ভুলে গেছিলাম। ভবিষ্যতের অভিযানে সেই আমার পরম লাভ।

হাজার পুষ্পের মতো পাপড়ি, হাজার বাসুকির মতো আগুনের ফণা, হাজার অর্কিড,

হাজার ডালিয়ার মতো রঙের খেলা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ফোরিত স্টোরেজ ট্যাঙ্ক থেকে সমস্ত টাইটানপৃষ্ঠে। কালো মহাকাশের পটভূমিকায় দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল পুরো উপগ্রহটা। জ্বলন্ত একটা বল ভাসতে লাগল মহাশূন্যে, গর্জমান অগ্নিগোলক।

পরম সন্তোষে দু' হাত কচলে প্রফেসর বললেন, 'কীরকম দেখছ হে ছোকরা?'

'উত্তম দৃশ্য!'

'ব্রেনখানা দেখেছ আমার?'

'বুদ্ধিটা কিন্তু আমার।'

'তোমার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গোড়া থেকেই আমি বলেছিলাম বোম মেরে উড়িয়ে দিন পুরো উপগ্রহটাকে। কাঙালের কথা বাসি হলে টকে, সেই তো—'

নির্লজ্জের মতো প্রফেসর বললেন, 'আইডিয়াটা তোমার হতে পারে, প্ল্যানটা আমার। বোমা পেতে কোথায় বাছাধন?'

'আপনি পেলেন কোথায়?'

'বানিয়ে নিলাম হে খোকন, বানিয়ে নিলাম। ওইজন্যেই তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার আমার এই ব্রেনখানার কাছে।'

'বাক্যিচচ্চড়ি থামাবেন?' জ্বলন্ত টাইটান-বলের দিকে চোখ রেখে বললাম, 'বোমাটা বানালেন কী করে বলুন।'

'খুব সহজে। মিথেন অ্যাটমসফিয়ারে ভাল করে অক্সিজেন মিশিয়ে দিয়ে ব্লাস্টার ছুড়ে দিলাম। ব্যস, কেল্লা ফতে! মিথেন স্টোরেজ ট্যাঙ্কটা ওই জন্যে আগে উড়িয়ে দিয়েছি, আমি জানতাম ওরকম একটা মিথেনের ভাঁড়ার ওইখানেই আছে, তা থেকেই শক্তি সৃষ্টি করে চালু রয়েছে টাইটানের সমস্ত যন্ত্রপাতি। তাই তো হে, ক-৫?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সায় দিল ক-৫।

'এবার তো যেতে হয় রিসার্চ হসপিটালে।'

'কেন, প্রভু?'

'সে কী হে! তুমি তো আমার সম্পত্তি নও। ফিরিয়ে দিতে হবে না তোমাকে ডক্টরের কাছে?'

'তথাস্তু!' কীরকম যেন বিমর্ষ গলায় বললে ক-৫। স্বর পরিবর্তনটা অদ্ভুত। ক-৫ কি আমাদের ছেড়ে যেতে চায় না?

রিসার্চ হসপিটালের রিসেপশন কক্ষ।

বিদায় অভিনন্দন জানাতে সময়গাড়িকে ঘিরে ধরেছেন কৌ এবং অন্যান্য ডাক্তার আর নার্সরা। ক-৫-এর শক্তিকোষে নতুন করে শক্তি ঠেসে দেওয়ায় সেও বেশ চনমনে। ঘুরঘুর করছে সময়গাড়ির আশেপাশে।

আমি আর প্রফেসর উঠে বসে আছি ভেতরে। প্রফেসরের চোখ কিন্তু রোবট-কুকুরের দিকে। একটু যেন সজলও বটে।

কৌ তা লক্ষ করেছিলেন।

বললেন মৃদু হেসে, 'ক-৫-এর জন্য মন কেমন করছে?'

প্রফেসর বলে উঠলেন, 'কই, না তো?'

কৌ বললেন, 'ক-৫-এর প্রাণও কাঁদছে আপনার জন্যে। আমি বুঝি।'

'তা হবে।'

'প্রফেসর—'

'বলুন, ড. কৌ।'

'আমাদের যে উপকার করে গেলেন আপনি, তা আমরা কোনওদিন ভুলব না। কিন্তু আপনি আমাদের ভুলে যেতে পারেন—'

'না, না, সেকি কথা!'

'যাতে ভুলে না যান, তাই একটা স্মৃতিচিহ্ন আপনি নিয়ে যান।'

'নেব? কী নেব?'

'ক-৫-কে।'

'ক-৫! ক-৫-কে দেবেন?'

'হ্যাঁ, দেব। আমাদের সবার উপহার হোক এই ক-৫।'

'আপনি? ছেড়ে থাকতে পারবেন ওকে?'

হাসবার চেষ্টা করলেন কৌ, 'পারব।...ক-৫!'

'হুজুর?'

'আজ থেকে তুমি প্রফেসরের হুকুম মেনে চলবে, কেমন?'

'তথাস্তু।' বলেই দূর থেকেই সময়গাড়ির দিকে লম্বা লাফ দিল ক-৫।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটল অঘটনটা।

বিদায়নাটকে ব্যাপৃত থাকায় প্রফেসর লক্ষ করেননি কন্ট্রোল প্যানেলের সহসা সজীবতা। আমিও লক্ষ করিনি। করলেও বুঝতাম না। আচমকা আপনা থেকেই চালু হয়ে গিয়েছে যন্ত্রপাতি। রিসার্চ হসপিটালে অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে প্রচণ্ড ধাক্কায় বিগড়ে গিয়েছিল অটোমেটিক রিটার্ন— তড়িঘড়ি ডিগবাজি খেয়ে টাইটান থেকে ছিটকে সরে যাওয়ার সময়ে পালটা ধাক্কায় আবার ঠিক হয়ে গেছিল অটোমেটিক রিটার্ন। ঠিক হয়েছিল তিন মিনিট আগেই। আমরা কেউ তা খেয়াল করিনি।

খেয়াল হল যখন ক-৫ আসন লক্ষ করে লাফ দিল, ঠিক তখনই। তিন মিনিট শেষ হল ঠিক সেই সময়ে। আচমকা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মেরে চালু হয়ে গেল অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশন। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমরা। প্রচণ্ডভাবে মাথা ঠুকে গেল কন্ট্রোল প্যানেলে। জ্ঞান হারানোর আগে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে যেন দেখলাম, ক-৫-এর রোবট দেহটা আমাদের ফুঁড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল রিসেপশন কক্ষের মেঝেতে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

২০
সুদূর অতীতে

অত্যাশ্চর্য এই অভিযান-কাহিনি অন্তে পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু শেষের চমকটাই এই কাহিনির সবচেয়ে বিস্ময়কর অংশ।

অটোমেটিক রিটার্ন চালু হয়ে যাওয়ায় জ্ঞান হারানোর আগেই চকিতের জন্যেও একটা পরম সুখাবেশে মনটা নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। যাক, অবশেষে তা হলে ঘরে ফিরছি। অনেকদিন বিদেশ ভ্রমণ করে কলকাতায় ফেরার সময়ে মনটা যেমন ঘরমুখো হয়, ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছিল আমার।

ফিরেছিলাম ঠিকই। কিন্তু সোজাসুজি নয়, একটু ঘুরপথে। একটা বলকে সুতোয় ঝুলিয়ে একদিকে টেনে ধরে ছেড়ে দিলে তা কি লম্ব অবস্থায় এসে স্থির হয়ে ঝুলতে পারে? পারে না। ছিটকে যায় অপরদিকে... বিপরীত দিকে। ডানদিক থেকে ছেড়ে দিলে পৌঁছোয় বাঁদিকে। এইটাই নিয়ম। দুলন্ত বলটাকে ধরে স্থির করে না দিলে তা এইভাবেই দুলবে। অন্তত কিছুক্ষণ, পেন্ডুলামের মতো।

সময়পথে আমরাও পেন্ডুলাম হয়ে গেলাম। টাইম মেশিনও তো প্রকৃতপক্ষে একটা ঘড়ি, যা শুধু সময়ের হিসেবই রাখছে না, সময়পথে ছুটেও চলেছে। কিন্তু তার অটোমেটিক রিটার্ন সত্যিই বিগড়েছিল বলে ভবিষ্যৎ থেকে ঠিকরে এলেও বর্তমান অর্থাৎ ১৯৮১-র কলকাতায় থামতে পারেনি। কখন যে সুদূর অতীতে উধাও হয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে, আমরাও জানতে পারিনি। কারওরই জ্ঞান ছিল না।

আমার মাথায় চোট লেগেছিল বেশি। তাই আমার আগে জ্ঞান ফিরেছিল প্রফেসরের। উনি কন্ট্রোল প্যানেলের বছরের হিসেব দেখে এমন চমকে উঠেছিলেন যে আমাকে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকেন। রামঝাঁকুনিতে আমার স্নায়ুমণ্ডল চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'অমন করছেন কেন?'

চারপাশ তমাল কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে সীমাহীন নৈঃশব্দ্য। নিস্তব্ধ কালগর্ভের অমানিশায় আমরা যেন স্থিরভাবে ভেসে রয়েছি।

কন্ট্রোল প্যানেলের একটা ডায়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রফেসর বললেন, 'দেখো।'

আমি দেখলাম। কাঁটা ঘুরছে বন্ বন্ করে। গতিনির্দেশক কাঁটা। কিন্তু ঘুরছে উলটোদিকে। আমরা পেছিয়ে চলেছি ঠিকই, কিন্তু প্রফেসর এত উত্তেজিত কেন?

আর একটা ঘড়ির ডায়াল দেখালেন প্রফেসর, 'কোথায় চলেছি বুঝেছ?'

আঁতকে উঠলাম আমি, 'এ কী! ১৯৮১ তো পেরিয়ে এসেছি।'

'তা তো এসেছই। অনেক আগেই এসেছ। কোথায় যাচ্ছ, সেইটা দেখো।'

'খ্রিস্টপূর্ব ১৪১৯!'

'হ্যাঁ, ১৯৮১-র আগে, ৩৪টা শতাব্দী আগে!'

'কিন্তু অটোমেটিক রিটার্ন তো চালু রয়েছে?'

'উঁহু। এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। যা গোদা পায়ের লাথি ঝেড়েছিলে।'

সব দোষ যেন আমারই। নিজের মেশিনের ক্রুটিটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন বেমালুম। কিন্তু ঝগড়া করার সময় সেটা নয়। উনি আমাকে কথা বলতেও দিলেন না।

বললেন, ঈষৎ উৎফুল্ল স্বরে, 'ভালই হল। সুদূর অতীতের কিছু ঘটনা দেখে যাওয়া যাক।'

'কিন্তু বর্তমানে শেষ পর্যন্ত ফিরতে পারব তো? পেন্ডুলামের মতো ভবিষ্যৎ থেকে তো সোজা চলে এলাম অতীতে, আবার ফিরে যাব নাকি ভবিষ্যতে? এইভাবেই কি চলবে অনন্তকাল? শেষ পর্যন্ত দোলক হয়েই থাকতে হবে নাকি?'

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'কী ঘটবে, তা নিয়ে অভিযাত্রীরা মাথা ঘামায় না, যা ঘটতে চলেছে, তাই শুধু পর্যবেক্ষণ করে। ঘটনা দেখো, অতীতের ঘটনা! ইতিহাসের ঘটনা! যে ঘটনা বিশ্বের কিছু কিছু গবেষক শুধু আন্দাজ করেছেন, চোখে কখনও দেখেননি। আমিও তা জানি, কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে চলেছি এখন। অবোধ দীননাথ, এ সুযোগ হেলায় হারিয়ো না।'

উনি তো জ্ঞান দিয়ে খালাস। আমার তখন বুক ধড়ফড় করছে। ঘরে ফেরার আনন্দ তো উবে গেছেই, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে পরিণতি ভেবে। প্রকৃতির ওপর চালিয়াতি করতে গেলেই তিনি ছেড়ে কথা কন না। আমরা কি তা হলে মহাকালের পথে মাকুর মতো টানা আর পোড়েন করেই চলব অনন্তকাল?

আচমকা চারপাশের নিকষ কালো মখমলের পরদার মতো পুরু অন্ধকারের আবরণটা একটু একটু করে ফিকে হয়ে এল। তমিস্রার বুক ফুঁড়ে জাগ্রত হল একের পর এক গ্রহ-নক্ষত্র...সীমাহীন মহাশূন্যে ভাসমান দ্যুতিময় সৌরজগৎ। বহুদূরে সূর্য, তারপর বুধ, পায়ের নীচে পৃথিবী...একপাশে রক্তরাঙা লালগ্রহ মঙ্গল...বৃহস্পতি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য গ্রহগুলো খালি চোখে দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা নয়, তাই তা প্রায় অদৃশ্যই রইল।

অস্ফুট চিৎকার শুনে সম্বিৎ ফিরল আমার। নির্নিমেষে প্রফেসর অপরূপ এই দৃশ্য দেখছেন। তারকাখচিত মহাশূন্যের দিকে এমন চোখে তাকিয়ে আছেন যেন ঘাবড়ে গেছেন। শীর্ণ দেহটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

দশদিকের ঝিলমিলে তারকাসুষমার পানে বিমূঢ় চাহনি মেলে ধরলাম আমিও। ক্ষণকাল চেয়ে রইলাম সবুজগ্রহ পৃথিবীর দিকে, আমার বাড়ি, আমার গ্রহ। কিন্তু আক্কেল বলিহারি যাই প্রফেসরের। বাড়ি ফেরার নাম করছেন না, ফ্যালফ্যাল করে দেখছেন আকাশের তারা, গ্রহ, সূর্য। যেন জন্মে দেখেননি। এত ভ্যাবাচাকা খাওয়ার কী আছে বুঝলাম না। রোজ যা দেখেছেন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে, আজ না হয় পৃথিবীর বাইরে থেকে তা দেখছেন। চোখসওয়া দৃশ্য। নতুন কিছুই তো নেই। তবে চোখ ছানাবড়ার মতো করে আছেন কেন?

'প্রফেসর! হ'ল কি আপনার?'

'মূর্খ!'

'আমি তো মূর্খই, কিন্তু আপনি যে মূঢ় হয়ে গেলেন!'

'না, না, তোমাকে বলছি না।'

'তবে কাকে বলছেন, আর কে আছে এখানে?'

'আমি আছি। আমি...আমি একটা মূর্খ।'

পুলকিত হলাম আত্মপ্রশস্তি শুনে, 'কেন প্রফেসর?'

'দেখতে পাচ্ছ না?'

'কী দেখতে পাচ্ছি না?'

'প্রতিবেশী কোথায়?'

'কার প্রতিবেশী?'

'পৃথিবীর!'

'মঙ্গলের কথা বলছেন? ওই তো রয়েছে। কি সুন্দর লাল টকটকে, আরও ঘন লাল, ১৯৮১-র পৃথিবী থেকে এমন টুকটুকে গ্রহ কেউ কখনও দেখেছে?'

'আর একজন প্রতিবেশী?'

'ওই তো বুধগ্রহ, সূর্যের ঠিক পরেই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সূর্যের ঠিক পরেই বুধ... তারপর? বুধ আর পৃথিবীর মাঝে যিনি থাকেন, তিনি কোথায়? কোথায় গেলেন মর্নিং স্টার? ভোরের শুকতারা? আমাদের শুক্রগ্রহ?'

ঠাহর করেও সত্যিই দূরে কাছে জ্বলজ্বলে ভোরের তারাকে দেখতে পেলাম না। সেই ভোরের তারা যাকে বছরের কোনও কোনও সময়ে সন্ধ্যায় দেখা যায় বলে হয় সাঁঝের তারা, যার চলতি নাম প্রভাত তারা। যার চেহারাখানা পৃথিবীর প্রায় সমানই বলা যায় এবং গ্রহদের মধ্যে যে পৃথিবীর সবচাইতে কাছে। অত যে ক্ষুদে গ্রহ বুধ, যার একুশখানা জুড়লে একখানা পৃথিবী তৈরি হয়, তাকেও অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে মহাশূন্যে আছি বলে, কিন্তু শুক্র কই?

অবাক হলাম। কিন্তু কথা বললাম না। বলবার সময়ও পেলাম না। ইতিউতি তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একদিকে চোখ পাকিয়ে রইলেন প্রফেসর।

বিজন বিভুঁয়ে এসে প্রফেসরের এহেন উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি আমার সুবিধের ঠেকল না। কীরকম যেন পাগল পাগল চাহনি।

তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ওদিকে আছে বুঝি শুক্র গ্রহ?'

'ইডিয়ট! আমি বৃহস্পতিকে খুঁজছি।'

'কেন?'

'সে গ্রহরাজ বলে। এত বড় গ্রহ আর সৌরজগতে নেই বলে। অন্য আটটা গ্রহকে একসঙ্গে করলেও যার তিনভাগও হওয়া যায় না বলে। তেরোশ পৃথিবীকে পিণ্ডি পাকালে যার একখানা শরীর হয় বলে।'

আমতা আমতা করে বললাম, 'কিন্তু সে তো সূর্য থেকে সাড়ে আটচল্লিশ কোটি মাইল দূরে। শুধু চোখে কি দেখতে পাবেন?'

'তা হলে ওটা কী?'

'কোনটা?'

প্রফেসর আঙুল তুলে শুধু দেখালেন। আমি দেখলাম। চোখ কচলে আবার দেখলাম। চুমকিবসানো মহাকাশের বুকে একটা ধোঁয়ার মতো কি যেন চোখে পড়ল।

২১
গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ

উন্মত্ত গোঁড়ামিকে ইংরেজিতে বলে ফ্যানাটিসিজ্‌ম্‌। আমি সায়েন্স ফিকশন পড়তে ভালবাসি, তাই আমাকে সবাই বলে ফ্যানাটিক। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের আশ্চর্য কীর্তিকাহিনি লিখলে টিটকিরি দেয়, আমাকে নাকি ফ্যানাটিসিজমে পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা যখন দার্শনিক হন, কল্পনাবিলাসী হন, তখন কিন্তু তাঁদের কল্পনার নাগাল পাওয়া সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁরা যে সম্ভাবনাময় আশ্চর্য জগতের স্বপ্ন দেখেন, তা দুঃস্বপ্ন আখ্যা পায় বাস্তবজগতে। কিন্তু মামুলি কল্পনায় যা অবাস্তব, সায়েন্স ফিকশনের রঙিন কল্পনায় তা অত্যন্ত বাস্তব। প্রফেসরের অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চারও সায়েন্স ফিকশনের মতোই চমকপ্রদ, বিস্ময়কর এবং অবাস্তব মনে হতে পারে উন্নাসিক পাঠকপাঠিকার কাছে, কিন্তু সায়েন্স ফিকশন অনুরাগীদের কাছে নয়। এই ভরসাতেই ফ্যানাটিক বদনামের ঝুঁকি নিয়েও লিখতে বসেছি এই কাহিনি। দীর্ঘ এই অ্যাডভেঞ্চারের পাতায় পাতায় অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা তুলে ধরেছি, অতি-তথ্যনির্ভর করতে যাইনি অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্যে। এ কাহিনি বিজ্ঞান-প্রবন্ধ পাঠকদের জন্যেও নয়, কল্পবিজ্ঞান রসিকদের জন্যে। ভূতের গল্প যেমন ভূতেদের জন্যে লেখা হয় না, কল্পবিজ্ঞানও তেমনি বিজ্ঞানীদের জন্যে লেখা হয় না। তাই বৈজ্ঞানিক তথ্যে ভারাক্রান্ত করে দ্রুতগতি উপাখ্যানটাকে মন্থর বিরক্তিকরও করতে চাই না। অতি-তথ্যনির্ভরতা একটা ব্যাধি— কল্পবিজ্ঞান কাহিনিকাররা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হন বলেই তো কল্পবিজ্ঞান সোনার পাথরবাটি হয়ে দাঁড়ায়। না প্রবন্ধ, না গল্প— এক অপরূপ বস্তুতে পরিণত হয়।

গৌরচন্দ্রিকাটুকু সেরে নিলাম পরবর্তী অবিশ্বাস্য অধ্যায়টুকুর জন্যে। এরপর যে ঘটনাপরম্পরা উপস্থাপিত করা হবে, তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবাসটুকুই কেবল থাকবে, কচকচি থাকবে না। কল্পবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য চিত্তরঞ্জনের আবরণে বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করা, যাতে অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানতৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে পারে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে। আমিও বলব, পরবর্তী অকল্পনীয় ঘটনাপরম্পরা পাঠান্তে পাঠকপাঠিকারা যেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। যা লিখব, তার প্রতিটি অক্ষর সত্য, প্রতিটি ঘটনা ঘটে গেছে চৌত্রিশশো বছর আগে এবং তারপরে। আমি তা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কিন্তু তথ্যনির্ভর বালখিল্য বিজ্ঞানেতিহাসে এখনও তার ঠাঁই হয়নি।

এবার আসা যাক কাহিনিতে।

উন্মত্তের মতো ধোঁয়াটার দিকে চেয়েছিলেন প্রফেসর। আমি চোখ ছোট করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। অস্বাভাবিক দ্রুতহারে বড় হয়ে উঠতে লাগল ধোঁয়ার কণা। আকার নিল অগ্নিকণার। সেইসঙ্গে দেখা গেল আরও কতকগুলো ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ। ছিটকে ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে শুধু একটি স্ফুলিঙ্গ। ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে...আরও বড়...আরও...আরও...

ঘাবড়ে গেলাম। হাত চেপে ধরলাম প্রফেসরের, 'কী ওটা?'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থেকে যেন স্বগতোক্তি করলেন প্রফেসর, 'কমেট!'

'কমেট! মানে, ধূমকেতু?'

'হ্যাঁ।'

আমার মস্তিষ্ক মন্থর, আমার ব্রেন অল্প, আমার বুদ্ধি কম, আমি নির্বোধ, আমি আহাম্মক, আমি অপদার্থ, আমি যে কিছু না, আমি তা জানি। কিন্তু সেই মুহূর্তে কেন জানি না সচল হল আমার ব্রেন। আসলে মানুষের মগজের খবর আজও কেউ পায়নি। পুরো মগজটা কখনওই সক্রিয় হয় না, হলে মানুষ রাতারাতি অতিমানুষ হয়ে যেত।

আমার নিষ্ক্রিয় মগজের জন্যেই তো এত গালমন্দ খাই। কিন্তু তাতে আমার কচু হয়। কেননা, সত্যিই তো আমার মগজ আছে। যতটা বোকা বলা হয় আমাকে, ততটা বোকা আমি নই। নইলে ধূমকেতু শব্দটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অলস মগজটা সহসা অত চঞ্চল হবে কেন? কেন ডায়নামোর মতো তড়িৎপ্রবাহে ভাসিয়ে দেবে আমার মস্তিষ্কের লক্ষকোটি কোষকে? কেন চকিতের মধ্যে মনে পড়ে যাবে এমন কতকগুলো কথা যা আমার মতো জড়মস্তিষ্কের মনে রাখা উচিত নয়?

কথাগুলো প্রফেসরকেও বলিনি। বলার সুযোগ বা সময়ও পাইনি। যা ঠাসবুনুনি অ্যাডভেঞ্চার চলছে, ফাঁক পেলে তো বলব। এখন বললাম।

'প্রফেসর।'

আমার বিদ্যুৎ প্রবাহিত ডায়নামো-মগজের তাড়নায় কণ্ঠস্বরেও পরিবর্তন এসেছিল। সম্বিৎ ফিরল প্রফেসরের। আগুয়ান স্ফুলিঙ্গের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। বিস্মিত চাহনি। আমার মুখভাব নিরীক্ষণ করলেন। বললেন, 'কী হল, দীননাথ?'

'আপনাকে কতকগুলো কথা বলতে একদম ভুলে গেছিলাম।'

'এখন কথা শোনার সময় নয়। যে আসছে, তাকে দেখো।'

'যে আসছে, কথাগুলো তার সম্পর্কেও তো হতে পারে।'

স্পষ্টত চমকে উঠলেন প্রফেসর, 'ধূমকেতু সম্পর্কে?'

'মনে হয়।'

'কী কথা বলো, তাড়াতাড়ি বলো, হেঁয়ালি বাদ দাও।'

'তাড়াতাড়ি বলা যাবে না, প্রফেসর। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। টাইম মেশিন যখন উলটে পড়ে থেকে গিয়েছিল রিসার্চ হসপিটালে, তখনকার কথা। আপনাকে কবজায় এনে ফেলেছিল ভাইরাস-হুজুর। আপনার চোখে দেখেছিলাম নীল আগুন। আপনার কণ্ঠে শুনেছিলাম অপার্থিব এক বক্তৃতা। আপনার মুখ দিয়ে আত্মকাহিনি শুনিয়ে গিয়েছিল ভাইরাস-হুজুর পরমোল্লাসে। আপনি আমাকে নির্বোধ বলেন, মূর্খ বলেন, গবেট বলেন, কিন্তু সেই দীর্ঘ বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে ওই ধূমকেতুকে দেখে।'

চোখ জ্বলে উঠল প্রফেসরের। চাপা আর্তনাদের সুরে বললেন, 'ইডিয়ট! এতক্ষণ তা বলোনি কেন?'

'আবার ইডিয়ট বলছেন?'

'একশোবার বলব, হাজারবার বলব। দেরি করো না, ফের ভুলে যাবে। ঠিক যেরকমভাবে শুনেছ, সেইভাবে বলে যাও।'

'আমি রেগে গিয়ে ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলেকে বলেছিলাম, যে চুলোয় ছিলে, সেই চুলোয় বিদেয় হও। প্রফেসরকে রেহাই দাও। ভাল বলিনি?'

'শাট আপ! ভাইরাস কী বলল? কোন চুলো থেকে এসেছে বলল কিছু?'

'হ্যাঁ, বলল। বলল, আমার চুলোর কি ঠিক আছে হে? আমি ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি নক্ষত্রদের পাশ দিয়ে, ছায়াপথের পর ছায়াপথের মধ্যে দিয়ে, কত তারকার জন্ম দেখেছি, কত তারকার বিস্ফোরণ দেখেছি, ধূমকেতুর উড়ে যাওয়া দেখেছি, কত গ্রহকে ধূমকেতুর ধাক্কায় নতুন রূপ নিতে দেখেছি, যেমন ঘটেছিল তোমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে, ধূমকেতুর ধাক্কায় মহাপ্লাবন হল, অগ্ন্যুৎপাত ঘটল, আকাশ থেকে পাথরবৃষ্টি হল, পেট্রল বৃষ্টি হল, পৃথিবীটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, আমি তখন পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, সমুদ্র ফুটছে, মহাদেশ তেতে লাল হয়ে গেছে, পাথর গলে যাচ্ছে, জঙ্গল পুড়ছে। আমি দেখলাম, বৃহস্পতি গ্রহের খানিকটা অংশ ছিটকে এসে ধূমকেতু হয়ে গেল, পৃথিবীটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে নিজে হয়ে গেল আর একটা গ্রহ, তোমাদের এখনকার শুক্রগ্রহ। পৃথিবীতে পালে পালে মানুষ মরছে দেখে টহল দিতে গেলাম ছায়াপথের অন্য অঞ্চলে। ফিরে এসে দেখি পৃথিবীতে আবার মেধার সৃষ্টি হয়েছে। সারা গ্রহটাকে চরকিপাক দিয়ে সন্ধান পেলাম তোমার এই গুরুদেবের, যার চাইতে বড় মেধা আজও কোথায় পাইনি। হে মূর্খ, আমার মধ্যে শক্তি আছে, তবুও আমি অসহায়, কারণ আমার দেহ নেই। আমি সর্বশক্তিমান হয়েও নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকেছি, প্রাণময় হয়েও নিষ্প্রাণ থেকেছি, মন আর মেধার সন্ধানে বুভুক্ষের মতো হন্যে হয়ে এক নক্ষত্রজগৎ থেকে আরেক নক্ষত্রজগতে পাড়ি জমিয়েছি। আজ আমার অভিযান সার্থক হয়েছে, পেয়েছি উপযুক্ত আধার, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এখন আমার!'

প্রফেসর কিন্তু আমার দিকে কান ফিরিয়ে থাকলেও চেয়েছিলেন সুদূর স্ফুলিঙ্গটির দিকে, আরও কাছে এগিয়ে এসেছে, পুচ্ছ দেখা যাচ্ছে। জ্যোতির্ময় একটা রেখা বিস্তৃত পেছনে। ঠিক যেন ঝাঁটা। চুলের রাশি লম্বমান পেছনদিকে।

ধ্যানস্থ কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'দীননাথ, এই সন্দেহটা তো আমার মনেও অঙ্কুরিত হয়েছে।'

'আপনার মনেও?'

'এত কথা মনে আছে, আমার কথাগুলো মনে পড়ছে না? আশ্চর্য ব্রেন বটে! মিউজিয়ামে রেখে দেওয়ার মতো। ভাইরাসকে যখন বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে, বাধা দিইনি আমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন, বটে, ওকে ওর ডেরায় নিয়ে যাবেন। ড. কৌ জানতে চেয়েছিলেন, ডেরাটা কোথায়। জানতে চেয়েছিলেন, কী করবেন সেখানে ওকে নিয়ে গিয়ে। আপনি বলেছিলেন—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'নিস্তেজ ভাইরাসকে নিয়ে গিয়ে ওদের সাঙ্গপাঙ্গদের বুঝিয়ে দেব মানুষের পেছনে লাগতে এলে পরিণামটা কী হয়। তারপর তুমি

আর আমি দু'জনেই যখন ওদের অবধ্য ঙ-৩০৯ ছড়িয়ে দেব যাতে প্রত্যেকেই নিস্তেজ শক্তিহীন হয়ে যায়, ভবিষ্যতে ডেরা থেকে কেউ ছিটকে বেরিয়ে এসে ছায়াপথের বিপদ ডেকে আনতে না পারে। আমার সে প্ল্যান তো ভন্ডুল হয়ে গেল।'

'ভালই হয়েছে। ওই বিটলেদের আস্তানায় যাওয়ার আমার কোনও ইচ্ছেই ছিল না। কিন্তু প্রফেসর, ধূমকেতুর সঙ্গে ভাইরাসের কি সম্পর্ক?'

প্রফেসর সেকথার জবাব না দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো এত তাড়াতাড়ি ধূমকেতুটা কেন এগিয়ে আসছে?' বলেই আমার জবাবের অপেক্ষা না রেখে বললেন, 'ভবিষ্যৎ থেকে আমরা যে ছুটে যাচ্ছি অতীতে আর ধূমকেতু আসছে অতীত থেকে ভবিষ্যতে, মহাকালের পথে মুখোমুখি হচ্ছি বলেই ওর স্পিড এত বেশি মনে হচ্ছে।'

'মুখোমুখি হচ্ছি!' আঁতকে উঠলাম আমি, 'বলেন কী? মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তো—'

'মাভৈঃ, মূর্খ! আমরা রয়েছি অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে, কোনও বস্তু আমাদের সংহার করতে পারবে না, ফুঁড়ে বেরিয়ে যাব!'

'অ।'

'তার মানে কিছুই বোঝোনি।'

'আলবৎ বুঝছি। ঝড় ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো আমরাও বেরিয়ে যাব। এই তো?'

'তার চাইতে বেশি। ঝড় তো আমাদের কোষের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না, এই ধূমকেতুর মধ্যে কিন্তু আমাদের কোষগুলো মিশে যাবে। সেই সময়ে যদি সময়গাড়ি বিকল হয়, অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশন থেকে বেরিয়ে আসি, তা হলেই জানবে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটবে।'

সভয়ে বললাম, 'তা হলে দরকার নেই ধূমকেতুর ভেতরে ঢুকে, বাইরে থাকুন। আপনার মেশিনকে বিশ্বাস নেই।'

কড়া গলায় প্রফেসর বললেন, 'আমার মেশিনকে তোমার চাইতেও আমি বেশি বিশ্বাস করি, ননসেন্স কোথাকার। আসলে আমি বাইরে থাকব অন্য কারণে, যে প্রলয়ের ফলে পৃথিবীর সব ক'টা মহাকাব্যে, পুরাণে, কিংবদন্তিতে একটাই কাহিনির সৃষ্টি, তা স্বচক্ষে দেখব।'

'কী কাহিনি?'

'মহাপ্লাবন।' একটু থেমে বললেন, 'আরও অনেক কিছু।'

'প্রফেসর!'

কিন্তু তিনি তখন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলে চলেছেন, 'মানুষের জ্ঞানের আধার কি সম্পূর্ণ হয়েছে? মানুষ মনে করে মাত্র কয়েক ধাপ এগোলেই বুঝি ব্রহ্মাণ্ড বিজয় সম্পূর্ণ হবে? ভুল, ভুল! পরমাণু থেকে শক্তি আহরণ করেই মানুষ অহংকারে মত্ত হয়েছে, কিন্তু আজও সে জানে না ক্যানসার রোগ কী করে সারানো যায়, বংশগতিকে কী করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অন্য গ্রহের সঙ্গে কীভাবে চিন্তা বিনিময় করা যায়। অন্যান্য গ্রহে আদৌ জীবন্ত প্রাণী আছে কিনা আজও যে-বিজ্ঞান জানতে পারেনি, মহাশূন্যের ভাইরাস-আক্রমণের কাহিনির ঠাঁই সে বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনওদিনই হবে না।'

'বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঠাঁই না হোক, কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসে তো ঠাঁই হতে পারে?' ফাঁক পেয়েই বলে উঠলাম আমি।

কিন্তু প্রফেসর তখন রোমন্থননিমগ্ন। আপন মনেই বলে চলেছেন, 'অজ্ঞান মানুষ! এত দম্ভ কেন তোমার? আজও তুমি জানো না প্রাণ কী, কোত্থেকে তার আগমন, অজৈব বস্তু থেকে কি না— তাও সঠিক জানা নেই। এই সূর্য বা অন্যান্য সূর্যের গ্রহ-পরিবারেও আদৌ প্রাণ আছে কি না, থাকলেও তারা আমাদের মতন কি না, তাও তুমি জানো না। তুমি জানো না মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত রহস্য কী, তুমি জানো না তোমার পায়ের পাঁচ মাইল তলায় পৃথিবীর চেহারাটা কীরকম, তুমি জানো না পাহাড়-পর্বত আর মহাদেশের পর মহাদেশের সৃষ্টি হল কী করে। অনুমিতির অন্ত নেই তোমার, কিন্তু জানো কি, কেন এই সেদিনও হিম আবরণে ঢাকা ছিল ইউরোপ আর নর্থ আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চল? জানো কি মেরুবৃত্তের মধ্যে তালবৃক্ষ জন্মায় কী করে? একই উদ্ভিদকে কেন পাওয়া গিয়েছে ইউরোপ আর আমেরিকার ভেতরকার সরোবরে? জানো কি সমুদ্রে লবণ এল কোত্থেকে? মানুষ! লক্ষ লক্ষ বছর এই পৃথিবীর বুকে তুমি রয়েছ। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস জেনেছ মাত্র কয়েক হাজার বছরের, তাও পুরোপুরি জানোনি। বলো তো, ব্রোঞ্জযুগ লৌহযুগের আগে এসেছিল কেন মানবসভ্যতায়? লোহা তো আরও বেশি করে ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে, তামা আর টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ উৎপাদনের চেয়েও সহজ হল লৌহ উৎপাদন। তবে কেন ব্রোঞ্জযুগ এল লৌহযুগের আগে? জানো না, হে মূর্খ মানুষ, তুমি তা জানো না। তুমি জানো না, কোন যান্ত্রিক উপায়ে অ্যান্ডিজ পর্বতের উচ্চ অঞ্চলেও নির্মিত হয়েছিল বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে বিপুল ইমারত। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের সমাধানও আজও তুমি করে উঠতে পারোনি। পৃথিবীর সব দেশেই মহাপ্লাবনের কিংবদন্তি পাওয়া যায় কেন বলো তো? মহাপ্লাবনের পূর্ববর্তী যুগটাকে অ্যান্টিডিলিউভিয়ান যুগ বলেই খালাস তোমরা, কিন্তু শব্দটার প্রকৃত দৃশ্য সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক ধারণা কি তোমার আছে?'

বিষম ভয় পেলাম। পাগল হয়ে গেলেন নাকি প্রফেসর? এদিকে তো ভীষণ বেগে ছুটে আসছে মূর্তিমান প্রলয়, ওই ধূমকেতু! প্রফেসরের মস্তিষ্কের উন্মাদবীজ কি ঠিক এই সময়েই অঙ্কুরিত হল? কিন্তু ওঁকে ঘাঁটাতেও সাহস পেলাম না। পাগলের মতোই বিড়বিড় করে চললেন আগন্তুক ধূমকেতুর দিকে চেয়ে থেকে, সম্মোহিতের মতো।

'মানুষ! হে মূর্খ মানুষ! অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছ তুমি! কিন্তু কতটুকু জানো তুমি? তুমি দেখছ সূর্য রোজ পুবে উঠছে, অস্ত যাচ্ছে পশ্চিমে। তুমি জানো চব্বিশ ঘণ্টায় হয় একটা দিন। ৩৬৫ ঘণ্টা ৫ দিন ৪৯ মিনিটে হয় একটা বছর। কলা পরিবর্তন করে চাঁদ আবর্তন করছে পৃথিবীকে, আসছে অমাবস্যা আর জ্যোৎস্না, শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ। মনের আনন্দে কবিতা লিখে চলেছ তাই নিয়ে। তুমি জানো ভূগোলকের অক্ষরেখা রয়েছে ধ্রুবতারা বরাবর এক লাইনে। তুমি জানো, শীতের পর আসে বসন্ত, তারপর গ্রীষ্মের পর বর্ষা। মামুলি ঘটনা, কে না জানে। কিন্তু এই নিয়ম কি অপরিবর্তনীয় নিয়ম? এইভাবেই কি চলবে চিরটা কাল? এইভাবেই কি ছিল চিরটা কাল? আসছে... ওই ধূমকেতু আসছে তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে।'

দম নেবার জন্যে এক সেকেন্ড থামতেই আমি ত্রস্তে বললাম, 'কিন্তু ও যে এসে গেল—'

'আসুক, আজকের যা কিছু সম্পদ পৃথিবীর, তা ওই প্রলয়রূপী ধূমকেতুর জন্যেই, আবার যা কিছু বিপর্যয়, তাও ওই ওর জন্যে। ভাইরাস সংক্রমণের বিভীষিকার বীজও ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে ওই কালান্তক ধূমকেতু... তবুও তুমি এসো, তুমি এসো, তুমি এসো... আমি যে পথ চেয়ে বসে আছি তোমার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় লীলা প্রত্যক্ষ করার জন্যে। তুমিই একত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর! তোমাকে প্রণাম!'

উন্মাদ...একেবারেই উন্মাদ হয়ে গেছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। তাঁর করজোরে ধূমকেতু-বন্দনার দেহভঙ্গিমা দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল আমার। এদিকে সেই করালপুচ্ছ দীর্ঘতর হয়েছে... প্রজ্বলিত শীর্ষদেশ বৃহত্তর হয়েছে... পাগল প্রফেসরকে থামাই কী করে?

আপন মনেই প্রফেসর তখন হাসছেন, 'এসো, এসো, হে অবিনেশ্বর, তুমি এসো! বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদে তোমার কীর্তি রূপকের মাধ্যমে বন্দিত হয়েছে, কিন্তু তোমাকে কেউ দেখেনি। ইতিহাস আর পুরাণে তোমার কাহিনিই নানান গল্পের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে, কিন্তু তোমার কথা সবাই ভুলে গেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিনকালের মধ্যে বিচরণ করার ক্ষমতা লাভ করে আজ তোমার অতীত কীর্তি প্রত্যক্ষ করতে চলেছি, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের মধ্যে দিয়ে তোমার অপরূপ বিহার দেখে নয়ন সার্থক করছি। নদ-নদী, সমুদ্র, পর্বত, গ্রাম, নগর, উপবন তোমারই সৃষ্টি, এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে তুমি না থাকলে আজ এই অবস্থায় মানবজাতি উন্নীত হতে পারত না, তোমাকে নমস্কার।'

'প্রফেসর!'

'শাস্ত্রে আছে, প্রথমত এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। সে শাস্ত্র রচিত হয়েছিল তোমার আবির্ভাবের পর। তাতে লেখা ছিল, অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হল। ওই অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়, সত্যস্বরূপ, নির্বিকার, জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হলেন। কে সেই ব্রহ্ম? সে কি তুমি? তোমার থেকেই জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশদিক, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি এবং অন্যান্য বস্তু সঞ্জাত হয়েছিল? প্রলয়কাল উপস্থিত হলে আবার কি এই সবই তোমার মধ্যে লীন হয়ে যাবে? পরব্রহ্ম কল্পনা করা হয়েছে কি তোমাকেই? আর কোনও চিহ্ন থাকবে না? প্রলয়, উৎপত্তি, স্থিতি, ঘূর্ণায়মান সংসারচক্রের মূল কি তুমি? শেষের সেদিনের সম্ভাবনা কি শাস্ত্রে এইভাবেই বর্ণিত হয়েছে? তুমি আসবে মহাকালের পথ পেরিয়ে প্রলয়বিষাণ বাজিয়ে তোমারই সৃষ্টিকে সংহার করতে? সেই কি কলিযুগের শেষ?'

'প্রফেসর! প্রফেসর! দোহাই আপনার?'

'চুপ করো মানুষ! মূর্খ মানুষ!'

'যাচ্চলে! এ তো দেখছি বদ্ধ উন্মাদ!'

উন্মাদের গলা তখন ধাপে ধাপে চড়ছে, 'সূর্যের আছে ন'টা গ্রহ। বুধের কোনও উপগ্রহ নেই। শুক্রেরও কোনও উপগ্রহ নেই। পৃথিবীর আছে একটা চাঁদ। মঙ্গলের আছে ছোট ছোট দুটো উপগ্রহ, পাথরের দুটো ডেলা বলা যায়, দুটোর একটা এত তাড়াতাড়ি আবর্তন সম্পূর্ণ

করছে যে মঙ্গলের একটা দিনও ততক্ষণে ফুরোচ্ছে না। কিন্তু বৃহস্পতির আছে এগারোটা চাঁদ আর এগারোটা বিভিন্ন হিসেবের মাস। শনির আছে ন'টা চাঁদ। ইউরেনাসের আছে পাঁচটা চাঁদ। নেপচুনের একটা, প্লুটোর কেউ নেই। এইরকম কি ছিল চিরটা কাল? এইরকমই কি থাকবে চিরটা কাল? হে ধূমকেতু, তোমার মতোই আর একজন এসে আবার সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবে না তো? গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে নতুন প্রলয়, নতুন উৎপত্তি, নতুন স্থিতির সূচনা করে যাবে না তো?

'সূর্য তো পাক দিচ্ছে পুব দিক দিয়ে। সমস্ত গ্রহরা সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে নিজের নিজের কক্ষপথে একইদিকে। বেশিরভাগ চাঁদই ঘুরছে একই দিকে, মানে, ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘুরছে, তার উলটোদিকে। কিন্তু কয়েকটা চাঁদ তো এই নিয়ম মানে না? তারা কেন বিপরীত দিক দিয়ে আবর্তন করে? তা ছাড়া, কারওর কক্ষপথই তো দেখছি সঠিক বৃত্ত নয়। গ্রহদের প্রতিটি কক্ষপথে খামখেয়ালিপনার চূড়ান্ত। প্রত্যেকের ডিমের মতো কক্ষপথ বিস্তৃত এক-একদিকে।'

পাগলা ঘোড়াকে আচমকা রাশ টেনে হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া মুশকিল। তার সঙ্গে কিছুটা দৌড়ে একটু একটু করে গতি মন্দীভূত করাই সংগত। এই কৌশলই প্রয়োগ করলাম প্রফেসরের ক্ষেত্রে। বিষে বিষক্ষয় করা আর কী। ওঁর পাগলামির সঙ্গে আমিও জুড়লাম আমার পাগলামি।

ওদিকে কিন্তু ক্রমশ রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে ধূমকেতু। কালো মহাকাশের বুকে অজস্র রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'উলটো পালটা হওয়া আশ্চর্য কি? হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান?'

'কী চমৎকার উপমাই দিলে! আহা! আহা! হাতের পাঁচটা আঙুল অসমান সব মানুষেরই। সবার কড়ে আঙুল ছোট হয়, মধ্যমা বড় হয়, সেখানেও একটা মিল আছে। কিন্তু গ্রহদের ক্ষেত্রে, উপগ্রহদের ক্ষেত্রে কেন এত অমিল? কেন বুধ সবসময় একদিক সূর্যের দিকে ফিরিয়ে থাকে, কিন্তু শুক্র থাকে না? কেন মঙ্গল ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২.৬ সেকেন্ডে একপাক খায়, অথচ পৃথিবীর চেয়ে ১৩০০ গুণ বড় হয়ে একপাক খেতে বৃহস্পতিবার সময় লাগে মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট? প্লুটো পুব থেকে পশ্চিমে ঘোরে বলে তার সূর্যোদয় ঘটে পশ্চিমে, কিন্তু ইউরেনাসের সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত পুবেও হয় না, পশ্চিমেও হয় না। কাজেই সৌরজগতের সব গ্রহরাই যে কেবল পশ্চিম থেকে পুবে ঘুরবে এবং সূর্য কেবল পুবেই উঠবে, এমন নিয়ম নেই। আশ্চর্য নয় কি?'

'গ্রহগুলো তো আর সূর্যের হাত-পা নয় যে একই নিয়মে চলবে?' টিপ্পনি কাটলাম আমি।

অন্যসময়ে হলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন প্রফেসর। সেই মুহূর্তে আগুয়ান ধূমকেতুর সম্মোহনী প্রভাবে উনি যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার টিটকিরি কানে ঢুকেছে বলেও মনে হল না।

বললেন, সেইরকমই আচ্ছন্ন গলায়, 'কত প্রহেলিকাই ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে, কয়েকটার ব্যাখ্যা এখুনি দেখতে পাবে চোখের সামনে। কিন্তু বাকিগুলোর ব্যাখ্যা তো

আজও বিজ্ঞানীরা ভেবে বার করতে পারেননি? তবে কেন এত লম্ফঝম্ফ? এত সবজান্তা ভাব? এই ঋতু পরিবর্তনের ব্যাপারটাই ধরো না কেন। পৃথিবীর বিষুবরেখা ক্রান্তিবৃত্তের সমতলে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোণ করে রয়েছে বলেই শীত গ্রীষ্ম বর্ষার আনাগোনা। কিন্তু অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রে অক্ষরেখা তো খেয়ালখুশিমতো হেলে রয়েছে। একই নিয়মে সব গ্রহে তো শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্তর জয়যাত্রা ঘটে না? কেন? দীননাথ? কেন? কে তার জবাব দেবে? ইউরেনাসের অক্ষরেখা কক্ষপথের প্রায় সমতলে থাকায় প্রায় কুড়ি বছর ধরে একটা মেরুপ্রদেশ সবচেয়ে গরম থাকে, আস্তে আস্তে নামে রাত্রি— আরেক মেরুপ্রদেশে শুরু হয় বিশ বছরের গ্রীষ্ম। চাঁদের কোনও আবহমণ্ডল নেই। বুধের আছে কিনা জানা নেই। শুক্র ঘন মেঘে ঢাকা। কিন্তু জল-বাষ্প একদম নেই। মঙ্গলের আবহমণ্ডল স্বচ্ছ, কিন্তু অক্সিজেন তার আবহমণ্ডলে নেই বললেই চলে। বৃহস্পতি আর শনিকে ঘিরে আছে গ্যাসের খোলস, তাদের দেহ নিরেট কিনা জানা যায়নি। মঙ্গলের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ০.১৫, কিন্তু পরের গ্রহ বৃহস্পতি মঙ্গলের চেয়ে ৮,৭৫০ গুণ বড়। সৌরজগতের বাসিন্দা হয়েও গ্রহদের অবস্থান বা আকারে কোনও মিল নেই। অবাক কাণ্ড, তাই না? মঙ্গলে দেখা যায় 'খাল' আর মেরুকিরীট, চাঁদে জ্বালামুখ, পৃথিবীতে আয়নার মতো আলোক প্রতিফলনকারী সমুদ্র, শুক্রে ঝলমলে মেঘ, বৃহস্পতিতে বেল্ট আর একটা লাল ফুটকি, শনিতে আংটি। বিচিত্র! বিচিত্র!'

এরকম বিচিত্র পরিস্থিতিতে আমিও কখনও পড়িনি। সময়গাড়ি ধেয়ে চলেছে মহাকালরূপী ধূমকেতুর দিকে, আর কানের কাছে চলছে পাগলের প্রলাপ অনর্গলভাবে।

'তা হলেই দেখো দীননাথ, গ্রহ-নক্ষত্রের বৈষম্য নিয়েই গড়ে উঠেছে, আশ্চর্য একতা। এদের সাইজ আলাদা, চেহারা আলাদা, আবর্তনের গতিবেগ আলাদা, অক্ষরেখা বসানো উলটোপালটাভাবে, আবহমণ্ডলের উপাদান আলাদা অথবা আবহমণ্ডল বলে আদৌ কিছু নেই, চাঁদের সংখ্যা আলাদা অথবা চাঁদ বলে কিছুই নেই। যেন দৈবাৎ পৃথিবীর বরাতে একটাই চাঁদ জুটেছে, দিন আর রাত পেয়েছি, একদিনে চব্বিশটা ঘণ্টা পেয়েছি, ঋতু পরিবর্তন পেয়েছি, সমুদ্র পেয়েছি, জল পেয়েছি, আবহমণ্ডল পেয়েছি, অক্সিজেন পেয়েছি, বাঁয়ে শুক্র আর ডাইনে মঙ্গলকে পেয়েছি। সবটাই কি বরাত, না, এর পেছনে কারও কারসাজি আছে? সে কি ওই ধূমকেতু, না আর কেউ?'

'যেই হোক না,' মিনতির সুরে এবার বললাম, 'এখনই কি তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে?'

'গবেষণা!' যেন আকাশ থেকে পড়লেন প্রফেসর, 'গবেষণা করেই কি সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় হে মূর্খ? নিউটন তো বলেই খালাস মহাকর্ষই গ্রহদের টেনে রেখে দিয়েছে, ছিটকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে না। গ্রহটা টেনে রেখে দিয়েছে উপগ্রহদের, নইলে কে কবে কোথায় উধাও হয়ে যেত। খুব ভাল কথা। কিন্তু নিউটন মহাশয় তো একবারও ব্যাখ্যা করে দেননি কীভাবে এবং কখন প্রাথমিক টানা-হেঁচড়া শুরু হয়েছিল? গবেষণায় তো পাওয়া গেছে অষ্টরম্ভা। গ্রহজগতের সৃষ্টিরহস্যেরই সন্তোষজনক সমাধান করতে পেরেছে কি গবেষণা? ফরাসি বিজ্ঞানী লাপ্লাস তো তাঁর নীহারিকাবাদ দিয়ে একসময়ে খুব হইচই

ফেলেছিলেন। ঘূর্ণীয়মান নীহারিকা থেকেই নাকি সূর্য আর গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি। সূর্যটা আগে ছিল নাকি একটা চ্যাপটা চাকতির মতো। ঘুরতে ঘুরতে তার কিনারাগুলো খসে গিয়ে গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই তত্ত্বের যে তিনটি ত্রুটি পরে ধরা পড়ল, তার অন্যতমটি হচ্ছে, তাই যদি হবে তো সৌরজগতের বেশিরভাগ সদস্য যেদিকে ঘুরপাক খায়, কয়েকটা উপগ্রহ কেন তার উলটোদিকে ঘোরে? কাজেই নাকচ হয়ে গেল লাপ্লাস থিয়োরি। হাজির হল জোয়ারি মত। একটা বিরাট তারা সূর্যের খানিকটা অংশ পেটমোটা চুরুটের আকারে ছিঁড়ে নিয়েছিল, তাই থেকেই গ্রহ উপগ্রহ জন্ম নেয়। কিন্তু পেটমোটা চুরুটের মতো অংশ থেকে যাদের জন্ম, তাদের সাইজগুলোও তা সেইভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে আবার ছোট হয়ে যাওয়া উচিত। সূর্যের কাছে বুধ খুবই ছোট ঠিকই, সূর্যের একদম দূরের প্লুটোও খুব ছোট। কিন্তু পৃথিবী আর বৃহস্পতির মাঝের গ্রহ মঙ্গলের সাইজ তো পৃথিবীর চেয়ে বড় হওয়া উচিত ছিল? কেন হয়নি? নেপচুনও তো ইউরেনাসের চেয়ে বড়, ছোট তো নয়। কাজেই নাকচ হয়ে গেল জোয়ারি মতও। এগিয়ে এল যুগ্ম-নক্ষত্র মত। সূর্য নাকি আগে জোড়া তারা ছিল। একটি তারার বিস্ফোরণ থেকে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি। এ মতেরও খুঁত বেরিয়েছে। এত গবেষণা করেও সৌরজগতের সৃষ্টি আজও রহস্যাবৃত। তবে আর গবেষণা গবেষণা করে লাফাচ্ছ কেন?'

'লাফাচ্ছি না, ওই ধূমকেতুটা—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধূমকেতু প্রসঙ্গেই আসছি এবার। ধূমকেতুর উৎপত্তি নিয়েও কি কম গবেষণা হয়েছে? নীহারিকাবাদ আর জোয়ারি মত তো ধূমকেতুর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি। হাজির হয়েছে অনেক মতবাদ। কিন্তু কোনওটাই সন্তোষজনক নয়। সূর্য কি সংকুচিত হওয়ার ফলেই ধূমকেতুদের ছিটকে বার করে দিয়েছে? সূর্যের পাশ দিয়ে আরেকটা নক্ষত্র যাওয়ার সময়েই কি ধূমকেতুদের বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে? ধূমকেতুরা কি সৌরজগতের বাইরে অন্যান্য নক্ষত্রজগৎ থেকে এসে বড় গ্রহগুলোর টানে ধরা পড়ে গিয়েছে? বড় গ্রহগুলো কি নিজেদের দেহ থেকে ধূমকেতুদের ঠেলে বার করে দিয়েছে? কেউ জানে না, কেউ জানে না কোটি কোটি বছর আগে আসলে কী ঘটেছিল।'

'আপনিই সব জেনে বসে আছেন,' আর রাগ চেপে থাকতে পারলাম না। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? ওদিকে ধূমকেতুর করালরূপ রক্তহিম করে দিচ্ছে, এদিকে কানের কাছে বিশ্বকোষ সরব রয়েছে। অসহ্য! অসহ্য!

প্রফেসর কিন্তু অম্লানবদনে বললেন, 'তা তো জানিই। ধূমকেতু যে এক মজার জিনিস, দীননাথ।'

'মজার জিনিস! ল্যাজটা কত লম্বা হয়ে গেছে দেখেছেন? ওর ঝাপটায় তো পৃথিবী এখুনি খানখান হয়ে যাবে।'

'খানখান যে হয়নি, তা তুমিও জানো। সেকালের লোকেই ল্যাজের ওই অদ্ভুত চেহারা দেখে ভয়ে মরত। তটস্থ হয়ে থাকত। কিন্তু ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতুর ল্যাজ পৃথিবীকে ঝাঁট দিয়ে চলে গেছিল, কেউ কিন্তু কিচ্ছু টের পায়নি। একটা গাছের পাতারও কিছু হয়নি। অসম্ভব হালকা ল্যাজ তো, খুবই ফাঁকা ফাঁকা। তাতে ধাক্কা লাগবে কী?'

'কিন্তু এর ঝাঁটা তো দেখছি লম্বা চুলের মতো।'

'হবেই তো। ওইজন্যেই তো ওর নাম কমেট, মানে, 'লম্বা চুলওয়ালা'।

'কী ভয়ংকর!'

'এ আর কি ভয়ংকর দেখছ, দীননাথ। ১৮৬১ সালে যে ধূমকেতুটাকে এক বছর ধরে দেখা গিয়েছিল, তার ল্যাজটা ছিল সত্যিই ভয়ংকর— লম্বায় ১৫-২০ কোটি মাইল তো বটেই। আবার ১৭৪৪ সালে দ্য শীজোর ধূমকেতুর ছিল ছ'টা ল্যাজ!'

'হ্যালির ধূমকেতু তো পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে গেছিল?' একটু আশার সুরেই বললাম।

'তা গেছিল,' আমাকে একেবারে নিভিয়ে দিয়ে বললেন প্রফেসর, 'কিন্তু এই ধূমকেতুটা যাবে না। অথবা গিয়েও ফিরে আসবে।'

'আপনি তো সর্বজ্ঞ নন।'

'কিছু ব্যাপারে তো বটেই,' অনেকটা স্বাভাবিক স্বরে বললেন, প্রফেসর। 'সবাই তো আর পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। অনেক ধূমকেতুই বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি বড় গ্রহদের টানে পড়ে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে যেতে না পেয়ে তার মধ্যেই ঘোরে। বৃহস্পতিকে নিয়ে এত ভয় পাচ্ছি তো সেই কারণেই।'

'কেন?'

'এরকম তিরিশটা ধূমকেতুকে সে ধরে রেখে দিয়েছে। হ্যালির ধূমকেতু তো নেপচুনের টানে বন্দি হয়েছে। বুধের টানে এন্‌কে-র ধূমকেতুও এমনি বিপদে পড়েছিল— বেচারিকে সোয়া তিন বছর বাদে ঠিক দেখা যায় আজও। টানাটানিতে কত ধূমকেতুর ল্যাজ ছিঁড়ে গেছে, দেহটাও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। যেমন ধরো না কেন বায়েলা-র ধূমকেতু। বেশ পৌনে সাত বছর পরপর আসছিল। ১৮৪৬ সালে হঠাৎ দেখা গেল তার ল্যাজ নেই। দেহের মাঝখানটা সরু হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে মাঝখানটা ভেঙে দুটো আলাদা টুকরো হয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখা যায়নি। যেদিন তার আসার কথা ছিল, সেইদিন, মানে, ১৮৭২ সালের ২৭ নভেম্বর দেখা গেল আকাশে যেন আগুন বৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, বায়েলা-র ধূমকেতু ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রায় একই দশাই হবে ওই ধূমকেতুর। ঘাবড়াচ্ছ কেন?'

'ঘাবড়াচ্ছি কি আর সাধে? হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। তার ওপর আপনার বকবকানিতে—'

'মাথা ঘুরছে? সইয়ে দিচ্ছি, দীননাথ, সইয়ে দিচ্ছি, নইলে যে এর পরের দৃশ্য দেখলে হার্টফেল করবে। অজ্ঞানকে জ্ঞান দিয়ে যাওয়াটা ঝকমারি বুঝি, কিন্তু তোমাকে জ্যান্ত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো, তাই একটু জ্ঞানের ভ্যাকসিনেশন দিয়ে দিলাম, বড় জ্ঞানে আর কুপোকাত হবে না।'

'কিন্তু ওই ব্যাটাচ্ছেলের জন্মটা কোথায়, সে জ্ঞানটুকু তো দিলেন না? জানা নেই নিশ্চয়?'

'কোন ব্যাটাচ্ছেলের?'

'ওই ধূমকেতু ব্যাটাচ্ছেলের! চেহারাখানা দেখুন, ঠিক যেন ঝাঁটার ওপর বসে ডাইনি উড়ে আসছে।'

'অথবা ঢেঁকিতে বসে নারদ উড়ে আসছে। ঢেঁকিবাহন নারদ আর ঝাঁটাবাহন ডাইনির কল্পনা তো এইভাবেই পৃথিবীর সবক'টা দেশেই আজও রয়ে গেছে। সংঘর্ষ বাঁধিয়েছিল এই ধূমকেতু, তাই নাকি নারদ ঝগড়া বাধায়। বিপর্যয় ডেকে এনেছিল বলে ডাইনিও নাকি লোকের অনিষ্ট করতেই আসে। কিংবদন্তি আর পুরাণ কাহিনির সৃষ্টি হয়েছে তো এইভাবেই। আকাশের আতঙ্ক বহুপুরুষ পরে পুরাণ কাহিনির রূপ নিয়েছে। কিন্তু ছিঃ! দীননাথ, মহাশয় ধূমকেতুকে ব্যাটাচ্ছেলে বলাটা তোমার ঠিক হয়নি।'

'বাইরের উৎপাতকে ব্যাটাচ্ছেলে বলব না তো—'

'বাইরের উৎপাত কাকে বলছ? সূর্য আর বৃহস্পতির মাঝখানে পঞ্চাশটা ধূমকেতু ঘুরছে, তাদেরকে বাইরের উৎপাত বলতে পারো, ওকে নয়। ওর জন্মরহস্য আমি জানি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জীবন্ত বিশ্বকোষ আপনি।'

'ছিঃ ছিঃ! শুভলগ্নে মাথা গরম করাটা কি ঠিক? ধূমকেতুর জন্ম কেউ দেখেনি ঠিকই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে কোটি কোটি বছর আগে বড় গ্রহগুলো যখন গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে, তখন তাদের গা থেকে ধূমকেতু ছিটকে বেরিয়ে আসা বিচিত্র নয়। বৃহস্পতির গা থেকে সেকেন্ডে ৩৮ মাইল বেগে একটা পিণ্ড ছিটকে এলে তার পক্ষে মাধ্যাকর্ষণের টান এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, ওই যে ধূমকেতুটা আসছে ঝাঁকরা চুলের মতো ল্যাজ উড়িয়ে, ওকেও ঠেলে বার করে দিয়েছে বৃহস্পতি এইভাবে। তাই শুক্রকে না দেখে বৃহস্পতিকে খুঁজছিলাম। ভাইরাস হুজুর ঠিকই বলেছিল।'

'ধূমকেতুটাই হয়েছে শুক্র গ্রহ?'

'হ্যাঁ।'

পলকহীন চোখে আগন্তুক ধূমকেতুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খেয়াল হল একটা প্রশ্নের জবাব প্রফেসর এখনও দেননি। ধূমকেতুর সঙ্গে ভাইরাসের কী সম্পর্ক?

ফের জিজ্ঞেস করলাম প্রশ্নটা।

প্রফেসর আনমনাভাবে ধূমকেতুর দিকে চেয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে সংকুচিত হল দুই চক্ষু। চোখের চাহনি পালটে এল আস্তে আস্তে। কঠিন হয়ে এল চোয়ালের হাড়। স্ফীত হল নাসারন্ধ্র।

দু'বার ঠোঁট ফাঁক করলেন কী বলবার জন্যে, বলতে পারলেন না। টকটকে লাল রঙে অপার্থিব মনে হল তাঁর মুখচ্ছবিকে। তৃতীয় চেষ্টায় কথা ফুটল বটে কণ্ঠে, কিন্তু স্খলিত স্বর।

বললেন যেন সম্মোহনের ঘোরে, 'দীননাথ, সময় হয়েছে নিকট!'

২২
শেষের সেদিন ভয়ংকর

বিশ্বাসঘাতক ব্রেনকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারব না আমি তারপরের সবকিছু স্পষ্ট মনে করতে না পারার জন্যে। মেধাবী তাকেই বলে যে মগজের নানান কুঠরিতে জমানো স্মৃতি আর জ্ঞানকে প্রয়োজনমতো টেনে আনতে পারে। আমার ক্ষেত্রে তা হয় হঠাৎ— স্বইচ্ছায় নয়। তাই আমি মেধাবী নই। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

আমার এই স্মৃতিহীনতা কিন্তু শাপে বর হবে পাঠকপাঠিকার কাছে। প্রফেসরের ম্যারাথন লেকচারের একঘেয়েমিতে আর বিরক্তিবোধ জাগ্রত হবে না। আসলে আমার তখন মুহ্যমান অবস্থা। অজ্ঞান যে হয়ে যাইনি, এই যথেষ্ট। কিন্তু আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না। উন্মত্ততা শুধু আমাকে নয়, প্রফেসরকেও আক্রমণ করেছিল। উনি ক্ষিপ্তের মতো টাইম মেশিন চালনা করেছিলেন কখনও অতীতে, কখনও ভবিষ্যতে। কখনও রকেট জাহাজের মতোই মহাশূন্যের এদিকে সেদিকে। কখনও ব্যোমযানের মতো উল্কাবেগে পৃথিবীর পাহাড় পর্বত জঙ্গলের ওপর দিয়ে। পাগলের মতো চেঁচিয়ে গেছেন। পাগলের মতো হাত-পা ছুড়েছেন। পাগলের মতো সময়গাড়ি চালিয়েছেন। অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে থাকার ফলে সংঘাতের পর সংঘাত এড়িয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। পাথরবৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড আর সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মধ্যেও অক্ষত থেকেছি। ভূমিকম্প, ছাই, লাভা আমাদের গায়ে আঁচড়টিও ফেলতে পারেনি। কিন্তু বহু সময় আর বহু পথের ব্যবধানে এত কাণ্ড পরের পর দেখে গেছি যে ঘটনাপরম্পরা তো বটেই, সব ঘটনাও মনে থাকেনি। কিন্তু যেটুকু স্মৃতির কোঠা থেকে উদ্ধার করে এই কাহিনি শেষ করতে চলেছি, তা এমনই লোমহর্ষক, কল্পনাতীত এবং ভয়ংকর যে লিখতে লিখতেও হাত কাঁপছে আমার। জানি ছাপাখানার কম্পোজিটররা আমার এই হস্তাক্ষর দেখে কম্পোজ করার সময়ে আমার বাপান্ত করে ছাড়বে... কিন্তু আমি নিরুপায়। এই স্নায়ুদৌর্বল্য কোনওদিনই আর নিরাময় হবে বলে মনে হয় না আমার।

সমুদয় ঘটনাই কিন্তু ঘটেছে আজ থেকে চৌত্রিশশো বছর আগে থেকে ছাব্বিশশো বছর আগেকার সময়ের মধ্যে। টাইম মেশিনের ঘড়ি তার প্রমাণ। মহাজাগতিক বিপর্যয়ের দুটো সিরিজ প্রত্যক্ষ করেছি আমি। এ ঘটনা ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেই— বিকৃত পৌরাণিক গল্পের আকারে বিধৃত রয়েছে পৃথিবীর সব দেশেই— পুরাণ ঘেঁটে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করার কোনও চেষ্টাই হয়নি— অলীক কল্পনা বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার বলছি, এই সেদিনও সৌরজগতের গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ চলেছিল— শান্তি ছিল না, শান্তি ছিল না, শান্তি ছিল না!

সাড়ে তিন হাজার বছর! হ্যাঁ, প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তো বটেই, টাইম মেশিনের ঘড়ির সঠিক হিসেবটা মনে নেই— কিন্তু অত্যন্ত অবিশ্বাস্য এই ঘটনার শুরু ওই সময়েই। অনেকক্ষণ থেকেই টকটকে রক্তলাল বর্ণে উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রফেসরের উত্তেজনা-থরথর মুখমণ্ডল। কিছুক্ষণ আগেই যে আকাশিক দেহটি সৌরপরিবারভুক্ত হয়েছে, সে ধেয়ে এসেছে পৃথিবীর অনেক কাছে। সময়ের পথে মুখোমুখি ধাবমান বলেই

আমাদের কাছে মনে হয়েছে কিছুক্ষণ— প্রকৃতপক্ষে তা দীর্ঘ সময়।

আমি দেখলাম অনুসূর বিন্দু থেকে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে এল রক্তবর্ণ সেই ধূমকেতু। অনুসূর বা পেরিহিলিয়াম মানে যারা জানে না, তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, ধূমকেতুর কক্ষপথের যে বিন্দু সূর্যের সবচেয়ে কাছে, তাকে বলে অনুসূর বা পেরিহিলিয়াম। আমি দেখলাম, বহু মাইল লম্বা ঝাঁটার পুচ্ছের আঘাত হেনে গেল সে পৃথিবীর বুকে।

যেন ঝাঁটার বাড়ি মেরে গেল রক্তদেহী ডাইনি। সরাসরি সংঘাত নয়— শুধু ঝাঁটার মার। সপাং করে আচমকা ঝাঁটা মারলে যেমন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে ককিয়ে উঠতে হয়, পৃথিবী বেচারার অবস্থাও হল প্রায় তাই।

ধূমকেতুর মুণ্ড তখন রক্তোচ্ছ্বাস নিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। আগুন রাঙা নয়— রক্তের মতো লাল। এ ছাড়াও প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার ফলে অজস্র রঙের হোলিখেলায় মহাকাশ জুড়ে এক অতীব আশ্চর্য আতশবাজির মহড়া শুরু হয়ে গেছে যেন। ১৯৮২-তে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ফায়ার ওয়ার্কের খেলা দেখেছিলাম কলাইকুণ্ডার ধূ ধূ প্রান্তরে। কিন্তু সেদিন যা দেখলাম, তা কল্পনাতীত। যেন, লক্ষ লক্ষ ন্যাট, হান্টার, মিগ বিমান শব্দের গতিবেগের বহুগুণ বেশি গতিবেগে লক্ষ লক্ষ ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করতে করতে ধেয়ে গেল আমার সামনে দিয়ে।

ঝাঁটার ঝাপটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর সময়গাড়ি নিয়ে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢুকে পড়েছিলেন। রুখতে পারিনি। সে চেষ্টাও করিনি। অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে থাকার দরুন মহাপ্রলয়ের উৎসের মধ্যে দিয়ে ভীমবেগে চক্কর দিয়েছি পৃথিবীকে। কখনও থেমেছি, কখনও নেমেছি, কখনও উঠেছি। উন্মাদপ্রায় প্রফেসর ঝাঁটার প্রহারে জর্জরিত পৃথিবীর অবস্থা কাছ থেকে দেখবেন বলেই এই কাণ্ড করেছিলেন— কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল সেই কারণেই।

সংঘাতের প্রথম চিহ্নটা চোখে দেখা গেল এইভাবে— সারা ভূপৃষ্ঠ লাল হয়ে গেল লাল ধুলোয়। মরচে রঙের রঞ্জক পদার্থ মিহিধুলোর আকারে ছড়িয়ে গেল ভূমণ্ডলের সর্বত্র। সমুদ্র, সরোবর, নদীর জল রক্তের মতো লাল হয়ে গেল রঞ্জক পদার্থের অবিরাম বর্ষণে। লৌহময় অথবা অন্যান্য দ্রবণীয় রঞ্জক-বৃষ্টিতে রঞ্জিত হয়ে লোহিত গ্রহে পরিণত হল সবুজ গ্রহ এই পৃথিবী।

চিৎকার করে বলে চলেছিলেন প্রফেসর, 'দীননাথ, দীননাথ, যা দেখছ, তা সত্যি, সত্যি, সত্যি! মধ্য আমেরিকা আর দক্ষিণ মেক্সিকোর সুপ্রাচীন রেড ইন্ডিয়ানদের মায়া-সভ্যতার নাম নিশ্চয় শুনেছ? তাদের 'ম্যানুসক্রিপ্ট কুইচি' গ্রন্থে বর্ণনা আছে ভয়াবহ এই সংঘাতের। গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষের ফলে সেদিনও পৃথিবী ঠিক এমনিভাবে কাতরে উঠেছিল— সূর্যের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছিল। নদীর জল রক্তে ভরে উঠেছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল নাকি পশ্চিম গোলার্ধে। একই বিলাপ কাহিনি পাবে তুমি মিশরীয়দের প্যাপিরাসের পৃষ্ঠায়— রক্ত হয়ে গিয়েছিল নদীগুলো। খ্রিস্টানদের বুক অফ এক্সোডাস-এও পাবে সেই রক্তনদীর হাহাকার।'

প্রফেসর নিজেই তখন হাহাকার করে চলেছেন। তাঁর সব কথা গুছিয়ে লিখতে পারব না। মনেই নেই। রক্তের মতো রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে মৃত্যু হল নদীর জলের মাছের

ঝাঁকের। মরামাছ পচে উঠে দুর্গন্ধে ভরিয়ে দিল আকাশ বাতাস। আমি দেখলাম, নদীর পাড় খুঁড়ে মিশরীয়রা পানীয় জল বার করছে— রক্তনদীর জল পান করা আর যাচ্ছে না। চারিদিকে ধ্বংস... ধ্বংস... ধ্বংস! জলাভাবের হাহাকার দেশে দেশে। রক্ত ধুলোর সংস্পর্শে এসে চিড়বিড়িয়ে জ্বলছে মানুষ আর জীবজন্তুর চামড়া— চুলকোতে চুলকোতে গায়ে ফোস্কা উঠে যাচ্ছে, চর্মরোগ মারাত্মক হয়ে উঠছে— শেষকালে সারা গা দগদগে ঘা-এ ভরে ওঠার ফলে মারা যাচ্ছে মানুষ আর পশু দলে দলে। শ্মশান হয়ে যাচ্ছে নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ। আকাশ বিভীষিকায় আতঙ্কিত বন্যজন্তুরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে গ্রাম আর শহরের মধ্যে।

এই সময়ে একটা পর্বতমালা দেখিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ওই দ্যাখো থ্রেস পাহাড়ের চূড়া— ওর নাম 'হেমাস' হয়েছে কেন জানো? রক্তবন্যায় ঢেকে গেছিল বলে— 'হেমাস' মানেই যে তাই— রক্তের মতো। ওই দেখো, ওই দেখো, ঈজিপ্টের ওই শহরটা— ওরও নাম হেমাস হয়েছে পরবর্তী কালে— রক্তবৃষ্টিতে স্নান করে রক্তলাল হয়ে গিয়েছিল বলে।'

সম্মোহিতের মতো টাইম মেশিন থেকে দেখেছি সেই রক্তদৃশ্য। ভাষার বর্ণনাতীত সেই দৃশ্য। ঠিক এই সময়ে অনেক নীচে দেখলাম একটা রক্তলাল সমুদ্র। প্রফেসর চেঁচিয়ে উঠলেন কানের কাছে, 'রেড সী! রেড সী!'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলেছিলাম, 'কিন্তু রেড-সী তো সত্যিই রেড নয়।'

সোল্লাসে বলেছিলেন প্রফেসর, 'তা হলেই বুঝছো নামটা কেন অমন হয়েছে? রেড সী তো ঘন নীল রঙের বর্তমানের পৃথিবীতে। তবুও তার নাম লোহিত সমুদ্র। বৈজ্ঞানিকরা ধাঁধার সমাধান করেছিল ছেলেভুলোনো ব্যাখ্যা দিয়ে— রেড সী'র তীরে নাকি কিছু লাল পাখি দেখা যায়, জলেও অনেক লাল প্রবাল আছে— তাই তার নাম রেড সী। মূর্খ! মূর্খ! ওই দেখো, সত্যিই লালে লাল হয়ে রয়েছে রেড সী! হাঃ হাঃ হাঃ! মূর্খ! মূর্খ! মূর্খ! র‍্যাফেল 'সী অফ প্যাসেজ' লাল রং দিয়ে এঁকেছিলেন কেন এখন বুঝতে পারছ? ভুল তিনি করেননি— করেছে ওই মূর্খের দল।'

আমি জানি, যাঁদের উনি গায়ের ঝাল মিটিয়ে মূর্খ উপাধিতে ভূষিত করে গেলেন, আজও তাঁরা আমার এই কাহিনি পড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবেন, অবিশ্বাসের ভ্রূকুঞ্চন করবেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালেও কি তাঁরা তুষারছাওয়া পর্বত আর মেরুপ্রদেশে লাল ধুলোয় অস্তিত্ব আবিষ্কার করেননি? উল্কা উধাও হওয়ার পর উল্কার ধূলিকণাই তো পড়ে আছে এইসব অঞ্চলে? তা হলে ব্যাবিলনের বাসিন্দারা যখন লিখেছিল লাল ধুলো আর লাল বৃষ্টি পড়েছিল আকাশ থেকে, সেই কাহিনি শুনে অবিশ্বাস করা হয়েছিল কেন? নিশ্চয় তা মেঘ থেকে পড়েনি!

অবিশ্রান্ত লাল ধুলোর বর্ষণে সারা পৃথিবী লাল হয়ে গেল অবশেষে। রক্তলাল গ্রহের ওপর রক্তকুজ্ঝটিকায় তাণ্ডব নৃত্য কিন্তু সমাপ্ত হল একসময়ে তারপরেই অল্প খানিকটা ধুলো তুমুল বৃষ্টিপাতের মতোই ঝরে পড়ল যে দেশটার ওপর, নাম তার মিশর। কানের কাছে প্রফেসরের ম্যারাথন বক্তৃতা শুনে বুঝলাম, বুক অফ এক্সোডাস পুস্তকে এই ধুলোরও

উল্লেখ আছে। যেন চুল্লি থেকে ছাই উড়ে এসেছিল সেদেশে। ছাইপতন শেষ হতে না হতেই উল্কার ঝাঁক বর্ষণ শুরু হয়ে গেল পৃথিবীর দিকে। সভয়ে দেখলাম, আমার প্রিয় পৃথিবী ধূমকেতুর পুচ্ছদেশের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে। চারপাশ দিয়ে কাতারে কাতারে উল্কাখণ্ড ধেয়ে যাচ্ছে পৃথিবী লক্ষ করে। প্রথমে ঝরেছিল ধুলো, এখন ঝরছে নুড়িপাথর। লাখে লাখে। শিলাবৃষ্টি অনেক দেখেছি, কিন্তু আকাশ অন্ধকার করে এরকম পাথর বৃষ্টি কখনও দেখিনি। ধ্বংসস্তূপ রচনা হয়ে চলেছে গোটা পৃথিবীপৃষ্ঠ জুড়ে। বিরামবিহীন আর্তনাদের সঙ্গে মিশেছে গুরু গুরু গুম গুম ধ্বনি। সে কী আওয়াজ! ধরণী যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে, টুকরো টুকরো অযুত উপলখণ্ডে যেন পর্যবসিত হবে যে কোনও মুহূর্তে। বরফের টুকরো নয়— তা হলে পাথরখণ্ড ঠান্ডা হত— বনজঙ্গলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত না। তপ্ত গনগনে উল্কাখণ্ড জ্বলতে জ্বলতে নেমে এসে ছারখার করে দিচ্ছে সবুজ পৃথিবীটাকে— এদৃশ্য দেখে যখন মন আমার অবসন্ন, ঠিক সেই সময়ে পরমোল্লাসে কানের কাছে প্রফেসর শোনালেন বুক অফ এক্সোডাসের উদ্ধৃতি— যার অর্থ, মহাপ্রলয়ের সেই দিনটাতেও গরম পাথরবৃষ্টি হয়েছিল আকাশ থেকে এমনিভাবে— যেমনটি দেখছি, শুনছি, ঠিক সেইভাবেই অগ্নিবেষ্টিত প্রস্তরখণ্ড আকাশ রাঙা করে লক্ষ বজ্রহুংকার আর বিস্ফোরণের সমতুল্য কানের পর্দাফাটানো আওয়াজে মুহুর্মুহু দুরমুশ পেটা করে গিয়েছিল মর্ত্যলোককে। মেদিনীজোড়া হাহাকারে সেদিনও ছায়াপথ ত্রস্ত চকিত ভয়ার্ত হয়েছিল যেমনভাবে— আজ, এই মুহূর্তে, হচ্ছি আমরা।

আমি দেখলাম পুরুতেরা মন্দিরে মন্দিরে ভজনা করছে ধ্বংসের দেবতার। নির্দেশ দিচ্ছে জনসাধারণকে গোরুছাগল মোষদের গিরিকন্দরে নিয়ে যেতে। প্রলয়ের দেবতার রোষানল থেকে বাঁচতে যদি চাও— পালাও! পালাও! শহর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে, পালাও পাহাড়-পর্বতের আশ্রয়ে— আগে মাথা বাঁচাও— তা হলেই প্রাণে বাঁচবে মুষলধারে প্রস্তরবৃষ্টির খপ্পর থেকে।

ভয়ার্ত মানুষরা তাই আগে নিজেদের মাথাই বাঁচাচ্ছে— গৃহপালিত পশুরা উন্মাদের মতো ছুটোছুটি করছে খেতে-খামারে মাঠে-ময়দানে প্রান্তরে-তেপান্তরে। মানুষ ছুটছে নিরাপদে আশ্রয়ের সন্ধানে। মাথার ওপর বাজছে প্রলয়বিষাণ কর্ণবধিরকারী বিস্ফোরণ আর বজ্রগর্জনের শব্দে মাটি কাঁপছে থরথর করে। মুহুর্মুহু প্রস্তরসংঘাতে মাটিতে মিশে যাচ্ছে দেবালয়, ইমারত, শহর, গ্রাম। চাপা পড়ছে যারা, তাদের দিকে কেউ আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। মর্মান্তিক সেই দৃশ্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এসে গেল আমার। আমি জানি, এদৃশ্য এখন ঘটলেও, ঘটেছে অতীতে। যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানের মানুষ যা কোনওদিনই বিশ্বাস করে উঠতে পারবে না, আমি তাই দেখছি দু'চোখ প্লাবিত করে। ব্যথায় টনটন করছে বুকের ভেতরটা পূর্বপুরুষদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে।

গাছ নেই, ফল নেই, ফুল নেই, শস্য নেই, পানীয় নেই— আগুন জ্বলছে সবুজ পৃথিবীর সর্বত্র— না, না, সবুজ নয়— এ তো লাল পৃথিবী! রক্তলাল তৃতীয় গ্রহে প্রলয়দেবতার উন্মাদ নাচন প্রত্যক্ষ করছি আর হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি কেন হিন্দুশাস্ত্রে মহাদেবকে

ধ্বংসের দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে, কেন তাঁর ডমরু ধ্বনিকে প্রলয়বাদ্য বলা হয়েছে। জলে স্থলে অন্তরিক্ষে আমি তো দেখছি সেই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিচক্ষু মহাকালাধিপতিরই রুদ্র মূর্তি— ওই আগুন, ওই ছাই, ওই ভীষণ আওয়াজ— সবই তো রুদ্র দেবতারই কল্পনার সহায়ক।

এ হেন ম্রিয়মান মানসিক অবস্থার সময়ে অত্যন্ত বিরক্তিকর লাগছিল প্রফেসরের জ্ঞানের ফুলকিগুলো। বৌদ্ধ পুথিতে নাকি তিনি পৌরাণিক এই প্রলয় কাহিনি কোনকালে পাঠ করেছেন। ম্যানিলার বিজ্ঞানসভায় পৌরাণিক এবং লোককথার অন্বেষণ করলে পৃথিবীর বিস্মৃত ইতিহাসের সন্ধান মিলবে— এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপহাসিত হয়েছিলেন। কেমন? এখন কী দেখছে আহাম্মকরা? যদিও ধারেকাছে কোনও আহাম্মকের টিকি দর্শনের সম্ভাবনা নেই— কিন্তু ওঁর তা খেয়ালও নেই। আত্মবিস্মৃত হয়ে চিৎকার করে যা বলে চলেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার হল, 'বিশুদ্ধমাগ্ন'তে বহুপূর্বেই লিখে গেছে বিশ্বচক্রের বিশদ বিবরণ। বিশ্বচক্রের সমাপ্তি সূচিত হবে ভীষণ ঝঞ্ঝায়,... আসবে ধ্বংসকারী বিপুল মেঘরাশি... প্রথমে বর্ষিত হবে মিহি ধুলো, তারপর মোটা ধুলো, তারপর মিহি বালি, তারপর মোটা বালি, তারপর নুড়িপাথর, পাহাড়... ভেঙে চুরমার করে দেবে মহীরুহ আর পর্বতমালা। ওপর-নীচ হবে ভূতল, ফুটিফাটা হবে ভূপৃষ্ঠ, ধূলিসাৎ হবে ভূগোলকের সমস্ত সৌধ... এ ঘটনা ঘটবে কখন? না, যখন গ্রহের সঙ্গে লাগবে গ্রহের সংঘর্ষ! শুধু পুথি কেন, মেক্সিকোর প্রাচীন রেড ইন্ডিয়ান থেকে আরম্ভ করে সুপ্রাচীন হিব্রু আর ভারতবর্ষের আদিপুরুষেরাও কল্পান্তের এই বিবরণ দিয়ে যাননি পুরাণ-লোককথার ছত্রে ছত্রে?

কান যখন ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে প্রফেসরের অবিশ্রান্ত বাক্যের উৎপাতে, ঠিক তখনি শুরু হল আর একটা বিপর্যয়। একেবারেই অভাবনীয় এবং ভয়ংকর।

সারা পৃথিবী তখন জ্বলছে দাউ দাউ করে। হেথায় হোথায় স্তিমিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ডের ওপর ধোঁয়া উঠছে ঘন মেঘের আকারে ছাই আর তপ্ত পাথরের ওপর থেকে। এমন সময় শুরু হল নতুন উৎপাত।

অবিশ্বাস্য সেই উৎপাত-প্রসঙ্গের প্রারম্ভে টীকাস্বরূপ একটু বক্তব্য সেরে নেওয়া যাক। এই জ্ঞানস্ফুলিঙ্গটাও প্রফেসরের— আমি কেবল অনুলেখক।

ক্রুড পেট্রোলিয়ামের উপাদান দুটি, কার্বন আর হাইড্রোজেন। পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত মূল দুটি তত্ত্ব এই:

অজৈব তত্ত্ব: পৃথিবীর পাথুরে স্তরে হাইড্রোজেন এবং কার্বন মিলিত হয়েছিল প্রচণ্ড চাপ এবং তাপের ফলে।

জৈব তত্ত্ব: উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেই এসেছে পেট্রোলিয়ামের উপাদান কার্বন আর হাইড্রোজেন। মূলত এই দেহাবশেষ আণুবীক্ষণিক সামুদ্রিক প্রাণীর এবং জলাভূমির প্রাণীর।

ধুলো, ছাই এবং পাথরবৃষ্টির পরেই আচমকা চটচটে আঠার মতো তরল পদার্থ পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতেই বিমূঢ় হয়েছিলাম আমি। তারপরেই যখন দেখলাম, পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ার আগেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সেই কালো আঠালো তরল পদার্থ— তখন

দু'হাতে প্রফেসরের হাত খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম সভয়ে— 'ওকী! ওকী! ওকী!'

বরাভয় দিয়ে প্রফেসর বলেছিলেন, 'মাভৈঃ বৎস! যা দেখছ, তা এই পৃথিবীর পেট্রল উৎসের আসল ইতিহাস।'

'পেট্রল!'

'হ্যাঁ, পেট্রল! যার ওপর বেঁচে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা— সেই পেট্রল। যে পেট্রোলিয়াম ছাড়া প্লেন উড়বে না, গাড়ি চলবে না, অনেক ওষুধপত্র তৈরি হবে না, বহু শিল্পসামগ্রীর উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে— সেই পেট্রোলিয়াম।'

'ধূমকেতু থেকে!'

'কেন নয়?' বলে প্রথমে টীকাস্বরূপ যে বক্তব্যটি ইতিপূর্বে লিখেছি সেইটি আমার কর্ণকুহরে বর্ষণ করলেন প্রফেসর। অতঃপর বললেন, 'ধূমকেতুর ল্যাজেও তো প্রধানত কার্বন আর হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে।'

'অ।'

'মানে, জানো না থাকে কি না। থাকে হে, থাকে। আমি বলছি থাকে। কিন্তু প্রশ্ন করতে পারো উজবুকের মতো, তা হলে কেন উড়তে উড়তে ধূমকেতুর ল্যাজে পেট্রোলিয়ামের আগুন জ্বলে না? কেন জ্বলে না বলো তো?'

'তা তো—'

'জানো না। ঘটে বুদ্ধি থাকলে তো জানবে। একেবারেই আকাট— যাকগে, যা বলছিলাম। অক্সিজেন ছাড়া কি কিছু পোড়ে? পোড়ে না। ধূমকেতুর ল্যাজেও তাই আগুন দেখা যায় না। কিন্তু গ্যাস দুটো তো দাহ্য? কেমন? তাই পৃথিবীর অক্সিজেন ঠাসা আবহমণ্ডলে যেই ঢুকেছে ল্যাজখানা, অমনি তাতে আগুন ধরে গেছে। কার্বন আর হাইড্রোজেন আলাদা আলাদাভাবে আর মিলিতভাবে বিপুল পরিমাণে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতেই ওই দেখো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে... দেখছ তো? অক্সিজেন যতক্ষণ থাকছে, ততক্ষণ জ্বলছে— কিন্তু যেই সমস্ত অক্সিজেনটুকু শেষ করে দিচ্ছে, তখন আর জ্বলতে পারছে না। চক্ষের নিমেষে রূপান্তর ঘটছে— গ্যাস থেকে তরল হয়ে যাচ্ছে! কোথায় যাচ্ছে এই তরল পদার্থ দেখতে চাও? এসো দেখাচ্ছি।'

বলে হাহাকার, আর্তনাদ, বজ্রগর্জন আর হুতাশনের হুংকার-শ্বাসের মধ্যে দিয়ে টাইম মেশিনকে স্পেসশিপের মতো চালনা করেছিলেন প্রফেসর। আমি দেখলাম, আগে থেকেই চৌচির হয়ে যাওয়া ভূপৃষ্ঠের ফাঁক দিয়ে, বালির মধ্যে দিয়ে, পাথরের ফাটলের মধ্যে দিয়ে চটচটে তরল পদার্থটি সেঁধিয়ে যাচ্ছে পাতালের জঠরে। জলে যখন পড়ছে, তা ভেসে রয়েছে— সমুদ্রপৃষ্ঠ, নদীপৃষ্ঠ, সরোবরপৃষ্ঠ ঢেকে যাচ্ছে কালো তরল পদার্থে— কিন্তু যেই নতুন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসছে, আগুনের ছোঁয়া পাচ্ছে আকাশ থেকে স্ফুলিঙ্গের বর্ষণে— অমনি জ্বলে উঠছে দাউ দাউ করে। ধুলো মাখিয়ে, পিটিয়ে এবার যেন রুদ্রদেবতা মেদিনীকে পেট্রোলিয়ামে স্নান করিয়ে বলি দিচ্ছেন অগ্নিদেবতার জঠরে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে সারা পৃথিবী। ধোঁয়া! ধোঁয়া! শুধুই ধোঁয়া। তারই মধ্যে থেকে লক্ লক্ করে উঠছে দানবিক সর্পজিহ্বার মতো লেলিহান শিখা!

আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলেছিলাম, 'পেট্রোলিয়ামের আবির্ভাব তা হলে আকাশ থেকে?'

সংশোধন করে দিয়ে এক দাবড়ানি দিয়েছিলেন প্রফেসর, 'শুধু আকাশ থেকে নয়— বলো, ধূমকেতুর ল্যাজ থেকে। পৃথিবীর যে কোনও দেশের প্রাচীন পুথিপুরাণ ঘাটলেই পাবে এই উপাখ্যান। মায়ারা যা লিখে গেছে, তা কি দেখতে পাচ্ছ না? অন্ধ তো নয়। ওই তো ধুলো আর পাথরবৃষ্টির পরেও যারা বেঁচে গেছে, এবার তারা ডুবে মরছে চটচটে তরল পদার্থে। না, না, ওদের বাঁচানোর ক্ষমতা তোমার আমার কারওরই নেই। যা দেখছ, সবই তো অতীতের দৃশ্য— তুমি তো অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনের মধ্যে আছ বলেই রেহাই পেয়ে যাচ্ছ— দেখছ না তোমাকে ফুঁড়ে নেমে যাচ্ছে কালো স্রোত— তুমি, আমি, টাইম মেশিন কিন্তু রয়েছি বহাল তবিয়তে। কিন্তু চোখ মেলে দেখো হে অন্ধ, আকাশ কালো হয়ে গেছে তরল বৃষ্টিতে, ঘড়ির দিকে একটু নজর দাও না হে ছোকরা। ওই দেখো, দিন পেরিয়ে যাচ্ছে। রাত ভোর হয়ে যাচ্ছে— কালো বৃষ্টির কিন্তু বিরাম নেই। ঝমাঝম ঝম ঝমাঝম ঝম পেট্রোলিয়াম বৃষ্টি চলেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। মানুষ আর নেই— সব শেষ! সব শেষ!'

নির্নিমেষে আমি দেখছিলাম পূর্বপুরুষদের অসহায় মৃত্যুদৃশ্য। উন্মাদের মতো ছুটছে যে যেদিকে পারে— বাড়ির ছাদে ওঠবার চেষ্টা করছে কালো বন্যার কবল থেকে পরিত্রাণের আশায়, কিন্তু বাড়ি ভেঙে পড়ছে; গাছে উঠে বাঁচতে চাইছে— ঝড় আর তুমুল বৃষ্টির ধাক্কায় ঠিকরে যাচ্ছে অনেক দূরে; পাহাড়ের গুহায় আর খাঁজে যারা ঢুকছে, জীবন্ত চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে আচমকা রন্ধ্রপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। সত্যিই মানুষ আর বেঁচে নেই কোথাও— সব শেষ। সব শেষ!

প্রফুল্ল কণ্ঠে কিন্তু প্রফেসর বলে চলেছেন তখন, 'বিটুমেন বৃষ্টির এই বর্ণনা তুমি 'ম্যানুসক্রিপ্ট কুইচি'তেও পাবে। মেক্সিকো জনশূন্য হয়ে গেছিল এই কাণ্ডের পর। সাইবেরিয়া, ইস্ট ইন্ডিজ, মিশর— কেউ রেহাই পায়নি— সব জায়গার পুরাণেই লেখা আছে একই ভয়ংকর কল্পান্তের বিবরণ! শুনছো হে ছোকরা? মিদ্রাশিম কেতাব পড়া আছে? নেই? উত্তম! পাতাগুলো উলটে দেখো, আমার লাইব্রেরিতে আছে। দেখবে লেখা আছে কীভাবে ন্যাপথা বৃষ্টি হয়েছিল মিশরে, গায়ে ফোস্কা পড়ে গেছিল গরম ন্যাপথায়। আরেমেকি আর হিব্রুতে ন্যাপথা মানে কী জানো? পেট্রোলিয়াম! পেট্রোলিয়াম।'

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল সময়গাড়িতে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে দেখলাম সেই একই দৃশ্য। দাহ্য পদার্থের প্লাবন বয়ে গেল ধরাপৃষ্ঠে। বাদ গেল না সমুদ্রপৃষ্ঠও। জমি টেনে নিল বেশিরভাগ অংশ। আবার তাতে আগুন ধরল। আবার... আবার... এইভাবেই লঙ্কাকাণ্ড চলল পৃথিবী জুড়ে সাত-সাতটা বছর, সাতটা শীত, সাতটা গ্রীষ্ম, সাতটা বর্ষা অতিবাহিত হল— গোটা পৃথিবীটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল এই কটা বছরে।

সাত বছরের হিসেব কিন্তু কাগজে-কলমে আর ঘড়িতে— সময়গাড়ির বুকে বসে আমরা এই দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এলাম হু হু করে। কানের কাছে ইত্যবসরে ফিসফিস করে বাকবৈদগ্ধ্যের নমুনা রেখে গেলেন নাটবল্টু চক্র মহাশয়, 'সাইবেরিয়ান মিথলজির ৩৬৯

পৃষ্ঠায় ঠিক এই ঘটনাই লেখা আছে, দীননাথ। সাত-সাতটা বছর পৃথিবীকে পুড়িয়েছিল দাবানল।'

জীবন্ত বিশ্বকোষ নাকি? পৃষ্ঠা সংখ্যা পর্যন্ত মনে রেখে দিয়েছেন?

আরব মরুভূমির ওপর দেখলাম ভয়াবহ এক দৃশ্য। মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করছে পলাতক ইহুদিরা। ঘরছাড়া দিকহারা বাউন্ডুলের দল! কিন্তু পেছনের বিপদ থেকে পলায়ন করেও কি পরিত্রাণ আছে? বিপদ যে সামনেও। মাঝেমধ্যেই রহস্যময় অগ্নিশিখা ধরণী বিদীর্ণ করে আবির্ভূত হচ্ছে সামনে! লকলকিয়ে উঠছে মেঘলোক পর্যন্ত— পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ছাইটুকুও ফেলে না রেখে! এ কোন আগন্তুক অগ্নিদেবতা? অগ্নিদেবের এহেন রূপের সঙ্গে তো পরিচিত নয় ইজরায়েলবাসীরা! আগুনটাও যেন কেমনতর। এই আসে, এই যায়।

একজায়গায় দেখলাম কয়েকশো ইহুদি চলেছে দল বেঁধে। আচমকা পায়ের তলার মাটি মুখব্যাদান করল যেন— বিরাট ফাটলের মধ্যে মুহূর্তে বিলীন হল দলটার বেশিরভাগ— বাকি ক'জন সঙ্গীদের মরণচিৎকার শুনে দৌড়ে এল ফাটলের চারধারে। দেবতার তুষ্টিসাধন দরকার নিশ্চয়। নইলে এমন অভাবনীয় বিপর্যয় ঘটবে কেন? দলপতি তাই ধূপ জ্বালিয়ে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল ফাটলের ওপর। পলকের মধ্যে প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল লেলিহান আগুন। আড়াইশো জন ইজরায়েলবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ওই একটা বিস্ফোরণে!

বেচারা! বোবা শোকে নিথর হয়ে রইলাম আমি। ওরা তো এই রহস্যময় আগুনের চরিত্র জানে না। এ যে দাহ্য গ্যাসের আগুন— তা তো জানে না। কোনওদিন এমন অদ্ভুত আগুন দেখেনি। ভূগর্ভ থেকে ভস ভস করে গ্যাস বেরিয়ে আসছে, তা জানে না বলেই তো ধূপ জ্বালিয়ে বাড়িয়ে ধরেছিল। পরিণামে ওই বিস্ফোরণ!

ককেশিয়া, সাইবেরিয়া, আরবে দেখলাম রহস্যময় আগুনের মুহুর্মুহু আনাগোনা। যে যে দেশে এইভাবে ঘটতে দেখলাম অঝোরধারা আগুনবৃষ্টি, আজকের পৃথিবীতে কিন্তু ঠিক সেই সেই জায়গাতেই পাওয়া গেছে পেট্রোলিয়ামের বিপুল সঞ্চয়, মেক্সিকো, ইস্ট ইন্ডিজ, সাইবেরিয়া, ইরাক আর মিশর আজ এই পৃথিবীর তেলের রাজা। পেট্রল দিয়ে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছে গোটা পৃথিবীটাকে। মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন সম্ভব হয়েছে শুধু তেলের কল্যাণে। যে-তেল সুদূর অতীতে আগুনবৃষ্টির আকারে পড়েছিল ধূমকেতুর পুচ্ছ থেকে— লেশমাত্র কালো দাগ অথবা ছাই ফেলে না রেখে যার পুড়ে যাওয়া দেখে ভয়ে বিস্ময়ে পুরাকালের মানুষ দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করতে শিখেছিল তাকে। তারপর একদিন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল মূল্যবান এই তেলের ব্যবহার। ধূমকেতুর অবদান জঠরে আগলে রেখে দিয়েছিল ধরিত্রী দীর্ঘদিন। মানুষ আজ তার ব্যবহার শিখেছে, সভ্যতাকে কয়েক লাফ মেরে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। একদিন যা ছিল ধ্বংসদূত, আজ তা সভ্যতার ধ্বজাবাহক।

সজীব বিশ্বকোষটি ইত্যবসরে অনেক মূল্যবান তথ্যই বর্ষণ করে গেছিলেন কানের কাছে। একটা কথা এখনও মনে আছে। বলেছিলেন, 'দীননাথ, লেখো তো ছাইপাঁশ,

একটা কাজের কাজ কোরো ফিরে গিয়ে, উজবুক অবিশ্বাসীগুলোকে বলে দিয়ো, ফারাও সিসোস্ট্রিসের মন্ত্রী অ্যান্টিফোকারের সমাধি মন্দিরটা যেন একটু দেখে আসে। আগুন লেগেছিল সেখানেও— পাতাল ঘরের আগুনের কালো দাগ সামান্যই আছে নীচের দিকে— ওপরের দিকে নয়। ছাইও নেই। কী করে থাকবে? হালকা গ্যাসের আগুন তো। তাদের বোলো, আরবের মরুভূমি আর মিশরের পাতাল সমাধিকক্ষে তেল ঢুকে গিয়েছিল বলেই আগুনের চিহ্ন এখনও দেখা যায় অ্যান্টিফোকারের সমাধি মন্দিরে। স্বচক্ষে তো দেখলেই কালো তেলের বান বয়ে গেল দেশগুলোর ওপর দিয়ে।'

তা আর দেখিনি! দেখে তাজ্জব হয়ে গেছি। অগ্নিউপাসকদের উৎপত্তি হল কীভাবে, তাও বুঝতে আর বাকি নেই!

কিন্তু বিপর্যয়ের বাকি এখনও আছে। শুধু ধুলো, পাথর আর তৈল বর্ষণ করেই ক্ষ্যামা দেয়নি ধূমকেতুর পুচ্ছদেশ— নিবিড় আঁধারে আচমকা ঢেকে গেল গোটা পৃথিবীটা।

গম্ভীর কণ্ঠে কানের কাছে বলে উঠলেন প্রফেসর, 'ল্যাজের আরও ভেতরে ঢুকে পড়েছে পৃথিবী— এগিয়ে যাচ্ছে তার দেহের দিকে।'

শুনে হাত-পা হিম হয়ে এল আমার। ল্যাজের ঝাপটাতেই এই কাণ্ড, মাথায় ধাক্কা লাগলে তো গোটা পৃথিবীটাই কক্ষচ্যুত হয়ে ছিটকে যাবে মহাশূন্যে!

নিরন্ধ্র অন্ধকারে অকস্মাৎ জাগ্রত হল মত্ত প্রভঞ্জনের হুংকার। দূরে, কাছে, সর্বত্রই ঝড় উঠেছে, আতীক্ষ্ণ নিনাদে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইছে, উন্মত্ত বেগে ধেয়ে চলেছে পৃথিবীর ওপর দিয়ে। গ্যাস, ধুলো আর ধূমকেতুর ভস্ম ভীমবেগে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে। যেন হাজার হাজার দানো অমানবিক গলায় চেঁচিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর আকাশে।

একী ঝড়! ঝড়ের এমন চেহারা তো কখনও দেখিনি! ঝড়টাই বা হঠাৎ এল কেন?

'পালটে গেল! পালটে গেল! পৃথিবীর আবর্তনের কৌণিক গতিবেগ বদলে গেল!' দামাল হাওয়ার অট্ট অট্ট হাসির ওপর গলা চড়িয়ে সোল্লাসে বললেন প্রফেসর। 'হেলে পড়ছে পৃথিবী। আবর্তন একেবারে বন্ধ হয়নি— তাই সূর্যের মুখ আর চট করে দেখা যাচ্ছে না।'

আমরা তখন ইরানের ওপর। তিন দিন তিন রাত্রি সূর্যের মুখ দেখা গেল না সেখানে, আরও পশ্চিমে নামল ন-দিন ব্যাপী একটানা রজনী, চিন দেশে আর ভারতবর্ষে সূর্য অন্তর্হিত হল দীর্ঘ দশদিন ধরে। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউফ্রেটিস আর সিন্ধুর অববাহিকায় এইভাবেই সূর্য উধাও হয়ে রইল দিনের পর দিন।

অবশেষে অবসান ঘটল কালরাত্রির। এল ভূমিকম্প!

আমরা জানি পৃথিবীটা রয়েছে বাসুকির ফণার ওপর। সেই ভদ্রলোক মাথা নাড়ান বলেই মেদিনী প্রকম্পিত হয়— ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আজ বুঝছি, এসব কল্পনারই সৃষ্টি সেই দিনের সেই ভয়ংকর ঘটনা থেকে। দেশ-বিদেশের পুরাণ কাহিনিতে এক কল্পের মহাপ্রলয়ান্তে অবসানের পর আর এক কল্পের

শুরু হওয়ার বর্ণনারও উৎপত্তি ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে। মানুষ মরেও মরেনি। ডাইনোসর লোপ পেয়েছে কেন, সে রহস্যও আর রহস্য নয় অন্তত আমার কাছে। যে যাই বলুক, কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে দেখে এসেছি সৃষ্টি ধ্বংসের প্রলয়ংকর দৃশ্য। ডাইনোসর, ম্যামথসহ পুরাকালের বহু জীবই লোপ পেয়ে গেছে— বেঁচে গেছে মুষ্টিমেয় মানুষ— আবার ভরিয়ে তুলেছে পৃথিবীকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর গিয়ে চলছে কলি যুগ— কিন্তু এরও শেষ হবে মহাপ্রলয়ের মধ্যে দিয়ে— এই তো ভবিষ্যদ্বাণী মহাপুরুষদের। কিন্তু তার সূচনা ঘটবে কি নতুন এক ধূমকেতুর আবির্ভাবে? কে জানে!

এখন যা জানি, যা দেখেছি, তা বলা যাক!

নিয়মিত গতিবেগের বাইরে গলা ধাক্কা খেতেই ধূমকেতুর মূলদেহের নিকট সান্নিধ্যে এসে নিমেষ মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল ভূগোলক। প্রচণ্ড কম্পনে দুমড়ে মুচড়ে তেউড়ে গেল পাথুরে স্তর— সারা ভূমণ্ডল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ভূমিকম্প। এক মিনিটের মধ্যেই ধূলিসাৎ হতে দেখলাম মিশরের উপরদিকের অংশ, পেল্লায় প্রস্তর সৌধগুলো ধরাশায়ী হল চক্ষের নিমেষে। কিন্তু মাটির বাড়ি, কুঁড়েঘর, নিচু ছাউনিগুলো টিকে গেল ভূমিকম্পের ধাক্কার পরেও। ইজরায়েলে দেখলাম এই দৃশ্য। গ্রামপ্রধান ভারতবর্ষেও বাসুকির রোষে প্রাণাহুতি দিল সামান্য ব্যক্তি— যারা ছিল প্রস্তর সৌধে।

এদিকে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা, ওদিকে হারিকেন ঝড়ের প্রলয়নাচন। ধূমকেতুর পুচ্ছের সংঘাতে তোলপাড় হয়ে গেল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, কিছু বায়ু নিজের দিকে টেনে নিল ধূমকেতুর দেহ, সেইসঙ্গে মন্দীভূত হল পৃথিবীর আবর্তন বেগ— এইসবের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অকল্পনীয় হারিকেন ঝড়ের নাচন আরম্ভ হয়ে গেল পৃথিবীর ওপর। সমুদ্র উথলে উঠে আছড়ে পড়ল মহাদেশের ওপর। ভাসিয়ে দিল শহর, জঙ্গল, পর্বত। ফেটে উড়ে গেল আগ্নেয়গিরির পর আগ্নেয়গিরি। মানুষ মরল পিঁপড়ের মতো, লোপ পেতে বসল বহু প্রাণীর অস্তিত্ব। পালটে গেল ভূগোলকের চেহারা। ধসে পড়ল পাহাড়, ধেয়ে আসা মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে এল মহাপর্বত। শুকিয়ে গেল নদীর খাত। দামাল টর্নেডো আকাশ থেকে নেমে এসে ধেয়ে গেল ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে।

'ওহে ছোকরা, বেদ পড়েছ, বেদ? পারসিকদের আবেস্তা?'

'অ্যাঁ?' সম্বিৎ ফিরল প্রফেসরের তারস্বরে।

'পড়ে দেখো, কল্পকাহিনি বলে উড়িয়ে দিতে আর পারবে না। এ সমস্তর বর্ণনা পাবে সেখানে। গিলগামেশ মহাকাব্যে আছে হে, সব আছে।'

ধুত্তোর গিলগামেশ। আমার তখন মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে ঝড় ভূমিকম্পের দাপটের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্লাবনের আবির্ভাব দেখে।

সূর্য আর চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা খেলে যায়, এ তো সবারই জানা। কিন্তু যে ধূমকেতুর মাথা চাঁদের চেয়ে বড় এবং পৃথিবীর কাছাকাছি, তার আকর্ষণ তো প্রবলতর হবেই। তাই সমুদ্রের জল ফুলে উঠল কয়েক মাইল উচ্চতায়; একই সঙ্গে পৃথিবীর আবর্তন মন্থর হতেই মাইলকয়েক উঁচু জলরাশি ধেয়ে গেল সুমেরু কুমেরুর দিকে— পৃথিবীর

অন্যান্য প্রতিবেশীদের আকর্ষণে মন্দীভূত হল প্লাবনের বেগ। বিরাট বিরাট পাথর ভেসে গেল জলের তোড়ে— ভাসিয়ে দিল গোটা এশিয়া, জলের পাহাড় আছড়ে পড়ল চিন সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝখানে। জল আটকে গেল উপত্যকায়— ডুবে গেল স্থলভূমি। দেশে দেশে দেখা গেল বিপুল জলস্তম্ভ। ভূমধ্যসাগর আছড়ে পড়ল লোহিতসাগরে। দু'-ভাগ হয়ে যাওয়া সমুদ্রপথে দাসত্বের বন্ধন মোচন করে পলায়ন করল ইজরাইলবাসীরা— কিন্তু পেছন পেছন ধাওয়া করার সময়ে খাড়াই সমুদ্রের প্রাচীর ভয়াবহ গর্জনে আছড়ে পড়ল তাদের ওপর। বারো জায়গায় সমুদ্র দু'-ফাঁক হয়ে গিয়ে পথ করে দিল ইহুদিদের— সেইপথে তারা এসে উঠল আমেরিকায়। আজও সেই বিশ্বাস রয়ে গেছে রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে।

আমি দেখলাম, বিপুল জলরাশির সঙ্গে হালকা সোলার মতো বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই ভেসে যাচ্ছে দিকে দিকে। বিশেষ করে উত্তর দিকে বিপুল ওজনের পাথরগুলো ঠিকরে গিয়ে আশ্রয় নিল এখানে সেখানে— ছত্রাখান অবস্থায়। বুঝলাম, কেন বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা হতভম্ব হয়ে যান ডোলারাইটের উচ্চ অঞ্চলে গ্র্যানাইটের স্তূপ দেখে, কেন স্থানীয় পাথরের মধ্যে উড়ে এসে-জুড়ে-বসা মনে হয় বহু শিলাস্তূপকে, কেন বীরভূমের মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের গ্র্যানাইট স্তূপের ধারে কাছেও গ্র্যানাইট দেখা যায় না। ঠিক যেন আকাশ থেকে বড় বড় গোলাকার পাথর টুপটাপ খসিয়ে ওপর ওপর ফেলে রেখেছে কেউ। পৃথিবীর নানান জায়গায় দানবিক উপলখণ্ডগুলি ওজনে দশ হাজার টন পর্যন্ত, যা কিনা একলক্ষ তিরিশ হাজার মানুষের সমান! ওয়েলস আর ইয়র্কশায়ারের চুনাপাথরের স্তরের ওপর জমা হতে দেখলাম গ্র্যানাইটের গোল চাঁই। সামুদ্রিক প্রাণীরা প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেল ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে হিমালয় পর্বতে, কালো মহাদেশ আফ্রিকার তৃণভূমি, মরুভূমি, অরণ্যের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্ব অক্ষাংশে!

মুহ্যমানের মতো আমি দেখলাম ভয়াবহ সেই দৃশ্য এবং শিহরিত হলাম। ধূমকেতুর মাথা তো এখনও স্পর্শ করেনি পৃথিবীকে— তাইতেই এই প্রলয়!

শুরুতেই বলেছিলাম, আমার এই প্রলয়বর্ণনায় কিন্তু কিছু উলটোপালটা ব্যাপার থেকে যাবে, ঘটনা পরম্পরা রাখতে পারব না। যেমন ধরো, একটু আগেই বললাম, মাইলকয়েক উঁচু মহাসমুদ্র আচমকা আছড়ে পড়েছিল ইহুদি অনুসরণকারীদের ওপর। কিন্তু কেন পড়েছিল, তা বলা হয়নি! ভূগোলক জুড়ে চরকিপাক দিতে দিতে সব জায়গা থেকেই দেখেছিলাম এক অদ্ভুত আকাশযুদ্ধ। যেন, আলোর দেবতার সঙ্গে বজ্র বিনিময় চলছে সরীসৃপদানবের। সূর্যের কাছ দিয়ে আসার সময় দ্যুতিময় হয়ে উঠেছিল ধূমকেতুর মাথা। পৃথিবীর টানে পুচ্ছদেশ চলে এসেছিল মাথার কাছে কাস্তের আকারে— আবহমণ্ডলের মধ্যে থাকায় সহসা বিদ্যুৎশক্তির বিনিময় ঘটল পুচ্ছ আর মস্তকের মধ্যে— পর পর দু'বার। প্রথমবারে আরও কাছাকাছি এসেই দ্বিতীয়বারে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে গেল মাথা আর ল্যাজ। সেইসঙ্গে আর এক পশলা উল্কাবর্ষণ ঘটল পৃথিবীর ওপরে— তড়িৎশক্তি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে, তীব্র ফ্ল্যাশে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মাইল কয়েক উঁচু জলস্তম্ভ ভেঙে পড়ল সগর্জনে। তড়িৎসঞ্চার নিষ্প্রভ হল ধূমকেতুর মাথায়, ল্যাজের স্তম্ভও ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল মহাশূন্যে। পৃথিবীর আকর্ষণে কিন্তু নিজের কক্ষপথ থেকে সরে এসে পৃথিবীর সঙ্গে

সঙ্গে ছুটে চলল ধূমকেতু। ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা থাকায় দেখা গেল না তার ম্রিয়মাণ মাথা। ছ'দিন এইভাবে কাছাকাছি ছুটে চলার পর দূরে সরে গেল— ছ'হপ্তা পর আবার এল কাছাকাছি। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন, সব ক'টা আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়ে গেছে। ধুলো, ধোঁয়া মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন। তাই সুস্পষ্ট দেখা গেল না আবার তড়িৎশক্তি বিনিময় ঘটল ফ্ল্যাশের আকারে পুচ্ছদেশ আর মস্তকদেশের মধ্যে। এবার কিন্তু ওই ধাক্কাতেই পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ধূমকেতু— বিচ্ছিন্ন হল সহাবস্থান।

গুরুগম্ভীর বজ্রনাদে কানে তালা ধরার উপক্রম হয়েছিল। তার মাঝেই শুনলাম প্রফেসরের উন্মত্ত চিৎকার, 'দেখলে দীননাথ, দেখলে? ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল ১৭৬৭ সালে। লেক্সেল ধূমকেতুকে আটকে রেখেছিল বৃহস্পতি আর তার চাঁদেরা— বেচারা ছাড়া পায় ১৭৭৯ সালে। কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ তখন দেখা যায়নি— আধুনিক যুগে কেউ দেখেনি— দেখলাম আমরা। কী নাম জানো আজকের এই ধূমকেতুর?'

'না,' বললাম রুদ্ধকণ্ঠে।

'টাইফন! টাইফন! টাইফন!'

পৃথিবী তখন গোঙাচ্ছে। অদ্ভুত ভয়াবহ সেই গোঙানির ওপর গলা চড়িয়ে টাইফন টাইফন করে চেঁচাতে লাগলেন প্রফেসর। আমি কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম পৃথিবীর আর্তনাদ শুনে। এ কীসের আওয়াজ? পৃথিবী যেন অসীম যন্ত্রণায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কাতরাচ্ছে, কাঁদছে! কেন? কোত্থেকে আসছে এই রক্তহিম করা শব্দ?

কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনছিলেন প্রফেসর। আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে এমন একটা মুচকি হাসি হাসলেন যে ওই অবস্থাতেও গা জ্বলে গেল আমার। তেড়িমেড়ি করে বসতাম, তার আগেই উনি রহস্যতরল কণ্ঠে কেবল বললেন, 'থিওফানি!'

'সেটা আবার কী?' ঢোক গিলে বললাম আমি।

'ভগবানের স্বস্তির নিশ্বাস— পুরাকালের মানুষরা অন্তত তাই বলত।'

'চুলোয় যাক পুরাকালের মানুষ। আপনি কী বলেন তাই শুনি।'

'১৮৮৩ সালে ইস্ট ইন্ডিজের ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আওয়াজ পৌঁছেছিল তিন হাজার মাইল দূরে জাপানে, জানো তো?'

'আজ্ঞে না। কিন্তু তার সঙ্গে পৃথিবীর গোঙানির—'

'দূর বোকা, পৃথিবী গোঙাবে কেন?' সস্নেহে বললেন প্রফেসর। 'সারা পৃথিবী জুড়ে আগ্নেয়গিরিগুলো একসঙ্গে বমি করতে আরম্ভ করলে বিচ্ছিরি আওয়াজ তো হবেই! হাজার হাজার আগ্নেয়গিরি একসঙ্গে গ্যাস ছাড়ছে, বাষ্প ওগড়াচ্ছে, লাভা বমি করছে, পাথর ছুড়ছে। এক ক্রাকাতোয়ার আওয়াজ যদি তিন হাজার মাইল পর্যন্ত যেতে পারে, হাজার ক্রাকাতোয়ার আওয়াজ তো এই রকমই হবে। হাজার নাক দিয়ে পৃথিবীর নিশ্বাস ফেলা আর নাক ঝাড়ার আওয়াজও বলতে পারো।'

আহা, কী রসিকতা! ভয়াবহ এই গর্জনের সঙ্গে নাক ঝাড়ার উপমা মাথায় আসে কী করে ভেবে পেলাম না। সাহিত্যিক উনিও নন, আমিও নই। কিন্তু এহেন উদ্ভট উপমা ওই রকম একটা লোমহর্ষক পরিস্থিতিতে আমার মাথাতেও আসত না।

হঠাৎ ঘটাংঘট করে কলকবজা টিপতে লাগলেন প্রফেসর।

অবাক হয়ে বললাম, 'কী করছেন?'

'টাইম মেশিন দাঁড় করাচ্ছি।'

'কেন? কেন?' আঁতকে উঠলাম আমি। 'মরবার সাধ হয়েছে নাকি?'

'পাগল নাকি। এখনও কত কাজ বাকি জানো?'

'তবে থামাচ্ছেন কেন?'

'কাঁহাতক আর ছুটোছুটি করা যায়। একটু ভাল করে দেখা যাক।'

'না, না, না!'

কথা ফুরোলো না। ঝাঁকুনি মেরে দাঁড়িয়ে গেল টাইম মেশিন। ডিগবাজি খেল না— ছিটকেও ফেলে দিল না। ফ্লাই হুইল কিন্তু ঘুরতে লাগল আস্তে আস্তে।

আকাশজোড়া ঘনঘটা আরও ভাল করে দেখা গেল এবার। অদ্ভুত কালো মেঘ যেন মাটির কাছে নেমে এসেছে। ভয় হল মাথার ওপর ঝুপ করে পড়ে যাবে না তো? টাইম মেশিন কিন্তু স্থির নেই। কাঁপছে থরথর করে। সারা পৃথিবী তো কাঁপছে হাজার আগ্নেয়গিরির আগুন বমির ঠেলায়। পৃথিবীর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। মত্ত প্রভঞ্জনের সঙ্গে লক্ষ বংশী ধ্বনি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাজার হাজার বিস্ফোরণের বিরামবিহীন আওয়াজ। সব মিলিয়ে এমনই একটা ভয়াবহ ঐক্যতান যে শোনামাত্র লোমখাড়া হয়ে যায়।

সভয়ে প্রফেসরের হাত আঁকড়ে ধরলাম, 'আর না, আর না—'

অদ্ভুত চোখে দিগন্তের পানে চেয়েছিলেন প্রফেসর। বললেন, অন্যমনস্ক সুরে, 'অটোমেটিক রিটার্ন চালু আছে— তিন মিনিট ধৈর্য ধরো।'

'তিন মিনিট!' তিন সেকেন্ডও থাকবার ইচ্ছে তখন আমার নেই। কিন্তু প্রফেসর একদৃষ্টে অমনভাবে কী দেখছেন?

দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, আমরা নেমেছি একটা ধূ ধূ মরুভূমির মধ্যে। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা তেকোনা পাহাড়। না, না, পাহাড় নয়— পিরামিড। বিদঘুটে স্ফিংক্স মূর্তিও দেখলাম একটা— ওত বসে যেন জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে আমাদের দিকেই। কিন্তু প্রফেসর এসবের ওপর দিয়ে চেয়ে আছেন দূর দিগন্তের যে দিকে— সে দিকে সূর্য উঠছে ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে।

চোখ দুটো কুঁচকে গেল প্রফেসরের। তোবড়ানো গাল নেড়ে কী যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

উদ্বিগ্ন হলাম। শুধোলাম, 'কী হয়েছে প্রফেসর?'

ঠিক এই সময়ে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় উলটে পড়তে পড়তে অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে ফিরে গেল টাইম মেশিন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'যাক বাবা, বাঁচা গেল। অটোমেটিক রিটার্ন চালু আছে।'

'তুমি কি ভেবেছিলে চালু নেই?' বলে কন্ট্রোল প্যানেলের যন্ত্রপাতিতে হাত দিলেন প্রফেসর। চোখ রইল কিন্তু সূর্যোদয়ের দিকে। বৃদ্ধি পেল সময় গতির। দিগন্ত ছাড়িয়ে সূর্য

বিদ্যুৎ বেগে মাথার ওপর দিয়ে অস্ত গেল অপর দিকে। পরমুহূর্তেই আবার সূর্যোদয়, দিবাবসান, সূর্যাস্ত। তারপরেই ঘটল অঘটন।

লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে গেল আকাশে বাতাসে। গোটা ভূমণ্ডলটা কেঁপে উঠল ভয়ংকরভাবে। দামাল হাওয়ায় বালির ঝড় বয়ে গেল মরুভূমির ওপর দিয়ে। অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক।

পরক্ষণেই অপসৃত হল তমিস্রা। সূর্য উঠে এল যেদিকে অস্ত গেছিল, সেদিক দিয়েই!

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না। এই তো পশ্চিমে ডুব দিল সূর্য— আবার পশ্চিমেই উঠে এল!

প্রফেসর কিন্তু নির্নিমেষে চেয়ে আছেন ধাবমান সূর্যের দিকে। বিদ্যুৎ বেগে আকাশে জ্বলন্ত রেখা টেনে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য অস্ত গিয়েই আবার উঠে এল... আবার... আবার... বার বার... কিন্তু এবার আর উদ্ভট ব্যাপারটা ঘটতে দেখলাম না। অবিরাম রইল উদয় আর অস্ত পরম্পরা স্ব স্ব দিগন্তে।

গভীর নিশ্বাস নিয়ে প্রফেসর বললেন, ‘এখন যদি বলি ম্যানিলার মূর্খ বৈজ্ঞানিকগুলোকে যে হেরোডোটাস তাঁর ইতিহাসে যা লিখেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, তাও ওরা বিশ্বাস করবে না। এমনই পাঁঠার দল।’

কী বলতে চান প্রফেসর? আমতা আমতা করে বলেই ফেললাম, ‘কীসের ইতিহাস প্রফেসর?’

‘ঈজিপ্টের পুরুতদের সঙ্গে কথা বলার ইতিহাস। ওঁরাই প্রথম হেরোডোটাসকে জানিয়েছিলেন, দু-দুবার সূর্য অস্ত গেছিল পুবে, উঠেছিল পশ্চিমে।’

‘পুবে অস্ত, পশ্চিমে উদয়! বলছেন কি?’

‘ম্যানিলার মূর্খদের খাতায় নাম লেখালে নাকি? নিজের চোখে দেখলে না? পুব হয়ে গেল পশ্চিমে, দক্ষিণ হয়ে গেল উত্তর? কেন হল তাও কি বলে দিতে হবে?’

‘আ-আ—’

‘শাট আপ। পৃথিবীটা উলটে গেলেও তুমি টের পাও না, কীরকম আহাম্মক তুমি!’

‘পৃথিবী উলটে গেল!’

‘জী হ্যাঁ, বোকচন্দর! পৃথিবীটা উলটে গেল। ইলেকট্রিক ডিসচার্জগুলো দেখলে তো চোখের সামনে। একটা ম্যাগনেটের ওপর ইলেকট্রিক ডিসচার্জ দিয়ে দেখো না, পোলারিটি পালটে যাবে। পৃথিবীও নিজের চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে একটা বিরাট ম্যাগনেট। টাইফনের ইলেকট্রিক ডিসচার্জ তার মেরুপ্রবণতা পালটে দিয়ে গেল বলেই গোটা পৃথিবীটা ঘুরে গেছিল। তাই সূর্যকে দেখলে পশ্চিমে উঠতে, পুবে নামতে। ঠিক যেমন কুমোরের চাকায় মাটির হাঁড়ি উলটে যায়, সেইভাবে।’

‘পৃথিবী উলটে গেছিল!’ বোকার মতো পুনরাবৃত্তি করে ফেলেই দাবড়ানি খেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

‘বিশ্বাস হল না গজমূর্খ? আকাশের তারাগুলো দেখলেও তো বিশ্বাস হত।’

‘তা তো দেখিনি।’

'তা আর কেন দেখবে, হাঁদারাম কোথাকার। উলটে গেছিল! সব উলটে গেছিল। পুরো রাশিচক্রটাই উলটোপালটা হয়ে গেছিল। প্লেটো তো তাই লিখেছিলেন 'স্টেটসম্যান' কেতাবে, এই ব্রহ্মাণ্ডটা যেন উলটোদিকেও ঘুরপাক খেয়েছিল কোনও একসময়ে। আসলে পৃথিবীটা উলটে যাওয়ায় ওইরকমই মনে হয়েছিল। উত্তরের তারামণ্ডল চলে এসেছিল দক্ষিণের আকাশে, দক্ষিণের তারামণ্ডল গিয়েছিল উত্তরের আকাশে। সেনমুটস-এর সমাধিমন্দিরের কড়িকাঠে সেই উলটো ছবি দেখে তো তাক লেগে গিয়েছিল বৈজ্ঞানিকদের। বলেছিল, সব নাকি ভুল। কিন্তু কোরানেও কি ভুল লিখেছিল?'

পৃথিবী নামক সুবৃহৎ চুম্বকের সঙ্গে বহিরাগত ধূমকেতুর শর্টসার্কিট নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করার সময় কি তখন আমার আছে? ভুবনজোড়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড দেখে তখন আমার মুণ্ড ঘুরছে। সূর্য তো এখনও সিধে পথে চলছে না! গতিপথ বেঁকে যাচ্ছে। আকাশপথে মাতালের মতো ছুটছে। টলতে টলতে উঠে আঁকাবাঁকা পথে ছুটে গিয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেন? কেন এরকম হচ্ছে? সেইসঙ্গে পৃথিবীর গোঙানি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আকাশপথে চক্কর মারতে মারতে দেখলাম হাজার হাজার আগ্নেয়গিরি থেকে ভলকে ভলকে আগুন আর লাভা আর জ্বলন্ত পাথর বৃষ্টিও বৃদ্ধি পেয়েছে। নদী সাগর সরোবরে জ্বলন্ত পাথর পড়তেই জল বাষ্প হয়ে যাচ্ছে, বনে জঙ্গলে আগুন ধরে যাচ্ছে। কেন? কেন এমন মাতালের মতো সূর্যের পথপরিক্রমা? চাঁদও তো দেখছি মত্ত! একি সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড? সবশুদ্ধ ছ'বার এই রকম মাতলামি করে গেল আমাদের সূর্য আর চন্দ্র। তারপর আবার যে কে সেই— অব্যাহত রইল দীর্ঘ টানারেখায় সূর্যের পথপরিক্রমা, চন্দ্রের কলা পরিবর্তন।

'বিশুদ্ধমাগ্ন পড়েছ?' কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন প্রফেসর, 'বৌদ্ধ গ্রন্থ। সেখানেও লেখা আছে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাহিনি। বেশি দূরে যেতে হবে না, ঘরের কাছে আন্দামানে গিয়ে নেটিভদের কাছে খোঁজ নিয়ো। আজও তারা মনে রেখেছে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার এই বিপর্যয়। আজও তারা বলে, প্রকৃতি যেদিন ক্ষেপে যাবে, পৃথিবী সেদিন উলটে যাবে।'

'সমুদ্র ফুটছে!' রুদ্ধশ্বাসে পায়ের তলায় পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম প্রফেসরের, 'বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে সমুদ্র!'

'তা তো উড়বেই, বৎস!' হৃষ্টকণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'ধূমকেতুর কাছাকাছি আসতেই, আবর্তনের বেগ কমে আসতেই পৃথিবী যে গরম হয়ে গেছে। তাই তো সমুদ্রের জল উবে যাচ্ছে।'

বাষ্প শুধু উড়েই যাচ্ছে না, ভূমণ্ডলকে মেঘের আকারে পাক দিতে দিতে শীতল হয়ে বরফের আকারে ঝরে পড়ছে যেখানে, সেখানে মেরু অঞ্চল নেই। সুমেরু কুমেরুর বরফ গলে যাচ্ছে, হু হু করে পৃথিবীর অক্ষরেখা হেলে পড়ায়— নতুন সুমেরু কুমেরু সৃষ্টি হচ্ছে পাশে পাশে। সেইসঙ্গে পালটে যাচ্ছে ঋতু পরিবর্তন। মিশরের ওপর দেখলাম গ্রীষ্মের বদলে হানা দিল শীত। মাসগুলোও পালটে গেল— ঘণ্টার হিসেব গেল গোলমাল হয়ে। পৃথিবীর যেখানে তাপ থাকার কথা যে সময়ে, সেখানে এল শৈত্য— বিপরীত দেখা গেল অন্যত্র। টাইফনের মহিমা দেখে হতভম্ব হয়ে স্থাণুর মতো সময়গাড়িতে বসে রইলাম আমি।

আপন মনে বললেন প্রফেসর, 'তিনশো ষাট দিনের হিসেবে বছর হচ্ছে এখন— পাঁচ দিন হারিয়ে গেল ক্যালেন্ডার থেকে।'

'একেবারে তো নয়।'

'সাতশো বছরের জন্যে—'

'আপনি কোত্থেকে জানলেন?'

'পুরাণ ঘেঁটে, দেশ-বিদেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান ঘেঁটে। এই পাঁচ দিনের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে ম্যানিলার মূর্খগুলো—'

পঁচিশ বছর আকাশ কালো হয়ে রইল ঘন মেঘে। একা ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের জের চলেছিল পুরো একটা বছর— গোটা পৃথিবীর আকাশ কালো করে রেখেছিল। আর, হাজার হাজার ভলক্যানোর যুগপৎ অগ্ন্যুৎগারের রেশ তো পঁচিশ বছর থাকবেই। ঘন মেঘের ওপরের দিকে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে ম্লান আভার আকারে ঠিকরে এল মর্ত্যলোকে। সূর্যাস্তের পর এই আভাই হল রক্তবর্ণ।

এই পঁচিশ বছরে বহুবার টাইম মেশিন দাঁড় করিয়েছেন প্রফেসর। হাওয়ার মধ্যে পেয়েছি বড় মিষ্টি একটা গন্ধ। ঠিক যেন পদ্মের সৌরভ। সেইসঙ্গে আকাশ থেকে ঝরে পড়তে দেখেছি অমৃত!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! অমৃত! ভোরের শিশিরের সঙ্গে দেখেছি ঝুরঝুর করে শস্যের বীজ খসে পড়ছে মাঠে, বনে, প্রান্তরে, জলে। হলদেটে রং। এক খামচা তুলে নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে শুরু করেছিলেন প্রফেসর পরম তৃপ্তির সঙ্গে, 'আঃ! এই হল গিয়ে তোমাদের দেবতাদের অমৃত।'

অমৃত! আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে! সৌগন্ধ্যে দিকবিদিক মাত হয়ে গেছে। আমার আর তর সয়নি। খপাৎ করে এক খামচা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিয়েছিলাম। কী মিষ্টি খেতে। ঠিক মধুর স্বাদ। অপূর্ব গন্ধ। শরীর চাঙ্গা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'এরই নাম অমৃত? অমর হয়ে যাব তো এখন থেকে?' বলেছিলাম পুলকিত চিত্তে।

'ঘোড়ার ডিম হবে,' আমাকে একেবারে নিভিয়ে দিয়ে বলেছিলেন প্রফেসর। 'পঁচিশ বছরের অন্ধকার কেটেছে তো এইভাবেই। পঁচিশ বছরের ঘোমটা খুলেছে একটু একটু করে বাষ্প, শিশির, বৃষ্টি, শিলা আর তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে। সেইসঙ্গে বায়ুমণ্ডলের উপাদানও মুক্তি পেয়ে নেমে এসেছে একই ভাবে—'

'বায়ুমণ্ডলের উপাদান।'

'খুব সম্ভব হাইড্রোজেন আর কার্বন। এক কথায় কার্বোহাইড্রেট।'

'কার্বোহাইড্রেট! যা আমাদের মূল খাদ্য?'

'আরে হ্যাঁ। পরপর দু'বার ধূমকেতুর কাছে এসে পৃথিবী যখন খাদ্যহীন, ঠিক তারপরেই আকাশ থেকে কার্বোহাইড্রেট ছড়িয়ে গিয়েছে ভোরের শিশিরের সঙ্গে। তাই তো বুভুক্ষু মানুষের কাছে তা অমৃত সমান। তাই তো ইহুদিদের কাছে যার নাম 'ম্যান্যা', গ্রিকদের কাছে সেই স্বর্গীয় রুটির নাম 'অ্যামব্রোসিয়া'।'

'স্বর্গীয় রুটি!'

'রুটিই তো। আমরা কচমচ করে কাঁচা খেলাম বটে, কিন্তু ঠিক খেতের গমের মতোই আকাশে গমকে যাঁতায় গুঁড়িয়ে, চাটুতে সেঁকে, রুটি বানিয়ে নেওয়া হত। দেখাব, দেখাব, সব দেখাব।'

'কার্বোহাইড্রেটের নাম অমৃত!'

'আঃ! আর কত অবাক হবে বলতে পারো? জ্বালালে দেখছি। বৌদ্ধ পুথি খুললেও দেখতে পাবে পরিষ্কার লেখা আছে, স্বর্গের খাবার পৌঁছেছিল মর্তে যখন পৃথিবী ধ্বংস হয়েছিল, দিন আর রাত এক হয়ে গেছিল, মহাসাগর শুকিয়ে গেছিল।'

'কিন্তু অমৃত তো সমুদ্রমন্থন করে উঠেছে।'

'উজবুক কাঁহাকার! সমুদ্র বাষ্প হয়ে গিয়েছিল বলেই সমুদ্র মন্থনের কল্পনা। দেবতা-দানবের লড়াই তো চোখের সামনে দেখলে। আকাশিক সংঘর্ষের ফলে অনিষ্ট যেমন হয়েছে, ইষ্টও তেমনি হয়েছে। অনিষ্টের নাম গরল, ইষ্টের নাম অমৃত।'

'অ।'

গজগজ করতে করতে প্রফেসর বললেন, 'ঋগ্বেদ অথর্ব বেদগুলো পড়লেও তো সন্দেহের অবসান ঘটত। সে বিদ্যেও নেই। ঋগ্বেদে স্পষ্ট বলেছে, মধু পড়েছিল মেঘ থেকে। মধুর স্বাদ তো পেলে এখুনি। অথর্ব বেদ তো স্পষ্টই বলছে, স্বর্গ মর্ত বাতাস সমুদ্র আগুন থেকে মধুর উৎপত্তি। এই মধু অমৃতের আকারে বাঁচিয়ে দিয়েছে জীবজগৎকে। এই যে মিষ্টি গন্ধটা পাচ্ছ বাতাসে, বেদের অগ্নিস্তোত্রে তারও উল্লেখ আছে। হিন্দুর ছেলে না তুমি?'

ঠিক সেই সময়ে তিন মিনিটের মেয়াদ ফুরোতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম। পৃথিবীকে চরকিপাক দিতে দিতে দেখেছিলাম, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রফেসর একটুও বাড়িয়ে বলেননি। সারা ভূমণ্ডল যখন পুড়ে কালো, তখন ভোরের শিশিরের সঙ্গে বিরামবিহীনভাবে কার্বোহাইড্রেট ঝরছে শস্যদানার আকারে। রোদ উঠলে কিছু গলে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু তার আগেই বুভুক্ষু মানুষেরা কুড়িয়ে নিয়ে ঢেকে রেখে দিলে আর কিছু হচ্ছে না। সেই শস্য খাচ্ছে ঘোড়া, গাঁজিয়ে মদ করে খাচ্ছে যোদ্ধারা, নিঙড়ে তেল বার করে মলম বানিয়ে গায়ে মাখছে মরুপ্রান্তর আর পর্বতাঞ্চলের মেয়েরা। প্রকৃতই অমৃত, এক বস্তু বহুবস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে কাজে লাগছে জীবজগতের। এ-দৃশ্য দেখলাম দেশে দেশে; দেখলাম প্রশান্তের মাওরিদের মধ্যে, এশিয়া আর আফ্রিকার সীমান্তে ইহুদিদের মধ্যে; হিন্দু, ফিন, আইসল্যান্ডার সব্বাই মৃত্যুবরণ আকাশ থেকে বর্ষিত শস্যদানাকে অমৃতজ্ঞানে পূজা করছে। মেঘাবৃত ভূমণ্ডলের উত্তাপে কিছু শস্য গলে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে, শিশিরকে যেভাবে মাটি শুষে নেয়—সেইভাবে শুষে নিচ্ছে। তবুও সারা পৃথিবী জুড়ে ভোরের শিশিরের সঙ্গে বর্ষিত হয়ে চলেছে মধু-তুষার বিপুল পরিমাণে।

প্রফেসরের একটা কথা কিন্তু এখনও মনে আছে। মধু-তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে ধেয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ শুধিয়েছিলেন, 'স্বর্গের রুটির পরিমাণটা জানো?' বলেই জবাবটা নিজেই দিয়েছিলেন, 'হ্যাগগাডিক সাহিত্যে বলে নাকি পৃথিবীর তাবৎ মানবকে দু'হাজার বছর ধরে আহার জুগিয়ে দেওয়ার মতো শস্য পড়েছিল আকাশ থেকে।'

আমি তখন বিস্ফারিত চোখে দেখছিলাম আরও একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য। দুধের নদী বইছে পায়ের তলায়।

দুধের নদী! সাদা দুধই তো বটে। চক্ষের নিমেষে ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল টাইম মেশিন। লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন প্রফেসর নদীর তীরে।

হাঁ হাঁ করে উঠলাম আমি, 'অটোমেটিক রিটার্ন চালু রয়েছে যে!'

ভ্রূক্ষেপ না করে নদীর জলে হাত ডুবিয়ে দিতে দিতে প্রফেসর বললেন, 'না, নেই। নেমে এসো। দেখে যাও রূপকথার দুধনদীর চেহারা।'

ভয়ে ভয়ে নামলাম বিজন বিভুঁয়ে। আঁজলা ভরে জল নিয়ে পান করলেন প্রফেসর, 'আঃ! কী মিষ্টি! ঠিক যেন মধু! তাই তো অথর্ববেদে বলেছে মধু-ফুল আগুন আর বাতাসের মধ্যে দিয়ে নেমে এসেছিল ধরাতলে— অমৃতবর্ষণে মধু হয়ে গেছিল নদীর জল।'

চড় চড় দড়াম করে আওয়াজ হল পেছনে। চমকে ফিরে দেখলাম মাটি দু-ফাঁক হয়ে গেছে। ফোয়ারার মতো দুগ্ধ ছিটকে আসছে বাইরে।

'প্রফেসর! প্রফেসর!' হ্যাঁচকা টান মারলাম ওঁর হাত ধরে।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলেন প্রফেসর, 'এমন ভীতু আর দেখিনি। দুধ এল কোত্থেকে জেনে যাও।'

ঝুরঝুর করে অ্যামব্রোসিয়া পড়ছে সারা গায়ে, হাতে, মাথায়, মুখে। পড়ছে নদীর জলে। হাত তুলে দেখিয়ে বললেন প্রফেসর, 'ওই দেখো, জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল দুধের মতো সাদা হয়ে যাচ্ছে। তাই ওপর থেকে মনে হয়েছে দুধ— যেমন মনে হয়েছিল মিশরীয় আর ইহুদিদের।'

চড়-চড়াৎ দুমদাম শব্দটা এবার শোনা গেল ঠিক পেছনে। হুড়মুড় করে ধসে পড়ল ডানদিকের পাড়। পায়ের তলার মাটি হেলে পড়তেই চক্ষের নিমেষে প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে একলাফে পেরিয়ে এলাম মাটির ফাটল। টাইম মেশিনও হেলে পড়েছিল। ধড়মড় করে ভেতরে উঠেই প্রফেসরকে বলতে গেলে ছুড়ে সিটের ওপর ফেলে দিয়ে বললাম, 'চালান!'

ককিয়ে উঠে প্রফেসর বললেন, 'লাগে না বুঝি?' হাতদুটো কিন্তু গিয়ে পড়ল কন্ট্রোল প্যানেলে। মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁকুনি দিয়ে ফিরে গেলাম অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে।

কপালের ঘাম মুছে বললাম, 'খবরদার আর কোথাও গাড়ি থামাবেন না।'

মিনমিন করে বললেন প্রফেসর, 'সে দেখা যাবে।'

হু হু করে পেরিয়ে গেল আরও পঁচিশটা বছর। মনটা এখন প্রফুল্ল। বর্তমানে ফিরে যাচ্ছি। পৃথিবীর আকাশও পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সেই বারোমেসে ঘনঘটা আর নেই। এমন সময়ে দূর আকাশে দেখা গেল একটা ধূমকেতু।

প্রফেসর আগেই দেখেছিলেন। একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন সেই দিকে। আমি অস্ফুট চিৎকার করে উঠতেই বললেন মৃদু কণ্ঠে, 'টাইফন ফিরে আসছে।'

'টাইফন! আবার!'

জবাব দিলেন না প্রফেসর। পলকের মধ্যে পেরিয়ে এলাম দু-দুটো বছর। ধূমকেতু এসে গেছে পৃথিবীর খুব কাছে। ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা খসে পড়ছে ভূমণ্ডলের সর্বত্র। বড় বড় জ্বলন্ত পাথরের চাঁই যেখানে পড়ছে, সেখানেই আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বাষ্প ছিটকে যাচ্ছে শূন্যে।

আচম্বিতে স্থির হয়ে গেল সূর্য আর চন্দ্র।

আঁতকে উঠলাম, 'আবার পৃথিবী উলটে গেল নাকি?'

ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে পৃথিবী তখন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। জনপদের পর জনপদ শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। মেদিনী আবার গোঙাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে... কাঁপছে...কাঁপছে! দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল গোটা পৃথিবীতে!

মহাশূন্যে জ্বলতে লাগল সবুজ গ্রহ পৃথিবী!

পরমুহূর্তেই নড়ে উঠল সূর্য। আবার শুরু হল অস্তাচল যাত্রা।

কিন্তু পৃথিবী তো তখন অগ্নিগোলকে রূপান্তরিত হয়েছে। ভূস্তর ফাটছে চড়চড় দমাদম শব্দে— প্রথমে ওপরের স্তর তারপর নীচের স্তর। জলাভূমি, ভিজে মাটি শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাচ্ছে— মাছ আর প্রান্তর সাদা ছাইয়ে ঢেকে যাচ্ছে... তরুলতা পুড়ছে, শ্যামল বৃক্ষপত্র পুড়ছে... মাঠের সোনালি ধান পুড়ছে... বড় বড় শহরগুলো নিমেষে ভেঙে পড়ে মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে... আগুন জ্বলছে পাহাড়ে, জঙ্গলে, মাঠে, প্রান্তরে। অপরিসীম উত্তাপে ইথিওপিয়ার মানুষগুলোর চামড়া কালো হয়ে যাচ্ছে। লিবিয়া মরুভূমি হয়ে গেল, ডন নদীর জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেল, ব্যাবিলোনিয়ান ইউফ্রেটিস পুড়তে লাগল; গঙ্গা, ড্যানিউব, ফাসিস, আলফিয়াস ফুটতে লাগল টগবগ করে; নদীর পাড় বরাবর দেখা দিল দাবানল, সৈকতভূমির বালি দারুণ উত্তাপে গলে গিয়ে হল কাচ। সাগর উবে গিয়ে দেখা দিল বালুকাময় মরুপ্রান্তর, কোথাও নিতল সমুদ্রগর্ভ থেকে মাথা তুলল পর্বত; কোথায় অগুনতি ফোয়ারা আবির্ভূত হল মেদিনী ফাটিয়ে। আগ্নেয়গিরিরা পাগল হয়ে লাভা উগরোচ্ছে, দ্বীপের পর দ্বীপ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। একটা দিন... মাত্র একটা দিন সূর্য স্থির হয়ে থেকে ছিল এক গোলার্ধে— আর এক গোলার্ধে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা বিরাজ করেছিল রাত্রি। মাত্র ওই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই লোপ পেল গ্রিক সভ্যতা...

আমরা তখন আটলান্টিকের ওপরে। পৃথিবীটাকে চরকিপাক দিতে দিতে আশ্চর্য এক মহাদেশ দেখেছিলাম সেখানে— আধুনিক মানচিত্রে যার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন, 'ওই হল গিয়ে আটলান্টিস, যে আটলান্টিসের গল্প বলে গেছেন প্লেটো— কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। ওই সেই আটলান্টিস। আফ্রিকা শাসন করেছে, ঈজিপ্ট আর ইউরোপের বর্ডার পর্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। যে আটলান্টিসের অস্তিত্ব মানতে চাননি ম্যানিলার মূর্খরা, কিন্তু যে মহাদেশকে নিয়ে চুটিয়ে গল্প উপন্যাস কাব্যরচনা করে গেছেন দেশ-বিদেশের কবি আর লেখকেরা। ১৯২৬ সালের একটা অসম্পূর্ণ তালিকা অনুসারে এরকম রচনার সংখ্যা ১৭০০।'

'১৭০০! বলেন কী!' সত্যিই অবাক হয়ে গেছিলাম আমি।

উনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ ১৭০০। আরও বেশি আছে। যাঁরা কল্পনাবিলাসী, লস্ট আটলান্টিস তাদের কল্পনার খোরাক জুটিয়েছে হাজার হাজার বছর। কেউ বলেন, এই মহাদেশ ছিল আটলান্টিকে, কারও কারও মতে তিউনিসিয়া, প্যালেস্টাইন, দক্ষিণ আমেরিকা, সিলোন, নিউফাউন্ডল্যান্ড, স্পিটবার্জেনে। মানে, সমুদ্র ছেড়ে ডাঙার ওপরেও আটলান্টিসকে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু তুমি তো দেখছ আটলান্টিস রয়েছে আটলান্টিকেই। যুগ যুগ ধরে কত বীর্যবান রাজা রাজত্ব করে গেছে এখানে, দ্বীপের পর দ্বীপ জয় করেছে, মহাদেশের অংশ কেড়ে নিয়েছে। লিবিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপেও বিজয়কেতন উড়িয়েছে— সেই তাসকানি পর্যন্ত। এখন বুঝলে তো কেন আমেরিকান, ঈজিপ্সিয়ান আর ফিনিসিয়ানদের মধ্যে সংস্কৃতির এত সাদৃশ্য? যোগাযোগ ছিল তো এই আটলান্টিসের মধ্যে দিয়েই।'

আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার সেই বিশাল আটলান্টিস সাম্রাজ্যের ওপর এসে দেখলাম কল্পনাতীত এক দৃশ্য।

তখন গভীর রাত্রি। সৃষ্টি ধ্বংস হচ্ছে। পৃথিবী জোড়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটছে। কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার মতো আওয়াজ শুনলাম নীচে। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। আগুন আর জ্বলন্ত পাথর ধেয়ে গেল মেঘলোক পর্যন্ত। নিমেষের মধ্যে তাথৈ তাথৈ সমুদ্র নাচতে লাগল বিরাট সাম্রাজ্য যেখানে ছিল— সেখানে। সমুদ্র গর্ভে নিমেষের মধ্যে তলিয়ে গেল আটলান্টিস। পরপর আরও কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটল। দূরে দূরে আরও কিছু ভূখণ্ডকে গ্রাস করল রাক্ষস আটলান্টিক। আর কোথাও ডাঙা নেই। শুধু সমুদ্র! শুধু সমুদ্র! শুধু সমুদ্র!

হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, 'আটলান্টিস লস্ট হয়ে গেল!'

'হ্যাঁ, দীননাথ, লস্ট হয়ে গেল আটলান্টিস,' অদ্ভুত গম্ভীর গলায় বললেন প্রফেসর। গম্ভীর, কিন্তু ভারাক্রান্ত। পৃথিবীজোড়া অনেক ধ্বংসলীলা দেখেও যিনি প্রসন্ন ছিলেন, তাঁর এখনকার বিষণ্ণতা মনকে নাড়া দিয়ে গেল। বললেন আবার মন্দ্র মন্থর কণ্ঠে, 'হারিয়ে গেল একটা উন্নত সভ্যতা— চিহ্নমাত্র না রেখে। মহাকাল, তোমাকে প্রণাম!'

'কিন্তু কেন? পৃথিবী কি আবার উলটে গেল?'

'না, দীননাথ। পৃথিবীর অক্ষরেখা শুধু হেলে পড়ল। তাই একদিনের জন্য সূর্য দাঁড়িয়ে গেল মনে হল। অক্ষরেখার চারধারে লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে ধাক্কা খেল বলেই ভূস্তর হড়কে সরে গেল— গলন্ত পাথর তলা থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে আগুন ধরিয়ে দিল পৃথিবীতে! আনফরচুনেট! মোস্ট আনফরচুনেট!'

কিন্তু ওই শেষ!

বাহান্ন বছরের ব্যবধানে এসে আগন্তুক টাইফন টলটলায়মান অবস্থায় পৃথিবীকে ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিয়ে তো গেলই, নিজেও পৃথিবীর আকর্ষণে নিজের ছুটে চলার পথ ছেড়ে ধরল অন্যপথ।

সেই দৃশ্য বিহ্বল হয়ে দর্শন করলাম আমরা। দ্বিতীয় সূর্যের মতো সমস্ত সৌরজগৎ আলোকিত করে দূর থেকে দূরে এঁকেবেঁকে টলতে টলতে ছুটে গেল টাইফন। তখনও তার

ল্যাজ রয়েছে— কিন্তু আকারে অনেক ছোট হয়ে গেছে। দু-দুবার পৃথিবীর ওপর উল্কার পাথর খসিয়ে গেছে ওই ল্যাজ থেকে— ছোট তো হবেই। শূকরপুচ্ছের মতো খাটো ল্যাজ, কিন্তু অতীব দ্যুতিময় মাথা নিয়ে সূর্যের টানে তার চারদিকে পরিক্রমা শুরু করল টাইফন।

জন্ম নিল শুক্র গ্রহ। শূকরপুচ্ছ আস্তে আস্তে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। কিন্তু মাথা জ্বলছে সূর্যের মতো। সে কী আলো! চড়া রোদের মতো চোখধাঁধানো। অথচ আমরা যে গ্রহকে কখনও দেখি ভোরের তারা অথবা সাঁঝের তারা রূপে বছরের বিভিন্ন সময়ে, তার আলো সূর্যের আলোর দশ লক্ষ ভাগের একমাত্র। সাড়ে তিন হাজার বছরের ব্যবধানে জারিজুরি অনেক কমে এসেছে সৌরজগতের নবীন গ্রহের।

নতুন গ্রহ বলেই কিন্তু শুক্র চক্রাকার পথে ঘুরছে না সূর্যকে ঘিরে— ঘুরছে ডিমের মতো কক্ষপথে। বড় বিপজ্জনক কক্ষপথ। সৌরজগতের সব গ্রহেরই নির্দিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে। উটকো উৎপাতটা পৃথিবীর সর্বনাশ করতে করতে বেরিয়ে গিয়ে না জানি আবার কোন গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়।

প্রফেসর এই সময়ে বলে উঠলেন, 'এখন বুঝছো তো পাঁচ হাজার বছর আগেকার জ্যোতির্বিজ্ঞানে কেন শুক্রগ্রহের উল্লেখ নেই? কেন শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল আর বুধ— এই চার গ্রহকে নিয়ে জ্যোতিষীরা আঁক কষেছেন ভারতবর্ষে আর ব্যাবিলনে? পাকা গণিতবিদ ছিলেন তাঁরা— অথচ শুক্রকে তাঁদের গণনার মধ্যে আনেননি শুধু এই কারণে— শুক্রের জন্ম হয়েছে অনেক পরে— আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। বেদে অবশ্য বলেছে, শুক্রের নাকি ল্যাজ ছিল। দেখতেই পাচ্ছ, রয়েছে। একই কথা বলেছেন ইউফ্রেটিস আর মেক্সিকান উপসাগরের উপকূলবাসীরাও। শুক্রের ল্যাজ ছিল এককালে— ধূমকেতু ছিল যে।'

দিনের বেলাতেও সদ্যোজাত শুক্রের আলোয় আকাশ ছেয়ে রয়েছে তখনও।

'শুক্র যে এককালে ধূমকেতু ছিল, তা শুক্রের দেশ-বিদেশের নাম বিশ্লেষণ করলেও ধরা যেত— এতদূর আসার দরকার হত না,' বললেন প্রফেসর, 'শুক্রর পেরুভিয়ান নাম 'চাসকা'— মানে, ঢেউ খেলানো চুল। তা ছাড়া, 'কোমা' শব্দটা গ্রিক, যার মানে, চুল। 'কোমা' থেকে 'কমেট' শব্দের উৎপত্তি।'

আমি তখন ওঁর কথা শুনছিলাম না। পলকহীন চোখে দেখছিলাম ডিমের মতো কক্ষপথে ছুটতে ছুটতে যতবার পৃথিবীর কাছে আসছে নতুন গ্রহ শুক্র, ততবারই খানিকটা অংশ আলোয় থাকছে, খানিকটা থাকছে ছায়াচ্ছন্ন। ঠিক চন্দ্রকলার মতন। পৃথিবীর কাছাকাছি আসতেই কলা-র প্রান্তদুটো ঝকঝক করছে দুটো শিং-এর মতো। ঠিক যেন মোষের শিং অথবা গোরুর শিং।

আঙুল তুলে দেখালাম প্রফেসরকে, 'দেখেছেন?'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'তোমার আগেই দেখেছি। মাউন্ট সিনাইতে ষাঁড়কে আর দেশ-বিদেশে গোরু আর ষাঁড়কে দেবতাজ্ঞানে কেন পূজা করা হয়, এখন তোমারই বোঝা উচিত।'

'গোরু-ষাঁড়ের পূজার সঙ্গে শুক্রের শিঙের কী সম্পর্ক?'

ক্ষেপে গেলেন প্রফেসর, 'তোমার মাথায় দুটো শিং থাকলে সম্পর্কটা অনেক আগেই বুঝতে। শুধু গোরু আর ষাঁড় কেন, ছাগল আর সাপকেও বহু দেশে পূজা করা হয় শুধু শুক্রের ওই চেহারা দেখে। সাপের মতো কিলবিলে চেহারা নিয়ে দক্ষযক্ষ কাণ্ড বাঁধিয়ে গেছিল যে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরাকালের মানুষ তাই সর্পদেবতার পূজা করে তুষ্ট করতে চেয়েছে তাকে। গোরুকেও হিন্দুরা ভগবান বলে শুধু এই কারণেই। কেন করবে না বলো? শিংওলা যে গ্রহ দুধ উৎপাদন করে গেছে, তার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য তো গোরুর। অথর্ববেদে তাই তো আকাশ থেকে অমৃত বৃষ্টির অত ফলাও বর্ণনা, দুধ দিয়েছে বলে দেবতাকে বিশাল গাভী রূপে কল্পনা। স্বর্গ থেকে আগুন বৃষ্টি করেছে বলে রুদ্ররূপী ষাঁড় হিসেবেও কল্পনার উৎস ওই শুক্র। কামধেনু কল্পনার আদি কোথায় এবার বুঝেছ হাঁদারাম?'

কাঁহাতক গালাগাল সহ্য করা যায়। তেড়িয়া মেজাজে বললাম, 'অত পড়াশুনার সময় নেই আমার।'

'না পড়েই সায়েন্স ফিকশন লেখো বলেই সাহিত্যের বাজারে বস্তাপচা সস্তা মাল ছেড়ে যাচ্ছ সমানে। রামায়ণ পড়েছ?'

'স্কুলে পড়েছি।'

'মাথা কিনে নিয়েছ। সম্পূর্ণ রামায়ণটা পড়ে দেখো হে পণ্ডিত। সেখানেও বলা হয়েছে, স্বর্গের গাভী নাকি মধু দেয়, সেঁকা শস্য দেয়... দই দেয়, চিনি মিশানো দুধ ঢালে সরোবরে। স্বর্গের গোরুরই তো আরেক নাম সুরভি, তাই না? যে সৌরভ বিতরণ করে? মহাকাব্যে তো স্পষ্ট বলেছে, উৎকৃষ্ট সুগন্ধ বিতরণ করে সুরভি। সুগন্ধ টের পাওনি আকাশে-বাতাসে?'

'পেয়েছি, পেয়েছি।'

'তবে আর গোরু-ষাঁড়ের পুজোর সঙ্গে শুক্রের শিং-এর সম্পর্ক আছে শুনে আকাশ থেকে পড়লে কেন? এইজন্যেই তো অথর্ব বেদের বিধান অনুযায়ী হিন্দুরা গোরু-ষাঁড় মারে না— তাদের বিষ্ঠা আর মূত্রও পবিত্র তাদের কাছে। অথচ বেদেই উল্লেখ আছে, শুক্রের আবির্ভাবের আগে গোরু বলি হত, মাংসও খাওয়া হত। কেননা, তখনও শুক্র তার শিং নিয়ে আবির্ভূত হয়নি।'

রাগে ফুঁসতে লাগলেন প্রফেসর। রাগ প্রশমনের জন্যে একটু মন জোগালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ধ্বংসের দেবতা শিবের কল্পনাও কি ওই শুক্র থেকে?'

অমনি স্বয়ং শিবের মতো জল হয়ে গেলেন প্রফেসর, 'মন্দ বলোনি। এদিকটা এখনও ভেবে উঠিনি। শিবের চেহারাখানা কল্পনা করো। মিলে যাচ্ছে না ওই শুক্রের সঙ্গে? মাথায় আধখানা চাঁদ। চুলের জটা, কখনও তা সাপের মতো, বাহন ষাঁড়। হাতে ডম্বরু— প্রলয়কালে যে শব্দ শুনে এলে কিছু আগে। বাঃ! বাঃ! এই তো বুদ্ধি খুলেছে। আসলে কি জানো, সৎসঙ্গে বুদ্ধি ঠিক খুলে যায়। একেবারে নির্বোধ তো তুমি নও— হলে কি আমার ধারেকাছে রাখতাম তোমাকে।'

এই প্রথম প্রফেসরের মুখে আমার বুদ্ধির প্রশংসা শুনলাম, হ্যাঁ, সেই প্রথম উপর্যুপরি অ্যাডভেঞ্চার আর কল্পনাতীত দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে আর ম্যারাথন বক্তৃতা ঝাড়তে ঝাড়তে ওঁর নিজের বুদ্ধির গোড়াও বোধহয় আলগা হয়ে এসেছিল— তাই বেফাঁস বলে

ফেললেন। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল আমার।

কিন্তু অঘটনের তো শেষ হল না। ভেবেছিলাম, আপদ বিদায় হল— সৌরজগতে শান্তি ফিরে এল। কিন্তু না, না! দামাল শিশুর মতোই টলতে টলতে ডিমের মতো কক্ষপথে ছুটতে ছুটতে আবার এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল শুক্র। সেই কথাতেই এবার আসা যাক।

২৩
নেকড়ে নক্ষত্র

দীর্ঘ সাতশোটা বছর সময়পথের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল দেখতে দেখতে। এই সাতশো বছরে পৃথিবীর ভয়ার্ত মানুষগুলো ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল শিং-ওলা শুক্রগ্রহের দিকে। নিঃসীম উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে রইল ডিম্বাকার কক্ষপথে জ্বলন্ত শুক্রগ্রহের পানে। শূকরপুচ্ছ নিয়ে যতবার পৃথিবীর নিকটবর্তী হল শুক্র, ততবার বিষম আতঙ্কে যেন নির্জীব হয়ে রইল সারা পৃথিবীর মানুষ। প্রতি বাহান্ন বছর অন্তর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেখলাম প্রত্যেককে। বাহান্ন বছরের ব্যবধানেই তো টাইফন ধূমকেতু ফিরে এসেছিল। দু-দুবার পৃথিবীকে ল্যাজের ঝাপটায় মৃতপ্রায় করে দিয়ে গেছে যে উৎপাত, বাহান্ন বছর অন্তর অন্তর তার ফিরে আসার সম্ভাবনায় ভয়ে উদ্বেগে বিশ্বের মানুষ আধমরা হয়ে রইল এই সাতশো বছর ধরে। আকাশে আরও গ্রহ তো রয়েছে, কিন্তু ভোরের তারার মতো ধূম্রপুচ্ছ তো কারও নেই। ধ্বংসের দেবতারূপে তাই তাকে সমীহ করতে শিখল দেশ বিদেশের মানুষ। দেখলাম, আমেরিকার রেডইন্ডিয়ানদের লোককথায় বিশেষ স্থান নিল শুক্রগ্রহ। সাবধান! সাবধান! বাহান্ন বছর অন্তর আবার ওই তারা ধূমকেতুর পুচ্ছ নেড়ে ধেয়ে আসতে পারে পৃথিবীর দিকে। আবার আগুন জ্বলবে, আবার সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হবে, মহাপ্লাবন ঘটবে, পাথর সৃষ্টি হবে, আকাশ মাথায় ভেঙে পড়বে। একই কাহিনি ঘুরে ফিরে বিভিন্ন আকারে স্থান পেল বিশ্বের সমস্ত মানুষের লোককথায়। একই অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছে যে প্রত্যেকেরই, একই বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে প্রত্যেককেই। তাই একই ধাঁচের বিভীষিকা কাহিনি ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে ভূমণ্ডলের সর্বত্র। ভোরের তারাকে তুষ্ট করার জন্যে বিবিধ উপাসনাপদ্ধতিও প্রবর্তিত হতে দেখলাম এই সাতশো বছরে। অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল পনি ইন্ডিয়ানদের বীভৎস বলিদান প্রথা দেখে। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

মর্নিংস্টারকে তুষ্ট করার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার অভিলাষ নিয়ে টাইম মেশিন পাহাড়ের মাথায় নামিয়েছিলেন প্রফেসর। নীচের উপত্যকায় জড়ো হয়েছে কাতারে কাতারে পনি ইন্ডিয়ান। হাত-পা-মুখ নেড়ে সর্দার মর্নিংস্টারের ভজনা করল অনেকক্ষণ ধরে। মাথামুণ্ড কিছু বুঝলাম না। অত উঁচু থেকে শুনতেও পেলাম না। প্রফেসর কিন্তু আমাকে বললেন, 'ওরা যা বলছে, তা কিন্তু এক বৃদ্ধ ইন্ডিয়ানদের মুখে শুনে লিখে নেওয়া হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। ওরা বলছে, মর্নিংস্টার স্বর্গের অন্য সমস্ত দেবতার প্রভু। বলছে, মর্নিংস্টারের বিধান অনুযায়ী, জগৎ যেদিন ধ্বংস হবে, সেদিন চাঁদ লাল হয়ে যাবে। চাঁদ যেদিন লাল

হবে, সেদিন বুঝবে পৃথিবীরও শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। সেদিন কিন্তু কুমেরু আর সুমেরুর ওপর যে দুটি তারাকে মর্নিংস্টার পাহারায় রেখেছে পৃথিবীর ওপর নজর রাখার জন্যে, তারা জায়গা বদলা বদলি করবে! সাবধান! সাবধান ভোরের তারাকে সাবধান! জগৎ ধ্বংস করবে ওই ভোরের তারা বাহান্ন বছরের ব্যবধানে যে কোনও দিন। তাই এসো তাকে ঠান্ডা করি বলি দিয়ে।'

কিন্তু বলি মানে যে মানুষ বলি, তা তো ভাবিনি। দৃশ্যটাও যে এমন বীভৎস হবে, কল্পনাও করতে পারিনি। মর্নিংস্টার যা যা করে গিয়েছে অতীতে, সেই সবেরই নাটক উপস্থাপিত হল যেন বলিদান অনুষ্ঠানে। ভোরের তারা তখন খুব বেশি জ্বলজ্বল করছে আকাশে, পুচ্ছদেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডিমের মতন পথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর খুব কাছে আসতেই বলিদানের হিড়িক উঠেছে। একটি মেয়েকে ঠেলে দেওয়া হল একজন পনি ইন্ডিয়ানের দিকে। নেকড়ের মতো গর্জাতে লাগল লোকটা— যেন ছিঁড়ে খাবে মেয়েটাকে। তারপর তাকে লাল রঙ মাখিয়ে কালো পোশাক পরানো হল। লোকটাও মুখে মাথায় লাল রং মেখে নিলে। বারোটা ঈগলের পালক লাগানো শিরস্ত্রাণ পরল মাথায়। মর্নিংস্টারকে নাকি এই বেশেই দেখা যায়।

চারটে খুঁটি পোঁতা ছিল একটা মঞ্চের চারপাশে। মেয়েটাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হল মঞ্চের ওপর। প্রধান পুরোহিত তার লাল রং-মাখানো দেহের ডানদিকে কালো রং মাখিয়ে দিলে— বাঁ দিক লালই রইল। ছড়ানো পাখার মতো বারোটা ঈগলপাখির পালক লাগানো শিরস্ত্রাণ পরিয়ে দেওয়া হল মাথায়।

এরপরেই শিউরে উঠলাম আমি। লাফ দিয়ে এগিয়ে এল একজন কৃপাণধারী। এককোপে উন্মুক্ত করল মেয়েটির বক্ষদেশ। প্রধান পুরোহিত হাত গলিয়ে দিয়ে তাজা রুধির আঁজলা করে এনে মাখাল নিজের মুখে, মাথায়, গায়ে। চারদিক থেকে তির ছুড়তে লাগল ইন্ডিয়ানরা মেয়েটার বিগতপ্রাণ দেহ লক্ষ্য করে। এমনকী বাচ্চাদের হাতেও ধনুক ধরিয়ে দিয়ে মায়েরা তিরনিক্ষেপ করতে ছাড়ল না।

আর সহ্য হল না। প্রফেসর নিজেও কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। পলকের মধ্যে টাইম মেশিন স্পেসরকেটের মতো ধেয়ে গেল পৃথিবীর অন্য প্রান্তে।

সংঘর্ষটা লাগল তারপরেই!

কী করে বর্ণনা দিই সেই দৃশ্যের ভেবে পাচ্ছি না। আমার ভাষায় কুলোবে না। মহাকবিরা রূপকের মাধ্যমে জ্যোতিষ্ক যুদ্ধের সেই অবিশ্বাস্য কাহিনি বর্ণনা করেছেন তাঁদের মহাকাব্যে। হোমার আর কালিদাসের রচনার সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের তা অজানা নয়। জ্যোতির্বিদ্যার সুপ্রাচীন গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্তে'ও একটি অধ্যায় আছে— যা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অধ্যায়টার নাম 'গ্রহ মিলন সম্পর্কে'। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা খবর রাখে কেবল এক ধরনেরই গ্রহসান্নিধ্যের— সূর্য যখন দুটো গ্রহের মধ্যে এসে পড়ে— সেই অবস্থায়। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদরা কিন্তু গ্রহসান্নিধ্যকে অনেকগুলো শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন। যেমন, সম্যোগ, সমাগম, যোগ, মিলক, যুতি এবং যুদ্ধ। যুদ্ধসান্নিধ্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, গ্রহে

গ্রহে যখন লড়াই লাগে। একালের জ্যোতির্বিদরা কিন্তু সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যায় কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পাননি। গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ তো তাঁরা দেখেননি।

কিন্তু আমরা দেখলাম এবং হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিন্দুমাত্র নেই— মনগড়া কথা একটাও নেই। জ্যোতিষ্ক যুদ্ধ সত্যিই ঘটেছিল পৃথিবীর আকাশে— একবার নয়, বার বার।

আরও একটা হেঁয়ালির অবসান ঘটল সেই সঙ্গে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের অন্তরে কোনওদিনই আতঙ্ক জাগ্রত করতে পারেনি মঙ্গলগ্রহ। নিশ্চয় আতঙ্কজনক ছিল না বলেই পারেনি। কিন্তু আজ থেকে ২৬০০ কি ২৭০০ বছর আগে কী এমন ঘটেছিল যে তারপর থেকে লাল গ্রহ মঙ্গল তাদের কাছে আতঙ্ক গ্রহে পরিণত হল? সুদূর পথের পথিক মঙ্গল কি তা হলে আপন কক্ষপথ ছেড়ে হানা দিয়েছিল পৃথিবীর আকাশে? কিন্তু কেন? কীসের তাড়নায় অভ্যস্ত পথ পরিক্রমা স্থগিত রেখে অজানার অভিযানে রওনা হয়েছিল মঙ্গল?

জবাবটা অতিশয় সোজা, কিন্তু দুঃখের বিষয় কারও মাথায় আসেনি। ডিমের মতো কক্ষপথে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে মঙ্গলের পথ মাড়িয়ে ফেলেছিল দামাল শুক্র।

পরিণাম: সংঘর্ষ!

চোখধাঁধানো দ্যুতিটাই প্রথমে চোখে পড়েছিল। সমস্ত সৌরজগৎ অবর্ণনীয় আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল পলকের জন্যে। তার পর লম্বা লম্বা লাফ মেরে সময়পথে এগিয়ে গেল টাইম মেশিন। মঙ্গলও রক্তরাঙা দ্যুতি নিয়ে যেন লাফ মেরে মেরে এগিয়ে এল পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীজোড়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ডের পুনর্ঘটন দেখলাম। ভূমিকম্প। অগ্ন্যুৎপাত। সমুদ্রোচ্ছ্বাস। হারিকেন। উল্কাবৃষ্টি। বজ্রপাত। একটা বজ্র এসে পড়ল তাসকানির সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর বোলসেনার ওপর। পুরো শহরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সহসা ধ্বংস হল বিশাল ইট্রাসকান সভ্যতা। উদ্বাস্তুরা ইটালি গিয়ে পত্তন করল রোম সাম্রাজ্যের। কালিদাস কি সাধে লিখেছিলেন গ্রহদেব শিবের ঔরসে অগ্নির গর্ভে জন্ম নিয়ে কুমার লড়ে গিয়েছিল দৈত্যের সঙ্গে— যে দৈত্য অনেক কষ্ট দিয়েছে পৃথিবীকে! মঙ্গলই সেই কুমার— যাকে বেমক্কা ধাক্কা মেরে নিজেই টিট হয়ে গেল শুক্র গ্রহ। ডিমের মতো কক্ষপথ পরিত্যাগ করে সুবোধ বালকের মতো বেছে নিল গোলাকার কক্ষপথ।

কিন্তু রুদ্ররূপী মঙ্গল অত সহজে নিস্তার দিল না শুক্রকে। নিস্তার দিল না পৃথিবীকেও। বারংবার সংঘটন ঘটাল শুক্রের সঙ্গে। ছিনিয়ে নিয়ে গেল পৃথিবীর চাঁদকে! শূন্যপথে যেন গেণ্ডুয়া খেলা আরম্ভ হয়ে গেল বেচারি চন্দ্র দেবতাকে নিয়ে। মুহুর্মুহু বজ্রপাতে বিদীর্ণ হল তার পৃষ্ঠদেশ— মুহুর্মুহু উল্কাপাতে চৌচির হয়ে গেল তার সাধের দেহখানা। চাঁদের জ্বালামুখ নিয়ে গবেষণা করেও একালের বৈজ্ঞানিকেরা অকাট্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। কেউ বলেন, নিভন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ওগুলো। কেউ বলেন, বিরাট বিরাট উল্কাপাতের পরিণাম। ছোট-বড় জ্বালামুখের সংখ্যা সেখানে ত্রিশ হাজারেরও বেশি। কোনওটা বিশ হাজার ফুট উঁচুতে। কোনওটার ব্যাস দেড়শো মাইল। অথচ পৃথিবীর

সবচাইতে বড় জ্বালামুখের সন্ধান পাওয়া গেছে অ্যারিজোনায়— যার ব্যাস মোটে এক মাইলের চার-পঞ্চমাংশ। প্রায় দশ মাইল চওড়া রশ্মিরেখার মতো ফাটল বিস্তৃত চাঁদের জ্বালামুখের চারধারে— পৃথিবীর কোনও জ্বালামুখেই যা দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকরা তাই হতভম্ব হয়েছিলেন এতকাল।

কিন্তু আমি দেখলাম কীভাবে চাঁদকে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ল লড়াকু মঙ্গল। হোমার কি সাধে 'ইলিয়াড' কাব্যগ্রন্থে চাঁদের সঙ্গে মঙ্গলের ক্রীড়ার অমন চিত্তাকর্ষক রূপক বর্ণনা লিখেছেন? শুধু মঙ্গলই নয়, স্মরণাতীতকাল থেকে আরও কত খবর রচিত হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠে— কে তার হিসেব রেখেছে? তাই তো চাঁদের অমন চেহারা!

সেই তুলনায় মঙ্গলের চেহারা কেন যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল ব্যাবিলনের আর ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের, তা সমস্ত অণু-পরমাণু দিয়ে উপলব্ধি করলাম। কী ভয়ংকর মূর্তি! ব্যাবিলনে মঙ্গলকে শেয়াল নামে ডাকা হত কেন, মিশরে তাকে নেকড়ে বলা হত কেন, তা সভয়ে লক্ষ করলাম সেদিন।

ধাক্কা তো মেরেছে শুক্র, পৃথিবীকে অত ভয় দেখানোর কী দরকারটা পড়ল বুঝলাম না। কখনও সিংহ, কখনও শিয়াল, কখনও নেকড়ে, কখনও মাছ, কখনও শূকর, কখনও ড্রাগনের মূর্তি ধরে গোটা পৃথিবীবাসীদের হৃৎকম্প উপস্থিত করল একা মঙ্গল। শুক্রের শূকরপুচ্ছ থেকে ক্ষুদে ধূমকেতুদের খসিয়ে এনে টেনে আনল পেছন পেছন— যেন দেবরাজের পেছন পেছন মার মার করে তেড়ে আসছে অগুনতি সৈন্য। আর্যরা যুদ্ধদেবতা ইন্দ্রকে কল্পনা করেছিল কী থেকে, সেদিন তা বুঝলাম ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে। বুঝলাম কেন দেবরাজকে মারুৎ বলা হয়েছে বৈদিক স্তোত্রে, আর কেনই-বা ভারতীয় মারুৎ থেকে এসেছে মঙ্গল গ্রহের পাশ্চাত্য নাম— মার্স। দেখলাম, দেবরাজ সদলবলে বিশাল বিশাল প্রস্তর বৃষ্টি করে চলেছে পৃথিবীতে। সেই শিলাখণ্ডদের দেবতারূপে পূজা করছে দেশে দেশে। বুঝলাম, বরাহমিহিরের বর্ণনা মিথ্যে নয়। আমার চোখের সামনেই যেন একটা কালো পাহাড় খসে পড়ল মক্কার কাবায়। পাথরটা লাল— কিন্তু ধুলো, ধোঁয়ায় কালচে মেরে রয়েছে। মুসলমান ধর্মের চেয়েও প্রাচীন এই কাবা-র কালো পাথরের রহস্য কিন্তু কেউ জানল না... পরবর্তীকালে দেখলাম দেবতা জ্ঞানে পূজিত হচ্ছে বিশাল কৃষ্ণশিলা, দেখলাম মহম্মদ স্বয়ং তাঁর জীবনের প্রথমভাগে বন্দনা করছেন শুক্রকে। আজও কিন্তু মুসলমান কিংবদন্তি অনুসারে সবার বিশ্বাস, এ পাথর এসেছে শুক্র থেকে। আমি তা দেখেছি! বিশ্বাস করো আমার ছোট্ট বন্ধুরা— কাবা-রহস্য আর কোনও রহস্য নয় আমার কাছে।

মঙ্গল, শুক্র, পৃথিবীর লড়াই চলল দীর্ঘকাল ধরে। টানা-হ্যাঁচড়ায় বাফিন আইল্যান্ড থেকে মেরু সরে এল বর্তমান অবস্থানে। সাইবেরিয়া মহাদেশ চালান হয়ে গেল মেরুপ্রদেশে। সেইসঙ্গে পালে পালে ম্যামথ মারা গেল অকস্মাৎ অক্সিজেনহীনতা আর প্রলয়ংকর বজ্রপাতে— জমে শক্ত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শুধু ম্যামথ নয়, আরও অনেক প্রাণীরও হাল হল একই রকম— আজও তাদের তুহিন-কঠিন অবিকৃত দেহ আবিষ্কৃত হচ্ছে মেরুপ্রদেশে— যে অঞ্চলে চোখের সামনেই স্থানান্তরিত হতে দেখলাম আটশো গৃহসহ

বিশাল একটা শহরকে— আলাস্কার পয়েন্ট হোপ প্রহেলিকার সৃষ্টি কিন্তু সেদিন থেকে— প্রহেলিকার সমাধান ঘটল আমার বিহ্বল চক্ষুর সামনেই।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখড়ের প্রাণ তো যাবেই। পৃথিবীবাসীদের দুর্দশার জন্যে কেঁদে আর লাভ নেই। কিন্তু রাজারাও লুঠপাট থেকে বাদ যায় না। লুঠপাটের জন্যেই তো যুদ্ধ, যুদ্ধের জন্যেই তো লুঠপাট। তাই পৃথিবী ছিনিয়ে নিল শুক্রের কার্বন মেঘ, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের কিছুটা। মঙ্গলই বা কম যায় কেন, শুক্রের ল্যাজ থেকে কার্বন কেড়ে নিয়ে বানিয়ে নিলে নিজের মেরুকিরীট। শুক্র বেচারি পুচ্ছহীন হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালটে নিল গতিপথ— গোল হয়ে ঘুরতে লাগল সূর্যের চারদিকে। যুদ্ধে জিতে গেল মঙ্গল। তাই দেশে দেশে যুদ্ধদেবতা মঙ্গলের তরবারি কল্পনার এত বন্দনা।

মুহ্যমানের মতো এই দৃশ্য দেখতে দেখতে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যে টাইম মেশিনকে হু হু করে বর্তমান পেরিয়ে আরও ভবিষ্যতের গর্ভে নিয়ে যাচ্ছেন টের পাইনি, টের যখন পেলাম, তখন সৌরপরিবারের শেষের সেদিন শুরু হয়ে গেছে, দেখলাম, নেপচুনের উপগ্রহ হতে হতে বেঁচে গেল প্লুটো। তারপরেই প্লুটোর সঙ্গে সংঘর্ষ লাগল— না, নেপচুনের নয়— নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনের সঙ্গে— আয়তনে যে প্লুটোর এক তৃতীয়াংশ। ঝাঁকে ঝাঁকে ধূমকেতু ছুটে গেল দিকে দিকে। এসে পড়ল বৃহস্পতি উপগ্রহদের ওপর— ষষ্ঠ আর সপ্তম উপগ্রহ এমনিতেই উলটোপালটা কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছিল— ধূমকেতুদের ধাক্কায় তারা ছিটকে গেল সৌরজগতের ভেতর দিকে— একটা এসে সটান আছড়ে পড়ল পৃথিবীর ওপর...

আর তার পরেই... কতকাল পরে সে খেয়াল নেই... বিস্ফোরিত হল স্বয়ং সূর্যদেব।

এইচ জি ওয়েলস তাঁর 'টাইম মেশিন' উপন্যাসের অন্তে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সূর্যের নিভে যাওয়া— শেষের সেদিন নাকি সেই দিনটাই। কিন্তু তা ভুল— এক্কেবারে ভুল!

সূর্য সুপারনোভা হয়ে গেল। নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটল। মৃত্যু ঘটল সমস্ত সৌরপরিবারের।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম আমি।

চোখ মেললাম।

সেই পরিচিত ল্যাবরেটরি। পুরনো আকাশ। চেনা পৃথিবী। আর টাইম মেশিন। উজ্জ্বল। অটুট। স্তব্ধ।

ইলেকট্রিক কেটলিতে চায়ের জল ঢালছিলেন প্রফেসর। ঘাড় ফেরালেন আমার দিকে।

'দেখলে?'

'দেখলাম। কিন্তু বুঝলাম না।'

'এখনও বুঝতে বাকি?'

'হ্যাঁ, এখনও বুঝতে বাকি।'

'কী বুঝতে বাকি জানতে পারি?'

'এখনও যা বলেননি। কী জিজ্ঞেস করেছেন, বলেননি। আমি জিজ্ঞেস করেছি, বলেননি।'

'কী বলো তা?'

'ভাইরাস-হুজুরকে তার ডেরায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তার ডেরার ঠিকানাটা কিন্তু পেট থেকে বার করেননি।'

'তা করিনি। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব বলেই করিনি।'

'দেখিয়েছেন?'

'আলবৎ দেখিয়েছি।'

'আমি দেখিনি।'

'চোখ থাকতে অন্ধ বলেই দেখোনি।'

'আঃ! প্রফেসর, প্লিজ, আর মুখনাড়া দেবেন না।'

'দেবো না মানে? একশোবার দেবো, হাজার বার দেবো। অন্ধ কোথাকার! ড্যাবডেবে চোখদুটো দিয়ে দেখলে না শুক্রের ল্যাজ থেকে জীবাণু ছড়িয়ে গেল পৃথিবীময়!'

'শুক্রের ল্যাজ থেকে জীবাণু! কই দেখিনি তো!'

আমার মুখের অবস্থা দেখেও সদয় হলেন না প্রফেসর। ঝাঁ ঝাঁ করতে করতে বললেন, 'দেখবে কী করে? জীবাণু কি দেখা যায় যে দেখবে? কিন্তু পেটে একটু বিদ্যে থাকলে ব্যাপারটার জন্যে চোখ খোলা রাখতে পারতে। ল্যাজের ঝাপটায় পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল কি শুধু ধোঁয়া ধুলো মেঘ পাথরের জন্যে? সেইসঙ্গে মাছি কীটপতঙ্গের উৎপাতটা বেড়ে গেল কীভাবে, সেটা দেখলে না? ঝাঁকে ঝাঁকে হঠাৎ তারা এল কোত্থেকে!'

আমি খাবি খেলাম বারকয়েক। স্বরযন্ত্র বিকল হল বিমূঢ় বিস্ময়ে। বলেন কী প্রফেসর! মাছি কীটপতঙ্গ ধূমকেতুর পুচ্ছ থেকে!

বাকবৈদগ্ধ্য তখন পুরোদমে চলছে, 'আধুনিক জীবতত্ত্ববিদরা মশগুল হয়ে আছেন একটা ধারণা নিয়ে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবেরা নাকি আবির্ভূত হয়েছিল পৃথিবীর বাইরে থেকে— আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্য থেকে। আলোর চাপে তারা এসে পড়েছে পৃথিবীতে। নক্ষত্রলোক থেকে সজীব প্রাণীর আগমন-সম্পর্কিত ধারণা তাই নতুন কিছু নয়— তা সত্ত্বেও তুমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলে। আশ্চর্য! শূককীটের সংক্রমণে পৃথিবী আক্রান্ত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে— এই ধারণা নিয়ে অনেকে অনেক অনেক অনুমান করেছে। এমনকী তোমার মতো কল্পবিজ্ঞান লেখকরা অনেক উদ্ভট কাহিনিও ফেঁদে বসেছে। কিন্তু এটা তো ঠিক যে অক্সিজেনহীন পরিবেশে প্রচণ্ড উত্তাপ আর ঠান্ডার মধ্যে ছোট ছোট কীটপতঙ্গের আর শূককীটের টিকে থাকার ক্ষমতা দেখে এহেন অনুমিতির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নয়? আগমন তাদের শুক্র থেকে, এটাই বা অসম্ভব হবে কেন? শুক্রের জন্ম তো বৃহস্পতির গা থেকে— তা হলে সেখানেই বা ক্ষতিকারক পোকামাকড় থাকবে না কেন?'

নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

'ভোরের শুকতারা সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে শয়তানের নানা নামের

সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে দেশ-বিদেশের লোককথায়। বাইবেলের ত্রিকালজ্ঞরা যে দেবতাকে দুচক্ষে দেখতে পারেনি, তার নাম দিয়েছে ‘বাল্’। ক্যানাইটস-এর সেই দুষ্ট দেবতা বাল্-এর আর এক নাম বীলজিবাব বা বালজিভাভ। ‘বাল্’ মানে কী জানো?’

‘না।’

‘মাছি।’

‘অ।’

‘ফিলিসটানদের দেশ ইক্রনে মাছের দেবতা বালজিভাভের একটা মন্দির আছে। ইরানের ‘বুন্দাহিস’ গ্রন্থে আছে দুষ্ট উপদেবতা আহরিমান নাকি গা-ঘিনঘিনে প্রাণীদের ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল পৃথিবীতে। বাইবেলে লেখা আছে মাছি, উকুন, মশা, ডগফ্লাই, পঙ্গপাল, ব্যাঙেরা ছারখার করে দিয়েছিল মিশর। অতবার প্লেগ শুরু হয়েছিল তো ওই কারণেই। আরব দেশের অ্যামালিকাইটরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল অত্যন্ত ছোট্ট পিঁপড়েদের আক্রমণে। পৃথিবী যখন অন্ধকার হয়ে গেছিল, মেঘ যখন ঝুলে পড়েছিল, অগুনতি জঘন্য কদর্য পোকামাকড়ে পৃথিবী তখন ছেয়ে গেছিল। ড্রাগনফ্লাই আর সাপের উৎপাতও বেড়েছিল।’

‘আমতা আমতা করে বললাম, ‘পৃথিবীর তাপ বাড়লে পোকামাকড়দের উৎপাত তো বাড়বেই।’

‘ইডিয়ট। মরুভূমিতে যখন ইলেকট্রিক ঝড় ‘খামাসিন’ শুরু হয়, তখন আশেপাশের গ্রামগুলোতে জঘন্য পোকামাকড়ের সংখ্যা বেড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু ভূগোলকের সব দেশের মানুষ শুক্র গ্রহের সঙ্গে মাছির সম্পর্ক আবিষ্কার করেছে কেন বলো? কেন বুন্দাহিসে আঁধারদেবতা আহরিমানকে মাছির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? কেন মধ্য ব্রেজিলের বোরোরো মানুষেরা শুক্রগ্রহকে বালুকা মাছি বলে? কেন মধ্য আফ্রিকার বান্টু উপজাতিরা বলে আকাশ থেকে আগুন নিয়ে এসেছিল বালুকা মাছি? কেন মেক্সিকোর মানুষরা বিশ্বাস করত ধূমকেতু সংক্রমণ ছড়িয়ে দিয়ে যায় জীবদেহে—। সেই ভয়ে চিমনি ঢাকা দিয়ে রাখত পাছে নক্ষত্রলোকের আগন্তুকদের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে উৎপাত না ঢুকে পড়ে? পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই শুক্রগ্রহের সঙ্গে মাছির এই তুলনা দেখে কি মনে হয় না, মাছিদের জন্ম শুধু পৃথিবীর উত্তাপেই নয় অন্যান্য পোকামাকড়ের মতো— অন্য গ্রহের আগন্তুক তারা? এবং সেই গ্রহ ওই শুক্রগ্রহ?’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ আমতা আমতা করে বললাম, ‘কিন্তু ভাইরাস-হুজুর তো আর মাছি নয়।’

‘কিন্তু লার্ভা। শূককীট। জীবাণু। ভাইরাস। যা খুশি তাই বলতে পারো। বহু বছর সে ভেসে ভেসে বেরিয়েছে মহাশূন্যে। তাপ আর শৈত্যে টিকে গেছে। কী আছে বৃহস্পতিতে? কেউ তা সঠিক জানে না— কিন্তু প্রাণ যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। নইলে পেট্রোলিয়াম থাকবে কেন? সেখানকার পেট্রোলিয়াম যদি জৈব বস্তুর দেহাবশেষ থেকে উৎপন্ন হয়— ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকামাকড় কল্পনা করা কি অন্যায়? অন্য নক্ষত্রলোক থেকেও এসে থাকতে পারে ভাইরাস-হুজুর, কিন্তু আমি প্রথম থেকেই আঁচ করেছিলাম এই সৌরজগতেই তার আদি নিবাস— টাইফনের ল্যাজের সঙ্গে ছিটকে গিয়ে ভেসে ভেসে বেরিয়েছে মহাশূন্যে।

তাই তাকে জ্যান্ত নিয়ে গিয়ে তার শোচনীয় দশাটা দেখাতে চেয়েছিলাম বৃহস্পতি আর শুক্রে তার সাঙ্গপাঙ্গদের। তাই তোমাকে দেখালাম বিশ্ববিপর্যয়, জ্যোতিষ্ক যুদ্ধ, শুক্রের জন্ম, সূর্যের বিস্ফোরণ। এখন বাকি রইল আর একটা কাজ। না, না, দুটো কাজ।'

'কী?' জিজ্ঞেস করলাম সন্দিগ্ধ কণ্ঠে।

'বৃহস্পতি বেড়িয়ে আসতে হবে। আর—'

'আর?'

'রক্তরাঙা গ্রহ মঙ্গল থেকেও উৎপাতেরা পৃথিবীতে হানা দিয়েছিল কিনা দেখে আসতে হবে— অনেকদিক দিয়ে পৃথিবীর মতোই ছিল মঙ্গল এককালে— শুক্রর ধাক্কা খেয়ে হয়তো এখন মরা গ্রহ। তাই—'

'না!'

ইলেকট্রিক কেটলির ফুটন্ত জলের বাষ্পের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে রইলেন প্রফেসর।
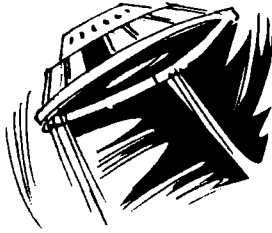
অলৌকিক ইন্টারনেট

প্রফেসর বললেন, 'দীননাথ, তুমি তো এনতার গাঁজা গল্প লিখে সেসবের একটা গালভরা নামও দিয়েছ— কল্পবিজ্ঞান, ইংরেজিতে সাই-ফি। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।'

হঠাৎ প্রফেসর আমাকে খোঁচাতে শুরু করলেন কেন বুঝলাম না। কিন্তু হুঁশিয়ার হয়ে গেলাম।

বললাম, 'সাই-ফি সংক্ষেপে, বিস্তারিতভাবে সায়েন্স ফিকশন।'

প্রফেসর একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, 'সোনার পাথরবাটি। জল মিশানো বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে না।'

'জল তো মিশানো হয় না। আগামী বিজ্ঞানের আভাস থাকে। তাই বিজ্ঞান নির্ভর কল্পনা— কল্পবিজ্ঞান।'

কথা হচ্ছিল প্রফেসরের পাতাল ল্যাবরেটরিতে বসে। এঘরে তিনি আমাকে ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেন না। অনেক অদ্ভুত আশ্চর্য যন্ত্রপাতির ডিপো এই পাতাল ল্যাবরেটরি। উদ্ভট যন্ত্রপাতিগুলো আমার চেনা হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন উনি যে যন্ত্রটার সামনে বসেছিলেন, সেটা আগে কখনও দেখিনি। দেখতে কম্পিউটারের মতো। কিন্তু অনেক বড় কম্পিউটার এমন ঢাউস হয় না। তার সামনে একটা মস্ত বাক্স। বাক্সর খোলা দিকটা কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে।

প্রফেসর মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, 'গোবরগণেশ দীননাথ, তোমার কল্পবিজ্ঞান কিন্তু ইন্টারনেট নিয়ে চৌকস গল্প লেখবার আগেই ইন্টারনেট এসে গেল সাঁ সাঁ করে দখল করে নিল তামাম দুনিয়ার যোগাযোগব্যবস্থা।'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'তা বটে। বিজ্ঞান এখানে একটা মস্ত লাফ মেরে এগিয়ে গেছে, কল্পবিজ্ঞানকে কোনও চান্স না দিয়ে। তবে কী জানেন, আইডিয়াটা নিশ্চয় কল্পবিজ্ঞানের কোনও একটা গল্প থেকেই ঘুরে ফিরে গিয়ে আবিষ্কর্তার মাথার মধ্যে সেঁধিয়ে গেছিল। আফটার অল, কল্পনা আগে, বিজ্ঞান পরে।'

প্রফেসর এবার আর হাসলেন না। বিদঘুটে যন্ত্রটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

আমি বলেছিলাম, এটা কী বানাচ্ছেন?

উনি বললেন, 'বানানো হয়ে গেছে।'

‘কীসের যন্ত্র?’

‘ইন্টারনেট থেকে একধাপ এগিয়ে— সূক্ষ্মলোকনেট।’

‘তার মানে? সূক্ষ্মলোক মানে?’

‘যে জগতটাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আছে। বর্ণালির বাইরের রং যেমন চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আছে। রক্তমাংসের চোখ সব দেখতে পায় না। কিন্তু তা আছে।’

‘সেটা তো অপবিজ্ঞান।’

‘সেটাই বৃহত্তর বিজ্ঞান, দীননাথ। বিজ্ঞানীরা এখন তো বুঝেছেন, ছায়াপথ একটা নয়— অনেক। ঠিক তেমনি, স্থূল জগত থেকে যারা প্রস্থান করে, সূক্ষ্মদেহ নিয়ে তারা সূক্ষ্মলোকেই থাকে। আমাদের আশেপাশেই থাকে। অন্য মাত্রার, অন্য ছায়াপথ জগতে। অন্য গ্রহে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে। তুমি তাদের দেখতে চাও?’

‘ভূতপ্রেতদের?’

‘তারা অশরীরী বটে, কিন্তু ঘেন্না করার মতো নয়, ভয় পাওয়ার মতোও নয়। এমন গ্রহ-নক্ষত্র আছে, যাদের প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু সেসব আছে। ইন্টারনেটের আগামী সংস্করণ... আমার বানানো এই মডেল মেশিন... অদৃশ্য সেই গ্রহ-নক্ষত্র ছায়াপথ সেখানকার বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারে।’

‘আপনার ওই খাঁচা বাক্সের মধ্যে?’

‘হ্যাঁ, বলেই ঘটাং করে কল টিপে দিলেন প্রফেসর।

অমনি, অদ্ভুত কম্পিউটারের পর্দা থেকে তীব্র রোশনাই ধেয়ে এসে আছড়ে পড়ল সামনের বাক্সটার মধ্যে। সেই আলো একটু একটু করে জমাট বেঁধে গড়ে তুলল একটা ‘টিরানোসর রেক্স’ ডাইনোসরকে। হিংস্র চোখে আমাদের দিকে তাকাতেই হঠাৎ যেন প্রলয় ঘনিয়ে এল তার ওপর। আছড়ে পড়ল বড় বড় পাথর মাথার ওপর। আগুন আর ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সবকিছু।

‘দীননাথ। সাড়ে ছ’কোটি বছর আগে চিকজুলাব গ্রহাণু আছড়ে পড়েছিল বলেই একদা মৃত্যু হয়েছিল পৃথিবীর ডাইনোসরদের। সেই দৃশ্যই অতীত থেকে এল বর্তমানের এই সূক্ষ্মলোকনেটে— যা তোমাদের ইন্টারনেটের আগামী মডেল।’
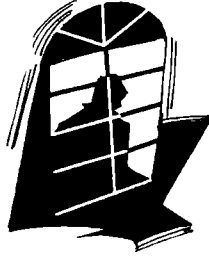
টাইম-ভিশন

'কী আপদ! কী আপদ!' বললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

আমিও সানাইয়ের পোঁ ধরলাম তৎক্ষণাৎ, 'এইটুকু দেখেই তিড়বিড়িয়ে উঠলেন আপনি? তা হলে ভাবুন, দুনিয়াময় টিভি দর্শকদের অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে।'

'শোচনীয়! শোচনীয়!'

'কিন্তু রমরমার রাশ টেনে ধরবে কে? কীভাবে? দেদার টাকা ঢালছে টিভি চ্যানেলের মহাজোটগুলো। চব্বিশ ঘণ্টা টিভি চালু... সবই মারকাটারি রক্তারক্তি আর ধিতাং ধিতাং প্রোগ্রাম। এ থেকে কি মুক্তি নেই?'

'আছে, দীননাথ, আছে, আমার টাইম-ভিশন বাজারে নামালেই মহাজোট মহাঘোঁট হয়ে যাবে। ইতিহাসের পাতার পর পাতা ছবি হয়ে ছুটবে ঘরে ঘরে।'

'টাইম-ভিশন?'

'ইয়েস, মাই বয়, টাইম-ভিশন। টাইম ট্র্যাভেল তো এখন আমার কবজায়। সময়গাড়ি নিয়ে সময় পর্যটন করে তা দেখিয়ে দিয়েছি।'

'সে তো গেছিলাম আপনি আর আমি।'

'এবার সেই অভিজ্ঞতা হোক ঘরে ঘরে তা হলেই—'

'টেলিভিশন লাটে উঠবে?'

'ইয়েস, মাই বয়, ইয়েস।'

প্রফেসর তখন দুনিয়া কাঁপিয়ে দিলেন তাঁর বিশ্ববিস্ময় টাইম-ভিশন দিয়ে। ওঁর যোগাযোগ তো কম নয়। মহা মহা টিভি চ্যানেলগুলো লাফিয়ে উঠেছিল তাঁর আইডিয়া আর আবিষ্কারের ক্ষমতা দেখে। ইতিহাসের পাতা উড়ে উড়ে চলে আসবে ঘরে ঘরে? চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাবে সত্যিকারের যুদ্ধ-টুদ্ধ আর নারকীয় কাণ্ডকারখানা?

বাদ সেধেছিলেন প্রফেসর, 'দেখো বাপু, ইতিহাস মানেই তো শুধু রক্তারক্তি নয়। এই ধরো না কেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সত্যিই বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছিলেন, না, রাশিয়ায় থাকবার সময়ে সাধু হয়েছিলেন, না, অন্য কিছু হয়েছিল— এইসব সত্য কাহিনি যদি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা হলেই তো মিথ্যে ইতিহাসের মুখোশ টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।'

'কিন্তু স্যার,' সবিনয়ে বলেছিলেন মহা মহা জোটের হর্তাকর্তারা, 'অনেক টাকা খাটাতে হচ্ছে তো, একটু মারপিট না দিলে পাবলিক খাবে না।'

অগত্যা নিমরাজি হয়েছিলেন প্রফেসর।

তারপরের ঘটনা-টটনা কারও অজানা নয়।

গোলমালটা হয়েছিল প্রথম দিকে। ধূর্ত আমেরিকানরা ইতিহাসের কপিরাইট পেটেন্ট করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রফেসর একবগ্গা থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। তারপরের হট্টগোল শুরু হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ থাকার ঘটনা দেখাতে গিয়ে। দেশে দেশে দাঙ্গা বেধে যায় আর কী? প্রফেসর দাবড়ানি দিতে এইসব সেন্টিমেন্টাল ইতিহাস আর টাইম-ভিশনে দেখানো হয়নি। কিন্তু পাবলিক খেয়েছিল প্রেসিডেন্ট কেনেডি আর প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গাঁধীর 'লাইভ' গুপ্তহত্যা দৃশ্য? সে এক লোম খাড়া-করা দৃশ্য? কিন্তু সত্যি তো বটে।

আর ঠিক এইটাই চাইছিল টাইম ভিশন কর্তারা। একটু রক্তারক্তি ধুমধাড়াক্কা না থাকলে পাবলিক খাবে কেন? টাইম ভিশন বাণিজ্য সফল হবে কী করে? টাকা যারা ঢালছে, তাদের এই যুক্তির কাছে প্রফেসর নিভে গেছিলেন।

তারপরেই দেখানো হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সত্যি দৃশ্য। ঘরে ঘরে রুদ্ধশ্বাসে বসে থেকে দর্শকরা দেখেছে কীভাবে অ্যাটম বোমা উড়িয়ে দিচ্ছে হিরোশিমা আর নাগাসাকি! কীভাবে বার্লিন বাঙ্কারে সুইসাইড করছেন হিটলার! গায়ে কাঁটা জাগানো সেই সব সত্যি দৃশ্য দেখে ঘরে ঘরে ঘুম উড়ে গেছিল দর্শকদের।

অভাবনীয় সাফল্য মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল টাইম-ভিশন কর্তাদের।

কিন্তু হোঁচট খেয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখাতে গিয়ে। যে রকম মারকাটারি ব্যাপার-স্যাপার লেখা আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়, সেরকম কাণ্ডকারখানা তো দেখা যাচ্ছে না! পাবলিক খাচ্ছে না!

তৎক্ষণাৎ ক্যামেরা সময়-পর্যটন চালিয়ে ফিরে এসেছিল উনিশ শতকে। স্ক্রিন থেকে মিলিয়ে গেছিল বিশ্বযুদ্ধ প্রথম আর দ্বিতীয়। ইন্সট্যান্ট হিসস্ট্রি পাবলিক যখন ভালই খাচ্ছে, তখন টাইম-ভিশন কর্পোরেশন দেখিয়েছিল ওয়াটার্লু যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়। ইতিহাসের গ্যাঁড়াকল ধরা পড়েছিল তখনই। কই, সে রকম লড়াই-টড়াই তো হয়নি? ঐতিহাসিকরা যত লড়াকু সৈন্যের কথা লিখে গেছেন, সে-রকম সৈন্যসংখ্যা তো নেই! সবই তা হলে গালভরা গপ্পো!

তৎক্ষণাৎ টাইম-ক্যামেরা সরে গেছিল রণস্থল থেকে। কেননা, সত্যি ঘটনার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যে অনেক দূর গড়াবে!

আর ঠিক এই সংকট মুহূর্তে এগিয়ে এসেছিল টাইম-ভিশন কোম্পানিদের জনাকয়েক চৌকস সহকারী প্রযোজক। তারা ম্যাড়মেড়ে লড়াই-টড়াইগুলোকে জমজমাট করে তোলার ব্যবস্থা করেছিল বিস্তর এক্সট্রা সোলজার আর বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে। ক্যামেরার টেকনিশিয়ানরা পারে না কী? কল্পবিজ্ঞানের মতোই কল্প-ইতিহাসের আবির্ভাব ঘটেছিল স্ক্রিনে... শুধু বলা হয়নি আসলের সঙ্গে ভেজাল মিশানো হয়েছে। ফলে, চমৎকৃত হয়েছিল

দুনিয়ার দর্শক। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে গেছিল টাইম-ভিশনের ডিম্যান্ড।

প্রফেসর কিন্তু গুম মেরে গেছিলেন এইসব ধুমধাড়াক্কা জালি কারবার দেখে। তিনি বিজ্ঞানতপস্বী। সত্যের সাধক। কিন্তু এসব হচ্ছেটা কী? ইতিহাসের রিমেক যে গর্হিত কর্ম!

কিন্তু টাইম-ভিশনের কর্তারা তো বুঝে গেছিল, পাবলিককে খাওয়াতে গেলে আরও ভেজাল চালানো দরকার। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর নতুন চিত্রনাট্য তৈরি করে গেল এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্ট। আসল ইতিহাসে দেখা গেছিল, মাত্র ছ'টা হাতি নিয়ে আল্পস পর্বতমালা পেরোচ্ছে হানিবাল-এর সৈন্যবাহিনী— দু'শো বাড়তি হাতি ঢুকিয়ে ভ্যাবাচাকা খাইয়ে দেওয়া হল রোমানদের। সিজারের ঘাতকরা ছিল দু'জন— তাদের করা হল আটজন।

তবে যিশুখ্রিস্টকে নিয়ে এগোতে দেননি স্বয়ং পোপ। সবাই যা জানে তাই থাক। সত্যি কী ঘটেছিল, তা যেন কেউ না দেখে, রং চড়ানো তো দূরের কথা।

কিন্তু মিশর থেকে ইজরায়েল সন্তানদের পলায়নদৃশ্য, লোহিত সাগর অতিক্রম, চক্রযান নিয়ে মিশরীয় সৈন্যদের তেড়ে আসা— এই সবে রঙচড়ানো হয়েছিল এমনই কায়দায় যে চোখ ছানাবড়া করে বসে থেকেছে টাইম ভিশনের দর্শকেরা।

এই তো চাই? আসলকে নকল করাই তো খাঁটি ব্যাবসা? পুলকিত প্রোডিউসাররা তখন নজর ফিরিয়েছিল এশিয়ার দিকে। শুরু করা হয়েছিল সিপাই বিদ্রোহের ইতিহাস দিয়ে— ইংরেজদের তুঙ্গে তুলে দিয়ে আরও পেছিয়ে প্রোডিউসাররা চলে গেল পলাশির যুদ্ধের ইতিহাসে। ইতিহাসকে বিকৃত করা হল সেখানেও। তারপরেই উল্লাসে উন্মত্ত টাইম-ভিশন কোম্পানির মহাজোট বসে গোপনে ঠিক করে নিল, এবার দেখানো হোক, কুরুক্ষেত্রের আসল যুদ্ধ... শ্রীকৃষ্ণ দেখতে কী রকম এবং সেই ভদ্রলোকের জারিজুরি কতখানি— মহাভারতের বর্ণনার সঙ্গে আদৌ মেলে কি না— তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যাক দুনিয়ার বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীদের। নিছক একটা পারিবারিক কলহ নিয়ে মহাকাব্য রচনা? ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা!

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে গোটা পৃথিবী যখন উন্মুখ...

ভূগোলকের সব ক'টা টাইম-ভিশন সহসা অন্ধকার হয়ে গিয়েই পরক্ষণে ঝলকিত হয়েছিল অপার্থিব এক রশ্মিধারায়।

একই সঙ্গে বিকল হয়ে গেছিল টাইম-ভিশন কোম্পানিগুলোর সমস্ত যন্ত্রপাতি।
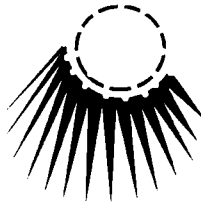
ভূত গ্রহ

গুলবাজ চাণক্য চাকলাদার প্রায় অষ্টপ্রহর চুরুট টেনে যায় বলে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ওকে একটা আজব টোব্যাকো পাইপ বানিয়ে দিয়েছিলেন। ভয়ানক শক্তি সেই পাইপে। শক্তিধর সেই পাইপ দিয়ে শক্তি ডাকাতকে কীরকম শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, এই গল্প সেই গল্প। আক্কেল গুড়ুম করে দেওয়ার মতন গল্প।

প্রফেসরের এক নম্বর চেলা আমি, দু-নম্বর বলা যায় চাণক্যকে। একদিন দুই বন্ধু বেড়াতে গেছিলাম একটা গ্রামে। নামেই গ্রাম। আসলে একটা ছোট্ট শহর। টিভি আর মোবাইল গ্রামবাংলার চেহারা পালটে দিচ্ছে। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আমরা দু'জনে দাঁড়িয়েছিলাম নিউটন চকোলেট দোকানের সামনে। দোকানটা বন্ধ ছিল। অবাক হয়েছিলাম। কেননা, এ সময়ে তো দোকান খোলাই থাকে। নিউটন চকোলেট কারখানার একটা ছোট্ট ডেলিভারি ভ্যান দাঁড়িয়েছিল সামনে।

আমরা দু'জনেই চকোলেট খেতে ভালবাসি। তাই দোকান বন্ধ থাকায় মেজাজটা খিঁচড়ে গেছিল। দু'জনেই দোকানের জানলার সামনে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েছিলাম। ব্যাপারটা কী, তা জানবার জন্যে।

দেখেছিলাম, কাউন্টারের ওদিকে দাঁড়িয়ে একটা মিষ্টি চেহারার মেয়ে হাত-মুখ নেড়ে কথা বলছে ডেলিভারি ভ্যানের ড্রাইভারের সঙ্গে।

ঠিক সেই সময়ে থানা থেকে পুলিশের জিপগাড়ি এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। লাফ দিয়ে নামলেন দারোগা মহীতোষ চৌধুরী। তিনি আবার গুলবাজ চাণক্যকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। তাই কটমট করে চেয়ে দেখে নিলেন চাণক্যকে। পরক্ষণে সাঁ করে ঢুকে গেলেন দোকানের মধ্যে— দরজা ঠেলে।

কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। ডাকাতি-ফাকাতি হয়েছে নাকি দোকানে? পুলিশের আগমন কি সেই কারণে?

জানলা দিয়ে ভেতরে চোখ চালিয়ে অবাক হলাম। থরে থরে সাজানো ট্রেগুলোতে চকোলেট ভরতি থাকত। এখন সব ট্রে ফাঁকা। মিষ্টি চেহারার মেয়েটাকে দেখলাম হাতমুখ নেড়ে কথা বলে যাচ্ছে থানার দারোগার সঙ্গে। হাত ঘোরাচ্ছে বনবন করে, যেন ইলেকট্রিক পাখার ব্লেড ঘুরছে।

আচমকা কানে ভেসে এসেছিল একটা ভয়ানক শব্দ। কী যেন ভেঙেচুরে দুমড়ে তেউড়ে গেল ঝনঝনাৎ আওয়াজ করে। সেইসঙ্গে শোনা গেল একটা কিছু দড়াম করে ফেটে যাওয়ার শব্দ। ছোটখাটো একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ।

আওয়াজের উৎস লক্ষ করে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখেছিলাম ভয়ানক সেই দৃশ্য।

পুলিশ জিপ তেউড়ে বেঁকে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। দানব হাত যেন ছাদটাকে হ্যাঁচকা টানে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বনেট আর বাম্পার গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায়।

তারস্বরে চিৎকার ছেড়েছিল থানার দারোগা, 'হচ্ছে কী এসব?'

করুণ কণ্ঠে বলেছিল জিপের ড্রাইভার, 'গেল, গেল, গোল্লায় গেল গাড়ি!'

দারোগা মহীতোষ চৌধুরী বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালেন তালঢ্যাঙা চাণক্যর দিকে। রক্তচক্ষু পাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় নতুন নষ্টামি শুরু করেছেন?'

চাণক্যর নিজের চোখই তখন ছানাবড়া। বললে মিনমিন করে, যা ওর স্বভাব নয়, 'আমি কী জানি!'

'জানেন না মানে? দাঁড়িয়ে ছিলেন তো এইখানেই! অনেকক্ষণ ধরে! নতুন কিছু বাঁদরামি মনে হচ্ছে!'

চাণক্য নির্বিকার মুখে গুল মারে ঠিকই, কিন্তু ওকে এরকম ঘাবড়ে যেতে কখনও দেখিনি। আমতা আমতা করে বললে, 'বু-বুঝতে তো পা-পারছি না!'

ঠিক এই সময়ে দারোগামশায়ের মন ঘুরে গেল অন্য দিকে, নইলে চাণক্যর অবস্থা তিনি কাহিল করে ছাড়তেন।

দোকানের ভেতরে আকাশফাটা আর্তনাদ শুরু করেছে মিষ্টি মেয়েটা।

কেননা, নতুন একটা আওয়াজ ভেসে আসছে দোকানের ভেতর থেকে।

অদ্ভুত আওয়াজ। যেন পুরোদমে চলছে হাজারখানা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। ঘোঁ ঘোঁ গোঁ গোঁ আওয়াজ ছেড়ে। মামুলি সাইজের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিশ্চয় নয়— অতিকায় সাইজের। আওয়াজটা তাই অমন বিকট বিচ্ছিরি। কানের পোকা বের করে দেওয়ার মতন।

দারোগা যথাকর্তব্য করলেন তৎক্ষণাৎ। তেড়েমেড়ে ঢুকে গেলেন দোকানের মধ্যে। পেছন পেছন চাণক্য আর আমি। হঠাৎ এমন অমানুষিক আওয়াজটা হচ্ছে কেন, সেটা দেখতে। যেখানে অদ্ভুত কিছু, সেখানেই আমি, সেখানেই চাণক্য। কে না জানে। অদ্ভুত পোকা কিলবিল করছে যে দুজনেরই মগজের মধ্যে।

অদ্ভুত কাণ্ডই ঘটে গেছে বটে দোকানের মধ্যে। চক্ষু ছানাবড়া করে দেওয়ার মতন ঘটনা। একটু আগে দেখেছিলাম, চকোলেট রাখার ট্রেগুলো সব ফাঁকা। যেগুলো ছিল কাউন্টারে। এখন দেখলাম, তাকগুলোও চকোলেট শূন্য। কোত্থাও একটাও চকোলেট পড়ে নেই?

তাজ্জব ব্যাপার তো! এই ছিল এত চকোলেট, এখন নেই একটাও! সব ভ্যানিশ!

ভ্যানিশ হয়েছে নিশ্চয় খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে। চোখের সামনে দিয়েই। কিন্তু এত চটপট হয়েছে যে বোঝাই যায়নি। শুধু বোঝা গেছিল যেন এক প্রলয়ংকর ঝড় আচমকা হানা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল সমস্ত চকোলেট।

শুধু চকোলেট। আর কিছু না।

এ কীরকম ঝড়? চকোলেটপ্রিয় ঝড়ের কথা কে কবে শুনেছে?

তাই একইসঙ্গে বিপুল কৌতূহলে ফেটে পড়েছিলাম আমি আর চাণক্য দুজনেই। কিন্তু পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা হয় বলে দারোগামশায়ের সামনে সেই কৌতূহল দেখাইনি। সরে এসেছিলাম দোকানের কাছ থেকে চাণক্য আর আমি। এসে দাঁড়িয়েছিলাম ডেলিভারি ভ্যানের সামনে। যা একটা জিপ।

এ জিপ সেই আধুনিক জিপ, বিশেষ কোম্পানির জিপ, যে জিপে ছাদ থাকে, দরজা থাকে। জিপ কোম্পানির নামটা বলতে চাই না, পাবলিসিটি হয়ে যাবে।

তবে হ্যাঁ, ওই কোম্পানির জিপ গাড়িগুলো খুবই মজবুত হয়। খারাপ রাস্তায় বিগড়ে যায় না। ঠিক যেন যুদ্ধের ট্যাংক। সাঁজোয়া গাড়ি।

কিন্তু এহেন বিখ্যাত গাড়িটার একী দশা হয়েছে! গাড়ির ড্রাইভার পাশে দাঁড়িয়ে পুতুলের মতন, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে গাড়িটার দিকে— বলা যায়, গাড়িটার কঙ্কালের দিকে।

গাড়ির দরজা যেন টেনে-ছিঁড়ে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ভেতরটা। সেখানেও নেই কিচ্ছু। সব ফাঁকা। দোকানের ভেতরে যেমন কিচ্ছু নেই, জিপ-ভ্যানের ভেতরেও কিচ্ছু নেই। বাক্স বাক্স চকোলেট সব উধাও!

পাছে পুলিশের জেরায় পড়তে হয়, তাই চাণক্যকে হ্যাঁচকা টানে টেনে নিয়ে লম্বা দিলাম তল্লাট ছেড়ে। আমি যে জানি, পুলিশ নিরীহদের পাকড়ায়, নির্দোষদের থানায় নিয়ে যায় কেস লেখবার জন্যে। চাকরি বাঁচানোর জন্যে।

হাঁফাতে হাঁফাতে দুই মক্কেল, আমি আর চাণক্য, যখন মূল সড়ক ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে চম্পট দিচ্ছি আখ খেতের দিকে, কানে ভেসে এল একটা মেয়েলি গলা।

কী ব্যাপার? চেহারা এমন ঝড়ো কাকের মতন কেন?

ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখতে পেলাম কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীকে। এক কিশোরী। নাম তার পিংকি। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের আজব কাহিনি-টাহিনির দারুণ ভক্ত। প্রফেসরকে নিয়ে আমরা এই গ্রামে স্রেফ হাওয়া খেতে এসেছি শুনে অষ্টপ্রহর লেগে থাকে তাঁর পেছনে। তাঁর পিলে চমকানো ব্যাপার-স্যাপার দেখবার জন্যে। প্রফেসর পিংকিকে খুব স্নেহ করেন। যেন নিজের নাতনি।

এইখানে বলে রাখি, আমরা এই গ্রামে এসে উঠেছি কোথায়।

উঠেছি একটা বিশাল বাগানবাড়িতে। তিন বিঘে দশ কাঠা তিন ছটাক জমির ওপর তৈরি সেই বাগানবাড়িতে আছে দুটো পুকুর, একটা দোতলা বাড়ি, আর—কিছু ভূত।

সেটা অবশ্য শোনা কথা। ভূত যদি থাকে, আমাদের তিনজনের ভয়ে চম্পট দিয়েছে। প্রফেসরের ইচ্ছে ছিল, ভূত নিয়ে কিছু গবেষণা করবেন। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির 'সিক্রেট ডকট্রিন' বইয়ের তিনটে খণ্ড পড়বার পর থেকেই ভূতপ্রেত সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে হয়েছে। এই বই যেহেতু পাওয়া গেছে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর ওপেনহাইমারের বইয়ের তাকে, এমনকী মহামানব শ্রীঅরবিন্দও তন্নতন্ন করে 'সিক্রেট ডকট্রিন' পড়েছিলেন। তাই প্রফেসর সেই বই তিনখানা প্লাস ইহুদিদের প্রাচীন 'কাবালা'

আর ‘তালমুড’ বই দু’খানাও মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অদৃশ্য জগতের রহস্য ভেদ করার জন্যে। ইথরীয় আধা-পদার্থই প্রেতশরীর কিনা, তাই নিয়ে গবেষণা করার জন্যে।

ভূতের বাড়িতে কেন এসেছিলাম তিন মূর্তি, এত কথা বললাম সেই কারণেই। যেহেতু ‘সিক্রেট ডকট্রিন’ প্রমাণ করেছে যে অসীম বিশ্বে অসংখ্য সৌরজগৎ আছে, তার প্রত্যেকটি গ্রহ আর তারা এক-একটা ফুলকি। যেহেতু যোগবিজ্ঞানীরা জানেন যে এক বিরাট অদৃশ্য জগৎ বিদ্যমান রয়েছে— তাকে অস্বীকার করা যায় না। জগতে এমন জিনিস আছে, যা আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি— সুতরাং ভূত থাকবে না কেন?

প্রফেসর এসেছিলেন এই অশরীরী রহস্য ভেদ করতে। ভূতবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা। পিংকি মেয়েটা তাই শুনে আঠার মতন লেগেছিল তাঁর পেছনে।

সেই পিংকির গলা শুনলাম আখের খেতের কাছে। মিষ্টি মিষ্টি গলায় টিটকিরি দিয়ে বললে, ‘ভূতে তাড়া করেছে না কি? দিনের বেলায়?’

পিংকি বড় মুখফোঁড় মেয়ে। বড় ক্যাট ক্যাট কথা বলে। প্রফেসর কেন যে ওকে এত স্নেহ করেন, বুঝতে পারি না।

আমি অবশ্য বরাবরই ডানপিটে। ভূতফুতদের থোড়াই কেয়ার করি। জীবনে একটা ভূতও তো দেখলাম না। তা হলে ভূতদের সমীহ করতে যাব কেন? তবুও প্রফেসরের সঙ্গে এসেছিলাম, আমি তাঁর ছায়া বললেই চলে বলে। আর চাণক্য এসেছিল যেখানে উদ্ভট, যেখানে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড— সেখানে থাকবে বলে। কিন্তু এইমাত্র দিনদুপুরে যে কাণ্ড দেখে এলাম, যা দেখে ইস্তক মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে, তারপর ভূত যে নেই, এমন কথাই বা বলি কী করে?

কিন্তু ভূত যে চকোলেট খেতে এত ভালবাসে, তা তো জানা ছিল না। খবরটা দেওয়া দরকার প্রফেসরকে এখুনি, তাই লম্বা লম্বা পা ফেলেছিলাম আমি আর চাণক্য দুজনেই।

এমনসময়ে চিমটিকাটা কথাগুলো শুনিয়ে দিল হাড়পাজি মেয়ে পিংকি।

ঢোঁক গিলে চাণক্য বলেছিল, ‘ভীষণ ব্যাপার! ভীষণ ব্যাপার!’

‘ভূতে মারে ঢেলা, ঠিক দিনের বেলা— ওইরকম ব্যাপার না কি?’ মজা চোখ নাচিয়ে বললে পিংকি।

‘ভূতের চাইতেও ভয়ানক।’ বললে চাণক্য।

‘যেমন?’

‘চকোলেট উধাও।’

‘সে কী! ভুতেরা আজকাল চকোলেট খাচ্ছে? দিনদুপুরে?’

গা-পিত্তি জ্বলে গেল পিংকির টিটকিরিতে। ভয়ানক ওই সোঁ সোঁ আওয়াজ শুনলে তো ভিরমি যেত তৎক্ষণাৎ। যেন হাজারখানা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার একসঙ্গে চালু হয়ে গিয়ে চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতে উড়িয়ে নিয়ে গেল দোকানের সমস্ত চকোলেট। ভাবা যায়? তার ওপর চোখের সামনেই তো ঘটে গেল অবিশ্বাস্য সেই ঘটনা। আর এই পুঁচকে মেয়েটা কিনা ফুট কাটছে তাই নিয়ে? ঠাস করে চড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে। বললাম মুখখানা হাঁড়ির মতন করে, ‘মুশকিলে পড়লে কিন্তু তুমি।’

হাসি হাসি মুখে পিংকি বললে, 'কেন? কেন?'

'চকোলেট আর পাবে না এই গণ্ডগ্রামে। ভূতেদেরও রুচি আছে। প্রোমোটারদের হিড়িকে তারা এখন গণ্ডগ্রামে কলোনি তৈরি করছে। এইমাত্র দেখে এলাম তাদের কাণ্ড। বড় পাওয়ারফুল ভূত। চক্ষের নিমেষে ভ্যানিশ করে দিল সমস্ত চকোলেট। এমনকী জিপ গাড়ির দরজা-টরজা পর্যন্ত উধাও।'

'ভূত বুঝি জিপের দরজা খায়?'

স্মার্টলি বললাম, 'সেইটা জানবার জন্যেই তো প্রফেসরের কাছে যাচ্ছি।'

ততোধিক স্মার্টনেস দেখিয়ে পিংকি বললে, 'তা হলে যাই ভূতেদের কাণ্ডকারখানা দেখে আসি।'

'যেয়ো না। পুলিশ এখন পাগলা হয়ে গেছে। গেলেই ক্যাঁক করে ধরবে।'

মুখে তড়পানি দেখিয়েও পিংকি কিন্তু আর এগোল না। পুলিশ এমনই জিনিস। তরতর করে পা চালাল মেঠোপথ দিয়ে। সেই পথ গেছে একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে। সাঁকোর নীচে একটা খাল। তারপরেই বাঁশবন। এ অঞ্চলের বাঁশ খুব বিখ্যাত। বাঁশভূত নাকি গিজগিজ করছে এই জায়গাটায়। ভুতুড়ে বাঁশ নুয়ে থাকে। ডিঙোতে গেলেই সটান উঠে যায়। ডানপিটে পিংকি কিন্তু শর্টকাট মারবার জন্যে ঢুকে গেল এই ভুতুড়ে বাঁশবনের মধ্যেই।

অগত্যা আমরাও।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কিছুই তো ঘটল না। ভূতেরাও তা হলে ভয় পায়। অন্তত সমীহ করে, এই পিংকি মেয়েটাকে। যা বিচ্ছু! নিশ্চয় ভূতদের কৌটোয় পোরার মন্তর-টন্তর জানে। নইলে প্রফেসরের ভূত গবেষণায় মাথা গলিয়েছে কেন?

কলম চালাতে চালাতে একটা কথা মাথায় এল। লিখে রাখি। ভূতের গল্প শুনতেই ভাল। ভূতের সামনে হাজির হওয়ার মতো বোকামি যেন কেউ না করে।

কেন লিখলাম এই কথাটা? এই বোকামিটা করেছিলাম বলে। এমনই একটা বোকামি যা 'উদ্ভট কোষ'*-এ ঠাঁই করে নিতে পারে অনায়াসেই। অবশ্য, প্রফেসরের, আমার, আর চাণক্যর সব কাণ্ডকারখানাই তো উদ্ভট। সৃষ্টিছাড়া। আক্কেল গুড়ুম করা ব্যাপার-স্যাপার। আজব এই কাহিনিটাও যে ঠাঁই পাবে উদ্ভট কোষে, তা নিয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই আমার মনে।

বাঁশবনে ঢুকে গেলাম একটা খুবই সরু রাস্তায়, তারপর আরও সরু একটা রাস্তায়, তারপর তার থেকেও সরু একটা পথে। পথ প্রায় নেই বললেই চলে। ভুতুড়ে এই বাঁশবনে কেউ ঢুকতে চায় না বলেই কোনও পথ নেই। চারদিকে শুধু বাঁশ আর বাঁশ। বাঁশের যেন একটা নিরেট পাঁচিল তুলে রেখেছে যাতে কেউ ভেতর দিয়ে ভুতুড়ে বাড়িটার দিকে যেতে না পারে।

ভূতের বাড়িটা রয়েছে ঠিক সামনেই। ভূত নিয়ে গবেষণা করার জন্যে প্রফেসর যেখানে আস্তানা নিয়েছেন। নিয়েছি আমরাও। কিন্তু এই বাঁশবন ঠেলে তো কখ্খনও আসিনি।

---

* 'উদ্ভট কোষ' একটি গ্রন্থ।

পিংকি মেয়েটা পারেও বটে। শর্টকাট মারল বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে।

ভুতুড়ে এই বাড়িটায় আর একটা রহস্য আছে। সদর দরজাটাকে কখনও মনে হয় খিড়কির দরজা, খিড়কির দরজাটাকে সদর দরজা।

পিংকি সাঁ করে ভাঙাচোরা বাড়িটায় ঢুকে গেল এমনি একটা দরজা দিয়ে, দূর থেকে যেটাকে দরজা বলেই মনে হচ্ছিল না।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বসেছিলেন একটা পেল্লায় লম্বা কাঠের টেবিলে। ডান চোখে লাগিয়ে রেখেছিলেন একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস— ঘড়ির দোকানে ঘড়িমিস্ত্রিরা যেমন চোখে লাগিয়ে ঘড়ির কলকবজা দেখে সেইরকম। প্রফেসর দেখছিলেন অদ্ভুত একটা টোব্যাকো পাইপ— তামাক খাবার পাইপ। এরকম পেল্লায় তাম্রকূট সেবনের পাইপ আমি জীবনে দেখিনি। তার গায়ে আবার নানারকমের চকমকে পাথর বসানো। জেল্লা ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে এক-একটা পাথর থেকে। পাইপের মুখের ফাঁদটা বিরাট। পেছন দিকটা, যেদিকটা দাঁতে কামড়ে পাইপ টানতে হয়, সেদিকটা বেশ বেঁকানো। প্রফেসর হাসি হাসি মুখে চেয়ে রয়েছেন পাইপের ফাঁদলটার ভেতর দিকে। যেন খুব মজা পাচ্ছেন।

তন্ময় প্রফেসরের ধ্যান ভেঙে গেল পিংকির চিৎকারে, 'প্রফেসর দাদু, প্রফেসর দাদু।'

চমকে উঠলেন প্রফেসর। এতক্ষণ যেন ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। বললেন মুখ তুলে, 'কী হল? হলটা কী? এত চেল্লামেল্লি কেন?'

'ভয়ানক কাণ্ড, ভয়ানক কাণ্ড।'

চোখ থেকে টুক করে খসিয়ে আনলেন প্রফেসর অদ্ভুতদর্শন ম্যাগনিফাইং গ্লাসটাকে। বললেন, 'কী রকম ভয়ানক কাণ্ড?'

পিংকি বললে, 'সমস্ত চকোলেট ভ্যানিশ হয়ে গেল চকোলেটের দোকান থেকে।'

আমি তখন দেখছিলাম বিদঘুটে একটা ব্যাপার। ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি? পিংকি যেই গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল, অমনি প্রফেসরের পাকা চুলের ডগায় ডগায় রংবেরঙের ফুলকি ছিটকে গেল। ঠিক যেন তারাবাজি। তাজ্জব দৃশ্য! এরকম তো কক্ষনও দেখিনি!

দু'হাতে ধরা পেল্লায় পাইপখানাকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন প্রফেসর। অমনি সমস্ত ফুলঝুরি মিলিয়ে গেল চুলের ডগা থেকে।

ম্যাজিক নাকি!

মিষ্টি গলায় বললেন প্রফেসর, 'বেশি মিষ্টি খেলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়। দাঁতের বারোটা বেজে যায়।'

এইবার আমি বললাম তড়বড় করে, 'কিন্তু ডেলিভারি ভ্যান আর পুলিশের গাড়ির দরজা-টরজাগুলোও যে ভ্যানিশ হয়ে গেল। হল কী করে?'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। খুলে বলো।'

খুলেই বললাম। ঠিক যেন একটা দানবিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালু হয়ে গেছিল সাঁ সাঁ করে, গাড়িগুলোর দরজা-টরজা, দোকানের সমস্ত চকোলেট চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সবশেষে বললাম, 'এ বাড়ির ভূতেরা তা হলে কি বাইরে বেরিয়ে উৎপাত শুরু করল? আপনার ভয়ে? এক্সপেরিমেন্ট সইতে পারছে না বলে? আপনি তো

বলেছিলেন, ভূতকে নিঙড়ে তেল বের করবেন। সেই ভয়ে কি উপদ্রব আরম্ভ করেছে বাড়ির বাইরে? দিনদুপুরেও তাই যদি হয়, তা হলে তো এরা ভয়ানক ভূত। আর না ঘাঁটানোই ভাল। শেষকালে আমাদেরও তো উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে?'

প্রফেসর এক চোখ সরু করে সব শুনে গেলেন, যে চোখে এতক্ষণ ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা লাগানো ছিল, সেই চোখটা। অবাক কাণ্ডটা দেখা গেল কিন্তু তখনই।

প্রফেসরের প্রত্যেকটা চুলের ডগা থেকে ফুলকি ছিটকে ছিটকে গেল। রংবেরঙের। যেন ফুলঝুরি ঝরছে গোটা মাথাটা থেকে।

প্রফেসর নিজেও দেখলেন ফুলকি ছিটকোচ্ছে চুল থেকে। রেগে গেলেন। ঠকঠক করে পাইপ ঠুকলেন টেবিলে। অমনি নিভে গেল সব ফুলকি।

অদ্ভুত ম্যাজিক? না, ভুতুড়ে কাণ্ড? দিনের বেলায় ভূতের উৎপাত? খোদ প্রফেসরের মাথার চুলে? তাই যদি হয়, তা হলে ঠকঠক করে পাইপ ঠুকতেই ফুলকিগুলো পালিয়ে গেল কেন? জাদু পাইপ নাকি? এরকম পেল্লা-মারা বিদঘুটে পাইপ তো প্রফেসরের হাতে কক্ষনও দেখিনি! আজকে কেন দেখছি? নতুন এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে মেতেছেন? ভূত তাড়ানো টোব্যাকো পাইপ?

এইরকম হাজারটা প্রশ্ন যখন কেউটে সাপের মতন ছোবল মেরে চলেছে মাথার মধ্যে প্রফেসর তখন ধীরে সুস্থে টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন পাশের মস্ত আলমারিটার সামনে। এমনই একটা আলমারি, যার কোনও পাল্লা নেই— ভূতেরা উধাও করেছে নিশ্চয়। আলমারির তাকে রয়েছে একটা মান্ধাতার আমলের রেডিয়োর মতো যন্তর। দেখা যাচ্ছে সারবন্দি টিউব, যা জ্বলে ওঠে রেডিয়ো চালু থাকলে।

প্রফেসর একটা সুইচ টিপলেন খট করে। অমনি দপদপ করে অনেকগুলো আলো নেচে নেচে গেল টিউবগুলোর মধ্যে দিয়ে। রেডিয়ো চালু হয়ে গেলে যেরকম হয়। সেকালের রেডিয়ো অবশ্য। একালের ট্রানজিসটর রেডিয়োতে ওসব বালাই নেই।

কিন্তু রেডিয়োর মতন দেখতে হলেও জিনিসটা আসলে যে কী, প্রফেসরের নতুন কিছু আবিষ্কার কি না, এই কথা যখন ভাবছি, ঠিক তখনই খট করে একটা সুইচ টিপে দিলেন প্রফেসর।

সঙ্গে সঙ্গে গাঁকগাঁক চিৎকার শোনা গেল যন্তরটার মধ্যে— ভীষণ কাণ্ড? ভীষণ কাণ্ড! গোটা তল্লাট জুড়ে হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার! সমস্ত মিষ্টির দোকান থেকে সব মিষ্টি উধাও! ছানাবড়া, রসগোল্লা, পানতুয়া, সন্দেশ, জিলিপি, গজা, এমনকী চকোলেটের দোকান থেকে সমস্ত চকোলেট পর্যন্ত— সব উধাও! পুলিশের চোখ ছানাবড়া! হতভম্ব প্রত্যেকেই! দিনদুপুরে এমন ভৌতিক কাণ্ড নাকি কখনও দেখা যায়নি? এই ভূত নাকি ভয়ানক ভূত? দেশের সমস্ত রোজা ওঝা ভূত-তাড়ানোর জাদুকরদের খোঁজা হচ্ছে— ভূতযজ্ঞ করা হবে... ভূতেরা খেপেছে... ভূতেরা খেপেছে।

খট করে আজব যন্তরটা বন্ধ করে দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

পিংকি বললে, 'নিশ্চয় কেউ নতুন এক সার্কাসের পাবলিসিটি শুরু করেছে। নতুন

ধরনের পাবলিসিটি। ভুতুড়ে কাণ্ড দেখানোর নতুন এক সার্কাস। যেখানে নেই পাগলা হাতি, মানুষখেকো বাঘ, আছে স্রেফ ম্যাজিক-ভূতেদের লম্ফঝম্প।'

প্রফেসর গুম মেরে গেছিলেন। এখন বললেন, 'মনে হয়, তা নয়।'

'তা হলে?' পিংকির প্রশ্ন।

'আমার পুরনো শত্রু নাকুচিকির কাণ্ড। ফের লেগেছে আমার পেছনে।'

'নাকুচিকি! সে কে? খুব ন্যাকাবোকা বলে তো মনে হচ্ছে না?'

'চিনি ডাকাত! চিনি ডাকাত! বিশ্ববোম্বেটে চিনি চোর!'

বিষম উত্তেজিত পিংকি হয়তো আরও একখানা প্রশ্নের ঝড় উড়িয়ে দিত, মুখ তো নয়— যেন ফটফটি গাড়ি, কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল একটা আক্কেল গুড়ুম কাণ্ড।

ঠিক যেন আতশবাজির আলোর ভেলকি শুরু হয়ে গেল প্রফেসরের ঝাঁকড়া-মাকড়া চুলের মধ্যে। পাকা চুলের মধ্যে সেকী আলোর রোশনাই, চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতন ঝিকিমিকি তারাবাজি।

ফুলকিগুলো যখন ছিটকে ছিটকে চলে যাচ্ছে প্রফেসরের চোখের ঠিক সামনে দিয়ে, তখন উনি বেশ মজা মজা চোখে ফুলকি নৃত্য, ফুলকি বৃষ্টি কিছুক্ষণ দেখলেন। আগুনের ফুলকি নয় স্রেফ আলো। এক-একটা ফুলকি যেন এক-একটা নক্ষত্র।

তার পরেই পাইপখানা ফের তুলে নিলেন। নলচেটাকে মুখের মধ্যে দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিলেন, আর ভুসভুস করে ধোঁয়া ছেড়ে গেলেন মিনিট দুই। ঘন ধোঁয়ার মেঘে ভরে গেল ঘরটা। খকখক করে কেশে গেলাম আমি আর পিংকি— এমনকী চাণক্যও, যে কিনা তুখোড় ধূমপায়ী— পাইপখেকো।

পিংকি মেয়েটার উপস্থিত বুদ্ধি খুব প্রখর। ছুট্টে গিয়ে খুলে দিল ঘরের সবকটা জানলা; ফলে, হুশহুশ করে ধোঁয়া বেরিয়ে গেল বাইরে। সব ধোঁয়া উধাও হওয়ার পর দেখা গেল, প্রফেসরের চুল থেকে আর আলোর ফুলকি বেরোচ্ছে না। উদ্ভট কাণ্ড! প্রফেসরের অনেক ভেলকি দেখেছি, কিন্তু ভৌতিক ফুলকি নেভানোর এরকম কাণ্ড কখনও দেখিনি।

'উচিত শিক্ষা দিয়েছি।' মিটিমিটি হেসে বললেন বটে, আমি কিন্তু দেখলাম উচিত শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রফেসর নিজের মাথার চুলগুলোকে ঝকঝকে নীল করে ফেলেছেন।

পরমোৎসাহে মুখ খুললেন পরক্ষণেই, 'খুব টাইট দিয়েছি, কিন্তু সময় হয়েছে— এখন কর্তব্য করতে হবে।'

পিংকি বললে ঝট করে, 'কী কর্তব্য?'

প্রফেসর জবাব দিলেন না। হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছুটলেন চালাঘরের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম একটা সাইডকার লাগানো ঝরঝরে মান্ধাতার আমলের মোটর সাইকেল। বাতিল এই যন্ত্রযানটাকে উনি কবে জোগাড় করলেন? আমাকে আর চাণক্যকে কিচ্ছু তো বলেননি। নিশ্চয় পিংকির কাণ্ড। যা দস্যি মেয়ে। হয়তো নিজেই চালায়।

হয়তো নয়, সত্যি। টপাস করে গিয়ে উঠল তিন চাকার মোটরবাইকে, প্রফেসরকে কিচ্ছু বলতে হল না— একেই বলে গেছো মেয়ে। পরনের শাড়িটাকে গাছকোমর করে বেঁধে

নিল চক্ষের নিমেষে। প্রফেসর লাফিয়ে গিয়ে বসে পড়লেন সাইড করে, পাশে চাণক্য, আমি বসলাম পিংকির পেছনে। পিংকি বেশ কয়েকবার ক্যাঁক ক্যাঁক করে লাথিয়ে গেল সেকেলে স্টার্টার লিভার। তারপরেই গোঁ গোঁ করে গর্জে উঠল ইঞ্জিন— তিরবেগে বেরিয়ে গেল গ্যারেজ থেকে।

প্রফেসরকে কক্ষনও পাইপ খেতে দেখিনি, দেখলাম সেই প্রথম। ধূমায়িত পাইপটাকে দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরে ধোঁয়া ছেড়ে গেলেন হুশহুশ করে। যেন গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে লাগল চিমনি থেকে।

লাফাতে লাফাতে মেঠো পথের ওপর দিয়ে তিন চাকার যন্ত্রযান এসে গেল পিচের রাস্তায়। আর ঠিক সেই সময়ে ঘটে গেল ভারী অদ্ভুত একটা ব্যাপার।

নিউটন চকোলেট কারখানা যে এই অজ পাড়াগাঁ থেকে একশো কিলোমিটারেরও বেশি দূরের নষ্টচন্দ্র নগরে, আমি তা জানতাম। নামটা অমন বিদঘুটে বলেই হাড়ে হাড়ে মনে রেখেছিলাম। নষ্টচন্দ্র মানেটা যে জানতাম। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা বা শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ— যা দেখলে দোষ হয়। কিন্তু সেই নামে যে কোনও শহর থাকতে পারে, তা জানা ছিল না। জানবার পর ভুলতেও আর পারিনি। আরও পারিনি এই কারণে যে ভারতবিখ্যাত নিউটন চকোলেট কোম্পানি কারখানা বানিয়েছে ঠিক এই শহরে— অশুভ নামের শহরে।

যাকগে, যা বলছিলাম। প্রায় একশো কিলোমিটার দূরের নষ্টচন্দ্র নগরের নিউটন চকোলেট ফ্যাক্টরির সামনে প্রফেসরের তিন চাকার মোটরবাইকে পৌঁছে গেল বলতে গেলে চক্ষের নিমেষে— গাঁ ছাড়াতে না ছাড়াতেই! ফোর্থ ডাইমেনশন দিয়ে এলেন নিশ্চয়— ত্রিমাত্রিক জগৎ ছাড়িয়ে সময় মাত্রার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সেটা এত সহজে ঘটে গেল যা আমি অন্তত কিছুই টের পেলাম না। পিংকি অবশ্য ব্যাপারটা নিশ্চয় কিছু জানত। প্রফেসর যে এই ঝরঝরে তেচাকার মোটর সাইকেলকে আজব শক্তি দিয়েছেন, তা জানত। জানত বলেই মুখ টিপে মুচকি মুচকি হাসছিল আমার হতভম্ব মুখচ্ছবি দেখে। চাণক্যকে দেখলাম বেশ নির্বিকার। গুলপট্টি মেরে সব্বাইকে অবাক করতে করতে নিজেই অবাক হতে ভুলে গেছে।

ফ্যাক্টরির সামনে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ডেলিভারি ভ্যান। একইরকম তেউড়োনো-দুমড়োনো ভাঙাচোরা অবস্থায়— যেমনটা দেখেছি অজ পাড়াগাঁয়ে। একটা জায়গায় লেখা রয়েছে 'শুধু দর্শকদের জন্যে'। পিংকি বোঁ করে তিন চাকাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল সেই জায়গাটায়।

পৌঁছেছিলাম কিন্তু ঠিক সময়ে। কেননা আমাদের চক্রযান আর্তনাদ থামাতে-না-থামাতেই ফ্যাক্টরির ভেতর থেকে ভয়ে-ময়ে পাঁইপাঁই করে দৌড়ে বেরিয়ে এল কারখানার সমস্ত লোক। প্রত্যেকেরই চোখ দেখলাম ভয়ে ছানাবড়া। নিঃসীম আতঙ্ক জেগে রয়েছে প্রত্যেকের চোখেমুখে।

আর ঠিক সেই সময়ে শোনা গেল একটা পিলে চমকানো ঝনঝন-মড়মড়-ঝনাৎঝঙ আওয়াজ। সোঁ সোঁ আওয়াজটা তখন থেমে গেছে। কিন্তু কড়মড়-কড়াং-কট আওয়াজ যেন কানের পরদা ফাটিয়ে দিতে চাইছে। দুমদাম করে আছড়ে পড়ছে মজবুত মজবুত মেট্যাল

দরজাগুলো। যেন হাজারখানা করাত কল একসঙ্গে চলছে মাথার ওপর।

সেই আওয়াজ ছাপিয়ে এবার শোনা গেল অতিকায় সেই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কানের পরদা ফাটানো বিকট আওয়াজ।

আর তারপরেই দেখতে পেলাম একটা ঘন কালো মেঘকে যেন আকাশ টেনে নিচ্ছে নিজের দিকে বিপুল বেগে। যেন গিলে নিচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড পরে সেই কৃষ্ণমেঘপুঞ্জ অন্তর্হিত হল চোখের বাইরে।

কিন্তু সেই কালো মেঘের মতন বস্তুপুঞ্জ যে আসলে কী, তাও বুঝে গেলাম চক্ষের নিমেষে।

নিউটন চকোলেট ফ্যাক্টরির ছাদ উড়িয়ে দিয়ে যেন জীবন্ত হয়ে গিয়ে সমস্ত চকোলেট ঝাঁক বেধে পাড়ি দিল মহাশূন্যের দিকে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ততক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছেন লঝঝড় ত্রিচক্র যান থেকে। কপালে হাত দিয়ে চেয়ে আছেন আকাশে পলাতক ঘূর্ণিঝড়ের মতন পাক খেয়ে খেয়ে ঊর্ধ্বে যাওয়া চকোলেট বাহিনীর দিকে। যেন একটা অবিশ্বাস্য টর্নেডো ঝড়।

প্রফেসরের পাশে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিলাম আমরা তিনজনেও। আমি, পিংকি আর চাণক্য। গোল গোল চোখে তিনজনেই তাকিয়েছিলাম অসম্ভব এই চকোলেট-ঝড়ের দিকে। ঘূর্ণিঝড় যে শুধু চকোলেট দিয়ে তৈরি হয়, তা জানলাম সেই প্রথম।

দেখেটেখে নিশ্চয় আমার চুল খাড়া হয়ে গেছিল, যদিও আমি ভয়ানক সাহসী, কিন্তু ভয়ানকের চাইতেও ভয়ানকতর এই দৃশ্য তো কখনও দেখিনি।

শুনতে পেলাম বিড়বিড় করে বলছেন প্রফেসর, 'নাকুচিকি— আমার চিরশত্রু নাকুচিকি... আর-একটা কেরামতি আজ দেখাল বটে! বেটা বদমাশ বৈজ্ঞানিক, কিন্তু ব্রেনখানা সরেশ-তুখোড় মানতেই হবে। টেক্কা মারতে চায় আমাকে? জব্দ করতে চায় পৃথিবীকে? দেখাচ্ছি মজা!'

সোঁ সোঁ টেনে নেওয়ার আওয়াজটা ততক্ষণে থেমে গেছে। পিচমোড়া রাস্তার সর্বত্র একটা গনগনে আঁচের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাত লাগছে পায়ে। বাতাসও বেশ গরম হয়ে গিয়ে যেন থিরথির করে কাঁপছে মাথার ওপর দিকে, প্রায় পঞ্চাশ ফুট ওপর দিকে।

গাড়ি রাখবার জায়গাটা যেদিকে, তার পাশ বরাবর ছিল একটা পাথরের পাঁচিল। হঠাৎ আঙুল তুলে সেই পাঁচিল দেখিয়ে প্রফেসর বললেন তারস্বরে, 'দৌড়োও— দৌড়োও— ওই দিকে!'

বলেই, উনি যেন হনুমান-লম্ফ দিলেন, ওই বয়েসে। অগত্যা আমরাও— আমি, পিংকি আর চাণক্য— বায়ুবেগে তাঁর পেছন নিলাম।

পাঁচিলের আড়ালে গিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়েছিলেন প্রফেসর। দেখাদেখি আমরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম। গুরু যা করবেন, চ্যালা চামুণ্ডারাও তো তাই করবে।

কিন্তু অকুতোভয় প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন?

আচমকা সাঁ করে একটা পেল্লায় সাইজের কাশ্মীরি টুপি উড়ে এল মাথার ওপর—

লোমশ যে-টুপি কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না— যে-টুপি পরতেন বক্সি গোলাম মহম্মদ!

কিন্তু সে-টুপি তো হয় কুচকুচে কালো, এ-টুপি যে টকটকে লাল। শুধু ধেয়ে এল না, টুপির মধ্যে থেকে ঠিকরে নেমে এল আলোর ঝলক, সেইসঙ্গে শোনা গেল বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। যেন একটা দানব-ভালুক ঘোঁত ঘোঁত করে যাচ্ছে গলা ফাটিয়ে।

ঘোঁতঘোঁতানিটা কিন্তু নিছক জান্তব চিৎকার নয়। রীতিমতো অর্থবহ। গাঁকগাঁক করে একটাই নাম বারবার আউড়ে যাচ্ছে উড়ন্ত টুপি, 'না-না-নাকুচিকি?'

গলা ফাটিয়ে চিৎকার ছেড়েছিলেন প্রফেসর, 'নিকুচি করেছে নাকুচিকি-র!'

অমনি ভীষণ আওয়াজ করে টুকরো টুকরো হয়ে গেল অমন মজবুত পাথরের পাঁচিলটা! আর দপদপ করতে লাগল তেচাকার মোটর সাইকেলটা। যেন তেতে লাল হয়ে গিয়ে গলে যাবে এখুনি।

প্রফেসর বললেন, 'অ্যাকশন! অ্যাকশন! আর দেরি নয়!'

বলেই, পাইপখানাকে বাগিয়ে ধরে টিপ করলেন উড়ন্ত টুপির দিকে। হাত সটান সিধে রেখে।

হুইশল ধ্বনির মতন একটা আওয়াজ শুনলাম। আওয়াজটা এল তাক করে তুলে রাখা পাইপের মধ্যে থেকে। অনেকটা সাইরেন বাজার আওয়াজের মতন। জাপানি বোমারুরা যখন কলকাতায় বোমা ফেলতে এসেছিল, এইরকম সাইরেন বেজেছিল থানায় থানায়।

অবিকল সেইরকম নিনাদ শোনা গেল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের নতুন আবিষ্কার নিরীহ পাইপখানার মধ্যে। নলচেটাকে টিপ করে ধরলেন উড়ুক্কু ভয়ানকের দিকে। তামাক ঠাসবার গোল ফাঁদলটাকে চেপে ধরলেন দু-মুঠোর মধ্যে।

কীমাশ্চর্যম ঘটনাটা ঘটে গেল চোখের পাতা ফেলবার আগেই।

হুইশল বাজার মতন শব্দ করে একটা লোহিত আলোকরশ্মি ধেয়ে গেল উড়ন্ত টুপির দিকে— পাইপের নলচের ভেতর থেকে।

পরক্ষণেই একটা অতিকায় সবুজ রঙের টুপি কারখানাবাড়ির কোণ ঘুরে তেড়ে এল আমাদের দিকে। টুপির দিক থেকে ঝলসে উঠল একটা চোখধাঁধানো সবুজ দ্যুতি। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচিলের ওদিকে রাখা একটা ডেলিভারি ভ্যান হেলে পড়ল একদিকে, কেননা তার একখানা চাকা উড়িয়ে দিয়েছে সবুজ ঝলক।

আমি কিন্তু আঁতকে উঠেছিলাম পিলেচমকানো সেই দৃশ্য দেখে। একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম। সবুজ টুপির টিপ ফসকেছে। প্রফেসরকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে গাড়ির চাকা।

অকুতোভয় প্রফেসর কিন্তু তৎক্ষণাৎ পাইপের নলচে টিপ করলেন সবুজ টুপির দিকে। ভীষণ একটা আওয়াজে মনে হল কানের পরদাটাই বুঝি গেল ফেটে।

ভয়ানক সেই আওয়াজটা আসলে সবুজ টুপির আর্তনাদ। কামান দাগা হয়েছে সবুজ টুপির ওপর। নির্ভুল লক্ষ্যে। ফলে চোখের সামনেই একতাল সবুজ ধোঁয়া হয়ে গেল সেই অজানা বিভীষিকা।

এবার দেখা গেল আর-এক ধরনের টুপি। স্পেন আর মেক্সিকোয় প্রফেসরের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে এরকম টুপি আমি দেখেছি। এ টুপির নাম সমব্রেরো টুপি। চারপাশে থাকে বেশ চওড়া কিনারা। যেটা উড়ে এল কারখানার দেওয়ালের এদিক থেকে, তার রং ঝকঝকে হলুদ। এল কিন্তু রশ্মিবর্ষণ করতে করতে।

প্রফেসর ফের তাঁর অভিনব পাইপ তাক করে ধরলেন আগুয়ান টুপির দিকে। রশ্মিঝলক ছুটিয়ে দিলেন পাইপের নলচে থেকে। সম্‌ব্রেরো গুঁড়িয়ে গিয়ে হলুদ ধোঁয়া হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। হাওয়ায় উড়ে গেল ধোঁয়ার মেঘ।

বাঁচা গেল, ভাবছি যখন মনে, ঠিক তখনই ঘটে গেল আর-একটা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। ফুস করে অদৃশ্য হয়ে গেল আমার ডানপায়ের বুট জুতোর আধখানা গোড়ালি!

চোখ তুলে দেখলাম একটা রাজস্থানি উষ্ণীষ, মানে পাগড়ি, বাঁই বাঁই করে পাক খেতে খেতে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। প্রফেসরও নিশ্চয় দেখেছিলেন আগুয়ান উড়ুক্কু আতঙ্ককে— ঠিক যেন একটা ফ্লাইং সসার— ভিনগ্রহের আকাশযান। তাই আর তিলমাত্র দ্বিধা না করে বিশাল পাইপগান টিপ করলেন সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে গলে মিলিয়ে গেল কালো পাগড়ি।

প্রফেসর তাঁর পাইপগান চালিয়ে উড়ুক্কু টুপিদের নিকেশ করে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু টুপিদের উড়ে আসার তো বিরাম নেই। একটাকে শূন্যে মিলিয়ে দিতে-না-দিতেই ধেয়ে আসছে আর-একটা। রকমারি চেহারার টুপি। কখনও নেপালি টুপি, কখনও ফেজ টুপি, কখনও গাঁধী টুপি। নিরীহদর্শন হলেও করাল প্রকৃতির প্রত্যেকেই। ঝলকে ঝলকে মারণরশ্মি বর্ষণ করতে করতে তেড়ে আসছে, যেসব রশ্মির এতটুকু আমাদের ছুঁয়ে গেলেই আমরা শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে পারি তৎক্ষণাৎ। কিন্তু ঝানু বন্দুকবাজের মতন প্রফেসর সেটি হতে দিচ্ছেন না। অভিনব পাইপগান চালিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে ভ্যানিশ করে দিচ্ছেন প্রত্যেকটাকে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। প্রফেসর দুমদাম ফুসফাস সোঁ সোঁ করে একটার-পর একটা রঙিন টুপিদের শূন্যে বিলীন করে দিলেও বিরাম নেই তাদের পুনরাবির্ভাবের। একটা ফিনিশ-ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে তো চলে আসছে আর-একটা। যেন ঝাঁকে ঝাঁকে টুপিবাহিনী রয়েছে চোখের আড়ালে, অন্য কোথাও অন্য কোনওখানে। এরকম মারণ টুপিবাহিনী আমি জীবনে দেখিনি। অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছি প্রফেসরের সঙ্গে, কিন্তু এরকম নিরীহদর্শন ফ্লাইং টুপিদের এ হেন করাল রূপ কখনও দর্শন করিনি।

এবার যে টুপিটা কালান্তক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল, সেটাকে দেখতে অবিকল হেলমেটের মতন, যে হেলমেট মাথায় দিয়ে আজকাল বাইক চালাতে হয়। নিরীহদর্শন সেই হেলমেটই আকাশপথে যখন দৃশ্যমান হল উড়ন্ত পিরিচের মতন, তখন আর তাকে নিরীহদর্শন লাগছিল না মোটেই, যেন একটা কালান্তক বিভীষিকা।

আমার নজর যখন চলে গেছিল আগুয়ান সেই বিভীষিকার দিকে, ঠিক তখনই কানের কাছে শুনলাম প্রফেসরের পরিত্রাহি চিৎকার, আমার বাইক! আমার বাইক! রশ্মি মেরে উড়িয়ে দিল যে আমার সাধের মোটরবাইক!

তাই তো! এতক্ষণ আকাশপানে চেয়েছিলাম বলে তেচাকার ঝরঝরে মোটর সাইকেলের

দিকে তাকাতে পারিনি। এখন তাকালাম এবং চমকে গেলাম।

মোটরবাইক আর নেই। পড়ে আছে শুধু বাড়তি একটা চাকা আর হ্যান্ডেলবার!

কানের কাছে শুনলাম প্রফেসরের ভীমগর্জন। নিরীহ মানুষটাকে এভাবে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে কখনও দেখিনি, 'নাকুচিকি— নাকুচিকি— তোর নিকুচি করব আমি, তবে ছাড়ব! কত কষ্টে, কত প্ল্যান করে বানিয়েছিলাম এই মান্ধাতার আমলের বাহনকে— ভবিষ্যতের আজব যান হয়ে যেত এই তিন চাকা— বিপ্লব ঘটিয়ে দিত মোটর সাইকেলের দুনিয়ায়— এমন একটা জিনিসকে ভ্যানিশ করে দিলি হারামজাদা! এইবার তোর একদিন, কি আমার একদিন!'

নাকুচিকি যেন অন্তরালে থেকে কান পেতে শুনতে পেয়েছিল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রর হুমকি। তাই রশ্মিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আচমকা নৈঃশব্দ্য নেমে আসায় থমথম করতে লাগল চারদিক। কোনও দিক থেকেই আর কোনওরকম বিদিগিচ্ছিরি হামলাবাজদের ধেয়ে আসতে দেখলাম না।

আর ঠিক তার পরেই শোনা গেল একাধিক পুলিশ সাইরেনের কানফাটানো আওয়াজ। গোঁ গোঁ করে ছুটে আসছে গাড়ির পর গাড়ি। দেখতে দেখতে ছ'খানা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে গেল কারখানার গাড়ি রাখবার জায়গায়। ব্রেক কষলো ঘচাঘচ করে।

টনক নড়ল প্রফেসরের। বললেন, 'এখানে আর নয়। এবার হোক অন্য কাজ।'

বলেই, লম্বা লম্বা পা ফেলে সরে গেলেন কারখানার কাছ থেকে। আমরা ছুটলাম তাঁর পেছন। আমি, পিংকি আর চাণক্য।

বেশিক্ষণ যেতে না যেতেই এসে পড়লাম একটা খেতের সামনে। কিন্তু খেত তো নেই। ফসল-টসল কিচ্ছু নেই। একদম ন্যাড়া মাঠ।

ফ্যালফ্যাল করে চাঁচাছোলা মাঠটার দিকে চেয়ে থেকে আপন মনে বললেন প্রফেসর, 'কী যেন দেখেছিলাম এখানে, এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। কী ছিল?'

জবাবটা এল পেছন থেকে, 'আখের খেত ছিল— আজ সকাল পর্যন্ত।'

বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা চারজনেই।

ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে একজন। গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। চোখমুখ উদভ্রান্ত। যেন ভূত দেখেছে। বললে, 'অদৃশ্য হয়ে গেল। আচমকা।'

'কীভাবে?' বললে পিংকি।

'উড়ে গেল আকাশে। সোঁ সোঁ আওয়াজ শুনলাম। যেন হাজারখানা ধুলো টানার মেশিন চলছে মনে হল। মাটি থেকে উপড়ে টেনে নিয়ে গেল সমস্ত আখ। কিন্তু এত আখ আকাশে গেল কেন? আকাশে কি আজকাল আখ থেকে চিনি তৈরি হচ্ছে?'

জবাব না দিয়ে হনহন করে হন্টন শুরু করে দিলেন প্রফেসর। বুঝলাম রাগে তখন তাঁর মাথা গনগন করছে। চাষি বেচারা দাঁড়িয়ে রইল হতভম্ব মুখে।

আমি কিন্তু হতভম্ব হলাম প্রফেসরের এত জোরে হাঁটা দেখে।

একটু পরেই এসে গেলাম এমন একটা জায়গায় যেখানে বাড়িটাড়ি একদম নেই, রাস্তা-ফাস্তা নেই, লোকজন নেই।

প্রফেসর দাঁড়িয়ে গেলেন সেইখানেই। বললেন, 'সময় হয়েছে নিকট, এবার বদলা নিতে হবে।'

আমি বললাম মিনমিন করে, 'বদলাটা নেবেন কার ওপর?'

'নচ্ছার রাস্কেল বদমাশ পাজি ওই নাকুচিকির ওপর। ঘাঁটাচ্ছে আমাকে অনেকদিন ধরেই। অনেক সয়েছি, আর নয়। এবার উচিত শিক্ষা দেব। শিক্ষাটা আগেই দেওয়া উচিত ছিল। তা হলে এত বাড় বাড়তে পারত না।'

এই বলে কিম্ভূত তামাকু পাইপটাকে নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন অসম্ভবকর্মা প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। প্রফেসর যখন রেগেছেন, তখন দুর্দান্ত একটা অ্যাডভেঞ্চার এইবার শুরু হল বলে। অ্যাডভেঞ্চারের পোকা আমি। অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া কি বাঁচা যায়? জীবনটা হবে পাগলা হাতির উদ্দামতার মতন। তবেই না জীবন।

বললাম আস্তে আস্তে, 'পাইপ নিয়ে ফের কিছু করবেন মনে হচ্ছে?'

'করবই তো।'

'কী করবেন?'

'এনার্জির বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ব।'

'এ-এনার্জির বড় রাস্তা! মা-মানে?'

'মূর্খ। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে এনার্জির অসংখ্য রাস্তা। কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইদানীং কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে। এনার্জির কণা টেনে এনে মানুষের কোষের ডিএনএ-র মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষকে অতিমানুষ বানাতে চাইছে। কল্পবিজ্ঞান কাহিনিতে অতিমানুষ নিয়ে লেখালেখিও হয়ে গেছে। যে অতিমানুষ জেটারশ্মির মধ্যে দিয়ে নিমেষে চলে যেত রাডা গ্রহে, অ্যাডভেঞ্চার শেষ করে, লড়াই-টড়াই ফিনিশ করে, ফের ফিরে আসত পৃথিবীতে জেটারশ্মির দৌলতে। আমি, নাটবল্টু চক্র, সেই জেটারশ্মির হদিশ বের করে ফেলেছি। এনার্জি হাইওয়ে দিয়ে গোটা বিশ্বটার সর্বত্র যাওয়ার পন্থা উদ্ভাবন করে ফেলেছি।'

বলতে বলতে বিষম উত্তেজিত হয়ে গেলেন প্রফেসর। আমি, শ্রী দীননাথ নাথ, হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। পিংকির চোখে দেখলাম কিন্তু বেশ একটা মজা মজা ভাব। একের নম্বরের গেছো মেয়ে। বললে বেশ উৎফুল্ল গলায়, 'রওনা হচ্ছি কখন?'

প্রফেসর বললেন আনমনা গলায়, 'কোডিং সিস্টেমটার হিসেবটা করতে দাও। তারপর—'

'কীসের কোড?'

'সংকেত— সংকেত— সেসবেরও একটা সিস্টেম আছে। স্নায়ুতন্ত্র, কঙ্কালতন্ত্রের মতন একটা সংকেততন্ত্র আছে। কোয়ান্টাম মেক্যানিক্সের টনক নড়েছে তো এই কারণেই। মহাবিশ্বে আছে অগুনতি শক্তিস্তর। আছে এক ছায়াপথ থেকে আর-এক ছায়াপথে নিমেষের মধ্যে চলে যাওয়ার শক্তিপথ— এনার্জি রুট। রাস্কেল নাকুচিকি কোন রুট ধরে, হানা দিয়েছে পৃথিবীতে, সেটা ভাবছি— ভাবতে দাও।'

শুনে-টুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল আমার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে আছে এনার্জি-

রাস্তার জটাজাল! কীমাশ্চর্যম! কিন্তু অতিমানুষ যারা, তারাই তো যেতে পারে এহেন এনার্জি-রাস্তা দিয়ে। এরকম একজন অতিমানুষের কাহিনি— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি কোথায় যেন পড়েছি। পড়তে মন্দ লাগেনি। কিন্তু তা যে কখনও সম্ভব হতে পারে, তা তো কখনও মনে হয়নি। সে তো ছিল স্রেফ ফ্যানট্যাসি অ্যাডভেঞ্চার। প্রফেসর কি সেই উদ্ভট কাহিনি পড়েছেন? পড়বার পর মাথা খাটিয়ে এনার্জি রাস্তা-টাস্তাগুলোর হদিশ বের করে ফেলেছেন? সায়েন্স ফিকশনে যাকে ওয়ার্ম-হোল বলে, প্রফেসর কি সেই গুপ্ত টানেলের কথা বলছেন?

বললাম মিনমিন করে, 'কিন্তু নাকুচিকি শুধু চিনি লুঠ করতে যাবে কেন?'

'কারণ সুগার— চিনি হচ্ছে একটা জৈবনিক শক্তি-ভাইটাল পাওয়ার— এই প্রাণময় শরীরে। নাকুচিকি যদি পৃথিবী থেকে সমস্ত সুগার উধাও করে দেয়, যা করেছে আরও অনেক গ্রহে, তা হলে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে এখানেও।'

'কিন্তু এত চিনি নিয়ে সে করবেটা কী?'

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব চাইতে দামি জিনিস তো এই চিনি। এই চিনির জন্যে যে-কোনও দাম দিতে প্রস্তুত, এমন জায়গা আছে অনেক।'

কথা বলতে বলতে অভিনব তামাকু পাইপের কলকবজা টিপে অ্যাডজাস্ট করছিলেন প্রফেসর। অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রায় শেষ করেই এনেছিলেন। পাইপের নলচের শেষের দিকটা বেশ শক্ত করে দাঁতের ফাঁকে রেখে কামড়ে ধরেছিলেন। তারপর চোখ তুলে চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তটায় ঘটে গেল পিলে চমকানো কাণ্ডটা। চোখ ঝলসানো একটা আলো যেন ফেটে গেল আমাদের ঘিরে। প্রফেসরকে আর কিছু ব্যাখ্যা করতে হল না, ব্যাখ্যা করবার মতন পরিস্থিতিও তখন নয়। কিন্তু অণু-পরমাণু দিয়ে উপলব্ধি করলাম, অস্থিমজ্জা দিয়ে টের পেলাম— আমরা অবস্তু হয়ে গেছি। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে, আমাদের শরীরের প্রতিটি বস্তুকণা রূপান্তরিত হয়ে গেছে শক্তিকণায়, যে শক্তি থেকে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি, আমরা ফিরে গেছি সেই শক্তিপ্রবাহের মধ্যে পরমাণু শক্তি নিয়ে আদিম শাশ্বত, অবিনশ্বর সেই এনার্জিফিল্ডের মধ্যে। রংবেরঙের একটা আলোর ঝলক পড়ল আমাদের ওপর। সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝতে পারলাম, পলক সময়ের মধ্যে চলে এসেছি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এনার্জি রুট-এর যে জটাজাল— তার মধ্যে।

আশ্চর্য এই যে, ভয় পাইনি একদম। নির্বিকার নিঃশঙ্ক ছিলাম আমরা তিনজনেই, যারা ডাহা আনাড়ি এ ব্যাপারটায়— আমি, চাণক্য আর পিংকি।

তবে লটঘট একটা কাণ্ড যে ঘটাতে পারে শক্তিদেহ থেকে বস্তুদেহে রূপান্তরের সময়ে, এরকম একটা আশঙ্কা আমার হেঁড়ে মাথার মধ্যেও ছিল। খুব ভয়ের মধ্যে ছিলাম।

কিন্তু বাহাদুর বটে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। নক্ষত্রবেগে গাড়ি ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ব্রেক মারলে প্রলয়কাণ্ড ঘটাবেই। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেরকম কিচ্ছু ঘটাতে দিলেন না প্রফেসর। যেন ওস্তাদ ড্রাইভার। দৃশ্যমান হলাম পলকের মধ্যে, বস্তুময় হলাম চকিত চমকে। এই ছিলাম পৃথিবীতে, এই এসে গেলাম অন্য একটা দুনিয়ায়। ভাবা যায়? জয় হোক এনার্জি

রুটের! প্রফেসর জিন্দাবাদ! এত জলদি মহাশূন্য ভ্রমণ? মাই গড!

প্রফেসর কিন্তু নির্বিকার। যেন এপাড়া থেকে ওপাড়ায় গেলেন। এমনি একটা সহজ স্বাভাবিক মুখভঙ্গি করে বললেন, 'দেখলে তো, সোজা পথ, কোনও জাংশন স্টেশন নেই— একেই বলে মহাকাশ এক্সপ্রেস।'

আমি তখন ফ্যালফ্যাল করে দেখছি এদিক-সেদিক। দাঁড়িয়ে আছি তো একটা পাহাড়ের মাথায় আগে সেখানে ছিল একটা আগ্নেয়গিরি। এখন নিভে গেছে। আমরা দাঁড়িয়ে জ্বালামুখের কিনারায়।

নীচে জ্বলছে হাজার হাজার আর্ক ল্যাম্প। জোরালো আলোয় দেখা যাচ্ছে যেন পুরোদমে চলছে খনি খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। খুব লম্বা একটা কনভেয়র বেল্টে কিছু একটা বস্তু তাগাড় করে ফেলছে রোবট খনিশ্রমিক। খোঁড়াখুঁড়িও করছে রোবট খনিশ্রমিক।

'ইন্টারেস্টিং।' বললেন প্রফেসর, বলেই সরে এলেন জ্বালামুখের কিনারা থেকে।

তার পরেই দৌড় দিলেন জ্বালামুখের ভেতর দিকের রাবিশ স্তূপের ওপর দিয়ে। হড়কে গিয়ে আছাড় খেলেন, পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে ফের দৌড় দিলেন। কে বলবে, মানুষটার বয়স হয়েছে যথেষ্ট। হিম্মৎ আছে বটে বুড়ো হাড়ে। আমি, পিংকি আর চাণক্য দৌড়োচ্ছি ওঁর পেছন পেছন। আমি দৌড়োচ্ছি লেংচে লেংচে। কেন না, একপাটি জুতো হারিয়েছে উড়ন্ত টুপির হামলার সময়ে। তাই একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম। আগ্নেয়গিরির একদম নীচে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখলাম, রোবটেরা যে জিনিস তাগাড় করছে কনভেয়র বেল্টে, সেই জিনিসেরই একটা নমুনা তুলছেন প্রফেসর।

'কী তুলছেন?' জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

'কিমবারলাইট।' বলেছিলেন উনি।

'মানে?'

'মানে অতি সোজা। এ জায়গায় পড়ে আছে রাশি রাশি হিরে। হিরের বিরাট স্তূপ।'

তুহিন-তমাল শ্বেত-প্রহেলিকা

॥ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে ॥

মুখ খুলতে বাধ্য হলাম। কারণ, বিজ্ঞানসাধকেরা আমার গায়ে-পড়া উপদেশ শুনতে নারাজ। কেন, তা বুঝছি না। জীবাশ্মশিকারিরা কুমেরু তছনছ করছে। সুপ্রাচীন তুহিনশিখর গলিয়ে দিচ্ছে, ধসিয়ে দিচ্ছে, ফুটো বানিয়ে বানিয়ে ঝাঁঝরা করে তুলছে। বারণ করেছিলাম কেন, তা অবশ্য বলিনি। কেউ বিশ্বাস করত না, উলটে হাসিঠাট্টার হুল্লোড় পড়ে যেত।

প্রকৃত ঘটনার উদ্‌ঘাটন যখন ঘটাব, তখন তার সত্যতা নিয়ে সংশয় অনিবার্যভাবে দেখা দেবেই। অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে।

বেশ কিছু ফটোগ্রাফ লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছি আজও। তার মধ্যে আছে অর্ডিনারি ফটোগ্রাফ আর আকাশ থেকে তোলা ফটোগ্রাফ। এই ফটোগুলো দেখলে অবিশ্বাসের অপনোদন ঘটবেই।

উদ্ভট অভিযান আমার বৈজ্ঞানিক জীবনে নতুন কিছু নয়। লোকে আমার নাম দিয়েছে 'পাগলা বৈজ্ঞানিক'। স্বকর্ণে না শুনলেও আভাসে ইংগিতে তা বুঝি। আমার নিত্যসহচর, অন্ধভক্ত এবং নির্বোধ— দীননাথ নাথ, আমার আপাত আজগুবি কাণ্ডকারখানা নিয়ে অনেক কিম্ভূত কাহিনি রচনা করেছে। ও মোটেই লেখক নয়— কিন্তু লেখার নেশা আছে। আর লেখকরা যখন নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় লেখে, তখন মাত্রা হারিয়ে ফেলে। মূল ঘটনাকে ছেড়ে ডালপালায় চলে গিয়ে।

তাই আমি এই লেখাটা নিজেই লিখতে বসেছি। মুখ যখন খুলেছি, তখন তা লেখার আকারে থাকা ভাল। মুখের কথার নড়চড় হয়। লেখা নড়ে না, পালটায় না।

কুমেরু নিয়ে আজকের দুনিয়ায় ভাবনা-চিন্তা, অভিযান করছে অনেক রথীমহারথী। সাধারণ মানুষও এখন কুমেরুর অনেক খবর রাখে। কিন্তু আমার মধ্যে কুমেরু নিয়ে অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল বীভৎস আর উদ্ভট রসের বিশ্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো-র পাঁচটা লাইন পড়বার পর। মাত্র পাঁচটা লাইনেই উনি বরফাবৃত কুমেরু অঞ্চলে একটা আগ্নেয়গিরির কথা লিখেছিলেন। যে আগুনপাহাড়ের গনগনে লাভাস্রোত গড়িয়ে নামছে বরফের ওপর দিয়ে। এই কল্প-কবিতা উনি লিখেছিলেন কুমেরুতে মাউন্ট এরেবাস

আবিষ্কারের সাত বছর পরে।

বরফ প্রদেশের অগ্নিগর্ভ এই পর্বত আমি দেখেছিলাম কুমেরুতে গিয়ে।

আমি, শ্রীহীন প্রফেসর, বিশ্রীনামের অধিকারী নাটবল্টু চক্র, পাড়ি জমিয়েছিলাম পাঁচখানা বিশেষ বিমান, শ্লেজ টেনে নিয়ে যাওয়ার মতন বিয়াল্লিশটা বাঘা কুকুর, জনাকয়েক সহযোগী, বিস্তর লোকলস্কর, আর অবশ্যই আমার প্রশংসায় মুখর চ্যালা দীননাথকে নিয়ে।

ও হ্যাঁ, গুলবাজ চাণক্য চাকলাদারকে বাদ দিতে পারিনি। হাওয়ায় খবর পেয়ে ও দৌড়ে এসেছিল। অবিশ্বাস্য অসম্ভব খবরটবর ও রাখে। চক্ষু ছানাবড়া করার মতন বহু অভিযানে আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করে ছেড়েছে, ও যা বলে, তার সবটাই ভাঁওতা নয়।

তুহিন তেপান্তরের চিরতুষার নাকি অনেক ভয়ানক ব্যাপার লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দিয়েছে— এমনি একটা বিকট বিশ্বাস অনেক দিন ধরেই ওর বিদঘুটে মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উৎপাত চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই ঠিক সময়ে হাজির হয়ে গেল এবং ছিনেজোঁকের মতন আমার সঙ্গে লেগে রইল।

এবার আসা যাক তুহিন তেপান্তরের কথায়।

॥ দুর্লভ শিহরনের দেশে ॥

সৃষ্টির শুরুতে প্রাণের রকমারি প্রকাশ যখন ঘটে চলেছে পৃথিবীময়, যখন সৃষ্টিকর্তা নিজেই লাখো লাখো এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু করেছেন এবং কোন সৃষ্টিটা রাখবেন আর কোন সৃষ্টিটা বাতিল করে দেবেন— সেই ধাঁধায় পড়েছেন, সেই সময়েরও আগের সময়ে যা যা সৃষ্টি হয়েছিল আর চাপা পড়ে আছে তুহিন তেপান্তরের চিরতুষার সাম্রাজ্যে লক্ষ কোটি বছর ধরে— আমার লক্ষ্য ছিল সেই সবের উদ্ধার।

আমি বলছি, ক্যামব্রিয়ান যুগের আগের কথা। যখনকার সৃষ্টিরহস্য আজও অজানা। তুষার-যবনিকা তুলে ধরলে এমন তথ্য জানা যাবে যা তামাম দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে ছাড়বে। বিস্ময় উপহার দেওয়ার জন্যেই যখন জন্মেছি, তখন এমন চরম বিস্ময়ের উদ্‌ঘাটন করব এই অভিযানে যে, সবুজ পৃথিবী বিস্ময়বাষ্পে আবিল হয়ে থাকবে বেশ কয়েকটা বছর।

তাই ঠিক করেছিলাম, যে কুমেরু ঋতুতে কুমেরু অভিযান সম্ভব, সেই ঋতুর সবটুকু সময় কাজে লাগিয়ে যতটা জায়গায় হানা দেওয়া যায়— দিয়ে যাব।

আমার মতলব ছিল, ঘন ঘন ক্যাম্প পালটে, বিশেষ বিমানের দৌলতে বিরাট অঞ্চল জুড়ে দ্রুত অভিযান চালিয়ে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগের এমন সব নমুনা-নিদর্শন আবিষ্কার করব, যা এতাবৎকাল কোনও অভিযাত্রীর নজরে আসেনি।

কুমেরু মহাদেশ একসময়ে নাতিশীতোষ্ণ, এমনকী নিরক্ষীয় অঞ্চলও ছিল, যখন সেখানে থুকথুক করছে অজস্র প্রজাতির উদ্ভিদ, পিলপিল করছে অগুনতি প্রজাতির জীবজন্তু—

যাদের ছিটেফোঁটা এখনও রয়ে গেছে উত্তর প্রান্তের বিবিধ শৈবাল, সামুদ্রিক উদ্ভিদ, প্রাণী, আর পেঙ্গুইনদের মধ্যে। এই ধারণাটা শুধু আমার নয়— বিজ্ঞান-জানা অনেক ব্যক্তিরই। এই আবছা বিশ্বাসটাকেই পূর্ণ বিশ্বাসে পরিণত করার জন্যে আমি ওখানে ড্রিল দিয়ে ফুটো করব, ফসিলের চিহ্ন দেখলেই ফুটোর মধ্যে ডিনামাইট ঢুকিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাব। উপযুক্ত সাইজের আর অবস্থার নমুনা না পেলে প্রমাণ করব কী করে যে, একদা এই তুহিন তেপান্তর আর বরফ পর্বতের দেশ ছিল না-ঠান্ডা না-গরম, অথবা প্রচণ্ড গরমের মহাদেশ।

পাথর অথবা পাথরের ওপরকার মাটি ফুটো না করলে নমুনা মিলবে না। অথচ এক মাইল থেকে দু-মাইল বরফ পুরু হয়ে জমে রয়েছে এই মাটি অথবা পাথরের ওপর। পাহাড়ি ঢালই একমাত্র সম্ভাব্য জায়গা যেখানে ঢালু জায়গায় অথবা খাদ্যের আনাচে-কানাচে জমে থাকে অতীতের রহস্যময় ফসিল। কিন্তু হিমবাহ ফুটো করা চাট্টিখানি কথা নয়। বিস্ফোরণ ঘটানো তো আরও বিপজ্জনক— একবার ধস নামলে আর রক্ষে নেই। তাই ভেবেছিলাম, বরফ গলিয়ে মাটি অথবা পাথর বের করে ফেলব। আমার এই অভিযানের পর কানাঘুষোয় শুনছি, ডাকাবুকো এক আমেরিকান অভিযাত্রী পয়সার শ্রাদ্ধ করবেন এবং আমি যা করেছি, তাই করতে যাবেন কুমেরুতে। আমার পদাঙ্ক অনুসরণ যেন না করেন— এই হুঁশিয়ারি পাঠিয়েছিলাম। কর্ণপাত করেননি।

অবিশ্বাস্য এই অভিযানের কিছু কিছু বেরিয়েছে কয়েকটা বিজ্ঞান পত্রিকায়— সেগুলো আমারই প্রতিবেদন, পাঠিয়েছিলাম কুমেরু থেকে। তাইতেই টনক নড়েছিল অনেকের।

বোস্টন বন্দর থেকে জাহাজে চেপে রওনা হওয়ার সময়ে কিছু পাবলিসিটি হয়েছিল খবরের কাগজে। অনেক নাকউঁচুরা বিদ্রুপের হাসি হেসেছিল। আমার এই কাহিনি যখন তাদের চোখে পড়বে, হাসি মিলিয়ে যাবে।

লোকালয়হীন অঞ্চল ছেড়ে আরও দক্ষিণে যত এগিয়েছি, সূর্য ততই আরও বেশি হেলতে শুরু করেছে উত্তরে। ৬২ ডিগ্রি সাউথ ল্যাটিচিউড অতিক্রম করার পর ভাসমান হিমশৈল দেখলাম সেই প্রথম। কুমেরু বৃত্ত পেরোনোর পর থেকেই জাহাজের সঙ্গে সংঘাত এড়ানো একটা দুর্ঘট ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

শিহরন জিনিসটা আজকাল সহজে পাওয়া মুশকিল। দুর্লভ বললেই চলে। দক্ষিণ মেরুর বিচিত্র আবহ সেই শিহরন একটু একটু করে জাগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের প্রত্যেকেরই অণু-পরমাণুতে। শুধু কি আবহ-বৈচিত্র্য— মরীচিকাসম দূরদৃশ্যও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বহুদূরের হিমশৈলগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন কল্পনাবহির্ভূত কসমিক কারাগারের বহিঃপ্রাচীর।

তারপর একদিন দুপুর নাগাদ শক্ত জমির আভাস দপদপিয়ে উঠল চোখের পর্দায়। সেই মুহূর্তে সত্যিই আমরা সকলেই অল্পবিস্তর শিউরে উঠেছিলাম দূরবিস্তৃত তুষারাবৃত শৈলশ্রেণি দেখে।

অজানা মহাদেশের সানুদেশে এসে গেলাম তা হলে। এই সেই মহাদেশ যার সর্বঅবয়বে লিখিত রয়েছে বরফে জমে গিয়ে মৃত্যুর সাংকেতিক লিপি। এই সেই বিখ্যাত অ্যাডমিরালটি রেঞ্জ— আবিষ্কার করেছিলেন রস। এখান থেকেই শুরু হল আমাদের দুর্গমতর অভিযান

এরেবাস আগ্নেয়গিরির দিকে।

জলপথে অভিযান যেদিন বন্ধ করতে বাধ্য হলাম, সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। টানা লম্বা উঁচু বরফের প্রাচীর চলে গেছে পুবদিকে দৃষ্টিসীমার বাইরে। খাড়াইভাবে উঠে যাওয়া প্রায় দুশো ফুট উঁচু বরফ পাঁচিল। নোঙর ফেলতে ফেলতেই দেখলাম, গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে মাউন্ট এরেবাসের মুখ দিয়ে। প্রায় বারো হাজার সাতশো ফুট হাইটের এই আগ্নেয়পাহাড় মনে করিয়ে দেয় জাপানের পবিত্র পাহাড় ফুজিয়ামা-চিত্র।

এরেবাসের পরেই আকাশপথে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মতন সাদা মাউন্ট টেরর— আতঙ্ক-পাহাড়। দশ হাজার নশো ফুট উঁচু। আগে ছিল ভলক্যানো— এখন তা মৃত।

মাউন্ট এরেবাসের মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল দমকে দমকে— কিছুক্ষণ অন্তর। একটু জিরেন দিয়ে, একটু দম নিয়ে ভুস ভুস করে ধোঁয়া বমি করছে যেন।

আমি কবি নই, লেখক নই— কাঠখোট্টা বৈজ্ঞানিক। কিন্তু ভয়-রসের বর্ণনা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে যেখানে, সেখানে এসে ভয়াচ্ছন্ন চোখে কিম্ভূতকিমাকার পেঙ্গুইনদের দিকে না তাকিয়েও পারিনি। লাখো লাখো পেঙ্গুইন কর্কশ আওয়াজ ছেড়ে ডানা ঝাপটাচ্ছিল সুউচ্চ বরফপ্রাচীরের ওপর। পাশের জলে দেখা যাচ্ছিল স্থূলকায় সীল মাছ ভাসমান অবস্থায়, অথবা কেকসদৃশ বড় বড় ভাসমান বরফচাঙড়ের ওপর শায়িত অবস্থায়।

মধ্য রাতের একটু পরেই নৌকোয় চেপে নেমেছিলাম রস আয়ল্যান্ডে। ক্যাম্প রচনা করেছিলাম আগুনপাহাড়ের ঢালে— সাময়িক আস্তানা। হেডকোয়ার্টার ছিল জাহাজে। মালপত্র নামিয়ে নিয়েছিলাম ক্যাম্পের পাশেই। গ্রীষ্ম থাকতে থাকতেই অভিযান সাঙ্গ করার পরিকল্পনা ছিল। মহাদেশের যেখানেই থাকি না কেন, খবর পাঠাব জাহাজে— জাহাজ থেকে পরিস্থিতি বুঝে রিপোর্ট পাঠাবে আমেরিকার সদর দপ্তরে— যাঁদের টাকায় দুঃসাহসিক এই অভিযান করতে পারছি।

পাঁচটা বিশেষ বিমান-এর পার্টস নিয়ে গিয়ে ফেলেছিলাম ক্যাম্পে। তারপর পার্টস জুড়ে তৈরি হয়েছিল পাঁচ-পাঁচটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল আকাশযান। একটা রেখে গেছিলাম ক্যাম্পে— জরুরি অবস্থায় যাতে কাজে লাগে। বাকি চারখানায় চেপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীভাবে উড়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম প্রকৃত কুমেরু মহাদেশে— সে প্রতিবেদন বেশ কয়েকটা কিস্তিতে বেরিয়েছে সায়েন্স জার্নালে। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

এই গ্লেসিয়ারের ওপর ক্যাম্প বানিয়েছিলাম বিস্তর মেহনতের পর। ড্রিল চালিয়ে পাথর ফুটো করে নমুনা সংগ্রহ করার কাজ আরম্ভ করেছিলাম প্রথম ক্যাম্প পাতবার পর। এখানেও সেই প্রচেষ্টা রইল অব্যাহত। মাউন্ট নানসেন পর্বতে উঠতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গেছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট ওপরে পৌঁছে ড্রিল চালিয়ে দেখেছিলাম, শক্ত পাথর রয়েছে মাত্র বারো ফুট বরফ আর তুষারের তলায়। বরফ গলিয়ে ফুটো বানিয়েছিলাম, ডিনামাইট চার্জ করেছিলাম এমন কয়েকটা জায়গায় যেখানে ইতিপূর্বে কোনও অভিযাত্রী খনিজ নমুনা সংগ্রহের কল্পনা মাথাতে আনতে পারেনি। পেয়েছিলাম প্রাক্-ক্যামব্রিয়ান

গ্র্যানাইট পাথর আর বালিপাথর। প্রমাণিত হয়ে গেছিল আমার অনুমিতি— এককালে এই অঞ্চলে সবরকম পদার্থ মিলেমিশে ছিল।

কিছু বালিপাথর বাটালি দিয়ে চেঁছে দেখে নিয়েছিলাম কত অদ্ভুত রকমের ফসিল আর ভাঙাচোরা টুকরো রয়েছে ভেতরে। পেয়েছিলাম ফার্ন, সামুদ্রিক উদ্ভিদ, শামুক এবং এমন অনেক প্রাণীর জীবাশ্ম, যাদের উদর ছিল এককালে। অজানা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস একটু একটু করে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল এইভাবে।

এইসঙ্গে পেয়েছিলাম প্রায় এক ফুট ব্যাসের ত্রিভুজাকৃতি খাঁজকাটা অদ্ভুত ছাপ। শ্লেট পাথরের টুকরোয় ছিল এই চিহ্ন। আমার জীববিজ্ঞানের জ্ঞান নড়ে উঠেছিল এই চিহ্ন দেখে। শ্লেট পাথর পরবর্তীকালে ঢেউ খেলে গেছে— চিহ্নটা বিকৃত আকার ধারণ করেছে। তা সত্ত্বেও খটকা লেগেছিল মনের মধ্যে। পায়ের ছাপ নাকি? ত্রিভুজ আকারের? সে কীরকম প্রাণী?

এরপর একদিন আমরা বিশেষ বিমানে চেপে সরাসরি উড়ে গেলাম কুমেরু বিন্দুর ওপর দিয়ে। দেখলাম দক্ষিণ মেরুর মহাকায় মরীচিকার পর মরীচিকা, বহুদূরের পর্বতমালা আকাশে ভাসছে মায়াময় মহানগরীর মতন, কখনও গোটা শ্বেত মহাদেশ রং পালটে পালটে সোনা, রুপো, রক্ত রঙের স্বপ্নের দেশ হয়ে যাচ্ছে মধ্য রাতের দিগন্তছোঁয়া সূর্যকিরণের ম্যাজিকে।

এই করতে করতেই গ্রীষ্মের অর্ধেক ফুরিয়ে গেল। ত্রিভুজাকৃতি পদচিহ্নর মতন ছাপ যেখানে পেয়েছিলাম, মন আটকে রইল সেই জায়গায়। ওখানে এমন ফসিল আর পাথর পেয়েছিলাম, যা টনক নড়িয়ে ছাড়ে। সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছিল ত্রিভুজ আকারের ওই পায়ের ছাপ— অবশ্যই কোনও প্রাণীর পায়ের ছাপ। প্রাক্-ক্যামব্রিয়ান যুগের বলেই তো মনে হয়। তারও আগের অথবা পরের সময়েরই হতে পারে। তবে হ্যাঁ, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জেনেছি পায়ের ছাপ যার তার ধীশক্তি নিশ্চয় যথেষ্ট উন্নত মানের ছিল— কেননা বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে অনেক অগ্রসর হলে তবে এমনি পায়ের অধিকারী হওয়া যায়।

বয়স নিয়ে আমাদের আনুমানিক হিসেবটা আরও চাঞ্চল্যকর। পঞ্চাশ থেকে একশো কোটি বছর আগে কোনও এক সময়ে এই পদচিহ্ন আঁকা হয়েছিল কুমেরুর বুকে।

॥ প্রলয়ঙ্কর শ্বেত-প্রহেলিকা ॥

আমার আর তর সইছিল না। বিশেষ করে দীননাথ আর চাণক্য আঠার মতন আমার পেছনে লেগে থাকায় আমিও স্থির থাকতে পারছিলাম না। মনুষ্য পদচিহ্ন আজও যেসব জায়গায় পড়েনি, মানুষ যেসব জায়গার দৃশ্য কল্পনাতেও আনতে পারে না সেই সব জায়গায় তেড়ে যাওয়ার অভিলাষে আমরা তিনজনে এমন গোঁয়ার হয়ে গেছিলাম যে কারও হুঁশিয়ারিতে কান দিইনি। অজানাকে জানার নেশা এমনই।

ক্যাম্প থেকে প্রায় তিনশো মাইল দুরে পাথর ড্রিল করেছিলাম। ডিনামাইট ফাটিয়েছিলাম। ত্রিভুজাকৃতি পদচিহ্নর মতন ছাপ আবার পেয়েছিলাম শ্লেট পাথরের গায়ে। হেঁয়ালি তাতে আরও বেড়েছিল। বেড়েছিল আমাদের জেদ।

ঝড়ের দাপট শুরু হয়েছিল ঠিক তার পরেই। প্রলয়ংকর সেই ঝড়ের কাছে মেদিনীপুরের টর্নেডো ঝড় কিছুই নয়। হাওয়া যখন খেপে যায়, তখন মস্ত ভারী জিনিসকেও যে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘুরপাক খাইয়ে বহুদূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। এ দৃশ্য যে না দেখেছে, সে বিশ্বাস করবে না। আমরা অবশ্য অক্ষত রইলাম। কারণ, আমরা তৈরি ছিলাম। হিমশৈল ঘুরপাক খেয়ে শূন্যে ধেয়ে যাচ্ছে দেখতে ভালই লেগেছিল।

প্রলয়ংকর শ্বেত প্রহেলিকা তাণ্ডবনাচ মাঝে মাঝে যখন থামিয়েছে দম নেওয়ার জন্যে, সেই ফাঁকে দেখে নিয়েছি অতি বিশাল পাহাড়ের পর পাহাড়— হিমালয় পাহাড়ের সমান। সবসময়ে কুহেলী সমাচ্ছন্ন থাকায় পাহাড়গুলো যে হিমালয়প্রতিম, তা বোঝা যায়নি। ঝড় যখন কুয়াশা উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তখনই দেখেছি মহাকায় পর্বতদের করাল রূপ।

এই রকমই একটা পাহাড়ের গায়ে বিমান নামাতে বাধ্য হয়েছিলাম। ঝড়ের সঙ্গে টক্কর দিতে গেলে একটু চোট তো খেতেই হবে। বিমান মেরামতের কাজ যখন চলছে, তখন স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছি টাইটানিক পর্বতের দিকে। ফ্যানট্যাসটিক। কোনও ভাষা দিয়ে সেই বিরাট মহান ভয়ানককে ফুটিয়ে তুলতে পারব না।

ভাঙা বিমানের মালপত্র অন্য বিমানে সরিয়ে নিলাম। তারপর আর একটা বিমানে চেপে আমরা তিনমূর্তি ছোট ছোট ব্যোম-বিচরণ শুরু করলাম।

শিখরগুলোর উচ্চতা তখনই আঁচ করতে পারলাম। বিশ্বাস হবে না জানি, তবুও লিখছি। সবচেয়ে উঁচু শিখরটা পঁয়ত্রিশ হাজার ফুটেরও বেশি। এভারেস্ট হার মেনে যায়!

॥ হিমালয় হার মেনে যায় ॥

বড় শিখরগুলোয় ওঠবার সাহস দেখাইনি বিশ্রী বিকট এই আবহাওয়ায়। বেছে নিয়েছিলাম একুশ হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড়কে। আশপাশের পাহাড়গুলোর উচ্চতাও মোটামুটি একই।

পাহাড়গুলোর ওপরের অংশ যেন হালকা রঙের পাথর দিয়ে গড়া। এমন পাথর কখনও দেখিনি। পাথুরে স্তর এত হালকা রঙের তো হয় না; তবে কি ক্রিস্ট্যাল পাথরে তৈরি হয়েছে অগুনতি কিউবাকৃতি চাঙড়?

বিস্ময়ের এখনও বাকি আছে। বিমান খুব কাছে নিয়ে গিয়ে দেখেছি, বিস্তর গুহামুখ। কোনওটার প্রবেশপথ দিব্বি চৌকোনা, কোনওটার অর্ধচন্দ্রাকার— এস্কিমোদের বরফগৃহ ইগলুর প্রবেশপথ যেমন হয়।

একটা পাহাড়ের চুড়ো ঘিরে চৌকোনা আর খাড়াই প্রাকারও দেখেছি— যেমন থাকে কেল্লাপ্রাসাদের চারদিকে। তাজ্জব হয়েছি। তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় এ কী প্রকৃতির নিছক লীলাখেলা, না অন্য কিছু?

বিমান নিয়ে অত উঁচুতে ঝড়ের দাপট ঠেলে যেতে সাহস পাইনি— তাই কাছ থেকে বিচিত্র প্রাকারগুলো দেখবার সুযোগ পাইনি। তবে একুশ হাজার ফুট উঁচুতে এসেই কান ফেটে যাচ্ছে অদ্ভুত গোঙানির আওয়াজে। ছুরির মতন ধারালো বাতাস পাহাড়ের অলিগলি দিয়ে শনশন নিনাদে ছুটে যাচ্ছে— গুহামুখে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। গুম্‌গুম্‌ শনশন শব্দ কখনও কখনও বজ্রনিনাদে ফেটে পড়ছে।

বিমান নামিয়ে এসেছিলাম ক্যাম্প এলাকায়, এখানের বরফস্তর বেশ পাতলা। ম্যাজেস্টিক সিন-সিনারি দেখবার উপযুক্ত জায়গা।

ভেবেছিলাম এখান থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ কোটি বছর আগেকার নমুনা উদ্ধার করতে পারব। কিন্তু এই পাথুরে স্তরে ত্রিভুজাকৃতি পদচিহ্ন তো মিলবে না— অতিকায় পাহাড়দের ভেতরেই যেতে হবে। নামতে হবে খাদের মধ্যে।

কিন্তু একটু-আধটু খোঁড়াখুঁড়ি না করে যেতেও মন চাইছে না। তাই ক্যাম্প থেকে সিকি মাইল দূরে নরম পাথরে ড্রিলিং অপারেশন শুরু করলাম। চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারটা ঘটে গেল তারপরেই।

পেলাম একটা গুহা। গর্ত করার প্রথম দিকে পেয়েছিলাম নানারকম জীবাশ্ম। প্রবাল স্পঞ্জ সামুদ্রিক মেরুদণ্ডী প্রাণীর হাড়, আরও অনেক কিছু। হাঙরের হাড় বলেই তো মনে হল। এই জাতীয় হাড় এই অভিযানে কপালে জুটল এই প্রথম। উত্তেজনা বেড়ে গেছিল এই কারণেই। তারপরেই ফাটানো হল ডিনামাইট। পাওয়া গেল গুহামুখ।

পাতাল প্রহেলিকার গোপন প্রবেশপথ দেখে আমরা তো হতবাক। ফেটে পড়েছিলাম সোল্লাসে তৎক্ষণাৎ।

গুহার মুখ এবড়ো-খেবড়ো— ব্যাস প্রায় পাঁচ ফুট। ভেতরের চুনাপাথর ক্ষয়ে গিয়ে গহ্বর সৃষ্টি করেছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জল বয়ে যাওয়ায় চুনাপাথর তো ক্ষইবেই। সুদূর অতীতের জলধারা নিশ্চয় ভীমবেগে প্রপাতের আকারে আছড়ে পড়ে চুনাপাথর ক্ষইয়ে বানিয়ে দিয়েছে প্রাকৃতিক গুহা।

গর্তটা গভীরতায় সাত-আট ফুটের বেশি নয়, কিন্তু ছড়িয়ে গেছে নানান দিকে— গোলকধাঁধার মতন। গর্তের মুখ দিয়ে হু হু করে বয়ে আসছিল টাটকা বাতাস। যা প্রমাণ করে দিচ্ছে, এই গর্তের গোলকধাঁধা পাতালে শাখাপ্রশাখা মেলে ধরলেও বাইরের বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। পাতালসুড়ঙ্গে নেমে গিয়ে দেখেছিলাম, ছাদ থেকে ঝুলছে বড় বড় বরফের ঝুরি। শুধু ঝুলছে নয়, কয়েক জায়গায় বরফস্তম্ভ রচনা করেছে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত।

নয়নমনোহর দৃশ্য নিঃসন্দেহে, আমরা কিন্তু আনন্দে নেচে উঠেছিলাম অন্য কারণে। রাশিকৃত শামুকের খোলা আর রকমারি হাড় পড়ে রয়েছে গুহার মুখে। প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য থেকে ধুয়ে নেমে এসেছে এইসব জঞ্জাল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে— আমাদের কাছে এখন তা অমূল্য রত্ন। কী নেই এদের মধ্যে? সাপ, পাখি, উভচর, মাছ, শামুক, বর্মধারী প্রাণী— এমনকী ছোটবড় স্তন্যপায়ী জীব। চেনা আর অচেনা।

এরপর আমরা পেয়েছিলাম করোটিখণ্ড, ডাইনোসরের শিরদাঁড়ার হাড়, টেরোড্যাকটিলের

দাঁত আর ডানার হাড়। চমৎকৃত হয়েছিলাম বহু অতীত যুগের হাঙরের দাঁত পেয়ে, সেইসঙ্গে দেখেছিলাম আদিম পাখির করোটি। প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপদের কঙ্কালও পেয়েছিলাম। জুরাসিক যুগের সেইসব পৃথিবীকাঁপানো আতঙ্কদের প্রায় সবারই কঙ্কাল অথবা হাড় পেয়েছিলাম পাতাল বিবরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

অবাক কাণ্ড এই যে, এত বছর আগেকার প্রাণী-দেহাবশেষের সঙ্গেই এমনসব প্রাণী দেহাবশেষ পেয়েছি ওখানে যা তিন কোটি বছর আগেকার। ধাঁধাটা এইখানেই। প্রায় পাঁচহাজার কোটি বছর আগে বরফযুগ ঢেকে দিয়েছিল যেখানকার সবকিছু, সেখানে তিন কোটি বছর আগেকার প্রাণী-দেহাবশেষ সহাবস্থান করে কী করে?

আমরা যেন পাগল হয়ে গেছিলাম এরপর থেকেই। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেছি, অন্বেষণ করেছি আরও দুর্লভ, আরও দুষ্প্রাপ্য নমুনা— যা মাথা ঘুরিয়ে দেবে তাবৎ বিজ্ঞানীমহলের।

পেয়েছিও বটে। শ্লেটপাথরে আঁকা ত্রিভুজাকৃতি বিদঘুটে পদচিহ্ন একাধিকবার।

তাই বুক ঠুকে বলতে পারছি, গণিত আর পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইন যা, কুমেরু অভিযানে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও ঠিক তাই!

মহাপ্রশ্নটা কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে— এহেন কিমাশ্চর্যম্ প্রাণী-বিবর্তন সংঘটিত হল কখন, কোথায়, কীভাবে?

॥ ডায়েরি লিখছেন প্রফেসর ॥

স্থলচর আর জলচর কিছু প্রাণীর করোটিতে অদ্ভুত ছেঁদা দেখে তাজ্জব হয়েছি। শুধু মাথার খুলি নয়, হাড়গোড়েও চোট রয়েছে— যেন মাংসাশী প্রাণীর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অক্কা পেয়েছে।

সোপস্টোনের একটা টুকরো পেয়েছি। অদ্ভুত জিনিস। ব্যাস ছ'ইঞ্চি, দেড় ইঞ্চি পুরু। রং সবুজ। এ অঞ্চলের জিনিস নয় নিশ্চয়। কত বছরের প্রাচীন, তাও আন্দাজ করতে পারছি না। আশ্চর্য রকমের মসৃণ। নিখুঁত গড়নের যেন একটা নক্ষত্র। পাঁচটা ডগা একটু একটু ভেঙে গেছে।

কৌতূহল তীব্রতর হয়েছে দুটি ব্যাপারে। এ জিনিস এল কোত্থেকে? এরকম অদ্ভুতভাবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেল কীভাবে?

আতসকাচের নীচে রেখে দেখেছি আরও খানকয়েক বিচিত্র কাটাকুটি দাগ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জল, ঝড়ের দাপাদাপির পরিণামে এমন দাগ হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। পিপে আকৃতির পৈশাচিক জীবাশ্ম পাওয়া গেছে পাতাল-গর্ভে। খুব সম্ভব উদ্ভিদ। খনিজ লবণই এতকাল অবিকৃত রেখেছে এই নমুনাকে। পশুচামড়ার মতন মজবুত, কিন্তু জায়গায় জায়গায় আশ্চর্য রকমের নমনীয়। পাশের দিকে আর প্রান্তসীমায় ভেঙে খসে যাওয়ার চিহ্ন। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বায় ছ'ফুট, মাঝের

ব্যাস সাড়ে তিন ফুট, দু'দিকের প্রান্তসীমায় সরু হয়ে গিয়ে ঠেকেছে এক ফুটে। পিপের গায়ে যেমন লম্বালম্বি লোহার পাত থাকে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত— এর গায়ে তেমনি রয়েছে পাঁচটা ঠেলে ওঠা আল। এই পাঁচটা ঠেলে ওঠা দেহাংশের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে সরু সরু শুঁড়। দুটো আলের মাঝের অংশে খাড়ির মতন দেবে রয়েছে। চিরুনি বা ডানার মতন বিচিত্র প্রত্যঙ্গ— যা ভাঁজ করে মুড়ে রাখা যায়, অথবা পাখার মতন মেলে ধরা যায়। সবই বেশ জখম অবস্থায়— একটা ছাড়া। এটার ডানা ছড়িয়ে যায় সাত ফুট পর্যন্ত। সুদূর অতীতের রক্তজমানো কিংবদন্তিতে বর্ণিত দুঃস্বপ্নের দানব বললেই চলে। 'নেকরোনোমিকন' কেতাবে এই জাতীয় বিভীষিকার বর্ণনা আছে।

ক্যাম্পে ফিরেই কেটেকুটে দেখতে হবে। উদ্ভিদ, না, জীব— বুঝতে পারছি না। অনেকগুলো প্রত্যঙ্গ নিঃসন্দেহে অতি-আদিম যুগের। সবাই মিলে আরও নমুনার সন্ধানে আছি।

আমাকে দিয়ে ডায়েরি লেখাচ্ছে দীননাথ আর চাণক্য। খাটছে ওরাই— পাগলের মতন। আরও হাড় মিলছে— তা নিয়ে এখন কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। কুকুরগুলো বড় ঝামেলা জুড়েছে। নয়া নমুনাকে বরদাস্ত করতে পারছে না। দূরে বেঁধে রেখেছি। নইলে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে নমুনা।

ইমপরট্যান্ট। পিপে আকৃতির অদ্ভুত নমুনার একাধিক প্রিন্ট রয়েছে পাথরে। গুহামুখ থেকে চল্লিশ ফুট দূরে গাদাগাদি অবস্থায় তেরোটা পিপেসদৃশ কিম্ভূত নমুনা পাওয়া গেছে। এদের মধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অদ্ভুত সেই তারকা আকারের সোপস্টোন দিয়ে গড়া সবুজ জিনিস— কয়েকটা জায়গা ছাড়া বিশেষ ভাঙচুর অবস্থায় নেই।

সবকটা নমুনা জৈব— অরগ্যানিক। উদ্ভিজ্জ নয় মোটেই। বেশ নিখুঁত অবস্থায় রয়েছে। গুহার ভেতর থেকে তুলে এনেছি বাইরে। কুকুরদের দূরে ঠেকিয়ে রাখতে হচ্ছে। অদ্ভুত নমুনাগুলোকে একদম সইতে পারছে না।

প্রত্যেকটা নমুনা লম্বায় আট ফুট। পিপে-ধড়ের দৈর্ঘ্য ছ'ফুট। লম্বালম্বি পাঁচটা খাঁজ— ঠিক মাঝখানের ব্যাস সাড়ে তিন ফুট। শেষের দুই প্রান্তের ব্যাস এক ফুট করে। রং কালচে ধূসর, নমনীয়। দুই খাঁজের মাঝখানকার খাড়ির ভেতর থেকে ডানা বেরিয়ে এসে মেলে ধরে। ডানার ডগায় ফুটো আছে।

পিপে-ধড়ের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পাঁচগুচ্ছ শুঁড় আছে খুব টাইট করে ভাঁজ করা অবস্থায়। ভাঁজ খুলে মেলে ধরলে চার ফুটের একটু বেশি ছড়িয়ে যায়। আদিম অক্টোপাসের বাহুর মতন। এক-একটা শুঁড়ের ব্যাস তিন ইঞ্চি; ছ'ইঞ্চি পর্যন্ত গিয়ে পাঁচটা আঙুলের মতন শাখা মেলে ধরেছে। প্রত্যেকটা বাহুশুঁড়ে রয়েছে শাখা-প্রশাখা মিলিয়ে মোট পঁচিশটা কিলবিলে সরু শুঁড়।

ধড়ের মাথায় রয়েছে ভোঁতা, গোদা, ঘাড়— হালকা ধূসর রং— তার গায়ে কানকোর মতন প্রত্যঙ্গ। স্টারফিশের মতন পাঁচটা হলদেটে পয়েন্ট।

তারকা-গড়নের মাথা পুরু আর ফোলা। এক পয়েন্ট থেকে আর এক পয়েন্ট পাক্কা দু'ফুট। প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে বেরিয়েছে তিন ইঞ্চি লম্বা হলদেটে নমনীয় টিউব। টিউবের

ডগার একটু আগে সামান্য চেরা— বোধহয় নিশ্বাস নেওয়ার প্রত্যঙ্গ।

মুখবিবরের ব্যাস বড় জোর দু'ইঞ্চি— ভেতরে সারি সারি সাদা চোখা দাঁত।

পিপে-ধড়ের তলায় চার ফুট লম্বা পেশি ঠাসা মজবুত পা রয়েছে। এই পায়ের ব্যাস গোড়ার দিকে সাত ইঞ্চি, আগার দিকে পয়েন্টে পৌঁছে হয়ে গেছে আড়াই ইঞ্চি। প্রত্যেকটা পয়েন্টে লেগে রয়েছে সবুজ রঙের পাঁচ শিরাওলা তেকোনা ঝিল্লি।

এই হল গিয়ে কিম্ভূত জীবের পদযুগল— ত্রিভুজাকৃতি পা অথবা পাখনা অথবা প্যাডেল— যার ছাপ আমরা শ্লেটপাথরে দেখে এসেছি।

উদ্ভিদজগতের, না, জীবজগতের— এখনও নির্ণয় করে উঠতে পারলাম না। তবে, গায়ের গন্ধটা পশুদের গায়ের গন্ধের মতন।

অতি পুরাকালের করালতম কিংবদন্তি কাহিনির উৎকট উৎপাতদের সঙ্গে এই নারকীয় নমুনার সাদৃশ্য আছে। ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। 'টাফ' বলেই 'ড্যামেজ' হয়েছে কম। অবিকৃত থাকাটাও স্রেফ অলৌকিক ব্যাপার— নিশ্চয় চুনাপাথরের কৃপায়। আরও নমুনাসংগ্রহের ফিকিরে আছি। যে চোদ্দোটা 'অতিকায়' রহস্য পেয়ে গেছি, কুকুরদের কামড় থেকে এইগুলোকেই টিকিয়ে রাখতে হবে যেভাবেই হোক। একটাকে কেটেকুটে দেখতেই হবে।

কালঘাম ছুটে গেল এই চোদ্দোটা 'অতিকায়'কে ক্যাম্পে নিয়ে আসতে। আয়তনের অনুপাতে বেজায় গুরুভার।

যে নমুনাটাকে কাটাকুটি করেছি, তার শক্ত চামড়া নরম করবার জন্যে আগুনে তাতাতে হয়েছে। টিস্যু, চামড়া আর পেশি লোহার তারের মতন নমনীয় অথচ ছুরি ঠিকরে দেয়। জোর করে ছুরি চালিয়ে পাছে ভাল নমুনা নষ্ট করে ফেলি, তাই বেছে নিয়েছি এমন একটা নমুনা, যেটা বেশ 'ড্যামেজড্' হয়েছে। পিপে-ধড়ের দুদিকের স্টারফিশ গড়ন রীতিমতো নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আলের মতন উঁচু উঁচু পৃষ্ঠদেশ তেমন নষ্ট হয়নি।

কাটাকুটির রেজাল্ট মুণ্ড আরও ঘুরিয়ে দিয়েছে। টিস্যু কেটে যা দেখেছি, তা স্তম্ভিত আর শিহরিত করার পক্ষে যথেষ্ট। জীববিজ্ঞান নতুন করে শিখতে হবে দেখছি। কোষবিজ্ঞান দিয়ে সৃষ্টিছাড়া এই নমুনার সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করা সাধ্যাতীত। কমপক্ষে চল্লিশ কোটি বছর বয়স সত্ত্বেও এর ভেতরকার দেহাংশ বিলকুল অটুট। 'জিনিস'টাকে গড়াই হয়েছে এমনভাবে যে কস্মিনকালেও এর পশুবৎ চর্মাচ্ছাদিত দেহসংস্থান বিকৃত হবে না। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এই জাতীয় ক্রমবিবর্তন যে সম্ভবপর, তা এক্কেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হত যদি না এই অত্যদ্ভুত 'জিনিস'টাকে স্বহস্তে কাটাকুটি করতাম।

গরমে যতই নরম হয়েছে বস্তুটা, ততই অসহ্য দুর্গন্ধ নির্গত হয়েছে এর সর্ব অবয়ব থেকে। অবিকৃত অংশ থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘন, গাঢ় সবুজ তরল পদার্থ— যাকে রক্ত বলা যায় না— কিন্তু বাহ্যত রক্তের যা কাজ, সেই কাজই করছে অথবা করেছে। বিকট, উৎকট, বমনকারী এই অবর্ণনীয় দুর্গন্ধ দূরের কুকুরগুলোকেও ক্ষিপ্ত করেছে— তাদের হাঁকডাকে তুহিন তেপান্তরের আকাশ-বাতাস ফালাফালা হয়ে গেছে। বরফপাঁচিল তুলে

তাদের অতি কষ্টে এদিকে ধেয়ে আসা বন্ধ করতে হয়েছে।

কাটাছেঁড়া করে রহস্যময় এই সত্তার গভীরে প্রবেশ করতে পারব ভেবেছিলাম, কিন্তু আদতে হল তার বিপরীত। রহস্য আরও তিমিরাচ্ছন্ন হয়েছে। বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে যা যা অনুমান করেছিলাম, সেসবই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু সেইসব প্রমাণের ভিত্তিতে এই 'জিনিস'কে জীব বলা যায় না কোনও মতেই। আভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান প্রায় সবই উদ্ভিজ্জ শ্রেণির— ফলে, আমাদের সকলেরই মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে। এর পাচনক্রিয়া আছে, রক্তসংবহন তন্ত্র আছে, বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেওয়ার পদ্ধতিও আছে।

সব চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এর শ্বাসযন্ত্র। কার্বন ডাইঅক্সাইড নয়— অক্সিজেন নিয়ে শরীর ঠিক রাখে। বাতাস জমিয়ে রাখার চেম্বারও আছে শরীরের মধ্যে। এই সঙ্গে আছে শ্বাসপ্রশ্বাসের বিকল্প ব্যবস্থা। বাইরের দিকের ছোট ছেঁদা দিয়ে শ্বাসক্রিয়া স্থগিত রেখে সেই কাজ চালিয়ে নিতে পারে কানকো আর লোমকূপ মারফত। ভাবা যায়?

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, 'জিনিস'টা শুধু উভচরই ছিল না, প্রয়োজন দেখা দিলে বাতাসহীন জায়গায় সুদীর্ঘ ঘাপটি-ঘুমেও অভ্যস্ত ছিল।

স্নায়ুতন্ত্র অতীব জটিল। অত্যুন্নত। যদিও কিছু ব্যাপারে অতিরিক্ত মাত্রায় আদিম, দেখলেও গা শিরশির করে। এত আদিমতা সত্ত্বেও নার্ভসেন্টার জাতীয় কয়েকটা স্নায়ুগ্রন্থিকেন্দ্র রয়েছে। তাদের মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থাও রয়েছে।

বিস্ময়করভাবে উন্নত পাঁচভাগে ভাগ করা এর মগজ। সংজ্ঞাবহ ব্যবস্থা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহনক্ষম ব্যবস্থাও রয়েছে। মাথার কয়েকটা অংশে অতি সূক্ষ্ম রোমের মাধ্যমে চলেছে অনুভূতি লেনদেনের আদিম প্রক্রিয়া। আদিম না বলে অপার্থিব বলা উচিত; কেননা, এরকম ব্যবস্থা পার্থিব কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

এ যুগের পিঁপড়ে অথবা মৌমাছিরা যেরকম পরিপাটি সব কাজের ব্যাপারে— এরাও ছিল প্রায় তাই। অথবা তার চাইতেও বেশি। অপুষ্পক উদ্ভিদ যেভাবে বীজকণা বা সূক্ষ্মবীজ মারফত এক থেকে বহু হয়— এরাও নিশ্চয় সেই পদ্ধতিতে বংশ বাড়িয়েছে। এদের বীজকণা বেরিয়েছে ডানার ডগার খুদে ফুটো দিয়ে।

এই মুহূর্তে এদের নামকরণ করতে যাওয়াটা হবে নিছক আহাম্মুকি। এর কিছুটা উদ্ভিজ্জ, কিন্তু চারভাগের তিনভাগ প্রাণীদের মতন— কাঠামোর দিক দিয়ে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমতা দেখে বেশ বোঝা যায় সমুদ্রই ছিল এর ঘরবাড়ি; অথবা সমুদ্রই একে প্রথমে সৃষ্টি করেছে। অথচ ডানা দেখে তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গগন বিচরণ ছিল এর কাছে ছেলেখেলা। হেঁয়ালিটা তো সেইখানেই। ধরণী যখন আঁতুড় অবস্থায়, তখন এহেন অত্যুন্নত প্রাণী সৃষ্টি হল কখন? কীভাবে?

চাণক্য অবশ্য ঘ্যানর ঘ্যানর করে একটাই সূত্র আমার মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করছে। দানিকেন প্রমুখ মহাশয় ব্যক্তিরা বাজে কথা লেখেননি। পৃথিবী যখন আঁতুড়ঘরে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে, তখন বহির্বিশ্ব থেকে, অত্যুন্নত নক্ষত্রলোক থেকে ধীমান জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা ধরিত্রীর অপদার্থ সৃষ্টিদের দেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসে আবোল-তাবোল সৃষ্টি করেছিল স্রেফ টিটকিরি দেওয়ার জন্যে। সেইসঙ্গে প্রকৃত প্রাণীর কিছু কিছু নমুনাও গড়ে দিয়ে গেছিল— নিজেদের আদলে।

অর্থাৎ ও বলতে চায়, চমকপ্রদ আবোল-তাবোল প্রাণী ভিনগ্রহীদের ছেলেখেলা ছাড়া কিছুই নয়!

এই বিশ্বাস নিয়েই চাণক্য বলতে চাইছে, প্রাক্-ক্যামব্রীয় যুগে যে প্রিন্ট পড়েছিল পাথরে, সে প্রিন্ট রচনা করেছে এই আবোল-তাবোল প্রাণীর কম-উন্নত কোনও এক পূর্বপুরুষ।

দীননাথ তখন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বলেছিল, প্রাক-ক্যামব্রীয় যুগের যেসব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাদের গঠনকাঠামো এত বেশি উন্নত যে চাণক্যর যুক্তি ধোপে টেঁকে না।

দীননাথ নেহাত বাজে কথা বলেনি। উপ-পা-এর সাইজ তো কমে গেছে— নমুনা কাটাছেঁড়া করার আগেই তা দেখেছি। গোটা অঙ্গসংস্থান আরও মজবুত, আরও সরল হয়েছে। সূক্ষ্মতাও হারিয়েছে। স্নায়ু আর দেহযন্ত্র আরও পশ্চাদগমন ঘটিয়েছে— যা সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার। সময় আর ক্রমবিবর্তনের তালে তালে চললে অগ্রগমন হওয়া উচিত ছিল— পিছিয়ে পড়বে কেন? ক্ষয়িষ্ণু আর লুপ্তপ্রায় প্রত্যঙ্গগুলো আশ্চর্যভাবে টিঁকে রয়েছে। কীমাশ্চর্যম্!

দীননাথের কাছে যুক্তিতে হেরে গিয়ে চাণক্য বলেছিল, তা হলে এই কিম্ভূতের নাম দেওয়া যাক, 'আহ্লাদি আবোল-তাবোল'।

আমার কিন্তু মোটেই আহ্লাদ হয়নি ভয়ংকরকে দেখে। শুধু ভয়ংকর নয়— আজব ভয়ংকর।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কালঘাম ছুটিয়ে কাটাকুটি করার পর তেরপল চাপা দিয়ে রেখে দিলাম আজব ভয়ংকরকে। গেলাম অন্য নমুনাগুলোর কাছে— যেগুলো 'ড্যামেজড' হয়নি মোটেই। কুমেরুর নিরন্তর সূর্যকিরণ নরম করে এনেছে এদের শক্ত টিস্যু। মাথার দিকের পয়েন্ট আর টিউবগুলো ভাঁজ খুলে ধরার সংকেত দিচ্ছে। কুমেরুর এই কনকনে ঠান্ডায় পচন শুরু হবে না— গা নরম হচ্ছে হোক। জিরো ডিগ্রির নীচে তাপমাত্রা যেখানে, সেখানে পচন ধরে না এত তাড়াতাড়ি। তা হলেও রোদ্দুর থেকে ঢেকে দিলাম তেরপল দিয়ে। ফলে, উৎকট গাত্রগন্ধ বেশিদূর ছড়াবে না। উন্মাদপ্রায় কুকুরগুলোকে বাগে রাখা যাবে। ওরা তো দেখছি একেবারেই পাগল হয়ে যেতে বসেছে। বরফের পাঁচিল ক্রমশ উঁচু করতে হচ্ছে।

আকাশে ভয়ানক তুফানের লক্ষণ দেখে বড় বড় বরফের চাঁই দিয়ে তেরপলের চারধার চাপা দিল চাণক্য আর দীননাথ—ঝড়ে তেরপল উড়ে না যায়। অতিকায় পর্বতগুলো যেন শ্যেনদৃষ্টি হেনে রয়েছে এদিকে— ঝড়ে সব উড়ে গেলে খুশি হবে।

ঝড় এল। প্রলয়ংকর ঝড়। সারাদিনের রিপোর্ট চেপে গেলাম, জাহাজে জানলাম না। ওখানে জানানো মানেই পৃথিবীকে জানানো। কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র একটা বদ্ধ বাতুল।

ইলোরার কথা এবার না বললেই নয়। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা এই মেয়েটাকে দেখলে মেয়ে-দত্যি বলেই মনে হবে। জন্ম বীরভূম জেলার মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের পাশের গ্রামে। বীরভূমের মেয়েরা একটু ঢ্যাঙা হয়, কিন্তু ইলোরার মতন ঢ্যাঙা মেয়ে পঞ্চনদের দেশেও চট করে চোখে পড়ে না। শরীর আর মনের জোর ওকে যেমন অনন্যা করে তুলেছে। ঠিক তেমনি ওর মগজের ক্ষমতা ওকে বিশ্বের প্রথম সারির মেয়ে করে তুলেছে।

যদিও ইলোরা নামটা কাগজে ম্যাগাজিনে ছাপা হয় না, টিভি, রেডিয়োতে বলা হয় না। কারণ ওর মগজের শক্তিকে যেকাজে লাগিয়ে রেখেছে, সেকাজ চলছে খুব গোপনে— সামরিক কারণে। বৈজ্ঞানিকেরাও যাতে জানতে না পারেন, তাই পুরো গবেষণাটা ধামাচাপা রাখা হয়েছে। নিরুপায় হয়ে ইলোরা-প্রসঙ্গ আমাকে আনতে হচ্ছে। নইলে আসল রহস্য-প্রসঙ্গে যেতে পারব না।

ইলোরা ছেলেবেলা থেকে সায়েন্স-ফিকশনের ভক্ত। বিশেষ করে ওকে টেনেছিল উড়নচাকি প্রহেলিকা। এই পৃথিবীতে মাঝে মধ্যেই যে উড়নচাকি টহল দিয়ে যায় অন্য নক্ষত্রলোক থেকে এসে, এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে থিসিস লিখে ডক্টরেট হয়েছিল। ওর গবেষণা নিবন্ধ সাড়া ফেলেছিল বিলিতি পত্রপত্রিকায়। তারপরেই ওকে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে গিয়ে একটা দেশের গোপন গবেষণাগারের চার্জে রাখা হয়। সে দেশ কোন দেশ, তা বলব না। গবেষণাগারের নামঠিকানাও বলব না। শুধু বলব, ইলোরা উড়নচাকির রহস্য আয়ত্ত করে ফেলেছিল। আশ্চর্য এই ব্যোমযান কসমিক শক্তিতে নক্ষত্রবেগে উড়ে যায়— পেট্রল ডিজেল ব্যবহার করে না।

আমি এই কাহিনির গোড়ার দিকে বলেছিলাম, পাঁচখানা বিশেষ বিমানের পার্টস জাহাজে করে আনা হয়েছিল। ডাঙার ক্যাম্পে যন্ত্রাংশ জুড়ে বিমান তৈরি হয়েছিল।

এইবার বলি, এগুলো নিছক বিমান নয়। উড়নচাকি। যাতে কেউ জানতে না পারে, তাই বড় বড় বাক্সে করে আনা হয়েছিল যন্ত্রাংশ। জাহাজের লোকদের চোখের আড়ালে গিয়ে তৈরি হয়েছিল পাঁচখানা উড়নচাকি।

জাহাজে চেপে কুমেরু অভিযান করেছিলাম এই কারণেই। এই 'বিশেষ বিমান'কে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখব বলে।

ডায়েরি আকারে যতক্ষণ লিখেছিলাম, ততক্ষণ ইলোরার নাম আনতে হবে— একথা ভাবিনি। বিশেষ বিমান প্রসঙ্গও চেপে যেতাম। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। কারণটা বলা যাক।

প্রলয়ংকর ঝড় আসন্ন দেখে বুদ্ধিমতী ইলোরা বলেছিল, 'দাদু, আপনি চাণক্যদা, দীনুদা আর বেশিরভাগ লোকজন নিয়ে মূল ক্যাম্পে ফিরে যান। দশজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আর বিয়াল্লিশটা কুকুর নিয়ে শুধু আমি থাকি পাহারায়। কথা বাড়াবেন না। যা বলছি, তাই করুন— প্লিজ! কেননা, মেরুঝড়ে যদি সবাই উড়ে যাই, অভিযান যে খতম হয়ে যাবে। ঝড় থেমে গেলে আমি খবর পাঠাব— তখন ফিরে আসবেন। আপনার বয়স হয়েছে—

চাণক্যদা আর দীনুদা আপনার দু'পাশে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।'

ইলোরা বড় জেদী মেয়ে। দৃঢ়চেতা। বুদ্ধিও রাখে। ওর কথায় যুক্তি ছিল। তাই ঝড় প্রলয়ংকর রূপে দেখা দেওয়ার আগেই চারখানা বিশেষ বিমানে চেপে আমরা ফিরে এসেছিলাম বেস ক্যাম্পে।

গভীর রাত পর্যন্ত ইলোরার মেসেজ পেয়েছিলাম। এ ঝড় নাকি দেখবার মতন। ক্যাম্প লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে বসেছে। তেরপল-টেরপল সব উড়ে যাচ্ছে...।

তারপরেই, আচমকা বন্ধ হয়ে গেল ওর মেসেজ। সারারাত আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দীননাথ আর চাণক্য অনেক চেষ্টা করে গেল ইলোরাকে কনট্যাক্ট করার।

কিন্তু বৃথা।

আমি ঘুম থেকে উঠেই জানতে চেয়েছিলাম, 'ইলোরার খবর এসেছে?'

'না।' একই সঙ্গে থমথমে মুখে জবাব দিয়েছিল চাণক্য আর দীননাথ। একখানা বিশেষ বিমান নিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। আমাকে তুলে নিয়ে রওনা হয়েছিল পাঁচ পাহাড়ঘেরা ক্যাম্পের দিকে। লোকজনদের বলে গেছিলাম— আমাদের সবুজ সংকেত পেলে তবে যেন সবাই চলে আসে।

এতজনকে অজানা বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে মন চায়নি আমার।

আকাশপথে যেতে যেতেই ডাইনি-আকৃতি পর্বতশঙ্কু দেখে শিউরে উঠেছিলাম বারবার। মাথা তুলে রয়েছে পশ্চিম দিকে— অত্যন্ত আবছা ভাবে। অনেক দূরে থেকেও যেন রয়েছে কত কাছে। অস্বাভাবিক উঁচু বলেই মনে হচ্ছে যেন কত কাছে চলে এসেছে— একটু উড়ে গেলেই নাগাল ধরে ফেলা যাবে।

শিখরে শিখরে যে অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য বিরাজ করছে, চাণক্যই প্রথম তা নজরে এনেছিল। এই আকাশপথেই ঘুরপথে এর আগে একবার গেছি, একবার ফিরেছি— তখন অজানাকে জানার উন্মাদনায় অতটা কেউই খেয়াল করিনি।

আকাশের বুকে শিখরের পর শিখর যে স্কাইলাইন এঁকে রেখেছে, তাতে সারি সারি সাজানো রয়েছে যেন অজস্র কিউব। ঘনক ঘিরে রয়েছে প্রতিটা চুড়োকে। এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকা ঘনক, কিন্তু প্রতিটা ঘনক সমান সাইজের— একই মাপের। এ যেন সুদূর অতীতের মন্দির-চূড়া— ঘনক দিয়ে ঘেরা। সব ঘনক আস্ত অবস্থায় নেই অবশ্য— ঝড়-জলে ক্ষয়ে গেছে। তবুও শিখরের পর শিখরে ঘনকের পর ঘনক কীভাবে এল, কে সাজিয়ে গেল— ভাবতে গেলে কূলকিনারা পাওয়া যাবে না।

দানবিক-শহরের আভাস ভাসছে যেন আকাশে— কোনও জানা জ্যামিতিক ছন্দে আটকে নেই সেই আভাস। কোনও চুড়োর মাথায় রয়েছে খুব লম্বা চোঙা। কারও মাথা ফুলো বেলুনের মতন। কোথাও রকমারি সাইজের বলয়— বড় থেকে ছোট হয়ে গেছে কোথাও, কোথাও ছোট থেকে একটু একটু করে বড় হয়েছে ওপর দিকে ওঠার সময়ে। আংটি অথবা বলয় না বলে এদেরকে চাকতি বললে বোধহয় বুঝতে সুবিধে হবে। কিন্তু প্রকৃতির গড়া পাহাড়চুড়োয় এ ধরনের চাকতি কি প্রকৃতি খেটেখুটে গড়েছেন? কারও চুড়ো কেটে ছাদের মতন চ্যাপটা করা হয়েছে। কিন্তু সে ছাদ অবিকল তারকা গড়নের পাঁচ পয়েন্ট

বিশিষ্ট। কারও ছাদ স্রেফ গোলাকার, কোনওটা আয়তাকার। কোনও ছাদে বসানো নিখুঁত পিরামিড, কোথাও বানানো শুধু একটা শঙ্কু।

তারপরেই ভেবেছি, যা দেখেছি, সবই দৃষ্টিবিভ্রম— মরীচিকা। আশ্চর্য এই যে, একই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটছে আমাদের তিনজনেরই। তিনজনেই বোবা বিস্ময়ে শুধু দেখেই যাচ্ছি। বুক দুরু দুরু করছে আতঙ্কে।

এবার মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলাম সামনের দৃশ্য দেখে। দেখলাম যেন দৈত্য-প্রাকারের পর দৈত্য-প্রাকার। একটার সঙ্গে একটার অবিশ্বাস্য মিল। দেখলে বুক কাঁপে— এত বিরাট। অথচ সবই পাহাড়। পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে। দানবিক প্রাচীর। কেল্লা-প্রাকার বলাই সংগত।

পাঁচ পয়েন্টে পাঁচ পাহাড় ঘেরা জায়গাটায় এসে অনেক নীচে দেখলাম, সাদা বরফের বুকে কালচে ছোপ— ইলোরার ক্যাম্প। আরও দূরে রয়েছে কল্পনাতীত উঁচু গগনচুম্বী পাহাড়।

কিন্তু ক্যাম্পের কোনও চিহ্ন নেই। বিমান থেকে নামবার পর দেখেছিলাম। ঝড়ে সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে নিশ্চয়। ইলোরাকে দেখলাম না। একটা কুকুরও উধাও। দশজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আর একচল্লিশটা কুকুরের লাশ পড়ে রয়েছে যে রকম ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায়— তার বর্ণনা আর নাইবা দিলাম। মুণ্ড থেকে ধড় আলাদা, কারও পা আর হাত ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন।

ঝড় কী এরকম পৈশাচিক পশুমেধ আর নারকীয় নরমেধ কাণ্ড ঘটিয়ে যেতে পারে?

বিশেষ বিমানের ধাতুর পাত টুকরো টুকরো অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিকে। ড্রিলিং মেশিন তালগোল অবস্থায় যেন বৃহৎ ধাতববর্তুলের আকার নিয়েছে। লণ্ডভণ্ড এইসবের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অদ্ভুত সেই তারকা গড়নের বস্তু— সবুজাভ সোপস্টোনে গড়া— সারা গায়ে নিয়মিত ছন্দে ফুটকি আঁকা— যেন রকমারি নকশায় ডট বসিয়ে যাওয়া হয়েছে পঞ্চকোণ সোপস্টোনে।

একটা স্লেজগাড়িও নেই। সেই মুহূর্তে ধরে নিয়েছিলাম, নিশ্চয় ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এমনকী বাড়তি তাঁবুগুলোও। প্রচুর বইও উধাও। নেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও।

খটকা লেগেছিল তখনই। এ কীরকম ঝড়? কিছু বই ফেলে যায়, কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়? একটা কুকুর আর ইলোরাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল— কিন্তু বাদবাকি কুকুর আর মানুষদের টেনে টেনে ছিঁড়ে রেখে গেল?

বীভৎস আকৃতির চোদ্দোটা নমুনার একটাও দেখতে পাইনি বিশেষ বিমান থেকে নেমেই। নমুনাগুলোর প্রত্যেকে ভয়ানক ভারী, তা তো দেখেই গেছি কাটাছেঁড়া করার সময়ে। এতগুলো ভারী নমুনা নিমেষে লোপাট করে দিল প্রলয়ংকর ঝঞ্ঝা, অথচ রেখে গেল কিছু অপ্রয়োজনীয় হালকা পুস্তক?

ধন্দ কেটেছিল চারদিকে তল্লাশি চালাতে গিয়ে। কেটেছিল বললে ভুল বলা হবে— বেড়েছিল। ছটা ক্ষতিগ্রস্ত নমুনাকে পেয়েছিলাম পরিপাটিভাবে ন'ফুট গভীর বরফকবরে শোয়ানো অবস্থায়। প্রত্যেকটা কবর পঞ্চকোণ আকারের। পেটাই সমতলে ডট দিয়ে নকশা

আঁকা। যে ডট-প্যাটার্ন রয়েছে পঞ্চকোণ সোপস্টোন তারকাদের গায়ে— হুবহু তার অনুলিপি।

এই নমুনাগুলো 'ড্যামেজড্' ছিল দেখে গেছি। এর মধ্যে একটাকে কাটতে গিয়ে ছুরি-কাঁচি ভোঁতা করে ফেলেছি। পঞ্চকোণ কবর ছ'টার একটার মধ্যে সযত্নে কাটাছেঁড়া অংশগুলোকে টিপেটাপে রেখে দেওয়া হয়েছে এটাকেও।

উধাও হয়েছে আটটা নমুনা— অক্ষত অবস্থায়। ঝড় কি বেছে বেছে জিনিস উড়িয়ে নিয়ে যায়?

অবাক বিস্ময়ে আমরা চেয়েছিলাম সামনের ভয়াল পর্বতগুলোর দিকে। আকাশ ছুঁয়ে থাকা *ওই পাহাড় টপকে গেলে হয়তো কোনও উপত্যকার সন্ধান মিলবে। কী দেখব* সেখানে?

মন চেয়েছিল নিষ্প্রাণ এই মহাভয়ংকর অঞ্চল ছেড়ে চম্পট দিতে।

আমাদের ভয় নিরীক্ষণ করেই যেন অকস্মাৎ বংশীরবে অট্টহাস্য করে উঠেছিল পাহাড়ের বাতাস। বিকট সেই ঐকতানে নেই কোনও সুর, আছে শুধু ভয়াবহতা। কানের পর্দায় মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধমনির শোণিতপ্রবাহকে শুষ্ক করে দেওয়ার প্রবণতা। তিনজনেরই হৃৎপিণ্ড ডিগবাজি খেয়ে গলায় এসে ঠেকেছিল। এ তো বাতাসের বিলাপ নয়— এ তো পিশাচগুরুর বংশীবাদ্য!

নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটিয়ে দেওয়ার পক্ষে এই কানফাটানো করতালিই ছিল যথেষ্ট! কিন্তু আমরা তিনজনেই যে অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। বিপদ বরণ করতেই ভালবাসি। তাই তিনজন শুধু পর্যায়ক্রমে দেখে নিয়েছিলাম তিনজনের চোখ। মনস্থির করে ফেলেছিলাম পরক্ষণেই।

বেরিয়ে পড়েছিলাম 'আহ্লাদি আবোল-তাবোল'দের অন্বেষণে। ঢুকেছিলাম পাগল পাহাড়দের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

॥ তিমির-তনয়দের গিরিগুহা ॥

যাওয়ার আগে তছনছ করা ক্যাম্প অঞ্চল আর একটু ঘুরে দেখেছিলাম। মানুষ-সহচরদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহগুলো দেখতে দেখতে গেছিলাম। শিহরিত হয়েছিলাম নির্মমতা দেখে। প্রত্যেকের টিস্যু কেটে ছিঁড়ে তার ওপর নুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিণামটা অনুমেয়। প্রতিহিংসা-স্পৃহা কতখানি পৈশাচিক হলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হয়!

এই যন্ত্রণা শুধু দ্বিপদ মানুষদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি— চতুষ্পদ কুকুরদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তাদেরও চামড়া ছাড়িয়ে টিস্যু ছিঁড়ে নিয়ে তার ওপর নুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ নুন এসেছে বিশেষ বিমানের খাবারদাবার রাখবার জায়গা থেকে। ছাউনি বানিয়ে বিশেষ বিমান রাখা হয়েছিল। বিমানগুলোকে ধাতুর পাত বানিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিপুণ শল্যচিকিৎসকের হাতে পড়েছিল যেন একটা কুকুর আর একজন মানুষ।

তাদের শবব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে ওস্তাদ সার্জেনের মতন। করোটি খুলে মগজ বের করা হয়েছে। নির্মম কৌতূহলের নিরসন ঘটিয়েছে অজানা আততায়ী— সে কে বা কারা, আমরা তা জানি না।

সব মিলিয়ে গুনতিতে কম পড়ছে একজন মানুষ আর একটা কুকুর। ইলোরা আর একটা কুকুরকে কি এই অজানা ভয়ংকরেরা ধরে নিয়ে গেছে? বরফে তাদের পদচিহ্ন খুঁজেছিলাম। কিন্তু ঝড়ে উড়ে আসা তুষার সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করেছে।

ছাউনির এককোণে তুষার পৌঁছোয়নি। সেইখানে পেলাম অবিশ্বাস্য কতকগুলো ফসিলচিহ্ন। তেকোনা পায়ের ছাপ। কোটি কোটি বছর আগে যারা ছিল প্রাণময়— এখন যারা নিষ্প্রাণ জীবাশ্ম, তাদের টাটকা পদচিহ্ন ছাউনির কোণে এল কী করে?

বিস্ময় আর প্রেত-ভয় যখন সীমা লঙ্ঘন করে, তখন বাকযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। আমাদেরও হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থা।

'ড্যামেজড' যে নমুনাটাকে কাটাছেঁড়া করেছিলাম টেবিলে ফেলে, সেই নমুনাকে একটু আগেই কবরস্থ অবস্থায় দেখে এসেছি বরফের তলায়। কাটাছেঁড়া অংশগুলোকে এই টেবিল থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টেবিল এখন একদম সাফ।

দুর্জ্ঞেয় হেঁয়ালি। পরিষ্কার টেবিলের দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠেছিল তিনজনেরই। এমনকী অস্ত্রোপচারের ইন্সট্রুমেন্টগুলোও মুছে পরিষ্কার করে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

ক্যাম্প-বিভীষিকার শেষ এইখানেই নয়। পেট্রল-স্টোভ আর বার্নারগুলো গেল কোথায়? ড্রামভর্তি পেট্রল? সবই ঝড়ে উড়ে গেছে? অথচ, ছাউনি তেমন ভেঙে পড়েনি?

কুকুরগুলো উঁচু বরফ-পাঁচিল টপকে বেরোতে পারেনি। তবে নিশ্চয় কামড়ে খাবলে নিকেশ করতে চেয়েছিল অজানা আগন্তুকদের। তাই তাদের ওপরেই হৃদয়হীন নির্মমতার নমুনা রেখে গেছে অজ্ঞাত বিভীষিকা। টুকরো টুকরো করা হয়েছে বললেই চলে। টেনে, কামড়ে ছিঁড়ে। অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই কোথাও। তবে কয়েকটা দংশনচিহ্ন অতিশয় লোমহর্ষক। কেননা, কোনও পার্থিব প্রাণী এভাবে দাঁত বসিয়ে ছিদ্র রচনা করতে পারে বলে জানা নেই।

খাবারদাবারগুলো টিনের ভেতর থেকে গেল কোথায়? টিন খোলা হয়েছে অদ্ভুতভাবে— চিরাচরিত প্রক্রিয়ায় নয়। পেট্রল স্টোভ নিশ্চয় জ্বালানো হয়েছিল। পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। গ্যাসলাইটার পড়ে গ্যাস-ওভেনের পাশে। সিলিন্ডার খাড়া রয়েছে ঠিক পাশেই— টিউব তো ছিঁড়ে যায়নি। সাদা খাতার পাতায় কলম দিয়ে ডট বসিয়ে যেসব নকশা আঁকা হয়েছে, সেই নকশাই একটু আগে দেখে এসেছি পাঁচ পয়েন্টওলা সোপস্টোন দিয়ে গড়া বিচিত্র বস্তুগুলোর গায়ে। শুধু ফুটকি-নকশা নয়, বইয়ের ছবি দেখে তার নকল করবার আনাড়ি প্রয়াসও রয়েছে কয়েকটা সাদা কাগজে।

বিমূঢ় বানাবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। এহেন বহিঃপ্রকাশ কি কোনও ঝড়ের ক্ষেত্রে সম্ভব?

ফটো তুলেছিলাম। তারপর বিশেষ বিমানে চেপে শূন্যে উড়েছিলাম কোন দিকে যাব, তা ঠিক করবার জন্যে।

কিন্তু উত্তুঙ্গ পাহাড় তো ডাইনে-বাঁয়ে সমানভাবে প্রসারিত— যতদূর দু'চোখ যায়। পাহাড়ের গায়ে অজস্র গুহাও দেখা যাচ্ছে— সমান মাপের। প্রকৃতি কি এমনভাবে মাত্রা আর নকশামাফিক গুহা রচনা করে?

এক চক্কর দিয়েই মাথা ঘুরে গেছিল। তাই নেমে এসেছিলাম। ঠিক করেছিলাম, ঘুমিয়ে-টুমিয়ে নিয়ে পরের দিন বেরোব অজানার উজানে।

তা সত্ত্বেও, পরের দিন ষোলো ঘণ্টা অবিশ্বাস্য অভিযানের পর ফিরেছিলাম বিকারগ্রস্ত চাণক্যকে নিয়ে। কমপ্লিট নার্ভাস ব্রেকডাউন। কেননা, ও যা দেখেছিল— তা শুধু ও একাই দেখেছিল— আমি আর দীননাথ দেখিনি। আংশিক দেখেই অবস্থা কাহিল হয়েছে আমাদের দুজনের— চাণক্য দেখেছিল আরও অনেক, কিন্তু বিকারের ঘোরে থাকায় আজও বলেনি। কী সেই বিভীষিকা যা ওর মতন শক্তধাতের মানুষকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আধপাগল করে রাখতে পারে!

ক্যাম্প গড়া হয়েছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারো হাজার ফুট উঁচু তুহিন তেপান্তরে। ঠান্ডার জন্যে বিশেষ ধড়াচূড়া পরে আমরা ওর বেশি উঠতে চাইনি নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে বলে। যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম কোন গিরিসঙ্কট দিয়ে সহজে উড়ে গিয়ে পর্বতপ্রাকার পেরিয়ে অজানার অন্দরে প্রবেশ করা যায়।

যতই প্রবেশ করেছি, ততই পর্বতমহলের প্রাচীনতা দেখে বিমূঢ় হয়েছি। কম করেও পাঁচ কোটি বছর আগেকার এই পর্বতমালায় এমন কিছু রয়েছে যা নিয়ম মাফিক সাজানো।

কালচে পাহাড়ের সাদাটে বরফ আস্তরণের নীচে চৌকোনা ঘনকগুলোর রং বিলক্ষণ হালকা। যেন বিশেষ কোয়ার্জ পাথর দিয়ে তৈরি। এই একই রঙের একই মাপের ঘনক পাহাড়ে পাহাড়ে পড়ে থাকাটা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। এই সবকিছুর মধ্যে একটা অতিপ্রাকৃত অপচ্ছায়ার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছি, আর মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হয়েছি।

শিহরিত কলেবরে লক্ষ করেছি একটা খাপছাড়া ব্যাপার। সব ঘনক হালকা রঙের কোয়ার্জ দিয়ে গড়া হয়নি। যেন শিলা দিয়ে গড়া। পাথরের গা কেটে তৈরি। রং দেখে মনে তো হয় না আগ্নেয়পাথর। অনেক আগ্নেয়গিরির গায়ে প্রকৃতি আপন খেয়ালে রকমারি সাইজের পাথর বানিয়ে রেখে যায় অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে। কিন্তু তারা তো একই মাপের হয় না। লাভা-জমাট পাথরের রং তো এরকম হয় না।

অপ্রাকৃতের হাতের ছোঁয়া রয়েছে অজস্র গুহামুখেও। সংখ্যায় অগণন। যতই এগিয়েছি, ততই দেখেছি গোটা পাহাড় ফোঁপরা করে যেন মৌচাক রচনা করা হয়েছে। মৌমাছিরা যেমন নিখুঁত গড়নে অলৌকিক প্রেরণায় তাদের কোটর রচনা করে, গুহামুখগুলোও তেমনি দু'রকম ছাঁদে পাথর খুদে নির্মিত— হয় চৌকোনা, নয় অর্ধবৃত্তাকার। ঝড়-জলে কোণ ক্ষয়ে গেলেও নির্মাণকালে তাদের রেখা যে নিখুঁত নকশায় গড়া হয়েছিল, তাতে নেই তিলমাত্র সংশয়। বিশেষ বিমান বলেই অনেক গুহামুখের কাছ দিয়ে উড়ে যেতে পেরেছিলাম। দেখেছিলাম, আরও এক আশ্চর্য নকশা। ফুটকির নকশা। যা দেখে এসেছি ছ'টা তুহিনকবরের ওপর, সাদা কাগজের ওপর আর সোপস্টোনে গড়া নক্ষত্রাকৃতি বস্তুগুলোর ওপর। দেখেছি আর থ হয়ে গেছি। কাদের ঐতিহ্য বহন করছে এই পর্বতগাত্র?

খুবলে সুড়ঙ্গ রচনা করে গেছে কারা? কী বার্তা রেখে গেছে ফুটকি-নকশার মধ্যে।

বিমান তুলে এনেছি ওপরে— পাহাড় টপকেছি সহজতম গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে। নীচে তাকিয়ে দেখেছি পাহাড়ি গিরিপথ হিমবাহ দিয়ে ছাওয়া। ওই পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে অজানা অঞ্চলে কোনও দিনই পৌঁছনো যাবে না।

কিন্তু নীচের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারিনি। অগুনতি গুহামুখে ধাক্কা খেতে খেতে পাহাড়ের বাতাস অবরুদ্ধ গোঙানির স্বরে কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছে।

বাতাস শুধু অট্টরোল দিয়ে আমাদের বধির করতে চায়নি, বিপুল গতিবেগে আমার গতিও রুখতে চেয়েছে। বিশেষ বিমান বলেই হুহুংকার আর নিনাদী বাতাস-প্রবাহ ঠেলে এগিয়ে গেছি। তারপর গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে দেখেছি সুদূর অতীতে গড়া বিস্তীর্ণ এলাকা— পরিত্যক্ত, প্রাণহীন, ধূসর এবং ঊষর।

॥ শেষ নেই, শেষ নেই ॥

আমরা তিনজনেই একযোগে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিলাম সেই দৃশ্য দেখে। অনেক নীচের হিমবাহ বড় জোর পঞ্চাশ কি ষাট ফুট পুরু। উপত্যকা ছেয়ে আছে এই হিমবাহে। যেখানে যেখানে স্তর পাতলা হয়ে রয়েছে, সেইসব জায়গায় অতিকায় পাথরের চাঁই যেন অজ্ঞাত এক জ্যামিতিক নকশায় তৈরি হয়ে উঁকি মারছে। এহেন ফ্যানটাসটিক প্রাকৃতিক সৃষ্টি কলোরাডোর 'গার্ডেন অফ গডস' অথবা অ্যারিজোনার মরুপ্রান্তরে দেখা যায়। ঝড়-জলে ক্ষয়ে যাওয়া কিম্ভূতাকৃতি শিলাখণ্ড। এ কোথায় এলাম আমরা তিন অ্যাডভেঞ্চারপিয়াসী?

মানুষ যখন নরবানরও ছিল কিনা সন্দেহ— এ তো সেই সময়ের হিমবাহ আচ্ছাদিত মহাদেশ। কম করেও পাঁচ লক্ষ বছর আগে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিশ হাজার ফুট উচ্চতায়, এহেন নারকীয় সমতল তৈরি হল কী করে? নিখুঁত নিয়মে গড়া এত পাথরের সমাবেশ এখানে ঘটল কী করে?

এর আগে লিখেছি, বিশেষ বিমানে চেপে কুমেরুবিন্দুর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময়ে দেখেছিলাম দক্ষিণ মেরুর মহাকায় মরীচিকার পর মরীচিকা, আকাশে ভাসছে যেন মায়াময় মহানগরী। এখন দেখলাম, তা মরীচিকা নয়— স্রেফ প্রতিফলন। অনেক উঁচুতে সমান্তরালভাবে ভাসছে বরফকণার পুরু স্তর। উপত্যকার এই ফ্যানটাসটিক নগরের প্রতিফলন তাতেই। নানা আকার আর আয়তনের পাথরের ব্লকগুলো সরলরেখা, বক্ররেখা আর বিভিন্ন ডিগ্রির কোণের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে। নারকীয় নকশায় গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ নগর।

লক্ষকোটি বছরেও অতিকায় সৌধগুলো ভেঙে পড়েনি অতিকায় পাথরের চাঙড় দিয়ে তৈরি হয়েছিল বলে। অবিশ্বাস্য, অমানবিক সেই বিশালতা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। মনে

মনে বলেছি, পৃথিবীর ছাদ তিব্বত নয়— এই অঞ্চল। তুষার-মানব হিমালয়ে ছিল না, ছিল এইখানে।

যে গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করেছি এই মহানগরীতে, শুধু সেই পথটুকু ছাড়া সব দিকেই অতিকায় পাথরের সমাবেশ ঘটিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে কিম্ভূতাকৃতি সৌধ। পাহাড়ের সানুদেশে এদের সংখ্যা বিপুল— পাহাড়ের ওপর দিকে গুহার সংখ্যা বেশি।

সৌধগুলো কখনও ছোট, কখনও বিশাল। শঙ্কু, পিরামিড, ছাদওলা— সব রকমই আছে। আর আছে সিলিন্ডার। ঘনক আর আয়তাকার প্রস্তরের সমাবেশ। পাঁচকোনা প্রস্তরসৌধগুলো নির্ঘাত কেল্লা। খিলেন আর গম্বুজ ব্যবহার করা হয়েছে সুকৌশলে— নিপুণভাবে।

মহাকাল কাউকে ক্ষমা করে না। সৌধ ভেঙেছে অনেক জায়গায়। রক্ষেও পেয়েছে অনেক জায়গায়। স্বচ্ছ বরফ আস্তরণের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাদের আস্ত অবয়ব। সারি সারি উপবৃত্তাকার জানলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাল্লাবিহীন। কয়েক ক্ষেত্রে প্রাচীন কাঠের পাল্লা পচে গিয়ে ঝুলছে। অবিকৃত রয়েছে শঙ্কু অথবা পিরামিড আকারের সৌধগুলো। এদের গায়ে দেখা যাচ্ছে ফুটকি-নকশা।

উগ্রতর হয়েছে আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। কী জাতীয় সত্তারা সুদূর অতীতে এই মহানগরী গড়েছিল, তা জানতেই হবে। আরও ভেতরে ঢুকতে হবে— ঝুঁকি নিয়েও। ধরণীর বুকে মানুষের উত্থান ঘটবার অনেক আগে যারা গড়েছে এই বিপুল সৌধশ্রেণি— তারাই কি একদা ছিল হিমালয়ের ভয়ংকর? অথবা, আরব মরুভূমির বিস্মৃত নগর-অধিপতি? এদের কীর্তির সঙ্গে তুলনা চলে কেবল আটলান্টিস আর লেমুরিয়া নগরকর্তাদের। কিন্তু তারা তো উপকথার কিংবদন্তি! এখানকার কীর্তিমানরা কি তাদের পূর্বপুরুষ?

এবার শুরু হোক পায়ে হেঁটে অভিযান।

॥ কীর্তিমানদের আবির্ভাব কোথা থেকে ॥

সঙ্গে নিয়েছিলাম টুকটাক অনেক জিনিস— সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এক ব্যাগ ছেঁড়া কাগজ। অলিগলি সুড়ঙ্গপথে যাতে পথ হারিয়ে না ফেলি— মোড় ঘুরলেই ফেলে যাব ছেঁড়া কাগজ। সুড়ঙ্গে যদি থাকে হাওয়ার টান— গাঁইতি দিয়ে চিহ্ন দিয়ে যাব পাথরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম একটা পঞ্চকোণ চত্বরে— দশ-এগারো ফুট উঁচু ভগ্নপ্রায় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বরফ জমে রয়েছে বিস্তর। নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশের দ্বার আর বেশি দূরে নেই বলেই মনে হল।

মনে হওয়ার কারণ আছে। নক্ষত্রাকৃতি চত্বরটার দেওয়াল পয়েন্ট থেকে পয়েন্ট পর্যন্ত লম্বায় তিনশো ফুট। জুরাসিক আমলের বালিপাথরের ব্লক দিয়ে তৈরি ভেতরের দেওয়াল— বেশিরভাগ ভেঙে পড়েছে অথবা বরফের তলায় চলে গেছে। পাঁচিল বরাবর ছ'ফুট বাই আট ফুট জানলা দিয়ে উঁকি মেরেই সে দৃশ্য দেখেছি। আঁচ করে নিয়েছি, ভগ্নস্তূপের তলায়

নিশ্চয় পাতালবিবরের প্রবেশমুখ আছে। তারকার আকারে পাঁচিল তুলে জায়গাটাকে ঘেরা আছে স্থানমাহাত্ম্যর জন্যেই।

অবাক হয়েছি এতবড় পাথর তোলার কায়দা দেখে। কায়দাটা কি জানি না। কত শক্তি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা থাকলে এত বড় পাথর শূন্যে তুলে সৌধ গড়া যায়?

পাঁচকোনা চত্বরটায় নিশ্চয় অতীত-সত্তাদের অন্দরমহলে প্রবেশের গুপ্তপথ ছিল। কিন্তু ওপরতলার বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই খসে পড়ায় নীচের তলার বরফজমা অঞ্চলে ঢোকবার পথ পাইনি।

বেরিয়ে এসেছিলাম। আধ মাইলটাক এদিক-ওদিক করবার পর আবার একটা পঞ্চকোণের কেল্লার মতন জায়গায় ঢুকে দেখলাম, একটা খিলেন আস্ত রয়েছে। খিলেনের মুখে বরফ জমে নেই।

সাহসে বুক বেঁধে ঢুকে পড়েছিলাম এই খিলেনের সুড়ঙ্গপথে। খুব অস্পষ্ট একটা বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিলাম। হাওয়ায় ভাসছে রেশ। পিপে আকৃতির বিদঘুটের শব-ব্যবচ্ছেদ করার সময়ে অসহ্য এই গন্ধ আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।

সেইসঙ্গে মাঝে মাঝেই কানে ভেসে আসছিল দূরায়ত ক্ষীণ বংশীরব। হাওয়া তো নেই এই সুড়ঙ্গে! তা হলে এই করাল সুর রচিত হচ্ছে কীভাবে?

গায়ে কাঁটা দিলেও থামতে পারিনি। টর্চের ফোকাস মেরে সুড়ঙ্গের গায়ে ফুটকি-নকশার টানা ম্যুরাল-চিত্র দেখতে দেখতে এগোচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম— সুদূর অতীতের কীর্তিমানরা হঠাৎ বিপাকে পড়ে চলে গেছে বলে তো মনে হচ্ছে না— বেশ তোড়জোড় করে মহানগরী ত্যাগ করে বসতি বেঁধেছে অন্যত্র। কীসের ভয়ে? বরফ যুগ আসছে বলে?

আচমকা যে পলায়ন করেনি সুদূর অতীতের কীর্তিমানরা, তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি ঘর থেকে ঘরে যাওয়ার সময়ে। তিরিশ ফুট বাই তিরিশ ফুট আর উচ্চতায় ষাট ফুট ঘর রয়েছে এনতার। ভেঙে পড়েনি স্থপতির অপার্থিব কৌশলের গুণে। বারো ফুট উঁচু দরজা দিয়ে একঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হয়েছে। দরজায় ছিল সুপ্রাচীন কাঠের পাল্লা— এখন তার ধুলো আর পচাগলা অংশ পড়ে রয়েছে মেঝেতে। কোনও ঘরেই কোনও আসবাব দেখতে পাইনি। অবশ্যই গোছগাছ করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানত্যাগের সময়ে। বড় বড় উপবৃত্তাকার কুলুঙ্গি আছে দেওয়ালে। সেখানে নেই কোনও জিনিস— ভাঙাচোরা সোপস্টোনে তৈরি পঞ্চকোণ বস্তু ছাড়া।

রয়ে গেছে কেবল দেওয়াল বরাবর খোদাই করা টানা, লম্বা, ছবির সারি। অতি-নিপুণ খোদাইশিল্পী দেড় থেকে দু'ইঞ্চির মতন পাথর গভীর করে কেটে পরের পর ছবির মালা আর ফুটকির নকশা উপহার দিয়ে গেছে। অপার্থিব স্টাইলে খোদাই করা ছবিগুলো তুলে ধরেছে কীর্তিমানদের অতীত ইতিহাসকে। সেই ছবি-সমগ্রের মধ্যে আছে মানচিত্র, আছে সৌরজগতের ছবি, আছে মহাবিশ্বের ম্যাপ।

টর্চের ব্যাটারির পর ব্যাটারি শেষ করেছি। নীরবে কথা-কওয়া ছবির ফটোর পর ফটো তুলেছি— আর জেনেছি পঞ্চকোণের ভক্তরা আসলে কারা।

পাঠক নিশ্চয় আঁচ করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, এদের আবির্ভাব অন্য নক্ষত্রলোক থেকে, অন্য ছায়াপথ থেকে, ধরণী যখন আঁতুর অবস্থায়, যখন ডাইনোসররাও বিচরণ করেনি পৃথিবীময়— তখন এরা এসেছিল। ডাইনোসরদের চাইতেও বিপজ্জনক— কারণ, এদের ব্রেনের ক্ষমতা ছিল আজকের মানুষের কল্পনার অগম্য।

অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? তবুও আমি বলব, বলতেই হবে।

॥ অতি-মগজের অধিকারী তারা... অতি-ভয়ংকর ॥

আগামী দিনের ডানপিটেদের কলজেতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিতে চাই বলেই আমাকে লিখে যেতে হবে যা দেখে এসেছি, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা— চাণক্য যা দেখে স্নায়ুর বারোটা বাজিয়ে বসে আছে।

পাতালসাম্রাজ্যের মহানগরী গড়ে উঠেছিল যাদের জাদুশক্তিতে, তারা এসেছিল অন্য ছায়াপথ থেকে। খেয়ালি স্রষ্টা তাদের মুণ্ড গড়েছিলেন তারকার আকারে। পঞ্চকোণ তারকা— পাঁচ কোণে পাঁচটা চোখ। মগজও বিভক্ত পাঁচ অংশে। স্নায়ুমণ্ডলী অত্যুন্নত এবং অতি শক্তি বিশিষ্ট। তারা না-প্রাণী, না-উদ্ভিদ। তাদের শরীরে কোষ ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু উদ্ভিদের মতন বীজ ছড়িয়ে তারা বংশ বাড়িয়ে নিতে পারত।

তারা এসেছিল এই পৃথিবীতে সেই সময়ে, যখন প্রাণের প্রদীপ জ্বলে ওঠেনি ধরিত্রীর আনাচে-কানাচে। পৃথিবী তখনও নিজেকে গড়ছে। সৌরজগতের এই তৃতীয় গ্রহ আজ সবুজ সুন্দর— কিন্তু তখন ছিল জ্বলন্ত, ফুটন্ত, জলমগ্ন। গোটা পৃথিবীর জল থেকে ঠেলে ওঠা সমস্ত শক্ত জমি ছিল এক জায়গায় জড়ো করা অবস্থায়— এই কুমেরু অঞ্চল ঘিরে ছিল বিপুল মহাদেশ। মাত্র একখানা মহাদেশ। মহাশূন্য থেকে দেখা যেত পৃথিবী গোলক ঘিরে থইথই করছে শুধু জল আর জল।

আমাদের এই ছায়াপথ তো একা নয় এই ব্রহ্মাণ্ডে, আছে আরও অনেক অনেক ছায়াপথ। আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে সেখানকার সৃষ্টিরহস্য বোঝবার চেষ্টা না করাই ভাল। এমনই এক ছায়াপথ থেকে ইথারের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছিল আদিম আতঙ্কেরা আদিম পৃথিবীর বুকে। যখন এসেছিল, তখন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে পৃথিবীর খানিকটা ছিটকে গিয়ে চাঁদ হয়ে পৃথিবীকে আবর্তন করছে। জল থইথই করছে গোটা গোলক ঘিরে। দেখে পছন্দ হয়েছিল আগন্তুকদের। কেননা, যেখান থেকে ওদের আবির্ভাব, সেখানেও জলতলেই ছিল ওদের নিবাস। পৃথিবী গ্রহে আসবার আগে তারা ছিল অন্য গ্রহে। গ্রহ থেকে গ্রহে বিচরণ করেছে। নতুন নতুন গ্রহে উপনিবেশ বানিয়ে থেকেছে। সেই সেই গ্রহের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে নিজেদের শক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়ে গেছে।

সেইসঙ্গে অর্জন করেছে বাহন না নিয়ে মহাকাশে পাড়ি জমানোর ব্যুৎপত্তি। অসাধারণ ‘টাফ’ শরীর ওদের। ডানা নেড়ে ব্যোমমার্গে বিচরণ ওদের কাছে অতি সহজ ব্যাপার। কসমিক এনার্জি ওদের অযুত। যোজনব্যাপী মহাপরিক্রমণের শক্তি জুগিয়ে গেছে— শরীরকে অবিকৃত রেখে।

ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল পৃথিবীর আকাশে। নেমে পড়েছিল কুমেরুর কাছে— জলের তলায় গড়ে নিয়েছিল ইমারতের পর ইমারত।

দৈহিক শক্তি দিয়ে নয়, গতর খাটিয়ে কাজ করার মতন গোলাম-প্রাণী ওরা নয়। বানিয়ে নিয়েছিল সমুদ্রে পাওয়া পদার্থ দিয়ে। কসমিক এনার্জির সঞ্চার ঘটিয়ে প্রাণকণিকা সৃষ্টির ঐশ্বরিক শক্তি ছিল ওদের করায়ত্ত। সৃষ্টি করেছিল কোষ, প্রোটোপ্লাজম, টিস্যু, দেহযন্ত্র। মৌলিক উপাদান থেকে জীব গড়ে নেওয়ার বিদ্যে ছিল ওদের মগজে। বানিয়েছিল রকমারি জীব রকমারি কাজের উপযোগী করে। গুরুভার বস্তু তোলবার জন্যে জেলিময় যে দানব সৃষ্টি করেছিল, তাদের নাম ছিল 'শোগোথ'।

সমুদ্রে তাদের আহার মিলত সহজে। তারা কিন্তু উদররসিক ছিল না। সামান্য খাদ্যেই তাদের প্রয়োজন মিটে যেত। প্রিয় খাদ্য ছিল আমিষ। কাঁচা অবস্থায়।

সমুদ্রের অনেক নীচে জলের চাপ অনায়াসে সয়ে যেত 'টাফ' শরীরের দৌলতে। জলতলের বহু নামহীন বিভীষিকাকে ওরা নিকেশ করেছে, সাম্রাজ্য বাড়িয়ে গেছে। ইমারত নির্মাণ আর রাজ্যবিস্তারের জন্যে কাজে লাগিয়েছে পার্থিব উপাদান দিয়ে গড়ে নেওয়া ভীমাকার প্রাণীদের। 'শোগোথ' ছাড়াও আরও বহুরূপী প্রাণীর স্রষ্টা ওরা। হিপনোসিস দিয়ে আয়ত্তে রেখেছিল বিপুল বাহিনীকে। মনকে নিয়ে গেছিল অবিশ্বাস্য স্তরে। মনের অমিত শক্তি দিয়ে ওরা যা করে গেছিল, পৃথিবীর উন্নত মেধার মানুষের কাছে তা নেহাত অলীক ফ্যানটাসি ছাড়া কিছুই নয়।

সরীসৃপ আর স্তন্যপায়ীদের ওরাই সৃষ্টি করেছিল— আহার হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে। চাষিরা যেভাবে ফসল ফলায়। কুমেরুতে সংগ্রহ করা বহু জীবাশ্মর গায়ে অদ্ভুত আঘাত দেখে অবাক হয়েছিলাম। সে আঘাত এরাই হেনেছিল।

এরা বংশবৃদ্ধি করত প্রয়োজন হলে— নতুন উপনিবেশ পত্তনের আগে। নবাগতরা দ্রুত বেড়ে উঠত— উচ্চশিক্ষা অর্জন করত অল্প সময়ে।

কিন্তু সমাজবদ্ধ ছিল প্রতিটি 'আদিম'। একসঙ্গে থাকার প্রয়োজনীয়তা ছিল আরও একটা কারণে। মনের শক্তি জড়ো করে 'ফোকাস' করলে কাজ হত তাড়াতাড়ি। কসমস ছিল ওদের মনের শক্তির মূল খনি। 'ডার্ক পার্টিকল' মহাকাশ অভিযানে জুগিয়েছে অফুরন্ত শক্তি।

জলজগৎ আয়ত্তে আনার পর ওরা স্থলজগতে এসেছিল রাজ্যপাট বিস্তারের অভিলাষ নিয়ে। মূল ঘাঁটি গড়েছিল এই কুমেরুতে। এখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। সম্পূর্ণ হয়েছিল পৃথিবীজয়। জল-স্থল-অন্তরিক্ষে এরাই ছিল সর্বময় প্রভু।

'শোগোথ' জেলিদানবেরা স্থলেও ভারী পাথর তুলতে সাহায্য করেছে। পাহাড় টপকে দূর জায়গা থেকে ভারী বস্তু বওয়ার জন্যে এরাই বানিয়ে নিয়েছিল 'টেরোড্যাকটিল'দের আদি-পুরুষদের। বিপুলকায় এই খেচর ছিল আকাশের আতঙ্ক— কিন্তু এদের হুকুমের দাস।

কুমেরু অঞ্চলে প্রায় একশো মাইল জুড়ে পাহাড়-পর্বত কুঁদে আর কেটে অত্যাশ্চর্য মহানগরীর পত্তন ঘটানোর পর শুরু হল বিপর্যয়।

পৃথিবীর উপাদানেও ছিল স্বকীয়তা— ছিল ক্রমবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী অগ্রসর। 'আদিম'দের হাতে গড়া 'সৃষ্টি' যখনই 'সৃষ্টিছাড়া' হয়েছে, উৎপাত ঘটিয়েছে— 'আদিম'রা তাদের সবংশে সংহার করেছে। টিকিয়ে রেখেছে শুধু তাদেরকেই যারা তাদের পায়ের গোলাম হয়ে থাকতে পেরেছে।

'আদিম'রা এমন সৃষ্টি করেনি যা তাদের শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। নিজেরা জলে সাঁতরেছে প্যাডেল-পা দিয়ে অথবা বাহুশুঁড় নেড়ে। স্থলে হেঁটেছে দু'পায়ে। আকাশে উড়েছে ডানা মেলে।

এই ত্রিবিধ ক্ষমতা দেয়নি কোনও জীবকেই। শোগোথকে দিয়েছিল শুধু দুটি ক্ষমতা। জলে আর স্থলে যেন সমানভাবে ভারী কাজ করে যেতে পারে।

ক্রমবিবর্তন কিন্তু এগিয়ে নিয়ে গেছিল 'শোগোথ'দের। অমান্য করতে শিখেছিল 'আদিম'দের। ধূর্ততা আর ইচ্ছাশক্তি এসেছিল বংশপরম্পরায়। তারা গোটা শরীরটাকে ঠিক দু'ভাগে ভাগ করে বংশবৃদ্ধি করত। এক হত দুই। দুই হত চার। প্রতিটি পদক্ষেপে কোষে কোষে জাগ্রত হয়েছে ধূর্তামি আর শয়তানি। গুরু-নিকেশের সংকল্প।

শুরু হয়েছিল সংগ্রাম। হাতে-গড়া দানবদের কোষে কোষে ছড়িয়ে থাকা ক্রমোন্নত বুদ্ধি আর অপরিমেয় দৈহিক শক্তির কাছে অবশেষে পরাভব স্বীকার করেছিল 'আদিম' প্রভুরা।

বিপদ সেখানেই থেমে থাকেনি। পৃথিবী আকর্ষণ করেছিল অন্যান্য ভিনগ্রহীদের। লক্ষ লক্ষ বছর পরে এসেছিল হিমালয়ের তুষারমানবদের পূর্বপুরুষেরা— জেলিময় অবয়ব নিয়ে। 'শোগোথ'রা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল দূরের পাহাড়-পর্বতে।

লক্ষ কোটি বছর পরে হানা দিল আর এক আততায়ীর বাহিনী। জল এদের মূল নিবাস, তাই জলময় পৃথিবীকে দখলে আনতে চেয়েছিল। এদের শুঁড় অনেক— অক্টোপাশের চাইতেও ভয়ংকর। কারণ, এরা ছিল করাল মগজের অধিকারী।

জলসাম্রাজ্য ছেড়ে দিতে হয়েছিল এদের নৃশংস আক্রমণ ঠেকাতে না পেরে। পৃথিবীর বহু কিংবদন্তিতে সভয়ে এদের নাম উচ্চারণ করা হয়— থুলু... থুলু... থুলু!

উপর্যুপরি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে, আর জলের আদি সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় অধঃপতন শুরু হয়েছিল 'আদিম' প্রভুদের। ক্রমোন্নতির বদলে ক্রম-অবনতি। সম্মোহনের চর্চা লোপ পেয়েছিল, মনের ক্ষমতা কমে এসেছিল, শিল্প আর ইতিহাসের দিকে ঝোঁক উবে গেছিল। কসমিক এনার্জির গুপ্ত প্রয়োগের কৌশল বিস্মৃত হয়েছিল।

শেষ নয় এইখানে। এল তুষার যুগ। বরফস্তূপে মহানগরী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগেই জলে পালিয়ে গেল শক্তিমান 'আদিম'দের দুর্বল বংশধরেরা। 'থুলু'রা তখন থেকেও নেই— অক্টোপাশের রূপ নিয়েছে। লক্ষ কোটি বছর ধরে চলেছে এই অবিশ্বাস্য বিবর্তন আর পরিবর্তন।

'আদিম'রা প্রস্তুত হয়েছে হিমযুগ আসবার অনেক আগে থেকে। ওদের আসবাব থাকত ঘরের মাঝে, দেওয়ালের ধারে নয়। ওরা ঘুমাত সোজা হয়ে বসে— শুঁড় গুটিয়ে নিয়ে। র‍্যাকে থাকত ফুটকি-নকশার বই। ফুটকি-নকশা আঁকা সোপস্টোন দিয়ে গড়া পঞ্চকোণ

বস্তুগুলো ছিল তাদের মুদ্রা— উন্নত সভ্যতায় যার প্রয়োজন অপরিহার্য।

পঞ্চকোণ তাদের সমুন্নত মুগুর প্রতীক— দেবালয়ের জায়গায় বসিয়েছে মুগুর প্রতীক। পুজো করেছে নিজেদের প্রতিভাকে— যার উত্তরসূরি হতে পারেনি অধঃপতিত বংশধরেরা।

পাথরের বুকে খোদাই ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেছিলাম অবিশ্বাস্য আরও অনেক তথ্য— খুঁটিয়ে লিখতে চাই না, পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে বলে; তার চাইতেও বড় কথা, অজানা অনেক রহস্য না জানাই মঙ্গল— যে তিমিরে আছে, থাকুক সেই তিমিরে। মানুষের সভ্যতা এই পৃথিবীকে চেনবার অনেক আগে বহু সভ্যতার উত্থান আর পতন ঘটেছে— এই কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? আজগুবি বলে মনে হয় না কী?

তবে হ্যাঁ, কুমেরু মহাদেশ আজও পৃথিবীর প্রাচীনতম অঞ্চল। এখানে যে সিক্রেট রয়ে গেছে, তা সিক্রেট-ই থাকুক।

আজও পুরোপুরিভাবে জানা যায়নি এই ভয়ংকর মহাদেশের যাবতীয় ইতিবৃত্ত। 'আদিম'তনয়রা পাথরে লিখে গেছে এমন সব পর্বতের উচ্চতার মাপ— যা নাকি বিশ্বের উচ্চতম হিমালয়ের চাইতেও উঁচু।

অধঃপতিত 'আদিম' তনয়েরা এই অজানা পর্বতমালার উদ্দেশে নিয়মিত প্রার্থনা নিবেদন করেছে। ভয়ে।

ওই পাহাড়শ্রেণির বুক থেকে বয়ে আসা বিশাল নদী উপত্যকা ধুইয়ে যেখানে পাতালগর্ভে প্রবেশ করেছে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা সেই সাগরতলের মহানগরীতেই আশ্রয় নিয়েছে।

খনিসম্পদ উদ্ধারের জন্যে ঠান্ডা কমলেই উঠে এসেছে। কিন্তু মহাকায় অতি-নৃশংস অতি-ধুরন্ধর 'শোগোথ'দের অত্যাচারে সে প্রচেষ্টাও কমে এসেছে।

ওদের সেই পাতালসাম্রাজ্যে প্রবেশের দুটো পথ রেখেছে এই মহানগরীতেই। একটা রয়েছে আমরা যেখানে রয়েছি, সেখান থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে।

আর একটা তার বিপরীত দিকে— মাইলখানেক দূরে। এই দুই পথ অথবা পাতালসুড়ঙ্গ দিয়ে তারা আসত চিরতমিস্রাময় পাতালসাগর থেকে।

কিন্তু এই দুটি পথেই হানা দিয়ে গেছে অতিকায় 'শোগোথ'রা। অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী হয়েছে তারা কালক্রমে। প্রথম 'আদিম'দের টিটকিরি দেওয়ার জন্যেই তারা আদিম-কণ্ঠের অনুকরণ করে— যা বংশীধ্বনির মতন। এই শব্দই ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির লহরী তুলেছিল গিরিসঙ্কটের তুমুল বায়ুপ্রবাহে— রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা যা শুনেছি।

'আদিম' প্রভুরা হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে আর তাদের বাগে রাখতে পারেনি।

রাখতেও চায়নি। মৃত্যুরূপী শৈত্যের আবির্ভাবে মহাদেশ ছেড়ে যখন সব পাখি গেল উড়ে, রইল কেবল পেঙ্গুইন, সীল আর তিমি— তখন তারা নিরাপদ আশ্রয় নির্বাচন করেছিল পাতালের অমানিশাময় সাগরেই। ওদের পাঁচ চোখের বিশেষ কেমিক্যাল আলো বিচ্ছুরণ করে গেছে সাগরের অন্ধকারে। অন্ধকার ওদের কাছে প্রতিবন্ধক ছিল না কস্মিনকালেও।

অধঃপতিত হয়েও চোখের এই মহিমা তারা হারায়নি।

তবে হঠকারিতা দেখাতে তাদের আর ইচ্ছে নেই। পাতাল প্রবেশের দু-দুটো পথে যখন তখন হানা দিচ্ছে পিশাচপ্রতিম 'শোগোথ'রা।...

পাথরের অগণিত ছবির কিছুটার পাঠোদ্ধার করে এই পর্যন্ত জানবার পর মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছিল আমাদের তিনজনেরই। চোদ্দোটা পঞ্চকোণ মুণ্ডওলা বিভীষিকার মধ্যে ছটাকে কবরস্থ দেখে এসেছি ক্যাম্প এলাকায়। বাকি আটটা নিরুদ্দেশ হয়েছে 'বিশেষ' কিছু সামগ্রী নিয়ে। নিদারুণ 'টাফ' 'আদিম' অধঃপতিতরা কি হিমঘুম থেকে জেগে উঠেছিল? মৃত ছ'জনকে কবর দিয়ে প্রাণময় আটজন গেছে এই পথ দিয়েই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে— পাতালসাগর অভিমুখে?

দূরায়ত ওই ক্ষীণ বংশীরব কি তাদের?

না, শোগোথদের?

॥ চোঙার ডগায় মস্ত কিউব ॥

আমরা দোটানায় পড়িনি। আত্ম-সম্মোহনের ঘোরে ছিলাম। আতঙ্ক আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল ঠিকই— কিন্তু কর্তব্যের তাগিদে আমরা এগিয়েই গেছিলাম। ইলোরাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। তার পরিণতি আমরা দেখব, তবে ফিরব। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে গেছি ম্যুরাল-ছবি দেখবার ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু সে কোথায়? তাকে না নিয়ে তো ফিরব না।

কোটি কোটি বছর আগের তৈরি এই বিভীষিকা-থমথমে পাতাল গোলকধাঁধায় পথ হারাইনি একটা আশ্চর্য সূত্রের সন্ধান পেয়ে। মেঝেতে স্তূপীকৃত ভাঙাচোরা পাথর কোনও কোনও জায়গায় যেন সম্প্রতি সরিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। যেটুকু জায়গা বের করা গেছে, তার ওপর দিয়েই যেন ভারী কিছু টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সূত্র না থাকলে পাতালসুড়ঙ্গের অগুনতি গোলকধাঁধায় আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠের মধ্যে পথ হারাতাম নির্ঘাত। যদিও কাগজের টুকরো ফেলতে ফেলতে আসছি, কিন্তু টর্চের ব্যাটারি স্টক তো ফুরিয়ে এল। নিঃসীম এই অন্ধকারে ফিরে যাব কী করে? কাগজের টুকরো খুঁজে পাব কী করে?

বুক ঠুকে তবুও এগিয়ে গেছি শুধু ইলোরার জন্যে। পায়ের তলায় বরফ, ভাঙা পাথর; দেওয়ালে ম্যুরাল-ছবি নতুন করে খোদাই করা হয়েছে দেখেও ফিরে তাকাইনি। মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে প্রায় দৌড়েছিলাম বললেও চলে। 'আদিম'দের নয়া ইতিহাস এখন মাথায় থাকুক— বেঘোরে প্রাণ যাওয়ার আগে চাই ইলোরাকে— জীবিত অথবা মৃত অবস্থায়।

কত ঘুরপাক খেয়েছিলাম, কতবার হোঁচট খেয়ে গা-হাত-পা রক্তারক্তি করেছি, সেসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আর দিতে চাই না। আচমকা একটা সুদীর্ঘ ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া

টানেলের শেষের দিকে যেন দিনের আলোর ক্ষীণ আভা দেখেছিলাম। সুড়ঙ্গ ওপরদিকে উঠতে আরম্ভ করেছে। দেখেছিলাম বরফ আর পরিষ্কার করা জায়গার ওপর দিয়ে গুরুভার বস্তু টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। বড় বড় পাথর-ইমারতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে— যাদের নীচের তলা চলে গেছে বরফের তলায়। কীভাবে যে গেছি আঁকাবাঁকা পথে, তা ভাবলেও এখন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

দিনের আলোর আভা দেখেছি আরও স্পষ্টভাবে সামনের একটা প্রকাণ্ড খিলেনের মধ্যে দিয়ে। খিলেনের তলার দিকটা হিমবাহ গ্রাস করেছে। ওপরের দিকের সামান্য ফাঁক দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছি পেল্লায় এক গোলাকার চত্বরে।

প্রায় পাঁচশো ফুট ব্যাস এই চত্বরের। পায়ের তলায় পুরু হিমবাহ। ঠিক মাঝখানে একটা অতিকায় সিলিন্ডার— যার ব্যাস কম করেও একশো ফুট। পাথরের ব্লক দিয়ে গড়া সেই সিলিন্ডার সোজা উঠে গেছে প্রায় ষাট ফুট ওপরে। সিলিন্ডার ঘিরে ঘুরে ঘুরে পাথরের বাম্পস বসানো ওঠবার পথ চলে গেছে মাথা পর্যন্ত। ডগায় বসানো একটা প্রকাণ্ড ঘনক। ঘনকের নীচে সিলিন্ডার ঘিরে একটার পর একটা ভাঙাচোরা পাথরের চাকতি— যেন আংটি ভেঙেচুরে গিয়েও পাঁচটা ছুঁচোলো স্তম্ভ ঘিরে রয়েছে ভীতিপ্রদ অতিকায় কিউবকে।

স্তম্ভিত নয়নে ঘাড় বেঁকিয়ে সেদিকে চেয়েছিলাম আর ভেবেছিলাম, ওই কিউব কী ছিল, 'আদিম'দের শূন্যমার্গে বিচরণের প্লাটফর্ম? ওইখান থেকেই কি ওরা উড়ে যেত মহাকাশে, সেখান থেকে এসে অবতরণ করত এইখানে?

সুড়ঙ্গ আর ঘরের অন্তহীন গোলকধাঁধা পেরিয়ে কখনই এখানে পৌঁছতে পারতাম না যদি না পেয়ে যেতাম মেঝের ওপর দিয়ে ভারী জিনিস টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসার চিহ্ন।

সেই চিহ্ন রয়েছে বরফের ওপরেও। তিন মূর্তিমান হাঁপাতে হাঁপাতে এই সূত্র অনুসরণ করে পৌঁছেছিলাম বিশাল উঁচু বাইরের সিলিন্ডারের প্রাচীরের তলদেশে। সেখানে দেখেছিলাম পরিপাটিভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধা, উধাও হওয়া আমাদের জিনিসপত্র।

তিনটে স্লেজ, নোটবই, ছবির বই, পেট্রলের ড্রাম, যন্ত্রপাতি, ভাঁজ করা তাঁবু। আর তাঁবুর কাপড় দিয়ে মোড়া দুটো লম্বাটে পুঁটলি। বাইরে থেকে পুঁটলি দুটোর পরিচিত আকৃতি দেখে গা শিরশির করে উঠেছিল। দুটো পুঁটলির ওপরেই দুটো সাদা কাগজে ফুটকি-নকশা করে দড়ির গায়ে গুঁজে রাখা হয়েছে। পাশে পড়ে একটা ভাঙা ঝর্নাকলম। কাগজদুটো আমাদেরই নোটবইয়ের কাগজ। ছিঁড়ে নিয়ে নকশা কাটা হয়েছে। কে করেছে? ইলোরা?

দীননাথ আর চাণক্য হ্যাঁচকা টানে পুঁটলি দুটোর দড়ি খুলে তেরপল টেনে এনেছিল।

দেখেছিলাম ইলোরা আর একটা কুকুরকে। দুজনেরই ঘাড়ের কাছে কাটাকুটি করা হয়েছে। কিন্তু স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে সযত্নে ক্ষতস্থান বন্ধ করা হয়েছে। শরীরের আর কোথাও ক্ষত নেই। চোখের পাতা বন্ধ। তেরপলে মোড়া থাকা সত্ত্বেও বরফের মতন ঠান্ডা।

কিন্তু দুজনের কেউই মরেনি। হিমঘুম নাকি?

চাণক্য আর দীননাথ ইলোরার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা যখন করছে, আমি তখন স্লেজ তিনটেকে

পরীক্ষা করছিলাম। তিনটের কোনওটাই আস্ত নেই। রাবিশ আর বরফের বাধার ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে আনায় ভেঙেচুরে গেছে।

চলে এসেছিলাম মাঝখানের সিলিন্ডারের কাছে। হাঁচড়পাঁচড় করে উঠেছিলাম ওপরে। একপিস পাথর কেটে তৈরি প্রকাণ্ড কিউবের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে প্রাচীরের ওপরের দৃশ্য দেখেছিলাম।

শুধু ধ্বংসস্তূপ, আস্ত আর আধভাঙা টাওয়ার, ব্রিজ আর পঞ্চকোণ চত্বর দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে। এ যে কত বড় মহানগরী, তা চোখে দেখেও কল্পনা করা কঠিন। দূর পশ্চিমে শরীরী বিভীষিকার মতন বিরাজ করছে মেঘলোক ফুঁড়ে উঠে যাওয়া পর্বতশিখরের পর পর্বতশিখর— যার ছায়া মাড়াতেও চায়নি 'আদিম' তনয়রা। ওই পর্বত এলাকা থেকেই একদা নেমে এসেছিল বিশাল চওড়া নদী— উপত্যকার বুক চিরে পাহাড়ের সানুদেশে এসে পাতালে প্রবেশ করেছে। গিরিসঙ্কট শুরু হয়েছে অদূরে। সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের বিশেষ বিমান।

আনন্দে বুক নেচে উঠেছিল আমার। এখন যেখানে, যে সিলিন্ডারের শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছি— এই জায়গাই ছিল 'আদিম' মহাপ্রভুর প্রথম আবির্ভাবের জায়গা— এ তল্লাটের পুণ্যতম জায়গা। পাতালসমুদ্র থেকে 'আদিম'তনয়েরা ফুরসত আর সাহস পেলেই দর্শন করতে এসেছে এই পবিত্র মন্দির। আর এই প্রকাণ্ড এক পাথরের বুক-কাঁপানো কিউব নিশ্চয় অগণিত নামহীন আতঙ্কদের পরশ পেয়ে অপবিত্র হয়ে রয়েছে। ক্যাম্প এলাকা থেকে আট আতঙ্ক ইলোরা, কুকুর আর মালপত্র নিয়ে এসেছে তাদের চেনা পথে। কিন্তু এই জায়গা থেকে অবশ্যই পাতালসাগরে যাওয়ার শর্টকাট সুড়ঙ্গ আছে। থাকতেই হবে।

বিশেষ বিমান পর্যন্ত পৌঁছনোর পথও নিশ্চয় আছে। খুঁজে বের করতে হবে।

নীচ থেকে চাণক্য আর দীননাথ প্রবলবেগে হাত নাড়ছিল আর আমাকে হাঁক দিয়ে নেমে আসতে বলছিল। ওদের গলাবাজি গুমগুম শব্দ করে চোঙার মধ্যে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির মেঘ গর্জন সৃষ্টি করে শূন্যপথে ধেয়ে যাচ্ছিল।

পা চালিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে এসেছিলাম আমি। যা দেখে এলাম এইমাত্র, ফিসফিসিয়ে তা বলেছিলাম। ব্যাটারির ভাঁড়ার যখন ফুরিয়ে এসেছে, তখন শর্টকাট রাস্তা খুঁজে বের করতেই হবে। ইলোরার হিমঘুম কিছুতেই ভাঙানো যাচ্ছে না। ওকে ঘাড়ে করেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে, এখুনি। আর দেরি নয়। 'আদিম' মহানগরীতে এখন আর কোনও অভিযান নয়।

প্রত্যুত্তরে ওরা দুজনেই আঙুল তুলে দেখিয়েছিল তিনটে স্লেজ আর স্তূপাকার জিনিসপত্রের পেছন দিকে। একটু ঠাহর করতেই দেখলাম, সেখানে রয়েছে ছোট্ট একটা ফোকর। এককালে এখানে নিশ্চয় ছিল কয়েকশো ফুট উঁচু কল্পনাতীত সাইজের একটা খিলেন। এখন তার মাথাটুকু কেবল জেগে রয়েছে, জমে যাওয়া বরফের মাথায়।

গোটা প্রাচীরের আর কোত্থাও নেই এমন খিলেনশীর্ষ।

এই কি তা হলে পাতালসাগরে যাওয়ার ভূগর্ভ-সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ?

'গন্ধ পাচ্ছেন?' ফিসফিস করে বলেছিল চাণক্য।

বিষম উত্তেজনায় এতক্ষণ আমার নাসারন্ধ্র যা ধরতে পারেনি— এবার তা ধরে ফেলল।

পেট্রলের কড়া গন্ধ ভেসে আসছে ফোকরের ভেতর থেকে। সেইসঙ্গে মিশে রয়েছে বিশ্রী বিকট একটা গন্ধ— ক্যাম্প এলাকায় পঞ্চকোণ কবর খুঁড়ে যে দুর্গন্ধ পেয়েছিলাম। 'আদিম' মড়াদের গায়ের গন্ধ।

॥ পাতাল প্রহেলিকা ॥

আমি যখন বিহ্বল অবস্থায়, আমার দুই স্যাঙাৎ ততক্ষণে স্লেজ আর জিনিসপত্র ঠেলে সরিয়ে ফোকরের মুখ পরিষ্কার করে নিচ্ছে। বুঝলাম, ওরা দুর্গন্ধের পেছনেই যাবে। যাবার ইচ্ছে আমারও ষোলো আনা। তার আগে বিশেষ বিমানে ফিরে যাওয়ার পথটা আগে বের করা দরকার। ইলোরার হিমঘুম দেহ সেখানে রাখা দরকার। ওকে নিয়ে তো পাতালসাগরের সন্ধানে যাওয়া যায় না।

মুখ ফুটে বলেছিলাম আমার আপত্তির কথা। তুখোড় চাণক্য তৎক্ষণাৎ আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, সুড়ঙ্গের দেওয়ালের ম্যুরাল-ছবি থেকে আমরা কী জেনে এসেছি। পাতালসাগরের প্রবেশের সুড়ঙ্গমুখ এখান থেকে যেদিকে, সামনের এই নয়া সুড়ঙ্গও গেছে সেইদিকে— পাহাড়ের সানুদেশের দিকে। আর ওইদিকের গিরিসঙ্কটের কাছেই তো রয়েছে আমাদের বিশেষ বিমান। চোঙার মাথায় উঠে আমি দেখে এসেছি বিশেষ বিমান রয়েছে কোথায়। সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে গেলে অজস্র অলিগলির একটাও কি গিরিসঙ্কটের দিকে যায়নি? নিশ্চয় গেছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে না। কম্পাসের কাঁটা দেখে আমরা শুধু একদিকেই যাব। তারপর যে সুড়ঙ্গের মুখে আলোর নিশানা দেখব, সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

নাছোড়বান্দাদের যুক্তির কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছিল আমাকে। আমি গোঁয়ার গোবিন্দ নই দীননাথের মতো। কিন্তু চাণক্য বিলক্ষণ ধূর্ত। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যে বিলক্ষণ প্রখর, তাও আমি জানি।

কিন্তু ইলোরাকে কে বইবে? চাণক্যর দ্বারা সম্ভব নয়। দীননাথকে কিছু বলতেও হল না। ওর ষাঁড়ের মতন চওড়া কাঁধে অক্লেশে তুলে নিল ইলোরার পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হিমঘুমে অচেতনপ্রায় দেহ। ইলোরা যেন একটা হালকা শোলা। হনহন করে ঢুকে গেল সরু ফোকর দিয়ে। গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল পায়ের দিকে চেয়ে।

পেট্রলের কড়া গন্ধর কারণটা দেখলাম। একটা ড্রাম উলটে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এখান দিয়ে। গড়ানে সুড়ঙ্গ। মুখ দিয়ে পেট্রল চুঁয়ে পড়তে পড়তে গেছে।

এইবার মনে পড়ল। ক্যাম্প এলাকায় ছিল মোট তিন ড্রাম পেট্রল। ভেবেছিলাম, তিনটে ড্রামই ঝড়ে উড়ে গেছে। ফোকরের মুখে দেখেছি দুটো। উত্তেজনায় ভেবে দেখিনি, থাকা উচিত তিনটের।

একটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঢালু পথে। কেন? পেট্রল অতি দাহ্য পদার্থ। দেশলাই পর্যন্ত লুঠ করে এনেছে যারা, তারা পাতালরন্ধ্রে পেট্রলের আগুন জ্বালাতে চায়। কী মতলবে?

ধন্দ নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইছে না দীননাথ আর চাণক্য। বাতাসে 'আদিম' মড়াদের দুর্গন্ধ উগ্রতর হয়েছে, তা নিয়েও ওদের মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু আমার আছে। পাতালের পাকচক্রে নেমে কোন আতঙ্কের সামনে পড়ব জানি না— তৈরি হয়ে যাওয়াই সমীচীন।

তাই থমকে গেছিলাম। বুঝিয়ে বলেছিলাম। ধড়িবাজ চাণক্য তক্ষুনি বুঝে নিয়েছিল। খানিকটা তেরপল ভিজিয়ে নিয়েছিল পেট্রলে। পকেটে রেখেছিল দেশলাই। একাই একটা পেট্রলের ড্রাম টেনে এনে গড়িয়ে দিয়েছিল ঢালু পথে। কিন্তু গড়ানে পথেও যে বাম্পস রচনা করা হয়েছে। সিঁড়ির ধাপের বিকল্প ব্যবস্থা। ড্রাম সেখানে যতবার আটকেছে, চাণক্য ততবার ঠেলে ঠেলে বাম্পস পার করেছে। টর্চ জ্বেলে পথ দেখিয়েছি আমি। দেখেছি, ফোকর মুখ সরু হলেও পাতালসুড়ঙ্গের সিলিং প্রায় পনেরো ফুট উঁচুতে।

ড্রাম গড়াচ্ছে। গুমগুম আওয়াজ। এমন সময়ে ভীষণ সেই শব্দপরম্পরা ছাপিয়ে সুড়ঙ্গের গভীর থেকে যেন ভেসে এল ব্যঙ্গের সুরে ক্ষীণ বংশীধ্বনি, পর পর কয়েকবার। তারপর সব নিস্তব্ধ।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা তিনজনেই।

ব্যঙ্গময় এই বংশীধ্বনির রক্তজমানো ঐকতান শুনেছি বাতাসের হাহাকারের মধ্যে— গিরিসঙ্কটে। ক্ষীণভাবে শুনেছি পাতালরন্ধ্রে। এখন যা শুনলাম, তা অবিকল তার প্রতিধ্বনি— একটু বিকৃত, ব্যঙ্গ ভরপুর।

মনে পড়ে গেল, চিত্র-কাহিনি। বিবর্তনের ধাপ বেয়ে উঠে এসে 'আদিম' গুরুদের বংশীধ্বনি-কাকলি অনুকরণ করতে শিখেছিল বহুরূপী বিরাট 'শোগোথ'রা— টিটকিরি মিশানো ছিল সেই সুরে।

এইমাত্র যে বংশীধ্বনির অতি-ক্ষীণ সুর ভেসে এল কর্ণরন্ধ্রে তার মধ্যেও রয়েছে প্রচ্ছন্ন উপহাস।

আর এগোনোর ইচ্ছে ছিল না আমার। কিন্তু চাণক্য ড্রাম ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে গেছিল আমার আর দীননাথের আগে। তাই সে দেখেছিল আরও কিছু। হাত নেড়ে ডাকল আমাকে। দীননাথ বোঝা নিয়ে মন্থরগতি হয়েছে দেখে দৌড়ে গেলাম আমিই।

চাণক্যর কাছে গিয়েই দেখলাম আলোর চাপা আভা— যে আলো দেখে ও হয়েছে উত্তেজিত।

সুড়ঙ্গ সেখানে অতর্কিতে অতিকায় গোল গম্বুজ হয়ে গেছে। অথবা বলা যায়, যেন একটা মস্ত পাথরের গামলা উপুড় করা রয়েছে। প্রায় ষাট ফুট উঁচু ছাদকে ধরে রেখেছে দু'পাশের দুটো মোটা থাম। গোলাকার গামলাগহ্বরের একদিকে রয়েছে নিখুঁত চৌকোনা সুড়ঙ্গমুখ।

নিঃসন্দেহে পাতালসমুদ্রে যাওয়ার প্রবেশপথ।

কারণ, ভলকে ভলকে সাদাটে বাষ্পকুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসছিল এই চৌকোনা হাতে গড়া সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে। ধেয়ে আসছিল গরম বাতাসের স্রোত। কনকনে ঠান্ডার সংস্পর্শে এসেই বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে ওপর দিকে— ছাদের ফুটো দিয়ে। দূর থেকে এই বাষ্পকুণ্ডলী দেখেই ভেবেছিলাম, হয়তো আগ্নেয়গিরি।

চোখ নামিয়ে চেয়েছিলাম চৌকোনা সুড়ঙ্গের ভেতরদিকে। কুণ্ডলী পাকিয়ে বাষ্প আসতে থাকায় দৃষ্টি ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু অনুমিতির কল্পনা পাখনা মেলে দিয়েছে। উষ্ণ বায়ুস্রোত উঠে আসছে অবশ্যই ভূগর্ভ-সাগর থেকে। যেখানকার জল বিলক্ষণ উষ্ণ পৃথিবীর উত্তপ্ত কেন্দ্রের উত্তাপের কারণে।

আমি যখন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি চৌকোনা সুড়ঙ্গমুখের দিকে, দীননাথ তখন একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাঁদিকে। সেদিকে রয়েছে ছোট্ট একটা সুড়ঙ্গমুখ। দিনের আলোয় ম্লান আভা যেন গড়িয়ে আসছে সেখান দিয়ে।

এক পলকেই বুঝলাম। মনে পড়ে গেল ম্যাপের সংকেত। গিরিসঙ্কট আছে ওই দিকেই। আছে আমাদের বিশেষ বিমান।

॥ কী ভয়ংকর ॥

দ্রুত শলাপরামর্শ করে নিয়েছিলাম তিনজনে। আগে ফেরা যাক বিশেষ বিমানে। ইলোরাকে নিয়ে দীননাথ থাকুক সেখানে। ফিরে আসব আমি আর চাণক্য।

তাই করেছিলাম। ছোট সুড়ঙ্গ খাড়াই ভাবে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছিল পঞ্চকোণ একটা চত্বরে। বেরোবার পথ জুড়ে রয়েছে ভেঙে পড়া বড় বড় পাথরের চাঁই। এই কারণেই আকাশ থেকে এই গহ্বরের মুখ আমরা দেখতে পাইনি।

পাথরের ওপর দিয়ে ব্যালেন্স বজায় রেখে তিনজনে পঞ্চকোণ চত্বরের বাইরে এসে দেখতে পেয়েছিলাম দূরের গিরিসঙ্কট আর আমাদের বিশেষ বিমান।

আমি আর চাণক্য যাইনি দীননাথের সঙ্গে। ওই কেঁদো বাঘের মতন চেহারা নিয়ে ও একাই যাক ইলোরাকে কাঁধে নিয়ে।

ফিরে এসেছিলাম পাথর টপকে ছোট গুহায়। সেখান থেকে উপুড়-গামলা গহ্বরে। দাঁড়িয়েছিলাম কুচকুচে কালো পাথর-বাঁধাই চৌকোনা গহ্বরের সামনে।

'আদিম' মড়াদের দুর্গন্ধ শ্বাসরোধ করার উপক্রম করেছিল আমাদের। টর্চের আলো মেরে গন্ধের উৎস সন্ধানে একটু এগোতেই দেখেছিলাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আটটা মড়া।

আস্ত নয় কোনওটাই। অসম্ভব 'টাফ' এদের শরীর। বিপুলতর শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে প্রত্যেকের ওপর। তারকা গড়নের পঞ্চমুখ মুণ্ড টেনে ছিঁড়েছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে দূরে দূরে। ছেঁড়া হয়েছে শুঁড় আর বাহু-প্যাডেল। এত মড়াপচা গন্ধ এই কারণেই।

বীভৎস সেই দৃশ্য দেখে রক্ত হিম হয়ে গেছিল আমাদের ঠিকই— কিন্তু নামহীন আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম অন্য একটা জিনিস দেখে।

চকচকে আঠার মতন কী যেন লেপটে রয়েছে প্রতিটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গ আর প্রত্যঙ্গে, লেগে রয়েছে সুড়ঙ্গের মেঝেতে। টর্চের আলোয় চিকমিকে রোশনাই বিকিরণ করছে। ঠিক যেন জেলি।

'চাণক্য, আর এগিয়ো না।'— অবরুদ্ধ স্বরে বলেছিলাম আমি।

চাণক্য আমার কথা শোনেনি। কুণ্ডলীপাকানো গরম বাষ্পস্রোতের বাধায় দৃষ্টি বেশি দূর যাচ্ছিল না বলেই পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ও। মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমাকেও যেতে হয়েছিল পেছন পেছন। তাই দেখতে পেয়েছিলাম পেট্রলের ড্রামটা। যে ড্রাম গড়িয়ে এনেছে মৃত্যুপথযাত্রী আট 'আদিম' আতঙ্ক। ভয়ালতর আতঙ্কের ডেরায় ঢুকে প্রাণ দিয়েছে, ড্রাম নিয়ে আর এগোতে পারেনি। 'আদিম' আলয়ে ফিরে যেতে পারেনি।

চোখ-মুখ কঠিন হয়ে গেছিল চাণক্যের। পেছিয়ে গিয়ে ফেলে আসা ড্রামটাকে গড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। দুটো ড্রাম পাশাপাশি রেখে দুটোরই মুখের ক্যাপ খুলে দিয়েছিল।

হুড়হুড় করে পেট্রল যখন গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে ঢালু সুড়ঙ্গপথ বেয়ে, তখন ও পেট্রলে ভিজিয়ে নিয়ে তেরপল ধরেছিল এক হাতে, আর একহাতে নিয়েছিল দেশলাই। একা দৌড়ে চলে গেছিল অন্ধকারের গভীরে— টর্চ না নিয়ে।

হাতে টর্চ নিয়ে আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। বাষ্পকুণ্ডলীর মধ্যে সামনের ধাবমান মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগেই আমি পেছন ধরে ছিলাম।

পায়ের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নামছিল পেট্রলের স্রোত। কড়া গন্ধে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে।

দম আটকে গেল পরক্ষণেই গম্ভীর করাল বংশীরবে— বর্ণনাতীত সেই নিনাদে আর নেই উপহাস, আছে হুংকার, আছে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি।

অপরিসীম ধূর্ত চাণক্যও আর এগোয়নি। ও যেন স্পেনের বুল-ফাইটারের কেরামতি দেখিয়ে গেল। পেট্রল-ভেজা তেরপল শূন্যে নাড়তে নাড়তে অট্টধ্বনিতে গলার শির তুলে চেঁচিয়ে গেল, 'ওরে আয়! ওরে আয়! ওরে আয়!'

সে এল। বাষ্পকুণ্ডলীর মধ্যে দ্রুত আগুয়ান রেলগাড়ির মতন সুদীর্ঘ বপু পলকের জন্যে ঠাহর করলাম। সুড়ঙ্গ ভরে গেছে তার স্ফীত কলেবরে। প্রেতকায় সাদা উপচ্ছায়া বললেও তার বর্ণনা দেওয়া যাবে না— তার সারা গা থেকে ঝলকে ঝলকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রকমারি রঙের রশ্মি... রেল ইঞ্জিনের কর্ণবধিরকারী 'কু' ধ্বনির মতন বিরামহীন বংশীধ্বনিতে সুড়ঙ্গ যেন চৌচির করে দিতে চাইছে।

ওইটুকু দেখেই আমি পেছন ফিরে দৌড়েছিলাম। গোল গহ্বরে এসে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে চাণক্যকে হাত ধরে টানতে গিয়ে দেখি, সে নেই।

কু-উ-উ-উ হুহুংকারে আমার কান তখন ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে। সামনে সাদাটে বাষ্পকুণ্ডলী ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। চাণক্যকে তো নয়ই।

বেশ বুঝলাম, চাণক্য মরছে। আমাকেও মারছে।

তবুও পালাতে পারলাম না। দু'পা আমার অবশ হয়ে গেছিল।

আচম্বিতে দেখলাম চাণক্যর আখাম্বা লম্বা মূর্তি। উটের মতন ঠ্যাং ফেলে নক্ষত্রবেগে

দৌড়ে বেরিয়ে এল বাষ্পকুণ্ডলীর আবরণ থেকে। দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চাহনিতে অস্বাভাবিকতা।

ড্রাম দুটোর কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। কোনও ড্রামেই তখন আর পেট্রল নেই— গড়িয়ে নেমে গেছে যাচ্ছে। পেট্রল ভিজোনো তেরপল মাটিতে রেখে দু'হাতে জ্বালালো একটা দেশলাইয়ের কাঠি। একহাতে তেরপল তুলে নিয়ে আর এক হাতের জ্বলন্ত কাঠিতে ছুঁইয়ে নিতেই নিমেষে দপ করে জ্বলে উঠল তেরপল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মেঝেতে পেট্রলের ধারা লক্ষ্য করে দূর থেকে ছুড়ে দিল জ্বলন্ত তেরপল। পেছন ফিরেই দৌড়ে এল আমার দিকে।

ও যা দেখেনি, আমি তা দেখেছিলাম। বাষ্প-যবনিকার দিকে আগুনের স্রোত ভীমরবে ধেয়ে যেতেই আঁধারজগতের শ্বেত বিভীষিকা বেরিয়ে এল বাষ্প ফুঁড়ে।

সেইসঙ্গে কানের পর্দায় আছড়ে পড়ল অবর্ণনীয় অপার্থিব হাহাকার— টেকেলি-লি... টেকেলি-লি!

ঠিক এই মর্মবিদারী শ্বেত-প্রহেলিকা-গর্জনের কথা লিখে গেছেন যশস্বী লেখক এডগার অ্যালান পো তাঁর 'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি' কাহিনিতে। কুমেরুর ভয়ংকরের সেই ডাক স্বকর্ণে শুনলাম।

এবং আর একটুও সময় দিলাম না।

ঘূর্ণিত চক্ষু উন্মাদপ্রায় চাণক্যকে হাত ধরে টেনে দৌড়লাম ছোট গহ্বরের দিকে... যেতে যেতে শুনলাম 'টেকেলি-লি... টেকেলি-লি' ডাক যেন বিমূর্ত হয়ে তাড়া করেছে আমাদের দুজনকে... তারপর শুনলাম বিস্ফোরণের প্রলয়ংকর নিনাদ।

মাথার ওপর কাঁপুনি এসে পাথর ধসিয়ে দেওয়র আগেই গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম পঞ্চকোণ চত্বরে। পাথরের পর পাথর টপকে যখন দৌড়চ্ছি বিশেষ বিমানের দিকে, তখন প্রলয়নিনাদ শুনলাম যেন পেছনে।

দেখলাম, পঞ্চকোণ চত্বর ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে— আগুন লকলকিয়ে ধেয়ে আসছে— পাথরের চাঁই শূন্যে ঠিকরে যাচ্ছে।

চাণক্য যা দেখেছিল, আমি তা দেখিনি— তাই ও আজও অসুস্থ। প্রায় উন্মাদ। নার্ভের দফারফা হয়ে গেছে।

ইলোরার হিমঘুম ভাঙানো গেছে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর। কিন্তু ওর মগজের জ্ঞানের ভাণ্ডার শুষে নিয়েছিল নিশ্চয় 'আদিম' আতঙ্কেরা ঘাড়ের কাছে অস্ত্রোপচার করে। ও নিজের নামটা পর্যন্ত মনে করতে পারছে না।

মারক মৌমাছি

১. পিকনিক

জায়গাটা কলকাতা থেকে মোটরপথে খুব দূরে নয়। সুন্দরবনের কাছে। ভোরবেলা বেরিয়ে পিকনিক সেরে রাত দশটার মধ্যেই ফিরে আসা যায়। এখন তো লম্বা লম্বা চওড়া চওড়া সড়ক তৈরি করে দিচ্ছে সরকার মোটরবিলাসীদের জন্যে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে দিকে দিকে চরকিপাক মারা জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে শরৎ যখন হাতছানি দিচ্ছে, মা দুগ্‌গার আসবার সময় হয়ে গেছে, তিনি ছেলেমেয়ে বাহনদের নিয়ে গোছগাছ শুরু করে দিয়েছেন কৈলাসে, শিবঠাকুর রেগে ব্যোম হয়ে রয়েছেন বউয়ের ফি বছরে বাপের বাড়ি যাওয়া নিয়ে, সেই সময়ে পুজোর কেনাকাটা শেষ করে, পিকনিকের মরশুম শুরু হওয়ার আগেই পিকনিকের পাট চুকিয়ে দেওয়ার জন্যে চণ্ডীগ্রামে গেছিলেন সমুদ্র সরকার সপরিবারে।

আবহাওয়া বেশ মোলায়েম। বৃষ্টিবাদলার পাট চুকে গেছে। পিকনিক স্পটে ফুলপরিদের দেখা না গেলেও ফুলের মরশুম শুরু হয়ে গেছে। প্রজাপতি উড়ছে। তাজা হাওয়া বইছে। শহর থেকে দূরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাচ্ছে।

মধুকর মৌমাছিরা এমন সুযোগ ছাড়বে কেন? ক্ষিপ্তের মতো তারা মধু সঞ্চয় করে চলেছে। ফুল যখন অঢেল, তখন তো তারা হদ্দ কুঁড়ের মতো বাড়িতে বসে থাকতে পারে না। কত কাজ, কত কাজ, ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি বেড়ে গেছে বহুগুণ। শীত জমিয়ে নামবার আগেই মধু সঞ্চয় করে নিয়ে ফের শুরু হবে বসন্তের জন্যে প্রতীক্ষা।

রাস্তার ওপর লেটেস্ট মডেলের গাড়িখানা রেখে দিয়েছেন সমুদ্র সরকার। পিকনিকের সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকেছেন জঙ্গলের মধ্যে। ভদ্রলোক বলিষ্ঠকায় পুরুষ এবং বিলক্ষণ আমুদে। জীবনটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার মন্ত্রগুপ্তি জানেন। মুখে বলেন, বিরাম কাজেরই অঙ্গ, একসাথে বাঁধা, নয়নের পাতা যেন নয়নেই গাঁথা। কোন কবির লেখা, তা তাঁর মনে নেই। তবে, ফুর্তিবাজ বলেই সময় পেলেই হুটহাট ইতিউতি যাবার জন্যে কিনেছেন পেল্লায় গাড়িখানা।

ভদ্রলোকের গিন্নিমহোদয়াও কম যান না। স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেন। তাঁর

নামটিও স্বামীর নামের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। সাগরিকা। তবে, হাইট মোটে পাঁচ ফুট। কিন্তু প্রাণশক্তিতে ভরপুর। যেন টগবগ করে ফুটছেন অষ্টপ্রহর। পাতলা শরীরখানা যেন আগাগোড়া তার দিয়ে বাঁধা। টানটান। পাঁচ ছেলেমেয়ে মা-বাপের ছাঁচে ঢালাই করা। বিল্টু একটু নাদুসনুদুস, কিন্তু বড্ড দুরন্ত। মিলি দেখতে ছোটখাটো হলে কী হবে, শরীরখানা যেন আগাগোড়া তার দিয়ে বাঁধাই, টংকার দিয়ে চলেছে যখন তখন। এদের পরেই শান্তা, টিঙ্কি আর বাদলা, এ বলে আমাকে দেখো, ও বলে আমাকে দেখো। প্রাণচঞ্চল প্রতি মুহূর্তে। জঙ্গলের মধ্যে দুরন্তপনা করবার জায়গা নিজেরাই বেছে নিয়েছে। মাঝখানে সবুজ ঘাসের কার্পেট পাতা খানিকটা জমি ঘিরে নানারকম গাছ। পাখিরা কলধ্বনি করে চলেছে, পোকামাকড়রা বিনবিন করে যাচ্ছে। বেশ জায়গা।

ছেলেমেয়েরা খেলছে খেলুক। সমুদ্র সরকার একটা ক্যাম্প চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বেশ মৌজে আছেন। কোলের ওপর ট্রানজিস্টর রেডিয়ো থেকে সুমধুর সংগীত জঙ্গলের ঐক্যতানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। সাগরিকা নরম রোদ পোহাচ্ছেন ঘাসে পাতা সতরঞ্চিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। রোদে একটু গা ময়লা হবে ঠিকই, তাতে বয়ে গেল। ময়লা গাত্রবর্ণ না হয় আর একটু গাঢ় হবে— কিন্তু সূর্যশক্তি তো আহরণ করা যাবে। ভদ্রলোক কত দূর থেকে সৌরশক্তি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তার যৎকিঞ্চিৎ শরীর দিয়ে গ্রহণ করলে অনেক রোগের আপদ বালাই দূর থেকে পেন্নাম করে চম্পট দেবে।

দুপুরের আহার গ্রহণ করার সময় নিকটতর হতেই সমুদ্র সরকার ঘাসের ওপর পেতে দিলেন একটা কাশ্মীরি কার্পেট। ধড়ফড় করে বেরোতে হয়েছে বলে সাগরিকা হাতের কাছে যা যা পেয়েছিলেন, তাই দিয়ে পিকনিক বক্স ঠেসে নিয়েছেন। এখন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবারদাবারের দিকে। কাবাব দিয়ে বানানো স্যান্ডউইচ, কেক, বেশ খানিকটা আলুর দম, জামবাটি ভর্তি মিষ্টি আচার, পটাটো চিপস, চিজ কিউব, ছানা, চানাচুর, গাঁটিয়া, চিনেবাদাম, রসগোল্লা, সন্দেশ, আইসক্রিম, সফ্‌ট ড্রিঙ্ক, মধু...

মন্দ কী। পেটুক ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে এতসব আনতে হয়েছে। তাতেও কুলোয় কিনা সন্দেহ। খাবার নিয়ে মারামারি তো করবেই। যত না খাবে, তার চাইতে বেশি চেঁচাবে।

জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দুরন্তগুলো একটা পিকনিকের উনুন বানিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে। মায়ের কাছে শুনেছিল। চড়ুইভাতি করতে গেলে উনুন বানিয়ে আগুন জ্বালাতে হয়। সেই আগুনে শুকনো ঘাসপাতা কাঠকুটো ঢেলে ধোঁয়া বানাতে হয়, তবেই তো হয় বনভোজন, নইলে কি ফিস্ট জমে। ধোঁয়ায় তাই চারদিক ঢেকে গেছে। তারপর যখন চোখ জ্বালা করছে তখন দৌড়ে এসেছে কাশ্মীরি কার্পেটে সাজানো রাশি রাশি খাবারের দিকে, পাখির ছানারা যেভাবে হাঁ করে জড়ো হয় মায়ের চারপাশে, সেইভাবে। কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেছে খাবার নিয়ে। হাল ছেড়ে দিয়েছেন তাদের মা। বাড়িতে তো সব নিখাকি। পিকনিকে এসে উলটো মূর্তি। যা পারে করুক।

মিলি ভালমানুষি দেখিয়ে বললে, মা একটু মধু নেব? মধু খুব উপকারী। খেলেই এনার্জি। অনুমতির অপেক্ষা না রেখে পাঁউরুটির ওপর নিজেই হড়হড় করে ঢেলে নিল খানিকটা মধু।

তারপর আর একজন। দেখতে দেখতে মধুর বোতল ঘুরে এল এক রাউন্ড। খালি পেটমোটা শিশিটা জঙ্গলের মধ্যে ছুড়ে দিল একজন।

ঝোপের মধ্যে পোকামাকড়দের হুঁশিয়ারি গুঞ্জন শোনা গেছিল তখনই।

ওদিকে জ্বলছে আগুন, উঠছে ধোঁয়া। অত খড়কুটো শুকনো ঘাসপাতা আগুনের ছোঁয়া পেয়ে ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে এনতার। দেখে মজা পাচ্ছে বাচ্চারা। এই না হলে বনভোজন।

মৌমাছিটাকে দেখা গেল তখনি। মধুর শিশিতে ঢাকনি দেওয়া হয়নি। একটা মৌমাছি ঢুকে পড়েছে ভেতরে। টিঙ্কি টুক করে শিশিতে ঢাকনি এঁটে দিয়ে বললে, 'ওমা, ধরেছি একটা মৌমাছি!'

দৌড়ে এল বাদলা, 'কত বড় মৌমাছি, মা!'

সত্যিই বেশ বড় মৌমাছি, সাইজে মার্বেল গুলির মতো কালো কুচকুচে। পিঠের দিকে লাইনবন্দি কমলা রঙের চুলের গোছা।

মিলি বললে, 'নিশ্চয় ভোমরা।'

তার মা বললেন, 'মৌমাছি, মধু লুঠ করে মৌচাকে জমায়।'

বলে, ভয় ভয় চোখে চেয়ে রইলেন শিশিতে বন্দি মৌমাছিটার দিকে। মৌমাছি, ভোমরা, বোলতা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান খুব বেশি নয়। মৌমাছি যে এমন পেল্লায় হতে পারে, তাও জানা ছিল না।

বললেন, 'রানি মৌমাছি নিশ্চয়।'

মিলি বললে, 'মা, তুমি কিচ্ছু জানো না। রানি মৌমাছি উড়ে উড়ে বেড়ায় না। উড়ে যায় শুধু বর-এর কাছে।'

বিল্টু বরাবর বেশি ডানপিটে। এতবড় একটা মৌমাছিকে কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখা দরকার বলে শিশি তুলে নিল চোখের সামনে। হাতে নিয়েই এগিয়ে গেল কয়েক পা। দৌড়চ্ছে। খেলা হচ্ছে।

চঞ্চল হল নিশ্চল মৌমাছি। শিশির ভেতর থেকে ভেসে এল তার হুংকার। চমকে দেওয়ার মতো গলাবাজি। যেন ঝংকার উঠল সেতারের তারে।

আচমকা সেই ভয়ানক গুঞ্জনধ্বনি শুনে ভয় পেয়ে হাত থেকে শিশি ফেলে দিল বিল্টু। গুঁড়িতে ঠোক্কর খেয়ে আলগা করে লাগানো ঢাকনি খুলে যেতেই বন্দি মৌমাছি ফুরুক করে উড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

হাঁক দিলেন সমুদ্র সরকার, 'সরে আয়, সরে আয়, অতটা মধু তো গেল!'

বাপের হুকুম। কী আর করা যায়। পলাতক মৌমাছির পেছনে না দৌড়ে ছেলেমেয়েরা ঠেসাঠেসি করে বসে গেল কাশ্মীরি কার্পেটের ওপর, মাকে ঘিরে। শুরু হয়ে গেল খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল প্লাস্টিক প্লেট আর স্টাইরোফোম গেলাস। আইসক্রিম-কুকি'র পর্যায়ে যখন পৌঁছেছে, তখন বিল্টু দেখতে পেল ফেলে আসা মধুর শিশির ওপর জড়ো হয়েছে ডজনখানেক মৌমাছি। আরও মৌমাছি এসে গেছে ছুড়ে ফেলে দেওয়া কাপ-ডিশের ওপর। মাঝে মাঝেই একটা করে মৌমাছি উড়ে চলে যাচ্ছে কাছের বড় গাছটার দিকে। সাহসী বিল্টু তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল মধু সংগ্রাহক মৌমাছিদের, কিন্তু তারা

চম্পট না দিয়ে অদ্ভুত গজরানি ছাড়ায় বিল্টু আর সে চেষ্টা করেনি।

কাশ্মীরি কার্পেট ঘিরেও চক্কর মারছে মৌমাছির দল, ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়া জিনিসগুলোর ওপরেও চরকিপাক দিচ্ছে। সরে যাচ্ছে। আবার এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি হওয়াটা বাড়ছে একটু একটু করে। সাগরিকা বললেন, 'মতিগতি সুবিধের মনে হচ্ছে না।' বলে উড়ন্ত মৌমাছিদের নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে একটা মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে বসে পড়লেন একটু তফাতে, ঘাসের ওপর। দিনটাকে উপভোগ করা যাক। ছেলেমেয়েরা কিন্তু মজা পেয়েছে মৌমাছিদের দেখে, টুকটাক খাবারের টুকরোটাকরা ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে তাদের দিকে। মজা করতে এসেছে, করবে না কেন? এমন দিনেই তো বাবা-মায়েরা শাসন ঢিলে করে দেয়।

কিন্তু ম্যাগাজিন নিয়ে তন্ময় হতে পারলেন না সাগরিকা। দেখলেন, ছোট মেয়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ছুটে আসছে তাঁর দিকে, 'মা, মা, একটা মৌমাছি তাড়া করেছে আমাকে!'

ম্যাগাজিন উপুড় করে রেখে উঠে পড়লেন সাগরিকা। মেয়ের কাছে গেলেন। বললেন, 'দূর বোকা। মৌমাছিকে আবার ভয় কীসের?'

মেয়ে কিন্তু দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে, কয়েক ইঞ্চি পেছনেই জেট ফাইটার প্লেনের মতো উড়ে এল একটা মৌমাছি।

চোখ গেল উড়ুক্কু পতঙ্গের পেছন দিকে। কাশ্মীরি কার্পেটের ওপর রাখা উদ্দিষ্ট খাবারদাবারের ওপর ভনভন করছে একদল মৌমাছি, গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েছে প্রতিটা খাবারের ওপর।

ছোট মেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'যাচ্ছেতাই! চারদিক থেকে আসছে।'

মা বললে, 'তাই তো রে! মৌমাছি শুধু ফুল আর ফুলের মধু ভালবাসে জানতাম। এরা তো দেখছি রাক্ষুসে মৌমাছি।'

মৌমাছির দল ততক্ষণে মধু মিষ্টি খাবারদাবারই নয়, খিদের চোটে স্টাইরোফোম কাপ-গেলাসগুলোকেও খেতে আরম্ভ করেছে।

একি নষ্টামি! বাচ্চাকাচ্চাগুলো যে ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। কীটনাশক বোতলটা কার্পেট থেকে তুলে নিয়ে জোরে টিপে রইলেন সাগরিকা, টার্গেট মৌমাছিরা।

কিন্তু যেন খেপে গেল মৌমাছি বাহিনী। মাটি ছেড়ে উঠে গেল একটু ওপরে, ঘুরপাক খেয়ে গেল দল বেঁধে। একটু দূরেই চড়ুইভাতির জন্যে যে কাঠ জ্বালিয়ে এসেছিল ছেলেমেয়েরা, তার ওপরে গিয়ে কতকগুলো মৌমাছি পটপট করে ফেটে গেল পটকার মতো। যেন খুদে ঝড়ের মেঘ দেখা গেল রাগী পতঙ্গদের মধ্যে।

সমুদ্র সরকার রেডিয়ো নিয়ে তন্ময় হয়েছিলেন। এত কাণ্ড তাঁর কানে যায়নি। তেড়ে গিলেন সাগরিকা তাঁর দিকে, 'শুনছ? এখানে আর নয়। পালানো যাক।'

রেডিয়ো বন্ধ করে চোখ তুলে থ হয়ে গেলেন সমুদ্র সরকার। এতক্ষণ আওয়াজটা কানে যায়নি, রেডিয়ো চলছিল বলে। এখন শুনতে পেলেন ভোঁ-ভোঁ-বন-বন-গোঁ-গোঁ আওয়াজ। পিলপিল করছে মৌমাছি গাছের ওপর, কার্পেটের ওপর, ঘাসের ওপর। যেন একটা খুদে ঝটিকা।

চোখ তুললেন আকাশের দিকে। আকাশ কালো হয়ে গেছে মৌমাছি বাহিনী এসে যাওয়ায়।

তীক্ষ্ণ গলায় সাগরিকা বললেন, 'উঠে যা গাড়িতে, পড়ে থাক সব জিনিস! দৌড়ো'!

ছোট মেয়ে কাতরে উঠল ঠিক তখনই, 'মা! মা! আমার চুলের মধ্যে একটা ঢুকে পড়েছে!' চুল খামচে ধরে আগন্তুক মৌমাছিকে টেনে বের করবার চেষ্টা করছে। মুখচোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন শরীরের মধ্যে আগুন ঢুকে গেছে। যন্ত্রণা ঠিকরে যাচ্ছে বিকৃত চোখ মুখ থেকে। ঘেসোজমির ওপর এসে গেছে মৌমাছি বাহিনী। গুঞ্জনধ্বনি এখন অরগ্যান বাজনার মতো কানের পরদায় আছড়ে পড়ছে। আকাশ থেকে গোঁত খেয়ে নেমে আসছে দলে দলে মৌমাছি। সমুদ্র সরকার ট্রানজিস্টর ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘাড় চাপড়াচ্ছেন। মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে ঘাড়ে।

সাগরিকা দৌড়তে গিয়ে থেমে গেছেন ভয়াল ভয়ংকর সেই শব্দগুঞ্জন শুনে। ভোঁ-ও-ও-ও আওয়াজটা এখন যেন সাইরেনের আওয়াজের মতো কানের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে। মৌমাছি বাহিনী নিমেষমধ্যে ঘিরে ধরল তাঁকে। ছেয়ে ফেলল সর্বাঙ্গ। ঘাড়ে, হাতে, কপালে— সর্বত্র শুধু মৌমাছি। দু' হাতে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু পারছেন না... যেন একসঙ্গে একশোটা বর্শার ফলার মতো ঢুকে গেল শরীরের মধ্যে। ঠেলে বেরিয়ে এল চোখ, ফুলে উঠল নাকের পাটা। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা পাক দিচ্ছে বুকের ভেতরে। নিশ্বাস আটকে আটকে যাচ্ছে। হাঁ করে ছিলেন শ্বাস নেওয়ার জন্য— জিভের ওপর হুল ফুটিয়েছিল একটা মৌমাছি। মাটিতে আছড়ে পড়ার সময়ে শুধু একটা চিন্তাই ঘুরপাক খেয়ে গেছিল মাথার মধ্যে, ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা কী?

২. বৈজ্ঞানিক

পরের দিন সব ক'টা খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়ে গেল খবরটা।

মারক মৌমাছি? মারক মৌমাছি?

চিত্তাকর্ষক এহেন শিরোনামের নীচেই সংবাদ পরিবেশনের পারিপাট্য দেখিয়ে গেল প্রতিটা সাংবাদিক। হোমরা চোমরা এক ভদ্রলোক সপরিবারে পিকনিক করতে গিয়ে নাকি খুনে মৌমাছিদের খপ্পরে পড়ে সপরিবারে পরলোকগমন করেছেন। নিষ্ঠুর মৌমাছিরা বাচ্চাদেরও রেয়াত করেনি। কিন্তু সরকারের বেতনভুক পতঙ্গবিদরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন? পিকনিক করবার নির্মল পরিবেশে খুনে মৌমাছিরা আসে কী করে? তার চাইতেও বড় কথা, মৌমাছিরা হুল ফুটিয়ে মানুষ বধ করতে শিখল কবে থেকে? সাক্ষাৎ এই যমদূতরা যদি পিকনিক স্পট ছেড়ে দলে দলে কলকাতায় হানা দেয়, তা হলে সরকার প্রতিরক্ষার জন্যে কী কী ব্যবস্থা মজুদ রেখেছেন? নাকি, নাকে সরষের তেল দিয়ে এখনও সরকারি

মৌমাছি-বিশেষজ্ঞেরা সুখনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন? মৌচাক লুণ্ঠন করে সরকার মধু সঞ্চয় করে বিক্রি করে টু-পাইস করছে করুক, কিন্তু এহেন খুনে মৌমাছিদের নিয়ে এতদিন মাথা ঘামানো হয়নি কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি, শ্রীহীন দীননাথ, কাগজ পড়েই দৌড়েছিলাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কাছে। উনি তখন ওঁর পাতাল পরীক্ষাগারে বসে একটা বেলজার-চাপা মরা মৌমাছিকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

আমি চমকে গেছিলাম। কাগজে কাগজে মারক মৌমাছি নিয়ে গরম গরম খবর, আর উনি কিনা একটা মরা মৌমাছি নিয়ে তন্ময়।

ঘোর সন্দেহ হল। গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম, 'প্রফেসর!'

উনি ভীষণ চমকে উঠলেন। আঁতকে উঠলেন বললেও বলা যায়। এই প্রথম দেখলাম, প্রফেসরের চোখে-মুখে নিঃসীম আতঙ্ক— অথচ উনি কখনও ভয় পাননি বলেই এতদিন জেনে এসেছি।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, 'কী হয়েছে?'

উনি খুব আস্তে করে বললেন, 'মর্কটটা কলকাতাকে শেষ করে দেবে।'

'কোন মর্কটটা?'

'পীতাম্বর পাণ্ডা।'

পীতাম্বর পাণ্ডার নাম শুনেছিলাম প্রফেসরের মুখে। মহাপাজি বৈজ্ঞানিক। পয়লা নম্বর পতঙ্গবিদ। কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করার জন্যে সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু গড়িমসিতে মাস্টার সরকারি আমলারা তাঁর আর্জি ঝুলিয়ে রেখেছে। ফলে, ভদ্রলোক যে বিলক্ষণ রুষ্ট, তা জেনেছিলাম প্রফেসরের মুখেই।

এখন শুনছি পাজির পা-ঝাড়া নাকি কলকাতাকেই শেষ করে দেবে! ব্যাপারটা কী?

খুলে বললেন প্রফেসর, 'ওকে পাত্তা না দেওয়ায় ভীষণ খেপেছে। মারক মৌমাছি বানিয়েছে। সুন্দরবনের জঙ্গলে তাদের চাষ করছে। কলকাতায় ছেড়ে দেবে ঝাঁকে ঝাঁকে।'

খটকা লাগল। বললাম, 'সুন্দরবনে?'

'তাই তো বলছে।'

আমি কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই দেখুন মারাত্মক একটা খবর। মৌমাছি হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলেছে গোটা একটা ফ্যামিলিকে।'

'কোথায়? কোথায়?' আঁতকে উঠলেন প্রফেসর।

'সুন্দরবনের দিকে একটা জঙ্গলে।'

'ক্যানিংয়ের এদিকে, না ওদিকে?'

'এদিকে।'

'তা হলে ওর মৌমাছি-খামার থেকে ফসকে বেরিয়ে এসেছে একটা দল। কী সর্বনাশ! কলকাতায় এদের ছেড়ে দিলে তো কামান বন্দুক দিয়েও রোখা যাবে না।'

'গ্যাস দিয়ে?'

'মানুষও তো মরবে!'

‘তা হলে? মারক মৌমাছি বানাল কী করে?’

‘আফ্রিকা আর ব্রেজিলের মৌমাছিদের মিশ খাইয়ে।’

‘কী সর্বনাশ!’

‘খুবই সর্বনাশের ব্যাপার, দীননাথ। লোকটাকে চাকরিটা দিলেই পারত সরকার। ব্রেন তো আছে। ও চেয়েছিল নতুন মৌমাছি বানিয়ে মধু উৎপাদন বাড়াবে। পাত্তা না পাওয়ায় বানিয়েছে বটে নতুন ধরনের মৌমাছি, কিন্তু তারা মধু উৎপাদন বাড়ায় না, মানুষ মারে।’

‘এখন উপায়?’

প্রফেসরের চোখে আলোর ঝিলিক দেখলাম।

বললেন, ‘মারক মৌমাছির এই নমুনাটা আমার কাছে না পাঠালেই ভাল করত পীতাম্বর।’

আশার আলো দেখলাম। বললাম, ‘পাঠিয়ে কি ভুলটা করেছে?’

চোখ নাচিয়ে প্রফেসর বললেন, ‘প্রতিষেধক বিষ বানাব, নতুন মৌমাছির চাষ করব, তারপর... তারপর...’

তারপরের কথা কারও অজানা নেই। গোটা কলকাতা ছেয়ে গেছিল পঙ্গপালের মতো মৌমাছি বাহিনীতে। আকাশ কালো করে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এসেছিল ঠিক কলকাতার ওপরেই, সটান সুন্দরবনের দিক থেকে উড়ে এসে কোথাও না থেমে।

প্রফেসর তাঁর পাতাল ল্যাবরেটরিতে বসে থাকেননি।

আফ্রিকা আর ব্রেজিলের মৌমাছিদের মিলিয়ে-মিশিয়ে পীতাম্বর যদি মারক মৌমাছি বাহিনী বানাতে পারে, তা হলে তিনিই বা তাদের খতম করার বিষওলা পতঙ্গ তৈরি করতে পারবেন না কেন? পীতাম্বরের মৌমাছি স্টাইরোফোম খায়, আশ্চর্য এই সূত্র ধরেই তিনি গবেষণা করে বানিয়েছিলেন পালটা বিষধর পতঙ্গ।

সবাই জানে এরপরের ঘটনা। কলকাতার আকাশ কালো হয়ে গেছিল মৌমাছিতে মৌমাছিতে। তাদের গুনগুন গজরানিতে কানে তালা লাগবার উপক্রম হয়েছিল। ট্রাম বাস গাড়ি ট্রেন সব বন্ধ হয়ে গেছিল। প্রত্যেকটা বাড়ির জানলা টাইট করে বন্ধ রাখা হয়ে গেছিল। অফিস-আদালতে কেউ যায়নি।

পাতাল ল্যাবরেটরি থেকে কালো ভোমরাদের বাহিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর। আকাশ-বাতাস যেন চৌচির হয়ে গেছিল ভ্রমর বাহিনীদের হাঁকডাকে। রাস্তাঘাট ভরে গেছিল মারক মৌমাছিদের মৃতদেহে।

কালো ভোমরারা পটল তুলেছিল তারপরেই। প্রফেসর যে ওদের আয়ু-র লিমিট বেঁধে দিয়েছিলেন। মারক মৌমাছিদের মেরে ফেলার পর যেন কলকাতার হকার উৎপাতের মতো নতুন উৎপাত সৃষ্টি না করে।

পীতাম্বরকে কিন্তু ধরা যায়নি। সে পাকিস্তানে পালিয়েছে উগ্রপন্থীদের আমন্ত্রণে।
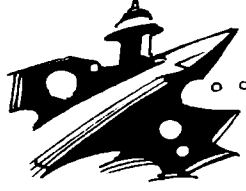
শয়তান উদ্যান

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বিমর্ষ হয়ে বসেছিলেন। আমি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী হয়েছে?'

উনি বললেন, 'বটকেষ্ট ফের গোলমাল শুরু করেছে।' আমি বললাম, 'বটকেষ্টটা আবার কে?' প্রফেসর তখন যা বললেন, তা এই—

বটকেষ্ট একটা হাড়পাজি বৈজ্ঞানিক। লোকে তাকে ড. বটকেষ্ট বলে ডাকে। বৈজ্ঞানিক মহলকে একদা কাঁপিয়ে দিয়েছিল উৎকট একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নাম শুনিয়ে। দু'-চারটে এক্সপেরিমেন্ট করবার ধান্দায় ছিল। তারপর গলাধাক্কা খেয়ে বেমালুম নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

আমি গুঁতিয়ে-গুঁতিয়ে প্রফেসরের পেট থেকে অনেক কথা টেনে বের করেছিলাম। পিলে চমকানো সেইসব গবেষণার ব্যাপারস্যাপার আমার মাথায় কিস্যু ঢোকেনি। প্রফেসর আমাকে এই কারণেই হেঁড়েমাথা বলেন। আমি গায়ে মাখি না। সত্যিই তো চৌকস মাথা নিয়ে আমি জন্মাইনি। তবে গায়েগতরে জোর আছে, ভয়ডর প্রাণে নেই। রক্তে আমার দুঃসাহসের নাচন। তাই তো অসম্ভবের অভিযানে বহুবার বেরিয়েও জয়যুক্ত হয়ে ফিরেছি। সেই কারণেই প্রফেসরের চ্যালা হতে পেরেছি। প্রফেসর আমাকে স্নেহ যেমন করেন, তেমনি আঁতে ঘা দিয়ে কথাও বলেন।

সেদিনও বললেন সব কথা বলবার পর, 'দীননাথ, একটা কথা আছে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। বটকেষ্ট স্টুপিডটার হাঁড়ির খবর জানবার জন্যে, ব্যাটাচ্ছেলেকে শায়েস্তা করবার জন্যে তোমার মতনই একটা স্টুপিডকে আমার দরকার।'

আমি মাথা গরম করলাম না। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলে আমার মাথা বরাবর খুব ঠান্ডা থাকে। বললাম, 'আমাকে কী করতে হবে?'

উনি বললেন, 'বটকেষ্ট ব্যাটার হাঁড়ির খবর বের করে আনতে হবে।'

আমি বললাম, 'কীভাবে?'

উনি বললেন, 'জার্নালিস্ট সেজে।'

আমি বললাম নাক সিঁটকে, 'আমি উচ্চিংড়ে হতে পারব না।'

উনি বললেন, 'আহা, তোমাকে সত্যি সত্যি তো জার্নালিস্ট হতে বলছি না। তবে কী

জানো, জার্নালিস্ট হতে গেলে মুরোদ থাকা দরকার, বুকের পাটা থাকা দরকার। পেটে বোমা মেরে খবর বের করে নেওয়ার কেরামতি থাকা দরকার। দুর্বৃত্তদের কাছে জার্নালিস্টরা এইজন্যেই দুঃস্বপ্ন। তোমার মধ্যে এইসব দুর্বৃত্ত নিধনের উপাদান আছে বলেই তোমাকে জার্নালিস্ট সেজে যেতে বলছি।'

খোশামোদে চিঁড়ের মতন শুকনো খটখটে জিনিসও ভিজে সপসপে হয়ে যায়। আমি তো কোন ছার। একেবারে গলে গেলাম। বুক ফুলিয়ে বললাম, 'তবে তাই হোক। আমি যে বোগাস বেঙ্গলি হয়ে জন্মেও উত্তম জার্নালিস্ট হতে পারি, সেটা গোটা ওয়ার্ল্ডকে আর-একবার জানিয়ে দেওয়া দরকার।'

তাই আমি এলাম আফ্রিকায়।

আস্তে আস্তে স্পিড কমে এল আমার মোটরগাড়ির। ফলে, হালকা শুকনো ধুলোর একটা মেঘ তৈরি হয়ে গেল চারদিকে।

পুরোনো আমলের গাড়ি তো, তাই ব্রেক কষতে হল অনেকরকম কলকবজা খাটিয়ে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ, সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি আর ঠংঠং কড়াং কড়াং আওয়াজের সে এক আশ্চর্য অর্কেস্ট্রা।

অবশেষে থেমে গেল গাড়ির গান। ড্রাইভার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, 'মি. পাণ্ডববর্জিত এই জায়গায় এর বেশি যাওয়ার মুরোদ আমার নেই!'

ড্রাইভারের মজবুত হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিলাম, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ।' দরজা খুলে যৎকিঞ্চিৎ বিনয়বাক শুনিয়ে দিলাম, 'তুমি না থাকলে, এই পর্যন্তই আসতে পারতাম না!'

তারপর, টুকুস করে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম গরম গরম ধুলোয় ভরা রাস্তার ওপর।

নামলাম যেখানে, সেখান থেকেই দেখা যাচ্ছে খাঁজ খাঁজ নিচু নিচু শৈলশ্রেণির দীর্ঘরেখা। সংখ্যায় এত বেশি যে গুনে শেষ করা মুশকিল। চারদিক ঘিরে কয়েক কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ের পর পাহাড়। তাই দৃষ্টি চলে যায় অনেকদূর পর্যন্ত।

সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে সবুজের আভাস। ন্যাড়া ন্যাংটা শৈলশ্রেণির মধ্যে গাছপালার সবুজাভা অদ্ভুত লাগছে। ধূসর প্রান্তরের ঠিক মধ্যিখানে একটা সবুজ ফোঁটা। গাছপালা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রয়েছে একটা ফটক, দু'পাশের দুই স্তম্ভের মাঝখানে। পাঁচিল-টাঁচিল বেড়া-টেড়ার চিহ্ন নেই কোনওদিকে।

অদ্ভুত। এ কেমন আস্তানা? ফটক আছে। কিন্তু পাঁচিল নেই!

ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। হাত নেড়ে আমাকে বললে, 'বিদায়, হুজুর?' লোকটার একটা কান খানিকটা কেটে ঝুলছে।

আমি হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে সেই হাত দিয়েই মুখ ঢাকা দিলাম। কেননা, গাড়ি ফিরে যাচ্ছে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে। একহাতে মুখ ঢেকেছি, আর একহাতে মস্ত জিম ব্যাগ আঁকড়ে আছি।

খাকি রঙের ভক্সওয়াগন প্রায় নটরাজ-নাচ নেচে নেচে চলে গেল দূর থেকে দূরে। অভিশপ্ত উপত্যকায় আমি পড়ে রইলাম একা।

গেট যখন রয়েছে, তখন গেট পেরিয়ে যাওয়াই ভাল। ঘুরে যাব কেন? কিন্তু কস্মিনকালেও বোধহয় এই ফটক খোলা হয়নি। গায়ের জোর দিয়ে পাল্লা ঠেলতে হল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

বোঝা হালকা করার জন্য জিম ব্যাগ থেকে আজেবাজে জিনিস ফেলতে ফেলতে গেলাম। খুঁটির ওপর খাড়া সাইনবোর্ডটার সামনে দাঁড়ালাম। লোকালয় থেকে এতদূরে কেউ মরতেও আসবে না। তা সত্ত্বেও বাহারি করে লেখা হয়েছে যে কথাগুলো ইংরেজিতে, তার সাদা বাংলা এই:

জীবনতরী গবেষণা

জাতীয় বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ
এবং
বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র

দূরে দেখা যাচ্ছে গাছপালার নিকুঞ্জ। ফটক পেরিয়ে পা চালালাম সেদিকে। অনেকটা পথ।

রাস্তা চলে গেছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। সেপথ কেউ মাড়ায় না নিশ্চয়, তাই দূর থেকে দেখা যায় না। রাস্তায় পা দিয়ে ঝোপঝাড়ের দৌলতে বাইরের কিছুও দেখতে পেলাম না। তখন বুঝলাম, গাড়ি কেন ভেতরে ঢুকতে চায়নি।

একটু একটু করে আমার গা-কামড়ে ধরতে লাগল কাঁটালতা আর কাঁটাঝোপ। যেমন জায়গা, তেমন উদ্ভিদ। মাটিতে জলের ভাগ কম, নুনের ভাগ বেশি। এমন জায়গাতেই তো কাঁটাগাছের বাড়াবাড়ি দেখা যায়।

কিন্তু বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের জন্যে, বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের জন্যে এমন জায়গা বেছে নেওয়ার পেছনে কোনও যুক্তি খুঁজে পেলাম না।

এক কিলোমিটারের মতন পথ হেঁটে যাওয়ার পর ছবি পালটে যেতে লাগল খুব দ্রুত। স্যাঁতসেঁতে জায়গায় জন্মাতে ভালবাসে যেসব গাছপালা, দেখা গেল তাদের। দেখা গেল, বড় বড় বাঁশঝাড়। দানব বাঁশ বললেই চলে। তারপরেই দেখা গেল ফলের গাছ, আরও অনেক রকমের গাছপালা। দেখে চমৎকৃত হলাম। এমন জায়গায় এই ধরনের গাছের চাষ করা চাট্টিখানি কথা নয়। এলেম আছে বটে সেই মানুষটার যে কিনা এইসব ঝাঁকালো গাছ গজাতে পেরেছে এমন একটা শুকনো খটখটে জায়গায়।

অদ্ভুত এই অরণ্যের গভীরে যতই ঢুকলাম, ততই বৃদ্ধি পেল আমার বিস্ময়। এবার দেখা যাচ্ছে ফুলগাছ আর সুগন্ধি গাছ। বাতাসে ভাসছে সৌরভ। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া অঞ্চলে যেসব গাছপালা সহজে বাড়ে, সেইসব গাছপালাকেও এখানে... এই শুকনো খটখটে অঞ্চলে দিব্যি বাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাজ্জব কাণ্ড!

ভারী ব্যাগটাকে হাতবদল করে নিয়ে হেঁটে গেলাম মনোরম এহেন উদ্যানের মধ্যে দিয়ে।

রাস্তা সোজা চলে গেছে ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্যে দিয়ে, একটুও বেঁকে যায়নি। মানুষের হাতে গড়া রাস্তা অবশ্যই। ঘাস গজানো হয়েছে রাস্তা জুড়ে। শক্ত ঘাস। বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে আমার জুতোর শুকতলার চাপে। ডানদিকে নানাধরনের ক্যাকটাস গাছ। সাজানো জঙ্গলকে পাহারা দিয়ে চলেছে যেন কিম্ভূতকিমাকার কাঁটাগাছের দঙ্গল।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল মাথার মধ্যে। এ জঙ্গল মানুষের হাতে গড়া অরণ্য। হিসেব করে মেপেজুপে তৈরি অরণ্য। ঠিক যেন একটা বিরাট বাগান।

মনে পড়ে গেল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কথাগুলো। 'ড. বটকেষ্ট রুক্ষ আফ্রিকার মাটিতে নন্দনকানন বানিয়ে ফেলেছে। মরু অঞ্চলে বাগান বানিয়েছে।' উনি অবাক হয়েছেন বটকেষ্টর বিটলেমি দেখে। টুরিস্টরা যেন আসতে না পারে, এমন একটা জায়গা বেছে নিয়েছে বটকেষ্ট অনেক হিসেব করে। অথচ এমন জায়গাতেই টুরিস্ট আসে দলে দলে। শখের বাগানের মালিকরাও তাই চায়। পাঁচজনে দেখে যাক তাদের কীর্তি। বটকেষ্ট কিন্তু তা চায় না। চায় লোকের চোখের আড়ালে থাকতে। কেন?

যে ড্রাইভারকে পটিয়ে এখানে এসেছি, সে গোড়া থেকেই বেঁকে বসেছিল। জীবনতরী গবেষণা কেন্দ্রের ধারেকাছেও আসবার ইচ্ছে তার ছিল না। আসেওনি। অনেক খোশামোদ, অনেক বকশিস দেওয়ার লোভ দেখিয়েছিলাম বলেই এসেছে, কিন্তু দূর থেকে ছেড়ে দিয়েই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পিঠটান দিয়েছে ঝড়ের বেগে। মুখের চেহারায় দেখেছিলাম বিষম বিতৃষ্ণা। ভয় ঠিক নয়।

সুন্দর সুন্দর গাছপালার মধ্যে দিয়ে সুন্দর ঘাসছাওয়া পথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, কেন এত বিতৃষ্ণা? এমন একটা আশ্চর্য নন্দনকাননে স্থানীয় লোক আসতে চায় না কেন? আশেপাশে এত ইউক্যালিপটাসের সমারোহ, এমন সুন্দর সুন্দর ফুলগাছ— তা সত্ত্বেও এত ঘেন্না কেন?

ঠিক এই সময়ে আমার তন্ময়তা খানখান হয়ে গেল অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে। মনে হল, প্যাট প্যাট করে কে যেন আমাকে দেখছে পেছন থেকে।

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেলাম। পেছনে তাকালাম, ঝোপের মধ্যে দেখতে পেলাম জ্বলজ্বলে দুটো চোখ।

আমাকে নজরে রেখেছে চোখের মালিক!

চেঁচিয়ে বলেছিলাম, 'কে ওখানে?' প্রথমে বাংলায় তারপর ইংরেজিতে।

অঙ্গারের মতন চোখদুটোয় পলক পড়েনি।

ঠান্ডা মাথায় যারা খুন করে, বন্দুক বাগিয়ে রাইফেলের ট্রিগারের ওপর আঙুল রেখে দেয়, তাদের চোখের পাতা পড়ে না।

দমে গিয়েও চেঁচাতে ছাড়িনি। নিষ্পলক চোখের চাহনি কিন্তু আমার ওপরেই স্থির ছিল। সরে যায়নি।

এবার কিন্তু বেশ খানিকটা ভয় কুরে কুরে ঢুকে গেছিল আমার মনের মধ্যে। হেঁকে বলেছিলাম, 'লুকিয়ে আছ কে? সামনে আসা হোক।'

বলেছিলাম চোস্ত ইংরেজিতে, আফ্রিকায় যে ভাষাটা বোঝে অনেকেই। এই তো এলাম

যে গাড়িতে, তার ড্রাইভারও দিব্যি ইংরেজি চালিয়ে গেল আমার সঙ্গে। পালিশ করা ইংরেজি না হলেও চালিয়ে নেওয়া যায়।

কিন্তু ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে প্যাট প্যাট করে যে আমাকে দেখে যাচ্ছে, সে কি আমার পরিচ্ছন্ন ইংরেজি বুঝছে না?

তাই আর সময় না দিয়ে চকিতে ধেয়ে গেছিলাম ঝোপটার দিকে।

বিদ্যুতের মতো ঠিকরে গেছিল একটা জানোয়ার। অনেকটা বাঁদরের মতন দেখতে।

বাঁদর!

হাতের ব্যাগ খসে পড়েছিল মাটিতে ঘাসের ওপর। নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না।

খুব বড় বাঁদর নয়, ম্যাকাক টাইপের বাঁদর, কিন্তু ঝলকের জন্যে দেখেছি তো, সঠিক বলা মুশকিল। বিদ্যুৎগতিতে সবচেয়ে কাছের ওক গাছের ডালে উঠে গিয়ে ঘাপটি মেরেছে ডালপালা পাতার মধ্যে, মগডালের কাছে।

অবাক হয়ে চেয়েছিলাম সেইদিকে।

বটকেষ্টর কাণ্ড নাকি? গাছপালার সমারোহ ঘটানোর পর জীবজগতকেও এনে ফেলেছে আশ্চর্য কাননে? তাই বলে বাঁদর? উত্তর আফ্রিকায় বাঁদর আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের পোষ মানিয়ে তো গাছে গাছে ছেড়ে রাখা যায় না!

বাঁদর নিয়ে বেশিক্ষণ অবশ্য ভাবতে পারিনি। কানে ভেসে এসেছিল কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক। একটা কুকুর নয়, যেন ডজনখানেক কুকুর নানারকম ডাক ডেকে চলেছে তারস্বরে।

বুনো কুকুর নাকি? ভয় পেয়েছিলাম। দ্রুত পা চালিয়েছিলাম রিসার্চ সেন্টারের দিকে। তখন আর গাছপালার বৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত পাইনি।

বেড়ে গেছিল ঘেউ ঘেউ ডাক। কোনদিক থেকে আওয়াজগুলো আসছে তা ধরতে পারিনি। তবে, ক্রমশ যে কাছে এগিয়ে আসছে, তা টের পাচ্ছি।

তারপরেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম সারমেয় দঙ্গলকে। সেইসঙ্গে দেখতে পেলাম একটা লম্বাটে নিচু টাইপের বাড়ি। জিম ব্যাগ আঁকড়ে ধরে পাঁই পাঁই করে দৌড়লাম সেইদিকে।

কিন্তু সারমেয় বাহিনি আমার নাগাল ধরে ফেলল অল্পক্ষণের মধ্যেই। ওরা দৌড়চ্ছে চারপায়ে, আর আমি দৌড়চ্ছি দু' পায়ে— পারব কেন?

তখন বুদ্ধি ঝিলিক দিল মাথায়! কুকুর জাতটার স্বভাবই হল, যা দৌড়য়, তা ধাওয়া করা। চারপায়ের দৌড় বড় সাংঘাতিক।

অতএব দাঁড়িয়ে যাওয়া যাক।

দাঁড়িয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ পাথরের মূর্তির মতন। ধড়াশ ধড়াশ করে গেল হৃৎপিণ্ড। এখন যদি কুকুরে খাবলা খাবলি করে আমাকে, আমার মৃত্যুর সংবাদটা আদৌ কোনও খবরের কাগজে বেরবে কি না সন্দেহ। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র জানতেও পারবেন না, তাঁর প্রিয় চ্যালা জার্নালিস্ট সেজে মস্তানি করতে এসে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে একপাল কুকুরের কামড়ে আশ্চর্য সুন্দর এক অরণ্যের মাঝে।

এটা গেল আতঙ্কের চিন্তা। অভয় চিন্তাটাও মনের মধ্যে খেলে গেল তৎক্ষণাৎ। কুকুর যদি পোষা হয়, তা হলে কামড়ে দেয় না। তারস্বরে চেঁচানিই সার। কিন্তু যদি বিশেষভাবে ট্রেনিং দেওয়া থাকে, অনাহুত রবাহুত দেখলেই তেড়ে গিয়ে কামড়ে দেয়, তা হলে অবশ্য আমার অবস্থা হবে শোচনীয়।

সবচেয়ে ভাল, স্ট্যাচুর মতন দাঁড়িয়ে থাকা। তাই করলাম।

সারমেয় দঙ্গল তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলল আমাকে। একটা অ্যালসেশিয়ানের পিপের মতন বুক দেখে মুগ্ধ হলাম।

তারপরেই হাঁটতে বাধ্য হলাম গবেষণা ভবনের দিকে। সারমেয় বাহিনী ঠেলে ঠেলে আমাকে নিয়ে গেল সেদিকে। যেতে যেতে মনে হয়েছিল, প্রফেসরের কথা শুনে নেচে নেচে চলে না-এলেই ভাল করতাম।

টানা লম্বা বাড়িটার সামনে এসেই আলতো করে আমার হাত কামড়ে ধরল মস্ত অ্যালসেশিয়ানটা। যার অর্থ, দাঁড়াও এখানে। আমি তৎক্ষণাৎ পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে গেলাম সেখানে। সারমেয় বাহিনী আমাকে ঘিরে বসে পড়ল জিভ লকলকিয়ে। প্রত্যেকের চোখ বাড়ির দিকে।

প্রফেসরের কথাগুলো ভেসে ভেসে গেল মাথার মধ্যে, 'দীননাথ, পেল্লায় যে বাড়িটা তুমি দেখবে, সেটাকে গবেষণাকেন্দ্র না বলে কেল্লা বলাই উচিত। বটকেষ্ট এই কেল্লাবাড়িতে নিয়ে গেছে বেশ কিছু বীজ আর চারাগাছ। কী নিয়ে গবেষণা করছে, দুনিয়ার কেউ তা জানতে পারেনি। বাড়িখানা চ্যাপটা, আয়তাকার। জানলার সংখ্যা কম। বাড়ি দেখে গবেষণাকেন্দ্র বলে মনে হয় না। চারদিকে গভীর জঙ্গল। কেন? এইসব তোমাকে জানতে হবে।'

প্রফেসর তো বলেই খালাস। কিন্তু আমার প্রাণ যে যায় যায় অবস্থায় এসে ঠেকেছে। যমদূতের মতন এই সারমেয় বাহিনীর প্রত্যেকে যদি একবার করে আমাকে কামড়ে যায়, তা হলে আর দেখতে হবে না।

ভারী ব্যাগটা বইতে কষ্ট হচ্ছিল। নামিয়ে রাখতেও সাহস পাচ্ছিলাম না। আচমকা আমার নড়াচড়া দেখে কুত্তার দল যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে!

না, কষ্ট হয় হোক, দাঁড়িয়ে থাকা যাক।

চারদিক নিস্তব্ধ। দুটো বক উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। সূর্যের আলোয় ঝকঝকে আকাশে দেখলাম একটা শকুনি। এখন আর অবাক হচ্ছি না। অপেক্ষায় আছি, গবেষণাকেন্দ্র থেকে কেউ বেরিয়ে এসে দেখুক আমার অবস্থা। তা হলেই বাঁচোয়া। নইলে এই মাংসাশী সারমেয় বাহিনী আমাকে আস্ত রাখবে না বেশিক্ষণ। লকলক করছে প্রত্যেকের জিভ।

হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম সেই মুহূর্তে, গাড়ির ড্রাইভার গেট পেরতে চায়নি কেন। কেন স্থানীয় বাসিন্দারা দু' চক্ষে দেখতে পারে না এই গবেষণাকেন্দ্র। বটকেষ্টর মতন একটা নচ্ছার বাঙালি যে এমন আতঙ্করাজ্য গড়ে তুলতে পারে কালো মহাদেশ আফ্রিকার বুকে, দূর থেকে তা ভাবা যায়নি। প্রফেসরও অত খুলে বলেননি। আমাকে নাচিয়ে দিয়েছিলেন। আমি চলে এসেছি নেচে নেচে অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। পড়েছি পোষা কুকুরদের খপ্পরে!

গবেষণা কেন্দ্রটা এমন কিছু আহামরি বিরাট বিপুল নয়। বেশ ছোটখাটো। লম্বায় বড়জোর

দেড়শো ফুট। লাল ইটের বাড়ি। সেকেলে নকশা। চারদিকে লম্বা লম্বা ঘাস। বেশ লম্বা, বাড়ির খানিকটা ঢেকে রেখে দিয়েছে। ছাদের ওপর দেখা যাচ্ছে দুটো খুব উঁচু অ্যান্টেনা, একটামাত্র তার দিয়ে জোড়া। একই প্যাটার্নের সারবন্দি জানলা যেন কেটে কেটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ধূসর দেওয়ালে। বাড়ির পেছনদিকের প্রবেশপথটা বেশ ইন্টারেস্টিং। মস্ত হাঁ করে নেমে এসেছে গড়ানে ঢালুপথ। নিশ্চয় মালপত্র নিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রেলার ওঠানামা করে সেখানে। কিন্তু এই মুহূর্তে একখানা গাড়িও নেই সেদিকে, নেই কোনও লোক। অথচ এখন দিনের আলো ফুটফুট করছে।

অ্যালসেশিয়ান ব্যাটাচ্ছেলে যাতে খেপে না যায়, সেইভাবে খুব সাবধানে চোখ বুলিয়ে নিলাম আশেপাশে। গ্যারেজ, গুদোমঘর, থাকবার জায়গা থাকার কথা আশেপাশে। কিন্তু কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। একটামাত্র বাড়ির মধ্যে সবকিছুই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নাকি? আশ্চর্য!

এরপরেই নজরে এল সরু একটা রাস্তা। বেরিয়েছে বাড়ির ভেতর থেকে। হারিয়ে গেছে গাছপালার মধ্যে। নানারকম বাহারি গাছ সেখানে। জঙ্গল না বলে সাজানো বাগান বলাই সমীচীন।

থাকা খাওয়ার জায়গা আছে তা হলে এই বাড়ির মধ্যেই— নিশ্চয় এই রাস্তার শেষে।

খুলে গেল লম্বাটে নিচু বাড়ির দরজা, সিঁড়ির ওপর বেরিয়ে এল একটা লোক। রীতিমতো চটপটে, প্রাণবন্ত, বয়স ষাটের এদিকে-ওদিকে। চোখ পারা-র মতো পিচ্ছিল, মুখের চামড়া বেশ টাইট, থলথলে নয়। দরজার হাতলে একহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে এমনভাবে যেন দড়াম করে পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির ভেতরে পিঠটান দেওয়ার ফিকিরে আছে। আর-এক হাতে নিশ্চয় কিছু একটা আছে। যা ঢাকা পড়ে গেছে দরজার আড়ালে। পরনে সাদাসিধে ক্যানভাসের ফিল্ড জ্যাকেট, আর কালো ট্রাউজার্স— যার পা দুটো ঢোকানো হাই বুটের মধ্যে। ল্যাবরেটরির সাদা কোটের বদলে এ যে বনসংরক্ষণ কর্মচারীর পোশাক।

আমি কিন্তু অবাক হলাম না এসব দেখে। চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে রইলাম মানুষটার মুখের দিকে। সে মুখ ফেরালো আমার দিকে। চাহনি দেখে মনে হল, বৈজ্ঞানিকই বটে। যেন ঘুম থেকে উঠেছে এইমাত্র।

'কে আপনি?' প্রশ্নটা ঠিকরে এল ভারী গলা থেকে। গম্ভীর কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে।

পাণ্ডববর্জিত এমন জায়গায় একটা মানুষ দেখতে পেয়ে গলে গিয়ে একপা বাড়িয়েছিলাম সামনে, সঙ্গে সঙ্গে খপ করে আমার ট্রাউজার্স কামড়ে ধরেছিল বাঘা অ্যালসেশিয়ান।

'সাবধান! হুটোপুটি করলেই মরবেন!' বলেই, একপা পিছিয়ে গেছিল বৃদ্ধ, যেন এবার চম্পট দেবে ভেতর বাড়িতে।

অবাক হয়েছিলাম। কুকুর কামড়াতে আসছে আমাকে চোর মনে করে। আর লোকটা বাড়ির ভেতরে সরে পড়ার ফিকিরে আছে!

চিৎকার করে বলেছিলাম পরিষ্কার বাংলায়, 'যাবেন না। কুকুরদের বলুন সরে যেতে। আমি চোর-ডাকাত নই।'

অ্যালসেশিয়ানের কামড় ট্রাউজার্স থেকে সরে এল পায়ের ওপর।

লোকটা দোরগোড়া থেকে বললে খাঁটি বাংলায়, 'আরে! বাংলা বলে যে! কে আপনি? এসেছেন কেন?'

'সাংবাদিক! সামান্য এক জার্নালিস্ট। এসেছি এক পত্রিকা থেকে। নচ্ছার কুকুরগুলোকে সরে যেতে বলুন।'

আমার কথা কানে না তুলে বুড়ো বললে, 'আইডি কার্ড আছে?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

'ছুড়ে দিন।'

আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয়নি। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আশ্চর্য এই অরণ্যে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার এই তো শুরু। শেষ অধ্যায় অনেক দূরে। বটকেষ্ট লোকটা যে কোনও কারণেই হোক, একটু ভয়ের মধ্যে রয়েছে। তাই যা বলছে, তা করা যাক। প্রেস কার্ড বের করলাম বুকপকেট থেকে, ছুড়ে দিলাম। শূন্যপথে অর্ধবৃত্ত রচনা করে কার্ড উড়ে গিয়ে পড়ল প্রবেশপথের সিঁড়ি থেকে প্রায় দশ ফুট দূরের ঘাসের ওপর।

ইচ্ছে করেই ফেললাম সিঁড়ি থেকে একটু দূরে। যাতে বটকেষ্ট বেরিয়ে আসে। পুরো চেহারাটা তখন দেখা যাবে। আর-এক হাতে কী ধরে আছে, সেটাও দেখা যাবে।

'খুম্বা! নিয়ে আয়!' হেঁকে বলেছিল বটকেষ্ট।

মাঝারি সাইজের একটা কুকুর ধেয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ। গায়ে ছোপ ছোপ কালো দাগ। ঘাসের ওপর থেকে বেশ কায়দা করে আমার প্রেস কার্ড দাঁতে করে তুলে নিয়ে দৌড়ে গেছিল বটকেষ্টর দিকে।

'সাবাস খুম্বা! যা নিজের জায়গায়!'

কুকুর চলে এল স্বস্থানে। মনিবভক্তি দেখে অবাক হলাম। সব কথাই দেখছি বুঝতে পারে।

প্রেস কার্ডে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বটকেষ্ট বললে, 'বটে! জার্নালিস্ট!'

'আজ্ঞে।'

'দীননাথ!'

'আজ্ঞে। এখন যদি কুকুরদের খপ্পর থেকে রক্ষে করেন কৃতজ্ঞ থাকব।'

খরচোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বটকেষ্ট। তারপর কুকুরদের বললে, 'আসতে দে। ছেড়ে দে।'

বলেই, বোঁ করে ঘুরে গিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল বটকেষ্ট।

কুকুরবাহিনী নড়ে গেছে এক হুকুমেই। অ্যালসেশিয়ান ব্যাটাচ্ছেলে আমার পা ছেড়ে দিয়েছে মুখের কামড় থেকে। দিয়েই উধাও হয়ে গেল সাঁ করে। পেছন পেছন চম্পট দিল বাদবাকি কুত্তাগুলো।

পা রগড়ে নিলাম আমি। কুকুরের দাঁত চেপে বসেছিল বেশ জোরে। লালা মুছলাম। সেইসঙ্গে অবাক হলাম এতগুলো কুকুরের আশ্চর্য প্রভুভক্তি আর কথা বোঝার ক্ষমতা দেখে। ট্রেনিং বটে।

এগিয়ে গেলাম প্রবেশপথের দিকে।

পা দিলাম ভেতরের আধা অন্ধকারে। আপনা থেকেই দরজার লক বন্ধ হয়ে গেল আমার পেছনে। এগিয়ে গেলাম সরু একটা গলিপথ দিয়ে। এসে গেলাম একটা মস্ত হলঘরে। সেখানে হাতলওলা চেয়ার রয়েছে অনেক। একটা রঙিন টেলিভিশন রয়েছে উঁচু মঞ্চে। মানুষের ছবি ঝিলিক মেরে মেরে যাচ্ছে পরদায়। কিন্তু কোনও শব্দ নেই।

বটকেষ্ট বসে রয়েছে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। করোটির গড়ন বিদঘুটে। দু'দিকে চ্যাপটা, ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনে-পেছনে। পাতলা কান দু'খানা চেপে বসানো চ্যাটালো খুলির ওপর। মাথার চুল খাবলা খাবলা করে খুলি ঘেঁষে ছাঁটা। নাপিতকে দিয়ে নয়, বোধহয় নিজেই কাঁচি চালিয়েছে। চুল মানুষের মুখকে মনোরম করে, আবার বদখতও করে। বটকেষ্টর ক্ষেত্রে তা প্রকট হয়েছে। খাবলা খাবলা চুলের বেশ কিছু পেকেও গেছে।

আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেই সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে বটকেষ্ট বললে, 'আপনার নাম দীননাথ নাথ?'

'আজ্ঞে।'

'বসা হোক, বসা হোক, দাঁড়িয়ে কেন?' লোকটার গলায় দেখছি রসকষ নেই।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এ কী অভদ্রতা? পিঠ ফিরিয়ে বাত ঝাড়ছে!

'কি হে ছোকরা কথা কানে গেল না?'

ছোকরা বলায় আরও খেপে গেলাম। তারপর অবশ্য ভেবে দেখলাম। এহেন কাঠখোট্টা একদল পিশাচপ্রতিম কুকুরের মালিক যে, তার সঙ্গে গোড়া থেকেই খিটিমিটি না-করাই ভাল। তাই বসলাম বটকেষ্টর পেছনে, একটু তফাতে।

'আসা হয়েছে কেন?' বটকেষ্টর কণ্ঠস্বর ঈষৎ উত্তপ্ত।

সাঁ করে ছুড়ে দিলাম জবাবটা, 'জার্নালিস্টকে এমন প্রশ্ন কেউ করে? বিশেষ করে কুকুর নিয়ে অমন খাসা অভ্যর্থনার পর?'

'দীননাথ, দিনকয়েক আগে বেশ ক'জন ডেঞ্জারাস কয়েদি জেলখানা থেকে পালিয়েছে। আমাকে হুঁশিয়ার থাকতে হয়েছে সেজন্য। কে নিয়ে এল?'

'নাম তো জানি না। একটা কান বেশ কাটা। ঝুলছে।'

'কানকাটা অ্যাজালবার্তো! সাহস তো কম নয়। এখনও এত কাছে আসতে চায়! আমি কী করছি না করছি, তা জানতে চায়। শিক্ষা এখনও হয়নি দেখছি!' চেয়ারের হাতলে টরেটক্কা বাজনা বাজিয়ে গেল হাতের আঙুল। কবজিটা দেখতে পেলাম তখনই। পাতলা, সরু, কিন্তু সুগঠিত। পিয়ানো যারা বাজায়, তাদের কবজির গড়ন এইরকম হয়। হাতের আঙুলগুলোও সরু সরু, সাদাটে। দুটো আঙুলে ব্যান্ডএইড লাগানো রয়েছে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনাকে সম্বোধন করব কীভাবে?'

'আমার নাম না-জেনেই আসা হয়নি নিশ্চয়... বটকেষ্ট... বটকেষ্ট... ড. বটকেষ্ট বটব্যাল।'

'আপনার রিসার্চ সেন্টারের লোকজন কোথায়, ডক্টর? রাস্তায় তো কাউকে দেখতে পেলাম না।'

'আজকে ওদের ছুটির দিন। হয়তো শহরে গেছে। গাড়ি নিয়ে দল বেঁধে গেছে।'

'কিন্তু আজ ছুটির দিন হবে কেন? আজ তো বুধবার।'

'তাতে কী?' বটকেষ্ট তখনও মুখ ফেরাল না আমার দিকে, 'বুধবার তো কি হয়েছে? মাসের পর মাস একটানা কাজ করে যাওয়ার পর যেদিন ছুটি পাওয়া যায়, সেইদিনই ছুটির দিন। বুধ, বেস্পতি, শুক্র, শনি— বার যাই হোক না কেন!'

যতই চেঁচাক না কেন বটকেষ্ট, আমি এত উজবুক নই যে চোখ বন্ধ করে আসব। চোখ খোলা রেখেছিলাম বলেই রাস্তায় কোনও গাড়ির চাকার দাগ দেখিনি। খাঁ খাঁ রাস্তায় কোনও গাড়িও চোখে পড়েনি। যে গাড়ির আড্ডায় গাড়ি নিয়েছিলাম, সেখানকার কেউই বলেনি বটকেষ্টর রিসার্চ সেন্টার থেকে লোকজন এসেছে শহরে। রিসার্চ সেন্টারের নাম শুনেই তো আঁতকে উঠেছিল প্রত্যেকে। একজন তো বলেই ফেলেছিল, 'ওরে বাবা! ওই শয়তানের বাগানে হাজার বকশিস দিলেও যাব না!'

কানকাটা অ্যাজালবার্তোর বুকের পাটা আছে বলেই রাজি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বলেছিল, 'মি., নামিয়ে দেব কিন্তু দূরে, কাছে যাব না। রাস্তা তো ওই একটাই, হেঁটেই চলে যাবেন।'

সুতরাং, বটকেষ্ট ডাহা মিথ্যে বলছে, তা ছাড়া, রিসার্চ সেন্টারের সমস্ত লোক ঠিক একটা দিনেই দলবেঁধে শহরে চলে যাবে, এমনটা হতেই পারে না। হাওয়ায় দলবেঁধে মিলিয়েও যেতে পারে না।

ঠিক যেন একটা ডিটেকটিভ গল্পের মধ্যে এসে পড়েছি। ধন্দটা সেইখানেই। নিশ্চয় কোনও অঘটন ঘটেছে রিসার্চ সেন্টারে। খুবই সিরিয়াস কিছু একটা। বটকেষ্ট তা চেপে যেতে চাইছে আমার কাছে।

কিন্তু বুরবকের মতন আমি সে প্রসঙ্গ তুলতে যাব কেন? বটকেষ্ট যতটা ধড়িবাজ, আমি তার থেকে কম নই। মুখ খুলতে যখন চায় না, খুলতে হবে না, যা জানবার আমি আবিষ্কার করে নেব। আমার নাম দীননাথ নাথ। গন্ধ যখন পেয়েছি... মস্ত এক রহস্যের গন্ধ... তখন ঠিক পথেই চলেছি! ঘোলা জল থেকেই তুলে আনব বটকেষ্ট-রহস্যের চাবিকাঠি।

'মুখে কথা নেই কেন? বোবা নাকি?' বেশ একটু রুক্ষস্বরেই বললে বটকেষ্ট।

খুব যে ফটফট করছে বটকেষ্ট। এবার একটু দাওয়াই দেওয়া দরকার, বিশেষ করে কুকুর যখন নেই ধারেকাছে। বললাম রুক্ষ গলায়, 'আইডি কার্ডটা এবার ফেরত পেতে পারি?'

'অবশ্যই। ওই তো রয়েছে ওই তাকে। নিজে উঠে গিয়ে নিলেই হয়।'

'এ আবার কী ভদ্রতা! আমার কার্ড আমাকেই নিয়ে আসতে হবে তাক থেকে!'

তাও গেলাম। কিন্তু বিশেষ সেই তাকে তো নেই আইডি কার্ড। আশেপাশেও নেই।

এহেন বদ রসিকতার দাওয়াই দেওয়ার জন্যে মুখ ফিরিয়ে দেখি, বটকেষ্টও নেই! উধাও হয়ে গেছে ঘরের ভেতর থেকে!

আশ্চর্য ব্যাপার তো! যে চেয়ারে একটু আগেই বসেছিল বটকেষ্ট, সেই চেয়ার এখন শূন্য!

পেছনের চেয়ারে যেখানে আমি আমার জিম ব্যাগ রেখে উঠে এসেছিলাম, সেই চেয়ারও শূন্য! জিম ব্যাগ উধাও হয়ে গেছে!

মহা ধড়িবাজের পাল্লায় পড়েছি তো! মাথা ঘুরে গেল আমার ভয়ানক রাগে। ধপ করে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে।

কার পাল্লায় পড়েছি? এই কি আসল বটকেষ্ট? না, জেল থেকে পালানো খুনের আসামি? সেইজন্যেই কি ওইরকমভাবে কাঁচি চালিয়ে নিজের চুল নিজে ছেঁটেছে? রিসার্চ সেন্টারে লোকজন নেই কি সেইজন্যেই? পাছে মুখ দেখে ফেলি, তাই পেছনে ফিরে বসে রয়েছে অভদ্রের মতন গোড়া থেকেই?

গা শিরশির করে উঠল আমার। কার পাল্লায় পড়লাম রে বাবা!

কিন্তু জেলখানা থেকে একজন কয়েদি তো পালায়নি, অনেকেই পালিয়েছে। তারা সব কোথায়? লুকিয়ে আছে কেন?

তার চেয়ে রহস্যময় ওই কুত্তার দল! খুনের আসামির ওপর এত প্রভুভক্তি দেখায় নাকি পোষা কুকুরেরা? এত অনুগত!

হেলান দিয়ে বসলাম চেয়ারে। নিশ্বাস ফেললাম ফোঁস করে।

কিন্তু আমার জিম ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিতে গেল কেন বটকেষ্ট? পালানোর কী দরকার ছিল? এত ভয় কীসের? কী মনে করেছে আমাকে? ছদ্মনামী সাংবাদিক? জানতে চায় আমার আসল পরিচয়? কার চ্যালা আমি, তা যদি জানতে পারে, তা হলে তো মুশকিলে পড়ব!

খসখস পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম পেছনদিকে।

ঘাড় ফিরলাম তৎক্ষণাৎ। দেখলাম, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বটকেষ্ট। চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে।

রক্ত চড়ে গেল আমার মাথায়, 'কোথায় আমার আইডি কার্ড? কোথায় আমার জিম ব্যাগ?'

'আমি নিয়ে গেছিলাম।' ছোট্ট জবাব বটকেষ্টর, 'যে ঘরে থাকতে দেব, সেই ঘরে রেখে এসেছি। আসা হোক আমার পেছন পেছন।'

বলেই গলিপথে পা দিল বটকেষ্ট। পেছন-পেছন পা চালানোর আগে যে তাকে আইডি কার্ড থাকার কথা, সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম কার্ড রয়েছে সেইখানেই। অথচ একটু আগেও ছিল না সেখানে!

মহা ফিচেল তো এই বটব্যাল লোকটা!

বটকেষ্ট বললে পেছন থেকে, 'আসা হোক, আসা হোক। যে ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে এলাম, সেই ঘর এবার দেখিয়ে দিই। কাল আমি বেজায় ব্যস্ত থাকব। সকাল হলে নিজেই যাবেন শহরে।'

এর নাম আতিথেয়তা? বিদায় করতে পারলে বাঁচে। দাঁড়াও, বের করছি মজা! আমার নাম দীননাথ নাথ!

চটপট পা চালিয়ে দোতলার একটা ঘরে এল বটকেষ্ট। সে ঘরে হাতলওলা চেয়ার আছে, শোওয়ার সিঙ্গল খাট আছে, লাগোয়া বাথরুম আছে। ঘর দেখিয়েই বোঁ করে পেছন ফিরে চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়ে বটকেষ্ট বললে, 'গুছিয়ে নিন। বিশ মিনিট পরে আপনার প্রশ্নের জবাব দেব।'

‘কোথায়?’

‘একতলার বড় ঘরে, যেখানে বসেছিলেন।’ বটকেষ্টর খরচোখে দেখলাম চাপা দ্যুতি। অস্বস্তিকর কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়।

বললাম, ‘বিশ মিনিট পরেই আসছি।’

হাওয়া হয়ে গেল বটকেষ্ট।

তৎক্ষণাৎ খুললাম আমার জিম ব্যাগ। জিনিসপত্র ঠিকই আছে, তবে একটু নাড়াচাড়া অবস্থায়। যেখানে যেটি ছিল, সে অবস্থায় নেই।

বটকেষ্ট ব্যাগ সার্চ করেছে!

মাথা গরম হয়ে গেছিল আমার। দরজা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখে নিলাম কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। কেউ নেই। গলিপথ ফাঁকা। তবে যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছি, তার উলটোদিকে গলিপথের অপর প্রান্তে রয়েছে আর একটা সিঁড়ি।

বুঝলাম ব্যাপারটা। এক সিঁড়ি দিয়ে ওপরে এসে আমার ব্যাগ সার্চ করেছে বটকেষ্ট। হাতে আইডি কার্ড নিয়ে। সত্যিই আমি জার্নালিস্ট কিনা যাচাই করেছে। তারপর, আর-এক সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে আইডি কার্ড তাকে রেখে দিয়েছে।

কিন্তু এত সাবধান কেন? জেল পলাতক খুনের আসামিদের ভয়ে? কিন্তু তারা নিশ্চয় আইডি কার্ড নিয়ে আসে না। জিম ব্যাগ নিয়ে জেল ভেঙে পালায় না!

তা হলে?

ক্যামেরা আর টুকটাক জিনিস রাখলাম খাটের পাশের ছোট্ট টেবিলে। ক্যামেরাটা কাজে লাগবে। গাছপালার পটভূমিকায় বটকেষ্টর একটা ফটো তুলতে হবে।

ঘড়ি দেখলাম। কুড়ি মিনিট হতে কয়েক মিনিট বাকি। তাই জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরে একটা বিপুলকায় সিডার গাছের দিকে। রয়েছে জানলার ঠিক সামনে। দেখে তো মনে হল যথেষ্ট প্রাচীন গাছ। লাল কাঠ থেকে সুগন্ধ যেন ভেসে আসছে ঘরের মধ্যে। নিশ্চয় অনেক আগে থেকে ছিল। বটকেষ্ট রিসার্চ সেন্টার করবার আগে থেকে। আর যদি রিসার্চ করে ছোট্ট থেকে বড় করা হয়ে থাকে, তা হলে বুঝে নিতে হবে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে বটকেষ্ট। উদ্ভট গবেষণার ফল।

কিন্তু রিসার্চ সেন্টার তো খাঁ খাঁ করছে। লোকজন সব গেল কোথায়?

জ্যাকেটের ব্রেস্ট পকেটে লুকিয়ে রাখলাম ডিক্টোফোন, বটকেষ্টর কথাবার্তা রেকর্ড করে নেওয়ার জন্যে। যন্ত্রটা সেকেলে, কিন্তু কাজ দেয় খুব। ক্যামেরা ঝুলিয়ে নিলাম গলায়। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

খুব খিদে পেয়েছিল। সকালে সামান্য খেয়ে বেরিয়েছিলাম। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সব হজম হয়ে গেছে। সঙ্গে খানকয়েক স্যান্ডউইচ আছে বটে, কুকুরদের খিঁচুনিতে তাও খাওয়া হয়নি। ভাবলাম, বটকেষ্ট নিশ্চয় কিছু খাওয়াবে। স্যান্ডউইচ থাকুক জিম ব্যাগে।

নেমে এলাম নীচে পা টিপে টিপে। শব্দ না করে। বটকেষ্ট ঠায় বসেছিল সেই একই চেয়ারে। পিঠ খাড়া করে। এত চুপি চুপি আসা সত্ত্বেও ঘাড় না ফিরিয়েই টের পেয়েছিল। কিন্তু চেয়েছিল নিঃশব্দে চালু টেলিভিশনের দিকে। বলেছিল, ‘বসা হোক।’

আমি বসেছিলাম এবার ঠিক ওর পেছনে। ক্যামেরাটা রেখেছিলাম পাশের চেয়ারে।

বটকেষ্ট শুরু করেছিল এইভাবে, 'ইয়ংম্যান, সভ্যতার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র এই টেলিভিশন। একটু দেখা যাক।'

চালু করে দিলাম ডিক্টোফোন, বটকেষ্ট যাতে টের না পায়, সেইভাবে। রেকর্ড হয়ে থাকুক আধপাগলাটার কথাবার্তা। কিন্তু শব্দহীন চলমান বাক্যব্যয়ী মনুষ্যস্রোত কাঁহাতক দেখা যায়? বলেছিলাম, 'আওয়াজটা দিলেই তো হয়।'

বটকেষ্ট বললে পরদা থেকে চোখ না সরিয়ে, 'আওয়াজ জিনিসটা সব মাটি করে দেয়। আওয়াজ যখন না থাকে, পরদার ছবি তখন গান হয়ে দাঁড়ায়।'

'কিন্তু শব্দ ছাড়া ছবির কোনও মানে হয়?'

এবার আমার দিকে মুখ ফেরাল বটকেষ্ট। বললে, 'ঠিকই বলেছেন, আবার বেঠিকও বলেছেন। গোড়ায় গলদ করছেন।'

সেই প্রথম বটকেষ্টর মুখাবয়ব দেখলাম খুব কাছ থেকে। আত্মপ্রত্যয় প্রকট মুখের রেখায় রেখায়। গোটা মুখটা যেন ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি। চওড়া কপালের চামড়া ভাঁজ খেয়ে খেয়ে গেছে। ললাট তো নয়, যেন মন্দিরের চুড়ো। ঠোঁট পাতলা আর বেশ শক্ত। সব মিলিয়ে কঠোর এক মানুষের মূর্তি। বিজ্ঞানের তপস্যায় শুষ্ক মুখাবয়ব। ধ্যানগম্ভীর। উঁচু কপালের রেখায় রেখায় আঁকা জীবনের ধকল। পরিশ্রম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জ্ঞানের আলো।

'মাই ডিয়ার দীননাথ, শব্দ আদতে ক্ষতিকর। নৈঃশব্দ্য জ্ঞানের আকর।'

'এইজন্যেই কি শব্দরাজ্য থেকে এতদূরে এসে নৈঃশব্দ্যের মাঝে আপনার গবেষণা চালাচ্ছেন?'

'ঘুরিয়ে জানতে চাইছেন, লোকালয় থেকে এতদূরে এলাম কেন গবেষণা করতে?'

'এগজ্যাক্টলি তাই।'

'উত্তম কৌতূহল। কিন্তু বাপু, আমি যা বলছি, তা লিখে নিচ্ছ না কেন?'

'দরকার নেই বলে। মেমারি আমার এক্সেলেন্ট।'

'তা হলে শুরু করা যাক। আমিই আমাকে প্রশ্ন করে জবাব দিয়ে যাব। তাতে সময় বাঁচবে। রাজি?'

'রাজি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে দাঁড়াল বটকেষ্ট। তখনই দেখলাম, গোটা দেওয়ালে নানারকম জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি খোদাই করা রয়েছে।

'বাস্তুসংস্থান নিয়ে প্রথমেই তা হলে একটু জ্ঞান দেওয়া যাক।'

'বাস্তুসংস্থান আবার কী জিনিস?'

'ইকলজি... ইকলজি... পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার নিয়ে বিজ্ঞান, মাথায় ঢুকেছে?'

মাথাটা কিঞ্চিৎ গরম হয়ে গেলেও চুপ করে রইলাম।

বটকেষ্ট বলে গেল, 'বোঝা উচিত ছিল। ইকলজিতে ইন্টারেস্ট আছে বলেই তো এতদূরে আসা হয়েছে। তাই না?'

আমি নিশ্চুপ। ডিক্টোফোন চলছে।

বটকেষ্ট বলে গেল, 'যখন এসেছিলাম এখানে, তখন সৃষ্টি করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। এই যে বিশাল জঙ্গল দেখছ, এসবই আমার গবেষণার সাইড এফেক্ট... পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া— উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু জ্ঞানগম্যি কি আছে মাথার মধ্যে?'

রাগ হয়ে গেলেও মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম আমি ক-অক্ষর গোমাংস নই। পেটে কিছু বিদ্যে আছে।

বটকেষ্ট বললে, 'তা হলে তো কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল। একটু বললেই বুঝতে পারবে, আমার কাজকর্ম কী নিয়ে, কী করতে চাই আমি। আমি চাই এমন একটা সম্প্রদায় গড়তে যেখানে হাজির থাকবে প্রায় সব উদ্ভিদের প্রতিনিধি।'

'প্রায় সব? তা কী হয়! অসম্ভব। প্রতিটি উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায় এমন অনুকূল পরিবেশে যেখানে বিশেষ উদ্ভিদের বিশেষ চাহিদা মিটে যায়!'

মুচকি হাসল বটকেষ্ট, 'বাপু দীননাথ।' যতটা পাঁঠা তোমাকে ভেবেছিলাম, দেখছি ততটা পাঁঠা তুমি নও। ঘটে কিছু আছে। তবে কী জানো, পুথিগত বিদ্যের বাইরে যে জগৎ, তাই নিয়েই আমার কাজ। কী বলছিলাম? হ্যাঁ, সব উদ্ভিদকেই একই পরিবেশে খাপ খাইয়ে বড় করে তোলা যায়। পৃথিবী একটা তাজ্জব গ্রহ। এ গ্রহে সব সম্ভব করা যেতে পারে। আসবার পথে কিছু দেখে এসেছ। আরও যদি দেখতে চাও মনের মধ্যে প্রত্যয় আনবার জন্যে, তা হলে বনের মধ্যে পা চালিয়ে ঘুরে এসো মাইল দশেক। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।'

ফুট কাটলাম না। বটকেষ্ট আমাকে যে আপনি সম্বোধন থেকে তুমি সম্বোধনে নেমে এসেছে, তা নিয়েও মাথাগরম করলাম না। হয়তো আমাকে বালখিল্য ভেবেছে। কিশোর পত্রিকার সাংবাদিক বলেই উজবুকের মতো একটু হেয় করছে। করুক। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তো জার্নালিস্টদের তুলে ধরে ছুড়ে ফেলে দিতেন। ইনি না হয় আমাকে একটু কম আপ্যায়ন করলেন। বয়ে গেল। আমার কাজ উদ্ধার নিয়ে কথা। মুখে বললাম, 'আপনার সাজানো বাগান দেখতে দেখতেই তো এতটা পথ এলাম।'

শুধু এড়িয়ে গেলাম কুকুরদের প্রসঙ্গটা। তারা যে আমাকে জামাই আদর করেনি, এখন তা বলা সমীচীন হবে না। কেস গুবলেট হয়ে যেতে পারে।

বটকেষ্ট একটু অন্যমনস্কভাবে বললে, 'আমি যে বিরাট আবিষ্কারটা করেছি, তার দার্শনিক ভিত নিয়ে তোমাকে জ্ঞান দিতে চাই না। অত তাত্ত্বিক খুঁটিনাটি তুমি হজম করতে পারবে না। বলব শুধু উৎস সম্পর্কে, যে মূল ব্যাপারটার ফলে কিম্ভূত কাণ্ড ঘটে চলেছে পুরো এলাকা জুড়ে। ছোকরা, ভাইরাস কাকে বলে জানা আছে?'

ছোকরা সম্বোধনে এইবার একটু চটে গেলাম। তারপরেই খেয়াল হল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও তো আমাকে কতরকম উৎকট সম্বোধনে অপমান করেন। সেসব যখন সহ্য করতে পারি, তা হলে বিদ্যাদিগগজ আর-এক বৈজ্ঞানিকের তাচ্ছিল্য সম্বোধন গায়ে মাখতে যাব কেন?

তা হলেও ভাইরাস কী জিনিস, তাই নিয়ে আমার জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে চায়? আস্পর্ধা তো কম নয়!

মুখে জবাব দিলে পাছে গলার ঝাঁঝ বেরিয়ে যায়, তাই ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে জানিয়ে দিলাম, 'ভাইরাস কী পদার্থ, এই আহাম্মকের তা অজানা নয়।'

বটকেষ্ট বললে, 'তা হলেও একটু জ্ঞান দিয়ে রাখি। সমসাময়িক ধারণা অনুযায়ী ভাইরাস হল গিয়ে সাংকেতিক তথ্য পাঠাবার অতি ক্ষুদ্রতম প্রকৃতিসঞ্জাত কণিকা, উদ্ভিদ আর প্রাণীদেহ মধ্যে এই কণিকাই তথ্য বয়ে নিয়ে যায়, মানিয়ে নেওয়ার জন্যে, এই ভাইরাসেরা—'

'এক মিনিট। বললাম আমি, ভাইরাস তো জানি রোগ সৃষ্টি করার ক্ষুদ্রতম প্রাণী।'

'এক্কেবারে না। ভাইরাসরা প্রাণী নয়। অসুখকেও তারা বহন করে নিয়ে যায় না। পোলিওমাইলাইটিস, এনকেফালাইটিস— এসবই তো ভাইরাসজনিত রোগ, তা হলেও মেরে তো ফেলে না, অক্ষম করে দেয়, তাও লাখে একজনকে। এ তো গেল অফিসিয়াল পরিসংখ্যান। তাই এমন ধারণা বাদ দেওয়া যায় অনায়াসেই। ভাইরাসেরা তো প্রকৃতির মধ্যে অনাহুত উপদ্রব নয়। প্রকৃতির মধ্যে বরং এমন এক অতিপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যার দৌলতে মানিয়ে নেওয়া যায়, প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা যায়, বিবর্তনের পথে যাওয়া যায়। ভাইরাস ছাড়া এসব এক্কেবারে অসম্ভব।'

'বিবর্তন?'

'আরে হ্যাঁ। ক্রমবিবর্তন।

'বলেন কী!'

'আমি ওইরকমই বলি, বৎস দীননাথ। কিন্তু এ নিয়ে জ্ঞান দেওয়া যাবে পরে। এই মুহূর্তে শুধু জেনে রাখো, ভাইরাস অসংখ্য বংশাণু-সংকেতের বাহক— যাদের কিছুটা অথবা পুরোপুরি কাজে লাগায় জীব বা অবয়বী বা অঙ্গী— ইংরেজিতে একশব্দে যাদের বলা হয় অরগ্যানিজম্।'

আমি বললাম, 'বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে কিন্তু মনে হয়েছে, ভাইরাস অতি সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ। হয়তো বিশেষ একরকম জীবধর্মী প্রোটিন কণিকা। ঠিক বলছি?'

'বেঠিক কিছু বলোনি।'

'ভাইরাসকে সংক্ষেপে তা হলে কি বলা যায় বাড়তি তথ্য— পরিবেশের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া তথ্য?'

'এগজ্যাক্টলি। এমনই তথ্য যাদের কাজে লাগাতেই হয় সমস্ত সজীব প্রাণীকে।'

'তা হলে তো একটা প্রশ্ন করতে হয়।'

'কী প্রশ্ন, বৎস দীননাথ?'

'ভাইরাসরা তা হলে আসছে কোত্থেকে?'

যেন একটা ধাক্কা খেল ড. বটকেষ্ট। বললে, 'আসছে কোত্থেকে মানে? আরে বাবা, আমরা নিজেরাই তাদের বানিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিই নিজের মতে চলবার জন্যে। যে কোনও ভাইরাসই যে কোনও একটা সজীব কোষকে নতুন করে গড়ে নিতে পারে এমনভাবে যাতে করে সমবিন্দু সমগোত্রীয় হাজার হাজার ভাইরাসকে বানিয়ে নিতে পারে অনায়াসে, ঠিক যেন একটা খুদে কারখানার মধ্যে।'

‘কিন্তু প্রথম স্তরে তা হলে পাচ্ছি কী? ভাইরাস তো আছে অনেক রকমের। তা হলে কি বলতে হবে মিউটেশন ঘটে? আকস্মিক কোনও কারণে পরবর্তী প্রজন্মে অন্য অন্য গুণাবলির বিকাশ ঘটে?’

‘মিউটেশন।’ বলেই বটকেষ্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে করতে এসে দাঁড়াল আমার ঠিক পেছনে। বললে এক্কেবারে অন্য সুরে, আগের চেয়ে অনেক ঠান্ডা গলায়, ‘ইয়ংম্যান, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?’

গলার সুরে এখন বেশ মমতা, আন্তরিকতা। আমি কিন্তু শক্ত হয়ে রইলাম। হঠাৎ এহেন দরদ বেশ সন্দেহজনক। বললাম মেপেজুপে, ‘সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট খাওয়াই হয়নি।’

‘তা হলে তো এখুনি দুপুরের খাওয়া খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাই হোক, কেমন?’

খটকা লাগল আমার। বটকেষ্ট তাড়াতাড়ি এক প্রসঙ্গ থেকে আর-এক প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে কেন? যেই কোণঠাসা করে ফেললাম সাংবাদিকী চাতুরি দিয়ে, অমনি লোকটা চলে এল খাওয়ার কথায়।

তবে হ্যাঁ, বিজ্ঞানসাধক যারা, তারা এইরকম খেয়ালিই হয়। তা ছাড়া, সত্যিকথা বলতে কী, খিদের চোটে পেটের মধ্যে দাবানল জ্বলছে। বেশ কাহিল লাগছে। পেটে কিছু দেওয়া যাক, মাথা তা হলে ঠান্ডা থাকবে। খেতে খেতে বটকেষ্ট-বধের একটা চান্স নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

মুচকি হেসে বটকেষ্ট বললে, ‘তবে কী জানো ভায়া, গেন্ডেমুন্ডে গেলানোর মুরোদ আমার নেই। এ যে আমার আইবুড়ো মন্দির। পাবে শুধু ফলের রস আর স্যান্ডউইচ। ঝোলঝাল যদি চাও, বানিয়ে নাও নিজে। কাবার্ডে ইন্সট্যান্স সুপের প্যাকেট পাবে অনেক।’

‘আমিও তো সেই পথের পথিক। ব্যাচেলর। নিজের খানা নিজেই বানাই।’

‘তা হলে চলো।’

ঘর থেকে আগে বেরিয়ে গেল বটকেষ্ট। লক্ষ করলাম, আগের মতো ততটা থপথপিয়ে আর হাঁটছে না। আমার কাছে পেট হালকা করার ফলে কি মন চাঙ্গা হয়ে গেল? পেশি সুস্থতা ফিরে এল?

নিশ্চয় তাই! যে কোনও বিদ্যাদিগগজ মনের মতো বিষয় নিয়ে কথা কইলে বেশ ফ্রেশ হয়ে যায়। নেহাতই নিরেট মাথা আমার, তাই এতক্ষণ এই সহজ ব্যাপারটা বুঝিনি। জীবনের বেশকিছু বছর কেটেছে যে ধ্যানধারণা নিয়ে, সেই প্রসঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পেরে চাঙ্গা হয়ে গেছে বটকেষ্ট।

ভাইরাস নিয়ে বটকেষ্ট যে লেকচারটা মেরে গেল, তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি। ভাইরাসরা ভাইরাসই হয়, তার বেশি কিছু তো নয়। তা হলে বেশি কথার কচকচি চালিয়ে লাভটা কী? বিশেষ করে আমি মানুষটা প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের পাল্লায় পড়ে এতরকম লোকের সান্নিধ্যে এসে এত অজস্র আইডিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছি যে কৌতূহল জিনিসটা নিভে গেছে মনের মধ্যে। নতুন কিছু শুনলে চমকে ওঠার বান্দা আমি নই।

সিঁড়ির উলটো দিক দিয়ে একটা বড় দরজা পেরিয়ে ঢুকলাম খানা খাওয়ার জায়গায়।

রান্নাঘরের অনেক সরঞ্জাম সেখানে থাকলেও ঘরটাকে ঠিক রান্নাঘর বলা যায় না। যেমন, আছে একটা রেফ্রিজারেটর, একটা ইলেকট্রিক স্টোভ, একটা টেবিলের ওপর। যে টেবিলে থরে থরে সাজানো রয়েছে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির বিস্তর টেস্টটিউব, বকযন্ত্র, আরও অনেক কাচের জিনিস। প্রত্যেকটা কাচের পাত্রে রয়েছে কিছু-না-কিছু কেমিক্যালের শুকিয়ে যাওয়া তলানি। টেবিলের পাশেই রয়েছে একটা মস্ত সিঙ্ক, শুকনো খটখটে, কেউ কখনও ব্যবহার করে বলে মনে হয় না।

ফ্রিজের সাদা দরজা খুলে খানকয়েক শুকনো খটখটে সসেজ আর এক ডেলা চিজ বের করল বটকেষ্ট— টেবিলে রেখে নিয়ে এল দু' বোতল পেপসি। আমার জন্য একটা, নিজের জন্যে একটা। কাবার্ড হাতড়ে বের করল আধখানা পাউরুটি। শুকনো খটখটে। বললে, 'এতেই হবে। টোস্ট বানিয়ে নেওয়া যাক।'

শুকনো পাউরুটির পিসে একটু জল ছিটিয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল টোস্টারের মধ্যে। আমি ফালি কেটে নিলাম বাসি চিজ আর বাসি সসেজ থেকে। চিজ শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছিল বলে পিছলে যাচ্ছিল ছুরি। সসেজ শুকিয়ে হলদেটে হয়ে গেলেও খাওয়া চলে। খাওয়াদাওয়ার এই ব্যবস্থা দেখে খটকা লাগল আমার মনে। ল্যাবরেটরির লোকজন এই খেয়ে টিকে আছে কী করে?

ডক্টর বললে মিষ্টি গলায়, 'জবর খোশবাই ছেড়েছে! টোস্ট জিনিসটা মানবজাতির সেরা আবিষ্কার!' ঘ্রাণ নিল বেশ আওয়াজ করে, ফুলে গেল নাকের দুই পাটা, কেঁপে কেঁপে উঠল নাটের ডগা।

মনে মনে ভাবলাম, ল্যাবরেটরিতে যারা কাজ করে, তাদের উত্তম আহারের বন্দোবস্ত আছে নিশ্চয় অন্য কোথাও।

সাড়ম্বরে পেপসি-র বোতলের ছিপি খুলল বটকেষ্ট, টোস্টার থেকে তুলে আনল ঈষৎ বাদামি ভাবে সেঁকা পাউরুটির পিস। আমি তাতে পুরু করে লাগালাম শক্তমক্ত চিজ আর সসেজ। চিবিয়ে গেলাম খুব শব্দ করে করে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হেসে হেসে। পেপসি দিয়ে ভিজিয়ে নামিয়ে দিলাম গলা দিয়ে। খিদেটা তো গেল।

মিষ্টি করে বললে বটকেষ্ট, 'খাওয়ার জায়গা তো কাফেটেরিয়ায়, স্টাফ থাকে যেখানে। এটা হল এমার্জেন্সি খানা। হাঃ হাঃ!'

গরম টোস্টে মুখ ভরতি থাকায় জবাব দিতে পারলাম না।

খাওয়া শেষ হতেই পেপসির বোতল সরিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল বটকেষ্ট। যার মানে একটাই— পড়ে থাক এঁটো থালা, ধুতে আর হবে না।

ফিরে এলাম হলঘরে।

বটকেষ্ট বললে, 'কী লেখা হয়?'

'আমার লেখা?' আচমকা প্রশ্নে চমকে গিয়ে আমি বলেছিলাম।

'আরে না। ম্যাগাজিনে কী ধরনের লেখা বেরোয়?'

'সব ধরনের।'

'টিকে থাকতে হলে প্রকৃতিকেও মানিয়ে নিতে হয়, এ-বিশ্বাস আছে?'

'অবশ্যই।'

'তাতে কত সময় লাগতে পারে, আন্দাজ হিসেবে?'

'একশো... দেড়শো... দুশো বছর তো বটেই।'

'ভুল! মস্ত ভুল— সব্বাই করে!'

'তা হলে? কত সময় লাগতে পারে?' এবার আমার প্রশ্ন।

'বড়জোর পঞ্চাশ বছর।'

শুনেই তো ভুরু উঠে গেল আমার বিষম বিস্ময়ে। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে প্রকৃতি মাত্র পঞ্চাশ বছরে! বলে কী বটকেষ্ট!

বটকেষ্ট বললে, 'এই খাপ খাওয়ানোটা, পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলাটা ঘটতে পারে আরও কম সময়ের মধ্যে।'

আমি হতবাক। তারপরেই নিক্ষেপ করলাম প্রশ্ন, 'কিন্তু ভাইরাসের সঙ্গে আপনার এই বাস্তুসংস্থানিক বাগানের সম্পর্কটা কোথায়?'

মোক্ষম প্রশ্ন। ধানাইপানাই না করে চলে এলাম সোজা পয়েন্টে।

দেওয়ালের সামনে গিয়ে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল বটকেষ্ট। বললে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে, 'ভাইরাসদের জেদ নিয়ে আগে একটু কথা বলে নেওয়া যাক।'

'সেটা আবার কী?'

'জীবদেহে ভাইরাসদের টিকে থাকার ক্ষমতা। দেখা গেছে, অবস্থান যদি দীর্ঘকালব্যাপী হয়, তা হলে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা এসে যায়। কিন্তু সেইটাই সব কথা নয়। ভাইরাসরা নিজেরা অসুস্থ না হয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেদের। জীবদেহের সূক্ষ্মতম সাম্য বজায় রাখে এই ভাইরাসেরা। কোষের ভেতরকার জিনদের সঙ্গে মানিয়ে জিনদেরই পালটে দেয়।'

থ হয়ে রইলাম। বলে কী বটকেষ্ট? ভাইরাস জিন মানে বংশাণুদের পালটে দেয়? জিনরা তো অপরিবর্তনীয় বলেই জানি।

বটকেষ্ট একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তাই জীবদেহের পুরো পদ্ধতিটা পালটে যায়।'

এই পর্যন্ত বলেই বেশ উত্তেজিত হয়ে ঘরময় পায়চারি শুরু করেছিল ড. বটকেষ্ট। চোয়াল ঝুলিয়ে ফেলে আমি চেয়েছিলাম সেদিকে।

সূর্য তখন দিগন্তের দিকে হেলতে শুরু করেছে। গরাদ দেওয়া জানলার মধ্যে দিয়ে সূর্যালোক আর ঢুকছে না। ঘরের মধ্যে তেমন আলো আর নেই। বটকেষ্ট সোজাসুজি আমার দিকে না-ফিরে একটু পাশ করে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়াময় মূর্তি। চক্ষুযুগল যেন কোটরে ঢুকে রয়েছে। বললে, 'দীননাথ, যদি বলি এখানকার গাছপালাদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিইয়েছি, অবাক হবে কি?'

'ভাইরাসদের দিয়ে?'

'অবশ্যই।'

নরম গলায় বললাম, 'যদিও এটা বিজ্ঞানের যুগ, তা হলেও সতীর্থ বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য ছাড়া একা হাতে সব করা যায় না বলেই আমি মনে করি! পিলে চমকানো আপনার এই

আবিষ্কার আগেই বা হয়নি কেন, বিষয়টা এতজনের চোখ এড়িয়ে গেল কেন এতদিন ধরে, সেটাও তো একটা প্রশ্ন।'

ম্লান আলো বটকেষ্টর মাথার পেছনদিকে পড়ায় মুখের চেহারা দেখতে পেলাম না। মুখ ফেরানো রয়েছে আমার দিকে। বললে গুরুগম্ভীর গলায়,—'এতজনের চোখ এড়িয়ে গেল কেন? তার মানে, বিষয়টা পড়েছিল খোলামাঠে, কারও নজরে আসেনি কেন?'

'একজ্যাক্টলি।'

'আমি যে জিনিয়াস, তা মানতে চাও না বলেই এমন প্রশ্ন করতে পারলে।'

আমি থ হয়ে রইলাম। জিনিয়াস যারা, তারা কখনও নিজেদের জিনিয়াস বলে দাবি করে না। লোকে বলে জিনিয়াস। তবেই তারা জিনিয়াস হয়। কিন্তু বটকেষ্ট দাবি করছে নিজে থেকেই, সে নাকি বিরল প্রতিভার অধিকারী।

এতক্ষণে বুঝলাম, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কেন হাড়ে হাড়ে চটে রয়েছেন বটকেষ্টর ওপর।

'দীননাথ, অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে?'

জবাব দিলাম না।

বটকেষ্ট বললে, 'বেশ, বেশ, কথাটা শুনে তোমার পিলে হয়তো চমকে গেছে, কিন্তু তাতে সত্যের অপলাপ ঘটছে না। হ্যাঁ, আমি জিনিয়াস... বিরল প্রতিভার অধিকারী... পুরোমাত্রায়।'

মনে মনে ভাবলাম, বটকেষ্টর মন মেজাজ তবিয়ত নিশ্চয় ঠিক নেই। তাই অমন চোরের মতো কাণ্ডটা করেছে আমার প্রেস কার্ড আর জিম ব্যাগ নিয়ে। গোড়া থেকেই আমার বোঝা উচিত ছিল, ছিট আছে বটকেষ্টর মাথায়। গরাদ দেওয়া কেল্লা অথবা কারাগারের মতো বাড়িতে অনেকদিন আটকে থাকার বিষময় পরিণাম নিঃসন্দেহে। এমন পাগলের খপ্পর থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে যেতে গেলে তো দরকার লোকজন আর অ্যাম্বুলেন্স।

বটকেষ্ট ঠায় দাঁড়িয়ে রইল আমার দিকে চেয়ে।

তারপর বললে, 'মুখে কথা নেই কেন?'

'ভাবছি।'

'কী নিয়ে ভাবছ?'

'একা একা থেকে এইরকম পরিবেশে কেউ জিনিয়াস হতে পারে কিনা।'

'কে বললে আমি একা?'

'তা বটে। গবেষণা নিয়ে আছেন তো এখানে দশ বছর।'

'একজ্যাক্টলি। তার আগে একটা বড় ধরনের বিজ্ঞানসংস্থায় ছিলাম অনেক বছর। তাতে কিছু এসে যায় না। এইসবের জন্যে কেউ জিনিয়াস হয় না। আমিও হইনি। জিনিয়াস ছিলাম, আছি, থাকব।'

মওকা ছাড়লাম না। টুক করে বললাম, 'কয়েক ডজন অথবা কয়েকশো বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে থেকে থেকে আপনি জিনিয়াস হয়ে গেছিলেন বলে মনে করেছিলেন। তারপর টুক করে সরে এসেছেন এই নির্বান্ধব অঞ্চলে, একা একা নাম করবেন বলে।'

'ননসেন্স! নামের ধার ধারে না এই শর্মা!'

'তা হলে এলেন কেন?'

'আবিষ্কারটা হাতেনাতে যাচাই করার জন্যে। আমার মতো জিনিয়াস যারা, তারা শুধু আবিষ্কারের বুলি কপচেই ক্ষ্যামা দেয় না, হাতেনাতে সুফল ফলিয়ে ছাড়ে।'

'আবিষ্কারটা কী?' পয়েন্টে লেগে রইলাম আমি।

'একটু আগে তোমাকে কী বলেছিলাম? ভাইরাসদেরও মিউটেশন ঘটে। মনে পড়ছে?'

'পড়ছে।'

'খাঁটি জার্নালিস্ট বলেই পুরো ব্যাপারটার মূল পয়েন্টে চলে যেতে পেরেছিলে ঝট করে। যদিও অত বোঝোনি।'

'কী বুঝিনি?'

'কানখাড়া করে শুনে যাও। কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা ছিল, ভাইরাসঘটিত মিউটেশন হয় হঠাৎ, বাইচান্স।'

'পরিবর্তনের নির্দিষ্ট রূপরেখা তা হলে আছে?'

'আছে বই কী। আমি তা প্রমাণ করে দিয়েছি।'

'কীভাবে?'

'আঃ! বড্ড বাজে বকো! কী বলছিলাম? হ্যাঁ। ভাইরাস মিউটেশন কীরকম হবে, তা আগেভাগে বলা যায়, সেই পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। গোটা গ্রহ জুড়ে সেই মিউটেশনকে এনে ফেলা যায়। কী বললাম, বুঝলে?'

'না।'

'গবেট! ভাইরাসজনিত মিউটেশনকে কন্ট্রোলে রাখা যায়। এহেন মিউটেশন যখন ভবিষ্যবাণী অনুযায়ী নির্দিষ্ট পথরেখা ধরে আসে, তখন যে যে নিয়মাবলি মেনে চলে, সেই সেই নিয়মাবলি গ্রহজুড়ে বিবর্তন ব্যাপারেও খাটে। অতিখুদে, আধা-জীব সত্তারা একই নিয়মদের মেনে চলে।'

'এই পৃথিবীর সমস্ত পরিবর্তনের মূলে রয়েছে তা হলে ভাইরাস গোষ্ঠী?'

'গুড, গুড, এই তো ব্রেন খুলেছে। জল থেকে জমিতে উঠে আসবার পর পাখনার জায়গায় পা এসেছে এই ভাইরাসদের মানিয়ে নেওয়ার প্রসাদি গুণের জোরে। ভাইরাসদের জন্যেই পৃথিবীতে এসেছিল সরীসৃপরা, ভাইরাসরাই তাদের লোপ পাইয়ে দিয়ে এনে দিয়েছে স্তন্যপায়ীদের। বাইরের আর ভেতরের যতকিছু আকৃতি, সব পালটাতে পালটাতে গেছে এই ভাইরাসরা, অবশেষে এসেছে মানবজাতির মতো চিন্তাশীল যুক্তিবাদী জীবেরা।'

কথার মালায় যতি দিতেই ঘরে নেমে এল নৈঃশব্দ্য। আমার মানস-চোখে কিলবিল করে গেল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিলবিলে রহস্যময় সত্তারা যারা ঘটিয়ে চলেছে পিলে চমকানো পরিবর্তনের পর পরিবর্তন।

বাইরের আলো তখন কমছে।

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, 'কিন্তু আপনার এই আশ্চর্য উদ্যানে ভাইরাসের ভূমিকা কিছু আছে?'

'অবশ্যই আছে।' গমগম করে উঠল বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বর, 'এখানকার মাটি জল হাওয়ায় মানিয়ে নিতে না পেরে শুকিয়ে যাচ্ছিল গাছপালা। আমি দিলাম মোক্ষম ভাইরাস। নিজের চোখে দেখে এলে তাদের বাড়। আশ্চর্য জয়জয়কার।'

'কিন্তু কী উদ্দেশ্যে এই গবেষণা?'

'মূর্খ! আমি যে সংগীতবিদ বাখ-এর মতো জিনিয়াস। যিনি বিশ্বাস করতেন তাঁকে পৃথিবীতে আনা হয়েছে বিশেষ বিশেষ কিছু দেওয়ার জন্যে। তিনি তা দিয়ে গেছেন। অক্লান্তভাবে একটার পর একটা কাজ করে গেছেন। পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে মারা গেছেন। আমিও দিতে এসেছি। এই গ্রহকে নতুন করে সাজাতে এসেছি।'

কিছুক্ষণ সব চুপ।

তারপর আমি বটকেষ্টকে আরও বকিয়ে ডিক্টোফোনে কথাগুলো তুলে নেওয়ার জন্য বললাম, 'নিজেকে জিনিয়াস বলে তো জাহির করলেন, তারপর বললেন, প্রতিকূল পরিবেশে গাছপালাদের মানিয়ে নিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। একজন জিনিয়াস কি শুধু এই করেই জিনিয়াস হতে পারেন? বহুমুখী প্রতিভা যাঁদের থাকে, জিনিয়াস তাঁদেরকেই বলা হয়। আপনার প্রতিভা দেখা যাচ্ছে তো শুধু একটা ক্ষেত্রে।'

জবাবটা দিল বটকেষ্ট উৎকট উন্মাদের মতো গমগমে গলায়, 'আমার এই ইকলজিক্যাল গার্ডেন দিয়েই শুরু করেছি। যাব অনেকদূর। আজকের মানুষ বড় ধ্বংসকামী... সবই নষ্ট করে দিয়ে নিজেদের আখের গুছোতে চায়... স্টুপিড... যত অনিষ্টের মূলে... সমস্ত অশুভ শক্তির মূলে রয়েছে এই মানুষ জাত...'

'এক মিনিট। মানুষই কিন্তু স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি, তা তো মানেন?'

'স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি প্রকৃতি! মানুষ নয়। আজ পর্যন্ত কী সৃষ্টি করতে পেরেছে মানুষ? শুধু ধ্বংস করে। জঙ্গল পোড়ায়; তেল, কয়লা লুঠ করে। শ্রেষ্ঠ কীর্তি কী? না, পারমাণবিক শক্তি। করছে কী? না, পরমাণু বিভাজন! এখানেও সেই একই উদ্দেশ্য— ধ্বংস করা। প্রকৃতির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলার দিন চলে গেছে।'

রেগে গেছে বটকেষ্ট। তাই রয়েসয়ে আর কথা বলছে না। ধরিয়ে দিচ্ছে নিজেকে। আমি চুপ করে রইলাম। পেটের খিল খুলেছে, আরও বকুক।

বকেই গেল বটকেষ্ট। যেন বোমার মতো ফেটে পড়ল, 'সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন গোটা পৃথিবীটা জ্বলবে দাউদাউ করে। আকাশে যত নক্ষত্র, তার চেয়ে অনেক বেশি রকমের পোকামাকড় আছে এই পৃথিবীতে, সব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। নির্বোধ মানুষ নিজেদেরই কবর রচনা করবে এই সবুজ গ্রহে। দীননাথ, আমি তা হতে দেব না।'

আমি চুপ করে রইলাম। বটকেষ্ট বদ্ধ উন্মাদ হতে পারে, কিন্তু সে ঝংকার তুলে গেছে আমার মনের বীণার তারে।

বাইরের উঠোনে চাপা ঘেউ ঘেউ ডাক শোনা গেল।

জানলার কাছে গেল বটকেষ্ট, 'কে ও? জগা নাকি?'

ঘেউ ঘেউ ডাকের বদলে এবার শোনা গেল কিঁউ কিঁউ গলাবাজি।

'যা, যা। মানিক তোকে খেতে দেবে। এখন আমি ব্যস্ত।'

কুকুর কিন্তু কিঁউকিঁউ করে গেল নাছোরবান্দার মতো। তবে একটু মিইয়ে পড়া গলায়।

গলা চড়িয়ে বটকেষ্ট বললে, 'না। দরকার নেই। তুই যা।'

বাইরের আওয়াজ থেমে গেল। জানলার কাছ থেকে সরে এল বটকেষ্ট। ঘনায়মান অন্ধকারে যেন একটা ছায়ামূর্তি।

কাঠ হয়ে গেলাম। আবার না খিঁচুনি আরম্ভ হয়!

বটকেষ্ট বললে, 'শোনো জার্নালিস্ট, ভাইরাসদের মিউটেশন কীভাবে কন্ট্রোলে রাখতে হয়, আমি তা আবিষ্কার করেছি। প্রকৃতি যেখানে, সেখান থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেছি। জীবদেহ কাজে লাগায় অর্ডিনারি ভাইরাস। আমি বানিয়েছি স্পেশ্যাল ভাইরাস, জীবদেহ না চাইলেও এই ভাইরাস করে যায় নিজের কাজ।'

এই পর্যন্ত বলে সাদা দাঁতের ঝিলিক তুলে একটু হেসে নিল বটকেষ্ট। ঘনায়মান অন্ধকারে শুধু দাঁতের বাহার চোখে পড়ল। তাও খুব অল্প।

আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললে ফিসফিস করে, 'ঠিক দু' মিনিট লাগে। তার বেশি নয়। তার মধ্যেই একটা মানুষ পালটে গিয়ে হয়ে যায় বাঁদর অথবা কুকুর। অথবা অন্য কিছু। মাথায় ঢুকেছে? মানুষের মধ্যে আমি ভাইরাসদূষণ ঘটাই। যে কোনও মানুষের মধ্যে। মানিয়ে নেওয়ার জন্যে মাসদুয়েক সময় দিই। ফলে পেয়েছি রীতিমতো ইনটেলিজেন্ট একটা হাউন্ড কুকুর!'

চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার। বিস্ফারিত হল দুই চক্ষু! এ কার পাল্লায় পড়েছি! এ যে দেখছি আস্ত উন্মাদ!

'সমস্যা শুধু একটাই। এই যে ভাইরাস, এরা নিজে থেকে সংখ্যাবৃদ্ধি করে না। কপাল খারাপ, শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিক্রিয়া এখনও আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি। ছোট্ট অন্তরায় সব গবেষণাতেই থাকে, কাটিয়ে ওঠার পথ আছে অনেক।'

টেপ ফুরিয়ে গেল ডিক্টোফোনে। খড়খড় আওয়াজ শুনেই বুঝলাম।

বটকেষ্ট বললে, 'জার্নালিস্ট শেষ হয়ে গেল তোমার টেপ।'

শার্টের বোতাম খুলে গেঞ্জি থেকে খুলে আনলাম ডিক্টোফোন, ঘুরিয়ে দিলাম টেপ।

বটকেষ্ট বললে, 'যাদের ওপর ভাইরাসের জোর খাটিয়েছি, দু'দিনেই তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।'

চুপ করে রইলাম। বটকেষ্টর বাক্য আদৌ বেদবাক্য কিনা, তা তো ধরতে পারছি না। তাই অবিশ্বাস খচখচ করে যাচ্ছে মনের মধ্যে। যা বলে গেল, তড়পে গেল, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো দুঃস্বপ্নের যুগ এসে গেল গোটা পৃথিবীতে। জৈবিক পন্থায় সৃষ্টি আর সভ্যতা নাশ করতে উদ্যত হয়েছে একটা আস্ত পাগল! ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মহামারী লাগবে পৃথিবীতে। গায়ে কাঁটা জাগানো সেই মহামারিতে মানুষ মরবে না, দু' ঘণ্টার মধ্যে কুকুর হয়ে যাবে! ঘুমোতে যাবে মানুষ রূপে, ঘুম ভাঙবে কুকুর হয়ে গিয়ে, ওরে বাবা! পরিণাম হবে ভয়ংকর। মানবসভ্যতা রাতারাতি মুছে যাবে, এসে যাবে বাঁদর আর কুকুরদের যুগ। হাজার হাজার বছর ধরে তিলতিল করে যা কিছু গড়া হয়েছে, রাতারাতি তা মুছে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে!

বটকেষ্ট যেন বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে গেল গলার মধ্যে, 'কী হে ছোকরা? চুপচাপ কেন? যুগ পালটানোর মতো আবিষ্কার নয় কি? ঢং করবে না, সত্যি বলো।'

'সত্যিই বলছি', বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল আমার, মাথার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে যা বললেন তা শুনে।

'মাথার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে? শুধু শুনেই? দেখলে না-জানি কী অবস্থাটা দাঁড়াবে!' বলতে বলতে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়াল পাগলা বটকেষ্ট আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, 'সভ্যতার ধ্বংস হবে, এই শুনেই এই অবস্থা? আরে বাবা, এটা কি একটা সভ্যতা হল? এত মারামারি-কাটাকাটির নাম সভ্যতা? এ তো জঙ্গলের রাজত্ব... জঙ্গুলে নিয়ম... ফিরে যাক মানুষ তা হলে সেই জঙ্গলে। মস্ত সুযোগ দিচ্ছি। শুরু হোক আবার শুরু থেকে। পারমাণবিক প্রলয়ের জন্যে মানুষকে আর অষ্টপ্রহর ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হবে না। সৈন্য না থাকলে যুদ্ধ-টুদ্ধও আর থাকবে না। কুকুররা কি সৈন্য হতে পারে? কিছু মানুষকে অবশ্য কুকুর না বানিয়ে অন্য জানোয়ার বানিয়ে দিতেও পারি! পৃথিবীটাকে বাঁচানোর জন্য মানুষ জাতটাকে আগে কুকুর বানানো হল গিয়ে আমার প্রথম প্রচেষ্টা। অন্য অন্য জানোয়ারও তৈরি করে যেতে পারি। যখন যেমন, তখন তেমন। যেসব প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে তাদের দলে দলে ফিরিয়ে আনতে পারি, যেমন বিশেষ একশ্রেণির কচ্ছপ অথবা বিশেষ জাতের ঘোড়া! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে দীননাথ, ভয়ে নয়, উল্লাসে।'

বটকেষ্ট যে দেখছি একটু একটু করে আরও খেপে যাচ্ছে। গোটা হলঘরটা গমগম করছে গলাবাজিতে। দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আগের মতোই জানলার সামনে।

'দীননাথ দ্য জার্নালিস্ট, শুনে যাও এই পৃথিবীর কতখানি মঙ্গল করবে আমার এই মহা আবিষ্কার। ফিরে আসবে বাস্তুসংস্থানিক ভারসাম্য... ইকলজিক্যাল ব্যালেন্স... এক টোটকায় ফিরে আসবে পৃথিবীর মূল প্রকৃতি... প্রাকৃতিক পাল্লায় আর হেরফের থাকবে না...যেখানে যা মানায়, সেখানে তা থাকবে। প্রকৃতির নষ্ট সংসারে আবার সুন্দরের জয়গান শোনা যাবে... বরং আরও একটু বেড়ে যাবে...মানুষের মধ্যেকার সমাজ বেঁধে থাকার প্রবণতা এসে যাবে জীবজন্তুর মধ্যে। গাছপালাদেরও পালটে দেব আমার প্ল্যান অনুযায়ী। নির্বোধের মতো একপায়ে খাড়া না থেকে চলমান হবে সেইসব গাছ... পাতা হবে স্বচ্ছ... সূর্যের আলো দেদার এসে পড়বে মাটিতে... নতুন প্রাণ পাবে গোটা পৃথিবী!'

'ড. বটকেষ্ট!' আমি আর মুখ বুজে থাকতে না-পেরে চিৎকার করে উঠেছিলাম। গলার শির তুলে, 'আপনার প্ল্যান যদি কাজে লাগান, তা হলে তো লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে মানুষ অক্কা পাবে। জানোয়াররা পটল তুলবে। কুকুর তো নিজেদের খাওয়াতে পারে না, সে মুরোদ তাদের নেই, খাবার দিলে তবে খায়। মানুষদের চেয়ে আরও বেশি মারদাঙ্গা হবে জানোয়ারেরা। তাদের আর বাগে রাখা যাবে না। সিংহ, বাঘ, প্যান্থারদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, তখন তাদের পেটভরা খাবার আর পাওয়া যাবে না। এই যেসব বুনো জানোয়ার, এদের খপ্পর থেকে আপনার কুত্তা-মানুষরা আত্মরক্ষা করবে কী করে? সভ্যতার কী অবস্থা দাঁড়াবে? হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা গোল্লায় যাবে নাকি?'

খেঁকিয়ে উঠল বটকেষ্ট, 'জাহান্নামে যাক সভ্যতা! এনে ফেলেছে তো পারমাণবিক যুদ্ধের চৌকাঠে। মরণ হবে লাখে লাখে? এখনই কি হচ্ছে না? বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানোর নামে নির্বিচারে পশু হত্যাকারী মানুষ কি জানোয়ার নিধনযজ্ঞে মাতেনি? মানুষগুলো পশু হয়ে যাবে? হোক। সব মানুষ তো হচ্ছে না, তিনভাগের দু' ভাগ মানুষ-জানোয়ার পুরোপুরি জানোয়ার হয়ে যাক। বাকি একভাগ দেব-মানুষ হয়ে সুন্দর জীবনযাপন করুক। অহো! অহো! কী সুন্দর পৃথিবীটা হবে সেদিন!'

'সুন্দর! একে আপনি সুন্দরতর পৃথিবী বলছেন?'

'আলবত বলছি, হাজারবার বলব। এখনকার এই নোংরা কাদাটে জঘন্য পৃথিবীর চাইতে অনেক... অনেক সুন্দর... স্বর্গ বললেই চলে। তখনকার মানুষ তো আর এখনকার মানুষের মতো অসাধু, জোচ্চোর, লোভী, পরশ্রীকাতর, হিংসুটে থাকবে না। তাদের প্রাণ হবে আকাশের মতো উদার। হারানোর কিছুই তো আর থাকবে না, ভয়ও আর থাকবে না। ঋষিদের মতো মহান মন হবে প্রত্যেকের। ফিরে আসবে সত্যযুগ। জীবজন্তুরা আগের মতো কথা বুঝবে মানুষের। রাংতা মোড়া এই সভ্যতার অবসানে আসবে নিখাদ যুগ, কলিযুগের পরের যুগ, তখন এই লোভ, হিংসা, হানাহানি আর থাকবে না।'

'নিখাদ যুগ! আরে মশায়, যুগ বলেই তো তখন আর কিছু থাকবে না। যা ছিল আদিম পৃথিবী, হয়ে যাবে তাই। বরং আরও ভয়ংকর। মানুষ-পশুদের প্রতাপে। একে আপনি প্রগতি বলেন?'

'এখনকার এই নিকেল সভ্যতা আর থাকবে না ঠিকই। কিন্তু ছাই থেকে উঠে আসবে আশ্চর্য সেই সভ্যতা, যেরকম সভ্যতা গোটা ছায়াপথের তারকাসাম্রাজ্যেও বোধহয় আর নেই... বোধহয় কেন... নিশ্চয় নেই... সৃষ্টি থেকে এসেছে ধ্বংস, ধ্বংস, শুধু ধ্বংস... তারপর... ধ্বংস থেকে আসবে সৃষ্টি, সৃষ্টি, সৃষ্টি... ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের চিরন্তন খেলা।'

আমি হাঁফাতে লাগলাম। বটকেষ্ট বলে গেল, 'সব মানুষকে তো জানোয়ার বানাব না। কিছু মানুষকে রেখে দেব, আমার মতবাদে বিশ্বাসী যারা, তারা থাকবে। মানুষ থেকে জানোয়ার হয়ে যাওয়া জানোয়ারগুলোকে টিট করে রাখার জন্যে। পৃথিবী জুড়ে যে ইকলজি... বাস্তব্য বিজ্ঞানের ঢেউ আসবে, তা কন্ট্রোল করার জন্যে।'

'তাই বলুন।'

'কী বলব?'

'তখনও থাকবে প্রভু-ভৃত্য ব্যাপারটা। প্রভু যারা, আপনারা মতবাদে বিশ্বাসী যারা, তারা কন্ট্রোল করে যাবে নির্যাতিতদের। সাম্যবাদ গোল্লায় যাবে।'

জানলার সামনে থেকে সরে এসে দরজার দিকে যেতে যেতে বটকেষ্ট বললে, 'বটে! আমার মতবাদে আস্থা নেই! খুব খারাপ। খুব খারাপ!'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। আচমকা বুঝলাম, বিষম বিপদের মধ্যে রয়েছি আমি। পাগলা বৈজ্ঞানিককে ঘাঁটাতে গিয়ে আমি আমার হাড়িকাঠ তৈরি করে ফেলেছি। খুব শিগগিরই বিশ্বের প্রথম জার্নালিস্ট-কুকুর হয়ে যেতে হবে আমাকে। সেই মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল একটা ব্যাপার, কেন আমার জিম ব্যাগ খুলে কাগজপত্র সার্চ করেছিল বটকেষ্ট।

দুঁদে মস্তানমার্কা ছিনেজোঁক সন্ধানীদের হামলা যে ঘটতে পারে, অনেকদিন ধরেই নিশ্চয় তা আঁচ করেছিল বটকেষ্ট। আটঘাটও নিশ্চয় বেঁধে রেখেছে সেইভাবে। আমার কাছে পেটের খিল খুলেছে ইচ্ছে করেই, মনের মধ্যে আর-এক মতলব নিয়ে। হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, কুকুরের দল গোড়া থেকে কেন আমাকে জামাই আদর করেনি, কেন গাছের বাঁদরটা প্যাটপ্যাট করে দেখছিল আমাকে। কেন শহরের লোকেরা বটকেষ্টর এই বাগানের নাম দিয়েছে 'শয়তানের বাগান'।

চিৎকারটা বেরিয়ে গেছিল গলা দিয়ে, 'ড. বটকেষ্ট—!'

'এই তো আমি।'

'আপনার কুকুরগুলো তা হলে—'

'এই তো মাথা খুলেছে। সঠিক অনুমান। আরে হ্যাঁ, আমার যেসব স্যাঙাত আমার মতে চলেনি, তারা যে আমার এই মহতী গবেষণার পথে মূল কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিপজ্জনক, খুবই বিপজ্জনক।' বলতে বলতে চৌকাঠ পেরিয়ে গেল বটকেষ্ট, 'পনেরোটা বছর ধরে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে মন ঘোরানোর চেষ্টা করেছি। চ্যালা বানাতে গিয়ে দেখেছি আমাকেই চ্যালাকাঠ নিয়ে তেড়ে আসে। তখন তাদের বন্দোবস্ত করতে হয়েছে এইভাবে... যেমন কুকুর তেমনি মুগুর... কুকুর বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি সবক'টা হারামজাদাকে। একটাকে বানিয়েছি বাঁদর, গাছে গাছে থেকে খবর এনে দেওয়ার জন্যে। তুমি যে এদিকে আসছ, সে খবরটা সে-ই এনে দিয়েছিল আমাকে। তখন পাঠিয়েছিলাম কুকুরদের।'

'অ্যালসেশিয়ানটা?'

'আমার পয়লা নম্বরের বেইমান শিষ্য!... গুড নাইট!' চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল বটকেষ্ট।

নিঃশব্দে টেলিভিশন চালু করল আগের মতোই।

আমার তখন মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল হওয়ার অবস্থা। বটকেষ্ট এর মধ্যেই আমার শরীরে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়েছে কিনা বুঝতে তো পারছি না। বেইমান শিষ্যদের নিশ্চয় জোরজবরদস্তি করে কুকুর, আর বাঁদর বানায়নি। আমিও কি আমার অজান্তে একটু একটু করে তাই হয়ে যাচ্ছি? সভয়ে হাত আর পা দেখে নিলাম। না, এখনও কুকুর-বাঁদর অবস্থা আসেনি।

মনে মনে কিন্তু বেজায় চটে গেছিলাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের ওপর। কী দরকার ছিল আমাকে প্রাণ নিয়ে টানাটানির খেলায় নামিয়ে দেওয়ার? প্রাণটা অবশ্য যাবে না, তবে বটকেষ্টর দরবারে একটা ডাকাবুকো মানুষকুকুর অথবা মানুষবাঁদর তো থেকে যাবে। কচ্ছপ-টচ্ছপও বানিয়ে দিতে পারে। এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে সাপ-টাপও করে দিতে পারে। ভয়ানক ভাইরাস যার হাতের মুঠোয়, সে সব করতে পারে!

হয়তো এখনও ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেনি। ঘটলে টের পেতাম। তার আগেই পলায়ন করতে হবে এখান থেকে, এই উদ্যানবাটিকা থেকে, এই শয়তানের বাগান থেকে!

ভয়াল ভয়ংকর এই তল্লাটের কুকুর-বাঁদরদের নিয়ে আমার আর কোনও ভয় নেই। আমার কী হাল হতে পারে, তারা নিশ্চয় তা টের পেয়ে গেছে, দরদও নিশ্চয় আছে আমার

ওপর। তেড়িয়া কুকুরগুলোর সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসে গেলেই হবে। একদিন তো তারা মানুষ ছিল। তা ছাড়া, বটকেষ্ট যা ভেবে রেখেছে, তেমনটা নাও হতে পারে। রেগে আগুন হয়ে রয়েছে ওরা মালিকের ওপর। মওকা খুঁজছে নিশ্চয় বদলা নেওয়ার জন্যে। বাইরে কুকুর, কিন্তু ভেতরে মানুষ তো প্রত্যেকেই।

ভাবতে ভাবতে ফের গায়ের রক্ত জল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। আমারও ওই দশা করে ছাড়বে বদমাশ বটকেষ্ট। তাই পেটের কষি আলগা করে প্রাণখুলে গাওনা গেয়ে গেছে। এবার মারবে কোপ।

পা টিপে টিপে এগোলাম খানিকটা। শব্দ-টব্দ পেলাম না। মনে সাহস হল। বটকেষ্টর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন শ্মশানপুরীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে গোটা বাড়িটায়, বাড়ির আশেপাশেও।

হাজার হাজার চিন্তা একসঙ্গে কিলবিল করে যাচ্ছে আমার ব্রেনের মধ্যে।

গলিপথটা বেশ লম্বা, তা তো দেখেই এসেছি। সাবধানে চেয়ারগুলোকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে আওয়াজ-টাওয়াজ না করে পৌঁছিলাম সদর দরজার চৌকাঠের কাছে।

আস্তে আস্তে টেনে খুলে ফেললাম একটা ছিটকিনি। একদম শব্দ না করে তুলে আনলাম একটা মস্ত ভারী লোহার হুড়কো। খুলতে গিয়ে একটু আওয়াজ করে ফেলেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূরে শুনলাম খচমচ পায়ের আওয়াজ। ধড়াস করে উঠল আমার বুক। বোধহয় সিঁড়ি বেয়ে কেউ নেমে আসছে। নিশ্চয় বটকেষ্ট, আবার কে!

তৃতীয় আর সর্বশেষ লোহার খিলটা খুলতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে। নানা জটিল কেরামতি থাকায় অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে খুলতে হচ্ছিল। তারপরেই খিল সরে এল, খুট করে আওয়াজ করে। নিরেট নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ওইটুকু আওয়াজ কম নয়।

ওপরতলা থেকে ভেসে এল হুংকার, 'জগা নাকি? হচ্ছেটা কী? সরে যা দরজার সামনে থেকে! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!!!'

আর সময় দিলাম না। এরপরে কী ঘটতে পারে ভেবে নিয়ে দরজা ধরে টানলাম। খুলতে না পেরে মনে পড়ে গেল, পাল্লা খোলে বিপরীত দিকে। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কপাট।

'থাম!' অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে এল বটকেষ্টর চিল্লানি। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে থপথপ পায়ের আওয়াজ।

আমি যখন দৌড়ে বেরিয়ে যেতে যাচ্ছি, বিশালাকায় একটা লোমশ চতুষ্পদ নক্ষত্রবেগে আমার পাশ দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে, ধাক্কা মেরে আমাকে বেশ খানিকটা টলিয়ে দিয়ে। আমি চিৎপাত হয়ে মেঝেতে ঠিকরে যেতেই দেখলাম আর-একটা মস্ত কুকুর দৌড়চ্ছে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দিয়ে।

শোনা গেল বটকেষ্টর আর্ত চিৎকার, 'আ-আ-আ!' সেইসঙ্গে পিস্তল নির্ঘোষ। একবার, দু'বার, তিনবার। জবাবস্বরূপ অন্ধকার মথিত করে দিয়ে বাঘা কুত্তার গর্জন শোনা গেল একবার... দু'বার...তিনবার। কী যেন ধপ করে আছড়ে পড়ল সিঁড়িতে। গড়িয়ে নেমে আসছে। পিস্তল নির্ঘোষ থেমে গেছে।

মন তখন কাজ করছে না। উঠে দাঁড়িয়ে টেনে দৌড়লাম। কোনদিকে যাচ্ছি, সে

খেয়াল ছিল না। যেভাবেই হোক আমাকে সরে যেতে হবে এউ উন্মাদভবন থেকে দূরে... দূরে...অনেক দূরে।

কিন্তু একটুখানি দৌড়েই হাঁটু ভেঙে গেল আমার। মুখ থুবড়ে পড়লাম ঘাসের ওপর। একটু পরেই সংবিত ফিরে পেয়ে টের পেলাম, ভেতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। হাত-পা শরীরে খিঁচুনি আরম্ভ হয়েছে। পেটে পাক দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম কেন এমন হচ্ছে।

চোখ খুললাম চোখের পাতায় রোদ পড়ায়। রোদ আসছে ঝকঝকে সবুজ গাছের পাতাদের মধ্যে দিয়ে। আড়মোড়া ভেঙে নিলাম একটু পাশ ফিরে।

জগা আমার আগেই ধকল কাটিয়ে উঠেছে। পাশে শুয়ে গোলাপি জিভ লকলকিয়ে হাঁপাচ্ছে।

ঘোর কেটে গেছে আমার 'ভাইরাসের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার' সময়টুকু দেওয়ার পর। আমার লালচে ল্যাজ এখন বেশ লম্বা। গায়ে লম্বা লম্বা লোম। জাতকুকুর হয়ে গেছি। জাতে আমি এখন কোলি কুকুর।

জগাকে তিনবার গুলি করেছিল বটকেষ্ট। তিনটে গুলিই পাশ কাটিয়ে জগা কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে বটকেষ্টর টুঁটি।

মিন্টু কুকুরটা অনেক কেরামতি জানে। বিশাল রেফ্রিজারেটর খুলে বিস্তর খাবারের প্যাকেট থেকে বেশ কয়েকটা এনেছে বাইরে মাঠের ওপর। তা সত্ত্বেও হিসেব করে খেতে হচ্ছে।

মস্ত অ্যালসেশিয়ান জগা, যে না কি বটকেষ্টর পয়লা নম্বর বেইমান শিষ্য, সে বদলা নিয়েছে বটকেষ্টর টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে দিয়ে, বটকেষ্টর ডেডবডি সে-ই টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছে শয়তান উদ্যানের কিনারায়— যেখানে আছে কাক-শকুনের সাম্রাজ্য, ছিঁড়ে খাক, হাড়গোড় শুধু পড়ে থাকুক।

জগা আর মিন্টু বালির ওপর সামনের থাবা ঘষে ঘষে লেখবার কায়দা ভালই রপ্ত করেছে। বিদ্যেটা আমাকেও শিখে নিতে হয়েছে। লম্বাটে ইটের বাড়ির পেছন দিকে একটা চৌকো চত্বরে আমরা এখন লেখা লেখা খেলা করি। ফলে, অল্প কথায় মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখে গেছি।

বাকি কুকুরগুলো দেখছি একটু একটু করে মানুষের স্বভাব হারিয়ে ফেলছে। নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া করে, ঘেউঘেউ করে, লড়াই করে, যখন তখন লিডার পালটায়। বলাই আমাদের মধ্যে একা বাঁদর হয়েছে। কুকুরগুলো এই বলাইয়ের ওপর একবার চড়াও হয়েছিল। পাথরের যে বাড়িটা রয়েছে একটু দূরে, সেখানকার চাবি থাকে এই বলাইয়ের কাছে। কুকুর তাড়া করলে চাবি নিয়ে উঠে যায় মগডালে। বাঁদুরে বুদ্ধি দিয়ে টাইট দিচ্ছে কুকুরদের।

তবে সেবাও করে। বাঁদর বলেই হাতের কেরামতি দিয়ে ফ্রিজ খুলে খাবারদাবার এনে দেয়। মিন্টুকে সাহায্য করে। মানুষ যেসব কলকবজা চালিয়ে অভ্যস্ত, বলাই একা সেসব করে যায়।

জগা আর মিন্টু বালির ওপর লিখে আমাকে বলেছে, ভাইরাসের প্রতিষেধক ইটের বাড়ির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে বটকেষ্ট। খুঁজে নিতে হবে। তা হলেই আমরা ফের মানুষ হয়ে যাব।

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। ড. নিজে তো কুকুর-বাঁদর হয়ে যায়নি। নিশ্চয় প্রতিষেধক ভ্যাকসিনের দৌলতে। যেভাবেই হোক সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে। বাঁদর-বলাইকে তাই চটালে চলবে না। ওর হাতের দাম আমাদের কাছে এখন অনেক। ওর কুচুটে বুদ্ধিও অনেক। বাঁদর হলে যা হয়।

আমি এক ধাপ এগিয়ে গেছি। আমার নাম দীননাথ নাথ। এত সহজে হার মানবার পাত্র নই। বটকেষ্ট যদি বিটলেমি করে, তার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিলাম।

ডিক্টোফোনটা মামুলি ডিক্টোফোন নয়। ইচ্ছে করেই জিনিসটাকে একটু সেকেলে চেহারা দিয়ে রাখা হয়েছে, বটকেষ্টর তা চোখ এড়িয়ে গেছে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের খাসা ব্রেন থেকে বেরিয়েছিল আইডিয়াটা। ওঁর কাছে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার আছে। অত্যাধুনিক যন্ত্র। লাখ টাকা দাম। তার মধ্যে 'আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স' বলে একটা সেকশন আছে। টাইপ করে যে কোনও প্রশ্ন করলেই স্ক্রিনে তার জবাব ভেসে ওঠে। আমি সেই অত্যাধুনিক নকল বুদ্ধিমত্তাকে হারিয়ে দিয়েছিলাম একটিমাত্র প্রশ্ন করে, 'বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন কি ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন?' জবাবটা হওয়া উচিত ছিল, 'সব প্রাকৃতিক শক্তির মূল যেখানে, উনি তাকেই ঈশ্বর বলে মানতেন।' ল্যাপটপ কিন্তু লিখে জানিয়েছিল, 'বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম হয় না, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হয় না।' বড় চালাক, না? আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে যাওয়ার মতো ধুরন্ধর।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তখন ল্যাপটপের ইনটেলিজেন্স বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সামান্য একটু কেরামতি করে। ডিক্টোফোনকে স্পেশ্যাল কায়দায় বানিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন ল্যাপটপকে।

বটকেষ্টর তা চোখ এড়িয়ে গেছিল।

কিন্তু যা যা বলে গেছিল, তক্ষুনি তক্ষুনি তা স্যাটেলাইটের মধ্যে দিয়ে এসে ল্যাপটপে রেকর্ডেড হয়ে গেছিল, কথা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল বিশেষ ধরনের মাইক্রোফোন আর স্পিকারের মধ্যে দিয়ে। মোবাইল ফোনের উন্নত ব্যবস্থা।

তাই কিস্তিমাত করলেন প্রফেসর। হারিয়ে দিলেন বটকেষ্টকে। উনি নিজে 'গুলজার বৈজ্ঞানিক কমিটি'র সবাইকে এনে আমাদের ফের মানুষ করে দিলেন।

এই কাহিনি লেখা হল তারপরেই।
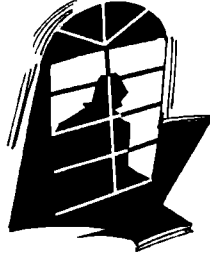
আশ্চর্য সংবাদপত্র

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র মাথা খাটিয়ে মাঝে মাঝে এমন সব উদ্ভট কাণ্ড করে বসেন...

একটা ঘটনা বলা যাক। বিশেষ এই এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলেন খবরের কাগজগুলোকে একহাত নেওয়ার জন্যে। বিশেষ করে একটা খবরের কাগজের কাটতি ফেলে দেওয়ার জন্যে। সে সংবাদপত্রে সংবাদ যত না থাকে, তার চেয়ে বেশি ছবি থাকে। সম্পাদকের ধারণা (এবং বদ্ধ বিশ্বাস), ছবি না থাকলে নাকি আজকালকার পাঠক আর পাঠিকারা কাগজ কেনে না। ফলে হয়েছে কি, তাঁর তৈরি কাগজ শুধু চোখ ভরায়, মন ভরায় না।

প্রফেসর তিতিবিরক্ত হয়ে আমাকে একদিন বললেন, 'দীননাথ, কাগজ করা কাকে বলে, তা দেখিয়ে দেব।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলাম, 'সাংবাদিকদের চটাতে যাবেন না, প্রাণে না মারলেও, মানে মেরে দেবে।'

উনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'তবে রে.....।'

তারপর যে কাণ্ডটা ঘটেছিল, সেই নিয়েই পিলে চমকানো এই কাহিনি।

কালিম্পং শহরে সেদিন দারুণ কুয়াশা পড়েছিল। বিশ হাত দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ইলেকট্রিক লাইট আর গাড়ির আলো শুধু হলুদ চক্ষুর মতো ম্যাড়ম্যাড় করছিল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে জুতোর আওয়াজ আর মোটর গাড়ির কান ঝালাপালা করা হর্নের আওয়াজ। শৈত্য নামক দৈত্য চেপে বসেছে গোটা শহরে। শহরের বাইরে বেশ কিছু মাইল পর্যন্ত একই অবস্থা। জঙ্গলের গাছগুলো কুয়াশার কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঝুমভাবে দাঁড়িয়ে।

বেলা তখন সাড়ে দশটা। হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম ইলেকট্রো মেক্যানিক্যাল ক্লাবে একটা কনফারেন্সে— প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের তরফ থেকে কিছু বলবার জন্যে। প্রফেসরের দৌলতে আমি যে একটু একটু করে কেউকেটা হয়ে যাচ্ছিলাম, এই নিমন্ত্রণটাই তার প্রমাণ। আসলে ডাকা হয়েছিল প্রফেসরকে। কিন্তু উনি নিজে না গিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কি ছাই জানতাম, তাঁর পেটে পেটে ঘুরছে অন্য ফিকির।

আমি প্রায় দৌড়চ্ছিলাম, গায়ে পাতলা কোট আর হালকা জুতো থাকার জন্য। আমার

নিশ্বাসের হাওয়া নিমেষে বাষ্প হয়ে যাচ্ছিল। নাকের ডগা এক্কেবারে অসাড় হয়ে গেছিল। বগলের তলায় নাকটাকে চেপে রাখতে পারলে যেন বেঁচে যেতাম।

হাতে তখন দেড়ঘণ্টা ছিল। সম্মেলনের প্রথমেই গিয়ে হামবড়া ভাব দেখানোর জন্যে একটু আগে পৌঁছতে চেয়েছিলাম। সেদিনের একটা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। প্রফেসর বলেছিলেন, 'সম্মেলনে যাওয়ার পথে যে নিউজপেপার স্ট্যান্ড আছে সেখান থেকে রোজ কাগজ কিনবে এবং পড়বে। মতামত জানাবে।'

আমি জানতে চেয়েছিলাম, বিশেষ ওই স্ট্যান্ড থেকেই কাগজ কিনতে হবে কেন? কালিম্পঙে আর কি কাগজের বিক্রির স্ট্যান্ড নেই?

উনি মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'থাকতে পারে, কিন্তু সেসব কাগজে মজা নেই। যা বলছি তা করবে।'

আমার সন্দেহ হয়েছিল। প্রফেসর দিনকয়েক কলকাতা থেকে উধাও হয়ে গেছিলেন, তা জানি। কোথায় গেছিলেন, আমার কাছে ভাঙেননি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এর মধ্যে কালিম্পং গেছিলেন নাকি?'

উনি তেড়ে উঠেছিলেন, 'তোমার অত কথা জানবার দরকারটা কি?'

আমার বেশ অভিমান হয়েছিল। আমার কাছে কক্ষনও তো লুকোচুরি করেন না। এখন কেন করছেন?

মরুকগে। চলে গেছিলাম কালিম্পং। প্রফেসরের কথামতো উঠেছিলাম বিশেষ হোটেলে, যে হোটেল থেকে সম্মেলনকক্ষে যেতে গেলে নিউজস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে যেতে হয়। স্ট্যান্ডের দিকে যখন যাচ্ছি কুয়াশার মধ্যে গা ঢেকে কে একজন বলেছিল, 'ও দোকানে রোজকার কাগজ পাবেন না।' আমি তেড়ে উঠে বলতে গেছিলাম, 'তবে কি বাসি কাগজ পাব?' কিন্তু বক্তা মিলিয়ে গেছিল কুয়াশায়।

আমি এসে দাঁড়িয়েছিলাম কাচ আর প্লাস্টিক ঢাকা নিউজস্ট্যান্ডের সামনে। ভেতরে আলো জ্বলছে। ঠিক যেন রূপকথার দোকান। এইটুকু দোকানের মধ্যে বসে কাগজ বিক্রি করাও তো ঝকমারি ব্যাপার। বসবার জায়গা কোথায়? ভেতরে ঠান্ডা অত নেই। কিন্তু এমন গরমও নেই যে ওখানে বসে বসে কাগজ বেচা যায়। প্রফেসরের সবই উদ্ভট অর্ডার। আমাকে কাগজ কিনতে হবে ঠিক এই দোকানটা থেকেই।

ঠান্ডায় জমে যাওয়া আঙুল দিয়ে টোকা মেরেছিলাম কাচের জানালায়। খুট করে কাচ সরে গেছিল তক্ষুনি।

আমি বলেছিলাম, 'আজকের কাগজ একটা দাও।'

জবাবটা এসেছিল মেয়েলি গলায়, 'আজকের কাগজ আমি বেচি না।'

খুপরি দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিলাম। কথা বলছে একটি মেয়ে। বাঙালি। বয়স বড়জোর কুড়ি।

'সেইরকমই তো শুনলাম আসবার সময়ে। কিন্তু বাসি কাগজ তো আমি পড়ি না।'

'বাসি কাগজ আমি বেচি না।'

'তা হলে বসে আছ কেন?'

'আগামীকালের কাগজ বেচবার জন্যে।'

'আগামীকালের কাগজ! মানে?'

মেয়েটি আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গায়ে পড়া গলায় বললে, 'আরে দাদা, আপনার গা যে এবার বরফ হয়ে যাবে। কোথায় যাচ্ছেন এমন ঠান্ডায়?'

'ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাবে।'

'এই ঠান্ডায়? জমে যাবেন যে! আসুন, ভেতরে একটু বসে যান। বাইরের মতো অত ঠান্ডা এখানে নেই।'

কাগজ বেচনেওয়ালি একটা মেয়ের কাছে এতটা সাদর অভ্যর্থনা আশা করা যায় না। যেন কত ঘরোয়া।

সত্যিই শীতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কলকাতার ছেলে, কালিম্পঙের শীত সহ্য হবে কেন। খুপরি ঘরের দরজায় হ্যাঁচকা টান মেরে খুলেছিলাম, গুটিসুটি মেরে নিউজস্ট্যান্ডের খুপরিতে ঢুকেছিলাম। একজনের বেশি বসবার জায়গা নেই ভেতরে। তাই বেঁকেচুরে দাঁড়িয়েছিলাম শরীরটাকে জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো করে।

একগাদা কাগজ দেখিয়ে মেয়েটি বলেছিল, 'বসে পড়ুন।'

বসেছিলাম কাগজের গাদায়। কনকনে ঠান্ডা পা দুটো রেখেছিলাম ইলেকট্রিক হিটারের সামনে। এরকম আলট্রামডার্ন নিউজস্ট্যান্ড কলকাতায় কল্পনাও করা যায় না। কালিম্পং সত্যিই একটা আজব শহর। জঙ্গল ঘেরা ব্রিটিশ কালচার। ফার্স্ট ক্লাস!

মেয়েটি বললে গায়ে পড়া গলায়, 'এমন ঠান্ডায় ক্লাবে কেউ যায়?'

আমি বললাম, 'আমাকে যেতেই হবে।'

'কেন?'

'বেতারতরঙ্গ নিয়ে বক্তৃতামালায় কিছু বলতে হবে।'

বক্তৃতাটা যে প্রফেসর লিখে দিয়েছেন, আমার এলেমে লেখা নয়, সেটা আর বললাম না।

'ওহো। কাগজে খবরটা পড়েছি। আপনার নাম দীননাথ নাথ?'

'আমার নাম তুমি জানলে কী করে?' চমকে গেছিলাম আমি।

'কাগজে বেরিয়েছিল খবরটা। আপনি নাকি অহেতুক স্বপ্ন দেখেন?'

খবরের কাগজ বেচনেওয়ালির মুখে ট্যাঁস ট্যাঁস কথা শুনে মাথা গরম হয়ে গেছিল আমার, 'বাজে স্বপ্ন আমি দেখি না। ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল এই শর্মা। রেডিও ওয়েভ যে মাটি ফুঁড়ে ঢুকে যায়, তা কি জানা আছে?'

'আমি মুখ্যু মানুষ।'

'তবে অত পটর পটর করছ কেন। মাটি পরীক্ষা না করেই জানা যেতে পারে মাটির তলায় কী আছে।'

'যাচ্ছেন যান। কিন্তু আপনার বক্তৃতা শুনে সবাই হাসবে। টিটকিরি দেবে।'

মাথা গরম হয়ে গেল আমার। আমার মাথা এমনিতেই চট করে গরম হয়ে যায়। তার ওপরে কিনা একটা কাগজ বেচনেওয়ালির ফুটুনি।

বললাম তেড়েমেড়ে, 'জানছ কী করে?'

'কাগজ পড়ে।'

'কী কাগজ?'

'এই তো।' বলে, একটা খবরের কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিয়ে চম্পা বললে, 'পড়ে দেখুন।'

প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু মামুলি খবর। আমাকে নিয়ে কিছু লেখা নেই।

চম্পা বললে, 'তিনের পৃষ্ঠা দেখুন।'

খুললাম তিনের পৃষ্ঠা। পড়লাম: 'বেতারতরঙ্গ নিয়ে অভিনব আলোচনা ২৪ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় হয়ে গেল......,'

সেকী! আলোচনা হয়ে গেল মানে! আলোচনা তো হবে একটু পরে দুপুর ১২টায়...... কাগজে লিখছে, হয়ে গেল। কী সর্বনাশ! আমি কি তা হলে গুলিয়ে ফেলেছি! একদিন পর কনফারেন্সে যাচ্ছি?

ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম চম্পাকে, 'তারিখ কত আজকের?'

'চব্বিশে ডিসেম্বর।'

'তা হলে কনফারেন্স হয়ে গেল বলছে কেন? শুরু তো হবে আরও একঘণ্টা পরে।'

'কারণ, এ কাগজ আগামীকালের কাগজ।'

কাগজ ঘুরিয়ে প্রথম পৃষ্ঠার তারিখটা দেখলাম, পঁচিশে ডিসেম্বর।

'ব্যাপারটা কি? আজকের তারিখ কত?'

'চব্বিশে ডিসেম্বর।'

'আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এ কাগজ আগামীকালের কাগজ। আমি বেচি শুধু আগামীকালের কাগজ। কিন্তু কেউ চায় না আগামীকালের কাগজ। চায় শুধু আজকের কাগজ। অথচ আমার কাছে ডেলিভারি আসে শুধু আগামী দিনের কাগজ।

'হতেই পারে না।'

মুখে তড়পালাম বটে, কিন্তু চোখের সামনে দেখছি খবরটা। একদিন আগেই বলে দেওয়া হয়েছে পরের দিনের খবর!

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!' বলেছিলাম তাজ্জব সুরে, 'আগে থেকেই বলে দেওয়া হচ্ছে কী ঘটবে কনফারেন্সে! বিসমিল্লা! এ খবর তো আমিই উলটে দিতে পারি।'

'কীভাবে?'

'কনফারেন্সেই যদি না যাই?'

'না গিয়ে পারবেন না। কী অজুহাত দেবেন? তা ছাড়া আপনি তো একা নন। আরও অনেকে আসছে কনফারেন্সে।'

'তা বটে! কিন্তু কী আশ্চর্য!'

'চমকাচ্ছেন কেন?'

'আগামীকালের কাগজ বেচছ বললে!'

‘সেইটাই আমার কাজ।’ একটু হেঁয়ালির সুরে বললে চম্পা।

‘এক্কেবারে অকাজ। দোকানে আছ কতক্ষণ?’

‘আটটা পর্যন্ত।’

‘সাড়ে সাতটায় আসব। কনফারেন্সের খবর মিলল কিনা, জানিয়ে যাব।’

‘নিশ্চয়।’ চম্পার দুই চোখে দেখলাম দুষ্টুমি।

কনফারেন্স শুরু হয়েছিল কাঁটায় কাঁটায় বারোটায়। একঘেয়ে বস্তাপচা কিছু জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ পাঠের পর এবং তা নিয়ে আলোচনা হয়ে যাওয়ার পর আমি মাটির ভেতরে বেতারতরঙ্গের প্রবেশ নিয়ে কল্পকথা শুরু করেছিলাম। ভেবেছিলাম, একঘেয়েমি আলোচনায় আইডিয়ার ধূমকেতু চালিয়ে দেব।

কিন্তু তা হল না। তার্কিক অবিশ্বাসীরা বিদ্রুপের বাণ ছুড়ে আমাকে ল্যাজেগোবরে করে বসিয়ে দিল। আগামীকালের একখানা কাগজ সঙ্গে যদি আনতাম, তা হলে দেখতে পেতাম, কাগজে যা যা যেমনভাবে লেখা হয়েছে একদিন আগে, ঠিক সেইভাবে সেই সেই কথার তুবড়ি ছুটে গেল সম্মেলনকক্ষে। গোহারান হেরে গেলাম আমি প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের মূল্যবান আইডিয়া উপস্থাপনের মুরোদ না থাকায়।

নিউজস্ট্যান্ডে পৌঁছেছিলাম সাড়ে সাতটার একটু পরে।

চোখ নাচিয়ে চম্পা বলেছিল, ‘কী ঘটল কনফারেন্সে?’

‘অষ্টরম্ভা।’ বলেছিলাম আমি তুম্বো মুখে। ‘কাগজে যেমন যেমন লেখা হয়েছে, ঠিক সেইরকমভাবে। আগামীকালের এই কাগজ আসে কোত্থেকে?’

‘ছাপাখানা থেকে।’

‘কালিম্পঙের কেউ কিছু বলে না তোমার এই আগামীকালের কাগজ বিক্রি নিয়ে?’

শুকনো মুখে চম্পা বললে, ‘সেইটাই তো কেউ বুঝতে পারে না। স্রেফ পড়ে যায়। মনে করে আজকের কাগজ।’

পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় চম্পার নিউজস্ট্যান্ডে গেলাম খবরের কাগজ কেনবার জন্যে। দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। টোকা মারতেই শুনলাম একটা খড়মড় আওয়াজ। যেন একটা আস্ত কাগজকে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হল।

তারপরেই খুলে গেল দরজা। শুকনো মুখে চম্পা বললে, ‘আমাকে যে এক্ষুনি বেরোতে হবে।’

‘কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?’

‘এখনও ঘটেনি, তবে এখুনি ঘটবে। ঠিক দশটার সময়ে আগুন লাগবে শিশুনিবাসে। প্রাণে বাঁচাতে হবে...... আমাকেই। যাই......’

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না আমার।

‘ঠিক দশটার সময়ে আগুন লাগবে শিশুনিবাসে। কী আশ্চর্য! তুমি জানলে কখন?’

‘এক্ষুনি। আপনি দরজায় টোকা মারতেই খবরের কাগজে।’

‘তা হলে চলো, আমিও যাই।’

‘না। আপনি থাকুন এখানে।’

‘ননসেন্স! আগুন লাগবে কোথায়..... সে সবকিছু লেখা হয়েছে?’

‘হ্যাঁ,’ চম্পার মুখ দেখে মনে হল সত্যি বলছে না।

‘বাচ্চারা সব বেঁচে যাবে?’

‘হ্যাঁ... তবে... একজন প্রায় পুড়ে যাবে।’

বলেই, বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিল চম্পা।

আমার খটকা লেগেছিল তখনই।

শিশুনিবাস ওখান থেকে মিনিট দশেকের পথ। আমরা ছুটতে ছুটতে সামনের দরজায় গেছিলাম। দরজা বন্ধ দেখে বাড়ি ঘুরে পেছনের দরজায় পৌঁছেছিলাম। সে দরজা খোলা ছিল। ঢুকে গেলাম ভেতরে। একতলায় একটা বড় ঘরে বাচ্চারা নানা খেলনা নিয়ে খেলছে। পাশের খাবারঘরে এক প্রৌঢ়া আয়া খুটখাট কাজ করছে। চম্পা সোজা তার কাছে গিয়ে বললে, ‘একটু কথা আছে।’

প্রৌঢ়া এই অঞ্চলের মানুষ। কিন্তু বাংলা বোঝে। কালিম্পঙের প্রায় সব মানুষই বাংলায় চৌকশ।

বললে, ‘কী কথা?’

‘চম্পা বললে ‘ঠিক দশটায় এখানে একটা আগুন লাগবে। কীভাবে জেনেছি, জিজ্ঞেস করো না।’

‘বলছ কী!’

‘বাচ্চাদের জামাকাপড় পরিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাও। এখুনি।’

প্রৌঢ়ার উপস্থিত বুদ্ধি আছে। কথা না বাড়িয়ে হাঁক দিয়ে ডাকল আর একজন মেয়েছেলেকে। এককথায় তাকে বলে দিল, কী করতে হবে। আর সময় নষ্ট নয়। বাচ্চাদের গরম জামা পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল তখুনি।

আমি বললাম, ‘টেলিফোন আছে?’

‘আছে। ওই তো।’

দৌড়ে গেলাম টেলিফোনের পাশে। দমকলের ফোন নাম্বার দেখলাম একটা কাগজে লিখে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে সামনের কাঠের পার্টিশনে। ফোন করলাম। ওদিক থেকে রিসিভার তুলতেই চটজলদি বললাম, ‘চলে আসুন শিশুভবনে।’

‘কখন আগুন লেগেছে?’

‘এখনও লাগেনি। এখুনি লাগবে।’

‘ইয়ারকি হচ্ছে?’ দমাস শব্দ শুনলাম। রিসিভার নামিয়ে রেখেছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ়াকে বললাম, ‘আগুন নেভানোর সিলিন্ডার আছে?’

বলতে বলতে হাতঘড়ি দেখলাম। দশটার কাছে চলে এসেছে ঘড়ির কাঁটা।

দোতলা থেকে ততক্ষণে হুড়মুড় করে নেমে আসছেন ভারী চেহারার এক ভদ্রমহিলা।

নিশ্চয় শিশুভবনের দায়িত্বে আছেন ইনি। পদমর্যাদায় ডিরেক্টর।

আমাকে বললেন উদ্বিগ্ন গলায়, 'ফায়ার এক্সটিনগুইশার আছে ওই ছাউনির মধ্যে।'

আমি দৌড়ে গেলাম উঠোনের ছাউনির সামনে। কিন্তু দরজায় যে তালা ঝুলছে।

'চাবি কোথায়?' উত্তেজনায় গলা ভেঙে গেছিল আমার।

দোতলা থেকে চাবি আনিয়েছিলেন ডিরেক্টর মহিলা। দরজা খুলে আমি যখন সিলিন্ডার বাইরে বের করছি। ঠিক তখনই শুনলাম অনেক গলার চিৎকার, 'আগুন! আগুন!'

রান্নাঘরের মেঝেতে পড়েছিল বিস্তর শুকনো প্যাকিংবাক্স। স্টোভের অথবা ইলেকট্রিক সার্কিটের আগুন লেগেছিল প্রথমে সেখানে। হুটোপাটিতে উলটে গেছিল কেরোসিনের টিন। নিমেষে। আগুন চলে এসেছে কাঠের পার্টিশনে, যার এদিকে খাবারঘরে ভিড় করেছিল বাচ্চাগুলো। জ্বলন্ত পার্টিশনের পাশ থেকে তাদের টেনে টেনে বের করছে চম্পা।

ডিরেক্টর ভদ্রমহিলা ফের ফোন করেছিলেন দমকলের অফিসে। এবার আর তারা অবিশ্বাস করেনি।

আমি তখন পাগলের মতো হাঁকপাঁক করছি। বাচ্চাদের জ্বলন্ত পার্টিশনের এদিক থেকে টেনে টেনে বের করছি। চম্পা ওদিক থেকে তাদের টেনে এনে ঠেলে দিচ্ছে আমার দিকে। দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছে আরও বাচ্চা। আমি সেদিকে ছুটে গেছিলাম। এক-একটা বাচ্চাকে ধরে কোলে করে নিয়ে গিয়ে রেখে আসছিলাম উঠোন পেরিয়ে পেছনে দরজা দিয়ে বাইরের গলিতে।

ঠিক এই সময়ে একটা জোর আওয়াজ শুনলাম একতলার খাবারঘরে। হুড়মুড় করে কী যেন ভেঙে পড়ল। দৌড়েছিলাম শব্দ লক্ষ্য করে।

জ্বলন্ত পার্টিশন পড়েছে চম্পার ওপর। শেষ বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়েছিল। নিজে কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারেনি।

মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছিল আগুনে। দমকলের লোক এসে জ্বলন্ত পার্টিশন সরিয়ে পেয়েছিল তার পুড়ে যাওয়া দেহ।

আমি তখন আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকলেও উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি।

মনে পড়েছিল ছোট্ট একটা ব্যাপার।

নিউজস্ট্যান্ডের দরজার বাইরে যখন দাঁড়িয়েছিলাম, কানে এসেছিল একটা খড়মড় শব্দ। যেন একটা কাগজ দলা পাকিয়ে ফেলা হল।

নিউজস্ট্যান্ডের চাবি ছিল আমার পকেটে। ইচ্ছে করেই কি চাবিটা আমার পকেটে দিয়ে গেছিল চম্পা?

দৌড়েছিলাম নিউজস্ট্যান্ডের দিকে। দরজা খুলে এককোণে ঠেলে রাখা দলা পাকানো একটা কাগজ পেয়েছিলাম। তারিখ আগের দিনের, খবরটা আজকের।

শিশুভবনে আগুনে ঠিক দশটায় পুড়ে মারা গেছে একটি মেয়ে। তার নাম চম্পা।

খবর নিয়েছিলাম হাসপাতালে। চম্পা আর বেঁচে নেই।

সফল হয়েছে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের এক্সপেরিমেন্ট। আগামীকালের খবরের কাগজ যে বের করা যায়, তা দেখিয়ে দিলেন হাতেনাতে, আমাকে সাক্ষী রেখে।
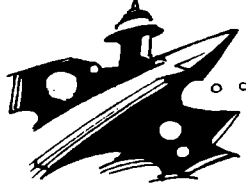
ডক্টর ফুঁ

১. অলৌকিক পাথর

ভাগনে যখন চিঠি লিখল সিউড়ি থেকে দু'দিন সেখানে কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে, সুটকেস গুছিয়ে উঠে বসলাম স্টেট ট্রান্সপোর্টের রামপুরহাটগামী বাসে। বসলাম আটটায়, সিউড়ি পৌঁছলাম বিকেল আড়াইটায়।

আমরা ভগ্নিপতি ওখানকার সরকারি অফিসার। জিপ নিয়ে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত হিল্লি-দিল্লি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভাগনে-ভগ্নিপতির পাল্লায় পড়ে আমিও যখন তখন সেই জিপে চড়ে বীরভূম পর্যবেক্ষণে বেরোতাম। এককালের বীরভূমি এই বীরভূম— গ্রামেগঞ্জে, পথেঘাটে, শহরে মাঠে কত কীর্তি ছড়িয়ে আছে, কে তার খবর রাখে। শুধু তারাপীঠ আর বক্রেশ্বর নিয়ে টুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ব্যস্ত, কিন্তু আরও কত কী যে দেখবার আছে, তা তারা জানে না। বড়ই দুঃখের ব্যাপার। জিপের সুবিধে নিয়ে সরকারি কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাই 'বীরভূমি' দেখে নয়ন সার্থক করে চললাম। জিপ যখন যেদিকে বেরোয় সরকারি ডিউটিতে, আমি এককোণে উঠে বসে থাকি, যা দেখি, তা মনের খাতায় টুকে নিই।

বীরভূমের পশ্চিমপ্রান্তে বিহারের ছোটনাগপুর। পার্বত্য ঢেউ গোটা বীরভূম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এখানকার রাঙামাটিতে লোহার চিহ্ন রয়েছে বলেই মিনি স্টীল প্লান্ট বসেছে। জল খুব ভাল, চনমনে খিদে পায়। হাওয়া বিশুদ্ধ, ফুসফুস পরিষ্কার থাকে। হিংলো ড্যামের দিকে গেলে অজয় নদীর আভাস এবং গ্র্যানাইট পাথর এনতার দেখা যায়। দেখা যায় দূর দিগন্তে পর্বতের ধোঁয়াটে বিস্তার।

গ্র্যানাইট স্তূপ আরও এক জায়গায় আছে। বড় বিস্ময়করভাবে আছে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, সেই বিরাট বিরাট স্খলিত শিলাস্তূপ দেখলে চক্ষুস্থির হবে না, এমন টুরিস্ট ভূভারতে নেই। অথচ কোনও টুরিস্টকে এ জিনিস দেখাতে নিয়ে আসা হয় না। মরুক গে। আমার কাজ আমি করে যাই।

আশ্চর্য এই প্রস্তরস্তূপ রয়েছে দুবরাজপুরের কাছেই। সিউড়ি থেকে পথ বেশি নয়। বেশ বড় এবং জমজমাট জায়গা। বিডিও অফিস আছে, হাসপাতাল আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের

আবাসিক বিদ্যালয় আছে, বিরাট বাজার আছে। দুবরাজপুর থেকে সামান্য এগোলেই, ময়ূরাক্ষী কটন মিলের দিকে যাওয়ার পথে পড়বে মামা-ভাগনে পাহাড়।

নামটা বিচিত্র, জায়গাটাও তাই। দূর থেকে বড় বড় পাথরগুলো চোখেই পড়ে না। জিপটা হঠাৎ মোড় নিতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল দোতলা তিনতলা সমান প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই। একটার পর একটা ওপর ওপর ফেলা; এমন আলগাভাবে ফেলা যেন বিষম ঝড়ে যে কোনও মুহূর্তে গড়িয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু যুগ যুগ ধরে এইভাবেই রয়ে গেছে প্রস্তরস্তূপ। কালো কুচকুচে, ছাইয়ের মতো ধূসর পাথরের গায়ে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা খড়ি, কাঠকয়লা, আলকাতরা দিয়ে নিজেদের নাম লিখে গেছে। অমর হয়ে থাকবার আত্যন্তিক বাসনায় কত আগডুম বাগডুম কথাই না রচনা করেছে। একদিকে শ্মশান। মস্ত একটা পাথরের ওপর মড়াপোড়া ছাই তখনও পড়ে। মাঝামাঝি জায়গায় একটা পরিত্যক্ত একতলা কোঠা, দরজা-জানলা পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দূর থেকেই তা দেখা গেল।

পাহাড়ের নীচের দিকে আবার একটা একতলা বাড়ি। সামনের দিকে মস্ত দালান। বাড়িটার ঠিক পেছন দিকে আড়াইতলা উঁচু একটা বিরাট গ্র্যানাইট পাথর। আকারে প্রায় ডিমের মতন, আয়তনে কেবল প্রকাণ্ড, পঞ্চাশ ফুট উঁচু তো বটেই।

এরই নাম নাকি পাহাড়েশ্বর শিবলিঙ্গ। এতবড় শিবলিঙ্গ ভারতে আর কোথাও নেই। কামরূপ কামাখ্যার অলৌকিক ক্ষমতা নাকি এই শিবলিঙ্গের মধ্যেও আছে, কিন্তু কেউ সে খবর রাখে না বলেই পুণ্যলোভীদের ভিড়ভাট্টাও নেই। একজন মাত্র খিটখিটে প্রৌঢ় পুজোআচ্চা করেন পাহাড়েশ্বরের, কিন্তু সন্ধে হলেই সটকান দেন এ অঞ্চল থেকে, রাত্রে থাকেন না। তখন এই শ্মশান আর এই পাহাড়ে থাকে নাকি কেবল চোর আর সাধু। পাহাড়ের আনাচে কানাচে, রন্ধ্রে গুহায়, সানুদেশে চূড়ায় থমথম করতে থাকে আতঙ্ক।

কীসের আতঙ্ক? জিজ্ঞেস করেছিলাম খিটখিটে প্রৌঢ় পুরুৎ ঠাকুরকে।

তিনি কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'সেসব কথা বলে আপনাদের মন বিরূপ করে দিতে চাই না। মামা-ভাগনে পাহাড় দেখতে এসেছেন, দিনমানে দেখে চলে যান। এখানে সন্ধ্যের পর কেউ থাকে না। আমরা পুরুষানুক্রমে বাবার সেবা করে আসছি, জাগ্রত বাবা, বেনারস থেকে এসেছিল আমাদের পূর্বপুরুষ বাবার সেবা করার জন্যে, তাই করে যাচ্ছি আজও। সরকারি সাহায্য পাচ্ছি না, উলটে চোরে সব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। দেখছেন না, মন্দিরের ঘণ্টাদুটোও ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। দরজা জানলা কিছু নেই। পাথরটাকে খালি নিয়ে যেতে পারে না, পারলে তাও নিয়ে যেত।'

'কেন? পাথরে কী আছে?' জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

'অলৌকিক ক্ষমতা আছে। মন্দিরের মধ্যে এই যে বিরাট কচ্ছপের মতো পাথরটা দেখছেন, শুধু যে এর মধ্যেই আছে, তা নয়। মন্দিরের পেছনে আড়াইতলা সমান ওই শিবলিঙ্গেরও সেই ক্ষমতা। আরও ক্ষমতা আছে আশপাশে পড়ে থাকা অনেক পাথরের। সেসব পাথর কোথায় আছে, কেউ জানে না। আমরাও কাউকে সেদিকে নিয়ে যাই না।'

কৌতূহল বেড়ে গেল কথা শুনে, 'আপনি জানেন কোথায় আছে?'

কথা এড়িয়ে গিয়ে বললেন খিটখিটে পুরুত, 'বংশপরম্পরায় আমাদের অনেক খবরই রাখতে হয়, কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্যেই জিভ বাঁধা, কথা বলা বারণ।'

আপাদমস্তক দেখে নিলাম লোকটার। গাঁজা-খাওয়া লাল চোখ, গলাও ভাঙা গেঁজেলদের গলার মতন। ময়লা ধুতি আর ছেঁড়া শার্ট ছাড়া পরনে সন্ন্যাসিগিরির বালাই নেই। পুরুতঠাকুর বলে মনেই হয় না। অথচ শিবলিঙ্গের আর অন্যান্য পাথরের অলৌকিক ক্ষমতার কথা অনর্গল বলে যাচ্ছেন। ধাপ্পাবাজ নিশ্চয়।

বললাম, 'সন্ধ্যার পর থাকেন না কেন?' খাঁ করে রেগে গেলেন খিটখিটে পুরুত। চোখ গরম করে বললেন, 'অত জেরা কীসের? পাহাড় দেখতে এসেছেন, দেখে চলে যান। বাবার পুজোর জন্যে পাঁচসিকে পয়সা দিয়ে যান। যা চান, বাবা তাই দেবেন। জাগ্রত বাবা, কাউকে ফেরান না।'

কথা বাড়ালাম না। গেঁজেলদের সঙ্গে তর্কে পেরে উঠব না। মানিব্যাগ থেকে আট আনা বের করে রাখলাম পেল্লায় শিলার ওপর, মন্দিরের মধ্যে দানব কচ্ছপের মতো যে-পাথরটা রয়েছে, তার ওপর। গজগজ করে বললেন গেঁজেল পুরুত, 'বাবার কাছে কিপটেমি করলে কি ইচ্ছে পূরণ হয়? আরও কিছু দিন।'

আমি আরও চার আনা বের করে পাথরে রাখলাম। গেঁজেল পুরুত অং-বং-চং করে একগাদা মন্তর আউড়ে, পাথরে ফুল-বেলপাতা ঠেকিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'গোত্র কী? নাম কী?'

নামটা বললাম, 'দীননাথ।'

'পদবী কী?'

'নাথ।'

'দীননাথ নাথ?'

'আজ্ঞে।'

'গোত্র।'

'কাশ্যপ।'

আবার অং-বং-চং করে মন্তর আউড়ে ফুল-বেলপাতা আমার হাতে গুঁজে দিলেন গেঁজেল পুরুত।

বললেন, 'যান, মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

মুখে কিছু বললাম না। মনে মনে তখন একটাই কামনা করেছিলাম। এই পাথরের অলৌকিক ক্ষমতাটা যে কী, তা আমাকে জানতেই হবে। কেন রাতবিরেতে এখানে কেউ থাকে না, কেন লোকে ভয়ে মরে, সে রহস্য আমি উদ্ধার করবই।

তখন কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি যে পাহাড়েশ্বর বাবা আমার মনের বাসনা এভাবে পূর্ণ করবেন।

ভাগনে রবিন আমার সঙ্গেই ছিল। মামার ওপর তার অসীম শ্রদ্ধা। এতক্ষণ তাই গেঁজেল পুরুতের চোটপাট শুনেও মুখ খোলেনি। মন্দিরের লাল সিমেন্টের দাওয়ায় বেরিয়ে এসেই বললে ফিসফিস করে, 'মামা, ব্যাটা নির্ঘাৎ গাঁজা খায়। সব গুল মারছে।'

আমি বললাম, 'কতখানি গুল, আর কতখানি সত্য, সেটা আবিষ্কার করতে হবে।'

'তোমার বিশ্বাস হয়? পাথরের আবার অলৌকিক ক্ষমতা থাকে নাকি? ব্যাটা ওইসব বলে পয়সা রোজগার করে। দেখলে না কীভাবে ঠকিয়ে নিল বারো আনা।'

আমি বললাম, 'রাস্তা থেকে পাহাড়ের ওপর দিকে একটা একতলা বাড়ি দেখেছিলাম। দরজা-জানলা খুলে নিয়ে গেছে। চল তো, দেখে আসি।'

বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে এগোলাম। ডাইনে শ্মশান। পাথরের চাঁই সেদিকে নেই। দুবরাজপুরের ফাঁকা প্রান্তর দেখা যাচ্ছে। গোরু-ছাগল চরছে। অতদূরে যাওয়ার দরকার হয় না। তার এদিকেই একটা ভাঙা গম্বুজ ঘর। ছাদ ভেঙে পড়েছে। অনেকগুলো ছোট ছোট সমাধিমন্দির। আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে। চিতা জ্বলছে নাকি? লোকজন তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

রবিন দেখেছিল ধোঁয়ার রেখা। বললে, 'মড়া পুড়ছে।'

আমি বললাম, 'শ্মশানযাত্রী তো কাউকে দেখছি না।'

'ফেলে পালিয়েছে বোধহয়।'

'দিনদুপুরে ভয় কীসের? ধোঁয়া-রহস্য পরে দেখে আসা যাবে। আগে চল সেই একতলা বাড়িটার দিকে।'

দোতলা তেতলা সমান পেল্লায় পেল্লায় পাথরের 'নুড়ি' অর্থাৎ বোল্ডারগুলোর পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেলাম ওপরে। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। দিনের বেলাও কেউ নেই। মাথার উপর সূর্য ঝকঝক করছে। রোদ্দুরে ভূতপ্রেতের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। অথচ মানুষ নেই। অবাক কাণ্ড বটে!

একতলা বাড়িটার সামনে পৌঁছে বাইরে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম না। প্রকৃতই ভগ্নদশা বাড়িটার। বুক সমান উঁচু দাওয়া। সামনে একখানা বড় ঘর। দরজার পাল্লা দুটো চোর মহাশয়রা খুলে নিয়ে গেছে। জানলার কপাটও তাদের দয়ায় উধাও। দু'পাশে দু'খানা ছোট ঘর। বাঁ পাশের ঘরের দরজা-জানলাও উধাও। ভেতরে ধুলো ছাড়া কিছু নেই। ডান পাশের ঘরটার দরজা-জানলা নতুন করে বসানো হয়েছে। জানলা বন্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। নতুন তালা।

রবিনকে দেখিয়ে বললাম, 'কী বুঝলি?'

'এ-ঘরে কেউ থাকে।'

'এই তো বুদ্ধি খুলেছে। গেঁজেল পুরুত কিন্তু বললেন, রাতবিরেতে কেউ থাকে না এ-তল্লাটে। ঘরটা তা হলে কার?'

'গেঁজেলের নয় তো?' রবিন আমার চোখের দিকে তাকায়।

'হতে পারে, নাও হতে পারে।... দেওয়ালের পেন্টিংগুলো দেখেছিস?'

'সাধুদের ছবি। নীল আর লাল রং দিয়ে সাদা চুনকামের ওপর কেউ এঁকে রেখেছে। বৃষ্টির জলে উঠেও গেছে অনেক জায়গায়,' বললাম আমি একদৃষ্টে ছবিগুলো দেখতে দেখতে, 'শুধু সাধুদের ছবিও নয়, বড় বড় পাথরের ছবিও দেখতে পাচ্ছি। এই পাহাড়েশ্বর আর মামা-ভাগনে পাহাড়ের ছবি বলেই তো মনে হচ্ছে। তাই না?'

রবিন বললে, ‘তাই তো মনে হচ্ছে।’

‘আরও একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাচ্ছি ছবির মধ্যে।’

২. উড়ন্ত সাপ

‘কী, মামা?’

‘উড়ন্ত সাপের ছবি।’

‘উড়ন্ত সাপ!’ রবিন কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ‘কিলবিলে কতকগুলো জিনিস যেন পাথরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে বটে, ডানাও রয়েছে। কিন্তু সাপেদের কি ডানা থাকে?’

‘না, থাকে না,’ গাল চুলকে বললাম, ‘সেইজন্যেই তো অবাক লাগছে। অথচ, ছবিগুলো সাপেদেরই ছবি। চ্যাটালো ফণা দেখছিস না? গোখরোর মাথায় খড়মের ছবিশুদ্ধ স্পষ্ট আঁকা রয়েছে।’

রবিন বললে, ‘পাহাড়েশ্বর মানে তো শিবঠাকুর। শিব ঠাকুরের অনুচর তো সাপ।’

‘উড়ন্ত সাপের কথা শিব ঠাকুরের কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই।’

রবিন বিরক্ত হল। ক্লাস নাইনের ছেলে তো। বাংলায় বিজ্ঞান আর কল্পবিজ্ঞান পড়ে। তাই নিজেকে মস্ত পণ্ডিত মনে করে। কিন্তু কোনও জিনিসই খুঁটিয়ে দেখে না। ওই এক ওর দোষ। তলিয়ে ভাবেও না। বললে অস্থির স্বরে, ‘কোনও গাঁইয়ার কারবার হয়তো। ছবি আঁকার বিদ্য ফলিয়ে গেছে।’

‘অথবা গেঁজেল পুরুতের শিল্পকীর্তিও হতে পারে।’ বললাম আমি, ‘ডানাওয়ালা সাপের ছবি এঁকে শিবভক্তদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাইছে।’

রবিনের এত কথা ভাল লাগল না। হাতের ভর দিয়ে বুক সমান উঁচু দাওয়ায় উঠে পড়ে বললে, ‘এসো মামা, দরজার তালাটা পরীক্ষা করি।’

বলে, আমার হাত ধরে টেনে তুলল দাওয়ায়। ওঠবার সময়ে লক্ষ করলাম, দাওয়ায় ধুলো খুব একটা নেই। নিয়মিত ঝাঁটা পড়ে মনে হচ্ছে। ঘরে যে লোকটা তালা ঝুলিয়েছে, তারই কীর্তি নিঃসন্দেহে।

রবিনকে আর তা দেখালাম না। বন্ধ ঘরের সামনে গিয়ে তালাটা পরীক্ষা করলাম। কলকাতার এক বিখ্যাত কোম্পানির তালা। বেশ মজবুত। আটটা লিভার। চোরকে বেশ বেগ পেতে হবে এ তালা ভাঙতে। পুরুত ঠাকুরের যে দৈন্যদশা দেখলাম, এত দামি তালা ঝোলানোর ক্ষমতা তাঁর নেই।

দরজায় শেকল তোলা ছিল। খুলে ফেললাম। ঠেলা মারলাম পাল্লায়। ফাঁক হল অল্প। ইঞ্চিখানেকের মতো। সেই ফাঁক দিয়ে তাকালাম ভেতরে। অন্ধকার ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

রবিন বললে, ‘টর্চটা আনলে ভাল হত, মামা।’

'তা ঠিক। কিন্তু দিনের বেলায় মামা-ভাগনে পাহাড়ে টর্চের দরকার হবে কে জানত বল।'
কথা বলতে বলতে অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করছিলাম। চোখ সয়ে আসছিল একটু একটু করে। বাক্সের মতো কতকগুলো জিনিস দেখলাম। প্যাকিং বাক্স বলেই মনে হল। সাদা কাগজের লেবেল ও চোখে পড়ল। খুব সম্ভব লাল রঙে কী সব ছাপা রয়েছে লেবেলের গায়ে। একটা বড় হরফের লাইন অতিকষ্টে দেখতেও পাচ্ছি বলে মনে হল। লেখাটা এই:

FRAGILE—HANDLE WITH CARE

অর্থাৎ প্যাকিং বাক্সের মধ্যে ভঙ্গুর বস্তু আছে, সাবধানে নাড়াচাড়া করো।

ভঙ্গুর বস্তু! জীর্ণ পরিত্যক্ত মন্দির কোঠায় প্যাকিং বাক্সের মধ্যে ভঙ্গুর জিনিস! কাচের জিনিস নাকি? পলকা জিনিস হলেই এই লেবেল লাগানো থাকে কাঠের বাক্সে, যাতে কুলি আছাড় মেরে ভেঙে না ফেলে। কিন্তু মামা-ভাগনে পাহাড়ের নির্জন এই ঘরে কাচের পল্‌কা জিনিসের কী দরকার? পুরুত ঠাকুরের পেটে পেটে এত বুদ্ধি বুঝতে পারিনি তো!

রবিনও দেখেছিল লেবেলটা। উত্তেজিত গলায় বললে, 'মামা, কী আছে প্যাকিং বাক্সে? কাচের জিনিস?'

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে বললাম, 'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু যেখানে কেউ থাকে না, যে-মন্দিরের দরজা-জানলা পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায় চোর, সেখানে এত দামি তালা ঝুলিয়ে কাচের দামি দামি জিনিস প্যাকিং বাক্সে আমদানি করে এনে রাখা হয়েছে কেন?'

রবিন জবাব দেওয়ার আগেই একটা কাণ্ড ঘটল।

আচমকা পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনলাম পেছনে। পাখি মনে করে ফিরে তাকাইনি। দুই চোখের অবাক চাহনি তখন আটকে রয়েছে ঘরের প্রায়ান্ধকারে। কিন্তু পাখি দেখবার কৌতূহল নিয়ে রবিন ফিরে তাকিয়েছিল পেছন দিকে।

তারস্বরে চিৎকার করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, 'মামা, সাপ!'

চমকে উঠে পেছন ফিরতে গিয়ে পায়ে-পা লেগে ধড়াম করে উলটে পড়লাম সিমেন্টের দাওয়ায়। সাঁই সাঁই করে কী একটা উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। রবিনও আছড়ে পড়েছিল আমার পাশে। পরক্ষণেই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কোথায় সাপ?'

সাপ জিনিসটাকে আমি বড় ভয় পাই। বাঘ দেখলে মুখোমুখি দাঁড়াতে রাজি আছি, সাপের সামনে নয়। সেই সাপ এই ভাঙা মন্দিরে?

রবিন বিহ্বল চোখে ডানদিকে বিরাট পাথরের খাঁজের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওইদিকে উড়ে গেল।'

'উড়ে গেল?'

'হ্যাঁ, মামা, শিবের দিব্যি নিয়ে বলছি, তোমার মাথার ওপর দিয়ে ওইদিকে উড়ে গেল।'

'ননসেন্স! উড়ন্ত সাপের ছবি দেখে চোখের সামনে সাপকে উড়তে দেখেছিস?'

রবিনের চোখের আতঙ্ক আমার ধমকানিতেও একটুও ফিকে হল না। ভয়ে কাঠ হয়ে বললে, 'সত্যি বলছি মামা, বিশ্বাস করো। কালো কুচকুচে একটা সাপ, কিলবিলে ইয়া বড় একটা সাপ, ঝটপট ঝটপট করে তেড়ে এসেছিল আমাদের দিকে। তোমাকে নিয়ে পড়ে না গেলে নির্ঘাত ছোবল মারত।'

রবিনের গালে ছোট্ট একটা চড় মেরে বললাম, 'মাথা ঠান্ডা কর। বুকে হাঁটা সাপকে জলে সাঁতরাতে দেখেছি, উড়তে কখনও দেখিনি। সাপ কখনও ওড়ে না। তুই যা দেখেছিস, তা বাদুড়-টাদুড় হবে।'

ভয়-তরাসে চোখে তবুও রবিন বললে, 'মামা, আমি ভুল দেখিনি। সত্যিই একটা সাপ সাঁই সাঁই করে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে।'

রবিনের চোখের দৃষ্টি দেখে শঙ্কিত হলাম। কথায় বলে, নরাণাং মাতুলক্রমঃ। অর্থাৎ মানুষেরা মামাদের মতোই হয়। আমি লোকটা সাত ফুট লম্বা না হতে পারি, কিন্তু ক্ষীণজীবী বঙ্গসন্তানদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো রীতিমতো বপুর অধিকারী। আমার এই ভাগনেটাও মাত্র চোদ্দো বছর বয়েসে আমার মাথার সমান লম্বা হয়ে গেছে। গায়ে গতরেও বেশ ভারী। খুদে দৈত্য বললেও চলে। ওর বাবা অবশ্য বলে, হাইপার-থাইরয়েডিজ্‌ম। অর্থাৎ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের বেশি বাড়াবাড়ির ফলেই নাকি শরীরটাও বেধড়ক হয়ে উঠেছে। কারণ যাই হোক না কেন, বিরাট বপুর অধিকারী হয়েও ভাগনে মহাশয় যে ভিতুর ডিম, তা জানা ছিল না। মামার মতো নয় মোটেই।

তাই ভুরু কুঁচকে বললাম, 'খুব হয়েছে। তোকে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করতে আসাটাই ভুল হয়েছে। চল, বাড়ি ফিরি।'

ধমক খেয়ে রবিন একেবারে মিইয়ে গেল। মিন মিন করে বললে, 'মামা, আমি মিথ্যে বলছি না।'

'থাম।'

ডানদিকের প্রকাণ্ড পাথরদুটোর খাঁজের দিকে ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে থেকে আপনমনে রবিন বললে, 'তা হলে কি আমি ভুল দেখলাম?'

'হ্যাঁ, ভুলই দেখেছিস। তুই হয়েছিস তোর মায়ের মতো। ছায়া দেখে চমকে উঠিস।'

রবিন মুখ চুন করে দাওয়া থেকে টপ করে নীচে লাফিয়ে পড়ল। আবার ফিরে তাকাল পাথরের খাঁজদুটোর দিকে।

আমার চোখদুটোও ফিরল সেইদিকে। যদি বাদুড় বা অদ্ভুত পাখিটার চেহারা দেখা যায়, সেই আশায় কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। কিন্তু কিছু দেখলাম না।

৩. খাকিরাম বাবা

বুঝলাম, ভীতু ভাগনেকে নিয়ে পাথরে পাথরে ঘোরা আর ঠিক হবে না। পাহাড় পর্বতে সাপ থাকে ঠিকই, উড়ন্ত সাপের কল্পনায় ভাগনে যখন ভয়ে আধমরা হয়েছে, বুকে-হাঁটা সাপ সত্যি সত্যি দেখলে ভয়ে হার্টফেল করতে পারে। ওর বাবার মুখেও শুনেছি, পাছে হার্টফেল করে, এই ভয়ে নাকি ভাগনে আমার দৌড়ঝাঁপ করাও ছেড়ে দিয়েছে। ভীতুরাম বাবাজিকে নিয়ে ঘরের দিকেই ফেরা যাক। অন্য এক সময়ে একলাই আসব এই মামা-ভাগনে পাহাড়ের আতঙ্কের উৎস সন্ধানে।

পাথরের ফাঁক দিয়ে নামতে নামতে দূরে চোখে পড়ল আবার সেই ধোঁয়ার রেখা। একটা তিনতলা সমান 'নুড়ি'-র পাশ দিয়ে ধোঁয়াটা এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে রোদ্দুর ঝকঝকে আকাশের দিকে। যাব নাকি শ্মশান মাড়িয়ে? ভাগনে আবার ভূত দেখে চমকে উঠবে না তো?

রবিন আমার মনের কথা টের পেয়েই যেন বললে, 'চলো মামা, দেখে আসি।'

সন্দিগ্ধ চোখে দেখে নিলাম ভাগনের মুখচ্ছবি। সাপের ভয় খানিকটা কেটেছে মনে হল।

বললাম, 'যাবি?'

'হ্যাঁ, মামা। ধোঁয়াটা মড়া পোড়ার কিনা দেখে আসি।'

'চল্।'

মিনিট দশেক লাগল শ্মশান পেরোতে। নিমতলার শ্মশান যারা দেখেছে, মামা-ভাগনে পাহাড়ের এই শ্মশান তারা আন্দাজ করতে পারবে না। রাশি রাশি মড়া পোড়া ছাই কোথাও নেই। এখানে-সেখানে হাড়ও পড়ে নেই। তাই একটু নিরাশ হলাম। তবুও গা ছমছম করতে লাগল কেন বুঝলাম না। বিশেষ করে ছোট ছোট সমাধিমন্দিরগুলোর আশপাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে বারবার মনে হল, আমি যেন নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করেছি। এখানে যারা থাকে, তারা বায়বীয় শরীর নিয়ে থাকে, নিরেট কায়ার সান্নিধ্য তারা যেন পছন্দ করে না। এখানে নরকঙ্কাল নেই, নরকরোটি নেই, কিন্তু বাতাসে ভাসছে যেন কায়াহীনেরা, অদৃশ্য দৃষ্টি মেলে কটমট করে তারা যেন প্রত্যক্ষ করছে আমাদের অবাধ আচরণ।

বুঝি, এসবই সংস্কারের ফল। আমরা শিক্ষিত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা যতই পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করি না কেন, বাপ-পিতামহের সংস্কার রক্তে মিশে রয়েছে বলে শ্মশানে গোরস্থানে গেলেই অকারণে ভয় পাই। অশরীরীদের অস্তিত্ব অনুভব করি। মন থেকে তাই গা-ছমছমানি ভাবটা ঝেড়ে ফেলে বিরাট নুড়ি পাথরটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম ভীতুরাম ভাগনেকে টানতে টানতে।

পাথরের ওদিকেই আগুন জ্বলছে নিশ্চয়, ধোঁয়া উঠছে সেই কারণে। পাথরটাকে তাই বেড় দিয়ে এসে দাঁড়ালাম সেখানে।

এবং দেখলাম এক সাধুবাবাকে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে।

তাকে সাধু বলব না দরবেশ বলব, সেটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পরেও পরিষ্কার হল না। লোকটার মাথায় সাদা চুলের জটা। কাদা আর ময়লার দৌলতে অতীব নোংরা। দড়ির মতো পাক খেয়ে খেয়ে গা-ঘিনঘিনে সেই চুলের জটা পিঠ আর ঘাড় বেয়ে নীচে নেমেছে। গালেও সাদা দাড়ি লম্বা হয়ে নেমে এসেছে বুকের ওপর। পরনে তান্ত্রিক ঢঙে লাল কাপড়, গায়ে লাল চাদর। মাথায় কিন্তু কালো টুপি— দরবেশদের মতো। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। আরও রকমারি জড়িবুটির কণ্ঠহার। হরেক রঙের পাথরের তাগাও বাঁধা রয়েছে কবজিতে। মাটির ওপর গাঁথা একটা চিমটে। চিমটের পাশে একটা বাঁশের লাঠি। তার পাশে একটা মড়ার মাথার খুলি। খুলির মধ্যে খানিকটা তরল পদার্থ।

সাধুবাবা অথবা দরবেশ মহাশয় নিবিষ্ট মনে গাঁজা টিপছিল। হাতের তেলোয় খানিকটা গাঁজায় খুলির মধ্যে থেকে তরল পদার্থের ফোঁটা ফোঁটা দিয়ে, তাতে শালপাতার ছাই আর বিড়ির তামাক মিশিয়ে একমনে গাঁজা টিপে চলেছে। সামনেই পুড়ছে একরাশ শালপাতা, রয়েছে ভাঙাবিড়ির তামাক, আর ছোট কলকে, মানে, গাঁজার কলকে।

আমাদের দেখেই মুখ ফেরাল সাধুবাবা। দেখলাম আরও একটা অবাক-করা দৃশ্য।

সাধুর চোখে কালো চশমা!

কুচকুচে কালো চশমার মধ্যে দিয়ে ভয়ংকরদর্শন সেই সাধু চেয়ে রইল আমাদের দিকে। গাঁজা টেপা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হল, কালো কাচের মধ্যে দিয়ে যেন একজোড়া দূরবিন-চক্ষু আমার মনের ভেতর পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখে নিচ্ছে। কোনও কথা নয়, শুধু চেয়ে থাকা। সামনে সেই মড়ার খুলি, ধুনির ধোঁয়া, অদূরে শ্মশান, এরই মাঝে নিঃশব্দ চাহনি আমার মতো ডাকাবুকো মানুষও সহ্য করতে পারল না। নীরবে ভৎর্সনা-মেশানো চাহনি মেলে আশ্চর্য সাধু যেন টেলিপ্যাথি দিয়ে বললে, বৎস দীননাথ, এখানে কেন? পালাও! পালাও! পালাও!

তাই পালিয়েই এলাম। ভীতুরাম ভাগনের হাত ধরে ভীতু সম্রাটের মতনই পলায়ন করলাম।

জিপে ফিরে এলে বললে ড্রাইভার নজরুল, 'খাকিরাম বাবার দর্শন পেলেন?'

৪. সাপের বিষ

খাকিরাম বাবা! জিপের সামনের সিটে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম, 'সে আবার কে?'

নজরুল চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করে দিয়ে বললে, 'আপনি নাম শোনেননি?' অজ্ঞতা স্বীকার করলাম।

নজরুল বললে, 'তবে কি শুধু পাহাড়ই দেখে এলেন?'

ঢোক গিলে বললাম, 'অদ্ভুত একটা সাধুর দেখা পেয়েছি শ্মশানে—'

মুখের কথা কেড়ে নিল নজরুল, 'মাথায় জটার ওপর কালো টুপি, গায়ে লাল কাপড় কাপালিকদের মতো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ওই হলেন খাকিরাম বাবা।'

আমি চেয়ে রইলাম। নজরুল ততক্ষণে উঁচুনিচু পাথরের ওপর দিয়ে গাড়িটাকে তুরুকনাচ নাচিয়ে রাস্তায় নামিয়ে এনেছে। একগজ লম্বা কাঠের খুঁটির ওপর সাদা রঙের 'পাহাড়েশ্বর' লেখা ফলকটার পাশ দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। পিচের রাস্তায় নেমে স্পিড না তোলা পর্যন্ত ও চুপ করে রইল।

তারপর বললে, 'খাকিরাম বাবা অলৌকিক ক্ষমতা রাখেন। পাথরচাপড়ির মুসলমান ফকির দাতাসাহেব যেমন ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধা

পেয়েছেন, খাকিরাম বাবাও তেমনি হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধার পাত্র। ওঁর দর্শন পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।'

চোখের সামনে ভেসে উঠল খাকিরাম বাবার অদ্ভুত চেহারা। কালো চশমার মধ্যে দিয়ে তাঁর অনিমেষে তাকিয়ে থাকার সেই দৃশ্যটা মনে পড়তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বললাম, 'কী ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা উনি ধরেন?'

নজরুল বললে, 'জানেন তো পাহাড়ি জায়গায় সাপখোপ থাকে। মামা-ভাগনে পাহাড়েও আছে। উনি কিন্তু সাপেদের বশ মানিয়েছেন। সাপেরা ওঁকে যমের মতো ভয় পায়। ওঁর ডাক শুনে কাছে আসে, আবার ধমক খেয়ে দূরে পালায়।'

'তুমি দেখেছ?'

'আমি শুনেছি। এ তল্লাটের সবাই অনেক অদ্ভুত খবর রাখে। একবার একজন সাপুড়ে সাপ ধরতে এসেছিল মামা-ভাগনে পাহাড়ে। পাথরের আনাচে কানাচে ঘুরছিল সাপের সন্ধানে। খাকিরাম বাবা বারণ করেছিলেন, সে শোনেনি। তারপরেই একটা সাপ ছোবল মারে সাপুড়েকে। সাপুড়ে আছড়ে পড়ে বাবার সামনে। প্রাণভিক্ষা চায়। বাবা কী করলেন জানেন?'

'কী?'

'ডাক দিলেন সাপটাকে। সুড়সুড় করে সাপ এল তাঁর সামনে। বাবা তার মুখটা নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে চোঁ চোঁ করে সব বিষ টেনে নিয়ে সাপুড়ের ব্রহ্মতালুতে থু থু করে থুথু ছিটিয়ে দিলেন। বললেন, যা, বিষ দিয়ে বিষ নামিয়ে দিলাম। আর কখনও আসিসনি। সাপটাকে বললেন, পালা, আর একে কামড়াসনি। সাপ ঢুকে গেল গর্তে, বিষ নেমে গেল সাপুড়ের গা থেকে।'

আমার অবিশ্বাসী মন সঙ্গে সঙ্গে উঠল চেঁচিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'গল্পটা কে বলল? সাপুড়ে?'

'হ্যাঁ। দুবরাজপুরে গিয়ে চা খেতে খেতে বলেছিল সবাইকে।'

'এখন তার দেখা পাওয়া যাবে?'

'সে কি আর এ তল্লাটে আছে? সেইদিনই পালিয়েছে।'

'আর কী কী শক্তি আছে খাকিরাম বাবার?'

'উনি ইচ্ছে করলে দু-তিনতলা উঁচু পাথরকে শূন্যে তুলতে পারেন।'

'অসম্ভব।'

নজরুল হাসল, 'বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সব সত্যি। জটালি বাবা পর্যন্ত এ তল্লাটে আর মাড়ান না। স্বচক্ষে সেই কাণ্ড দেখবার পর থেকে।'

'জটালি বাবা আবার কে?'

'আর এক সাধু। বক্রেশ্বরে দুধকুণ্ডের ধারে থাকতেন একটা ভাঙা শিবমন্দিরে। শিবমন্দির বলে চেনাই যায় না, বটের ঝুরিতে একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে। খাকিরাম বাবার নাম শুনে এসেছিলেন দেখা করতে। দু'জনের মধ্যে বাণ মারামারি হয়। জটালি বাবা বরুণ বাণ মেরে মামা-ভাগনে পাহাড়ের ঠিক ওপরে মেঘ জমিয়ে বৃষ্টি ঝরিয়েছিলেন। খাকিরাম বাবা তখন

তাঁর লঘিমা সিদ্ধাইয়ের খেলা দেখান। বিরাট পাহাড়ের শিবলিঙ্গকে মন্ত্রের জোরে শূন্যে তুলে জটালি বাবার ঠিক মাথার ওপর নিয়ে আসেন। চিঁড়েচ্যাপটা হতে চলেছেন দেখে চোঁ চোঁ পালিয়ে যান জটালি বাবা, বক্রেশ্বরেও আর নেই এখন। শুনেছি, ফের হিমালয়ের উত্তরকাশীতে গিয়ে আবার সাধনায় বসেছেন।'

শুনতে মন্দ লাগছিল না। আমার ভাগনেটি তো চোখ বড় বড় করে হাঁ করে গিলছিল প্রতিটি কথা।

আমি বললাম, 'তোমরা কোনওদিন দেখেছ পাথরকে শূন্যে ভাসতে?'

নজরুল বলল, 'গভীর রাতে ওখানে অনেকরকম অদ্ভুত আলো দেখা যায়। আওয়াজ শোনা যায়। তখন গেলে হয়তো দেখা যায় খাকিরাম বাবার মহিমা। কিন্তু ভয়ে কেউ যায় না। প্রেতসিদ্ধ পুরুষ তো, ঘাঁটিয়ে লাভ কি। উনি চান না ওঁর সাধনার জায়গায় কেউ আসুক। তা ছাড়া—' নজরুল থেমে গেল।

আমি বললাম, 'থামলে কেন? তা ছাড়া কী?'

'ওর সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গোরা যেভাবে মামা-ভাগনে পাহাড় আগলে রেখেছে, দিনের বেলাতেই গা-ছমছম করে। রাতের বেলায় তো কথাই নেই।'

'ভূত-প্রেত?' বলে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে তুললাম বাঁকা ঠোঁটে।

নজরুল উইন্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার স্পিডে ড্রাইভ করতে করতে যেন আপন মনেই বলল, 'ভূত-প্রেত তো অনেকেই দেখেছে, তেনাদের হাওয়ার শরীর। খুব-একটা ক্ষতি করেন না খুব বাড়াবাড়ি না করলে। কিন্তু ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের শরীর তো হাওয়ায় তৈরি নয়।'

'তবে কী দিয়ে তৈরি?' হেঁয়ালি শুনে মেজাজটা খিঁচড়ে গেছিল বলে কণ্ঠস্বরেও ঝাঁঝ ফুটে উঠেছিল নিশ্চয়।

নজরুল তাই স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বললে কি বিশ্বাস করবেন? ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গো হল এ-অঞ্চলের সাপেরা। তাও মাটিতে হাঁটা সাপ নয়, উড়ন্ত সাপ। উনি সাপেদের ওড়বার ক্ষমতা দিয়েছেন। ওঁর হুকুমে গর্তের সাপ শূন্যে ওড়ে, রাতবিরেতে কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে থাকলেও উড়তে-উড়তে তাকে দেখতে পায়। তাই—'

ভাগনে বললে রুদ্ধশ্বাসে, 'মামা, তোমায় বললাম না, একটা সাপ সাঁই সাঁই করে উড়ে এল আমাদের দিকে?'

'তুই থাম।'

নজরুল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রবিনের দিকে, 'তুমি দেখেছ?'

রবিন দম-আটকানো গলায় বললে, 'মামা আর আমি পড়ে না গেলে নির্ঘাত ছোবল খেতাম।'

নজরুল খুব একটা অবাক বা উত্তেজিত হল না। শুধু বললে, 'ছোবল খেলেও খাকিরাম বাবাই আবার বিষ নামিয়ে দিতেন। কিন্তু কি দরকার তাঁর সাধনায় বাগড়া দেওয়ার।'

আমি কটমট করে ভীতু ভাগনের দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, আজ রাতে কী করে আসা যায় খাকিরাম বাবার শ্মশানে।

৫. অসম্ভব সম্ভাবনা

ভয়ডর আমার চিরকালই কম। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এই কারণেই অনেক অভিযানে সঙ্গে নিতেন আমাকে, আবার বাদ দিতেন অনেক অ্যাডভেঞ্চারে, বাড়াবাড়ি করে ফেলি বলে। রাশ টেনে সামাল দিতে পারতেন না, পাছে বেঘোরে মরি অথবা তাঁকে বিপদে ফেলি, এই ভয়ে আমাকে না জানিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে ফিরতেন আস্তানায়।

মামা-ভাগনে পাহাড়ের গালগল্প শুনে আসার পর থেকে প্রফেসরের কথাই মনে হতে লাগল খুব বেশি। ভদ্রলোকের ব্রেনটি, বলতে নেই, বিলক্ষণ সরেস। উদ্ভট সমস্যার এমনও আশ্চর্য সমাধান করে দেন যে তাক লেগে যেতে হয়।

এ হেন প্রফেসরকে তাই বড় বেশি মনে পড়ল পাহাড়েশ্বরের উড়ন্ত সাপের গালগল্প শুনে আসার পর। বোকচন্দর ভাগনেটিও নাকি দেখেছে উড়ন্ত সাপকে। মুণ্ডু দেখেছে! নজরুল আর এককাঠি ওপরে যায়। রাতবিরেতে পাথর উড়িয়ে দেওয়ার গল্পও শোনা গেল তার মুখে। সেইসঙ্গে খাকিরাম বাবার খাঁটি গঞ্জিকা কাহিনি। বিষধর সাপের বিষ চুষে নিয়ে বিষ নামিয়ে দিতে পারেন ছোবল-খাওয়া মানুষের গা থেকে। সাপে তাঁর কথা শোনে, দলে দলে মামা-ভাগনে পাহাড় পাহারা দেয়। যত্ত সব আকাট মুখ্যু-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইডিয়টের দল!

মনে মনে তাই হাজার ফন্দি আঁটতে আঁটতে ফিরলাম সিউড়িতে। ভগ্নিপতি সবে অফিস থেকে ফিরে কফি পান করতে বসেছে। আমিও বসে গেলাম। শরীর-মন একটু চাঙ্গা করে নিয়ে বললাম, 'মামা-ভাগনে পাহাড় দেখেছ?'

ভগ্নিপতি নরেশ বললে, 'কেন দেখব না, আমার কাজই যে ওই অঞ্চলে।'

'পাহাড়টা সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি শুনছি; এসব কি সত্যি?'

নরেশ কম কথা বলে। যেটুকু বলে, ভেবেচিন্তে বলে। আমার কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে বললে, 'এক কাজ করো। জিপ রেডি আছে। লালুবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসবে চলো।'

'লালুবাবু কে?'

'এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন যাঁরা, তাঁদের বংশধর। শিক্ষিত— এমএসসি-তে গোল্ড মেডেল পেয়েছেন ফিজিক্সে। কিছুদিন সরকারি কাজ করেছিলেন। চাকরি আর গবেষণা একসঙ্গে চলছিল না বলে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। এখন স্টুডিয়োতে বসেন।'

'স্টুডিয়ো? কীসের?'

'ফোটোগ্রাফির। ওটা ওঁর শখ। নেশা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা।'

'কিন্তু আমি গিয়ে কী করব?'

'তোমার কথা উনি শুনেছেন আমার কাছে। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের জীবনীকারকে কে না দেখতে চায় বলো?'

শুনে বেশ গর্ববোধ করলাম। প্রফেসরের নামডাকের কৃপায় আমারও নামডাক তা হলে ছড়িয়ে পড়েছে।

বললাম, 'কিন্তু মামা-ভাগনে পাহাড়ের কিংবদন্তি সম্বন্ধে উনি কি বলবেন?'

'উনি স্থানীয় লোক। সব খবর রাখেন। কিছু কিছু আমিও শুনেছি। কিন্তু তোমাকে শোনাতে চাই ওঁর মুখে। চলোই না, ভাল লাগবে আলাপ করে।'

নরেশের পীড়াপীড়িতে আর 'না' করলাম না। সিউড়ি কোর্টের কাছেই লালুবাবুর বিরাট বাড়ি। জমিদারি ছাপ বাড়ির গেট থেকেই শুরু হয়েছে। বাইরে থেকে সাদামাঠা চুনকাম-করা দোতলা বাড়ি বলে মনে হয়। কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যায়, মহলের পর মহল। এক-একটা বারান্দাই কলকাতার চিৎপুর রোডের মতো চওড়া। মাঝে মাঝে উঠোন। আবার একটা মহল।

আমরা বসলাম বাইরের মহলে।

এইখানেই লালুবাবুর শখের স্টুডিয়ো। মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে উনি একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন। আমাদের দেখে বই মুড়ে রেখে সোফায় এসে বসলেন আমাদের পাশে। এটা-সেটা কথার পর আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, মামা-ভাগনে পাহাড় সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে পারেন?'

লালুবাবুর বয়স বেশি নয়। শ্যামবর্ণ। বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ। টেনে আঁচড়ানো চুল। উত্তেজিত হলেই আর বসে থাকেন না। ঘরময় পায়চারি করতে করতে কথা বলেন অনেকটা বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে।

বললেন, 'পাহাড়েশ্বর বড় জাগ্রত জায়গা। এইটুকু বললেই হত অন্যের কাছে। কিন্তু আপনি প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সঙ্গে থেকে অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখেছেন। তাই আপনাকে এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে না। আরও কিছু বেশি বলার দরকার। কিন্তু আপনি কি তা বিশ্বাস করবেন?'

'আগে বলুন।'

'দীননাথবাবু, দুবরাজপুরে তো ঘুরে এলেন, এত গ্র্যানাইট পাথর এক জায়গায় এত বেশি পড়ে থাকতে দেখে মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি?'

'জেগেছে বলেই তো আপনার কাছে এলাম।'

'প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছিল। ওখানকার অনেক লোককে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। কেউ কিন্তু সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। মানে, যে-উত্তর শুনলে মন শান্ত হয়, সেরকম উত্তর কারওর মুখে শুনিনি। যত উত্তর শুনেছিলাম, তার মধ্যে একটা গল্প বেশ চিত্তাকর্ষক। রামের সেতুবন্ধ করার গল্প নিশ্চয় রামায়ণে পড়েছেন। বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করার জন্যে কুমারিকা থেকে লঙ্কা পর্যন্ত পাথর ফেলে সেতু নির্মাণ করেছিলেন রামচন্দ্র। এই পাথর নাকি তিনি হিমালয় থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেছিলেন পুষ্পক রথে চাপিয়ে। দুবরাজপুরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে কোনও কারণে রথের ঘোড়া ভড়কে যায়। আকাশ থেকে দুমদাম করে বেশ কিছু পাথর খসে পড়ে মামা-ভাগনে অঞ্চলে।'

আমি তো অবাক, 'বলেন কী?'

'আমি বলি না,' বললেন লালুবাবু, 'অনেক পুথিপত্তর ঘেঁটে আশ্চর্য এই কিংবদন্তি আমি উদ্ধার করেছি। কাহিনি হিসেবে একেবারেই অলীক সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও সাধারণ

মানুষের কাছে বিলক্ষণ বিশ্বাসযোগ্য, বিশেষ করে ধারেকাছে এককণা গ্র্যানাইটও যখন পাওয়া যায় না, তখন ওই একটা জায়গায় স্তূপাকার গ্র্যানাইট পাথর দেখলে অতিবড় অবিশ্বাসীকেও অবিশ্বাস্য এই কাহিনি বিশ্বাস করতে হয়।'

'আপনি করেন?'

সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাকে একটা অফার করে নিজে একটা ধরালেন লালুবাবু। তারপর বললেন, 'আমি এই কাহিনির পেছনে অন্য একটা অসম্ভব সম্ভাবনার কথা কল্পনা করি।'

'যথা?'

'অন্য কেউ হলে এ-সম্ভাবনার কথা বলতে যেতাম না। কিন্তু আপনি প্রফেসরের কাছের লোক। আপনার লেখা গল্পগুলোও এমনি অনেক অসম্ভব কাহিনি নিয়ে লেখা। তাই আপনাকে বলতে একটুও সংকোচ করব না। দীননাথবাবু, আপনি ফ্লাইং সসার্স বিশ্বাস করেন?'

৬. পৃথিবীর শক্তি

শুধু বক্তৃতা নয়, নাটকটাও ভাল জানেন লালুবাবু। এমন নাটকীয়ভাবে প্রশ্নটা ছুড়ে মারলেন আমার দিকে যে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলাম না। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম ওঁর সকৌতুক বুদ্ধি-উজ্জ্বল চাহনিযুগলের দিকে।

বললাম তারপরে, 'পৃথিবীর অনেক বৈজ্ঞানিক মনে মনে প্রচণ্ড অবিশ্বাস নিয়েও উড়ন চাকি সম্পর্কে গবেষণা করে যাচ্ছেন। পৃথিবীর নানান আকাশে এদের দেখা যাচ্ছে। এই সেদিন কলকাতার খুব কাছেই একটা স্কুলবাড়ির টিনের চালা পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেছে উড়ন চাকি, কাগজে ছবিও বেরিয়েছিল। কাজেই অবিশ্বাস আর করি কী করে বলুন।'

লালুবাবু আমার খোলাখুলি কথায় খুশি হলেন। সিগারেটে ঘন ঘন টান মারতে মারতে বললেন, 'তা হলে বিশ্বাস করেন। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে, অনেক বছর আগে উড়ন চাকি থেকে পাথরগুলো ঠিকরে পড়েছে মামা-ভাগনে অঞ্চলে?'

নরেশ হেসে বলল, 'লালুবাবু এবার কিন্তু সায়েন্স ফিকশন আরম্ভ করে দিলেন।'

আমি বললাম, 'তুমি থামো। তোমাদের এই এক দোষ। যা জানো না, তাকেই উদ্ভট আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে চাও। সায়েন্স ফিকশনের শেষের ফিকশনটুকু বাদ দিলে প্রথমদিকের বিজ্ঞানটুকু কিন্তু থেকে যাচ্ছে। আকাশ থেকে গ্র্যানাইট খসে পড়ার মধ্যে ফ্লাইং সসার্সদের হাত থাকলেও ধরে নিতে হবে সায়েন্স এখানেও বর্তমান।'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু,' বলে হাসতে লাগল নরেশ।

লালুবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে কথাটা ঘুরিয়ে দিলাম। বললাম, 'আজ মামা-ভাগনে পাহাড় দেখতে গিয়ে আরও অনেক গালগল্প শুনে এসেছি। এগুলো সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই।'

‘কী শুনতে চান বলুন,’ লালুবাবু এবার বেশ গম্ভীর।

‘ওখানে এক সাধুবাবার দর্শন পেলাম।’

‘খাকিরাম বাবা?’ তীক্ষ্ণ শোনাল লালুবাবুর কণ্ঠস্বর।

‘হ্যাঁ। তিনি নাকি সাপের মুখ নিজের মুখে পুরে বিষ চুষে খান। মানে, নীলকণ্ঠ। স্বয়ং শিব। সত্যি?’

‘আমিও তাই শুনেছি। আর কী শুনেছেন?’

‘তিনি নাকি সাপেদের সঙ্গে কথা বলেন। সাপেরা তাঁর কথামতো চলে। পাহাড় পাহারা দেয়।’

‘তাও শুনেছি। আর কী শুনেছেন?’ লালুবাবুর কণ্ঠস্বর আরও তীক্ষ্ণ।

‘উড়ন্ত সাপ নাকি পাহারা দেয় মামা-ভাগনে পাহাড়কে।’

‘আপনি দেখেছেন?’

‘না। শুনেছি,’ ভীতু ভাগনে যে দেখেছে, তা তার বাবার সামনে বললাম না।

লালুবাবু বললেন, ‘আমিও শুনেছি। কখনও দেখিনি।’

‘দেখবার ইচ্ছে আছে?’

‘লালুবাবু আবার একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন খুব শান্ত গলায়, ‘তা আছে বইকী।’

‘প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যেতে পারবেন?’

পাল্টা প্রশ্ন করলেন লালুবাবু, ‘আপনি যেতে পারবেন?’

মনের কথাটা এতক্ষণে ব্যক্ত করলাম, ‘সেই কথাই তো ভাবছি বিকেল থেকে।’

লালুবাবু এসে ধপ করে বসে পড়লেন আমার সামনে কার্পেটের ওপর।

বললেন, ‘কখন যাবেন?’

‘আজ রাতে।’

‘আজ রাতে! আজ তো পূর্ণিমা!’

‘তাতে কী হয়েছে?

‘পূর্ণিমার দিন... মানে কি জানেন, অমাবস্যার দিনই যত ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটে বলেই জানি, কিন্তু মামা-ভাগনে পাহাড়ের কাছে পূর্ণিমা রাতে যাওয়া বারণ।’

‘কারণ?’

‘কারণ,’ বলে, নরেশের দিকে ফিরলেন লালুবাবু, ‘আপনি এখন কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকতে পারেন। দীননাথবাবু, মামা-ভাগনে পাহাড়ের পাথরগুলোর সাইজ দেখেছেন তো?’

‘দেখেছি! পঞ্চাশ-ষাট পর্যন্ত উঁচু এক-একটা পাথর।’

‘পূর্ণিমার রাতে নাকি এইসব পাথরকেই মাঝে মাঝে ভাসতে দেখা যায় শূন্যে।’

হো হো করে হেসে উঠল নরেশ। বিরক্ত চোখে লালুবাবু বললেন, ‘বললাম না কানে আঙুল দিতে?’

হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গিয়েছিল নরেশের। বললে, ‘এটারও একটা বৈজ্ঞানিক,

সরি, কল্পবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও করেছি বটে,' বীরভূমি টানে ব্যঙ্গের সুরে বললেন লালুবাবু।

'শুনতে পারি আমি?' নরেশ তখন হাসির দমকে বেরিয়ে-আসা চোখের জল মুছছে।

'চাইনিজ সায়েন্স ফেং-শুইয়ের এর নাম শুনেছেন?'

'কী সুঁই?'

'সুঁই না, শুই। শু আর ই। ফেং-শুই। ইংরেজি বানান feng-shui; যার মানে, 'বাতাস আর জলের বিজ্ঞান,' অথবা 'জিওম্যানসি'।'

'কীসের বিজ্ঞান প্রাঞ্জল করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য আছে, এই ধর্মবিশ্বাস বা দার্শনিক বিশ্বাস নিয়ে গড়ে উঠেছে ফেং-শুই বিজ্ঞান। ফেং-শুই বিশ্বাসীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, প্রকৃতি একটা সজীব সত্তা, মানুষ যদি নিজেকে সুখী করতে চায়, তা হলে এই সজীব সত্তার সঙ্গে ঐক্য বজায় রেখে চলবে। ফেং-শুই তত্ত্ব অনুসারে, পৃথিবীপৃষ্ঠ একটা দর্পণ ছাড়া কিছুই নয়, মহাশূন্যের গ্রহনক্ষত্রের শক্তিকে প্রতিফলিত করছে। পৃথিবী যেন একটা জীবন্ত প্রাণী। পৃথিবীপৃষ্ঠ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে শক্তির নানান রেখা। একটা শক্তি নেগেটিভ, আর একটা পজিটিভ। নেগেটিভ শক্তিপ্রবাহের নাম ইন্, পজিটিভ শক্তিপ্রবাহের নাম ইয়ান্। এই শক্তি আর অদৃশ্যপ্রবাহ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় কমে-বাড়ে আকাশের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে। নরেশবাবু, অকাল্ট সায়ান্স নিয়ে যাঁরা ইদানীং গবেষণা করছেন, তাঁরা এই শক্তিরেখাদের নাম দিয়েছেন আর্থ ফোর্স, পৃথ্বীশক্তি। পৃথিবীপৃষ্ঠ ম্যাগনেটিক ফোর্সে সমাচ্ছন্ন, জোয়ার-ভাঁটার মতো তা উঠছে আর নামছে, বিশেষ করে চাঁদের ওঠানামা আর অমাবস্যা-পূর্ণিমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে।'

ঝড়ের মতো একটানা বক্তৃতা দিয়ে থামলেন লালবাবু। আমি হাঁ করে শুনে গেলাম ভদ্রলোকের পাণ্ডিত্য। চোখেমুখে বৈদগ্ধ্যের ঝলক দেখে বেশ বুঝলাম, উনি যা বললেন, তা ছিটেফোঁটা মাত্র, জানেন তার চাইতেও বেশি। মুখ খোলেন না কারও সামনে, উপহাসের পাত্র হতে চান না বলে; এখন খোঁচা খেয়ে কিছু বলে ফেলেছেন।

নরেশ অপ্রস্তুত হয়ে কাষ্ঠহাসি হাসছে দেখে আমি নরম সুরে বললাম, 'কিন্তু এই যে, ফোর্স...... আর্থ ফোর্স বললেন না?'

'হ্যাঁ, আর্থ ফোর্স, সেটা শুধু ম্যাগনেটিক নয়, তার সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল ব্যাপারও আছে বলে আমার বিশ্বাস। এ ফোর্স মানুষের মনের আর দেহের ওপরেও কাজ করে। কারণ, মানুষ এই পৃথিবীরই সন্তান, মাটিতেই মিশে যায় শেষপর্যন্ত আকুপাংচারের থিয়োরিও তো এই বিশ্বাসের ওপর, ইন্ আর ইয়ান্। এই শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকলেই শরীর সুস্থ, ভারসাম্য নষ্ট হলেই শরীর অসুস্থ।'

দেখলাম, লালুবাবু খুব রেগেছেন। রাগের মাথায় বক্তব্যবিষয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তাই হেসে বললাম, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু মামা-ভাগনে পাহাড়ের পাথর ভেসে ওঠার সঙ্গে আর্থ ফোর্সের কী সম্পর্ক, সেটা বলবেন তো?'

'দীননাথবাবু,' ঝুঁকে পড়ে বললেন লালুবাবু, 'আজ পূর্ণিমা। লক্ষ করেছি, এই পূর্ণিমাতেই যতকিছু অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে থাকে ওখানে। পাথর ভেসে ওঠে, অদ্ভুত আওয়াজ শোনা

যায়, আলো দেখা যায়। কে জানে, চাঁদের পজিশনের সঙ্গে বিশেষ অবস্থানে গ্রহনক্ষত্রেরা থাকার ফলে ঠিক ওই জায়গার আর্থ ফোর্স তুঙ্গে পৌঁছয় কিনা, অলৌকিক বলে যাকে সবাই ভয় পাচ্ছে, আসলে হয়তো এইটাই লৌকিক ব্যাখ্যা।'

ভুরু কুঁচকে বললাম, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আর্থ ফোর্সের দাপটে পাথর শূন্যে ভেসে ওঠে?'

'হ্যাঁ, সেইসঙ্গে আরও একটা কথা বলতে চাইছি।'

'কী?'

'খাকিরামবাবা পাহাড়েশ্বরে আস্তানা গেড়েছেন মাস ছয়েক। এই মাস ছয়েক ধরেই প্রতি পূর্ণিমাতে এই অলৌকিক কাণ্ড ঘটছে পাহাড়েশ্বরে।'

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম লালুবাবুর দিকে। লোকটা এত চিন্তা করেন? এত তলিয়ে ভাবেন? চোখকান এত খোলা রাখেন?

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনলাম রাস্তার দিকের দরজার সামনে। তারপরেই কে যেন খড়মড় শব্দে নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

দৌড়ে গেলাম দরজার সামনে। রাত হয়েছে। রাস্তা ফাঁকা। কিন্তু মনে হল, একটা ছায়ামূর্তি যেন কোর্টের সামনে রেলিং-দেওয়া পার্কের ওপারে বেগে উধাও হয়ে গেল ঘোড়ানিম গাছের তলায়।

৭. পূর্ণিমার পাহাড়েশ্বর

আমি রাস্তায় ছায়ামূর্তির দিকে ছুটে যেতে যাচ্ছি, পিছন থেকে হাত চেপে ধরলেন লালুবাবু। উনি আমার পিছন পিছন এসেছিলেন আওয়াজ শুনে।

বললেন, 'যেতে দিন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু লোকটা নিশ্চয় ঘাপটি মেরে আমাদের কথা শুনছিল।'

'চোরছ্যাঁচোড় হতে পারে। বড় ছিনতাই হচ্ছে আজকাল। নাই-বা বেরোলেন।'

'দু'-চারজনকে ঘায়েল করার মতো কায়দা দীননাথের জানা আছে, লালুবাবু।'

'জানি। কিন্তু খামোকা—'

'একমত হতে পারলাম না আপনার সঙ্গে। আমার জীবনটাই অ্যাডভেঞ্চারে ভরা। গন্ধে গন্ধে ঠিক টের পাই। তাই তো আওয়াজ শুনেই দৌড়ে এলাম।'

লালুবাবু কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'কী অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ বলুন তো?'

'লালুবাবু, কেউ আমাদের কথা শুনছিল। সে কে, আমার জানা দরকার। আমার মনে হয় না, লোকটা সামান্য ছিঁচকে চোর।'

হেসে ফেললেন লালুবাবু। বললেন, 'আপনার জন্ম কি এই বীরভূমে? আপনাদের আদিপুরুষ কি এই বীরভূমের মানুষ?'

'কেন বলুন তো?'

'আপনার বীর মনোভাব দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

'বীর মনোভাবের সঙ্গে বীরভূমের কি সম্পর্ক?'

'তাই বলুন। গল্পটা তা হলে জানেন না।'

'কীসের গল্প?'

'বীরভূমের নাম বীরভূম হল কী করে, সেই গল্প। বসুন, বসুন, ওই দেখুন চা এসে গেছে। চা খেতে খেতে গল্পটা শুনুন, তারপর বীরভূমের এই বীরপুঙ্গবটিও আপনাকে সঙ্গদান করবে'খন।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, 'গল্পটা তা হলে বলে নিন।'

'বলবই তো। আপনি লেখক মানুষ, এসব আপনার জানা দরকার। বিষ্ণুপুরের এক রাজা নাকি তাঁর শিক্ষিত বাজপাখিকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন শিকার করতে। শিকার করতে করতে এসে পড়েন এই অঞ্চলে। কিছু দূরে একটা বক দেখতে পেয়ে তিনি বাজপাখি লেলিয়ে দিলেন বকের দিকে। বকটা কিন্তু চম্পট দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করল না। তেড়ে গেল বাজপাখির দিকেই। অবাক কাণ্ড তো! আরও অবাক কাণ্ড ঘটল রাজার চোখের সামনে। যুদ্ধে হেরে গেল বাজপাখি, পালিয়ে এল রাজার কাছে। আগের মতো খাবার খোঁজায় ব্যস্ত হল বকটা। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা। বাজপাখি খুব সহজেই বক শিকার করে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে উলটো ব্যাপারটা ঘটল কেন? ভাবলেন, যে দেশের পাখি এত সাহসী, নিশ্চয় সেদেশের মানুষ-ও অত্যন্ত বীর আর বেপরোয়া হবে। তাই তিনি এ অঞ্চলের নাম রাখলেন বীরভূমি বা বীরভূম।'

'মন্দ গল্প নয়,' বললাম আমি, 'বীরভূমের পুরুষরা তাই যেন একটু বেশি লম্বা মনে হয়, মেয়েরাও।'

'ঠিকই লক্ষ করেছেন। আমার হাইট তো দেখছেনই, ছ' ফুট দু' ইঞ্চি। আমার স্ত্রী সাড়ে পাঁচ ফুট।'

এমন সময়ে আর এককাপ চা নিয়ে আড্ডায় এসে বসলেন লালুবাবুর স্ত্রী। ভদ্রমহিলা বাস্তবিকই মাথায় বেশ লম্বা। ফরসা। নাক বেশ ধারালো।

হাসিমুখে বললেন, 'আড়াল থেকে কর্তামশায়ের গালগল্প শুনছিলাম। বীরভূমের নাম বীরভূম হয়েছে কেন, সে-সম্বন্ধে আমিও কিন্তু একটা গল্প জানি।'

লালুবাবু বলে উঠলেন, 'তোমার তো যত মেয়েলি গল্প।'

'আহা, শোনোই না। দীননাথবাবু, গায়ে পড়ে আলাপ করছি বলে যেন বেহায়া ভাববেন না। আপনার গল্প আমি খুব পড়ি তো। আপনি বীরসিংহপুর গেছেন?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না। সেটা কোথায়?'

'সিউড়ি থেকে ছ' মাইল পশ্চিমে। নরেশবাবুর জিপে চেপে একদিন ঘুরে আসবেন'খন। বীরসিংহপুর একটা গ্রাম। পুবদিকে জঙ্গলছাওয়া একটা ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাবেন। লোকে বলে, ওইখানেই নাকি এককালে রাজা বীরসিংহের রাজপ্রাসাদ ছিল। পশ্চিম অঞ্চলের রাজপুত্র ছিলেন। আটশো কি নশো বছর আগে আসেন আরও দুই ভাইকে নিয়ে।

মুসলমানদের সঙ্গে দারুণ লড়েছিলেন। কিংবদন্তি, তাঁর নাম থেকেই নাকি এই জেলার নাম হয়েছে বীরভূম।'

নরেশ ফোড়ন দিল, 'ম্যাডাম, আপনার গল্পের চেয়ে আপনার কর্তার গল্পটা কিন্তু অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।'

লালুবাবুর বউ হেসে বললেন, 'মোটেই না। আসল গল্পটা এখনও বলিনি। সাঁওতালি ভাষায় বীর মানে কী জানেন?'

'কী বলুন তো?'

'জঙ্গল। আগে নাকি এ-অঞ্চলে জঙ্গল ছাড়া আর কিছু ছিল না। সাঁওতালরা তাই জঙ্গলময় এই অঞ্চলকে বলত বীরভূইয়া— যা থেকে নাম দাঁড়িয়েছে বীরভূম।'

চায়ের কাপ ঠন্ করে নামিয়ে রেখে লালুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'তা হলে তো বলতে হয়, তোমার আমার পূর্বপুরুষেরা সবাই ছিলেন জংলি।'

আমি বললাম, 'থাক থাক, কথার প্যাঁচে আর কাজ নেই। এবার গা তুলুন।'

লালুবাবুর স্ত্রী বললেন, 'কোথায় যাবেন?'

'পাহাড়েশ্বরের মন্দিরে।'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'না তো।'

'এই পূর্ণিমার রাতে পাহাড়েশ্বরের এক মাইলের মধ্যেও কেউ হাঁটে না, তা কি জানেন না?'

বুঝলাম, আমাদের বাধা দেওয়ার জন্যেই আড়াল থেকে সব শুনে বেরিয়ে এসেছেন ইনি। লালুবাবুর মুখের হাসি দেখেও বুঝলাম, উনিও ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেলেছেন।

বললেন, 'গিন্নি, তুমি তো জানোই, এ ব্যাপারে আমার নিজের মনেও একটা অনুসন্ধিৎসা আছে। আজকে যখন দীননাথবাবুকে পেয়েছি, দেখে আসতে চাই, সত্যিই সেখানে অলৌকিক ব্যাপার কিছু ঘটে কিনা। তার পিছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কতখানি আছে, আমাকে তা জানতেই হবে।'

'কল্পবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলুন,' টুক করে খোঁচা মারল নরেশ।

'কল্পবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থেকেই শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় পৌঁছে যেতে পারি তো। দীননাথবাবু, আপনি তৈরি?'

নাচার হয়ে ওঁর স্ত্রী বললেন, 'বীরভূমের পোলা তুমি, তোমাকে আর আটকাতে পারব না। তা ছাড়া দীননাথবাবুকেও একলা ছাড়া উচিত নয়, যা গোঁয়ার। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। খাকিরামবাবাকে চটাতে যেয়ো না। সাক্ষাৎ শিব উনি।'

'সাপেদের চ্যালা বানিয়েছেন বলে?'

'যা রটে, তার কিছু তো বটে।'

কার্পেট ছেড়ে উঠে পড়লেন লালুবাবু। আলমারি-ভরতি ফোটোগ্রাফিক কেমিক্যালের শিশি-বোতলের মধ্যে থেকে একটা বোতল নামিয়ে এনে বললেন, 'এতে কী আছে জানো?'

‘কি গো?’

‘কার্বলিক অ্যাসিড। অনেকদিন থেকেই জোগাড় করে রেখেছি, তোমার ওই খাকিরামবাবুর চ্যালাচামুণ্ডাদের শায়েস্তা করার জন্যে। কার্বলিক অ্যাসিডকে ভয় পায় না, এমন সাপ ভূভারতে আছে বলে আমার জানা নেই। চলুন, দীননাথবাবু।’

‘চলুন। যাবেন কীসে?’

‘আমার প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টে। ফাঁকা রাস্তা। দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব।’

নরেশ উঠে পড়ে বললে, ‘আচ্ছা শালার পাল্লায় পড়েছি বটে।’

নরেশের শ্যালক আমি। তাই যখন তখন শালা নামের আপ্যায়ন হজম করতে হয়।

বললাম, ‘কাল সকালে যদি না ফিরি তো শালাকে উদ্ধার করতে যেয়ো তোমার জিপ নিয়ে।’

‘তা তো যেতেই হবে।’

দুবরাজপুর যখন পৌঁছিলাম, পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উঠে পড়েছে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের সামনের চায়ের দোকানগুলোয় দিনের বেলা অনেক লোক দেখেছিলাম। এখন সব ঝাঁপ বন্ধ। গোটা দুবরাজপুরটাই নিঝুম মেরে রয়েছে। দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তাঘাটেও লোকজন নেই। পূর্ণিমার রাতের আতঙ্ক বেশ ছড়িয়েছে দেখছি।

আমাদের প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্জন পথ বেয়ে উল্কাবেগে বেরিয়ে গেল মামা-ভাগনে পাহাড়ের দিকে।

তারপরেই, মোড় ঘুরেই দেখতে পেলাম রহস্যে ঘেরা থমথমে সেই অঞ্চল— মামা-ভাগনে পাহাড়।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেলেন লালুবাবু। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই আশেপাশে। নিশাচর রাতের কুকুরগুলো পর্যন্ত ল্যাজ গুটিয়ে চম্পট দিয়েছে। মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশে দিকদিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার খেলা। মহান। অপূর্ব! শুভ্রসুন্দর চন্দ্রকিরণের মধ্যে দিয়েও ছায়াপথের নক্ষত্রগুলো ঝিকমিকিয়ে চলেছে। আকাশের এই বিশালতার পানে তাকিয়ে থাকলে মন নিজে থেকেই প্রসারিত হয়, উদার হয়, সব ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে চলে যেতে চায়। ছোট ছোট ব্যাপারে নিজেকে আর আটকে রাখতে চায় না। মহাশূন্যের এই অসীম ব্যাপ্তি আর সীমাহীন সৌন্দর্য অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়ে তোলে মনের সমস্ত অন্দর আর কন্দর।

আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিলাম, এই অনন্ত সৌন্দর্যের পটভূমিকায়, স্খলিত শিলাস্তূপ দিয়ে গড়া মামা-ভাগনে পাহাড়ের দিকে। চেয়েছিলেন লালুবাবুও। দু’জনেরই মনে এই সুধাময় প্রকৃতি অমৃতপরশ বুলিয়ে যাচ্ছে, দু’জনেই তাই সমান অভিভূত। কথা বলে এই নীরব নিস্তব্ধ ভাবগম্ভীর রূপটিকে যেন নষ্ট করতে চাইছি না।

লালুবাবু হাতের ইঙ্গিতে মামা-ভাগনে পাহাড় দেখিয়ে মৌন মহান শিলাস্তূপের দিকে পা বাড়ালেন। আমিও এলাম পিছন-পিছন।

বলাবাহুল্য, বুক ফুলিয়ে রাস্তা বেয়ে এলাম না। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনের মধ্যে যতই অমৃতপরশ বুলিয়ে যাক, আমরা যে চলেছি এক অলৌকিক রহস্যের লৌকিক ব্যাখ্যার

সন্ধানে, মন থেকে তা পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারিনি। তাই পা টিপেটিপে সারিসারি গাছতলার ছায়ায় গা মিলিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম রহস্যনিকেতন পাহাড়টার দিকে।

আমাদের হাতে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। লালুবাবু কেবল একটা বোতল বয়ে নিয়ে চলেছেন। এই সেই বোতল, যার মধ্যে রয়েছে কার্বলিক অ্যাসিড। কয়েক ফোঁটা ছিটিয়ে দিলেই উগ্র গন্ধে ভূত পর্যন্ত পালায়, সাপখোপের তো কথাই নেই।

পাহাড়েশ্বরের মন্দিরের তলায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে সেই বটগাছটা। দিনের বেলা দেখে গিয়েছিলাম, বটের ঝুড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে একটা পরিত্যক্ত শিবমন্দিরকে। কবে কোন শিবভক্ত গড়ে দিয়ে গিয়েছিল, এখন তা বটের মহিমায় বিলুপ্তপ্রায়, ভাল করে ঠাহর না করলে বোঝাই যায় না যে ওখানে একটা শিবমন্দির আছে। বড় বড় পাথরগুলো চারদিক থেকে আড়াল করে রেখেছে ঝুড়ি দিয়ে মোড়া মন্দিরটাকে।

চাঁদের আলো সেদিকে তাই পড়ছে না। আবছা অন্ধকারে মায়াময় রহস্যাবৃত সেইদিকে তাকিয়ে কেন জানি না, গা-ছমছম করে উঠল আমার। লালুবাবুর হাত চেপে ধরলাম। কেন ধরলাম, তা নিজেই জানি না। আসলে ভয় জিনিসটা মানুষের মনের মধ্যেই রয়েছে। কখন যে কোন অনুকূল পরিবেশে তার ঘুম ভাঙে, তা স্বয়ং ঈশ্বর জানেন।

আমারও তাই হল, চাঁদনি রাতে অন্ধকার শিবমন্দিরটার দিকে তাকিয়ে সহসা মনে হল, জায়গাটা নিরাপদ নয়। চোখে দেখা না গেলেও ওখানে এমন কিছু আছে, যা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নাও হতে পারে।

আমার এই অকারণ রোমাঞ্চ-অনুভূতি লালুবাবুর অণু-পরমাণুতেও যে একই শিহরন জাগিয়েছে, তা তখন বুঝতে পারিনি। উনিও তা প্রকাশ করেননি। শুধু লক্ষ করলাম, কার্বলিক অ্যাসিডের বোতলের কথা যেন ভুলেই মেরে দিয়েছেন। সাপেদের কথাও যেন আর মনে নেই। নিমেষহীন চোখে শিবমন্দিরের জমাট অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

খুব আপশোস হল সঙ্গে টর্চ না আনার জন্যে। উঠল-বাই-তো কটক-যাই গোছের-যাত্রা করাটা ঠিক হয়নি। অন্তত বিজলি মশাল আনা উচিত ছিল।

লালুবাবু তন্ময় হয়ে কী দেখছেন, অথচ সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন না, তা দেখবার জন্যে আমিও একদৃষ্টে চাইলাম সেইদিকে। চোখের ভুল কিনা জানি না, মনে হল যেন কতকগুলো সাদা সাদা আলোকময় ধূম্রপুঞ্জ অন্ধকারের মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

চোখ অনেক সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে জানি। বিশেষ করে যেখানে ভয় পায় সকলে, সেখানেই চোখ অনেক কিছু কল্পনা করে নেয়, যাদের আসলে কোনও অস্তিত্বই নেই। কিন্তু পরে আমি শুনেছিলাম লালুবাবুর মুখে, আমার দু' চোখ সেই রাতে পরিত্যক্ত শিবমন্দিরে যা দেখেছিল, লালুবাবুর দু' চোখও দেখেছিল সেই একই দৃশ্য। আলোর কতকগুলো কণা, যেন কতকগুলো জোনাকি, তাল তাল ধোঁয়ার মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমরা দু'জনেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলাম সেইদিকে। এগিয়ে গিয়ে কাছ থেকে দেখবার সাহসটুকু পর্যন্ত রইল না। অথচ এই আমরাই অসীম সাহসে বুক বেঁধে সিউড়ি থেকে এতটা পথ এসেছি প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট হাঁকিয়ে অলৌকিককে প্রত্যক্ষ করব বলে।

কিন্তু আমরা যা দেখতে এসেছিলাম, তা তো দেখতে পাচ্ছি না। আমরা এসেছিলাম উড়ন্ত সাপ দেখবার প্রত্যাশা নিয়ে, এখনও পর্যন্ত সেই মহাপ্রভুদের একজনেরও লেজের ডগা পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আমরা এসেছিলাম অনেক রঙের খেলা দেখবার প্রত্যাশা নিয়ে, কিন্তু ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে দুধসাদা অথচ কালচে পাথরগুলোর ওপর কোনওরকম রঙিন আলোর চিহ্নটুকুও দেখলাম না। আমরা এসেছিলাম গুম্‌গুম্‌ অথবা শন্‌শন্‌ অথবা হুম্‌হাম্‌ আওয়াজ শুনব বলে, কিন্তু এমন নৈঃশব্দ্য আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল উড়ন্ত শিলা অথবা ভাসমান শিলাখণ্ড দেখবার কিন্তু নিথর প্রস্তররাজির কোথাও তিলমাত্র কম্পনও দেখা যাচ্ছে না, শূন্যে ভেসে ওঠা তো দূরের কথা। সবই তা হলে বুজরুকি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়কাতুরে গ্রামবাসীদের নিছক রটনা।

কিন্তু যা দেখব বলে আসিনি, তা কেন দেখতে পাচ্ছি নীরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে? কী আছে ওই বটের ঝুড়ির অন্তরালে? কেন ওখানে কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে আলোককণিকা? কেন সাদা ধোঁয়ার মতো অবর্ণনীয় ওই বস্তু বিরামবিহীনভাবে ঘূর্ণাবর্ত রচনা করছে অন্ধকারের পটভূমিকায়?

সহস্র প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল মনের মধ্যে। কিন্তু কোনওটারই জবাব পেলাম না। মনের প্রশ্ন মুখে আনতেও ভরসা পেলাম না, যদি ওই আলোকপুঞ্জ সহসা টের পায় আমাদের অস্তিত্ব? কুপিত হয় আমাদের অনধিকার অবস্থান উপলব্ধি করে?

কেন যে এই ভয় অক্টোপাসের মতো একাধিক শুঁড় বাড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরতে লাগল আমার মনকে, তা আমি হাজার লিখেও বোঝাতে পারব না। কেন যে নৃত্যপর আলোককণিকার মধ্যে অযথা প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করলাম, ভয়ংকরের সম্ভাবনায় শিহরিত হলাম, তাও ব্যাখ্যা করতে পারব না। শুধু বলব, আচমকা আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নামক অব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়টি যেন মনের একান্ত সংগোপনে হুঁশিয়ার করে দিল আমাকে। দীননাথ— আর এগিয়ো না! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ!

আমার অজান্তেই মুষ্ঠি দৃঢ় করে ফেলেছিলাম। না জেনেই লালুবাবুর অগ্রগতির সম্ভাবনাকে রোধ করতে চেয়েছিলাম। ভুল করেছিলাম সেইখানেই। আমি কলকাতার ছেলে, কিন্তু লালুবাবু বীরভূমির সন্তান— ভয়কে কাটিয়ে ওঠার মতো জেদ আর মনোবল তাঁর আছে। তাই আচমকা এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে নৃত্যপর আলোককণাগুলোর দিকে অগ্রসর হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল আমার অন্তরাত্মা। দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু দিয়ে অনুভব করলাম, সর্বনাশের আর দেরি নেই। ওখানে আছে অজানা আতঙ্ক, আছে মানুষের অগোচর বিভীষিকা, আছে কালান্তক মরণ! চোখের সামনে ভেসে উঠল লালুবাবুর স্ত্রীর হাসি হাসি মুখখানা।

এবং, ওই মুখখানাই নিমেষমধ্যে আমার ভয়ের নাগপাশ খসিয়ে দিলে। অস্ফুট আর্তনাদ করে পিছনে ফিরে চম্পট দিলাম না, সোজা সামনে ধেয়ে গেলাম লালুবাবুকে ফিরিয়ে আনতে।

লালুবাবু আমার দ্রুতধাবমান পদশব্দ শ্রবণ করেই দ্রুততর করেছিলেন নিজের পদক্ষেপ। টপাটপ লাফ মেরে এগিয়ে গিয়েছিলেন আলোককণার ঘূর্ণাবর্তের দিকে, ভেসে ভেসে

বেড়ানো সাদাটে ধোঁয়ার দিকে। দূর থেকেই দেখলাম, আলোকপুঞ্জগুলো যেন ঘনসন্নিবিষ্ট হচ্ছে, ধূম্রকুণ্ডলী যেন জমাট কায়া পরিগ্রহ করছে। যেন একটা অমানুষিক রূপ এখুনি জেগে উঠতে চলেছে বটবৃক্ষের ঝুপসি আঁধারে।

লালুবাবু ততক্ষণে অনেকটা কাছে চলে গেছেন। আচমকা একটা কাতরানি শুনলাম তাঁর কণ্ঠে। যেন ককিয়ে উঠলেন তিনি। পরক্ষণেই ঠিকরে পড়লেন পিছনদিকে। সামলাতে না পেরে, পায়ে পা বেঁধে গড়িয়ে নেমে এলেন আমার পায়ের কাছে। আমিও আর কালক্ষেপ করলাম না। সবলে দু' হাতে লালুবাবুকে ভূমিশয্যা থেকে টেনে তুললাম এবং সহসা যেন অযুত ঐরাবতের শক্তি অর্জন করে হিড়হিড় করে তাঁকে টেনে নিয়ে এলাম রাস্তায়। সেখান থেকে গাছতলার অন্ধকার দিয়ে প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে। লালুবাবু ইলেকট্রিক শক-খাওয়া প্রাণীর মতো ঝিমিয়ে রইলেন আগাগোড়া। এ মানুষকে দিয়ে আর ড্রাইভিং সম্ভব নয় উপলব্ধি করে তাঁকে বসালাম পিছনের সিটে, আমি বসলাম সামনের সিটে, তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট করে নিয়ে টপাটপ গিয়ার পালটে টপগিয়ারে ফিরে চললাম সিউড়ি অভিমুখে।

যেতে যেতে পিছন ফিরে একবার শুধু দেখেছিলাম মামা-ভাগনে পাহাড়ের দিকে। দেখেছিলাম, সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার মাথায় চাঁদের আলোয় ধোওয়া একটি মনুষ্যমূর্তিকে।

গালে তার লম্বা সাদা দাড়ি। চাঁদের সাদা আলোয় যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। স্থির নিষ্কম্প সেই মনুষ্যমূর্তি যেন অনিমেষ চেয়ে আছে আমাদের দিকেই।

৮. আলোকপুঞ্জের ব্যাখ্যা

অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম, ভগ্নিপতির বাড়িতে নয়, লালুবাবুর স্টুডিয়োতে। ওঁর স্ত্রী ঘুমোননি। মানুষের মন বড় দুর্জ্ঞেয় বস্তু। অদৃশ্য তন্তু দিয়ে যেন রেডিয়ো-বার্তা চলে আসে এক মন থেকে আর-এক মনে। লালুবাবুর স্ত্রী লালুবাবুকে নিয়ে কখনওই চিন্তিত থাকেন না, কখনওই উদ্বেগে ভোগেন না। কিন্তু সেই রাতে তিনি ঘুমোতে পারেননি। নামহীন আতঙ্কে আর উৎকণ্ঠায় চোখ মেলে শুয়ে থেকেছেন পালঙ্কে। দূর থেকে নির্জন পথ বেয়ে উল্কাবেগে আগুয়ান প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টের পরিচিত শব্দ পেয়েই ছুটে এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রায় মুহ্যমান লালুবাবুকে স্টুডিয়ো ঘরে টেনে নিয়ে এলাম আমি। উনি ঘরে ঢুকেই বড় সোফাটায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি কী করব ভেবে না পেয়ে লালুবাবুর স্ত্রীকে বললাম, 'ব্ল্যাক কফি করে আনতে পারেন এক গেলাস? কড়া হওয়া চাই। মেন্টাল শক মনে হচ্ছে। খুব গরম করে করবেন।'

কয়েক চুমুক ব্ল্যাক কফি খেয়ে ধাতস্থ হলেন লালুবাবু। লজ্জিত মুখে উঠে বসলেন সোফায়। ভয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিলেন ওঁর স্ত্রী।

লালুবাবু হেসে বললেন, 'কিচ্ছু হয়নি, তুমি যাও, শুয়ে পড়ো।...'

স্ত্রী কিন্তু গেলেন না। বললেন, 'কী হয়েছে, বলো আমাকে।...'

চুপ করে রইলেন লালুবাবু। কী হয়েছে, তা আমিও জানি না। কিন্তু যা দেখেছি, শুধু সেইটুকুই বললাম। লালুবাবুর স্ত্রীর মুখটা মনের পর্দায় ভেসে উঠতেই আমার ভয়ের নাগপাশ খসে গিয়েছিল, তাও বললাম। উনি মৃদু হেসে বললেন, 'আপনারা ভাবছিলেন বলেই বোধহয় আচমকা মনটা কীরকম করে উঠেছিল, ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়েছিলাম।...'

জিজ্ঞেস করলাম লালুবাবুকে, 'অমন চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? ছিটকেই বা পড়লেন কেন? এতক্ষণ বেহুঁশের মতোই বা ছিলেন কেন?...'

লালুবাবু বললেন আস্তে আস্তে, 'জীবনে আর-একটা অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। ওই যে আপনি বললেন, শক পেয়েছি, ঠিক তাই। তবে মেন্টাল নয়।'

'তা হলে কীসের?'

'কীসের?' বলে, ফের বিমূঢ় চোখে চাইলেন লালুবাবু। একটু পরে জড়িত স্বরে বললেন, 'কীসের, তা কী করে বোঝাই বলুন তো? এ-ধরনের ঘটনা কেতাবে পড়েছিলাম, নিজের শরীরের ওপর দিয়ে অভিজ্ঞতাটা অর্জন করলাম এই প্রথম।'

আমি বললাম, 'আপনাকে বোঝাতে হবে না, আমরাও বুঝতে চাই না, শুধু জানতে চাই, আপনার ছ' ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা দেহটা কীসের ধাক্কায় অমনভাবে ঠিকরে গেল পেছনে? আপনি নিজে যে পেছনে লাফিয়ে পড়েননি, আমি হলফ করে বলতে পারি।'

'না... না... নিজে লাফাইনি। লাফাতে যাব কেন? ওইরকমভাবে ছুটে গিয়ে পেছনে লাফানো কি যায়?'

'তবে?...'

'দীননাথবাবু, আমি সবকিছুর মধ্যেই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অন্বেষণের চেষ্টা করি। এই ঘটনার মধ্যেও সেই ইঙ্গিত পাচ্ছি।'

'ব্যাখ্যাটা শোনাবেন?'

'তা হলে তো আবার কিছু তত্ত্বকথা বলতে হয়,' বলে রসিকতার ভঙ্গিমায় হাসলেন লালুবাবু, কিন্তু ক্লিষ্ট হাসিতে রসিকতা ফুটল না।

আমি বললাম, 'তা হলে শোনান আপনার তত্ত্বকথা।'

লালুবাবু বললেন, 'কোনখান থেকে শুরু করব, ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। আপনারা যাকে প্যারা-সায়েন্স বলেন, আমি সেই প্যারা-সায়েন্স নিয়ে বেশ কিছুদিন চর্চা করেছি। প্যারা-সায়েন্সের বাংলা কী হওয়া উচিত, দীননাথবাবু?'

'অপবিজ্ঞান?'

'চলনসই। যাকগে... আপনারা যে দেশের সায়েন্সকে বেদ-বেদান্তের চেয়েও বড় বলে মনে করেন সেই দেশের বৈজ্ঞানিক আর বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসুরা এখন এই প্যারা-সায়েন্স নিয়ে রীতিমতো আদাজল খেয়ে লেগেছেন। এঁরাই বলছেন, মনের রহস্য আজও আমরা কেউ পুরো ধরতে পারিনি। মনের যা ক্ষমতা, তার এক হাজার ভাগের একভাগ মাত্র ব্যবহার করেই দেমাকে ফেটে পড়ছি। এঁরাই বলছেন, চিন্তার তরঙ্গ আলোকতরঙ্গের গতিবেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পারে, অর্থাৎ এক সেকেন্ডের সাতভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই একজনের চিন্তার ঢেউ পাক দিয়ে আসতে পারে পৃথিবীকে। আজকেই কি

তার প্রমাণ পেলেন না? মামা-ভাগনে পাহাড়ে আপনি আমার স্ত্রীর কথা চিন্তা করেছিলেন, করেছিলাম আমিও, সেই মুহূর্তেই ছটফটিয়ে উঠেছে আমার স্ত্রী— চিন্তা, আবেগ, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগের প্রচণ্ড তরঙ্গ নিমেষমধ্যে উদ্বেল করে তুলেছে তাঁকে। আবেগের প্রচণ্ডতা তা হলে আপনি মানছেন?'

'মানছি,' বললাম আমি।

লালুবাবু বললেন, 'তা হলে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া যাক। টম লেথব্রিজ ছিলেন কেমব্রিজের পণ্ডিত। নিজেকে কখনও পরাবিজ্ঞানী বা অকাল্টিস্ট বলে জাহির করেননি। কিন্তু পরাবিজ্ঞানের বহু আশ্চর্য রহস্য নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করে গেছেন, অনেক চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ লিখে গেছেন। উনিই প্রথম বলেন, আবেগের তীব্রতা ইথারে স্থায়ী ছাপ ফেলে যেতে পারে। থিয়সফিস্টরা একেই বলেছেন, আকাশিক ইথার।'

'থিয়সফিস্ট মানে?' আমার প্রশ্ন।

'ব্রহ্মবিজ্ঞানী।'

'আকাশিক ইথার জিনিসটা মাথায় ঢুকছে না।'

'বৈজ্ঞনিক ভাষায় বললে ঢুকে যাবে মাথায়। কসমিক মেমরি, বুঝলেন?'

'ওটার বাংলা কি আকাশিক ইথার?'

'কসমিক মেমরির বাংলা মহাজাগতিক স্মৃতি। যা কিছু ঘটছে, তার 'আকাশিক রেকর্ড' থেকে যাচ্ছে ইথারের মধ্যে। এ হল সেই ইথার যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে রয়েছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণকে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।'

'লালুবাবু, অনুমিতিটার প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে, বলছেন বিজ্ঞানীরা।'

কঠোর গলায় লালুবাবু বললেন, 'বৈজ্ঞানিকরা কী বলেন আমি তা জানি, দীননাথবাবু। আমি বলছি পরাবিজ্ঞানীদের কথা। শুনতে যদি ভাল না লাগে তা হলে থামছি। রাত অনেক হয়েছে।' ধমক খেয়ে কান-টান লাল করে বললাম, 'না, না..... বলে যান।'

'এই সেই ইথার যা ইচ্ছা আর আবেগের তীব্রতাকে ধরে রাখে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কম্পনকে জাগ্রত করে। ম্যাজিসিয়ান এলিফাজ লেভি এই ইথারকেই বলেছেন অ্যাসট্রাল লাইট বা আকাশিক ইথার। বলেছেন, ঠিক যেন একটা প্লাস্টিক মিডিয়াম একটা নমনীয় মাধ্যম যার ওপর চিন্তাভাবনার ভাবমূর্তি ছাপা হয়ে যায়। লেথব্রিজ কিন্তু ম্যাজিকের বইয়ের ধার ধারেননি, তিনি নিজে থেকে আবিষ্কার করেছিলেন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানা জায়গায় এমন অনেক পাথর ছড়িয়ে আছে যা মনের এই শক্তির স্টোরেজ ব্যাটারি, যার আর এক নাম ম্যাজিক। দীননাথবাবু, আমরা আজ মামা-ভাগনে পাহাড়ের অসংখ্য পাথরের একটির মধ্যে এই জমানো শক্তির আধার দেখে এসেছি।'

মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল লালুবাবুর বক্তৃতার তোড়ে। ওঁর স্ত্রীর অবস্থাও যে আমারই মতো, তা তাঁর মুখের চেহারা দেখেই মালুম হল। স্বামীর মাথা ঠিক আছে কিনা, সে বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ জাগছে মনে।

লালুবাবু কিন্তু যেন ঘোরের মাথায় বলে চললেন, 'বাঘশিকারী জিম করবেটের তীব্র মাত্রায় 'জঙ্গল অনুভূতি' ছিল। আমার কাছে এইসবই প্যারা-সায়েন্সের ব্যাপার। তাই মামা-

ভাগনে পাহাড়ে ধাক্কাটা আমিই খেয়েছি, পার পেয়ে গেছেন আপনি।'

'কিন্তু ধাক্কাটা কীসের?'

'বলছি। তার আগে একটা গল্প শুনুন। গল্প ঠিক নয়, সত্যি ঘটনা। এই ঘটনাটাই এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে বলে বলছি। এই একটা ঘটনা থেকেই বুঝবেন, ভূত বা অশরীরী সম্বন্ধে লেথব্রিজ থিয়োরিটা কী।'

'ভূতের থিয়োরি?'

'হ্যাঁ, ভূতের থিয়োরি। অশরীরীদের ভৌতিক কাণ্ডকারখানার পরাবিজ্ঞানী ব্যাখ্যা। শুনতে আগ্রহ থাকলে বলব, নইলে ক্ষ্যামা দিন।'

'ভূত তত্ত্ব শুনতে কার আগ্রহ হয় না? থামবেন না, বলে যান।'

সত্যিই আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিল আমার মনের মধ্যে। লালুবাবুর বক্তৃতার সারমর্ম বুঝতে না পারলেও, এটুকু বুঝলাম, অনেকগুলো তত্ত্বকথা অল্প পরিসরে পরপর বলে যাওয়ার ফলে আমার মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে বটে, উনি কিন্তু একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকেই নিয়ে যাচ্ছেন কথার প্রবাহকে এবং এই প্রবাহটাই শেষপর্যন্ত মামা-ভাগনে পাহাড় প্রহেলিকার একটা ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়াবে। ভূতেদেরও যে একটা পরাবিজ্ঞানী ব্যাখ্যা থাকতে পারে, এটা জানামাত্র আগ্রহ তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল চক্ষের নিমেষে।

লালুবাবু বললেন, 'মনের বা আবেগের বা ইচ্ছাশক্তির যে-ক্রিয়াকলাপ আমরা ধরতে পারি না, তাকেই ম্যাজিক অথবা জাদুবিদ্যা বলে সান্ত্বনা পাই। সবই তো আকাশিক রেকর্ড হয়ে থাকছে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভাইব্রেশনের হেরফের ঘটলে, অনুকূল কম্পনের মধ্যে গিয়ে পড়লে ফুটে বেরোচ্ছে। আমরা ভূত দেখি ঠিক তখনি। এক সময়ে, মানে বেঁচে থাকার সময়ে, শরীরী প্রাণীটি যে-ইচ্ছার তীব্রতা আর আবেগের প্রচণ্ডতা ইথারের বুকে জমা রেখে শরীর ত্যাগ করেছে...... সময়ে সময়ে সেই জমানো আবেগের তীব্রতার বিস্ফোরণ ঘটলে অশরীরী কাণ্ডকারখানা আমাদের চক্ষুস্থির করে দেয়। যেমনটি আজকে দেখে এলেন। এই আবেগ অশুভ হলে, গায়ে কাঁটা দেয়, কনকনে শৈত্য অনুভব করি, নিদারুণ ঝটকায় আছড়ে পড়ি, বিষম ভয়ে কাঠ হয়ে যাই, সম্মোহনী প্রভাবে ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলি— যেমন...'

আমতা আমতা করে বললাম, 'কিন্তু—'

'ঘটনাটা? বলছি। হানাবাড়ির ভৌতিক কাণ্ড কখনও দেখেছেন?'

'শুনেছি।'

'বিশ্বাস করেন?'

'যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে অবিশ্বাস করি কী করে?'

'সাবাস। যেমন, আজকে যে কাণ্ড দেখে এলেন, তাকেই বা অস্বীকার করবেন কী করে? স্রেফ ভূতের খেলাই দেখে এলেন। অশরীরীর পুঞ্জীভূত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভাইব্রেশনের ম্যাজিকই দেখে এলেন। আর আমি অতি-অনুভূতি নিয়ে খুব কাছে চলে যাওয়ার ফলে সেই শক্তির তেজ সইতে না পেরে ছিটকে গেলাম। ঘোর কাটিয়ে উঠতে গেল এতটা সময়।'

'কিন্তু ঘটনাটা—'

'বলছি। বিভারলি নিকোলাস নামে এক সাহেবের আত্মচরিতে পড়েছিলাম এই ঘটনা। বইখানার নাম 'টোয়েন্টি-ফাইভ'। পড়তে চান তো দিতে পারি।'

'আপনার মুখেই শুনি না।'

'তা হলে শুনুন। যে বাড়িতে ঘটনাটা ঘটেছিল, তার নাম 'কাসল মেয়ার'। বাড়িটা হানাবাড়ি। ১৯২০ সালের এক রোববারের রাতে তিন তরুণ ঠিক করলেন, হানাবাড়িতে হানা দেবেন; এই তিনজনের মধ্যে ছিলেন, বিভারলি নিকোলাস, তাঁর ভাই, আর লর্ড পিটার সেন্ট অড্রিজ নামে এক বন্ধু। বাড়িটাকে হানাবাড়ি বানিয়ে ছেড়েছিলেন নাকি এক ডাক্তার। বউকে আর বাড়ির ঝিকে খুন করেন পাগলা ডাক্তার। ভূত হয়ে কাউকে তিষ্ঠোতে দেন না বাড়িতে।

তিন তরুণ বাড়ির মধ্যে ঢোকার সময় থেকেই টের পেলেন কেমন জানি একটা দম-আটকানো ভাব...... মন-মেজাজের ওপর একটা অস্বস্তিকর চাপ..... কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়...... আতঙ্কে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার মতো ব্যাপার নয়। ওপরতলার হলঘরে একা দাঁড়িয়েছিলেন নিকোলাস। সঙ্গীদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগ্রত হল তাঁর মনের মধ্যে। মনে হল, চিন্তাপ্রবাহ যেন হঠাৎ মন্থরগতি হয়ে পড়ছে। মস্তিষ্কের বাম অংশ যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে একটা কালো আবরণে। যেন ঘুমের ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছেন একটু একটু করে। চৈতন্য লোপ পাওয়ার আগেই কোনওমতে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন বাইরে। বেরিয়ে এলেন অদ্ভুত রকমের ক্লান্তি আর নিঃশেষিত হওয়ার অনুভূতি নিয়ে।

অন্য সঙ্গী দু'জন তখন তন্নতন্ন করে খুঁজছিলেন বাড়ির সবক'টা ঘর— যদি কোথাও অদ্ভুত কিছু দেখা যায়, এই আশায়।

নিকোলাস এসে মিলিত হলেন তাঁদের সঙ্গে।

লর্ড সেন্ট অড্রিজ এরপর একাই তদন্ত চালিয়ে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড অন্তর শিস দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিলেন, সব ঠিক হ্যায়, ডরো মৎ।

তারপরেই শিসের আওয়াজ আর শোনা গেল না।

দুই ভাইয়ের মনে হল, কী যেন একটা তাঁদের পাশ দিয়ে বেগে উধাও হয়ে গেল বাড়ির বাইরে। আর ঠিক সেই সময়ে বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন লর্ড সেন্ট অড্রিজ।

জানলার সামনে ধেয়ে গেলেন দুই ভাই। শুনতে পেলেন কোথায় যেন ধপ্ করে অদ্ভুত একটা আওয়াজ হল, সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এল ঝটাপটির শব্দ এবং মুহুর্মুহু অস্ফুট আর্তনাদ।

লর্ড সেন্ট অড্রিজ বেরিয়ে এলেন তারপরেই।

চুল তাঁর উশকোখুশকো, পোশাক লণ্ডভণ্ড, আপাদমস্তকে দেওয়ালের প্লাস্টারের চুন আর বালির আস্তরণ।

'ব্যাপার কী?' সভয়ে জানতে চাইলেন দুই ভাই।

লর্ডসাহেব বললেন, 'নিকোলাস যে-ঘরে ঢুকেই প্রায় মূর্ছা যেতে বসেছিলেন, সেই ঘরে পা দিতে-না-দিতেই দেখতে পেলাম একটা আশ্চর্য ব্যাপার।'

‘কী ব্যাপার?’ চোখ বড় বড় করে জানতে চেয়েছিলেন নিকোলাস।

‘একটা আলো।’

‘আলো?’

‘হ্যাঁ। ধূসর রঙের একটা আলো। আলো দেখেই পেছন ফিরে সটকান দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু পাশ ফিরতে-না-ফিরতেই কী যেন একটা প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে গেল গা ঘেঁষে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক এক ধাক্কায় ঠিকরে পড়লাম মেঝেতে। একই সঙ্গে একটা অবর্ণনীয় অশুভ প্রভাব যেন ছেয়ে ফেলল আমাকে। আমার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন ক্লেদাক্ত হয়ে গেল কুটিল করাল সেই প্রভাবের অদৃশ্য ঝাপটায়। মন আর শরীরের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় করে কী কষ্টে যে মেঝে থেকে টেনে তুলেছি নিজেকে, তা শুধু আমিই জানি। সিধে হয়ে দাঁড়াতেও পারছিলাম না। হামাগুড়ি দিয়ে চাতালে বেরিয়েছি, হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছি, সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দম-আটকানো সেই অনুভূতিটা মিলিয়ে গেল চক্ষের নিমেষে।’

দম আটকে এসেছিল আমার নিজেরও। নিশীথ রাতে এই ধরনের কাহিনি গায়ে কাঁটা তো দেবেই। লালুবাবুর স্ত্রী কিন্তু বীরাঙ্গনা নিঃসন্দেহে স্তিমিত নয়নে শুনছেন বীর স্বামীর কথাশিল্প।

লালুবাবু বলে গেলেন, ‘দীননাথবাবু, পাগলা ডাক্তারের প্রেত সেদিন হানাবাড়িতে নিকোলাস আর লর্ডসাহেবের এনার্জি নিঙড়ে বের করে নিয়ে তবে ছেড়ে দিয়েছিল, হুবহু একই ঘটনা ঘটল আমার ক্ষেত্রে, একটু আগে মামা-ভাগনে পাহাড়ে। বটের ঝুড়িতে ঢাকা আলোককণার দিকে এগোতেই যেন একটা অদৃশ্য বাধা পথ আটকে দিল আমার। একটা কু-সত্তা যেন আচ্ছন্ন করে আনল আমার সমস্ত সত্তাকে। আমি নিস্তেজ, শক্তিহীন হয়ে পড়লাম। তারপরেই অদৃশ্য ধাক্কায় ঠিকরে গেলাম পেছন দিকে। অনুভব করলাম একটা কনকনে হাওয়ার ঝাপটা। আমার মগজের মধ্যেও যেন ঘুমের আরক প্রবেশ করল চক্ষের নিমেষে, চিন্তাভাবনার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললাম, আপনি না থাকলে আমাকে ওখানেই পড়ে থাকতে হত।’

স্পষ্ট দেখলাম, কথা বলতে বলতে নিঃসীম ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন লালুবাবু। অকুতোভয় ভদ্রলোকের এহেন মুখচ্ছবি দেখে বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করলাম তাঁর প্রতিটি কথা।

বললাম সহানুভূতি-গভীর কণ্ঠে, ‘আপনি কিন্তু এ ব্যাপারের একটা কল্পবৈজ্ঞানিক অথবা পরাবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।’

কপালের ওপর হাত চালিয়ে বললেন লালুবাবু, ‘দেবো তো নিশ্চয়। নিকোলাসের ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা অনেকেই খাড়া করেছেন, এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সেইটাই। আতঙ্ক আর দুঃখদুর্দশার মতো নেতিবাচক আবেগ যদি ইথারে ছাপ ফেলে যায়, অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে এনার্জি টেনে নেওয়ার মতো রেকর্ড রেখে যায়, এবং এরপরে অন্য কেউ যদি সেই রেকর্ডের সঙ্গে নিজের রেকর্ড মিলিয়ে ফেলে, অনেকটা রেডিয়ো টিউনিংয়ের মতো, তা হলে একইরকমভাবে তার এনার্জি বেরিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে, চিন্তাভাবনা তালগোল

পাকিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে। আমি কি বোঝাতে পারলাম, দীননাথবাবু?...'

আমি 'হ্যাঁ', 'না', কিছু না বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। লালুবাবু সেই সময়টুকু আমার মুখের দিকে চোখ কুঁচকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'প্রেতশরীরের এই যে কাণ্ডকারখানা, তা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের একটা মাতামাতি ছাড়া আর কিছুই নয় বলে আমার বিশ্বাস। বছরের বা দিনের, বা মাসের বিশেষ সময়ে অনুকূল পরিবেশে এই মাতামাতি আরম্ভ হয়, তখন অলৌকিক কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ অথবা অনুভব করা যায়। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল যথেষ্ট প্রেতচক্রে যোগদান করার পর 'ল্যান্ড অব মিস্ট' উপন্যাসে লিখেছিলেন, বিদেহীরা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ স্থিরতড়িৎ একদম সইতে পারে না। এই থেকেই কি আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে, বিদেহীরা যখন চক্ষু-কর্ণ-মানসগোচর কিছু করে বসে, তখন ইথারে পরিব্যাপ্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা ওই জাতীয় কোনও শক্তিক্ষেত্রের সাহায্য নেয়? দীননাথবাবু, অঞ্চলটায় আমার আবার যেতে ইচ্ছে করছে, এবার একটা উইম্‌স্‌হার্স্ট মেশিন নিয়ে।'

'স্থির তড়িৎ দিয়ে পরীক্ষা চালানোর জন্যে? ও মেশিন তো স্থির তড়িৎ তৈরির মেশিন।'

'ঠিক ধরেছেন, যে-অপার্থিব শক্তির প্রহারে আমাকে পপাত ধরণীতলে হতে হয়েছে, এতক্ষণ মুহ্যমান হয়ে থাকতে হয়েছে, দেখি স্থির তড়িৎ দিয়ে তাকে অস্থির করে অঞ্চলছাড়া করতে পারি কিনা।'

দৃঢ়কণ্ঠে এতক্ষণ পরে কথা বললেন লালুবাবুর স্ত্রী, 'থাক, অনেক বীরত্ব দেখিয়েছ, আর দরকার নেই।'

'গিন্নি—'

'থামো। দীননাথবাবু সঙ্গে ছিলেন বলে এখনও শাঁখাসিঁদুর রাখতে পেরেছি—'

অট্টহেসে বললেন লালুবাবু, 'পাঁচ-পাঁচজন জ্যোতিষী কিন্তু একবাক্যে বলেছেন, তোমার আয়ু আমার চাইতে কম। কাজেই শাঁখাসিঁদুর নিয়েই ড্যাডাং-ড্যাং করে স্বর্গে যাবে। আমাকে ভূত-গবেষণা থেকে নিবৃত্ত করতে যেয়ো না।'

লালুবাবুর স্ত্রীর শক্ত চোয়াল দেখেই বুঝলাম, বৃথা চেষ্টা করছেন ভদ্রলোক। অনর্থ ঘটিয়ে ছাড়বেন ভদ্রমহিলা এরপরেও যদি উইম্‌স্‌হার্স্ট মেশিনের প্রসঙ্গ তোলেন। তাই কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার অভিপ্রায় বললাম, 'কিন্তু আমরা যেজন্যে এতটা পথ গেলাম, সেটাই তো হল না। উড়ুক্কু সাপেদের দর্শন তো পেলাম না।'

কাষ্ঠহেসে লালুবাবু বললেন, 'সে সুযোগ আর পেলাম কই।'

'উড়ুক্কু সাপ দেখি আর না দেখি, আমি কিন্তু একটা জিনিস দেখে এসেছি।'

'কী বলুন তো?' উদগ্রীব হলেন লালুবাবু। আমি তখন বললাম প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট চালিয়ে পিঠটান দেওয়ার সময়ে সবচেয়ে উঁচু পাথরের ওপর জ্যোৎস্নালোকে দেখা দুগ্ধধবল দাড়িওলা সেই স্থির মনুষ্যমূর্তিটির কথা।

বললাম, 'মনে হল, ছায়ামূর্তিটা পলকহীন চোখে চেয়ে আছে আমার দিকেই। অতদূর থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও ঘাড় ফিরিয়ে থাকার ধরন দেখে অন্তত তাই মনে হল।'

চোখ কুঁচকে চেয়ে থেকে লালুবাবু বললেন, 'আপনি কি তা হলে বলতে চান, ভুতুড়ে ব্যাপারটার পিছনে তাঁর কোনও হাত আছে? আড়ালে থেকে তিনিই কলকাঠি নেড়েছেন, প্রেতলোককে জাগ্রত করেছেন, আমাদের নাস্তানাবুদ করে তাড়িয়ে দিয়ে পলায়নদৃশ্যটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন?'

'অতটা কল্পনার দৌড় আমার নেই, লালুবাবু। তা ছাড়া, সে যেই হোক, ভূতেদের হুকুম দেওয়ার মতো ক্ষমতা যদি তার থাকে, তা হলে বলতে হবে, স্বয়ং ভূতনাথ।'

'গালে সাদা দাড়ি ছিল বললেন না?'

'হ্যাঁ।'

'খাকিরামবাবা নন তো?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

লালুবাবু বললেন, 'প্রেতসিদ্ধ পুরুষ। শ্মশানে-মশানে দিন কাটান। অকাল্ট সায়েন্সটা ভাল রপ্ত করেছেন নিশ্চয়ই। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবার এমন মন্ত্রগুপ্তি আয়ত্ত করেছেন যে, তাঁর ইচ্ছামতো ভূতবাবাজিদের আবির্ভূত হতে হয় যখন তখন। কিন্তু কী দরকার ছিল এত কাণ্ড করবার? খান দুই উড়ুক্কু সাপ লেলিয়ে দিলেই তো পারতেন?'

'কার্বলিক অ্যাসিডের বোতলটা বগলে রেখেছিলেন বলেই বোধহয় সে চেষ্টা করেননি।'

'তা বটে! কিন্তু উনি তা জানলেন কী করে?'

'ভূতনাথের অগোচর কিছু থাকে কী?'

'তা হলে কার্বলিক অ্যাসিডকে ভয় পান খাকিরামবাবা! উইম্‌স্‌হার্স্ট মেশিনকেও ভয় পাবেন নিশ্চয়ই।'

'আবার!' ঝংকার দিলে লালু-জায়া।

একদম চুপ মেরে গেলেন বীরভূমনন্দন লালুবাবু।

৯. ভূতনাথের আর এক কীর্তি

নরেশ জিপ নিয়ে এসে হাজির হল ভোরবেলা। সারারাত বেচারা বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়েছে। কাক ডাকতে-না-ডাকতেই তাই দৌড়ে এসেছে আমরা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি কিনা জানবার জন্যে।

রাতের ঘটনা শোনবার পর অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল নরেশ। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আগেই বলেছি, নরেশ কম কথার মানুষ। কথা কম বলে, ভাবে বেশি। মনটা খোলা, বদ্ধ নয়। নিজে যা জানে, তার বাইরে যে অসীম জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে, তা নিয়ে কখনও পণ্ডিতমূর্খের মতো তর্ক করে নিজেকে জাহির করতে যায় না। বরং শিখতে চায়, জানতে চায়, জ্ঞানের ভাঁড়ারকে ভরিয়ে নিতে চায়।

তাই কাহিনি শুনে হো হো হেসে বাহাদুরি নিতে গেল না। ভাবতে লাগল। ঘটনাগুলো তলিয়ে পর্যালোচনা করল মনে মনে।

তারপর বললে, 'আচ্ছা, আর্থফোর্স নিয়ে সেদিন এখানে আলোচনা হচ্ছিল মনে আছে?'

লালুবাবু বললেন, 'তখন কিন্তু আপনি হেসেছিলেন।'

'ওটা আড্ডার হাসি। সত্যিকারের হাসি নয়,' অল্প হেসে বললে নরেশ। 'আমার মনে হচ্ছে, আর্থফোর্সের সঙ্গে এইসব ব্যাপারের হয়তো কোনও যোগাযোগ আছে।'

'তা তো আছেই,' বললেন লালুবাবু। 'আর্থফোর্স যখন নিজে থেকে উৎপাত ঘটায়, তখন তা ভুতুড়ে উৎপাত। মানুষ তাকে কাজে লাগালে, তার নাম ম্যাজিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাল রাতে যা ঘটেছে, তার পেছনে ওই দাড়িবাবার হাত আছে কিনা। যদি থাকে, তা হলে বলব, সবটাই ম্যাজিক।'

'খাকিরামবাবার কথা বলছেন,' নরেশের বোঝার জন্যে বললাম আমি।

চুপ করে রইল নরেশ। তারপর বললে, 'ও নিয়ে পরে গবেষণা করা যাবে, যাচাইও করা যাবে, আমি তার ব্যবস্থা করব।'

'আপনি করবেন? কীভাবে?' লালুবাবু উদগ্রীব হলেন।

'বলছি সেকথা। কাল আপনার কথাগুলো নিয়ে ভেবেছি। আর্থফোর্স পুরোপুরি ইলেকট্রিক্যাল অথবা ম্যাগনেটিক— এ তত্ত্ব আমি মেনে নিতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, মানুষের মনের ওপর এর প্রভাব আছে, মানুষও ইচ্ছে করলে মনের শক্তি দিয়ে আর্থফোর্সকে কাজে লাগাতে পারে। স্ট্যান্ডিং রকের কেসটা কি জানেন?'

লালুবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কোন কেসটা বলুন তো?'

'বিরাট একখণ্ড মেগালিথ পাথরে সিওক্স ইন্ডিয়ান বদ্যিরা তাদের বর্শা চেপে ধরে টেলিপ্যাথি, রোগ সারানোর ক্ষমতা আর তৃতীয় নয়নের শক্তি তীক্ষ্নতর করার জন্যে। এথেকেই কি বোঝা যায় না, মানুষ তার সাইকিক ফোর্স অথবা অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিকে সক্রিয় রাখবার জন্যে পৃথিবীর শক্তিকে ব্যবহার করে এসেছে প্রাচীনকাল থেকে। এই পৃথিবীর নানান জায়গায় এমন অনেক পাথর আছে, যা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন— রোগহর এই আশ্চর্য শক্তিরেখা বরাবর ছড়িয়ে আছে পৃথিবীময়। আমার তো মনে হয়, ভারতের একান্নপীঠের শক্তিমাহাত্ম্যের মধ্যেও রয়েছে এই আর্থফোর্স। এক এক জায়গায় এই আর্থফোর্স এমন সৃষ্টিছাড়াভাবে প্রচণ্ড যে, মানুষ সেখানে ধর্মের আখড়া বানিয়ে ফেলেছে, মন্দির-মঠ-গির্জে-মসজিদ বানিয়েছে। লালুবাবু, এই আর্থফোর্সকে ঘনীভূত আকারে প্রক্ষেপ করতে পারলে গুরুভার বস্তুকেও শূন্যে উড়িয়ে দেওয়া কি অসম্ভব কিছু? আমি যা বলতে চাইছি—'

নরেশের মুখের কথা লুফে নিয়ে বললেন লালুবাবু, 'আপনি যা বলতে চাইছেন তা আমারই মনের কথা, নরেশবাবু। বিলেতের স্টোনহেঞ্জ আর অতিকায় শিলাস্তম্ভগুলো মানুষের বাহুবলে নিশ্চয়ই খাড়া হয়নি— হয়েছে আর্থফোর্সের প্রসাদে। মিলাসেনিয়ানরা পৃথিবীর এই শক্তিকে বলে 'মন'। লেথব্রিজ লিখেছেন, ঈস্টার দ্বীপের পেল্লায় পাথরগুলোকে

খাড়া করেছে সেখানকার এক রাজা 'মন'-এর শক্তি দিয়ে। শুনলে অসম্ভব বলেই মনে হয়, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মামা-ভাগনে পাহাড়ে পাথর ভাসানোর মূলেও এই আর্থফোর্স রয়েছে। হয় তা আপনা থেকেই সক্রিয় হয়েছে, নয়তো কেউ সেই শক্তিকে আয়ত্ত করে কাজে লাগিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, সে কে? খাকিরামবাবা? না, অন্য কেউ?'

নরেশ বললে, 'আপনি যে ধাঁধায় পড়েছেন, বোধহয় আমি তার সমাধান করতে পারব।'

'পারবেন?'

'হ্যাঁ, পারব। মামা-ভাগনে পাহাড়ের রহস্য এখন অনেকগুলো। উড়ুক্কু সাপ, ভাসমান পাথর, অশরীরীর আবির্ভাব। খাকিরামবাবার হঠাৎ আবির্ভাবের পর থেকেই যখন এসব ঘটেছে, তখন আমাদের প্রথম প্রয়োজন, তিনি কে, তা আবিষ্কার করা।'

'সেইসঙ্গে আবিষ্কার করতে হবে, কেন তিনি কাউকে ওঁর ধারেকাছে আসতে দিচ্ছেন না।'

আমি বললাম, 'সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে চান না বলে কি?'

নরেশ সকাল-সন্ধে পুজো করে। ঠাকুরদেবতায় ভক্তি আছে। বললে, 'তাও যদি হয়, তা হলে জানব, এতদিনে সত্যিকারের একজন অতিমানুষ সাধুর সন্ধান পেলাম। সৎসঙ্গে স্বর্গবাসের পথ তা হলে খুলে গেল। কিন্তু মনটা তা সত্ত্বেও খচখচ করছে একটা 'কিন্তু'র জবাব না পেয়ে। এত ক্ষমতা নিয়ে খাকিরামবাবার এই জায়গায় সাধনার শখ হল কেন? হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে থাকলেই তো পারতেন?'

আমি বললাম, 'নিশ্চই আর্থফোর্সের অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন মামা-ভাগনে পাহাড়ে। মনে রেখো সেই কিংবদন্তিটা। হিমালয় থেকে পাথর নিয়ে সেতুবন্ধ করতে যাচ্ছিলেন রামচন্দ্র। হিমালয়ের সেই পাথর যখন এখানে পড়েছে, আর স্বয়ং রামচন্দ্র যে-পাথর পুষ্পকরথে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা কি আজেবাজে পাথর হতে পারে? নিশ্চয়ই এমন শক্তিসম্পন্ন পাথর ওর মধ্যে আছে, যার সন্ধান ওখানকার পুরোহিতরা বংশপরম্পরায় জানে, কাউকে খোঁজ দেয় না। খাকিরামবাবা সন্ধান পেয়েই ছুটে এসেছেন।'

নরেশ বললে, 'আমরা সব্বাই হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি, নয়তো বিরাট একটা আবিষ্কারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, এ আবিষ্কার এমন একটা আবিষ্কার, যা স্বয়ং আইনস্টাইনের আবিষ্কারকেও ম্লান করে দেওয়ার মতো হতে পারে।'

লালুবাবু বললেন, 'নরেশবাবু, আপনি কিন্তু ঠিক লেথব্রিজের মতোই কথা বলে ফেললেন।'

'কীরকম?'

'লেথব্রিজও বলেছিলেন, অতিপ্রাকৃত গবেষণা অর্থাৎ প্যারা-নরম্যাল রিসার্চে বিপ্লব আনবে তাঁর আবিষ্কার, যেরকম আইনস্টাইন এনেছেন ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে। ওঁর লেখা বইগুলো পড়লে পাঠকের মনে এই আবিষ্কারের একটা আভাস ফুটে ওঠে। মূল যে অনুভূতি মনের মধ্যে জাগে, তা এই, সব রহস্যের সমাধান রয়েছে ভাইব্রেশন রেটের মধ্যে। কম্পনের গতিবেগই সমাধান জুগিয়ে দেবে বিরাট এই বিশ্বরহস্যের। মাত্র আশি বছর

আগে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, সব বস্তুই এমন এক বস্তুকণা দিয়ে তৈরি যে বস্তুকণাকে আর ভাঙা যায় না, তাঁরা তার নাম দিলেন অ্যাটম। ১৮৯৭ সালে বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিলেন, অ্যাটমের মধ্যে থেকে ইলেকট্রন বিকিরণ করানো যায়। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন, ইলেকট্রন কোনও বস্তুকণা নয়, এনার্জির একটা ইউনিট, এক ধরনের ভাইব্রেশন। হিরোশিমায় বোমা পড়ার পর সারা দুনিয়ার নেহাত বাচ্চারাও জেনে গেছে, বস্তুমাত্রই মূলত এনার্জি দিয়ে গড়া, যা এক ধরনের ভাইব্রেশন। কিন্তু ভাইব্রেট করাচ্ছে কে? কম্পন সৃষ্টি করাচ্ছে কোন উপাদান? কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করতেন কম্পন সৃষ্টি করাচ্ছে একটা জিনিস, যার নাম আলোকময় ইথার, যা জেলির মতো একটা মাধ্যম, সারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে রয়েছে, অকাল্ট সায়ান্টিস্টদের কাছে যার নাম অ্যাসট্র্যাল লাইট বা আকাশিক ইথার। আমার মনে হয়, এই যে ভাইব্রেশন, এরই ফলে যা-কিছু ঘটছে মামা-ভাগনে পাহাড়ে। খেয়াল রাখবেন, কবি ইয়েটসের মতো প্রতিভাধরও থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মেম্বার হয়েছিলেন, আকাশিক ইথারের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন কিন্তু প্রতিটি থিয়সফিস্ট।'

নরেশ হেসে বললে, 'কোন মনীষী কী বিশ্বাস করেন, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি অতীন্দ্রিয় জগৎ আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করতে চাই বিজ্ঞানসম্মত পন্থায়। তাই একজনের কাছে নিয়ে যেতে চাই আপনাদের।'

একই সঙ্গে বলে উঠলাম আমি আর লালুবাবু, 'কার কাছে?'

নরেশ বললে, 'লোকটা ভণ্ড হতে পারে, জোচ্চোর হতে পারে, অথবা সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। তার কিছু কিছু বিভূতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু বিভূতি বা সিদ্ধাই নাকি নিম্নশ্রেণির সাধকের লক্ষ্য, অর্জন করা সহজ, রক্ষা করাই কঠিন। তাই সে এমন-একটা বস্তুর সন্ধানে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে, যা দুর্লভ এবং সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক এবং সে জিনিস কোনও সাধকের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।'

'কী? কী?' সমস্বরে বললাম আমি আর লালুবাবু।

'পরশপাথর,' এককথায় জবাব দিল নরেশ।

১০. পরশপাথরের সন্ধানী

সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালাম। লালুবাবুও নিদ্রাদেবীর আরাধনা করলেন অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে। পূর্ণিমার রাতে নৈশ নিসর্গদৃশ্য দেখে মন যতটা আপ্লুত হয়েছিল, ঠিক ততখানিই বিপর্যস্ত হয়েছিল পরবর্তী অতিপ্রাকৃত ঘটনায়। আমি ঘুমোলাম রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি কাটানোর জন্যে। আর উনি ঘুমোলেন শরীর আর মনের ওপর অশরীরীর প্রহারের ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্যে।

নমো নমো করে অফিসের কাজকর্ম চুকিয়ে বিকেল নাগাদ জিপ নিয়ে এল নরেশ। আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল লালুবাবুর বাড়িতে। উনি বাইরের ঘরে অর্থাৎ

শখের স্টুডিয়োতে ঠ্যাং ছড়িয়ে কার্পেটের ওপর বসে তিলের নাড়ু আর কড়াইশুটির কচুরি খাচ্ছিলেন। আমাদের জন্যেও এল দুটো প্লেট। আহারান্তে এবং কফি সেবনান্তে তিন মূর্তিমান জিপে করে রওনা হলাম পরশপাথর-সন্ধানীর সন্ধানে।

ভদ্রলোক উঠেছেন মসজিদ মোড়ের কাছে একটা একতলা বাড়িতে। একখানা ঘর, কল-পায়খানাসমেত ভাড়া দেওয়া হয়।

নরেশ বললে, 'উনি ভাড়া নিয়েছেন তিনমাস থাকবেন বলে।'

যেতে যেতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি ওঁর সন্ধান পেলে কী করে?'

নরেশ বললে, 'নিবিড় মৎস্যচাষের শিক্ষা নেওয়ার জন্যে বিভিন্ন ব্লক থেকে মৎস্যচাষীরা আসে আমার লেকচার শুনতে। এদের মুখে খবর পাই প্রথমে। তারপর প্রলয়বাবু, মানে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলাম। সিউড়ির রিপোর্টার বলতে পারেন ওঁকে। উনিই খবর এনে দিলেন। বললেন, বড় সাংঘাতিক লোক, স্যার, না-ঘাঁটানোই ভাল।'

আমি বললাম, 'কী অর্থে না-ঘাঁটানো ভাল জিজ্ঞেস করেছিলে?'

নরেশ বললে, 'করেছিলাম। প্রলয়বাবু গুছিয়ে ঠিক জবাব দিতে পারলেন না। বীরভূমের অনেক পীঠ তিনি দেখছেন। নলহাটি, তারাপীঠ, কঙ্কালিতলা, বক্রেশ্বরে সতীর দেহাংশের ওপর গড়ে-ওঠা মন্দিরের ধারেকাছে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করেছেন। ফি-বছর জয়দেব-কেন্দুলির বিরাট মেলায় গেছেন, যা কিনা বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা, গঙ্গাসাগরের পরেই; অনেক বাউল, অনেক ভৈরব, অনেক ভৈরবী, অনেক ফকির, অনেক পীর দেখেছেন। হিন্দু মুসলমান এই বীরভূম জেলায় একই সাধু বা ফকিরের সেবা করে এমন দৃশ্যও দেখেছেন। দেখেছেন অনেক অলৌকিক দৃশ্য, যা শুনলে বিংশ শতাব্দীর মানুষের বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দুলিচাঁদের মতো হাফ-গেরস্থ, হাফ-সন্ন্যাসী, হাফ-তান্ত্রিক, হাফ-ম্যাজিশিয়ান কখনও দেখেননি।'

লালুবাবু বললেন, 'যে-লোক অতগুলো হাফ, সে তো তা হলে কোনও ব্যাপারেই 'ফুল' নয় ধরে নিতে হবে। তা হলে আমাদের তার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? তা ছাড়া, আপনি বললেন, মামা-ভাগনে পাহাড়ে এই যে রহস্যজনক কাণ্ডকারখানা চলছে, এই লোকটা তার সুরাহা করতে পারবে বলেই আপনি আমাদের তার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। খাকিরামবাবা এইসব ভূত-ভুতুড়ে কাণ্ডের মূল হোতা কিনা, তাকে দিয়েই যাচাই করাবেন। আপনার এখনকার কথা শুনে তো চুপসে যাচ্ছি মশাই। শেষকালে কি একটা ফোর-টোয়েন্টির পাল্লায় পড়তে হবে?'

আমি বললাম, 'তা ছাড়া অতগুলো ব্যাপারে 'হাফ' হয়ে যে মহাশয় ব্যক্তিটি পরশপাথরের সন্ধান করে বেড়ায় সে আদৌ সুস্থ কিনা, আমার তো এখন সেই সন্দেহই জাগছে।'

লালুবাবু বললেন, 'শুধু তাই নয়, নরেশবাবু, দুলিচাঁদ না গুলিচাঁদ কী যেন নাম বললেন, সে যে সত্যিই এত গুণের অধিকারী, তা কি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রত্যক্ষ করেছেন?'

অল্পকথার মানুষ নরেশ বললে, 'আরে, এইসব প্রত্যক্ষ করার জন্যেই তো আমরা যাচ্ছি। লোকটার সম্বন্ধে এতকথা শুনেছি যে আমার মনে হয়, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যাবে।'

'কেন? খাকিরামবাবার পেছনে সে লাগতে যাবে কেন?'

'কারণ,' বলে একটু থেমে বলেছিল নরেশ, 'দুলিচাঁদের বিশ্বাস পরশপাথরের সন্ধান পাওয়া যাবে ওই মামা-ভাগনে পাহাড়েরই কোনও পাথরের মধ্যে।'

'আবার সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পাথরের প্রসঙ্গ কিন্তু এসে পড়েছে, যে পাথরের অস্তিত্বের কথা মন্দিরের গেঁজেল পুরুতঠাকুর আমাকে আভাসে ইঙ্গিতে বলেছিল,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, সেইজন্যেই সদলবলে দেখতে যাচ্ছি দুলিচাঁদ কী কী ক্ষমতার অধিকারী এবং মামা-ভাগনে পাহাড়েই যে পরশপাথর পাওয়া যাবে, এমন উদ্ভট ধারণা তার মাথায় এল কেন, কীভাবে, কোথা থেকে। এসে গেছি, লালুবাবু— ওই সেই বাড়ি।'

মসজিদ-মোড় থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে স্থানীয় সিনেমা হলের দিকে। একটা বড় পুকুরের গা-ঘেঁষে একতলা একটা বাড়ি। সামনে ছোট্ট উঠোন। জিপ গিয়ে দাঁড়াল মাঠের ওপর, পুকুরের গা-ঘেঁষে। বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার পথ নেই।

তখন গোধূলির ম্লান অন্ধকার ঝোপেঝাড়ে জমাট বাঁধছে। অনেকগুলো ইউক্যালিপটাস গাছ দেখলাম আশেপাশে। বাড়িটার গা-ঘেঁষেই কিন্তু বটগাছ ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝুরি নেমে এসেছে বাড়ির ছাদেও। বেশ নির্জন জায়গা। পুকুরের জল নিস্তরঙ্গ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাছ ঘাই মারছে। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, ঠিক তার উলটোদিকে ঘুরছে একঝাঁক মাছ মেঘের মতো পুঞ্জাকারে। ছোট মাছ, নামটা নরেশ বলেওছিল, ভুলে গেছি। এ-মাছেরা নাকি এইভাবেই অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ প্যাটার্নে ঘুরতে থাকে, পুকুরময় চক্কর দিতে থাকে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে এরকমই একটা মাছের ঝাঁকের দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। কলকাতার ছেলে তো, কৌতূহল বড্ড বেশি। মাছেরা কেন ঘড়ির কাঁটার উলটোদিকে ঘোরে, কোন শক্তির আকর্ষণে, তা জানতেও চেয়েছিলাম নরেশের কাছে, মৎস্যবিশেষজ্ঞ নরেশ তার জবাব দিতে পারেনি। শুধু বলেছিল, এক শ্রেণির তিমির মধ্যেও এমনি অদ্ভুত খেলা দেখা যায়। তাদের অবশ্য মুখের একদিক সাদা, আর একদিক কালো। সাদা দিকটা থাকে চক্রব্যূহের ভেতর দিকে। রোদ্দুর ঝলসে যায় সাদা অংশে। চক্রব্যূহের মাঝখানে মাছের ঝাঁক সেই ঝলকানি দেখেই বোধহয় জড়ো হয়। তিমির চক্রব্যূহ ক্রমশই ছোট হতে থাকে। তারপর একবার মাত্র মুখব্যাদান করে কপাৎ করে গিলে নেয় মাছের দঙ্গলকে। তিমিদের সেই অভ্যেসটি এই মাছেদের মধ্যে এল কী করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছি, তাড়া লাগালেন লালুবাবু।

'কি হল দীননাথবাবু, সন্ধে যে ঘনিয়ে এল, চলুন।'

হঠাৎই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। নরেশের হাত খামচে ধরে বললাম, 'দেখেছ?'

'কী বলো তো?'

'ওই মাছের ঝাঁকটা। এতক্ষণ অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ প্যাটার্নে ঘুরপাক খাচ্ছিল, এখন ঠিক উলটোদিকে হঠাৎ ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে।'

'তাই নাকি! দেখি! দেখি!' বলে মৎস্যবিশেষজ্ঞ নরেশ তীক্ষ্ণ চাহনি মেলে ধরল পুকুরের জলে।

মাছের ঝাঁকটা তখন তীরের খুব কাছে। পাড় থেকে মনে হবে যেন খানিকটা কালো মতো কী ভাসছে জলের ওপর। নরেশ আগে আমাকে এ-মাছের ঝাঁক দেখিয়েছিল বলেই আমি চিনতে পেরেছিলাম। এখন নরেশও চোখ বড় বড় করে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

বললে, 'সত্যিই তো! তুমি দেখেছিলে এদের অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট?'

'দেখেই তো দাঁড়িয়ে পড়লাম। যেই দাঁড়ালাম, অমনি আমার চোখের সামনেই ওরা উলটো ঘুরপাক আরম্ভ করল।'

নরেশের মুখ দেখে মনে হল বিমূঢ় হয়েছে। কথার সুরেও তা প্রকাশ পেল। বললে নিজের মনে, 'কিন্তু এ-মাছেদের তো স্বভাব তা নয়। এরা জন্ম থেকেই ঘুরপাক খায় অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ প্যাটার্নে— ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট তো কখনও দেখিনি।'

'নরেশ, তা হলে তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও একটু ভরাট হল বল? এ মাছের ঝাঁক কিন্তু দু'রকম মুভমেন্টেই অভ্যস্ত। আরে! আরে! এ আবার কী?'

নরেশও দেখেছিল। আবার একটা আশ্চর্য দৃশ্য! দেখে আর কোনও কথা না বলে জলের ধার পর্যন্ত গেছিল। ঘূর্ণায়মান মাছের ঝাঁকের দিকে।

নরেশের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্যেই যেন মাছের ঝাঁক সহসা ওর সামনেই ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট ত্যাগ করে আবার অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট আরম্ভ করেছে।

নরেশের মুখে আর কথা নেই। লম্বা দেহটা ঝুঁকিয়ে নিবিড় চোখে দেখছে বিস্ময়কর মাছেদের পিলে-চমকানো গতিবিধি।

লালুবাবু পেছনে এসে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। নরেশের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নতুন মাছ নাকি? আগে দেখেননি বোধহয়?'

'দূর মশায়!' মেজাজ-খিঁচড়ে-যাওয়া গলায় বললে নরেশ, 'চোখ পচে গেছে এই মাছ দেখে দেখে। রোজ ভোরে পুকুরপাড়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে দেখি এই মাছেদেরই কিন্তু আজকে হঠাৎ এদের এমন উলটোপালটা কাণ্ড শুরু হল কেন?'

ফিজিক্সে গোল্ড মেডালিস্ট লালুবাবু বললেন রসিকতার সুরে, ' দেয়ার আর মোর থিঙ্স ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ—'

ঘুরে দাঁড়াল নরেশ। বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই বললে, 'চলুন যাই দুলিচাঁদের দর্শনে। মাছ নিয়ে পরে গবেষণা করা যাবে। লালুবাবু, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা নিয়মের বাঁধনে বাঁধা। গ্রহনক্ষত্র, ধূমকেতু থেকে সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলেই ধোঁকা লাগে তো, তাই চমকে গেছি। চলুন— ও লোকটা আবার কে? আগে তো দেখিনি?'

আমরাও তাকে দেখিনি।

১১. দুলিচাঁদের ছায়া

অন্ধকার তখন আরও গাঢ় হয়েছে বটের তলায়। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বেদির ওপর অসংখ্য বটফল আর শুকনো পাতার ওপর পদ্মাসনে বসে স্থির একটি মূর্তি। দূর থেকে স্পষ্ট ঠাহর হচ্ছে না। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিটা কেবল চোখে পড়ছে। পুকুরপাড়ে যখন এসে দাঁড়িয়েছিলাম, লোকটাকে তখন দেখিনি। অথচ বটগাছের তলায় ওই বেদিটা দেখেছিলাম। বেদি শূন্য ছিল। এখন সেখানে পদ্মাসনে আসীন এই মূর্তি।

বললাম, 'আমরা যখন মৎস্যদর্শনে বিভোর, তখন এসে বসেছে নিশ্চয়। ভগবানের নামজপ করছে। চলো, চলো, দুলিচাঁদ দর্শন করি গে।'

দুলিচাঁদ দর্শনে যেতে গেলে ওই বটের পাশ দিয়েই যেতে হবে। গেলামও তাই। যেতে যেতে দেখলাম লোকটাকে। নিরীহ চেহারা। শ্যামবর্ণ। দাড়িগোঁফ কামানো। পাঞ্জাবির ওপর দিয়ে কেবল একটা রুদ্রাক্ষমালা চোখে পড়ছে। কাঁধের ওপর উড়নির মতো রাখা রয়েছে একটা নামাবলি। তাতে লেখা, হরেকৃষ্ণ হরেরাম, হরেকৃষ্ণ হরেরাম। রুদ্রাক্ষ আর হরেকৃষ্ণ হরেরামের এমন মিলন কখনও চোখে পড়েনি।

লোকটা প্যাট প্যাট করে চেয়েছিল আমাদের পানে। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যেও দেখলাম, কালো মুখের পটভূমিকায় চোখদুটো যেন বড্ড বেশি সাদা, যেন একজোড়া সাদা মার্বেল পাথরের চোখ চেয়ে আছে আমাদের পানে। আরও কাছে আসতে লক্ষ করলাম, একটা চাপা বিদ্রুপের হাসি ভাসছে লোকটার চামচিকের মতো শুকনো ঠোঁটে। মাছ নিয়ে আমাদের বিস্ময়কে লক্ষ করেই বোধহয় শহুরে-বিস্ময়কে ব্যঙ্গ করছে।

ভুরু কুঁচকে বললাম, 'দুলিচাঁদবাবু এই বাড়িতেই থাকেন তো?'

লোকটা মুখে কোনও জবাব দিল না। শুধু মাথা নেড়ে চোখের ইঙ্গিতে সায় দিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিল। সাক্ষাৎ মৌনী বাবারে! গা-পিত্তি জ্বলে যায়!

তিনজনে গিয়ে দাঁড়ালাম দরজার সামনে। একটামাত্র জানলা উঠোনের দিকে, বন্ধ। পুকুরের দিকের জানলাও বন্ধ। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কে যেন বললে, 'ভেতরে আসা হোক। সুস্বাগতম।'

থতমত খেয়ে গেলাম। দুলিচাঁদ হাফগেরস্ত, হাফসন্ন্যাসী ইত্যাদি শুনে এসেছিলাম। কিন্তু তার বাড়িতে নারীকণ্ঠ তো আশা করিনি।

অস্পষ্ট হাসির আওয়াজ ভেসে এল ভেতর থেকে। মেয়েলি গলায় হাসি। নারীকণ্ঠ ফের বললে, 'আমার গলার স্বরটা ওইরকম। পুরুষ কি নারী, ভেতরে এলেই বোঝা যাবে।'

বলব কি, পা দুটো যেন স্ক্রুপ-আঁটা হয়ে গেল সেইখানেই। খোদ প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও হাজার চমকপ্রদ অভিযানে নিয়ে গিয়েও আমাকে এইরকম চমকিত করতে পারেননি। কুলকুল করে ঘেমেও গেলাম বোধহয়। ব্যাপার কী! আমি মনে যা ভেবেছি, বন্ধ দরজার ওপারে ঘরের মধ্যে বসে থেকে নারীকণ্ঠের অধিকারী ঠিক তার জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

আমি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়েছি দেখে এবং আমার মুখাবয়ব অবলোকন

করে নরেশ আর লালুবাবুও দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনজনে দাঁড়িয়ে রইলাম পটে আঁকা তিনটে ছবির মতন।

ভেতর থেকে আবার বামাকণ্ঠ ভেসে এল, 'এত অবাক হওয়ার কি আছে নাটবল্টু চক্রের চ্যালা মশায়ের? গোল্ড মেডেলিস্ট লালুবাবুও কি ফিজিক্সের জ্ঞান দিয়ে থই পাচ্ছেন না? মৎস্যবিজ্ঞানী নরেশবাবু কি দিশেহারা হলেন মৎস্যকুলের পাগলামি দেখে? মশাইরা, অনেক কিছুই এখনও আছে এই পৃথিবীতে, আমিই তার জ্যান্ত প্রমাণ! আসা হোক ভেতরে, আসা হোক। শুরুতেই এত ভড়কে গেলে চলবে ক্যামনে? এই তো কলির সন্ধে!'

প্রচ্ছন্ন টিটকিরির জন্যেই বোধহয় আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠলাম। দরজায় ঠেলা দিলাম। তৈলহীন কবজার ওপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠে ঘুরে গেল পাল্লা। ভেতরে দেখলাম, একটা তক্তপোশ। একটা কাচের চিমনি দেওয়া ল্যাম্প। আর, পদ্মাসনে আসীন এক পুরুষ মূর্তি। ল্যাম্পের আলো বাঁদিক থেকে পড়েছে তার মুখে। তাতেই যা দেখলাম, তা পিলে চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সবেগে পেছনে ফিরলাম আমি। শুধু আমি নই, নরেশ আর লালুবাবুও। তিনজনেই প্রায় সমান ঢ্যাঙা। তিনজনেই খোলা দরজা পথে একইসঙ্গে দেখেছি তক্তপোশে আসীন একই মূর্তিকে। তাই একইসঙ্গে তিনজনেই পেছনে ফিরে তাকালাম বটগাছের তলায় পদ্মাসনে আসীন মূর্তিটার দিকে।

আমরা কি পাগল হয়ে গেলাম? নাকি সম্মোহনের ফাঁদে পড়ে অসম্ভব দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করছি চর্মচক্ষু দিয়ে? একী দেখছি তিনজনে! তিনজনেই যে দেখছি একই দৃশ্য, একই অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

বটের তলায় পদ্মাসনে বসে রয়েছে সেই পুরুষমূর্তিটা। ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশেও তার সাদা পাঞ্জাবিটার আদল দেখা যাচ্ছে। ওই আদলটুকুই যথেষ্ট। ওই আদল দেখেই স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে এই সেই মূর্তি যে বসে রয়েছে আমাদের পেছনে ঘরের মধ্যে তক্তপোশের ওপর পদ্মাসনে।

হতভম্বভাবে আবার পেছনে ফিরলাম। পদ্মাসনে আসীন তক্তপোশের মূর্তিটার চামচিকে ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি, ঠিক যে-হাসি আসবার সময়ে বটের তলায় বসে থাকা মূর্তির চামচিকে-ঠোঁটে দেখে এসেছি। একইরকমের হরেকৃষ্ণ হরেরাম উড়নি রয়েছে কাঁধের ওপর। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। একই মূর্তি বসে দু' জায়গায়। কাঁধের ওপর মুণ্ডু ঘুরিয়ে ফের দেখলাম। আবার সামনে তাকালাম। ঘরে আর বাইরে বসে একই মূর্তি।

তা হলে কি যমজ ভাই?

ঘরের ভেতরে থেকে নারীকণ্ঠে বললে পুরুষমূর্তি, 'আজ্ঞে না, আমার তিনকুলে কেউ নেই। যমজ ভাই তো নেই-ই।'

'তবে ও কে?' এতক্ষণে একটা কথা বলতে পারলাম। নিজের গলা নিজেরই চিনতে কষ্ট হল। ব্যাঙের ডাকের মতো কণ্ঠস্বর হয়েছে ভয়ের চোটে, বিস্ময়ের ধমকে। স্বরযন্ত্র বিকল হতে বসেছে অসম্ভব এই দৃশ্য দেখে।

ঘরের মধ্যে থেকে বললে নারীকণ্ঠ, 'আর এক দুলিচাঁদ।'

'মানে?'

'দুলিচাঁদের ছায়া। একইসঙ্গে দু' জায়গায় থাকবার ক্ষমতা আছে বইকী দুলিচাঁদের।'

'আসলে দুলিচাঁদ তা হলে কে?'

'এই আমি, যে এখন ঘরের মধ্যে বসে। বাইরে বসে আমার ছায়া, আমার সূক্ষ্মদেহী প্রতিবিম্ব ইথার দিয়ে গড়া। এই তাকে ফিরিয়ে আনলাম নিজের মধ্যে। বড্ড চমকে গেছেন দেখছি, হার্টফেল না হয়। নিন, এবার পেছনে ফিরে দেখে নিন বটের তলায় নকল দুলিচাঁদ আছে কিনা।'

পেছনে ফিরলাম। বটের তলা শূন্য। মূর্তিটা নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়েছে। সামনে তাকালাম। দুলিচাঁদ কি স্বয়ং অশরীরী? শরীরী প্রেত? কায়াহীনের কায়া পরিগ্রহ?

এবার চামচিকে ঠোঁটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পান-খাওয়া গজাল দাঁতের সারি। আহা কী বাহার! ফাঁক ফাঁক দাঁতের সারিতে কালচে মেরে গেছে এক-একটা দাঁত। গজাল দাঁতের অপরূপ শোভা দেখিয়ে দুলিচাঁদ নামধারী অদ্ভুত ব্যক্তি বললে, 'অশরীরী হতে যাব কোন দুঃখে? জলজ্যান্ত মানুষকে ভূত বলাটা কি ঠিক? ছিঃ! দীননাথবাবু, ছিঃ! খুবই অপমানিত বোধ করছি কিন্তু।' যদিও অপমানের লেশমাত্র স্পষ্ট হল না লোকটার কুৎসিত মুখচ্ছবিতে।

কাঁহাতক আর এই দৃশ্য, এত বচনমালা সহ্য করা যায়। থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের মতো তিনজনে মার্চ করে প্রবেশ করলাম ভেতরে। বলা বাহুল্য, গা-ছমছম করছিল পরের পর এতগুলো বিটকেল ব্যাপার দেখে এবং শুনে। তাই জোর করে দাপিয়ে ঘরে ঢুকলাম সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই।

দুলিচাঁদ নামধারী শরীরী প্রহেলিকা তক্তপোশের অপরদিক দেখিয়ে বললে, 'বসতে আজ্ঞা হোক। অধমের আজ কি সুদিন, এতগুলো স্বনামধন্য মানুষের একসঙ্গে আবির্ভাব ঘটেছে দীনের কুটিরে! বসতে আজ্ঞা হোক!'

বিদ্রুপ যেন ঝরে ঝরে পড়ল প্রতিটি শব্দ থেকে। অন্য সময় হলে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিতাম, মুখের মতো জবাব দিয়ে দিতাম, কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা এমনই শোচনীয় যে দুলিচাঁদ উঠে এসে দু' কান মলে দিলেও প্রতিবাদ করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

গজাল-দাঁত বের করে দুলিচাঁদ পর্যায়ক্রমে চোখ বুলিয়ে গেল আমাদের ওপর। তিনজনেই তখন কাঠের পুতুলের মতো বসে। মানুষ মুখে যতই বড়াই করুক না কেন, এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে, যখন তার দর্পচূর্ণ হবেই। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছে, অহংকার সর্বনাশা। আমাদের সেই অহংকার যে এমনভাবে ধূলিসাৎ হবে কদাকার ওই লোকটার উপর্যুপরি চমক সৃষ্টিতে, তা যদি আগে আঁচ করতে পারতাম, তা হলে কি আর এ-তল্লাট মাড়াই?

দুলিচাঁদ ঘরের মধ্যে বসে থেকেই পরের-পর প্রমাণ দিয়ে গেল তার বিভূতির, অলৌকিক ক্ষমতার। আমরা তাই সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না।

দুলিচাঁদ দাঁত বের করেই ছিল। একেবারেই চাষাভুষো টাইপের চেহারা। হাটেগঞ্জে, রাস্তাঘাটে, ট্রেনেবাসে এ-মূর্তি দেখলে ফিরেও তাকাতাম না, তাচ্ছিল্য করতাম। কিন্তু সেদিন সেই পরমাশ্চর্য সন্ধ্যায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলাম তার দিকে।

দুলিচাঁদ আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে নেওয়ার পর বললে অবিকল মেয়েলি গলায়, 'কেমন, বিশ্বাস হল তো? হাফ-গেরস্ত, হাফ-সন্ন্যাসী, হাফ-ম্যাজিশিয়ান, হাফ-তান্ত্রিক হয়েও 'ফুল' হতে পেরেছি তো?'

লালুবাবু হাতজোড় করে বললেন, 'ঘাট মানছি, দুলিচাঁদবাবু। আমরা তিনজনেই একটু আধটু বিজ্ঞানচর্চা করি তো, তাই প্রথম প্রথম সবাইকেই সন্দেহের চোখে দেখি। অপরাধ নেবেন না।'

'না, না, অপরাধ নেব কেন। অপরাধ তো আপনারা করেননি। শুধু অবিশ্বাস করেছিলেন, তাই চোখ ফুটিয়ে দিলাম।' দুলিচাঁদ যেন বিলক্ষণ খুশি হল লালুবাবুর মতো স্বর্ণপদকধারী হাতজোড় করায়।

হাতজোড় করেই লালুবাবু বললেন, 'তা হলে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে,' উদার ভঙ্গিমায় বরাভয় দিল দুলিচাঁদ।

'এত অল্প সময়ের মধ্যে এতবার চমকে দিয়েছেন যে ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই ধাতস্থ হতে চাই।'

'আরে বাবা, কী জানতে চান, আমি তা জানি। আপনার প্রথম প্রশ্ন হল, পুকুরে মাছগুলো স্বভাবধর্ম ছেড়ে হঠাৎ উলটোদিকে ঘুরতে লাগল কেন? এই তো?'

'আজ্ঞে,' লালুবাবু যেন বিনয়ের অবতার।

'থট প্রেসার কাকে বলে জানা আছে?'

'আজ্ঞে?'

'থট প্রেসার... থট প্রেসার... চিন্তা দিয়ে চাপসৃষ্টি।'

১২. আশ্চর্য শক্তি সাইকোমেট্রি

স্পষ্ট দেখলাম, ঢোক গিললেন লালুবাবু। গোল্ড মেডেলিস্টের ঢোক গেলা দেখতে মন্দ লাগল না। থট প্রেসার কাকে বলে কস্মিনকালেও শুনিনি। কিন্তু শব্দের মানেটা দিয়ে আন্দাজ করা গেল, দুলিচাঁদ চিন্তা প্রক্ষেপ করতে পারে, চিন্তার সেই প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে মৎস্যবাহিনীকে উলটোদিকে। কিন্তু চিন্তাশক্তির এতটা প্রচণ্ডতা সম্ভব হল কী করে, এই কৌতূহলটা যেই আমার মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হল অমনি জবাবটা দিয়ে দিল দুলিচাঁদ আমার মুখে প্রশ্নটা বাঙ্ময় হয়ে ওঠার আগেই।

বললে, 'দীননাথবাবু, লালুবাবু যখন আপনাদের আর্থ ফোর্সের কথা বলছিলেন, আপনারা তো পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। ঠিক কিনা?'

এবার ঢোক গেলবার পালা আমার। কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। কিন্তু এই অন্তর্যামী লোকটা যখন তা জেনেই ফেলেছে, চুপ করে থাকাই মঙ্গল।

দুলিচাঁদ বললে, 'পৃথিবীর এই শক্তিকে সভ্য মানুষ যদি কাজে লাগানোর কৌশল রপ্ত করত, তা হলে এই পৃথিবীটা আজ অন্য চেহারা নিতে। ঠাকুরের দয়ায় আমি এই শক্তির

যৎসামান্য নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে প্রয়োগ করি। চিন্তার চাপকে প্রচণ্ড করে তুলে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারি।'

'সাইকোকাইনেসিস,' একটিমাত্র শব্দ ধীর গম্ভীর স্বরে এতক্ষণে উচ্চারণ করল নরেশ। আর কোনও কথা নয়। চকিতে তার পানে তাকিয়ে দুলিচাঁদ বললে, 'জানা আছে তা হলে?'

'আছে,' নরেশ যে এতক্ষণ ধাতস্থ হয়েছে, তা ওর পরবর্তী কথাগুলো শুনেই মালুম হল। 'সাইকোকাইনেসিস নিয়ে ১৯৭৩ সালে ইজরাইলের মানুষ উরি গেলার প্রথম সাড়া ফেলে পৃথিবীতে। আঙুল বুলিয়ে চামচ বেঁকিয়ে দিত, ঘড়ির ডায়ালের ওপর হাত মুঠো করে ধরে কাঁটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিত, কম্পাসের কাঁটা পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিয়েছে স্ট্যানফোর্ডে পরীক্ষকদের সামনে। বৈজ্ঞানিকরা তাকে পরীক্ষা করে বলেছেন, উরি গেলার আর যাই হোক, জোচ্চোর নয়।'

'বাঃ, বাঃ! এই তো অনেক খবর রাখেন দেখছি, নরেশবাবু। ঘড়ির কাঁটা যখন হাত মুঠো করে ধরে ঘোরানো যায় উলটো দিকে, ঘরে বসে মাছের দঙ্গলকে উলটো দিকে পাক খাওয়ানো যাবে না কেন?' মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললে দুলিচাঁদ।

নরেশের মুখের আগল এবার খুলে গেছে। বললে, 'কিন্তু উরি গেলারের শক্তির উৎসটা যে আর্থফোর্স, সেটা জানা ছিল না— এবার জানলাম।'

দেখা গেল, বেশ খুশি হয়েছে দুলিচাঁদ। খোশামোদে শুকনো চিঁড়ে পর্যন্ত ভিজে সপসপে হয়ে যায়, আর এ তো হাফ সন্ন্যাসী দুলিচাঁদ। খুশি খুশি মুখে বললে, 'হ্যাঁ এই আর্থফোর্সই যে তার শক্তির মূলে, তা সে নিজেই জানত কিনা সন্দেহ। তাই নিজের মুখেই স্বীকার করেছে, তার শক্তি আদৌ খাটবে কিনা, সে গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ শক্তিটাকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেনি উরি গেলার। সব ম্যাজিকই কিন্তু ইচ্ছাশক্তির খুশিমতো নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে। এই অধম সেদিক দিয়ে উরি গেলারের ওপর যায়— খুশিমতো আর্থফোর্সকে আকর্ষণ করে অসাধ্যসাধন করতে পারি। দেখবেন আর একটা চাক্ষুষ প্রমাণ?'

বলেই, আমাদের সম্মতি বা অসম্মতির তোয়াক্কা না রেখে ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে ধরল দুলিচাঁদ। তর্জনী নির্দেশ করল ল্যাম্পটার দিকে। যেন আঙুল তুলে দেখাচ্ছে ল্যাম্পকে। কী দেখাচ্ছে তা দেখবার জন্যে তিনজনেই একযোগে তাকালাম ল্যাম্পের দিকে। প্রথমটা কিছু টের পেলাম না। বন্ধ ঘরে নিষ্কম্প রয়েছে শিখা। একটুও দুলছে না, একটুও কাঁপছে না। তারপরই দেখলাম, শিখা কাঁপছে। যেন একটা মৃদু বাতাসের ধাক্কায় হেলে পড়েছে উলটোদিকে। ঠিক যেন ফুঁ দিয়ে শিখা নিভিয়ে দিচ্ছে কেউ। শিখা যখন নিভু নিভু তখন সবিস্ময়ে চোখ ফিরিয়েছিলাম দুলিচাঁদের দিকে।

দেখলাম, তার সাদা মার্বেলের মতো চোখদুটো পাথরের মতো শক্ত হয়ে রয়েছে। আর দেখলাম একটা আশ্চর্য দৃশ্য!

তর্জনীর ডগা দিয়ে কমলারঙের জ্যোতিঃপুঞ্জ যেন প্রবাহের আকারে, তরঙ্গের আকারে ধেয়ে যাচ্ছে হেলে পড়া শিখাটার দিকে।

অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল দুলিচাঁদের। মিলিয়ে গেল তর্জনী থেকে ঠিকরে আসা জ্যোতির প্রবাহ। ফিরে দেখলাম, ল্যাম্পের শিখা আবার সিধে হয়ে গেছে। হাসল দুলিচাঁদ, 'বিশ্বাস হল?'

শুকনো গলায় বললাম, 'কিন্তু আঙুলের ডগা দিয়ে ওটা কী বেরোচ্ছিল?'

'ভাগ্যবান আপনি, সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে বলেই দেখতে পেলেন, নইলে সবাই দেখতে পায় না। আশ্চর্য এই বিকিরণের নাম দেওয়া হয়েছে অডিক ফোর্স, নামটা বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক ব্যারন কার্ল ফন রাইকেনবাকের, প্যারাফিন যাঁর অন্যতম আবিষ্কার। ইনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, ক্রিস্টাল আর ম্যাগনেটের মধ্যে থেকে অদ্ভুত একটা বিকিরণ বেরোয়, যা দেখতে পায় শুধু তারাই, যাদের অনুভূতি অতিশয় তীক্ষ্ণ। এই নিয়ে হাজার হাজার এক্সপেরিমেন্ট করে রাইকেনবাক জেনেছিলেন ম্যাগনেটের নর্থ পোল দিয়ে বেরোয় ব্লু লাইট, সাউথ পোল দিয়ে ইয়োলো লাইট। শুধু তাই নয়, রাইকেনবাকই প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করে জানালেন মানুষের শরীর থেকেও বেরোয় একরকমের রঙিন বিকিরণ, যেমন আঙুলের ডগা দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোর ধারা দেখতে পায় তারাই, যাদের অতি-অনুভূতি বোধ আছে। এরই নাম অডিক ফোর্স।' দুলিচাঁদ থামল।

নরেশ বললে, 'বিকিরণটা তা হলে কী?'

দুলিচাঁদ বললে, 'আমেরিকার প্রফেসর জেমস রোডস বুকানানা এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। অনেক এক্সপেরিমেন্টের পর ইনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মানুষের স্নায়ু থেকে এক ধরনের কারেন্ট বেরোয়। উনি তার নাম দিয়েছিলেন নার্ভ-অরা— যা নাকি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। আমি এই অডিক ফোর্স, নার্ভ অরা, বা লাইফ ফোর্সকে আর্থফোর্স দিয়ে আরও তীব্র করে তুলতে পারি, যা এই পৃথিবীতে এই মুহূর্তে আর কেউ পারে না।'

'সাইকোমেট্রি', আবার একটামাত্র শব্দ ধীরগম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করে চুপ মেরে গেল নরেশ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাইকোমেট্রি— নামটা যে প্রফেসর বুকানানার দেওয়া সেটা বোধহয় নরেশবাবুর জানা নেই?' মনে হল নরেশ তার পাণ্ডিত্য দেখিয়ে একটু ক্ষুব্ধ করে ফেলেছে দুলিচাঁদকে, 'সাইকোমেট্রি কিন্তু শুধু আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে অনেক খবর বলে দেওয়ার বিজ্ঞান— যা আমার মধ্যেও আছে, প্রমাণ এর আগেই দিয়েছি।'

'দিয়েছেন?' লালুবাবুর প্রশ্ন।

'দিয়েছি বইকী। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন তো সেইটাই, জীবনে আপনাদের দেখিনি, অথচ প্রত্যেকের সম্বন্ধে এত খবর জানলাম কী করে? আপনাদের নিজেদের মধ্যে যা যা আলোচনা হয়েছে, তাই বা বলে গেলাম কী করে? এই তো আপনার প্রশ্ন?'

আমতা আমতা করে লালুবাবু বললেন, 'তা হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।'

'কী করে জানলাম জানেন?' বলতে বলতে পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা খবরের কাগজ বের করে তক্তপোশের ওপর মেলে ধরল দুলিচাঁদ। ছোট সাইজের কাগজ। ডিমাই সাইজ নিউজপ্রিন্ট দু' ভাঁজ করা। ওপরে ছাপা কাগজের নাম 'বীরভূম সন্দেশ'। ফ্রন্ট পেজে একটা ছবি।

ছবিটা দেখিয়ে দুলিচাঁদ বললে, 'চিনতে পারেন নরেশবাবু?'

নরেশ বললে, 'আমার ছবি। মিনিস্টারের সঙ্গে মৎস্যচাষি সম্মেলনে তোলা হয়েছিল।' দুলিচাঁদ বললে, 'দৈবাৎ কাগজটা আমার হাতে আসে। ছবিতে আঙুল ঠেকিয়েছিলাম নিছক কৌতূহল মেটাতে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়হুড় করে খবর আসতে লাগল ব্রেনের মধ্যে। মনের চোখে দেখলাম আপনার সাম্প্রতিক চিন্তার ছবি, যাঁদের সঙ্গে এখানে আসবার পরামর্শ করছেন তাঁদের ছবি, এমনকী, কী কথা বলেছেন নিজেদের, সব জেনে ফেললাম। এরই নাম সাইকোমেট্রি।'

নরেশের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল এই কথা শুনে। হঠাৎ প্যান্টের পকেটে হাত পুরে একটা কাগজের পুরিয়া বের করে দুলিচাঁদের হাতে দিয়ে বললে, 'আজকে এক জায়গায় সয়েল টেস্ট হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টাকায় সেখানে মাছের চাষ করা যায় কিনা জানার জন্যে। মাটির নমুনা কলকাতায় গেছে রিপোর্টের জন্যে। একই নমুনা এখন আপনার হাতে। আপনাকে পরখ করছি, দয়া করে তা মনে করবেন না। কিন্তু যদি এই মুহূর্তে বলে দেন মাটির মধ্যে কী কী আছে তা হলে আমার বড় উপকার হয়। কালকেই রিপোর্ট লিখে ফেলব। হাতে সময় কম, কলকাতার রিপোর্ট আসতে হপ্তা ঘুরে যাবে। করবেন এই উপকারটা?'

আন্তরিক সুরেই বলল নরেশ। ও যে যাচাই করার জন্যে রিপোর্ট চাইছে না, তা মুখ আর বলার ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল। তা ছাড়া এই অন্তর্যামী লোকটার কাছে কিছু গোপন করাও তো মূর্খতা। শিশুর মতো সরলভাবে দুলিচাঁদ বললে, 'কেন করব না? কিন্তু মুখে বলে দিলে কি মনে থাকবে? দিন একটা কাগজ, লিখে দিচ্ছি।'

নরেশই সাত তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটুকরো কাগজ আর কলম বের করে এগিয়ে দিল দুলিচাঁদের দিকে। দুলিচাঁদ মাটির ডেলাটা একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে কলম চেপে চেপে লিখে দিল মাটির উপাদান। কাগজটা তুলে নিয়ে চোখ বুলালো নরেশ। খুশি গলায় বললে, 'আঃ! বাঁচালেন। বীরভূমে বড্ড মাছের আকাল। এবার লোকে মাছ খেয়ে বাঁচবে। মাছের চাষ ভালই হবে এই মাটিতে।'

দুলিচাঁদ ভারী খুশি হল নরেশের কথায়। মানুষের উপকার করার মধ্যে একটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি আছে। উপকারটা আসলে নিজেরই হয় পরোপকারের মধ্যে দিয়ে। দুলিচাঁদের মুখে ফুটে উঠতে দেখলাম সেই তীব্র খুশির ছবি।

বললে হৃষ্টকণ্ঠে, 'যাক, সাইকোকাইনেসিস গেল, সাইকোমেট্রিও শেষ হল। লালুবাবু, যে-প্রশ্নটা আপনার জিভের ডগায় নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, তা এই, দু' নম্বরি দুলিচাঁদকে তৈরি করলাম কী করে? ঠিক কিনা?'

'আপনি অন্তর্যামী', প্রায় গদগদ স্বরে বললেন লালুবাবু।

'ইথিরিক ডাবল কাকে বলে, আপনি তো তা জানেন লালুবাবু, তবে এ প্রশ্ন কেন?'

'মানে... কী জানেন... মানুষের সূক্ষ্মদেহ একই মুহূর্তে অন্য এক জায়গায় আবির্ভূত হতে পারে, তা জানি, যেমন, যোগী শ্যামাচরণের মূর্তিকে দেখেছিলেন বিলেতের মেমসাহেব অসুস্থ অবস্থায় বিছানার পাশে। শ্যামাচরণ স্বইচ্ছায় ধ্যানস্থ হয়ে সূক্ষ্মদেহে বিলেতে গিয়ে

মেমসাহেবের খবর এনে সাহেবকে বলেছিলেন। সাহেব তখন বিশ্বাস করেননি। কিন্তু সুস্থ হয়ে মেমসাহেব এদেশে এসে যোগী শ্যামাচরণকে দেখে চমকে উঠে বলেছিলেন, এই সাধুকেই তো দেখেছিলাম কিছুদিন আগে বিছানার পাশে। দুলিচাঁদবাবু, সূক্ষ্মদেহকে বিলেত পাঠাতে কিন্তু ধ্যানস্থ হতে হয়েছিল যোগী শ্যামাচরণকে। আমাদের টিটকিরি দেওয়ার জন্যে আপনার সূক্ষ্মদেহকে বটের তলায় কী করে বসিয়ে রেখেছিলেন, এই রহস্যটাই তো বুঝতে পারছি না।'

গজালের মতো দাঁত বের করে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল দুলিচাঁদ, হাসতে হাসতে বললে, 'বাবুর আবার রাগ হয়েছে টিটকিরি দিয়েছি বলে। কী করব বলুন, অবিশ্বাসীদের নিয়ে একটু মজা করতে কার না ইচ্ছে যায়। আসলে কি জানেন, আর্থ-ফোর্সকে আকর্ষণ করতে পারি বলে, আমার শক্তি যোগী শ্যামাচরণের চেয়েও অনেক বেশি। আমি আমার চিন্তার চেহারাকেও আপনাদের সামনে এখুনি ফুটিয়ে তুলতে পারি, অকাল্ট সায়েন্টিস্টরা যাকে বলেন 'থট ফর্ম'। এতখানি যে করতে পারে, সে নিজের সূক্ষ্ম চেহারাটাকে যেখানে খুশি বসিয়ে রেখে হাসিঠাট্টা করতে পারবে না? দেখবেন আমি পায়ের মধ্যে দিয়ে আর্থ-ফোর্স টেনে নিয়ে আমার সূক্ষ্ম দেহের স্তরগুলোকে কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারি?'

বলতে বলতে তক্তপোশ থেকে মেঝেতে নেমে এল দুলিচাঁদ। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট কয়েক। চোখ আবার শক্ত হয়ে গেল পাথরের চোখের মতো। আচমকা দেখলাম, সাদা কুয়াশার মতো জ্যোতি স্তরে স্তরে জমে উঠেছে দুলিচাঁদের দেহ ঘিরে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিচিত্র আলোকময় স্পষ্ট তিনটে স্তর। প্রথম স্তরটা যেন গায়ে লেপটে রয়েছে, যেন খুব মিহি কোনও উপাদান দিয়ে তৈরি। বাকি দুটো স্তর শরীর থেকে ফুটখানেক পর্যন্ত ঠেলে রয়েছে। আস্তে আস্তে কেটে গেল দুলিচাঁদের চোখের শক্ত ভাব। মিলিয়ে গেল জ্যোতিঃপুঞ্জ। তক্তপোশে এসে বসল। বলল, 'আমার নিজের শক্তি ধার দিয়েছিলাম আপনাদের, তাই দেখতে পেলেন এই জিনিস, নইলে পেতেন না।'

কাষ্ঠহেসে লালুবাবু বললেন, 'সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি।'

কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুলিচাঁদ বললে, 'লন্ডনের সেন্ট টমাস হসপিটালের ডাক্তার ওয়াল্টার কিল্‌নার কিন্তু রাইকেনবাক আর বুকানানা বর্ণিত নার্ভ-অরা বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেখতে চেয়েছিলেন রুগির রোগ সঠিকভাবে ধরে চিকিৎসা করার জন্যে। দুটো কাচের প্লেটের মধ্যে ডাইসায়ানিন রঞ্জক রেখে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেখেছিলেন, নরদেহ যেন এনার্জি দিয়ে মোড়া রয়েছে। তিনটে স্তরও তিনি স্পষ্ট দেখেছিলেন। ১৯১১ সালে 'হিউম্যান অ্যাটমসফিয়ার' বইতে তিনি সব লিখেও গিয়েছিলেন, কিন্তু মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি, সর্বসাধারণকে এনার্জির এই স্তর দেখানোর পন্থা আবিষ্কার করে যেতে পারেননি। যদিও ১৯৩০ সালে বার আর নরথর্প নামে দুই বৈজ্ঞানিক একটা প্রবন্ধে লিখে গিয়েছিলেন, প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী এক ধরনের ম্যাগনেটিক বা ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডে আবদ্ধ। এই কারণেই ব্যাঙের পায়ে অনেকরকমের ইলেকট্রিক্যাল ফোর্সের লাইন পাওয়া যায়। বার একেই বলেছিলেন এল-ফিল্ড; এল অর্থে লাইফ। ওঁর আবিষ্কার করা মেশিনে এই ফিল্ডের বা জ্যোতির ছবি ওঠেনি ঠিকই, আপনি গতকাল আপনার স্ত্রীকে উইমসহার্স্ট মেশিনের কথা বলেছিলেন মনে আছে।'

থতমত খেয়ে লালুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভূত তাড়ানোর জন্যে নিয়ে যাব বলেছিলাম।'

দুলিচাঁদ বললে, 'এই যে তিনটি স্তর এখুনি দেখালাম আমার দেহ ঘিরে রয়েছে, এই তিনটে স্তরকেই অদৃশ্য করে দেওয়া যায় উইম্‌স্‌হার্স্ট মেশিনের নেগেটিভ কারেন্ট দিয়ে, মেশিন সরিয়ে নিলেই ফের আবির্ভূত হয় দ্বিগুণ তেজে। বিদেহীদের সূক্ষ্মদেহ এই কারণেই উইম্‌স্‌হার্স্ট মেশিনের ইলেকট্রিক চার্জ সইতে পারে না। ম্যাগনেট দিয়েই এই সূক্ষ্মদেহের ওপর প্রভাব ফেলা যায়। মেসমেরিজম্‌-এর গুরু মেসমার সাহেব একেই 'অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম', বলেছেন এবং ম্যাগনেট বুলিয়ে রুগির রোগ পর্যন্ত ভাল করে দিতেন।'

দুলিচাঁদের পাণ্ডিত্য দেখে এতক্ষণ বাক্‌রহিত হয়ে বসেছিলাম আমি। এবার কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'এইটুকু বুঝলাম এতক্ষণে যে, আর্থ-ফোর্সের দৌলতে আর আপনার সাধনা এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে আপনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। বুঝলাম না শুধু একটা ব্যাপার।'

সঙ্গে সঙ্গে বললে দুলিচাঁদ, 'পরশপাথর খুঁজে মরছি কেন, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

চোখের পাতা না ফেলে অনেকক্ষণ সাদা পাথরের মতো চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে রইল দুলিচাঁদ। এতক্ষণ যে লোকটা শিশুর মতো প্রগলভ আর মহাপণ্ডিতের মতো পাণ্ডিত্যের ফুলকিবর্ষণ করে চলেছিল, 'পরশপাথর' শব্দটা উচ্চারণ করেই সে যেন নিমেষমধ্যে আর-এক মানুষ হয়ে গেল। মৌন, গম্ভীর, অন্যমনস্ক।

আমিও চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে রইলাম তাঁর চোখের দিকে। এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্যে, এই হেঁয়ালির সমাধান করার জন্যে, সদলবলে এসেছি আমরা। এখন এসেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ!

আমার চোখের মধ্যে দিয়ে মনের ভেতর পর্যন্ত যেন দেখে নিয়ে নারীকণ্ঠে সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষের স্বরে বললে দুলিচাঁদ, 'কারণ, বহু জন্ম ধরে আমি খুঁজছি এই পাথর।'

আমরা তিনজনেই একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম দুলিচাঁদ নামক অত্যাশ্চর্য পুরুষটির দিকে। চোখের পাতা ফেলতেও যেন ভুলে গেলাম। বহু জন্ম ধরে পাথর খোঁজার মানে কী হতে পারে, এই নিয়েই তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গেল মাথার মধ্যে। সন্ধের পর থেকে যেসব ভেলকি দেখিয়ে চলেছে লোকটা, তার পরিপ্রেক্ষিতেই মনে হল, বহু জন্ম ধরে পাথর খোঁজার পেছনে আরও একটা ভয়ানক চমক আছে। চমকের পর চমক খেয়ে নার্ভ তখন এমনই হেদিয়ে পড়েছে যে, আবার একটা চমকের সম্ভাবনায় যেমন শঙ্কিত হলাম, ঠিক তেমনি কৌতূহলটা কীভাবে প্রকাশ করা যায়, ভাবতে ভাবতেই গেল কয়েকটি মিনিট।

দুলিচাঁদ একদৃষ্টে চেয়ে রইল ল্যাম্পটার দিকে। যেন আরেক মানুষ। রহস্যপ্রিয় মানুষটা যেন অকস্মাৎ বড় বেশি সিরিয়াস হয়ে গেছে। কৌতূহল প্রকাশ কি সমীচীন হবে এই মুহূর্তে?

'কেন হবে না?' বললে দুলিচাঁদ।

আহারে। দুলিচাঁদের মতন যদি সবার মনের কথা টের পাওয়ার বিদ্যেটা রপ্ত করতে

পারতাম, খেল দেখিয়ে দেওয়া যেত ম্যাজিকদুনিয়ায়। এ ম্যাজিক তখন গা-সওয়া হয়ে গেছে বলে আর চমকালাম না।

বললাম, 'তা হলে বলুন আপনি কে?'

'আমি কে?' প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল দুলিচাঁদ, অথবা যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করল। জিজ্ঞেস করার পর আবার ল্যাম্পের দিকে উদাস চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বললে, 'এই যেসব ক্ষমতা আমি অর্জন করেছি, এসব কিছু না, সমস্ত দিয়ে দিতে পারি, পরশপাথরের বিনিময়ে।'

আমি আর কথা বললাম না। প্রতীক্ষায় রইলাম দুলিচাঁদের মুখে ওর প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্যে।

দুলিচাঁদ ফের বললে, 'আমি কে, আপনি জানতে চাইছেন। আমি জানি আমি কে। শুধু কে বললে কম বলা হবে; আমি জানি আমি কারা ছিলাম। এই আমিই অনেক আমি হয়ে অনেক জন্ম নিয়েছি, খুঁজে খুঁজে বেরিয়েছি পরশপাথর। পাইনি। কিন্তু পরশপাথরের সন্ধান করতে গিয়ে যেসব বিদ্যে অর্জন করেছিলাম, এ জনমে তার সবক'টাই পেয়েছি, শুধু পাইনি যা চাই, তাকে— পরশপাথরকে। দীননাথবাবু, আমি কে বা কারা, তা মুখে বললে হয়তো নাও বিশ্বাস করতে পারেন। পুনর্জন্মবাদ আমরা মানি ঠিকই, কিন্তু তবুও প্রমাণের অভাবে বিশ্বাস করে উঠতে পারি না, অথচ আমেরিকার ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটিতে এই নিয়ে জোর গবেষণা চলছে।'

'তা জানি,' ছোট করে বলল নরেশ।

'তা তো জানবেনই,' বললে দুলিচাঁদ, 'আপনাদের মামার সঙ্গে ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির যোগাযোগ আছে যে। আমার কেসটা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। কারণ, আমি শুধু এক জন্মের জাতিস্মর নই, বহু জন্মের।'

বলে কি লোকটা! এক জন্মের জাতিস্মরই বেশি বয়স পর্যন্ত পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে রাখতে পারে না, আর এ কিনা বহুজন্মের স্মৃতি মনে রেখেছে এত বয়স পর্যন্ত?

দুলিচাঁদ বললে, 'হ্যাঁ মনে রেখেছি, রেখেছি বোধহয় আমার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার তাগিদেই। তা বলে যেন আমাকে বুদ্ধদেবের পর্যায়ে ফেলবেন না। তিনি অবতার, তাই পাঁচশো জন্মের স্মৃতি মনে রেখেছিলেন। আমি অতি সাধারণ মানুষ। কিছু কিছু প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্ত করেছি, কিন্তু এতগুলো পূর্বজন্মের স্মৃতি কী করে যে এখনও মনে রেখেছি, তা আজও আমার কাছে একটা রহস্য! কিন্তু পরশপাথর আমার চাই-ই চাই। জন্ম জন্ম ধরে যার সন্ধানে হন্যে হয়ে বেড়িয়েছি, এ জন্মে তাকে আমি মুঠোয় আনবই। ওই খাকিরামবাবা—।'

প্রায় লাফিয়ে উঠে লালুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাকিরামবাবাই তো আমাদের মেন টার্গেট। মামা-ভাগনে পাহাড়ে জাঁকিয়ে বসে আছে কেন, সেটা আপনাকে দিয়েই জানব বলে আমরা এসেছি। কিন্তু তার আগে যদি দয়া করে বলেন, আপনি আগের জন্মগুলোয় কী ছিলেন এবং কী করেছিলেন—'

দুলিচাঁদ বললে, 'বলব, বলব, সব বলব— কিন্তু মুখে বলব না, চোখের সামনে হাজির করব।'

'চোখের সামনে হাজির করবেন?'

'নিশ্চয়। নইলে বিশ্বাস হবে কেন?'

'কী করে?'

আদেশের সুরে দুলিচাঁদ শুধু বললে, 'ল্যাম্পের চিমনির দিকে তাকান।'

তাকালাম ল্যাম্পের দিকে।

বলে গেল দুলিচাঁদ, 'তিনজনেই তাকান। হ্যাঁ, ঠিক এইভাবে। ফ্রেডরিকা হফি সাবানের বুদবুদের মধ্যে যেভাবে ভবিষ্যৎ ফুটিয়ে তুলেছিল, ঠিক সেইভাবে চিমনির কাচে আমি ফুটিয়ে তুলব আমার অতীতকে। তাকিয়ে থাকুন।' বলতে বলতে দুলিচাঁদ তর্জনীনির্দেশ করল ল্যাম্পের দিকে, তারপর একে একে আমাদের তিনজনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মতো একটা আলো দপ করে ঝলসে উঠল চোখের সামনে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল পলকের জন্যে। ধাঁধা কেটে যাবার পর দেখলাম, ল্যাম্পের চিমনির মধ্যে দিয়ে শিখা দেখা যাচ্ছে না, ধবধবে সাদা ফানুসের মতো হয়ে গেছে চিমনিটা। দুধের মতো সাদা কাচ টেলিভিশনের পর্দার মতো উজ্জ্বল, আলোকিত। আবিষ্টের মতো চেয়ে রইলাম অতীতের সেই ছবির পানে।

শুধু আলোকিত নয়, টেলিভিশনের পর্দায় যেভাবে ছবি ফুটে ওঠে, সেইভাবে অনেকগুলো রঙিন লাইনের ছবিও দেখা যাচ্ছে। লাইনগুলো আস্তে আস্তে সরে এসে গায়ে গায়ে মিলে যেতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল ছবি। লাইন আর দেখা গেল না, শুধু ছবি, রঙিন ছবি। অত্যন্ত স্পষ্ট, নিখুঁত, চুল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোনও টেলিভিশনের পর্দায়, তা সে যত সলিড স্টেটই হোক না কেন, এমন শার্প পিকচার কখনও দেখিনি।

প্রথম ছবিটা দেখলাম এইরকম:

বইপত্র তাগাড় করা রয়েছে একটা টেবিলে। সেকেলে ধাঁচের টেবিল। একজন শ্বেতকায় ইউরোপীয় তন্ময় হয়ে পড়ছে একটা পুথি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হাতে-লেখা পুথি। ঘনকালো কালিতে লেখা। ঘরে ঢুকল একজন শ্বেতকায় মেয়ে। উত্তেজিতভাবে পুরুষটি কী যেন বলল মেয়েটিকে।

এরপরেই দু'জনকে দেখা গেল একটা কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। একজন বুড়ো বেরিয়ে এল কটেজ থেকে। পুথিটা তাকে দেখাল এরা। বুড়ো ওদের কটেজের ভেতর নিয়ে গেল। আবার সেই বইপত্র ঠাসা ঘর আর টেবিল। এবার টেবিলে অনেক পাত্র আর শিশি-বোতলে অনেক রঙের তরল পদার্থ আর পাউডার। এটা-ওটা মিশিয়ে আগুনের ওপর ফোটাচ্ছে শ্বেতকায় যুবক।

একটা লাল পাথর হাতে নিয়ে পাগলের মতো হাসছে সেই যুবক। পাশে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল চোখে দেখছে মেয়েটি।

আবার গবেষণা। রাসায়নিক সরঞ্জাম। একটা পাত্রে ভারী আর চকচকে একটা তরল পদার্থ ঢেলে দেওয়া হল। তাতে লাল পাথরটা গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়া হল। আগুনে ফোটানো হল।

পাত্রের তরল পদার্থটা আর দেখা গেল না। চকচকে হলদে রঙের একটা জিনিস রয়েছে তার বদলে। সোনা নাকি?

কানের পাশে গাঢ়কণ্ঠে বললে দুলিচাঁদ, 'হ্যাঁ, সোনা। প্যারিসে জন্মেছিলাম। আমার নাম ছিল নিকোলাস ফ্ল্যামেল। আমার বউয়ের নাম পার্নেলা। হঠাৎ একটা পাণ্ডুলিপি এসে পড়ে হাতে। ম্যাজিকের বই। লিখেছিল একজন ইহুদি। নাম, আব্রাহামেলিন। অ্যালকেমিস্ট। পারা থেকে সোনা তৈরির ফর্মুলা লিখে রেখেছিল পাণ্ডুলিপিতে। সেই বই নিয়ে গেলাম স্পেনে। দেখা করলাম একজন ইহুদি ডাক্তারের সঙ্গে। সোনা তৈরির প্রক্রিয়া সংগ্রহ করলাম তার কাছে, ফর্মুলাটা তার জানা ছিল না। ফর্মুলা আর প্রক্রিয়া, এই দুটোই হাতে আসার পর প্যারিসে ফিরে এসে তৈরি করলাম লালপাথর, মানে পরশপাথর। সেই পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে পারা থেকে সোনা তৈরি করলাম। ইহুদি আব্রাহামেলিন লিখেছিল পুথিতে, বেশি লাভ যেন না করা হয়, সর্বনাশ হবে। তাই ঠিক তিনবার সোনা বানিয়ে ও-চেষ্টাই আর করলাম না। লোকমুখে কিন্তু ছড়িয়ে গেল, আমি পরশপাথর পেয়েছি। তাই ১৪১৭ সালের ২২ মার্চ আমি মারা যেতেই ওরা আমার বাড়ি লুঠ করল পরশপাথরের সন্ধানে। ওই দেখুন।'

চিমনির দুধসাদা কাচে দেখলাম সেই দৃশ্য। নিকোলাস ফ্ল্যামেলের বাড়িতে লোক গিজগিজ করছে। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করছে। রাসায়নিক সরঞ্জাম ভাঙচুর করছে। দেখতে দেখতে ফিকে হয়ে গেল সেই ছবি। দেখলাম দ্বিতীয় চিত্র:

শয্যাশায়ী এক শ্বেতকায় বৃদ্ধ অতিকষ্টে নিশ্বাস নিচ্ছে। চোখেমুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একটি তরুণ। বালিশের তলা থেকে একটা বই আর একটা শিশি বের করে তরুণের হাতে দিয়েই মারা গেল বৃদ্ধ। শিশির মধ্যে খানিকটা লাল গুঁড়ো।...

রাসায়নিক সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে তরুণটি। পারা থেকে সোনা তৈরি করে হাসছে।...

খালি শিশিটা হাতে নিয়ে পাগলের মতো আপনমনে বকছে তরুণটি। সামনে রাসায়নিক সরঞ্জাম, হরেক রঙের গুঁড়ো আর তরল পদার্থ। লাল গুঁড়োটাই কেবল নেই শিশিতে।

কানের কাছে ফিসফিস করে বললে দুলিচাঁদ, 'যেটুকু দিয়ে গেছিলাম মারা যাবার সময়ে, তাই দিয়েই সোনা বানিয়ে বিখ্যাত অ্যালকেমিস্ট হয়ে যায় মাইকেল সেনডিভোগিয়াস—আমার ছাত্র। সোনা তৈরির গুপ্ত রহস্যও ওকে দিয়েছিলাম মরবার সময়ে, ১৬০৪ সালের ১ জানুয়ারি। আমার নাম ছিল জ্যাকব হসেন। জাতে ওলন্দাজ। পেশায় জাহাজের পাইলট। এডিনবরার উপকূলে জাহাজডুবি হয় আমার। পরশপাথরের গুঁড়ো আর প্রাচীন পুথিখানা হাতে আসে। তারপরেই অত্যাচার শুরু হয় আমার ওপর। সোনা তৈরির কৌশল কিন্তু কাউকে বলিনি, ওই মাইকেল ছাড়া, কেননা মাইকেলই আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বন্দিশালা থেকে।'

মিলিয়ে গেল সেই ছবি। স্পষ্ট হয়ে উঠল আর একটা ছবি:

একজন বেদে ঝোলার মধ্যে থেকে একট মোষের শিং বের করে তুলে দিচ্ছে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের হাতে। ফাঁপা শিং। ভেতরে বেশ খানিকটা লাল গুঁড়ো।

রাসায়নিক সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। পারা ফুটছে, তাতে ঢেলে দেওয়া হল মোষের শিঙের ভেতরকার লাল গুঁড়ো। দেখতে দেখতে হলুদবর্ণ ধারণ করল ফুটন্ত পারা। সোনা... সোনা... 'হ্যাঁ, সোনা... আবার সোনা,' যেন অনেকদূর থেকে ভেসে এল দুলিচাঁদের

উদাস কণ্ঠস্বর, 'সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেলজিয়ান কেমিস্ট ভ্যান হেলমন্টের নাম ছড়িয়ে যায় 'গ্যাস' শব্দটা আবিষ্কার করার জন্যে। আরও অনেক রাসায়নিক আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানী স্বীকৃতি পায় হেলমন্ট। এই সময়ে এক অচেনা বেদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পরশপাথরের লাল গুঁড়ো। চার আউন্স পারাকে সোনায় পরিণত করে সে। ভ্যান হেলমন্টই এ-জন্মে দুলিচাঁদ হয়ে এসেছে আপনাদের পাশে। এরপরের জন্মটাই সবচাইতে শোচনীয়। ওই দেখুন।' নতুন ছবি ফুটে উঠেছে দুগ্ধধবল প্রদীপ্ত চিমনিতে:

একঘর লোকের সামনে রাসায়নিক সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। বয়েসে তরুণ। পোশাক দেখে ধনবান বলেই মনে হচ্ছে। বুদ্ধিদীপ্ত মুখচ্ছবি। সামনে যারা ভিড় করে রয়েছে, তারাও যে বিলক্ষণ জ্ঞানীগুণী, তা মার্জিত এবং ধীমান মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে। সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে তরুণটি নুনের মতো একটা জিনিসের সঙ্গে মেশাল সোডার মতো সাদা একটা বস্তু— তার সঙ্গে আবার মেশাল খানিকটা সাদাগুঁড়ো, মিশেলটা ক্রুসিবলে ফুটন্ত পারায় দিতে পারা পরিণত হল সাদা রঙের তরল পদার্থে। রুপো মনে হচ্ছে না?

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ রুপো,' কানের কাছে চাপা গলায় বললে দুলিচাঁদ। 'নুনের মতো জিনিসটা সোরা, সোডার মতো জিনিসটা বোরাক্স। ১৭৫২ সালে ইংল্যান্ডে জেমস প্রাইস হয়ে জন্মে সোনা তৈরি হাতেনাতে দেখিয়েছিলাম এইভাবে। রয়াল সোসাইটির ফেলো হওয়ার পর তিরিশ বছর বয়সে ১৭৮২ সালে সোনা তৈরি করা দেখতে গণ্যমান্যদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম সারে জেলার ল্যাবরেটরিতে। প্রথমে পারাকে করলাম রুপো। তারপর—'

ছায়াছবিতে দেখলাম, জেমস প্রাইস খানিকটা লাল গুঁড়ো ঢেলে দিল ফুটন্ত রুপোয়। রুপো হয়ে গেল হলুদ সোনা।

সেই সোনা কষ্টিপাথরে ঘষে পরখ করছে একজন, স্যাকরা নিশ্চয়ই। বিস্ফারিত চোখে ঘাড় নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছে। খাঁটি সোনা দেখে ভড়কে গেছে মনে হচ্ছে। পারা থেকে খাঁটি সোনা!...

ঘর খালি। কী যেন লিখছে জেমস প্রাইস...

অনেক লোকে কাড়াকাড়ি করে একটা পত্রিকা পড়ছে...

জেমস প্রাইস বিব্রতমুখে হাত-মুখ নেড়ে কিছু বলছে একদল গণ্যমান্য ব্যক্তিকে... কিছুতেই রাজি হচ্ছে না... শেষকালে পীড়াপীড়ির ফলে রাজি হল...

জেমস প্রাইস ল্যাবরেটরিতে দাঁড়িয়ে। তিন ভদ্রলোক এলেন। জেমস প্রাইস ম্লান হেসে একটা শিশি গলায় উপুড় করে দিল, আছড়ে পড়ল মেঝেতে, আর নড়ল না...

ধরা গলায় দুলিচাঁদ বললে, 'আত্মহত্যা করলাম। রয়াল সোসাইটি জেদ ধরেছিল আবার সোনা তৈরি করে দেখাতে হবে। আমার লেখা প্রবন্ধ সাড়া ফেলেছিল বৈজ্ঞানিক মহলে। তৈরি করাও সম্ভব নয় এই স্বাস্থ্য নিয়ে— শুধু বলিনি যে পরশপাথরের সেই গুঁড়ো কস্মিনকালেও আমি তৈরি করিনি, কুড়িয়ে পেয়েছিলাম একটা পুথির সঙ্গে। ওরা শুনল না। অসম্মান, অপমান আর লাঞ্ছনা এড়ানোর জন্যে রয়াল সোসাইটির তিন ডেলিগেটের সামনে প্রুসিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করলাম। এরপর জন্মালাম মেয়ে হয়ে, নাম হল

মেরি অ্যান সাউথ। আমার বাবা টমাস সাউথের লাইব্রেরিতে রাশি রাশি বইয়ের মধ্যে ছিল বিস্তর অ্যালকেমির বই আর প্রাচীন রহস্য নিয়ে লেখা কেতাব। আমি গোগ্রাসে গিলতাম সেই বইগুলো। ওই দেখুন—'

মেরি অ্যান সাউথকে দেখা গেল লাইব্রেরি ঘরে। রাশি রাশি গ্রন্থ নিয়ে মশগুল। মোটা একটা খাতায় পাতার পর লিখে চলেছে।

একটা বই। ওপরে নাম ছাপা রয়েছে মেরি, আর এক লণ্ডন প্রকাশকের।

বইটা পড়ছে একজন সাহেব। তারপরেই ভীষণ রেগে বই ছুড়ে ফেলে দিল ফায়ারপ্লেসে।

পুড়ছে রাশি রাশি বই। সবই মেরির লেখা বই। কে এই সাহেব?

দুলিচাঁদ বললে মেয়েলি গলায়, 'আমার আগের জন্মের বাবা টমাস সাউথ। উনি ভাবতে পারেননি, ওঁরই লাইব্রেরির বই ঘেঁটে অ্যালকেমির সবচেয়ে গুপ্তরহস্য, পারা থেকে সোনা তৈরির রহস্য, আমি উদ্ধার করে ফেলব এবং তাই নিয়ে বই লিখে বাজারে ছেড়ে দেব। এই বইতে একটা কথা আমি লিখেছিলাম, শুধু বিভিন্ন উপাদান মিশিয়েই সোনা তৈরি করা যায় না, তার সঙ্গে অ্যালকেমিস্টের লাইফ-ফোর্স মিশিয়ে তৈরি পরশপাথরও মিশাতে হয়। একান্ত গোপনীয় এই মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস করে দিতেই বাবা রেগে গিয়ে সব পুড়িয়ে দেন। এর বারো বছর পরে আমি মারা যাই— ১৯৩০ সালে। তারপরেই আমার জন্ম হল দুলিচাঁদরূপে। মেয়েলি গলাটা পেয়েছি হয়তো সেই কারণেই। যাই হোক, যে লাইফ-ফোর্স না থাকলে পরশপাথর তৈরি সম্ভব হয় না, এ-জন্মে ঠাকুর আমাকে তা দিয়েছেন। পরশপাথরের মূল উপাদান যে মামা-ভাগনে পাহাড়ে আছে, সে তথ্যও জেনেছি অতীন্দ্রিয় দূরদর্শন-ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এখন আমায় ঠেকায় কে?'

'খাকিরামবাবা,' গম্ভীর মৃদু গলায় বললে নরেশ।

১৩. শূন্যের আতঙ্ক

পরের দিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল আমার আর নরেশের। দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ নিয়ে বসতে না বসতেই একখণ্ড 'বীরভূম সন্দেশ' নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন লালুবাবু।

ঘরে ঢুকেই কাগজটা মুখের সামনে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'দেখেছেন? কাণ্ড দেখেছেন? অতীন্দ্রিয় কাণ্ডকারখানা নিয়ে কেবল আমরাই পাগলামি করে বেড়াচ্ছি না, খবরের কাগজওলাদেরও টনক নড়েছে।'

কাগজটা ছোঁ মেরে নিয়ে পড়লাম। ষাট পয়েন্ট টাইপের গোদা গোদা হেডিংয়ের ওপর থেকে চোখ লাফিয়ে নেমে এল ভেতরের চাঞ্চল্যকর খবরে:

সাংবাদিকের শূন্যে পরিভ্রমণ!

গতকাল বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটেছে দুবরাজপুরের কাছে— মামা-ভাগনে পাহাড়ে। হিমালয়-প্রত্যাগত যোগী খাকিরামবাবা মাসছয়েক হল আস্তানা নিয়েছেন এই মামা-ভাগনে পাহাড়ে। পাহাড়েশ্বর মন্দিরে কালেভদ্রে আসেন। বেশিরভাগ সময় কাটান শ্মশানে। উনি আসার পর থেকে স্থানটি অলৌকিক রহস্যের লীলানিকেতন হয়ে উঠেছে। দিনমানে যদিওবা দু'-একজন তীর্থযাত্রী আসে পাহাড়েশ্বরের মাথায় ফুল-বেলপাতা চাপাতে, সন্ধের পর এ অঞ্চল আর কেউ মাড়ায় না। খাকিরামবাবার সাধনায় নাকি বিঘ্ন ঘটে।

কিন্তু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ এই ভারতে যোগীপুরুষের সন্ধান পেলে ভক্তের কখনও অভাব হয় না— বিশেষ করে যে যোগী যত দুর্মুখ, তার চারপাশে ভক্তসমাগম হয় তত বেশি। খাকিরামবাবারও এই সুনাম আছে। তাই ভয়ে কাঠ হয়েও কিছু ভক্ত আসে বাবার পায়ের ধুলো নিতে। দিনকয়েক আগে নলহাটি থেকে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে আনা হয়েছিল বাবার সামনে। নাছোড়বান্দা ভক্তদের জ্বালায় খাকিরামবাবা শেষকালে মামা-ভাগনে পাহাড়েরই একটি পাথর দিয়ে মারতে যান পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীটিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাথর দিয়ে মাথা না ফাটিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাথরটাকে বোলাতে থাকেন। কয়েকবার বোলানোর পরেই রোগীর আরামবোধ হতে থাকে। তার মনে হয় যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ মাথা থেকে স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে অসাড় পা-দুটোর দিকে নেমে যাচ্ছে। চনমনে অনুভূতিটা বাড়তে থাকে একটু একটু করে, বেশ বুঝতে পারে পায়ের নখের ডগা পর্যন্ত যেন তড়িৎপ্রবাহ বইছে— পাথর বোলানোর সঙ্গে সঙ্গে। তারপরেই খাকিরামবাবা পাথরটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নাকি আকাশমুখো হয়ে ডাকতে থাকেন— 'আয়!... আয়!... আয়!' ডাক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শনশন শব্দ শোনা যায়। পাথরের আড়াল থেকে একটা শঙ্খচূড় সাপ শূন্যপথে ছিটকে এসে পড়ে রোগীর পায়ের কাছে। দেখেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীটি পক্ষাঘাতের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে প্রাণের ভয়ে 'বাপ রে' বলে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে এবং সবেগে পলায়ন করে শ্মশান থেকে। কিছুদূর এসেই সঙ্গীদের হতভম্ব মুখ দেখে তার খেয়াল হয়, পায়ের পক্ষাঘাত সম্পূর্ণ উধাও হয়েছে। মামা-ভাগনে পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসে বিকট অট্টহাসি— খাকিরামবাবার অট্টহাসি নিশ্চয়ই— কিন্তু ফিরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নেওয়ার সাহস আর কারও হয়নি শঙ্খচূড়ের ভয়ে।

ঘটনাটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পোষা শঙ্খচূড়ের ভয়ে খাকিরামবাবাকে ঘাঁটাবার সাহস আর কারও হয়নি। একজনের ছাড়া।

ইনি খাকিরামবাবাকে দর্শন করতে যান সংবাদ সংগ্রহের জন্য। কিন্তু নিজেই একটি সংবাদ হয়ে গেছেন পরবর্তী অবিশ্বাস্য ঘটনার ফলে। সঠিক কী হয়েছিল, তা জানা যায়নি! তবে মধ্যরাতে দুবরাজপুরের পাশের গ্রামের আকাশে একটি কালো বস্তুকে ভেসে আসতে দেখা যায়। বস্তুটি আবির্ভূত হয় মামা-ভাগনে পাহাড়ের দিকে থেকে। তারপরেই ধপাস করে আছড়ে পড়ে একটা ধানের মরাইয়ের ওপর। সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে খড়ের গাদায়। দৌড়ে গিয়ে সবাই দেখে বেহুঁশ সাংবাদিক ভদ্রলোক পড়ে রয়েছেন খড়ের গাদায়।

কিন্তু তিনিই আকাশপথে পক্ষীরাজের মতো উড়ে এসে ধানের মরাইয়ে আছড়ে পড়েছেন কিনা, এ প্রশ্নের সঠিক কোনও উত্তর তিনি দিচ্ছেন না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা চাঁদনি রাতে হয়তো রজ্জুতে সর্পভ্রম করে থাকতে পারে।

ঘটনাটি বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে গোটা দুবরাজপুরে।

খবর পড়া শেষ করে আমি চাইলাম নরেশের দিকে, নরেশ চাইল আমার দিকে, তারপর দু'জনেই চাইলাম লালুবাবুর দিকে।

শেষকালে আমি বললাম, 'এক জায়গায় কিন্তু খটকা লাগছে। ঘটনাটা ঘটেছে কাল মাঝরাতে। আজকেই সে খবর ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেল কী করে?'

'দুবরাজপুরের সংবাদদাতা কাল রাতেই সিউড়ি এসে খবর ধরিয়ে দিয়েছে সম্পাদককে,' বললেন লালুবাবু। 'কিন্তু আমার খটকা লাগছে অন্য একটা ব্যাপার। সাংবাদিক ঠিক আমাদের মতোই খাকিরামবাবার পেছনে লেগেছে। কেন বলুন তো?'

'খবর সংগ্রহ করার জন্যে,' বললাম আমি, 'সাংবাদিকরা যে কী ধরনের প্রাণী, তা তো জানেন না। এদের ভয়েই প্রফেসর পর্যন্ত দেশছাড়া।'

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র?'

'হ্যাঁ।'

লালুবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'যাবেন তো?'

'কোথায়?'

'এই দেখুন! আসল কথাটাই বলা হয়নি। সাংবাদিকের ডেরার ঠিকানা জোগাড় করে ফেলেছি। ঘটনাটার বিবরণ তার স্বমুখেই শুনতে চাই। আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি।'

নরেশের সেদিন ছুটির দিন। বললে, 'তা আর বলতে।'

আমিও উঠে পড়ে লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরতে পরতে বললাম, 'নাম কী রিপোর্টারটার?'

'কানু কর্মকার।'

কানু কর্মকার তক্তপোশে শুয়ে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে গিয়ে পা নাচাচ্ছিল। আমাদের দেখে উঠে বসল। গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে লোমশ বুক দেখা যাচ্ছে— সেইসঙ্গে বুকের পেশি। হাতের গুলিও বেশ প্রকট। দেখলেই বোঝা যায়, নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীরটাকে মজবুত রেখেছে। রাত জাগার জন্যে কী অন্য কোনও কারণেই হোক, চোখদুটো লাল। নাক টিকালো এবং নাকের পাটা ফুলে রয়েছে। বেশ কড়া ধাতের পুরুষ বলেই মনে হয়।

ঠোঁটের কোণে সুমিষ্ট হাসি ফুটিয়ে কিন্তু বললে, 'আপনারা কে বটে? কেন জ্বালাতে এসেছেন? 'বীরভূম সন্দেশ' যা লিখেছে, তা নিছক গল্প। আমাকে দেখে বুঝছেন না? দশটা খাকিরামবাবা এলেও আমাকে ঘাড়ে করতে পারবে না, আকাশে ভাসিয়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার খবরটা তাই স্রেফ গুলিখোরের গল্প। আপনারা আসতে পারেন।'

আমি তখন চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে জুতো খুলতে শুরু করেছি। খোলা হয়ে গেলে ভেতরে ঢুকেই চোখাচোখি হয়ে গেল কানু কর্মকারের সঙ্গে। ভদ্রলোক সেই প্রথম দেখল আমাকে। দেখেই তড়াক করে তক্তপোশ থেকে নেমে এসে বললে, 'আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়, কী সৌভাগ্য আমার!'

এ আবার কী! এই তাড়িয়ে দিচ্ছিল, আবার আমাকে দেখেই এত খাতির!

বললাম, 'আমাকে চেনেন?'

'চিনব না মানে? কে না চেনে আপনাকে? আমাদের দুর্ভাগ্য আপনি আমাদের চেনেন না। আমি 'দৈনিক গল্প পত্রিকা'র বিশেষ সংবাদদাতা কানু কর্মকার।'

'দৈনিক গল্প পত্রিকা!' একটু বাঁকা সুরেই বিস্ময়টা প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। পৃথিবীতে ঠিক এ ধরনের দৈনিক আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। রাজ্যের হলদে গল্প, মানে, ইয়োলো জার্নালিজমের তৈরি করা গল্প খবরের নামে ছাপিয়ে হু হু করে কাটতি বাড়িয়ে ফেলেছে। হুজুগে বাঙালিরা তাই দৈনিক গল্প পত্রিকা বলতে অজ্ঞান। ভগবানকে তারা বিশ্বাস করে না— কিন্তু বিশ্বাস করে এই হলদে পত্রিকার প্রতিটি হলদে গল্প।

সুমিষ্ট হাসি হেসে পরুষকণ্ঠে কানু কর্মকার বললে, 'অত হেনস্তা করবেন না দীনবাবু। প্রফেসরও করেছেন— এখন তো পস্তাচ্ছেন।'

'আপনি তা হলে জানেন আপনাদের উৎপাতেই প্রফেসর নাটবল্টু চক্র দেশত্যাগী?'

'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! জানাটাই যে আমাদের কাজ।' তক্তপোশের একটা দিক দেখিয়ে থিয়েটারি ঢঙে বললে কানু কর্মকার, 'বসুন, বসুন। এই আকাটদের দেশে যে আপনাদের দর্শন পাব, কে জানত।'

গরম হয়ে গেলেন লালুবাবু, 'আকাটদের দেশ কাকে বলছেন মশায়? আমার চোদ্দোপুরুষ এই দেশে রয়েছে— আকাট হলে নিশ্চয়ই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সোনার মেডেলখানা আমাকে দিত না।'

ধুন্ধুমার কাণ্ড লেগে গেল বলে! 'দৈনিক গল্প পত্রিকা'র রিপোর্টারদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না আমি এই কারণেই। প্রত্যেকেই নিজেকে স্বয়ং অবতার বলে মনে করে এবং নিজেকে ছাড়া বিশ্বের প্রতিটি দ্বিপদ প্রাণীকে হেয়জ্ঞান করে। এত দাম্ভিক গোষ্ঠী আর জীবনে দেখিনি। তাদেরই আর এক অবতার তো এই কানু কর্মকার। চোখমুখের ভাবেই তো সবজান্তা ভাব ফুটে বেরোচ্ছে। ফলভারে বৃক্ষ অবনত থাকে; যে বৃক্ষে ফল নেই, সে বৃক্ষ উন্নতশির থাকবার চেষ্টা তো করবেই। কানু কর্মকার তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আমি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললাম, 'কানুবাবু, আপনি কাকে কী বলতে হয় তাও দেখছি জানেন না। একটু হিসেব করে কথা বলুন। লালুবাবুর মতো মানুষ যেদেশে জন্মায়, সেদেশের মানুষকে ফট করে আকাট বলাটা আপনার ঠিক হয়নি।'

বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে কানু কর্মকার বললে, 'আরে, ওটা হল গিয়ে একটা কথার কথা। আমার সব কথা গায়ে মাখতে যাবেন না। লালুবাবু, আমি ক্ষমা চাইছি। আপনার নাম আমি শুনেছি। আলাপ করে ধন্য হলাম।'

লালুবাবু তখনও চোখ পাকিয়ে আছেন, 'কোথায় শুনেছেন?'

গূঢ় হেসে কানু কর্মকার বললে, 'শুনেছি— কোথায় শুনেছি, তা তো মনে নেই।— নরেশবাবু, আপনি নিশ্চয় নরেশবাবু? দীননাথবাবুর ভগ্নিপতি? আপনাকেও সুস্বাগতম জানাই দীনের কুটিরে।'

নরেশ বুদ্ধদেবের মতো নির্বিকার প্রশান্ত মুখে বললে, 'আমাকেই বা চিনলেন কী করে?

আমার বড়োকুটুমকে চিনতে পারেন— কিন্তু আমি তো এই আকাটদের দেশে পয়লানম্বর আকাট— মাছ নিয়ে মেতে থাকি।'

পান-খাওয়া লাল জিভ বের করে কানু কর্মকার বললে, 'কী মুশকিল! কী মুশকিল! কথাটা দেখছি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। আপনাদের প্রত্যেককেই আমি জানি, চিনি, নাড়িনক্ষত্রের খবর পর্যন্ত রাখি— আরে মশাই, জানাটাই যে আমার কাজ।'

'তা ঠিক,' নিরীহ স্বরে বললে নরেশ, 'আপনি যে 'দৈনিক গল্প পত্রিকা'র সাংবাদিক— স্বয়ং ভগবান!'

কানু কর্মকার বেগতিক দেখে সিগারেটের প্যাকেটটা তক্তপোশের ওপর থেকে টেনে নিয়ে বললে, 'চলবে?'

তিনজনের কেউই হাত বাড়ালাম না প্যাকেটের দিকে। আমাদের অপমানিত মুখচ্ছবি পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করে নিয়ে যেন নাচার হয়েই কানু কর্মকার বললে, 'তা হলে আমি একাই খাই।' ফস করে দেশলাই জ্বলল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়া হল। তারপর— 'সারারাত যা ধকল গেছে, মাথার ঠিক নেই। খাকিরামবাবা লোকটা রিয়ালি মিস্টিরিয়াস।'

তক্তপোশের আসন গ্রহণ করে বললাম আমি, 'সেই বৃত্তান্ত জানতেই আমাদের আগমন। ব্যাপারটা কী হয়েছিল বলুন তো?'

বিজ্ঞের মতো হেসে কানু কর্মকার বললে, 'কী আর বলব মশাই। গেছিলাম খবর বের করতে— নিজেই একটা খবর হয়ে গেলাম। 'বীরভূম সন্দেশ'-এর রিপোর্টাররা এত স্মার্ট জানলে আরও একটু চুপিসাড়ে কাজ করতাম।'

'কী হয়েছিল?'

'খাকিরামবাবার কাছে ধর্না দিয়েছিলাম। চেপে ধরেছিলাম, পাথর বুলিয়ে প্যারালিসিস সারানোর ব্যাপারটা সত্যি কিনা বলতে হবে। তা উনি তো মারতে এলেন আমাকে।'

তারপর যা বললেন কানু কর্মকার, তা এই:

১৪. চুম্বক রহস্য

গভীর রাত। মামা-ভাগনে পাহাড় নিস্তব্ধ। আকাশে নক্ষত্রের রোশনাই।

বিকেলবেলা বাসে করে পাহাড়েশ্বর পৌঁছেছিল কানু কর্মকার। গাছতলায় বসে চিনেবাদাম চিবিয়েছে। রাত হতেই এগিয়েছে শ্মশানের দিকে। আগুন জ্বলছিল সেখানে। পাথর টপকে যাওয়ার সাহস হয়নি, সাপখোপের ভয়ে। মামা-ভাগনে পাহাড়কে বেড় দিয়ে ফাঁকা মাঠের দিক থেকে এগিয়েছিল শ্মশানের দিকে।

খাকিরামবাবা কিন্তু ছিলেন না ধুনির সামনে। অবাক হয়ে গিয়েছিল কানু কর্মকার। আগুন জ্বলছে। একটা মড়ার মাথার খুলিও সামনে রয়েছে। বাঘের ছালের আসনও পাতা রয়েছে— নেই কেবল খাকিরামবাবা।

কানু কর্মকারের তখন গোয়েন্দাগিরির বাসনা হয়। চিরকালই ডানপিটে সে। এসেছে

খবর জোগাড় করতে প্রাণের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও। তাই চুপি চুপি দেখতে চেয়েছিল সাধুর গোপন সাধনা।

পায়ে পায়ে এগিয়েছিল পাহাড়েশ্বর মন্দিরের দিকে।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, ভোজবাজির মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন খাকিরামবাবা। চোখে সেই কালো চশমা। সাদা দাড়ি ঝকঝক করছে কানু কর্মকারের টর্চের আলোয়। হাতে একটা ত্রিশূল। সাক্ষাৎ শিবের মতো ত্রিশূলটা দিয়ে কানু কর্মকারের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন খাকিরামবাবা।

কিন্তু বুকে বিঁধিয়ে দেননি। ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্মশানে— হাত তুলে মৌনীবাবার মতোই পালিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেছিল। আর ঠিক সেই সময় শনশন শব্দ শোনা গিয়েছিল আশেপাশে। ছায়ার মতো কীসব যেন উড়ে উড়ে গিয়েছিল পাথরের আনাচেকানাচে— আওয়াজ শোনা গিয়েছিল ডানা ঝাপটানির।

হাতজোর করে কানু কর্মকার তখন বারবার বলেছিল, 'বাবা, পাথরের মহিমা একটু দেখান— আমি এখুনি বিদায় নেব।'

বাবা একটা কথাও বলেননি। কাঁধের ঝোলা থেকে একটা পাথর তুলে নিয়ে কানু কর্মকারের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বুলোতে থাকেন। আস্তে আস্তে শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে কানুবাবুর। মাথার মধ্যে কীরকম যেন করতে থাকে। ঘুম ঘুম পেতে থাকে। তারপর আর কিছু মনে নেই। মনে যখন পড়ল, তখন কোথায় মামা-ভাগনে পাহাড়ের শ্মশান? কোথায় খাকিরামবাবা? সে শুয়ে আছে একটা খড়ের গাদায়। মাথায় জল ঢালছে অনেক লোক। সে নাকি আকাশপথে ভেসে এসে আছড়ে পড়েছে। কিন্তু তা কী করে হয়? গ্রামবাসীরা বানিয়ে গল্প শোনাচ্ছে নিশ্চয়ই। আসলে খাকিরামবাবা হিপনোটাইজ করেছিল কানু কর্মকারকে— তারপর সম্মোহনের ঘোরে নিজেই হেঁটে এসেছে খড়ের গাদা পর্যন্ত। কাহিনি শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে লালুবাবু বললেন, 'তা হলে হিপনোটিজ়মের খেলা শুরু হল এবার?'

অমনি জুলজুল করে তাকিয়ে কানু কর্মকার বললে, 'তা হলে আরও খেলা হয়ে গেছে নাকি?'

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল আমাদের তিনজনের মধ্যে। মেয়েছেলে আর সাংবাদিকের পেটে কথা থাকে না। আমরা যা জেনেছি গত আটচল্লিশ ঘণ্টায়, তা এমনই পিলে চমকানো সংবাদ যে, কোনও সাংবাদিকের সামনে তা ফাঁস না করাই শ্রেয়।

তাই আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, 'আরও খেলা মানে পাথর বুলিয়ে প্যারালিসিস সারানোর খেলা আর কী!'

'তাই কি?' ধূর্ত চোখে চেয়ে বললে কানু কর্মকার।

সেই চাহনি দেখে আমার হঠাৎ কেন জানি মনে হল, তুখোড় এই সাংবাদিকটি অনেক খবর রাখে। আমরা যা জানি না, হয়তো সে খবরও সংগ্রহ করে বসে আছে। জল দিয়ে জল বের করার টেকনিক ছেড়েছে আমাদের ত্রিমূর্তিকে চিনতে পেরে। অর্থাৎ, সামান্য একটু খবর ছেড়ে উসকে দিতে চায় আমাদের— যাতে হুড়হুড় করে পেট খালি করে দিই।

তাই মুখে চাবি এঁটে থাকাই সংগত মনে করলাম। মুচকি মুচকি হেসে বললাম, 'তা ছাড়া আর কী হতে পারে বলুন? আমরা তো আর সংবাদ বেচে খাই না যে সংবাদ সংগ্রহ করে বেড়াব। আপনার কাছে এসেছিলাম স্রেফ কৌতূহল মেটাতে।'

কানু কর্মকার গাঁজার কলকে ধরার কায়দায় সিগারেট ধরে ফুঁকতে ফুঁকতে বললে, 'তাই নাকি?'

বলাটাও যেন কেমনতর। খটকা লাগল আমার মনে। কানু কর্মকার একবর্ণও বিশ্বাস করেনি আমার কথায়। কেন? আমাদের কী কী কাহিনি সে জেনে থাকতে পারে?

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল একটা ঘটনা। পরশু পূর্ণিমার রাতে লালুবাবুর বাড়িতে আড্ডা মারবার সময়ে দোরগোড়া আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম আমি। কোর্টের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে দেখেছিলাম একটি পুরুষমূর্তিকে। আজও জানতে পারিনি সে কে। কেন কান পেতেছিল আমাদের দরজায়! তবে কি কানু কর্মকারই সেই রাতে পিছু নিয়েছিল আমাদের? অথবা আমার? আমার মুখই সে চেনে তিনজনের মধ্যে— নরেশ আর লালুবাবুকে চেনে নামে।

সন্দেহটা মনের মধ্যে ধূমায়িত হতেই আরও সাবধান হয়ে গেলাম। সিউড়িতে আমি বেড়াতে এসেছিলাম— কোনও মতলব নিয়ে আসিনি। কিন্তু যেহেতু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, তাই জড়িয়ে গেছি মামা-ভাগনে পাহাড়ের রহস্যে। তবে লালুবাবুর কাছে যাওয়ার আগে পর্যন্ত জানতাম না আমি কী ধরনের রহস্যসিন্ধুতে হাবুডুবু খেতে চলেছি। কিন্তু যে আমার পিছন নিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই সব জেনেই দরজায় কান পেতেছিল। কে সে? কানু কর্মকার?

গাঁজা টানার কায়দায় সিগারেটে লম্বা টান মারতে মারতে সকৌতুকে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল কানু কর্মকার। হঠাৎ সিগারেটটা ঘরের কোণে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'কী এত ভাবছেন, দীননাথবাবু?'

আমি নিক্তি দিয়ে ওজন-করা হিসেবি গলায় বললাম, 'ভাবছি, আপনি আমাদের অজ্ঞতায় অবিশ্বাস করছেন কেন?'

কৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে কানু কর্মকার বললেন, 'করেছি নাকি? কী মুশকিল! কী মুশকিল! এই নাক-কানে খৎ দিচ্ছি, আর করব না।'

লালুবাবু আর নরেশ চুপচাপ নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিল আমার সঙ্গে কানু কর্মকারের বাকযুদ্ধ। এখন কথার মোড় ফেরানোর জন্যেই বোধহয় লালুবাবু বললেন, 'কানুবাবু, কাল রাতের ব্যাপারটা তা হলে আপনি বিশ্বাস করেননি?'

'কো-কোন ব্যাপারটা বলুন তো?'

'আপনার ব্যাপারটা।'

'বাতাসে ভো-কাট্টা ঘুড়ির মতো ভেসে আসা?'

'আজ্ঞে।'

'দুর মশাই! এটা হল গিয়ে মহাকাশযুগ, প্রাচীন কুসংস্কারে আমি বিশ্বাসী হতে যাব কোন দুঃখে? ওই জন্যেই তো 'আকাট' শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম— আপনি গায়ে পেতে

নিলেন। আকাট ওই গ্রামবাসী গেঁইয়া লোকগুলো। আকাশে বাদুড় উড়তে দেখেছে— তারপর আমাকে আবিষ্কার করেছে খড়ের গাদায়। অমনি বানিয়ে নিলে একটা অসম্ভব কাহিনি— আমিই নাকি আকাশ দিয়ে উড়ে এসেছি। যত্তোসব।' বলে, ফের সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল কানু কর্মকার।

লালুবাবু স্থির চোখে চেয়ে থেকে বললে, 'আপনি কিন্তু পাথর বুলিয়ে প্যারালিসিস সারানোর গালগল্পে বিশ্বাস করেন। করেন বলেই তো খাকিরামবাবার শ্মশানে দৌড়েছিলেন সাপের ছোবলে প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও। ঠিক কিনা?'

'ঠিক, ঠিক, বিলকুল ঠিক,' কমেডিয়ানের মতো ঘাড় নেড়ে নেড়ে সিগারেটটার প্যাকেট ঠুকতে ঠুকতে বললে কানু কর্মকার, 'তবে কী জানেন, সে বিশ্বাসের মূলে একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ছিল— তাই গিয়েছিলাম।'

'কী ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস জানতে পারি? যদি আপত্তি না থাকে।'

'রাম বলো! আপত্তি থাকবে কেন? ইনটেলেকচুয়ালদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেই তো আরাম। এই আকা—আই মিন— ভূতপ্রেতবিশ্বাসী মানুষদের দেশে কথা বলার লোক কই?'

খোশামোদে ভবি ভোলবার নয়। লালুবাবুর মুখচ্ছবি একটুও পালটাল না। একইরকম রসকষহীন স্বরে বললে, 'তা হলে ধন্য করুন আপনার বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের বৃত্তান্ত শুনিয়ে।'

এমনভাবে বললেন কথাগুলো যেন কামারের কাছে ছুঁচ বেচতে আসা হয়েছে। কত ধানে কত চাল এখুনি টের পাইয়ে দেওয়া যাবে'খন।

কিন্তু কানু কর্মকার এরপর যা বলে গেল বেশ গুছিয়ে, তা শুনে আমরা হতবাক। লোকটা ভগবানের পত্রিকা, থুড়ি, 'দৈনিক গল্প পত্রিকা'র সবজান্তা সংবাদ-সংগ্রাহক হলেও অনেক কিছুরই খবর রাখে দেখা যাচ্ছে। বিলক্ষণ পড়াশুনো আছে— বিশেষ করে অব্যাখ্যাত অলৌকিক ব্যাপারস্যাপারে।

সিগারেটে জম্পেশ টান মারতে মারতে বললে কানু কর্মকার, 'চুম্বক দিয়ে রোগ আরোগ্যের কোনও ঘটনা জানেন?'

আমি থ হয়ে রইলাম কথা শুনে। চুম্বক দিয়ে আবার রোগ সারানো যায় নাকি? তবে ঠিক এই ধরনের একটা কথা কোথায় যেন শুনেছিলাম— শোনার পর এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল— সঠিক কিছু মনে করতে পারলাম না।

কারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি ঘটছে না দেখে কানু কর্মকার বললে, 'তা হলে কিছু জ্ঞান দেওয়া যাক— অপরাধ নেবেন না সেজন্যে। ১৭৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসের 'রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিন'-এর সভাকক্ষে বেশ কিছু পণ্ডিত চিকিৎসাব্যবসায়ীর সামনে অভিনব এক বক্তব্য রেখেছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ড. চার্লস দ্য এসলন। বলেছিলেন, গ্রহনক্ষত্র, পৃথিবী আর জীবন্ত প্রাণীদের দেহের মধ্যে একটা পারস্পরিক প্রভাবের অস্তিত্ব রয়েছে। এই প্রভাবটা সম্ভবপর হচ্ছে অজ্ঞাত এক 'গ্যাস'-এর জন্যে, যা মহাশূন্যে ব্যেপে রয়েছে। রহস্যজনক এই গ্যাস বা পদার্থের গতির ওপরেই নির্ভর করছে

মানুষের স্বাস্থ্য। যেহেতু চুম্বকের আকর্ষণীশক্তির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এই প্রভাবের, তাই একে বলা যেতে পারে অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌ম। পরবর্তীকালে অকাল্ট সায়েন্টিস্টরা এই অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌মকেই বলেছেন, 'অ্যাসট্র্যাল লাইট'। তার পরের বৈজ্ঞানিকরা এর নাম দিয়েছিলেন আলোকবাহী ইথার।

'লালুবাবু, দ্য এসলন কিন্তু নিজের কথা জাহির করতে যাননি পণ্ডিতদের সামনে। ড. ফ্রাঞ্জ অ্যানটন মেসমারকে উনি অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। এ তত্ত্ব সেই ডাক্তার মেসমারের। বৃহৎ চুম্বকের রোগ নিরাময়ের শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন মেসমার। খুব সম্ভব, মেসমার এ তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দুশো বছর আগেকার পণ্ডিত পারসেলসাসের পুথি থেকে। চাঞ্চল্যকর এই আবিষ্কারটি সর্বপ্রথম করেন পারসেলসাস। বড় চুম্বক দিয়ে ঠুকে ঠুকে রোগীদের ম্যাগনেটাইজ করলে তাদের ব্যথা আর বেদনা মিলিয়ে যায়, পারসেলসাস তা লক্ষ করেছিলেন। আরও দেখেছিলেন, কোনও গাছকে ম্যাগনেটাইজ করার পর রোগীদের সেই গাছে হেলান দিতে দিলেও ব্যথাবেদনা মিলিয়ে যায়— গায়ে ম্যাগনেট বুলিয়ে ব্যথাবেদনা ভ্যানিশ করে দেওয়ার মতোই। লালুবাবু, ধৈর্য থাকলে বলুন, আরও বলি। নইলে—'

'বলে যান,' বললেন লালুবাবু।

'বৈজ্ঞানিকরা যুগে যুগে একইরকম। নতুন তত্ত্ব বা ধারণাকে নস্যাৎ করে দেন। মেসমারের আইডিয়াকেও তাঁরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। উলটে সিদ্ধান্ত নিলেন, মেসমারের এই উদ্ভট থিয়োরি নিয়ে যে বেশি কপচাবে বা প্র্যাকটিস করবে, তার ডাক্তারি লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে। বেচারা মেসমার ভগ্নহৃদয়ে মারা গেলেন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে।

'কিন্তু মেসমার অমর হয়ে রইলেন তাঁর তিন ছাত্রের মধ্যে। যে বছর ভদ্রলোক ধরাধাম ত্যাগ করলেন, সেই বছরই তাঁর এক বড়লোক এবং অভিজাত ছাত্র আর্মান্ড জ্যাকুইস দুই সহোদর ভাইকে নিয়ে স্থানীয় চাষাদের ওপর অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌মের ডাক্তারি আরম্ভ করলেন। এঁরা বিস্তর টাকা দিয়েছিলেন মেসমারকে অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌ম নিয়ে পসার জমানোর জন্যে। গুরুর মৃত্যুর পর শিষ্যরা উঠেপড়ে লাগলেন কারও তোয়াক্কা না রেখে। মেসমারের নির্দেশ অনুযায়ী বাগানের একটা লেবুগাছকে তাঁরা ম্যাগনেটাইজ্‌ করলেন এবং রোগীদের গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন যাতে প্রভাবটাকে দেহ শুষে নিয়ে পারে। এই করতে গিয়েই বিরাট একটা আবিষ্কার করে বসলেন তিন ভাই— এমন একটা আবিষ্কার যা বিপ্লব আনল ভবিষ্যতের ভেষজ বিজ্ঞানে।

'১৭৮০ সালে একদিন ভিক্টর রেস নামে বিশ বছরের এক রাখালের চিকিৎসা করেছিলেন মার্কুইস। আলগাভাবে তাকে বেঁধেছিলেন গাছটার সঙ্গে; একটা চুম্বক বোলাচ্ছিলেন তার মাথা আর শরীরের ওপর দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল, ম্যাগনেটিক প্রবাহটা জোরদার করা। সবিস্ময়ে মার্কুইস লক্ষ করলেন, কিছুক্ষণ ধরে চুম্বকটা শরীরের একটু ওপর দিয়ে ওঠানোনামানো করার পর চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল ভিক্টর। মার্কুইস তখন হুকুম দিলেন, জাগো হে ছোকরা, বাঁধনটা নিজেই খোলো। ভিক্টর চোখ বন্ধ করেই হুকুম তামিল করল। তারপর স্বপ্নচারী অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে ভ্রমণকারীর মতো হাঁটতে লাগলেন বাগানে।

ইংরেজিতে স্বপ্নচারীকে বলে সোমনামবুলিস্ট— আপনারা ইংরেজিটা না বললে বুঝবেন না বলে বললাম— কিছু মনে করবেন না। মার্কুইস ওষুধপত্র সম্বন্ধে অনেক খবর রাখতেন বলেই এ ঘটনা থেকে বুঝতে পারলেন, একটা ঘোরের মধ্যে ভিক্টরকে এনে ফেলেছিলেন তিনি চুম্বক বুলিয়ে। কিন্তু ঘোরটা যে কী তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

'লালুবাবু, এরপরেও দুশো বছর কেটে গেছে। হিপনোটিজ্‌ম কাকে বলে আমরা তা জেনেছি— কিন্তু হিপনোটিজ্‌ম কী— এ প্রশ্নের উত্তর আজও কেউ দিতে পারে না।

'হিপনোটিক ঘুমে মনের কিছুটা অংশ কিন্তু বিলক্ষণ সজাগ থাকে। হিপনোটিস্টের হুকুম শোনে— তামিলও করে। লালুবাবু, নরেশবাবু, দীননাথবাবু— খাকিরামবাবাও ঝানু হিপনোটিস্ট। তিনি যে পাথরটা বুলিয়ে রোগ সারিয়েছেন, সেটা চুম্বক। আমাকে হিপনোটাইজ্‌ও করেছেন সেই পাথর বুলিয়ে। তারপর তাঁর হুকুমে হেঁটে চলে এসেছি শ্মশান থেকে— স্বেচ্ছায় তো যেতে চাইনি— তাই সম্মোহন করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। গ্রামের খড়ের গাদায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। আকা— মানে— সরল গ্রামবাসীরা আকাশের উড়ন্ত বাদুড় দেখে কল্পনা করে নিয়েছে, আমি ভেসে এসেছি আকাশ দিয়ে। এইভাবেই তো বুজরুকদের ব্যাবসা ফলাও হয়, গেঁইয়ারাই অতিরঞ্জিত করে ওদের পসার বাড়িয়ে দেয়।'

কানু কর্মকার বক্তৃতা শেষ করতেই লালুবাবু মুখে মুখে বলে উঠলেন, 'আপনি তা হলে পুরো ব্যাপারটা হিপনোটিজ্‌মের কেস বলে চালাচ্ছেন?'

'আমি চালাচ্ছি না— যা ঘটেছে, তাই বলছি।'

'কিন্তু আপনি স্বীকার করছেন, এর পিছনে চুম্বকের কারসাজিও আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। ওই ব্যাপারটা যাচাই করবার জন্যেই তো গিয়েছিলাম খাকিরামবাবার কাছে। মেসমারের অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজ্‌ম যে বুজরুকি নয়, তারই প্রমাণ সংগ্রহ করতাম খাকিরামবাবুর সম্মুখে। লোকটা কথাই বলল না।'

নাছোড়বান্দা সুরে লালুবাবু আবার বললেন, 'মোট কথা, ম্যাগনেটের বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের আশ্চর্য ক্ষমতায় আপনি তাহলে বিশ্বাসী?'

'আলবাৎ বিশ্বাসী—'

'ব্যস, ব্যস, এইটুকুই শুধু শুনতে চেয়েছিলাম আপনার মুখে। চৌম্বকক্ষেত্রের অত্যাশ্চর্য শক্তিতে আপনি যখন বিশ্বাসী, তখন এই চৌম্বকক্ষেত্রেরই একটা অবিশ্বাস্য শক্তির ঘটনা আপনাকে শোনাতে পারি কী?'

'লেঙ্গি মারবেন নাকি?' সুমিষ্ট হেসে বললে কানু কর্মকার।

'না, না, কিছু জ্ঞান দেব,' বক্রসুরে বললেন লালুবাবু।

অট্ট হেসে বললে কানু কর্মকার, 'যেহেতু আমি আপনাকে দিয়েছি, তাই?— বেশ, বেশ শুরু হোক জ্ঞানদানপর্ব।'

রসিকতার রসে একটুও না ভিজে গম্ভীরমুখে লালুবাবু বললেন, 'আপনার শূন্যে উড়ে আসার পিছনেও যে চৌম্বকক্ষেত্র বিরাজমান, হয়তো আমি তা প্রমাণ করতে পারব না। না, না— এখন আর আপনি জ্ঞান দেবেন না— আমার পালা আগে শেষ হোক। কানুবাবু, ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে অনেকরকম গবেষণাই চলছে আজকের দুনিয়াতে। তার মধ্যে কিছু

প্রকাশ পাচ্ছে, কিছু গুপ্ত থেকে যাচ্ছে— যেমন, ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট।'

অমনি বললে কানু কর্মকার, 'ওটা তো একটা কিংবদন্তি।'

'কিংবদন্তী পর্যায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা কী জানেন?'

'ভাসা ভাসা জানি। ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে জাহাজ অদৃশ্য করে দেওয়া ফ্যানট্যাসি তো?'

'তার চাইতে বেশি। উড়নচাকি নিয়ে যত গালগল্প পৃথিবীতে ছড়িয়েছে, ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট তার একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অকাল্ট সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করবার সময়ে লেথব্রিজ একটা যন্ত্রের কথা বলেছিলেন। ঠিক এই ধরনের যন্ত্র নাকি তৈরি করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের বিজ্ঞানীরা— খবরটা যিনি ফাঁস করে দিয়েছিলেন, তিনি হেঁজিপেঁজি মানুষ নন— যুগ্ম নক্ষত্র অর্থাৎ বায়নারি স্টার আবিষ্কার করেছিলেন ইনি। জানেন তো, যুগ্ম নক্ষত্র দু'টি পরস্পরকে আকর্ষণ করে বলে একই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অর্থাৎ ভারকেন্দ্রের চারপাশে আবর্তিত হয়। যাই হোক, ড. জেসাপ ছিলেন মিশিগান ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিজ্ঞান আর গণিতের শিক্ষক। ১৯৫৫ সালে ফ্লাইং সসার্সের ওপর একটা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনকা আর মায়া ধ্বংসস্তূপ নিয়ে গবেষণা করে ইনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেই একই সিদ্ধান্তে লেথব্রিজও এসেছিলেন নিজের চিন্তাভাবনা দিয়ে। সিদ্ধান্তটা এই: ইনকা আর মায়া সভ্যতায় বিরাট বিরাট পাথরগুলোকে শূন্যে ভাসিয়ে তোলা হয়েছিল বিশেষ কোনও শক্তি দিয়ে। ১৯৩৫ সালে জেসাপের বইটা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্ল অ্যালেন নামে এক ভদ্রলোক দু'খানি চিঠি লেখেন জেসাপকে— ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের বিবরণ ছিল সেই চিঠিতে।

'কার্ল অ্যালেন লেখেন, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকান নৌবহর প্রচণ্ড রকমের শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রয়োগ করেছিল ফিলাডেলফিয়ায় একটা যুদ্ধজাহাজের ওপর। ফল হয়েছিল অবিশ্বাস্য। পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল জাহাজটা। ফিলাডেলফিয়া ডক থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেই যুদ্ধজাহাজ নাবিক-টাবিকসমেত দৃশ্যমান হয়েছিল ভার্জিনিয়ার নিউপোর্ট ডকে।

কার্ল অ্যালেনের এই চিঠির মধ্যে কিন্তু পরস্পরবিরোধী তথ্য ছিল। জেসাপের বন্ধু ড. ম্যানসন ভ্যালেনটাইনের রিপোর্ট অনুযায়ী জেসাপকে নাকি আমেরিকান নৌবহর ডেকে পাঠিয়েছিল। কার্ল অ্যালেনের ঠিকানায় কিন্তু তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি— যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তিন বছর পরে ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে রহস্যজনকভাবে মারা যান জেসাপ— মৃত্যুটা যে আত্মহত্যা নয়, তা বলেছিলেন বেশ কয়েকজন উড়নচাকি গবেষক। কিন্তু রাশিয়ানরাও নাকি জেনে ফেলেছিলেন, ফিলাডেলফিয়ায় একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল। ড. ভ্যালেনটাইন জোর দিয়ে শুধু বলেছিলেন, জেসাপ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তি সম্পর্কে একটা থিয়োরি খাড়া করেছিলেন। এই শক্তি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে যে কোনও বস্তুকে এক ডাইমেনশন থেকে আর এক ডাইমেনশনে সরিয়ে দেওয়া যায়— তার চেহারা পালটে দিয়ে। মি. কানু কর্মকার, খাকিরামবাবা যে ঠিক এই কাণ্ডই করেননি, কী করে জানছেন? উনি চুম্বকের রোগহর শক্তি

সম্পর্কে যখন ওয়াকিবহাল, চৌম্বকক্ষেত্র দিয়ে আপনাকে হালকা করে ভাসিয়ে আকাশপথে পাচার করেও তো দিতে পারেন।'

'ননসেন্স,' বললে কানু কর্মকার।

'আপনি কী শুনেছেন, মামা-ভাগনে অঞ্চলে প্রায় রাত্রে পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু পাথর ভাসতে দেখা যায়?'

চোখে চোখে না তাকিয়ে কানু কর্মকার বললে, 'তাই নাকি?'

'আপনি জানেন কানুবাবু, না জানার ভান করে লাভ হবে না। চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করে যিনি টন টন ওজনের পাথর ভাসাতে পারেন, তিনি কি আপনার এই নশ্বর দেহখানা শূন্যে ভাসাতে পারেন না?'

চোখ কপালে তুলে কানু কর্মকার বললে, 'নশ্বর কাকে বলছেন মশাই? এক ছটাক চর্বি যদি আবিষ্কার করতে পারেন— জানেন রোজ ভোরে ডনবৈঠক মারি এখনও? তারপর আদাছোলা খেয়ে—'

'কথা ঘুরিয়ে লাভ নেই মি. কানু কর্মকার,' কাটা কাটা স্বরে বললেন লালুবাবু, 'আমরা আদাছোলা খাই না— তাই বলে ঘাসে মুখ দিয়েও চলি না। আপনি যে অনেক কিছুই জানেন, তা জানি। আপনার লক্ষ্য খাকিরামবাবার রহস্য ভেদ করা— আমাদেরও লক্ষ্য তাই। আসুন, হাতে হাত মিলিয়ে তদন্ত করি। রাজি?'

তড়াক করে লাফিয়ে হাত বাড়িতে দিয়ে একগাল হেসে কানু কর্মকার বললে, 'একশোবার রাজি। একথাটা আগে বলতে হয়।'

১৫. সোনার তেল

সিউড়ি বেড়াতে এসে এ কী লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ছি একটু একটু করে?

লালুবাবুর স্টুডিয়োতে ফিরে এসে সেই কথাই বলছিলাম। ক্রমশই দেখছি দল ভারি হচ্ছে। প্রথমে রবিনকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দলে এলেন লালুবাবু, নরেশও দলছাড়া থাকতে চাইল না। এরপর দুলিচাঁদকে বাজাতে গিয়ে লোকটা আমাদেরকেই বাজিয়ে দিল বেশ করে এবং চলে এল আমাদের দলে। তারও লক্ষ্য রহস্যময় পুরুষ খাকিরামবাবা। শেষকালে এল কিনা সাংবাদিক কানু কর্মকার।

কানু কর্মকার দলে ভিড়লেও পেটের কথা যে পুরোপুরি ফাঁস করেনি, তা আমরা তিনজনেই বুঝলাম। তা সত্ত্বেও ঠিক করলাম, সেইদিন বিকেল নাগাদ আমরা এই পাঁচজনে মামা-ভাগনে পাহাড়ের কাছে একচক্কর দিয়ে আসব। প্রয়োজন হলে দুবরাজপুর থানাতেও দল পাকিয়ে আসব— চৌকিদার, দফাদারদের সাহায্যও তো কম নয়। দারোগাকে জপাতে হবে সবার আগে।

প্ল্যানমতো বিকেলবেলায় সবাই হাজির হলাম মামা-ভাগনে পাহাড়ের অনতিদূরে। গাড়ি থেকে নেমে আমি, কানু কর্মকার, নরেশ আর লালুবাবু, দুলিচাঁদকে ঘিরে সবে দাঁড়িয়েছি,

এমন সময়ে একটা বিশাল কামপালা গাড়ি এসে নিঃশব্দে ব্রেক কষল আমাদের সামনে।

পেছনের জানলা থেকে মুখ বাড়াল একজন হৃষ্টপুষ্ট মাড়োয়ারি। ঘি-দুধে নধর মুখকান্তি। বললে আকর্ণ হেসে, 'মোশাইরা কি হেখানেই থাকেন?'

ঠোঁটকাটা কানু কর্মকার বলে উঠল, 'আপনি মশাই কাকে চান জানতে পারি?'

'হামি তো চায় এক সাধুকে।'

'কী নাম আছে সাধুটার?'

'এ বজরঙ্গ,' ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল হৃষ্টপুষ্ট মাড়োয়ারি, 'কী নাম আছে রে সাধুবাবার?'

'খাকিরামবাবা,' বলল ড্রাইভার।

'হাঁ, হাঁ, খাকিরামবাবা। বহুৎ আচ্ছা সাধু আছে। হামি নাম শুনিয়েই ছুটে এসেছি।— আপনারা চেনেন?'

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম পাঁচজনে। দুলিচাঁদ কচরমচর করে পান চিবুতে চিবুতে কেবল নিমীলিত চোখে চেয়ে রইল মাড়বারনন্দনের দিকে।

কানু কর্মকার বলল, 'বাবা তো কাউকে দর্শন দেন না। বহুত ঝামেলা করেন।'

'সো হোবে না, সো হোবে না— সুরজলাল ঝামেলাকে ডরায় না, দর্শন হামি কোরবোই।'

'প্রাণ নিয়ে যে টানাটানি পড়বে।'

'কেনো, কেনো? কী হোবে?'

'সাধুবাবার পোষা সাপ ক্যাঁক করে কামড়ে দেবে।'

'সিয়ারাম! সিয়ারাম! আমি সুরজমল, সাধুবাবাকে লাখোপতি বানিয়ে দিবো বোলেই এসেছি— হামাকে সাপে কামড়াবে কেনো?'

ভুরু কুঁচকে কানু কর্মকার বললে, 'লাখোপতি বানাবেন কেন?'

'এতো বোড়ো সাধুবাবা— কোতো পাওয়ার তাঁর— তাই তাঁকে লাখটাকা দিবো বোলেই এসেছি। হামাকে সাপে কামড়াবে না।'

কানু কর্মকার নির্বিকারভাবে বললেন, 'তা হলে যান, মরুন গে।'

মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ ষাট। কিন্তু ঘি-দুধের গুণে বেশ তাগড়াই আর জোয়ান চেহারা। কানু কর্মকারের কথা শুনে কামপালা হাঁকিয়ে একটু গিয়েই আবার গাড়ি থামিয়ে, গাড়ি থেকে নেমে, হেঁটে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। পড়ন্ত রোদ ঠিকরে গেল পাঞ্জাবির হিরের বোতাম থেকে।

'কসুর নেবেন না, আপনারা এখানে কী কোরছেন?'

কানু কর্মকার জবাবটা দিল, 'গল্প।'

'গোপ্পো করছেন? আরে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। লেকিন কীসের গোপ্পো?'

খাটোগলায় কানু কর্মকার বললে, 'জ্বালালে দেখছি।' পরক্ষণেই বললে উঁচু গলায়, 'খাকিরামবাবার গোপ্পো।'

হা হা করে হেসে বললে মাড়োয়ারিবাবু, 'সো তো বুঝতে পেরেই নেমে এলাম। বাবার

তো অনেক পাওয়ার— আপনারা কী কী শুনিয়েছেন, থোড়াসে বলবেন?'

'পাওয়ারের জ্বালায় আমরা নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছি। কাউকে শূন্যে ভাসিয়ে পাহাড়ের বাইরে পাচার করছেন, কাউকে উড়ন্ত সাপ লেলিয়ে দিয়ে ভাগাচ্ছেন। আবার রোগী এলে এই মারেন কি সেই মারেন করেও রোগীর রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন।'

চোখ বড় বড় করে যেন লাফিয়ে উঠল মাড়োয়ারিবাবু, 'তা হলে তো ঠিক নিউজই শুনেছিলাম বোড়োবাজারে।'

'কী শুনেছিলেন?'

'সো এক ফ্যানটাসটিক নিউজ মোশাই। উনি নাকি সোনার তেল বানিয়েছেন। হিরের তেল ভি বানাতে পারবেন বোলেছেন। হাম তো তুরন্ত আ গ্যায়া ইস লিয়ে।'

খুব আস্তে আস্তে নরেশ বললে, 'সোনার তেল?'

'হাঁ, হাঁ, সোনার তেল। একজিমা বিলকুল সেরে যাচ্ছে সেই তেলে। অয়েল অফ গোল্ড। হামি তো সেই পেটেন্টটাই কিনে লিব লাখ টাকা দিয়ে। দো' লাখ দিব হিরের তেল বানালে— অয়েল অফ ডায়মন্ড। এক্সপোর্ট মার্কেটে লুফে নেবে।'

দুলিচাঁদ কচরমচর করে পান চিবিয়েই চলেছে দেখে আমিই শুধোলাম, 'কে বলেছে আপনাকে খাকিরামবাবা সোনার তেল বানিয়েছে?'

'সো জেনে কী কোরবেন? খবর ঠিক এসে গেছে। লাখ টাকায় কিনে লিবো ফর্মুলাটা।'

নাচার গলায় কানু কর্মকার বললে, 'তা হলে আপনিই যান।'

'আপনারা?'

'গোপ্পো করব।'

ভয় ভয় চোখে মামা-ভাগনে পাহাড়ের উঁচু উঁচু পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে মাড়বারনন্দন বললে, 'তা হোলে যাব বলছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাখ টাকা পেলে সাপের বিষ শুদ্ধ নেমে যায়— খাকিরামবাবা তো ছাপোষা সাধু।'

'তা হলে যাই,' বলে হেঁটে গিয়ে কামপালায় উঠে বসল চলমান টাকার পাহাড়।

মিনিট পনেরো পরে আঁধার বেশ ঘন হল। হঠাৎ বিকট চিৎকারে আকাশ যেন ফালা ফালা হয়ে গেল। চিৎকারটা ভেসে এল মামা-ভাগনে পাহাড়ের দিক থেকে।

একটু পরেই নক্ষত্রবেগে ধেয়ে আসতে দেখলাম কামপালা গাড়িটাকে। হেডলাইট জ্বালিয়ে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দুবরাজপুরের দিকে। ধুলোর মধ্যে দিয়ে জানলার ফাঁকে দেখলাম গাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে। নিঃসীম আতঙ্কে রক্তহীন হয়ে গেছে মাড়োয়ারিনন্দনের মুখখানা।

ধুলোর জন্যে আর হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জন্যে এর বেশি কিছু দেখতে পেলাম না। তবে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনলাম।

ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আওয়াজটা যেন ধেয়ে গেল উধাও কামপালার পেছনে পেছনে।

১৬. খাকিরামবাবার সাধনকক্ষ

সূর্য তখনও ওঠেনি। উষার প্রসন্ন কিরণে মামা-ভাগনে পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নীরব নিস্পন্দ।

মন্দিরের দিকের থেকে উঠে এল গাঁজাখোর সেই পুরুতঠাকুর। সারারাত গাঁজা খাওয়ার দরুন বোধহয় চক্ষুদুটি রীতিমতো রক্তবর্ণ। আপন মনে বকরবকর করতে করতে এসে দাঁড়াল তেরপলের ধারে। তারপর অ্যালুমিনিয়ামের মগে করে তেরপলে সঞ্চিত শিশির তুলে ঢালতে লাগল চওড়ামুখ একটা বোতলে। বোতল ভরতি হতেই প্যাঁচানো ছিপিটা এঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা পাথরের আড়ালে।

কিছুক্ষণ পরেই আবির্ভূত হল শূন্য হাতে। বকরবকর করতে করতে গেল পরিত্যক্ত মন্দিরের দিকে। দাওয়ায় উঠল। ট্যাক থেকে চাবি বের করে তালা খুলল। পাল্লা ঠেলে ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল। বেরিয়ে এল একটা ভারি প্যাকিং কেস দু'হাতে ধরে। দাওয়াতে প্যাকিং কেস নামিয়ে রেখে ফের তালা দিল দরজায়। চাবি ট্যাঁকে গুঁজে প্যাকিং বাক্সটা কাঁধে তুলে, নেমে গেল বড় বড় পাথরগুলোর মাঝখান দিয়ে। একটু পরে যেন হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

পাতালপ্রকোষ্ঠে বসে আছেন খাকিরামবাবা। ঘরটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামে ঠাসা। গুমগুম শব্দে জেনারেটর চলছে। ইলেকট্রিক আলোয় পাতাল প্রকোষ্ঠ ঝলমল করছে। বিবিধ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরিবৃত অবস্থায় খাকিরামবাবা নির্মিমেষে চেয়ে আছেন একটা ডিসটিলেশন অ্যাপারেটাসের দিকে। পুরুতঠাকুরের আনা শিশির-ভরতি বোতলটা রয়েছে পাশের টেবিলে।

এমন সময়ে পুরুতঠাকুর প্রবেশ করল প্রকোষ্ঠে।

খাকিরামবাবা চোখ না ফিরিয়েই বললেন, 'মতি, বাক্সটা এনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এনেছি,' কাঁধ থেকে ভারি বাক্সটা নামিয়ে বললে পুরুতঠাকুর।

'জার্মানির যন্ত্র তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমেরিকান অ্যাপারেটাস তো আপনার কাজে লাগল না।'

'দূর, দূর! একগাদা বিদেশি মুদ্রা জলে গেল। এবার কার্ল জাঙ-কে সোনার তেল যখন পাঠিয়েছি, আশা করা যায়, সবচেয়ে নতুন আবিষ্কারটাই পাঠাবে,' খাকিরামবাবা দ্রুতহাতে বাক্সের ঢাকনা খুলতে খুলতে বললেন।

পুরুতঠাকুর, মানে, মতি বলে খাকিরামবাবা যাকে ডাকলেন, সে একটা লম্বা টুলের ওপর বসে পড়ে বললে, 'কিন্তু সোনার তেল কি কার্ল জাঙয়ের কাছে পৌঁছেছে?'

বাক্স খোলা বন্ধ হয়ে গেল। মতির দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে খাকিরামবাবা বললেন, 'কেন? একথা বলছ কেন?'

'মাড়োয়ারিটা সোনার তেলের খবর পেল কী করে?'

'মাড়োয়ারি? কোন মাড়োয়ারি?'

'আপনি তখন ব্যস্ত ছিলেন বলে আর বলিনি। নিজেই নন্দী আর ভৃঙ্গীকে লেলিয়ে দিয়ে

তাড়িয়েছি ব্যাটাকে। দীননাথ, নরেশ, দুলিচাঁদ আর ওই রিপোর্টার কানু কর্মকারকে জিজ্ঞেস করছিল আপনার কথা— সোনার তেলের পেটেন্ট কিনে নেবে নাকি লাখ-দু'লাখ টাকা দিয়ে। দিলাম নন্দী আর ভৃঙ্গীকে লেলিয়ে।'

চোখ বড় বড় করে খাকিরামবাবা বললেন, 'ওই চার ছ্যাঁচড়া তখন কোথায়?'

পুরুতঠাকুর, মানে মতি বুঝে নিল 'চার ছ্যাঁচড়া' বলতে খাকিরামবাবা কাদের বোঝাচ্ছেন। বললে, 'এইদিকেই নজর রেখেছিল কাল বিকেলের দিকে। নন্দী ভৃঙ্গীর ভয়ে পাহাড়ের ভেতরে আসবার মুরোদ তো নেই— ছোঁক ছোঁক করছিল কিছুদূরে। এমন সময়ে মাড়োয়ারি ব্যাটাচ্ছেলের কামপালা গাড়িখানা এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।'

খাকিরামবাবা ধপ করে একটা টুলে বসে পড়ে বললেন, 'কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ! মতি, ভাগ্যিস তুমি আমেরিকা টামেরিকার ডিগ্রিগুলো নিয়ে এসেছিলে, তাই তো কামপালা গাড়ি কাকে বলে চিনতে পারলে। কিন্তু চিনলে কী করে এতদূর থেকে! নিশ্চয়ই...'

ঘাড় নেড়ে মতি বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ইলেকট্রনিক দূরবীন নিয়ে একটু আশেপাশে চোখ বুলোচ্ছিলাম। এমন সময়ে দেখলাম চার মূর্তিকে। গুটিগুটি এগোচ্ছে। বাকিটা বলার আগে আবার বলি বাবা, আমার ওই আমেরিকান ডিগ্রির খোঁটা আর দেবেন না। অনেক জন্ম তপস্যা করলে আপনার মতো গুরু পাওয়া যায়। আমেরিকান সায়েন্টিস্টরা জানে কি? শনি-মঙ্গল-চাঁদে রকেট পাঠালেই কী বড় হওয়া যায়? বিশ্বরহস্য ধরা যায়? ধরেছেন আপনি। এসে দেখে যাক।'

খুশি হলেন খাকিরামবাবা। হাসি হাসি মুখে বললেন। 'কী আর ধরেছি বল। জ্ঞানসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে এখনও নুড়ি কুড়িয়েই মরছি। যাক গে সেকথা।— ইলেকট্রনিক দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখলে চার ছ্যাঁচড়া গুটিগুটি এগোচ্ছে?'

'হ্যাঁ, তারপরেই কামপালা গাড়িটা এসে পাশে দাঁড়াতেই টেলিপ্যাথি ওয়্যারলেস চালু করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে ভুড়ভুড় করে ওদের কথাবার্তাগুলো এসে গেল। বাবা, আপনি রিসিভিং সেটের একটা ব্যবস্থা এবার করুন। নিজে রিসিভার হয়ে আর কদ্দিন থাকব?'

তার চেষ্টা তো চলছে, মতি। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টিকে অত চট করে নকল করা কী যায়? তোমার অতীন্দ্রিয় অনুভূতিবোধটা একটু বেশি পরিমাণে আছে বলেই তো রিসিভার হিসেবে তুমি আদর্শ। ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড এই শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। আপাতত তাই শুধু সেই যন্ত্রটুকুই তৈরি করছি— তাতেই তোমার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা এত বেড়ে গেছে... এখন তো রেডিয়োর মতো ফিল্ড রিসিভারের নব ঘোরালেই অনেক দূরপাল্লার কথাবার্তা বা চিন্তাভাবনার ঢেউও তোমার ব্রেন রিসিভারে পৌঁছে যাচ্ছে। এর পরের ধাপে তোমার ব্রেন রিসিভারের নকল রিসিভার তৈরি করে দেব। মতি, সেদিন পৃথিবীর মানুষ শুধু ঘরে বসে বসে টেলিপ্যাথিক রেডিয়ো চালিয়ে দিয়ে অনেক দূরের চেনা-জানা অচেনা-অজানা মানুষের চিন্তাভাবনা কান দিয়ে পর্যন্ত শুনতে পাবে। হাঃ হাঃ হাঃ! খাকিরামবাবার সৃষ্টি সেদিন আইনস্টাইনের আবিষ্কারকেও ছাড়িয়ে যাবে। যাক, যাক, সেকথা, এরকম অনেক আবিষ্কারই করব এই মামা-ভাগনে পাহাড়ে বসে— যদি উৎপাত এড়িয়ে টিকে থাকা যায়।

তারপর বলো কী হল— আহা, বলছি তো, টেলিপ্যাথিক ব্রেন রিসিভার তৈরির কাজে এবার হাত দেব— বলো বলো, চার ছ্যাঁচড়ার সঙ্গে মাড়োয়ারিটার কী কথাবার্তা হল?'

মতি বললে, মাড়োয়ারিটা নাকি সোনার তেলের সন্ধান পেয়েছে। পেটেন্ট কিনতে আসছিল আপনার কাছে। দীননাথরা সবাই মিলে বারণ করল। কিন্তু কিছুতেই শুনল না। পাহাড়েশ্বরের বোর্ডটার কাছে এসে দাঁড়াতেই লেলিয়ে দিলাম নন্দী ভৃঙ্গীকে। যেই ডানা মেলে পাথরের আড়াল থেকে উড়ে গেল দু'-দুটো শঙ্খচূড় আর গোখরো— ঝুলে পড়ল মাড়োয়ারির চোয়াল। তাড়াতাড়ি গাড়ির সবকটা জানলার কাচ তুলে দিয়ে চিৎকার করে ড্রাইভারকে বললে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সটান বড়বাজারে যেতে। নন্দী আর ভৃঙ্গী ততক্ষণে বন্ধ জানালায় মুখ দেখিয়েছে। লিকলিকে চেরা জিভ বের করে কাচের গায়ে বারকয়েক বুলিয়ে মুখ হাঁ করে বিষদাঁত দেখিয়েছে। আপনি ঠিক যেভাবে শিখিয়েছেন, তা-ই করে গেল। তাইতেই কাজ হল সাংঘাতিক। গ্রাঁ প্রি মোটর রেসে নামলে সেই মুহূর্তে কামপালা নির্ঘাৎ ফার্স্ট হয়ে যেত। সে কী স্পিড! আমি কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম নন্দী আর ভৃঙ্গীর স্পিড দেখে। ওদের ডানায় এত জোর হয়েছে, কল্পনাও করতে পারিনি। কামপালার পেছনে পেছনে, ধরুন, ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার স্পিডে স্বচ্ছন্দে ধেয়ে গেল ওরা। ডানা ঝটপটানির আওয়াজটুকু কেবল কান দিয়ে শুনল ওই চার ছ্যাঁচড়া। তাতেই রক্ত জল হওয়ার জোগাড়—' বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল মতি।

খাকিরামবাবা ডাকলেন, 'নন্দী! ভৃঙ্গী!'

সুড়ঙ্গপথে ডানা ঝটপটানির আওয়াজ শোনা গেল।

১৭. ভাইটাল এসেন্স রহস্য

বিশালাকায় ভয়ংকরদর্শন শঙ্খচূড় আর গোখরো ডানা মেলে উড়ে এসে বসল খাকিরামবাবার কাঁধের ওপর। ডানাদুটো মুড়ে গায়ের সঙ্গে লেপটে ফেলে কুণ্ডলী পাকিয়ে এমন পোজ নিয়ে বসল যেন খাকিরামবাবা স্বয়ং শিব।

খাকিরামবাবা বললেন, 'তোদের শোনবার ক্ষমতা দেননি সৃষ্টিকর্তা, আমি তোদের কান দিয়েছি; ডানা ছিল না— ডানা দিয়েছি; বুদ্ধি ছিল না— তাও দিয়েছি। কেন দিয়েছি তা মনে আছে তো?'

মাথা নাড়ল শঙ্খচূড় আর গোখরো।

খাকিরামবাবা বললেন, 'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। ড. ফুঁয়ের শয়তানি বানচাল করবার জন্যেই তোদের সৃষ্টি— মানুষকে কামড়ানোর জন্যে নয়। শুধু ভয় দেখাবি— আর কিছু করবি না, যা, পালা!'

ডানা ঝটপটিয়ে কাঁধ থেকে উড়ে গেল মূর্তিমান দুই আতঙ্ক।

খাকিরামবাবা সেইদিকে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'সোনার তেলের খবরটা জানাজানি হল কী করে বলো তো?'

'আপনি যে স্যাম্পল শিশিটা পাঠিয়েছিলেন, আমার মনে হয় সেইটাই লোপাট হয়েছে।'

'সে কী। লোপাট হবে কোত্থেকে?'

'লোপাট হওয়ার জায়গা কি একটা খাকিরামবাবা? পাঠিয়েছি তো দুবরাজপুরের পোস্ট অফিস থেকে। কলকাতার জিপিও-তে শুনছি আজকাল খাম চুরি হচ্ছে ডাকটিকিটের লোভে— পার্সেল চুরি তো হবেই— বিশেষ করে যে পার্সেল যাচ্ছে জার্মানির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. কার্ল জাঙ-এর কাছে।'

খাকিরামবাবার মুখ শুকিয়ে গেল মতির কথা শুনে। বললেন, 'কিন্তু শিশির ভেতরে কী আছে, আগে থেকে আঁচ করবে কী করে?'

মতি বললে, 'আপনি কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আছেন বলেই ইন্ডিয়ার কোনও খবরই রাখেন না। মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবি, ভাটিয়া ব্যবসাদাররা টাকা দিয়ে হাত করছে সবক'টা সরকারি দপ্তরের কাজের লোকদের। ডকুমেন্ট পর্যন্ত আগে পাচার হচ্ছে তাদের কাছে। বিদেশে বৈজ্ঞানিকের কাছে অয়েল অফ গোল্ড পাঠাচ্ছেন এক ভারতীয় যোগী, এ খবর সরকারি দপ্তর থেকেই তারা আগে পেয়েছে। তারপর নমুনা হাত করে দেখেছে রপ্তানির বাজার আছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে ছুটে এসেছিল আপনার কাছে ফর্মুলা কেনবার জন্যে।'

খাকিরামবাবা মাথা চুলকে, মানে জটা চুলকে বললেন, 'কিন্তু সোনার তেল দিয়ে মারাত্মক একজিমা জন্মের মতো সারানো যায়, তাও কি জেনেছে?'

মতি এবার একটু রেগে গিয়েই বললে, 'জেনেছে বইকি। না জানলেও কি আসে যায়? সোনার তেল নামটাই যে অদ্ভুত। সোনার আবার তেল হয়? ধাতু থেকে তেল কখনও বেরোয়? তেল বেরোয় গাছপালা থেকে, বীজ থেকে, এমনকী দরকার হলে মানুষের তেল অথবা ভূতের তেলও বের করা যায়, কিন্তু ধাতুর তেলের নাম কেউ কখনও শুনেছে? অথচ বিদঘুটে এই জিনিসই পাঠানো হচ্ছে জার্মানির এক বৈজ্ঞানিকের কাছে।'

খাকিরামবাবা প্রশস্তি শুনে বেশ খুশি হলেন। মাড়ি বের করে হাসলেন। বললেন, 'তা ঠিক মতি, ঠিকই বলেছ। সোনার তেল দিয়েই তো শুরু, এরপর বের করব রুপোর তেল আর পারার তেল— মুণ্ডু ঘুরিয়ে ছেড়ে দেব ওষুধ বিজ্ঞানীদের। ক্যানসার পর্যন্ত সেরে যাবে পারদ তেলে; যে রোগ কোনও ওষুধে সারে না, তাও সেরে যাবে আমার রুপোর তেলে। তারপর যখন বাজারে ছাড়ব আমার গ্র্যানাইট তেল— তখন ভেষজবিজ্ঞানটা ঢেলে সাজাতে হবে হে মতি, নোবেল প্রাইজ দেওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে লোকে খুঁজবে আমাকে। আমি কিন্তু এই মামা-ভাগনে পাহাড় ছেড়ে কোথাও নড়ছি না। কেউ তো জানে না আসল শক্তি এই পাহাড়ের মধ্যেই— এই পাথরের মধ্যে জমাট শক্তিকেই একটু একটু করে ছাড়িয়ে নিয়ে অসাধ্যসাধন করে চলেছি আমি।'

মতি একটু উশখুশ করে বললে, 'তা হলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তুমি জিজ্ঞেস না করলে আর কে করবে বলো? এত কাছে থেকে তুমিই তো কেবল দেখছ আমাকে। পাথরের শক্তি আমি তো চুরি করছি না— কাজে লাগাচ্ছি। কিন্তু বাটপারগুলো আশপাশে ঘুরছে অন্য মতলবে।'

‘বাবা,’ বললে মতিরাম, ‘শিশিরের জন্যে আপনি পাথর ডিসটিলেশন করেন কেন, একটু বুঝিয়ে বলবেন? এতদিন জিজ্ঞেস করিনি রেগে যাবেন এই ভয়ে।’

খাকিরামবাবা সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে কান সাফ করলেন একটা কানখুসকি দিয়ে। তারপর সেই কানখুসকি দিয়েই মাথার জটার নানান জায়গায় খোঁচাখুঁচি করলেন কিছুক্ষণ। মিনিটকয়েক এইভাবে কাটিয়ে দেওয়ার পরেও যখন মতি আর মুখ না খুলে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে, তখন বুঝলেন নাছোড়বান্দা অনুচরটি আজকে তাঁকে ছাড়বে না— কৌতূহল চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই।

বললেন গলা সাফ করে, ‘আমি যা বলব, তা কি তোমার ওইসব আমেরিকান ডিগ্রির বিজ্ঞান মেনে নেবে?’

মতি আহত কণ্ঠে বললে, ‘আবার আমেরিকান ডিগ্রির খোঁচা দিচ্ছেন? আর কত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বলুন? সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পুরুতঠাকুর সেজে ফুল আর বেলপাতা চড়িয়ে যাচ্ছি শিবের মাথায়— অথচ ওই আমেরিকান ডিগ্রির দৌলতে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতাম বাকি জীবনটা। আপনার পায়ের তলায় পড়ে আছি তবু—’

‘হয়েছে, হয়েছে। অভিমানে যে গলা বুজে গেল বাপধন,’ বললেন খাকিরামবাবা, ‘ভাইটাল এসেন্সের নাম কখনও শুনেছ?’

‘ভাই-ভাইটাল এসেন্স?’

‘আকাশ থেকে পড়লে নাকি? এইজন্যেই বলেছিলাম, মার্কিন বিদ্যে নিয়ে এসব শুনতে যেয়ো না। খামোকা আঁতকে উঠে প্রাণটা হারাবে।’

‘না, না, আঁতকে উঠতে যাব কেন? এসেন্স নিয়ে থিসিস লিখেছি তো, আমেরিকান কসমেটিক্স কোম্পানিতে এসেন্স ডিপার্টমেন্টের চার্জেও ছিলাম। কিন্তু ভাই-ভাইটাল এসেন্সের নাম তো কখনও শুনিনি।’

খাকিরামবাবা অসীম কৃপাবর্ষণ করলেন দুই নিমীলিত চক্ষু দিয়ে। বললেন করুণাঘন কণ্ঠে, ‘বেচারা। ছিলে মতিলাল পাণ্ডে, হলে পাহাড়েশ্বর পাণ্ডা। শিখেছিলে কসমেটিক্স এসেন্সের বিদ্যে— এখন শুনছ ভাইটাল এসেন্সের নাম। মাথা তো ঘুরে যাবেই। তাই না?’

কাতরকণ্ঠে মতি বললে, ‘আর কত খোঁটা দেবেন খাকিরামবাবা?’

‘না, না, খোঁটা দেব কেন? তুমিই তো আমার একমাত্র শিষ্য— তাই বাজিয়ে নিচ্ছি বারবার। বৎস মতিলাল, ভাইটাল এসেন্স হল সেই সার পদার্থ যা এই বিশ্বের পদার্থ— যা এই বিশ্বের যাবতীয় প্রাণময় বস্তু এবং প্রাণহীন বস্তুর সার পদার্থ— যা জীবদেহে আছে, উদ্ভিদদেহে আছে, প্রস্তর-মৃত্তিকা-খনিজেও আছে। এক কথায়, এই পরম সারবস্তুকেই আমি বলি ভাইটাল এসেন্স।’

‘ভাইটাল এসেন্স!’

‘ইয়েস মাই বয়, ভাইটাল এসেন্স। সেকালের অকাল্ট সায়েন্টিস্টরা জানতেন এই ভাইটাল এসেন্সের অস্তিত্ব। তাঁরা জানতেন, আর্থ ফোর্স বা পৃথিবীর শক্তি সব জিনিসের মধ্যেই আছে। এরই নাম ভাইটাল এসেন্স। পাথরের মধ্যে ভাইটাল এসেন্স এত প্রবল যে

কোটি কোটি বছরেও পাথর পালটায় না— বৎস মতিলাল, মামা-ভাগনে পাহাড়ের কিছু কিছু পাথরে এই আর্থ ফোর্স রয়েছে অত্যধিক মাত্রায়— পাথর থেকে সেই ভাইটাল এসেন্স আমি নিষ্কাশন করি শিশির দিয়ে।'

মতি বললেন, 'কিন্তু এত জিনিস থাকতে শিশির দিয়ে কেন? তাও আবার টাটকা শিশির হওয়া চাই। তেরপল বিছিয়ে আজ ভোরে এই যে এক বোতল শিশির জোগাড় করলাম, আজই তো এই দিয়ে পাথর ফোটাবেন?'

'ননসেন্স। পাথরকে ফোটাব না— পাথর থেকে ভাইটাল এসেন্স নিঙড়ে বের করব। শিশির ছাড়া আর কিছু দিয়ে তা সম্ভব নয়। তার কারণ, ভাইটাল এসেন্স উদ্ভিদের মধ্যেও আছে— অবশ্য নরদেহের মধ্যে যতটা আছে, তার চাইতে কম। আবার নরদেহের মধ্যে ভাইটাল এসেন্স যতটা আছে, খনিজ বা ধাতুর মধ্যে আছে তার চাইতে বেশি। এই কারণেই উদ্ভিদের ভাইটাল এসেন্স নিষ্কাশন করা খুবই সোজা— কঠিন হল খনিজ বা ধাতুর ভাইটাল এসেন্স নিষ্কাশন। যে ক্রিয়ায় এটি সম্ভব, তা আমি জেনেছি তিব্বত আর মিশর থেকে সংগ্রহ-করা বেশ কয়েকটা পুথি থেকে।'

তন্ময় হয়ে শুনছিল মতিলাল। খাকিরামবাবা এমনিতে কম কথা বলেন। কিন্তু আজ তাঁর মুখের চাবি খুলে গেছে।

তাই ফের শুধোয় মতিলাল, 'কিন্তু ভাইটাল এসেন্স জিনিসটা কী?'

চকিতে চোখে চোখে চাইলেন খাকিরামবাবা— 'খুব বেশি জানতে চাইছ কিন্তু।'

হাতজোড় করে মতি বললে, 'আমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না। সে পথ তো আর নেই। এই শরীরের প্রায় সবটাই তো আপনার সৃষ্টি—'

কথাটার হেঁয়ালি খাকিরামবাবা বুঝলেন। শরীর বিধাতার সৃষ্টি— এ কথা একটা পাঁচ বছরের ছেলেও জানে। অথচ শিষ্য মতিলাল গদগদ কণ্ঠে কিনা বলে বসল, তার শরীরের প্রায় সবটাই খাকিরামবাবার সৃষ্টি!

জবর হেঁয়ালি সন্দেহ নেই। খাকিরামবাবা কিন্তু স্বয়ং বিধাতার আসনে নিজেকে বসাতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত হলেন না।

মুচকি হেসে বললেন, 'যাক মনে আছে তা হলে।'

'আজ্ঞে—'

'থাক, থাক, ভাইটাল এসেন্স আসলে কী, এইটাই তো তোমার প্রশ্ন? শোনো তা হলে। ভাইটাল এসেন্স উচ্চতর এক ধরনের ভাইব্রেশন অর্থাৎ কম্পনতরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। কী বুঝলে?'

আমতা আমতা করে মতিলাল বললে, 'ভাই-ভাইব্রেশন?'

'আরে হ্যাঁ। সৃষ্টিরহস্যের মূল এই ভাইব্রেশন বা কম্পনতরঙ্গ। সঠিকভাবে এই ভাইটাল এসেন্স বা ভাইব্রেশনকে নিষ্কাশন করে ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করব বলেই তো এই পাতাল-কারখানার পত্তন করেছি।'

ঢোক গিলে বললে মতিলাল, 'তা ঠিক। সোনাকেও তা হলে এইভাবে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খাকিরামবাবা বললেন, 'ঠিক ধরেছ। সোনার ভাইটাল এসেন্স

দিয়ে সোনার তেল বানিয়েছি চর্মরোগবিশেষজ্ঞদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব বলে। সবচেয়ে দুরারোগ্য একজিমাও রাতারাতি মিলিয়ে দেব। সেদিন একটা বুড়ো এসেছিল শ্মশানে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সারা গায়ে, মুখে, হাতে পায়ে চাপ চাপ কী যেন লেগেছিল। রস গড়াচ্ছিল।'

'একজিমা। ভয়ংকর রকমের। যত চুলকোয়, ততই বেড়ে যায় রস গড়ায়। তা আমি সোনার তেলের এক্সপেরিমেন্ট করলাম। শ্মশানের মড়াপোড়া ছাই নিয়ে একটা সরায় রাখলাম, নন্দী আর ভৃঙ্গীকে বললাম তার মধ্যে বিষ উগরে দিতে। লোকটার সামনেই দাঁতের বিষ সরায় ঢেলে দিয়ে গেল নন্দী আর ভৃঙ্গী। লোকটা মনে করল, বিষমেশানো ছাইটাই বোধহয় একজিমার ওষুধ। আসলে তার সারা গায়ে মাখিয়ে দিলাম সোনার তেল। মতি, তিনদিন পর লোকটা যখন আছড়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর, নিজেই চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। মাথা মুখ গা হাত পা রীতিমতো চকচক করছে— সোনার মতো গায়ের রঙ ফুটে বেরোচ্ছে। সোনার ভাইটাল এসেন্স রাতারাতি চামড়ার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনেছে। আমার সেই সোনার তেলের নমুনাটাই শেষপর্যন্ত মাড়োয়ারির খপ্পরে গিয়ে পড়ল?'

বলতে বলতে যেন মিইয়ে গেলেন খাকিরামবাবা। সজল চোখে চেয়ে রইলেন ধূমায়িত রসায়ন সরঞ্জামগুলোর দিকে।

সান্ত্বনা দিয়ে মতি বললে, 'নমুনা চুরি হয়েছে তো বয়ে গেল। ফর্মুলা চুরি তো হয়নি। আবার বানিয়ে নেওয়া যাবে'খন। বাবা, আজকের শিশির দিয়ে কীসের তেল বের করবেন?'

'উজবুকের মতো কথা বোলো না। তেল বের করবার গবেষণা এটা নয়— ভাইটাল এসেন্স! বুঝলে হাঁদারাম?'

ধমক খেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে মতিলাল বললে, 'ওই হল গিয়ে। বলুন না আজকে কার ভাইটাল এসেন্স বের করবেন?'

খাকিরামবাবা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আজ তৈরি করব মিনারেল এসেন্স।'

'মিনারেল এসেন্স?' মতিলাল যেন খাবি খেল, 'মিনারেল ওয়াটারের নাম শুনেছি— খেয়েওছি, কিন্তু মিনারেল এসেন্স—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিনারাল এসেন্স। এই এসেন্স দিয়ে যে বড়ি বানাব, তার নাম দেব মিনারেল বড়ি। সারা পৃথিবীর ডাক্তাররা লুফে নেবে আমার তৈরি এই মিনারেল বটিকা— গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না আর স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির মাস্টারদের— মাথামোটা ছাত্রছাত্রীদের মিনারেল বটিকা খাইয়ে দিলেই সংহত হবে চঞ্চল মন, বৃদ্ধি পাবে বুদ্ধিমত্তা— হাঃ হাঃ হাঃ!'

শূন্যে চেয়ে আপনমনে হাসতে লাগলেন খাকিরামবাবা। প্রতিভাবানেরা একটু ছিটগ্রস্ত হন। কিন্তু খাকিরামবাবার মাথায় ছিট একটু বেশিই আছে দেখা যাচ্ছে।

'কী.. কীরকম করে তা হবে, বাবা?' তোতলাতে তোতলাতে শুধোয় মতিলাল।

'সিরোটোনিন কেমিক্যালের নাম জানা আছে?'

'আজ্ঞে না।' চটপট অজ্ঞতা স্বীকার করে নিয়ে মুখখিঁচুনি এড়িয়ে যায় মতিলাল।

‘বুদ্ধিমত্তা আর মন সংহত করার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় যে কেমিক্যাল, তার নাম সিরোটোনিন। কিন্তু সিরোটোনিন সরাসরি নিজের এলেম দেখানোর সুযোগ পায় না। মস্তিষ্কের দুই ভুরুর মাঝখানে পিনিয়্যাল গ্ল্যান্ড আছে। সিরোটোনিন কেমিক্যালকে নেয় এই পিনিয়্যাল গ্ল্যান্ড, ব্রেনকে দেয় মেলাটোনিন হরমোন। পরিষ্কার হল?’

‘হল।’

‘কিন্তু মুশকিলটা কি জানো? সিরোটোনিন সরাসরি পিনিয়্যাল গ্ল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছয় কিনা, তাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কাজেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনেক খবর রেখেও কাজের কাজ কিছু করতে পারছিল না। এখন পারবে— মিনারেল পিল খাইয়ে দিলেই মিনারেল এসেন্স সরাসরি উদ্দীপ্ত করবে পিনিয়্যাল গ্ল্যান্ডকে— মেলাটোনিন হরমোনের ক্ষরণ ঘটবে— বাড়বে বুদ্ধিমত্তা, সংহত হবে মন— মানুষ হবে অতিমানুষ।’

‘অতিমানুষ! আপনি বানাবেন?’

যেন ধাক্কা খেলেন খাকিরামবাবা। এতক্ষণ অনেকটা স্বপ্নের ঘোরে কথা বলে চলেছিলেন। মতিলালের বেমক্কা প্রশ্নে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন যেন।

চোখ পাকিয়ে বললেন কড়া গলায়, ‘সন্দেহ আছে?’

প্রমাদ গনল মতি। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছে তো! মুখে বললে সাত তাড়াতাড়ি, ‘না না, সন্দেহ হবে কেন?’

‘একটু আগেই নিজের মুখেই স্বীকার করেছিলে, তোমার শরীরে প্রায় সবটাই আমার সৃষ্টি।’

‘আজ্ঞে তা তো একশোবার।’

‘তা হলে আমি মানুষের আধাআধি বা কিছু কিছু তৈরি করতে পারি?’

‘আমিই তার প্রমাণ।’

‘তা হলে মানুষকে অতিমানুষ করতে পারব না কেন?’

‘নিশ্চয়ই পারবেন।’

গনগনে চোখে কিন্তু চেয়েই রইলেন খাকিরামবাবা। তারপর বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে, ‘উঁহু, তোমাকে শাস্তি পেতে হবে আমার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করার জন্যে দাও, তোমার চোখদুটো বের করে দাও।’

‘আঁ... আঁ...।’

‘চোপরাও! নিকালো চোখ। আমার চোখ আমাকে দাও। অন্ধ হয়ে থাকো আজ সারাদিন।’

সম্মোহিতের মতো মতিলাল দু'চোখের কোটরে আঙুল ঢুকিয়ে একে একে টেনে বের করল দুটো পুঁচকে টেলিভিশন ক্যামেরা। কাচের চোখের মধ্যে ছোট ছোট দুটি টিভি ক্যামেরা।

শূন্যকোটর চক্ষু মেলে তাকিয়ে দু'হাতে টেলিভিশন ক্যামেরা দুটো বাড়িয়ে ধরে বললে কাঁদো কাঁদো গলায়, ‘এই নিন বাবা, নিন আপনার দেওয়া চোখ।’

১৮. নকল মানুষ তৈরির কারখানা

আমেরিকার কেনটাকির ম্যামথ গুহার মতো সুবিশাল পাতালগুহা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। মধ্যপ্রদেশের কোটামসারে অঞ্চলে পাতালগুহা পাওয়া গেছে, কিন্তু ম্যামথ গুহার কাছে সে গুহা কিছুই নয়। নদীস্রোত হঠাৎ চুনাপাথরের মতো নরম ভূস্তর পেলে পাথর ক্ষইয়ে পাতালে চলে যায়— পাতালগুহার সৃষ্টি হয় এইভাবেই।

কিন্তু মামা-ভাগনে পাহাড়ের তলায় যে বিশাল গহ্বর বিরাজমান, তার সৃষ্টি কীভাবে, তা কেউ জানে না। মামা-ভাগনে পাহাড়ের পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু বিশাল পাথরগুলোকে মাথায় নিয়ে অত বড় একটা গহ্বর যে যুগ যুগ ধরে মাটির তলায় রয়ে গেছে, কোনও ভূবিজ্ঞানী তা কল্পনাও করতে পারেননি। দূর থেকে মামা-ভাগনে পাহাড়ের স্খলিত সুবিশাল শিলাখণ্ড দেখে স্তম্ভিত বিস্ময়ে মূক হয়ে থেকেছে ট্যুরিস্ট এবং তীর্থযাত্রী। ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করে বিরাটত্বের মহিমায় অভিভূত হয়েছে, ধ্যানগম্ভীর শিবের স্তবরূপটুকুই কেবল মনে মনে কল্পনা করেছে— কিন্তু কোনওদিন কেউ জানেনি, চোখের সামনে মাটির ওপর যে বিস্ময় জাগ্রত রয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর বিশালতা গুপ্ত রয়েছে মাটির তলায়।

প্রায় পাঁচ বিঘে জায়গা জুড়ে একটি গহ্বর। বিশাল বিশাল স্তম্ভ-খিলানের মতো অনেক উঁচু ছাদকে ধরে রেখেছে। ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। তবুও দেখা যায় না সুবিশাল সেই গহ্বরের ছাদ। এরকম গহ্বর রয়েছে পরপর আরও কয়েকটি। অন্ধকার বিরাজমান সর্বত্র। একটিতে ছাড়া।

এই গহ্বরের নীচের দিকে অত্যাধুনিক বিদ্যুৎবাতি ঝলমল করছে। সারি সারি চেম্বার। আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজানো ঘরে ঘরে। কোনও ঘরেরই অবশ্য ছাদ নেই, শুধু টিকউড দিয়ে পার্টিশন করা।

একটি প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে খাকিরামবাবা। সামনে পুতুলের মতো অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে মতিলাল। অন্ধ।

কাচের চোখে বন্দি টেলিভিশন ক্যামেরা দু'টো নিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন খাকিরামবাবা, 'কেন? এখন ঘ্যানঘ্যানানি কেন? বোমার টুকরোয় চোখদুটো যখন গেছিল, কানের পরদা ছিঁড়ে গেছিল, ডান হাতটা নষ্ট হয়ে গেছিল— তখন কি ভাবতেও পেরেছিলেন আবার চোখ ফিরে পাবে? আবার হাত ফিরে পাবে? আবার কান ফিরে পাবে?'

অন্ধ মতি নিজের দুই কান মুলতে মুলতে বললে, 'আজ্ঞে, এই কান মুলছি, আর কখনও বলব না।'

খাকিরামবাবার রাগ তখনও পড়েনি। গজগজ করতে করতে বললেন, 'বায়োইঞ্জিনিয়াররা তো হালে পানি পায়নি। ওদের বোলো আমার এই সাধনমন্দিরে এসে কিছু শিখে যেতে, চক্ষুব্যাংক থেকে চোখ এনে অন্ধের চোখের কোটরে খুব জোর বসিয়ে দিতে পারে সার্জেনরা; কিন্তু পারবে কি টেলিভিশন ক্যামেরা বসিয়ে নকল চোখের কাচ করাতে? কানের বারোটা বাজিয়ে বসেছিলে, পেরেছিল ওরা নতুন কানের পরদা প্লাস্টিক থেকে বানিয়ে দিতে?

হাতটা তো হাসপাতালে কেটে বাদ দিয়েই খালাস। নতুন হাত এইভাবে কেউ বসাতে পারত? প্লাস্টিক পেশি তৈরি করার বিদ্যে কারও জানা আছে? ইলেকট্রিক মোটর মারফত প্লাস্টিক পেশিতে সংকেত পাঠানোর কায়দা কোন মক্কেল জানে বলতে পারো? ইস্পাতের আঙুলের ওপর টিস্যু সৃষ্টির কৌশল কেউ জানে? জানে কি বায়োসেরামিক হিপ-জয়েন্ট নির্মাণের কৌশল? জানবে, জানবে, আরও দশ বছর পরে জানবে— যখন খাকিরামবাবার বায়োইঞ্জিনিয়ারিং সারা পৃথিবীর ডাক্তারদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে। কারখানাতেই তৈরি হবে মানুষের দেহের সমস্ত অংশ। তৈরি হবে পলিইউরিথিন-এর হৃৎপিণ্ড, টেফলন-এর ফুসফুস, প্লাস্টিকের পেশি, পলিমার-এর স্নায়ু, হাড়, রক্ত— সমস্ত। নাক, চোখ, চিবুক, চোয়াল, হাঁটু, উরু, আঙুল আর দেহসন্ধিগুলো বানিয়ে রাখব রাশি রাশি। ওই যে নকল মানুষ তৈরির কারখানা, ওইখানেই এইসব আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটিয়েছি— তুমিই আমার প্রথম সাকসেসফুল এক্সপেরিমেন্ট— দেখি দেখি, হাতখানা দেখি, বাঃ! বেশ তো কোষগুলো গজিয়েছে দেখছি। প্লাস্টিক গ্লাভসের ওপর টিস্যুগুলোও বেশ চনমনে দেখাচ্ছে— নকল টিস্যু বলে বোঝাই যাচ্ছে না— আঙুল মুঠো করো— বাঃ বাঃ! সাবাস! নকল হাতখানা দিয়ে তুমি যে ওজন তুলতে পারো, আসল হাতে কি তা তুলতে পারবে?'

ঘাড় নেড়ে বললে অন্ধ মতি, 'আজ্ঞে না।'

'তবে? তবে? নকল প্রত্যঙ্গ যদি আসল প্রত্যঙ্গের চাইতে শক্তিশালী হয়, তা হলে সবক'টা নকল প্রত্যঙ্গ দিয়ে তৈরি নকল মানুষটা আসল মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবে না কেন?'

'তা তো হবেই', সায় দেয় মতি।

'তা হলেই তো অতিমানুষ সৃষ্টি হয়ে গেল।'

'ঠিক, ঠিক!'

নরম হলেন খাকিরামবাবা, 'তা হলে স্বীকার করছ আমি অতিমানুষ, নকল মানুষ— সব রকমের মানুষ তৈরি করতে পারি?'

'করছি করছি! বাবা, চোখজোড়া এবার দিন!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! আসল হার্ট যত জোরে এবং যতদিন রক্ত পাম্প করবে, আমার কারখানায় তৈরি নকল হার্ট তার চেয়ে জোরে এবং আরও বেশিদিন রক্ত পাম্প করবে। প্লাস্টিকের তৈরি নকল পেশি লাগিয়ে, খেলোয়াড় আর ব্যায়ামবীরেরা অনেক বেশি কেরামতি দেখাতে পারবে। নকল হাড়ের জোর হবে আসল হাড়ের চেয়ে বেশি। আহা, আহা! সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন আমার নকল কারখানায় তৈরি নকল মানুষ আসল মানুষদের হটিয়ে দিয়ে দখল করতে চাইবে দুনিয়াটা— কিন্তু পারবে না, কিছুতেই পারবে না, কেননা ভাইটাল এসেন্স দিয়ে আমি মানুষকে অতিমানুষ বানিয়ে ছাড়ব। পৃথিবীটা এক লাফে এগিয়ে যাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতার চরম শিখরে। এই ছায়াপথের কোথাও পৃথিবীর মানুষের সমকক্ষ আর কেউ থাকবে না— ছায়াপথের মালিক হয়ে বসবে মানুষ আর্থফোর্সকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে— অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধকে জাগ্রত করে। মনের শক্তি দিয়ে অর্জন করবে এমন সব শক্তি, যা কেবল যোগী পুরুষদের পক্ষেই

সম্ভব। মতি, সেদিন আর বেশি দূরে নেই। কিন্তু বড্ড ব্যাঘাত ঘটছে আমার সাধনায়। কী করি বলো তো?'

'চোখদুটো না দিলে কী করে বলব?' ঝটিতি বললে মতি।

'নাও নাও, জ্বালিয়ে মারলে।' রেগেমেগে টেলিভিশন চোখদুটো মতি পাণ্ডের হাতে তুলে দিলেন খাকিরামবাবা।

১৯. মানুষ-ব্যাটারি

কিছুদিন পর...

'মতি, পূর্ণিমার আর কত দেরি?'

'আজ্ঞে, আজই তো পূর্ণিমা?'

'গত পূর্ণিমায় বড্ড উৎপাত করে গেছে ছোঁড়াগুলো— আজ রাতেও তো করতে পারে?'

'তা পারে...'

'তুমি রেডি তো? তাড়িয়ে দিতে পারবে?'

'তা আর বলতে। লাউডস্পিকারের অট্টহাসি তো আছেই, এর ওপর নন্দী-ভৃঙ্গী একবার উড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। যদি বলেন তো, তার আগেই দু'-একটা পাথর ভাসিয়ে দিতে পারি।'

'দরকার হলে ভাসাবে বইকি। পূর্ণিমার রাতেই তো পাথর ভাসানো সবচেয়ে সোজা। পাথরে ভোল্টমিটার লাগিয়ে রেখেছ?'

'রেখেছি।'

'লাইফ-ফিল্ড বাড়ছে কিনা দেখেছ?'

'বিলক্ষণ বাড়ছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে তুঙ্গে পৌঁছাবে।'

'সাবাস! তখন ভাসিয়ে দিয়ো দু'-চারটে পেল্লায় পাথর। খামোকা ব্যাটারা পেছনে লাগছে আমার। আরে, পাথর ভাসিয়ে ভেলকি দেখানোর জন্যে কি এখানে আমি আছি? কিন্তু এত উৎপাত করছে—'

'তারও দরকার আছে, বাবা। আপনার মাহাত্ম্য প্রচার হোক একটু-আধটু।'

'দুর দুর! আমি কি যৌগিক ক্ষমতা দেখাতে বসেছি? এই পৃথিবীর শক্তিকেই কাজে লাগিয়ে মানুষকে অতিমানুষ বানাতে চাইছি আমি। পৃথিবীটাই তো একটা চুম্বক— গ্রহরাও তাই। সৌরজগতে গ্রহদের অবস্থান অনুযায়ী পৃথিবীর চৌম্বকত্ব কমে-বাড়ে। পূর্ণিমার রাত তাই প্রশস্ত চন্দ্রের কৃপায়। আর্থ ম্যাগনেটিজ়মকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় আমার গবেষণাকে।'

'বাবা যদি রাগ না করেন তো একটা কথা বলব।'

'বলো, বলো, ভনিতা কীসের?'

'পূর্ণিমাতেই শুধু পৃথিবীর চৌম্বকত্ব বেড়ে যায়— সেইসঙ্গে আমার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাটাও বেড়ে যায় কেন?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ, মতি, উত্তম প্রশ্ন করেছ। খুব ছোট্ট করে দিচ্ছি জবাবটাও— শেষ করব চাঁদ ওঠবার আগেই। অনেক কাজ আছে আজকের জ্যোৎস্নায়। মতি, যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সবকটা সভ্য, অর্ধসভ্য আর অসভ্য দেশে পূর্ণিমায় চাঁদের প্রভাব টের পাওয়া গেছে। চাঁদ, সূর্য, গ্রহদের আকর্ষণ সারা পৃথিবীর ওপর পড়েছে। একই সঙ্গে প্রভাব পড়েছে মানুষের বায়োলজিক্যাল মেক-আপে— জৈবিক সত্তায়। এইজন্যেই দেখা গেছে, চাঁদের প্রভাব থাকে লেখক আর রাজনীতিবিদদের ওপর, মঙ্গলের আর শনির প্রভাব থাকে ডাক্তারদের ওপর, বৃহস্পতির প্রভাব থাকে খেলোয়াড় আর সৈনিকদের ওপর। সারা পৃথিবীর সব মানুষের ওপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে যুগ যুগ ধরে— পূর্ণিমায় পড়ছে বিশেষ করে চাঁদের— তাই ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতেই পাগলামি বাড়ে পাগলদের, উন্মনা হয় কবি-ভাবুক লেখকেরা— লেখার প্রেরণা পায়; আসলে মনের অবস্থাটা পালটে দেয় পূর্ণচন্দ্র— সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পায় সাইকিক পাওয়ার— অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ— যেমন...'

'কেন বাড়ে বাবা?'

'ম্যাগনেটিক ফিল্ডে পরিবর্তন আসে বলে। সাইকিক পাওয়ার তো মাটি থেকেই আসছে— পূর্ণচন্দ্র চৌম্বকক্ষেত্রে এবং সম্ভবত ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডেও পরিবর্তন এনে রহস্যময় এই পৃথ্বী শক্তিকেই বাড়িয়ে দেয়। মামা-ভাগনে পাহাড়ের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন এই পৃথ্বী শক্তির মতো শক্তি পৃথিবীর আর কোথাও নেই— কোনও পাহাড়ে নেই, মঠে-মন্দিরে-মসজিদে-গির্জেয় নেই। পুরাকালের মানুষ কিন্তু এই পৃথ্বী শক্তির অস্তিত্বের খবর রাখত। তারা জানত, পৃথিবীর ওপর দিয়ে রহস্যময় এই আর্থ ফোর্স নার্ভরজ্জুর মতো বিশেষ কয়েকটি রেখা বরাবর প্রবহমান। মঠ-মন্দির-মসজিদ-দেবালয় এইসব লাইনের ওপরেই গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যে এই লাইনকে বলা হয়েছে লে লাইন। ডার্টমুরে এই লাইনের অস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মতি, নগণ্য বাংলার এই একান্ত অবহেলিত মামা-ভাগনে পাহাড়ের আর্থ ফোর্স যে কী বিপুল, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। যার সামান্যতম সাইকিক পাওয়ার আছে, সে এখানকার পাথর থেকে আর্থ ফোর্স টেনে নিয়ে পূর্ণচন্দ্রের দিনে শক্তিতে ঠাসা মানুষ-ব্যাটারি হয়ে যেতে পারে— যেমন তুমি হয়েছ।...'

'মানুষ-ব্যাটারি!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মানুষ-ব্যাটারি। অত অবাক হওয়ার কী আছে? তোমার চোখ-কান-হাত যেদিন থেকে গেছে, সেইদিন থেকে তোমার মধ্যেও সাইকিক পাওয়ার জাগ্রত হয়েছিল— যেমন হয়েছিল পিটার হারকোসের ক্ষেত্রে। দোতলার ভারায় দাঁড়িয়ে জানলা রং করতে করতে পড়ে গেছিল মাটিতে। চোট লেগেছিল মাথায়। প্রাণে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কে এসে গেল অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ। বোম্বাইয়ের কোন ধনকুবেরের ছেলে পালিয়ে সার্কাসে গেছে, তা সে বলে দিত ছেলেটির একটিমাত্র চুল হাতে নিয়ে— পৃথিবীর আর একপ্রান্তে বসে। মাটির ওপর হাঁটতে হাঁটতে বলে দিত, কোথায় সোনার সঞ্চয় আছে মাটির তলায়।

দেখা গেছে, গুরুতর অসুস্থ হলে বা ভয়ানক দুর্ঘটনার পর অনেকের ক্ষেত্রে সাইকিক পাওয়ার জেগে ওঠে— তোমার ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছিল বোমার টুকরোয় শরীরের আধখানা জখম হওয়ার পর। কিন্তু তুমি মানুষ-ব্যাটারি হয়ে গেছিলে সেইদিন থেকে— মতি, তাই তো তোমাকে টেলিভিশন চোখ, নকল হাত আর কান দিয়েছি। ওগুলো কিছুই নয়, মতি। আজ তোমাকে বলছি, তোমার মধ্যে যে শক্তি সেইদিন থেকে জেগেছে, তা দিয়ে তোমার চোখ-কান-হাতের অভাবও পূরণ করে নিতে পারো। বিঠোফেন বধির হয়ে গেছিলেন— কিন্তু জেগেছিল যেন ভেতরের কান— নইলে অমন স্বর্গীয় সুর রচনা করলেন কী করে? মতি, এ বড় ভয়ংকর শক্তি— এ শক্তিকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারো— তোমার তো বটেই, দেশের আর দশের মঙ্গল হবে। নইলে ঠিক উলটোটাই ঘটবে। যেমন ঘটিয়েছিল রাসপুটিন, হিটলার—'

'হিটলার! হিটলারের কি সাইকিক ক্ষমতা ছিল?'

'ছিল বইকি, মতি। কিন্তু ক'জন তার খবর রাখে? উনি কি সুস্থ ছিলেন বলে মনে হয়? অসুস্থতার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল জন্মগত সূত্রে পাওয়া প্রচণ্ড অতি-মানসিক শক্তি— সাইকিক পাওয়ার। সম্ভবত অকাল্ট সায়েন্সেরও চর্চা করে গেছিলেন এবং নাৎসিবাহিনী মূলত ম্যাজিক-পরিচালিত হয়েছিল— বেস্টসেলার 'ডন অফ ম্যাজিক' বইটা পড়ে দেখো। আসলে কী জানো, কামারের হাতুড়ি বদলোকের হাতে যেমন বিপজ্জনক, সাইকিক পাওয়ারও তেমনি বাজে লোকের দখলে গেলে সর্বনাশ ঘটে। রাসপুটিন তো একদৃষ্টে চেয়ে থেকে প্যারালাইজ করে দিতে পারত। সাইকিক পাওয়ার তাকে একটা দানব বানিয়ে ছেড়েছিল। আবার দেখো, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও সাইকিক পাওয়ার ছিল। কিন্তু তিনি হিটলার-রাসপুটিনের মতো অহমিকায় মত্ত হননি— শক্তিমান, সৎ এবং সাধুদের নিজের দিকে কেবল আকর্ষণ করেছিলেন— ঠিক যেভাবে মধু পতঙ্গকে আকর্ষণ করে— মানুষের উপকার করে গেছেন সাইকিক ক্ষমতা দিয়ে। আমার তো মনে হয়, পঞ্চবটীর শক্তিকেন্দ্রের খবর উনি রাখতেন। গবেষণা করলে হয়তো দেখা যাবে— বোধিদ্রুম, পঞ্চবটী, একান্ন পীঠের প্রতিটি লে লাইন অর্থাৎ পৃথ্বীশক্তি বরাবর পড়েছে। সাইকিক পাওয়ার যাঁদের আছে, তাঁরা এই শক্তিরেখার খবর রাখতেন— মন্দির দেবালয় সেখানেই গড়েছেন— মাটির শক্তি আহরণ করে নিজেরা আরও শক্তিমান হয়েছেন— বিশ্বের মঙ্গল করেছেন। মতি, বোমার বিস্ফোরণ তোমার সেই উপকারটি করেছে, মামা-ভাগনে পৃথ্বীশক্তি কেন্দ্রে আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি তোমার এই সাইকিক পাওয়ারকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজে লাগানোর জন্যে— যাতে পৃথিবীর সবার কল্যাণ হয়। তবে দুঃখের কথা কী জানো, খবরটা মনে হচ্ছে আর চাপা নেই— ২১৬১ সালের সেই বিশেষ দিনটিতে এই শক্তিকেন্দ্রের আরও অনেকে হাজির থাকতে চায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। কেউ চায় অতিমানুষ হতে— কেউ চায়—'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, ২১৬১ সালের বিশেষ দিনটি মানে?'

'তুমি এত কম খবর রাখো মতি যে মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয় তোমার জন্যে। তুমি কি জানো না, ১৯৮২ সালে সৌরজগতের সবক'টা গ্রহ যে অবস্থানে এসেছিল, ঠিক সে-রকম

অবস্থান ঘটে ১৭৯ বছর অন্তর? যেহেতু পৃথ্বীশক্তি বা আর্থ ফোর্স এক ধরনের ম্যাগনেটিক কারেন্ট, ২১৬১ সালের ওই দিনটিতে এই ম্যাগনেটিক কারেন্ট অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে যাবে— কল্পনাতীত বৃদ্ধি ঘটবে এই মামা-ভাগনে পাহাড়ে। সারা পৃথিবীতে অঘটন ঘটবে কিনা, জ্যোতিষীদের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আমি কোনও কথা বলতে চাই না, কিন্তু সাইকিক পাওয়ার যাদের আছে, তারা বছরের বিশেষ দিনটিতে, যেমন কুম্ভমেলা বা গঙ্গাসাগর মেলায় দৌড়য় বিশেষ অঞ্চলের পৃথ্বীশক্তি আহরণ করে ছোটখাটো মানুষ-ব্যাটারি হওয়ার বাসনায়— ঠিক তেমনি ২১৬১ সালের সেই পুণ্যলগ্নে কিছু সাইকিক পাওয়ারের অধীশ্বর দখল নিতে চাইবে এই মামা-ভাগনে পাহাড়ের। আর্থ ফোর্সের সঙ্গে নিজেদের মেন্ট্যাল ফোর্স টিউন-আপ করে অসাধ্যসাধন করতে চাইবে।'

'যেমন দুলিচাঁদ চাইছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তার বাসনা পরশপাথর সৃষ্টি। আরে, পরশপাথরের কয়লা পর্যন্ত তো আমি বানিয়েছি এখানকার আর্থ ফোর্সের দৌলতে। শিশির দিয়ে তিন বছর ডিসটিলেশন চালিয়ে যেতে পারলে আমিও বানাব পরশপাথর— কিন্তু মতি, এত বাগড়া পড়লে আর কি তা পারব? মতি, চাঁদ উঠেছে।'

'হ্যাঁ বাবা, চাঁদ উঠেছে। আমার মাথার মধ্যে কীরকম যেন করছে। পায়ের দিক থেকে শিরশির করে কী যেন মাথার মধ্যে উঠে আসছে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে, বাবা, বাবা, এরই নাম কি ম্যাগনেটিক কারেন্ট?'

'হ্যাঁ, মতি হ্যাঁ। আর্থ ফোর্স তোমার মধ্যে দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে পূর্ণচন্দ্রের দিকে। তোমার মধ্যে দিয়ে পূর্ণচন্দ্র আকর্ষণ করছে পৃথিবীর শক্তিকে— মঠ-মন্দির-মসজিদ-গির্জের চুড়ো এইজন্যেই ছুঁচলো করা হয়, পিরামিডের মাথাও ছুঁচলো এই একই কারণে, পাহাড়ের ডগায় ডগায় এখন পুঞ্জীভূত হচ্ছে আর্থ ফোর্স— মতি, মতি, তুমি কিন্তু সেই শক্তির অধিকারী হতে চলেছে— মানুষ-ব্যাটারির মধ্যে শক্তি জমা হচ্ছে। উরি গেলার এই শক্তির খেলাই দেখিয়েছে শুকনো জায়গায় দাঁড়িয়ে। বেশি করে শক্তি অনুভব করেছে পিরামিড অঞ্চলে, চামচ বেঁকিয়ে দিয়েছে, ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়েছে— কিন্তু শক্তির উৎস যে মাটির মধ্যে— ধাতুর মধ্যে নয়, তা কখনও জানতে পারেনি... আমি তা জানি, মতি, আমি তা জানি... জানি বলেই তোমাকে উরি গেলার বানাতে চাই। আমার হাতের এই ত্রিশূলটা দেখছ?'

'দেখছি।'

'তোমার সারা শরীরে যে শক্তি জমা হচ্ছে, সেই শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করো চোখের মধ্যে। মনে মনে কল্পনা করো, তোমার ওই টেলিভিশন-ক্যামেরা চোখ এখন অসামান্য ক্ষমতায়, ক্ষমতাবান— মনে মনে ইচ্ছা করো, যেন আমার হাতের এই ত্রিশূল বেঁকে যায়—'

'করছি... চেষ্টা করছি... একী! একী ! সত্যি সত্যিই যে আপনার হাতের ত্রিশূল বেঁকে যাচ্ছে! এ কী ক্ষমতা এল আমার মধ্যে!'

'হাঃ হাঃ হাঃ! এই হল আর্থ-ফোর্স! চামচ বেঁকিয়ে দেওয়ার ভেলকি এই শক্তির প্রসাদেই দেখাতে পেরেছিল উরি গেলার— ম্যাগনেটিক কারেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। মানুষ-ব্যাটারি মতিলাল পাণ্ডে, এই মুহূর্তে তুমি কিন্তু অতিমানুষ হয়ে গেছ।'

'খাকিরামবাবা!'

'কী হল? কী দেখছ অমন করে?'

'সত্যিই মানুষ-ব্যাটারি হয়ে গেছি আমি। চাঁদ যতই ওপরে উঠছে ততই নিজেকে অমিত শক্তিশালী মনে হচ্ছে। সেইসঙ্গে আরও একটা জিনিস বুঝতে পারছি।'

'কী বুঝতে পারছ, মতি?'

'আর-একটা মানুষ-ব্যাটারি হাজির হয়েছে মামা-ভাগনে পাহাড়ে। এই পাহাড়ের নীচেই সে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা দাঁড়িয়ে আছি পাহাড়ের মাথায়— সবচেয়ে বড় পাহাড়টার মাথায়— তাকে দেখতে পাচ্ছি না— কিন্তু চাঁদের আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আমাদের। বেশ বুঝতে পারছি... কী করে বুঝতে পারছি তা বলতে পারব না... কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, সে তাকিয়ে আছে আপনার হাতের ওই ত্রিশূলটার দিকে। আমার মতোই ম্যাগনেটিক কারেন্টে সে সমাচ্ছন্ন— আমার মতোই সে মানুষ-ব্যাটারি— এ কী! এ কী। এ কী! খাকিরামবাবা। আপনার হাতের ত্রিশূল যে আরও বেঁকে যাচ্ছে! আমি না... আমি বাঁকাইনি... পাহাড়ের নিচে আগন্তুক ওই মানুষ-ব্যাটারি ম্যাগনেটিক কারেন্ট ফোকাস করে বাঁকিয়ে দিচ্ছে আপনার হাতের ত্রিশূল। তার মনের ভাবনার ঢেউও আমি ধরতে পারছি। সে বলছে— 'খাকিরামবাবা, তোমার কেরামতি আমি ধরে ফেলেছি'।'

'মতি! মতি! বলিনি তোমাকে আমাকে নির্বিঘ্নে সাধনা করতে কেউ দেবে না? লেলিয়ে দাও, লেলিয়ে দাও নন্দী আর ভৃঙ্গীকে।'

জ্যোৎস্নালোকে মহান গম্ভীর মামা-ভাগনের পর্বতকন্দর থেকে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল একজোড়া উড়ন্ত বিভীষিকা। বিকট অমানুষিক অট্টহাসি ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলল বিরাট বিরাট পাথরগুলোয়।

রাস্তায় জাগ্রত হল একটা মোটরগাড়ির ধেয়ে যাওয়ার শব্দ। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

'পালিয়েছে, মতি?'

'হ্যাঁ বাবা। ওই তো ফিরে আসছে নন্দী আর ভৃঙ্গী।'

'চলো, এবার গবেষণামন্দিরে যাওয়া যাক— অনেক কাজ বাকি।'

২০. ফ্যাকাল্টি এক্স

আমি বললাম, 'আপনি কাল গিয়েছিলেন মামা-ভাগনে পাহাড়ে?'

ভদ্রলোক রাতজাগা চোখে চেয়ে রইলেন। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, 'বললাম তো সব, খাকিরামবাবা ত্রিশূল বেঁকিয়ে দিয়েছি শুধু আঙুল নেড়ে।'

নরেশ চুপ করে শুনছিল। লালুবাবু সিগারেট টানছিলেন। কথা হচ্ছে ওঁরই স্টুডিয়োতে। আজ ভোররাতে এই ভদ্রলোক একটা ঝরঝরে ফোর্ড গাড়ি হাঁকিয়ে এসে পৌঁছেছেন ওঁর

স্টুডিয়োতে। মামা-ভাগনে পাহাড় থেকে নাকি সটান আসছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আর নরেশকে ডাকিয়ে এনেছেন লালুবাবু।

ভদ্রলোক এসেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন তান্ত্রিক-ম্যাজিশিয়ান হিসেবে। ওঁর নাম শম্পি ঠাকুর। ষোলো বছর বয়স থেকে বাড়ি ছাড়া। হিমালয় ভ্রমণ করেছেন। তিব্বতে অনেক বছর কাটিয়েছেন। লোকালয়ে তিষ্ঠোতে পারেন না বেশিদিন। কেননা, জন্ম থেকেই উনি একটা অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। তর্জনী সংকেতে যে কোনও ধাতুর জিনিসকে শূন্যে ভাসিয়ে অথবা দূর থেকে বেঁকিয়ে দিতে পারেন। স্কুলে পড়ার সময়ে এইসব ঘটনা ঘটায় সবাই ধরে নেয়, শম্পিকে পেঁচোয় পেয়েছে— ভূতে ভর করেছে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবাই তাঁকে ত্যাগ করে। স্কুল থেকে নাম কাটা যায়। তখন এক বাউলের সঙ্গে হরেকৃষ্ণ হরেরামের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে তিনি দেশত্যাগী হন। পাহাড়ে পর্বতে মঠে মন্দিরে তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে উনি বুঝতে পারেন, ভৌতিক ব্যাপার নয়— অলৌকিক ক্ষমতাটা জন্মগতভাবেই এসে গেছে ওঁর ভেতরে। নেপালে থাকতে পেটের জ্বালায় এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ম্যাজিক দেখানো শুরু করেন। দু'-পয়সা হাতে জমলে গাড়ি কেনেন। এই সময়ে এক সাধুর কাছে খবর পান, ২১৬১ সালের আগে থেকেই মামা-ভাগনে পাহাড়ে গিয়ে সাধনা করতে— ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে।

তাই ভদ্রলোক গিয়েছিলেন গতকাল পূর্ণিমার রাতে। পাহাড়ের মাথায় চাঁদের আলোয় দুটো ছায়ামূর্তি দেখেছিলেন। একজনের হাতের ত্রিশূল বেঁকে গিয়েছিল আর-একজনের চাহনির শক্তিতে। ত্রিশূলধারী ও জটাধারী লোকটা যে খাকিরামবাবা, তা বুঝতে পেরে নিজের ক্ষমতা দেখানোর লোভটা সামলাতে পারেননি শম্পি ঠাকুর।

ফলটা হয়েছে সাংঘাতিক। দানবিক অট্টহাসিতে পাহাড় কেঁপে উঠেছে। দু'-দুটো সাপ উড়ে এসেছে তাঁর দিকে।

প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন শম্পি ঠাকুর।

আমি বললাম, 'বেশ বেশ, আপনার যে সত্যিই এই ক্ষমতা আছে, তার প্রমাণ?'

'দেখাব নিশ্চয়ই। তার আগে বলে রাখি, প্রমাণ কিন্তু এর মধ্যেই পেয়েছেন কিছুটা। লালুবাবুর বাড়ি চিনলাম এই ক্ষমতার জোরেই। এখানে এসেই যে খাকিরামবাবাকে হঠিয়ে পাহাড় দখল করা যাবে— তা আমি আমার শক্তি দিয়ে জেনেছি বলেই তো এসেছি।'

আমি বললাম, 'তা বেশ করেছেন। কিন্তু লোহার রড কীভাবে বেঁকান, তা দেখতে চাই।'

'নিশ্চয়ই দেখাব। তার আগে যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্বকথা শোনাতে চাই। আগ্রহ থাকলে বলব, নইলে নয়।' বলে, চুন ইত্যাদি বের করে হাতের তেলোয় খৈনি ডলতে শুরু করলেন। ভদ্রলোকের গুণের অবধি নেই দেখছি।

বললাম, 'তত্ত্বকথা আমরা ভালই বাসি। কিন্তু তত্ত্বটা কীসের?'

'ফ্যাকাল্টি এক্স-এর।'

'ফ্যাকাল্টি এক্স।'— সোজা হয়ে বসলেন লালুবাবু। আধখাওয়া সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এইটুকুই শুধু জানি যে ফ্যাকাল্টি এক্স একটা রহস্যময় শক্তি— যা বিশেষ

বিশেষ মানুষের ভেতরের থেকে উৎসারিত হয়। এক এক মানুষের ক্ষেত্রে এক এক রকমের শক্তির আধার হয়ে দাঁড়ায়। এই আধার থেকে শক্তি সংগ্রহ করে শক্তিমান পুরুষটি নানা কাজে লাগায়। যেমন লাগিয়েছিলেন ক্যাসানোভা— সারা জীবন উঞ্ছবৃত্তি করে গেছেন। আবার ভাইটাল এনার্জির এই সঞ্চয় থেকে শক্তি টেনে নিয়ে উরি গেলার আর ম্যাথ ম্যানিং যেন আর-এক ধরনের এনার্জির সংস্পর্শে এসেছিলেন— চামচ বেঁকিয়ে দিতেন, কম্পাসের কাঁটা ঘুরিয়ে দিতেন, এনার্জির স্বরূপটা কী তা কেউ সঠিক বুঝতে না পারলেও এনার্জির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারও মনে কোনও সন্দেহ আর নেই। আপনি এই ফ্যাকাল্টি এক্স সম্পর্কে বলতে চান?'

শম্পি ঠাকুরের খৈনি ডলা হয়ে গিয়েছিল। বাঁহাতে তলার ঠোঁট টেনে ধরে ডানহাতের তেলো থেকে খৈনিটা দাঁত আর ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দিয়ে বললেন কাষ্ঠকণ্ঠে, 'আমি নিজেই ফ্যাকাল্টি এক্স-এর অধিকারী।'

লালুবাবুর দু'চোখ চকচক করে উঠল। মনের খোরাক পেয়েছেন।

খৈনির কড়া নেশায় চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে এল শম্পি ঠাকুরের। মন্দ্রকণ্ঠে, ঈষৎ স্খলিত স্বরে যেন স্বগতোক্তি করে চললেন, 'ফ্যাকাল্টি এক্স এমন একটা অজ্ঞাত শক্তি, যা শুধু বাস্তবকে ধারণায় এনে দেয় না— অন্য সময় এবং অন্য জায়গার জ্ঞানও জাগ্রত করে চেতনায়। প্রাঞ্জল করেই বলি, আমি বর্তমানকে যেমন স্পষ্ট দেখতে পাই, অতীত আর ভবিষ্যতের এই পৃথিবীর কোথায় কী ঘটেছে বা ঘটবে, তাও সুস্পষ্ট দেখতে পাই। ফ্যাকাল্টি এক্স যে আজগুবি নয়, তা বিখ্যাত লেখক সি এস লুই-এর আত্মচরিত 'সাইপ্রাইজড বাই জয়' পড়লেই বুঝবেন। পড়েছেন বইখানা? পড়েননি? আমি পড়েছি। যদিও স্কুলের শেষ পর্যন্ত যাইনি— কিন্তু ইংরেজিটা শিখেছি বোধহয় ফ্যাকাল্টি এক্স-এর জোরেই।'

লালুবাবু বললেন, 'ফ্যাকাল্টি এক্স বলতে কি তাহলে বোঝাচ্ছেন দূরদর্শনের ক্ষমতাকে?'

'তুলনা করতে গেলে সেইভাবেই বলা যায়, লালুবাবু', শম্পি ঠাকুর যেন ভগবান তথাগতের মতো কথা বলে চললেন, 'সব শিশুর মধ্যেই ফ্যাকাল্টি এক্স-এর ফ্ল্যাশ দেখা যায়। দেখা গিয়েছিল আমার মধ্যেও, কিন্তু চলে যায়নি— ঈশ্বরের কৃপায় থেকে গেছে। ফ্যাকাল্টি এক্স নামটা কিন্তু পাশ্চাত্যের অতীন্দ্রিয় গবেষকদের আবিষ্কার। দার্শনিকদের কাছে যা অন্তর্দৃষ্টি, বৌদ্ধদের কাছে যা জ্ঞানোদয়— ওদেশে তাকে বলে ফ্যাকাল্টি এক্স। আপনারা বিলিতি শব্দটব্দগুলো না বললে কিছু বিশ্বাস করতে চান না— তাই বিলিতি নাম দিয়েই তত্ত্বকথাটা শুরু করলাম। এবার প্রমাণ দেব, আমার ফ্যাকাল্টি এক্স আছে কি না। লালুবাবু, আপনার হাতের কাছে একটা বই দেখছি। বাংলা বই। মলাটটা উপুড় করে রেখেছেন। কিন্তু আমি সেকেন্ডকয়েক বইখানার দিকে তাকিয়ে থাকব। তারপর যা দেখব, তা বলে যাব।'

খৈনির মৌতাত বেশ জমেছে, তা শম্পি ঠাকুরের দ্রিমিদ্রিমি কণ্ঠস্বরেই মালুম হল। প্রায় দশ সেকেন্ডের মতো আধবোজা চোখে চেয়ে রইলেন লালুবাবুর পাশের টেবিলে রাখা বইটার দিকে। আমি জানি, এ-বই তন্ত্রের ওপর লেখা।

হঠাৎ আত্মসমাহিতের মতো বললেন শম্পি ঠাকুর, 'বইটার নাম তন্ত্ররহস্য। পুরো বইটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। পুস্তনিটার তিন জায়গায় পোকায় খেয়েছে। ছেপেছে, কালীতারা প্রিন্টার্স। প্রকাশ করেছে, জয়ভারত প্রকাশনী। বইয়ের ওপর আরও দুটো আবছা ছবি ভেসে উঠল। একটা কালীতারা প্রিন্টার্সের। আজ থেকে বিশ বছর আগে বইটা কম্পোজ করছে কম্পোজিটরেরা। ঘরটায় তিনটে জানলা— পাশে রাস্তা— তারপর পার্ক। রাস্তাটার নাম রামনারায়ণ মতিলাল লেন। পার্কটার নাম সেন্ট জেমস স্কোয়ার। এখন নাম পালটে হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। চার নম্বর বাড়ির একতলায় চারজন কম্পোজিটর কাজ করছে। ওদের প্রত্যেকের নাম, বাড়ির ঠিকানা, ফ্যামিলিতে ক'জন মেম্বার— তাও চোখের সামনে এবার দেখতে পাচ্ছি। চারজনের একজন মারা গেছে। থাক, এবার অন্য ছবিটার কথা বলা যাক। জয়ভারত প্রকাশনীর দোকানঘর। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। সামনে সংস্কৃত কলেজ। দোকানঘরে কাউন্টারে বসে দু'জন সেলসম্যান। প্রকাশক বসে পেছনের টেবিলে। দিব্যি লম্বা, দোহারা চেহারা, কালো। ইনি নিজেও লেখক। নাম, সুশোভন সান্যাল। ইনি—'

বাধা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে লালুবাবু বললেন, 'থাক থাক, আর বলতে হবে না। আপনি যে ছবি দেখছেন একটার পর একটা— সবই বিশ বছর আগেকার। কয়েকটা ছবির খবর আমি রাখি— সুশোভনবাবুকেও আমি চিনি— সব সত্যি। এ তো গেল অতীতের দৃশ্য। ভবিষ্যতের দৃশ্যও কি প্রত্যক্ষ করছেন?'

শম্পি ঠাকুর বললেন, 'দেখবার চেষ্টা করলেই দেখতে পাব। আরও কয়েকটা সেকেন্ড সময় দিন।... অতীত মুছে গেল। এবার ভবিষ্যতের ছবি ফুটছে। জয়ভারত প্রকাশনীর মালিক সুশোভনবাবুর কিডনির অসুখ হয়েছে। মারা যাচ্ছেন। ছেলেকে ডেকে বলছেন 'তন্ত্ররহস্য' বইটা পুনর্মুদ্রণ করতে। রয়্যালটি আর দিতে হবে না— পঞ্চাশ বছর তো হয়ে গেল।'

লালুবাবু বললেন, 'আপনি কি তাহলে লেখকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরের কথা বলছেন?'

শম্পি ঠাকুর বললেন, 'লেখক তো মারা গিয়েছিল বইটা প্রকাশ পাওয়ার বিশ বছর আগে। আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশতম বছর শেষ হবে। অষ্টম দিনে সান্যালমশাই মরতে বসেও বইটা পুনর্মুদ্রণ করতে বলছেন—'

লালুবাবু বলে উঠলেন, 'সুশোভনবাবু তা হলে আর আটদিনের মাথায় মারা যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'থাক থাক, আর পরীক্ষার দরকার নেই', বললেন লালুবাবু।

শম্পি ঠাকুর আমার দিকে তাকালেন, 'দীননাথবাবু, আপনি জানতে চাইছিলেন কীভাবে লোহার রড বেঁকাই, কেমন?'

শম্পি ঠাকুরের দূরদর্শনের এলেম দেখে তখন আমার মস্তিষ্ক ঘুরছে। বললাম ক্ষীণকণ্ঠে, 'মানে, ওই আর কি...'

'তার আগে আর একটা পরীক্ষা দিই। লালুবাবু, আপনার সামনের কাচের দেরাজে তিনটে অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো আছে, একটা শূন্য। মাঝেরটায় যে ফিল্মটা রয়েছে, তা

খারাপ। তারিখ পেরিয়ে গেছে। তৃতীয় কৌটোটায় রয়েছে জার্মানি থেকে আমদানি করা একটা অত্যন্ত ভাল ফিল্ম— যান, মিলিয়ে নিন।'

লালুবাবু এক ইঞ্চিও না নড়ে বললেন, 'মেলানোর দরকার নেই, আমি জানি।'

শম্পি ঠাকুর বললেন, 'তা হলে এখন বাকি রইল লোহার রড, মানে, ত্রিশূল কীভাবে বেঁকিয়েছি, এই তো?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

'ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে,' ছোট্ট করে বললেন শম্পি ঠাকুর।

'সে তো বটেই। কিন্তু প্রক্রিয়াটা কী?'

হাসলেন শম্পি ঠাকুর, 'দীননাথবাবু, ইজরায়েলের মানুষ বিশ্ববিখ্যাত উরি গেলার নিজেও কি জানত ঠিক কখন শক্তিপ্রয়োগ করতে পারবে? ম্যাজিক হল ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রণের আর্ট। আমি তা পারি। কসমিক ম্যাটারকে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যেমন ধরুন, আপনি আমার চোখের আড়ালে একটা টেপরেকর্ডার চালু করে দিয়েছেন আমার সব কথা টেপ করার জন্য। ঠিক কিনা?'

খাবি খেতে খেতে বললাম, 'তা হ্যাঁ... মানে, আপনার মূল্যবান কথাগুলো—'

শম্পি ঠাকুর উদার কণ্ঠে বললেন, 'থাক থাক, অত অপ্রস্তুত হতে হবে না। কিন্তু টেপ তো চলছে— দেখুন তো, কথাগুলো রেকর্ড হল কিনা।'

আমার পেছনে রাখা টেপরেকর্ডারটা বের করে আনলাম অপরাধীর মতো। মেশিন চলছে। সুইচ বন্ধ করে স্পুল উলটোদিকে একটু ঘুরিয়ে ফের চালালাম।

কোনও শব্দ নেই।

আবার বেশ খানিকটা উলটোদিকে ঘুরিয়ে প্লে-ব্যাক করলাম। কোনও শব্দ নেই।

শম্পি ঠাকুরের কোনও কথাই টেপ হয়নি— অথচ যন্ত্র চালু রয়েছে। খৈনি-কালো দাঁত বের করে হেসে উঠলেন শম্পি ঠাকুর। আচমকা টেপরেকর্ডারটা আমার হাতের মধ্যে থেকে শূন্যে ভাসতে ভাসতে গিয়ে নেমে পড়ল কার্পেটের ওপর। কে যেন আলতো করে ধরে বসিয়ে দিল— অথচ ধারেকাছে কেউ নেই।

পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে কী যেন ঠিকরে গেল মেঝের ওপর। দরজার পাশে রাখা তেপায়ার ওপর থেকে পেতলের বিরাট ড্রাগনটা ঠিকরে পড়েছে। আমাদের চোখ সেদিকে ঘুরে যেতেই অত বড় ড্রাগনটা মাখনের মতো বেঁকে গেল।

আর্তনাদ করে উঠলেন লালুবাবু, 'আমার অত সাধের ড্রাগনটা এ কী ছিরি করলেন ঠাকুরমশাই।'

লালুবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই বাঁকা ড্রাগন এক ঝটকায় আবার সিধে হয়ে গেল— বেঁকা লেজ সিধে করে নিয়ে একলাফে উঠে গেল তেপায়ার ওপর। কে বলবে, একটু আগেই দুমড়েমুচড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল ড্রাগনটা।

মৃদু মৃদু হেসে ড্রাগনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন শম্পি ঠাকুর। আমরাও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আবার চাইলাম নিরেট ড্রাগনের দিকে। কিন্তু ড্রাগনকে তেপায়ার ওপর দেখতে পেলাম না। অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আবার ককিয়ে উঠতে যাচ্ছেন লালুবাবু, হাত তুলে নিরস্ত করলেন শম্পি ঠাকুর। তর্জনীসংকেতে দেখালেন তেপায়া। আমরা চেয়ে রইলাম। দেখলাম, একতাল অনচ্ছ কুয়াশার মতো কী যেন ভাসছে তেপায়ার ওপর। একটু একটু জমাট বাঁধছে। পেতলের মতো চকচকে ভাবটাও দেখা গেল। পরমুহূর্তেই দেখলাম, পেতলের ড্রাগন আবার ফিরে এসেছে।

শম্পি ঠাকুর বললেন, 'দীননাথবাবু, আপনাদের কাউকেই কিন্তু হিপনোটাইজ় করিনি আমি। যা দেখলেন তা সত্যি; ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ম্যাগনেটিক ফোর্স ফোকাস করে অণুদের জোট ভেঙে দিয়ে অদৃশ্য করেছিলাম ড্রাগনকে— আণবিক গঠন দিয়েছিলাম— ইলেকট্রনিক পরিবর্তনও বলতে পারেন— মেন্ট্যাল এনার্জি দিয়ে ম্যাগনেটিক ফোর্সের সহায়তায় 'মলিকিউলার মেমারি' মুছে দিয়েছিলাম— অণুরা বিস্মৃত হয়েছিল তাদের ধর্ম— তাই ছাড়া ছাড়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। আবার তাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দিলাম, তাই তারা নিজেদের ধর্ম অনুযায়ী একত্র হয়ে ড্রাগনকে দৃশ্যমান করে তুলল। এর মধ্যেও বিজ্ঞান আছে দীননাথবাবু— পরাবিজ্ঞানও বলতে পারেন। কিন্তু অনেকটা এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টই কি ফিলাডেলফিয়ায় হয়নি? জাহাজ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ফের দৃশ্যমান হয়নি?'

আমতা আমতা করে লালুবাবু বললেন, 'তা তো বটেই।'

শম্পি ঠাকুর বললেন, 'মোদ্দা কথাটি কি জানেন, সব সাইকিক পাওয়ারেরই উৎস এই পৃথিবী। খোলামনের বৈজ্ঞানিক প্রফেসর এইচ আইজেন্‌ক এই কারণেই বলেছিলেন, অব্যাখ্যাত গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী পৃথিবীর শক্তি কমে-বাড়ে। আমার মধ্যে যে ফ্যাকাল্টি এক্স রয়েছে, এর উৎসও এই পৃথিবী। এই এনার্জি থেকে পেয়েছি চিন্তা দিয়ে চাপ সৃষ্টির কৌশল— এককথায় ইংরেজিতে যাকে বলে থট-প্রেসার। এইমাত্র যে খেলা দেখলেন, তা এই চিন্তার চাপের খেলা, ইচ্ছাশক্তির খেলা, ধাতুর অণু বিশ্লিষ্ট করার খেলা। লেখক জে বি প্রিস্টলি নিজেও তো একটা ভোজসভায় টেলিপ্যাথির সাহায্যে এক সজ্জন ব্যক্তিকে দিয়ে তাঁর দিকে চোখ ইশারা করতে বাধ্য করেছিলেন। ভদ্রলোক পরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন— কেন যে চোখ টিপে ইশারা করেছিলেন, তা অবশ্য বুঝিয়ে বলতে পারেননি— হঠাৎ নাকি তাঁর প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। ইচ্ছেটা অবশ্য প্রিস্টলি সাহেবের— রগড় করার জন্যে করেছিলেন।'

নরেশ এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এত যে পিলে চমকানো ঘটনার পর ঘটনা ঘটে গেল, টুঁ শব্দটি করেনি। ওর স্বভাবই তাই। শুধু পর্যবেক্ষণ করে যায়, সিদ্ধান্ত নেয় দেরিতে— কিন্তু মোক্ষম সিদ্ধান্তে পৌঁছে খুব কম কথায় ব্যক্ত করে মনের কথা।

এবারও তাই করল। হঠাৎ গলা ঝেড়ে বললে কাষ্ঠ হেসে, 'ইয়ে, ঠাকুরমশাই, একটা রহস্য কিন্তু পরিষ্কার হল না।'

ভুরু কুঁচকে বললেন শম্পি ঠাকুর, 'আবার কী রহস্য?'

নরেশ বললে, 'আপনি পেতলের ড্রাগন বেঁকিয়ে, ফের সিধে করে, অদৃশ্য করে দিয়ে, আবার দৃশ্যমান করতে পারেন, ভূত-ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পান, ভারি জিনিসকে

শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেন— কৌটোর মধ্যে বস্তু প্রত্যক্ষ করেন, টেলিপ্যাথি অথবা থটপ্রেসার দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেন।'

'তা করিই তো।'

'কিন্তু উড়ন্ত সাপের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এলেন কেন?'

ফুটো বেলুনের মতো নিমেষে যেন চুপসে গেলেন শম্পি ঠাকুর। 'আরে মশাই, আমার যা কিছু জারিজুরি ধাতুর ওপর, অথবা যে জিনিসের কোনও প্রাণ নেই তার ওপর। যার প্রাণ আছে, সেই সজীব দেহের ওপর আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই।'

'বলেন কী? খাকিরামবাবা তাহলে এই একটি ব্যাপারে আপনার ওপর টেক্কা মেরেছেন?'

খোঁচাটা বেমালুম হজম করে আর-একপ্রস্থ খৈনি বানাতে বসলেন শম্পি ঠাকুর।

মায়া হল ভদ্রলোকের চুপসানো মুখচ্ছবি দেখে। এতক্ষণ শক্তির বড়াই করে এসেছেন, আমাদের চক্ষু চড়কগাছ করে ছেড়েছেন। নরেশের এক খোঁচাতেই সব ঠাণ্ডা।

বললাম সহানুভূতির স্বরে, 'আমাদের কাছে ছুটে এলেন কেন এবার বলবেন?'

খৈনি ডলতে ডলতে শম্পি ঠাকুর বললেন, 'সবাই মিলে খাকিরামবাবাকে টাইট দেওয়ার জন্যে। ১৯৮২ সালের ১৭৯ বছর পর ২১৬১ সালে যে গ্রহ সমাবেশ ঘটবে, তার আগেই লোকটাকে ওখান থেকে সরিয়ে মামা-ভাগনে পাহাড়ের দখল নেওয়ার জন্যে। আর্থ ফোর্স লুঠ করে অতিমানুষ হতে চাই বলে।'

বলে, তলার ঠোঁট আর দাঁতের ফাঁকে খৈনি নিক্ষেপ করলেন শম্পি ঠাকুর।

২১. মহাশূন্যের ধীশক্তি

নরেশ কিন্তু উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হল না। নির্নিমেষে চেয়ে রইল শম্পি ঠাকুরের মুখের দিকে।

খৈনি মুখে নেওয়ায় শম্পি ঠাকুরের মৌতাত তখন নতুন করে জমেছে। কিন্তু মৌতাত কেটে যাওয়ার উপক্রম হল নরেশের নিমেষহীন চাহনির সামনে। ভদ্রলোক তাঁর টেলিপ্যাথি দিয়ে কী বুঝলেন তিনিই জানেন, হঠাৎ নরেশের চোখে চোখে চেয়ে বললেন, 'দুর মশায়, ওই জায়গাটাতেই আমার দূরদর্শন ক্ষমতা হোঁচট খাচ্ছে।'

নরেশ আস্তে আস্তে বললে, 'কেন খাচ্ছে?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন। মামা-ভাগনে পাহাড়ে গেছিলাম তো ওই খবরটাই জানবার জন্যে। কিন্তু বেশ বুঝলাম, পাহাড়ের ভবিষ্যৎ, খাকিরামবাবার ভবিষ্যৎ কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। কত চেষ্টা করলাম— আদৌ আমি পাহাড়ের দখল নিতে পারব কিনা, সে ধরনের কোনও ছবিই মনের চোখ দিয়ে দেখতে পেলাম না। আমার কী মনে হয় জানেন? নিজের ভবিষ্যৎ জানবার ক্ষমতা আমার নেই। যেমন ধরুন না কেন, আমি কবে পটল তুলব, তা

আমি নিজেই জানি না— জানতেও পারি না। কিন্তু আপনার পটল তোলার ছবি ইচ্ছে করলেই দেখতে পাব।'

নরেশ বললে, 'এমনও তো হতে পারে, মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের আর্থ ফোর্স এমন অদ্ভুত আর জটিল যে ফ্যাকাল্টি এক্স হালে পানি পাচ্ছে না?'

'তাও হতে পারে।' বলতে বলতে সিধে হয়ে বসলেন শম্পি ঠাকুর। ঝিমুনিভাবটা চটপট কেটে গেল চোখ-মুখ থেকে। উত্তেজনায় চনমনে হয়ে উঠল মুখচ্ছবি। উত্তেজনাটা আকস্মিক, কিন্তু প্রচণ্ড।

'কী হল?' লালুবাবু বিস্মিত, 'দরজার দিকে অমন করে চেয়ে আছেন কেন ঠাকুরমশাই? কেউ আসছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আসছে। এইমাত্র সাইকেল রিকশা থেকে নামল পানের দোকানটার সামনে। আপনার বাড়ির ঠিকানা রয়েছে পকেটে। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করছে।'

'কে সে?'

'একজন আমেরিকান।'

'আমেরিকান! বলেন কী!'

'এসে গেছে দরজার সামনে। আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ।'

'বলুন?'

'এ-বাড়ির পেছনের দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ আছে?'

অবাক হয়ে লালুবাবু বললেন, 'এ আবার কী কথা? আমেরিকান ভদ্রলোকের সামনে থাকতে আপনার আপত্তি।'

'না না না!' অদ্ভুত শোনাল শম্পি ঠাকুরের কণ্ঠস্বর, 'কেন থাকতে চাই না, পরে শুনবেন। আমার ঠিকানা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডে— গোরস্থানের সামনের একতলা বাড়ি। তাড়াতাড়ি পেছনের দরজাটা দেখিয়ে দিন', বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শম্পি ঠাকুর।

আমরা সবাই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলাম অসীম ক্ষমতাবান শম্পি ঠাকুরের কেঁচোর মতো কুঁচকে যাওয়া দেখে। কে এই আমেরিকান? কেন তার ভয়ে লেজ গুটিয়ে চম্পট দিচ্ছেন ঠাকুরমশাই?

লালুবাবুও উঠে দাঁড়িয়েছেন। ভেতরবাড়ির দরজা খুলে ধরে বললেন, 'আসুন।'

ঠিক সেই সময়ে সামনের দরজায় নক করার শব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে মার্কিনি উচ্চারণে, 'মে আই কাম ইন?'

সাঁৎ করে ভেতরবাড়ির দরজা দিয়ে উধাও হলেন শম্পি ঠাকুর। পেছন পেছন হতচকিত চোখে গেলেন লালুবাবু। যাবার আগে চোখের ইঙ্গিতে আমাকে সদর দরজায় গিয়ে আমেরিকানকে অভ্যর্থনা জানাতে বলে গেলেন।

আমি উঠে গিয়ে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালাম। বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষস্কন্ধ এক আমেরিকান। বিরাট আকৃতি। পোশাকআশাক দেখলে মনে হয় যেন স্রেফ ছুটি কাটাতে বেরিয়েছেন। চেক কোট, চেক প্যান্ট। লাল মুখে দ্যাখনহাসি।

আমাকে দেখেই 'বো' করে, মানে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'লালুবাবু?'

'নো নো, আই অ্যাম দীনুবাবু; প্লিজ কাম ইন।'

খাতির করে দৈত্যাকৃতি আমেরিকানকে এনে বসালাম ভেতরের ঘরে। লোকটার সোফায় বসেই ইতিউতি চেয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'হ্যাঁ, এই সেই ঘর। কিন্তু লালুবাবুকে যে চাই।'

বলতে না বলতেই ভেতরবাড়ির দরজা খুলে ঘরে ঢুকে লালুবাবু বললেন, 'আমি লালুবাবু। আপনি?'

'আমি ফ্রেড ওয়েন— দ্য পি কে ম্যান।'

'হোয়াট ম্যান?'

'পি কে ম্যান। ওই নামেই আমি এখন বেশি পরিচিত। ফ্রেড ওয়েন নামটা এখন পোশাকি নাম বলতে পারেন,' বলে দাঁত খিঁচিয়ে হাসলেন পি কে ম্যান ফ্রেড ওয়েন।

লালুবাবু আসন গ্রহণ করলেন আমেরিকান অতিথির সামনে সোফায়। সিগারেট প্যাকেট বের করে অফার করলেন। নিজে ধরালেন। আগাগোড়া চেয়ে রইলেন ফ্রেড ওয়েনের মুখের দিকে। মনে মনে কী যেন ভাবছেন।

ফ্রেড ওয়েন যেন তাঁর ভাবনাটা ধরতে পেরেই আবার ঝকঝকে সাদা দু'পাটি দাঁত খিঁচিয়ে হাসলেন। বললেন, 'হুট করে আপনার ওপর চড়াও হলাম কেন, জানবার বড্ড কৌতূহল হয়েছে বুঝতেই পারছি। সব বলব। বলবার জন্যেই পাঠানো হয়েছে আমাকে। এ ঘরটাও আমাকে চিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এক নজরেই তাই চিনেছি। ঠিক জায়গাতেই এসেছি।'

লালুবাবু সিগারেট টানতে টানতে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নিস্পৃহ রাখবার চেষ্টা করে বললেন, 'কিন্তু এ বাড়িতে কস্মিনকালেও আপনি আসেননি।'

'না, আসিনি। আমেরিকায় সল্ট লেক সিটিতে বসেই দেখলাম আপনার এই ঘরখানা। তারপর আকাশপথে আসতে আসতে যেটুকু সময় লেগেছে,' বলে আবার দাঁচ খিঁচিয়ে হাসলেন ফ্রেড ওয়েন। আহা! কী হাসির ছিরি! ওই তো লালমুখো দৈত্যের মতো চেহারা! তার ওপর দাঁতখিঁচোনো হাসি। বড়সড় বেবুন বললেই চলে।

লালুবাবু ধীরেসুস্থে আমেরিকান সিগারেটে টান দিতে দিতে বললেন, 'আপনার কথা শুনে এইটুকু বুঝলাম— আপনি সাধারণ মানুষ নন।'

'তা নই।'

'আধখানা পৃথিবী চক্কর দিয়ে আপনি এই গরিবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন বড় রকমের একটা কাজ নিয়ে।

'খু-উ-উ-ব বড়।'

'বলবেন কি, কী কাজ? এঁদের সামনেই বলতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই বলব। তার আগে আমার সম্বন্ধে একটা ছবি আপনাদের উপহার দেব। নইলে ঠিক ধরতে পারবেন না।'

‘উপহার দিন।’

ফ্রেড ওয়েন তখন যে ছবিটা উপহার দিলেন স্রেফ কথার জাল বুনে, তা এই:

অগস্টের শেষের দিকে লন্ডন সিটি ইউনিভারসিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্যারা-সায়েন্স কনফারেন্স। ইজরায়েলের মির‍্যাকল-মানুষ উরি গেলারকে নিয়ে বিস্তর এক্সপেরিমেন্ট করে এসে কনফারেন্স রিপোর্ট নিবেদন করছেন ড. টেড বাস্টিন। সাইকিক চিকিৎসার ওপরেও একটা রিপোর্ট পেশ করেছেন প্রফেসর ডগলাস ডিন— এক্সপেরিমেন্ট করেছেন নিজে। ফোটোগ্রাফে হাত বুলিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলে দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে যে ব্যর্থ হয়েছেন, প্রফেসর জন টেলরের সেই ব্যর্থতার কাহিনি শুনেও হাই তুলেছেন সমাগত সুধীবৃন্দ।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আর থার্মাল রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি নিয়েও এত আলোচনা হয়ে গেছে যে, হাই না তুলে আর পারছেন না অভ্যাগতরা। দিনকয়েক বেশ গরমও পড়েছে। কেননা, গত দুশো বছরের মধ্যে এমন অনাবৃষ্টি দেখা যায়নি ইংল্যান্ডে। মাসখানেক ধরে গোটা ইংল্যান্ড ধুঁকছে। তাই এত ঘন ঘন হাই উঠছে। হাই চাপবার চেষ্টাও চলছে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, একঘেয়ে নীরব বক্তৃতা আর কারও ভাল লাগছে না।

তাই বিকেল নাগাদ যখন বৃষস্কন্ধ বিরাটকায় আমেরিকানটি দীর্ঘ পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন সম্মেলনকক্ষে, জোড়া জোড়া কৌতূহলী চক্ষু নিবদ্ধ হল তাঁর ওপর। আত্মপরিচয় দিলেন ভদ্রলোক। পি কে ম্যান— এই নামটাই যদিও এখন চালু হয়ে গেছে, কিন্তু বাপ-মায়ের দেওয়া নাম ফ্রেড ওয়েন। কণ্ঠস্বর বিলক্ষণ ভারি— যেন হাঁড়ির মধ্যে থেকে কথা বেরিয়ে আসছে। মাইক্রোফোনের দরকার হয় না। সম্মেলনকক্ষের দূরতম প্রান্তেও পৌঁছে গেল গমগমে কণ্ঠস্বর। সবচেয়ে বড় কথা, বক্তিমে শুরু করার পর মিনিটকয়েক যেতে না যেতেই হাই তোলা বন্ধ হয়ে গেল প্রত্যেকের। ঘুম ঘুম ভাব ছুটে গেল চোখ থেকে। মির‍্যাকল নিয়ে এত বক্তৃতার দরকার কী? পি কে ম্যান নিজেই তো একটা মূর্তিমান মির‍্যাকল।

সংক্ষেপে নিজের সম্বন্ধে যা বললেন পি কে ম্যান, তা এই: ফ্লাইং সসার্সদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে পি কে ম্যানের এবং তাদের মাধ্যমেই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তিনি, ঝড় পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেন।

বললেন মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে, ‘জেন্টলমেন, খুব যখন বাচ্চা ছিলাম, তখন থেকেই লক্ষ করছি, অন্যের মনের কথা বুঝতে পারতাম। বাচ্চা বয়সে এরকম ক্ষমতা সবারই হয়তো থাকে— এই বিশ্বাস নিয়ে খুব একটা মাতামাতি করিনি, অসামান্য এই ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়েও অহংকারে ফেটে পড়িনি। বড় হওয়ার পর প্রায় পঞ্চাশটা পেশা গ্রহণ করেছিলাম পরের পর। এই পঞ্চাশ রকমের জীবিকার মধ্যে ছিল জাজ বাজনার ড্রামার, বক্সার, প্রাইভেট ডিটেকটিভ, ম্যাজিশিয়ান, লাইফ গার্ড, সেলসম্যান। আমি যে নিজের থেকেই পরের পর জীবিকা পালটে গেছি, তা কিন্তু ঠিক নয়। আমার বরাবরই মনে হয়েছিল, আমাকে বিভিন্ন জীবিকা, বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে— ভবিষ্যতের ঘটনার বিরাট উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। আমার নিজের ইচ্ছেতে এত বহু বিচিত্র পেশার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়নি।

'জেন্টলমেন, আমার বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ, তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মেয়েকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিলাম টেক্সাসের ফোর্থ ওয়ার্থ দিয়ে। পাশের ভুট্টাখেতের ওপর আচমকা আবির্ভূত হল একটা অতিকায় চুরুটের মতো ঝকঝকে বস্তু। হরেক রঙের আলো ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছিল শূন্যে ভাসমান বস্তুটা থেকে। হঠাৎ চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে গেল অতবড় জিনিসটা— সবক'টা আলো চক্ষের নিমেষে নিভিয়ে দিয়ে যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। থ হয়ে বসে রইলাম গাড়ির মধ্যে। বাপ-বেটিতে স্পষ্ট বুঝলাম, এইমাত্র চোখের সামনে যা দেখলাম, তা উড়নচাকি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যাকে এখন বলি UFO, Unidentified Flying Object।

'সেইদিন থেকে পঞ্চাশ রকমের পেশায় অভিজ্ঞ এই মানুষটার জীবনের ধারাই পালটে গেল... এল নতুন পরিবর্তন... আকস্মিক, কিন্তু দুর্বার, অমোঘ এবং বিস্ময়কর। UFO দর্শনের দিন কয়েক পরেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের একরাতে মেয়ের সামনে একটু মজা করার ইচ্ছে হয়েছিল। মিথ্যে করে বলেছিলাম, জানিস, ইচ্ছে করলে যেখানে খুশি বাজ ফেলতে পারি আমি। অবশ্য মনে মনে জানতাম, ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়— মিথ্যে ঠাট্টাও নয়। সাইকোকাইনেসিস বিদ্যে যারা রপ্ত করেছে, তারা মনের শক্তি দিয়ে কসমিক ম্যাটারকে কন্ট্রোল করতে পারে— আকাশের বাজকে টেনে এনে যেখানে খুশি ফেলতে পারে। এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কিসসু নেই। প্রাকৃতিক নিয়মকে যারা জেনেছে, তারাই সাইকোকাইনেসিসের জাদুবিদ্যে দেখাতে পারে এইভাবে। এও এক ধরনের বিজ্ঞান। কিন্তু যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের বাইরে— তাই একে পরাবিজ্ঞানও বলতে পারেন।

'আমি এ তত্ত্ব বিশ্বাস করতাম বলেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের সেই ভয়ানক রাতে মেয়ের সঙ্গে মজা করার জন্যেই মনে মনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেছি বার বার; হুকুম দিয়েছি আকাশের বজ্রকে— অমুক জায়গায় গিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধাও তো বাছাধন— দেখি, আমার সাইকোকাইনেসিসের বিদ্যে আছে কিনা।

'অবাক হয়ে গেলাম এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল দেখে। পরের দিন সকালে খবর পেলাম, আশ্চর্যভাবে ঠিক যে যে জায়গায় বজ্রপাতের আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, বাজ পড়েছে ঠিক সেই সেই জায়গায়।

'হয়তো নিছক কাকতালীয়— হঠাৎ মিলে গেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মনের ইচ্ছে। সত্যি সত্যি সাইকোকাইনেসিস বিদ্যে কি আমার আছে? কখনও না।

'মনের ধাঁধা কিন্তু কাটল না। মনের অন্তরতম প্রদেশে একটা বিচিত্র শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করলাম। মন বলল, না না, মিথ্যে নয়, সব সত্যি। আকাশের বাজ তোমার হুকুম শুনেছে। তোমার আদেশেই খেয়ালখুশি মতো অবতীর্ণ না হয়ে তোমার নির্দেশমতো বিশেষ বিশেষ জায়গায় নেমে এসেছে। বেশ তো, ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত আবার দেখা যাবে সামনের পনেরো দিনে বেশ কয়েকবার। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট তা-ই। ফ্রেড ওয়েন, তুমি সাইকোকাইনেসিস ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়েছ কিনা, সে এক্সপেরিমেন্ট করার এই তো সময়।

'জেন্টলমেন, মনের তাড়নায় নিরুপায় হয়ে পরের কয়েকটা বজ্রপাতের দুর্যোগময় রাতে

এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলাম, সত্যিই বজ্রকে আমি হুকুমের দাস বানাতে পেরেছি কিনা। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম এক্সপেরিমেন্টের সাফল্য দেখে। অদ্ভুতভাবে বজ্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি আমার মানসিক শক্তি দিয়ে।

'এই ঘটনার অনেকদিন পরে ফ্যামিলি নিয়ে চলে এলাম অ্যারিজোনার ফিনিক্সে। আসবার পর থেকেই দেখলাম, অনাবৃষ্টি হাহাকার পড়েছে সেখানে। চাষবাসের দফারফা হবার উপক্রম হয়েছে বৃষ্টি না পড়ায়! দিনরাত চোখের সামনে অনাবৃষ্টির ফলে দেশশুদ্ধ লোকের এই দুর্দশা দেখতে দেখতে হঠাৎ খেয়াল হল— আচ্ছা, আমার মনের শক্তিটা প্রয়োগ করে দেখলে হয় না? অদ্ভুত এই ক্ষমতার দৌলতে হয়তো দেশের লোকের দুঃখদুর্দশা কিছুটা ঘুচতে পারে।

'ফ্যামিলির সবাইকে ডেকে বললাম, আমিই বৃষ্টি ঝরাব এই দেশে। বসলাম বসবার ঘরে। বাড়ির সবাই ঘিরে বসল আমাকে। ওরা মজা দেখতে বসেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন ঘন কালো মেঘ জমা হল মাথার ওপর, তখন মজা দেখা বেরিয়ে গেল মেয়ে আর বউয়ের। আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল দু'জনেই। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে উঠল আকাশছাওয়া কালো মেঘে। চাঁদ ঢাকা পড়ে গেল, তারা ঢাকা পড়ে গেল। সাদা আলোয় গোটা অ্যারিজোনা যেন ঝলসে গেল। তারপর উঠল ঝড়। সে কী প্রচণ্ড ঝড়। ভয়ে মেয়ে আঁকড়ে ধরল মা-কে। মা হাত চেপে ধরল আমার। আমি কিন্তু তখন যেন আর আমার মধ্যে নেই। ঝড় উঠেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে— সবই ঘটছে আমারই আন্তরিক বাসনায়। আমিই কায়মনে ডাকছি শুধু পবন-অগ্নিকে— সমস্ত মনপ্রাণ একাগ্র করে একনাগাড়ে শুধু বলছি মনে মনে— ওরে আয়! ওরে আয়! ওরে আয়! ক্ষিতি-অপ-তেজ-ব্যোম— তোরা সাড়া দে আমার আহ্বানে। ওরে আয়! ওরে আয়! ওরে আয়!

'কিন্তু ক্ষমতাটা শুধু নিজেদের মধ্যে রেখে দিলেই তো হবে না— পাঁচজনকে হাতেনাতে দেখানো দরকার। স্থানীয় খবরের কাগজের সম্পাদককে চিঠি লিখে জানালাম, আগামী হপ্তায় কি তার পরের হপ্তায় দুরন্ত ঝড়কে ডেকে এনে অশান্ত করে তুলব ফিনিক্স-এর বাসিন্দাদের। করলামও তাই। একটা দুটো নয়— পর পর আটটা ঝড়ের হু-হুংকারে কেঁপে কেঁপে উঠল ফিনিক্স— ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ল দেশের লোক। হইহই পড়ে গেল খবরের কাগজে— জেনে নিতে পারেন 'ফিনিক্স হেরাল্ড' আর 'মর্নিং গ্লোরি'-তে চিঠি লিখে।

'কিন্তু বিশ্বাস হল না সরকারি কর্মচারিদের। খবরের কাগজের চিঠি আর কাটিং নিয়ে দেখা করতে গেছিলাম। ফ্রেড ওয়েনের শক্তি জনসাধারণের কাজে লাগুক— গভর্নমেন্টের হোমরাচোমরা অফিসারদের এইটাই বোঝাতে চেষ্টা করে নাজেহাল হলাম। সরকার এতটু তৎপর হলেই আমাকে দিয়ে দেশের মঙ্গল করাতে পারত। কিন্তু অবিশ্বাসী গভর্নমেন্ট অফিসাররা কোনও পাত্তাই দিলে না আমাকে। মির‍্যাকল নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয় সরকারি চাকরেরা। উজবুক আর বলে কাকে।

'জেন্টলমেন, হঠাৎ পাওয়া এই শক্তির উৎস কোথায়, এই আত্মসমীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত রইলাম এরপর থেকে। ভেবেচিন্তে দেখলাম, প্রকৃতির আড়াল থেকে কোনও ধীশক্তি আমার মনের যোগসাজশে অত্যাশ্চর্য ঘটনা সৃষ্টি করছে। কথাটা খেয়াল রাখবেন— প্রকৃতির অন্তরালে

রয়েছে একটা ধীশক্তি, একটা ইনটেলিজেন্স! কেন খেয়াল রাখতে বললাম, তা একটু পরেই বুঝবেন।

'এইবার বলি সেই ঘটনাটা। একদিন আচমকা একটা টেলিপ্যাথি বার্তা ভেসে এল মাথার মধ্যে। শিগগিরই উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে আশ্চর্য রকমের ম্যাগনেটিক কাণ্ডকারখানা দেখা যাবে।

'এর ঠিক পরেই জানুয়ারি মাসের আট তারিখে দক্ষিণ মেরুর ঠিক ওপরেই বিরাট চাকতির মতো একটা যন্ত্রযানকে ভাসতে দেখা গেছিল। জেন্টলমেন, সেইদিনই খটকা লাগে আমার মনে। যে ধীশক্তি, যে ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে আমার মনের, সেটা এই ধরিত্রীর নয়— এসেছে বাইরের মহাশূন্য থেকে।'

ফ্রেড ওয়েনের কথা বলার ঢঙটি কিন্তু চমৎকার। যাদের ভেতরে প্রত্যয় নেই, তাদের কথার মধ্যে এত জোর থাকে না। নার্ভাস হয়ে পড়ে পণ্ডিতমানুষের সামনে। কিন্তু আশ্চর্য, ফ্রেড ওয়েনের বাজখাঁই বক্তৃতা শুনে, তাঁর অবিশ্বাস্য কাহিনি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-টিটকিরির কথাও মাথায় এল না কারোর। শুধু তা-ই নয়, বক্তৃতার মাঝে মাঝেই ভদ্রলোক বিস্তর খবরের কাগজের কাটিং হাতে হাতে ছড়িয়ে দিলেন ঘরময়। তাতেই দেখা গেল, বহু সংবাদপত্রে চিঠি লিখে উনি তুমুল ঝড়-বৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে তাঁর প্রতিটি কথা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্পাদকদের চক্ষুস্থির করে দিয়ে ঝড় উঠেছে, বৃষ্টি পড়েছে, বাজ ডেকেছে। এতগুলি খবরের কাগজ বিভিন্ন প্রিন্টিং মেশিনে ছেপে এনে জোচ্চুরি করা সম্ভব নয় কোনওমতেই। না, না, ফ্রেড ওয়েন আর যাই হোন, প্রতারক নন।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মুখের চেহারায় এই বিশ্বাস যখন প্রকট হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই শেষ বম্ব শেলটি নিক্ষেপ করলেন ভদ্রলোক। বললেন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এই যে অনাবৃষ্টি চলছে, এর অবসান তিনি ঘটাবেন আজকেই। ঘন ঘন করতালিতে হলঘর যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। প্রকৃতিকে বশ করেছেন যিনি, তিনি নিঃসন্দেহে বড় মিস্টিক— দেখা যাক, তাঁর ক্ষমতার চাক্ষুষ প্রমাণ।

সভা ভেঙে গেল। পণ্ডিতরা বেরিয়ে এলেন বাইরে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেলেন।

রোদ্দুরে ঝাঁ ঝাঁ আকাশে সহসা দেখা দিয়েছে কালো মেঘ। ঈশান কোণ থেকে বুনো ঘোড়ার কালো কেশরের মতো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত আকাশকে।

তারপরেই নামল বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটায় প্রথমে ধুয়ে গেল হলবর্ন। উত্তপ্ত ফুটপাত শীতল হল বারিধারায়। প্রবল বর্ষণে নেয়ে উঠল সমস্ত দেশ। তারপর শুরু হল শীত। এত প্রচণ্ড শীত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বহুদিন পড়েনি।

আমরা যেন বোবা হয়ে শুনছিলাম ফ্রেড ওয়েনের উপাখ্যান। আমেরিকান ঢঙে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, কিন্তু দুই চোখে ভারতীয় যোগীর মতো ধ্যানের দৃষ্টি ভাসিয়ে বিচিত্র কায়দায় উনি যেন আমাদের বশ করে ফেললেন কথার ছবি উপহার দিয়ে। বেশ বুঝলাম, কথার স্রোতের প্রেরণাটা অমানবিক— উৎসারিত হচ্ছে মনের অন্তরতম গহন কন্দর থেকে... উনি যেন

যন্ত্র... কোনও যন্ত্রী অন্তরাল থেকে চালনা করছে তাঁর বাগযন্ত্রকে। কে সেই যন্ত্র? অন্য গ্রহের, অন্য ছায়াপথের, অন্য নীহারিকার ধীশক্তি?

ক্ষণেক মূক হয়ে রইলেন ফ্রেড ওয়েন। চোখ নামিয়ে কার্পেটের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর যখন চোখ তুললেন, দেখলাম সেইরকমই শূন্য চাহনি ভাসছে নীল নীল দুই চোখের তারায়। উনি আমাদের দিকে চেয়ে আছেন ঠিকই, কিন্তু তবুও যেন চেয়ে নেই— ওঁর নীল চাহনি যেন আমাদের ফুঁড়ে, এই ইট কাঠ পাথরের ইমারত ফুঁড়ে, এই পঞ্চভূতের ধরণী পেরিয়ে মহাশূন্যপানে প্রসারিত।

মৃদু গম্ভীর স্বরে ফের বলে চললেন অদ্ভুত মানুষ ফ্রেড ওয়েন, 'আমার ক্ষমতাকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করতে এগিয়ে আসেনি সরকারি চাকরেরা— কিন্তু আমি নিজে থেকেই এগিয়েছি। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, ১৯৭১ সালের মে মাসে মাউন্ট এটনার ঘুম ভাঙে হঠাৎ। শুরু হয় অগ্ন্যুৎপাত। আধ মাইল চওড়া আর আঠারো ফুট গভীর লাভার নদী বহু আঙুরখেত আর ফলের বাগান ধ্বংস করে এগোতে থাকে ছোট্ট শহর সান্ট আলফিও-র দিকে। সেদিন ছিল মে মাসের বিশ তারিখ। শহরটাকে বাঁচানোর জন্যে আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলাম— মহাশূন্যের ধীশক্তিরা সাহায্য করেছিল আমাকে। লাভা স্রোত সামান্য বেঁকে সান্ট আলফিও শহরের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল— শহরের ভেতরে আর ঢোকেনি।

'আরও আছে। ১৯৭৩ সালের তেইশ অক্টোবর নিউ ইয়র্কের মেন্সা-র ডিরেক্টর ড. ম্যাক্স ফোজেল-কে জানিয়েছিলাম, ভার্জিনিয়ার কেপ চার্লস-এর একশো মাইলের মধ্যে একটা উড়নচাকিকে আসতে বলেছি আমি। সেখানকার পুলিশকে দেখাব উড়নচাকি সত্যি আছে কি না। পঁচিশে অক্টোবর কেপ চার্লস-এর একশো মাইলের মধ্যে চেজ শহরের একজন পুলিশম্যানের মাথার ওপর এসে ভাসতে থাকে একটা উড়নচাকি। পনেরো মিনিট ভেসে ছিল একনাগাড়ে। ড. ফোজেল নিজে বলেছেন, ঘটনাটা সত্যি। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে ভার্জিনিয়ার নরফোক শহরে র‍্যামোজ নামে এক পোস্ট অফিসের কর্মচারিকে বলেছিলাম— সাবধান, পোস্ট অফিসটা বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এক হপ্তা পরেই একটা বোমা পড়ল ওয়েস্ট টোয়েন্টিয়েথ স্ট্রীট পোস্ট অফিসে; কপাল ভাল বলেই ক্ষতি হল খুব সামান্য। ১৯৭২ সালের দশ আগস্ট, কেপ চার্লস-এর স্টেট লিকার স্টোর্সের এক বন্ধুকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, হয় একটা ব্যাংক লুঠ বা একটা মদের দোকান লুঠ করার চেষ্টা করবে ডাকাতেরা। সেইরকমই একটা ষড়যন্ত্র চলছে। সেইদিনই কাছের টাউন কেলান-এ একটা ব্যাংক লুঠ করে বাহান্ন হাজার ডলার নিয়ে গা-ঢাকা দিল একদল ডাকাত। এই ফাইলটা দেখুন। খবরের কাগজের কাটিংগুলো পড়ুন। পোস্ট অফিসে বোমা আর ব্যাংকে লুঠের খবর এতে পাবেন। আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, সে সম্বন্ধেই সই-করা এফিডেভিট পাবেন ফাইলের মধ্যে।'

বলে, ব্রিফকেসের থেকে একটা প্লাস্টিকের ফাইল বের করে আমার হাতে দিলেন ফ্রেড ওয়েন। আমি ফাইল খুলে দেখলাম, সত্যিই অনেক খবরের কাগজের কাটিং আর সই-করা এফিডেভিট রয়েছে।

হঠাৎ বললেন লালুবাবু, 'সুসান প্যাডফিল্ড একজন মহিলা সাইকিক। সাইকোকাইনেসিস ক্ষমতা তাঁরও আছে। তিনি বলেছেন, মহাজাগতিক কোনও সত্তা, মহাশূন্যের কোনও ধীশক্তি তাঁর এই ক্ষমতার উৎস। মনে মনে তিনি কল্পনা করেন যেন লেজার রশ্মি বা অ্যাটমিক পাওয়ার প্রয়োগ করে চলেছে মহাশূন্য থেকে কেউ বা কারা তাঁর মধ্যে দিয়ে। মি. ওয়েন, আপনিও কি এইরকম কিছু কল্পনা করেন?'

ফ্রেড ওয়েন বললেন, 'হ্যাঁ করি। স্পেস ইনটেলিজেন্সকে কনট্যাক্ট করার ইচ্ছে হলেই আমি একটা ছোট্ট চেম্বারকে কল্পনা করি। মনের চোখে দেখতে পাই, গঙ্গাফড়িঙের মতো দুটো ছোট ছোট প্রাণী-পোকা ডিম্বাকৃতি একটা মেশিনের দিকে তাকিয়ে আছে। মেশিনের সঙ্গে রয়েছে, একটা টেলিভিশনের স্ক্রিন। ওরা আমার ছবি দেখতে পায় স্ক্রিনে— আমার কথা হাই-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দতরঙ্গে অনূদিত হয়ে যায় মেশিনের মধ্যে দিয়ে।'

লালুবাবু বললেন, 'আপনার সব ভবিষ্যদ্বাণীই কি সফল হয়েছে?'

পরুষকণ্ঠে ফ্রেড ওয়েন বললেন, 'না, হয়নি।'

আমরা সচকিত হলাম।

উনি বললেন, 'এটুকু সততা আমার আছে। অনেক কথাই আমার মেলেনি। যেমন, আমি বলেছিলাম ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মকালে সারা পৃথিবী জুড়ে উড়নচাকির অভাবনীয় খেলা দেখা যাবে। এত ফ্লাইং সসার্স এর আগে পৃথিবীতে কখনও আসেনি। কিন্তু মহাশূন্যের বন্ধুরা তাদের কথা রাখেনি। আরও একটা ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে। বলেছিলাম, ১৯৭৪ আর ১৯৭৫ সালে পৃথিবীজোড়া যুদ্ধ লাগবে। অনেক রক্তক্ষয় ঘটবে। কিন্তু শুধু বেরুট ধুলোয় মিশে গেছে— জায়গায় জায়গায় লড়াই চলেছে, বড় রকমের কিছু ঘটেনি। হয়তো মহাশূন্যের বন্ধুদের প্রভাবেই তা হয়নি।'

লালুবাবু বললেন, 'তা সত্ত্বেও বলব, ফ্লাইং সসার্স অলীক বস্তু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই নিকোলাই রোয়েরিখ নিজে তা দেখেছিলেন।'

'দেবিকারানীর স্বামী নিকোলাস রোয়েরিখ? রাশিয়ান পেন্টার?'

'হ্যাঁ। আমৃত্যু ব্যাঙ্গালোরের কাছে চন্দন তেল তৈরির কারখানা করে দিব্যি ছিলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালে যে দলটি মঙ্গোলিয়া থেকে দেশ বেড়াতে বেড়াতে ইন্ডিয়াতে আসে, নিকোলাস রোয়েরিখ ছিলেন সেই দলে। ওঁর লেখা 'আলটাই-হিমালয়' বইটা ওই তাকে আছে, দেখতে পাচ্ছেন? ওই বই পড়েই প্রথম জানতে পারি, ১৯২৬ সালের ৫ আগস্ট বিরাট একটা চকচকে চাকতিকে বিপুল বেগে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখে গোটা দলটা। সব ফ্লাইং সসার্সের মতো এটিও তাঁদের ক্যাম্পের ওপর এসেই আচমকা দিক পরিবর্তন করেছিল। তারও অনেক আগে ১৮৯৬ সালে সানফ্রান্সিসকো অঞ্চলে বহু উড়নচাকি দেখা গিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বহু রঙের আলো আর ডিমের আকারের উড়োজাহাজ পর্যন্ত দেখেছিল। এসবই কি মিথ্যে? নিকোলাস রোয়েরিখ নিশ্চয়ই মিথ্যেবাদী নয়?'

ভরাট গলায় ফ্রেড ওয়েন বললেন, 'নিশ্চয়ই নন। যেমন নন ড. পুহারিক।'

'ড. অ্যানড্রিজা পুহারিক? সাইকিক তদন্তকারী?' লালুবাবু ঈষৎ উৎসুক হলেন এবার।

'হ্যাঁ। যাঁর 'সেকরেড মাশরুম' বইটা পড়ে অ্যালডাস হাক্সলে অভিভূত হয়েছিলেন।

বলেছিলেন, প্যারাসাইকোলজিতে এত বড় পণ্ডিত খুব কমই আছে। ড. পুহারিক যাঁদের নিয়ে তদন্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ব্রেজিলের সাইকিক সার্জন আরিগো আছেন। এই সেই আরিগো, যিনি এক মৃত জার্মান ডাক্তারের প্রেতাবিষ্ট হয়ে রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে অস্ত্রোপচার করতেন এবং প্রত্যেকটা অপারেশনের পর ছুরি মুছে নিতেন পরনের ময়লা শার্টে। উরি গেলারকে নিয়েও তদন্ত করেছেন ড. পুহারিক। গেলার নিজে বলেছেন, তিন বছর বয়েসে বাড়ির সামনের বাগানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ঘুম ভাঙার পর দেখলেন, একটা বিশাল চকচকে মূর্তি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর ওপর— মাথার ওপর ভাসছে উজ্জ্বল বাটির মতো একটা বস্তু। যান্ত্রিক স্বরে কে যেন গেলারের মাথার মধ্যে কথা বলে গিয়েছিল আকাশ থেকে, বলেছিল, মহাশূন্য থেকে ধীশক্তিরা এসেছে গেলারের মাধ্যমে পৃথিবীর বিপর্যয় রোধ করার জন্যে। মিশর তখন ইজরায়েলকে আক্রমণ করার প্ল্যান আঁটছিল। গেলার আর পুহারিক— দু'জনের ওপর ভার পড়েছিল এই ফন্দি বানচাল করে দেওয়ার। কিন্তু ঠিক তার পরেই একটা মির‍্যাকল ঘটে যায় ড. পুহারিকের চোখের সামনেই।'

'কীরকম?' লালুবাবুর প্রশ্ন।

ফ্রেড ওয়েন বললেন, 'গেলারের ওপর তখন গ্রহান্তরের ধীশক্তি ভর করেছিল। কথাগুলো টেপরেকর্ডারে তুলে নিচ্ছিলেন ড. পুহারিক। ঘোর কেটে যাওয়ার পর টেপরেকর্ডারটা দেখিয়ে ডক্টর পুহারিক বলেছিলেন, সব কথা জমা রইল এই মেশিনে। হাত বাড়িয়ে টেপরেকর্ডারটা নিয়েছিলেন উরি গেলার। আর ঠিক তার পরেই—' বলে থামলেন ফ্রেড ওয়েন।

লালুবাবু বললেন, 'তারপর?'

'গোটা টেপরেকর্ডারটা অদৃশ্য হয়ে গেল উরি গেলারের হাত থেকে।'

লালুবাবু কিছু বললেন না, আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'ম্যাজিক নয় তো? হাত সাফাইয়ের জাদুবিদ্যেও তো হতে পারে?'

হাসলেন ফ্রেড ওয়েন, 'ড. পুহারিক নাবালক নন। তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তা ঠিক... তা ঠিক', আমতা আমতা করে বললাম আমি, 'কিন্তু এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার—' শম্পি ঠাকুরের ড্রাগন অদৃশ্য করে দেওয়ার ঘটনাটা ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম। লোকটাকে বাজিয়ে নেওয়া দরকার।

চোখ কুঁচকে ফ্রেড ওয়েন বললেন, 'আপনি কি তা হলে আমার অদ্ভুত ব্যাপারগুলোও বিশ্বাস করছেন না?'

আমি না বা হ্যাঁ বললাম না।

ফ্রেড ওয়েন রাগ করলেন না। বললেন, 'ঝড়বৃষ্টি ডেকে এনে প্রমাণ আর দেখাব না। ওটা আমারও একঘেয়ে লাগছে। তবে আপনারা যে আমাকে একবাক্যেই মেনে নেবেন, এমনটি আশা করেও আমি আসিনি; গ্রহান্তরের বন্ধুরা আমার ঘাড়ের কাছে একটা অদৃশ্য তার বসিয়ে রেখেছে। দরকার হলে এই তারের মাধ্যমে তাদের বার্তা সরাসরি আমার মুখ দিয়ে বেরোয়।'

হেসে ফেললাম আমি। ফ্রেড ওয়েন কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, 'সিউড়িতে টেলিভিশন নেই (এই কাহিনি যখনকার, তখন সিউড়িতে টেলিভিশন ছিল না)। থাকলে ওদের চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতাম।'

'টেলিভিশন স্টুডিয়োতে গিয়ে প্রোগ্রাম করে আসত বুঝি?'

'না না, ওদের কোনও স্টুডিয়োকে যাওয়ার দরকার হয় না। মহাশূন্য থেকেই পৃথিবীর সবক'টা টিভি-র পরদায় নিজেদের ফুটিয়ে তুলতে পারে— নিজেদের ভাষা পৃথিবীর যে কোনও ভাষায় অনুবাদ করে নিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। সময় হওয়ার আগে কিছু করাটা হঠকারিতা।'

ঈষৎ বিদ্রুপের স্বরে বললাম, 'তা হলে আপনার ঘাড়ের অদৃশ্য তারের মাধ্যমেই আপনার বন্ধুদের কথা বলতে বলুন।'

অদ্ভুত নীল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ফ্রেড ওয়েন। গভীর চাহনির মধ্যে চাপা বেদনার ছবি দেখলাম যেন। অনুতাপ হল বিদ্রুপ করার জন্যে। বাকসংযমের বড় অভাব ঘটেছে আমার ইদানীং। কিন্তু স্বয়ং নরেন্দ্রনাথও শ্রীরামকৃষ্ণকে বাজিয়ে নিয়েছিলেন। রূঢ়তা একটু দরকার বইকি।

অকস্মাৎ থরথর করে কাঁপতে লাগলেন ফ্রেড ওয়েন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, বিশেষ করে দুটো উরু আর ঘাড়ের মাংসপেশি এমন থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল যা আমি কখনও দেখিনি। কোনও মানুষ স্ব-ইচ্ছায় যে এমনভাবে পেশি আকুঞ্চন দেখাতে পারে, তা মনে হল না। ব্যায়ামবীরেরা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পেশিনৃত্য দেখায় ঠিকই, কিন্তু এরকম দমকে দমকে পেশি শিহরন কল্পনাও করা যায় না।

একই সঙ্গে দুই চোখ মুদে এসেছিল ফ্রেড ওয়েনের। চিবুক এসে ঠেকেছিল বুকের ওপর। আচমকা মুখ তুলে চোখ খুলে সটান আমার দিকে চাইলেন তিনি। নীল চোখের তারা দুটোকে মনে হল যেন দুটো নীল কাচের গুলি। নিষ্কম্প, নির্ভাষ নিতল।

আমার হাত-পা হিম হয়ে গেল সেই চাহনি দেখে।

তারপরেই খ্যানখ্যান শব্দটা বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। হ্যাঁ, ফ্রেড ওয়েনের গলা দিয়ে। যে গলায় একটু আগেই ভরাট গম্ভীর উচ্চনিনাদী স্বর শুনেছি, এখন সেই গলাতেই শুনলাম ধাতব ঝংকার। যেন কাঁসি বাজানো গলা। যেন ধাতুতে ধাতু ঢুকে আওয়াজ সৃষ্টি হচ্ছে গলার মধ্যে এবং পরিষ্কার বাংলা! কোথায় সেই মার্কিনি ইংরেজি!

'দীননাথ নাথ! দীননাথ নাথ! দীননাথ নাথ!' তিনবার খ্যানখেনে গলায় কে যেন ডাকল আমাকে ফ্রেড ওয়েনের শরীরের মধ্যে থেকে। আমি হলফ করে বলতে পারি, সে স্বর হাজার ভেনট্রিলোকুইজ়ম প্র্যাকটিস করে ফ্রেড ওয়েনের গলা দিয়ে বের করা সম্ভব নয়।

যন্ত্রচালিতের মতো সাড়া দিয়ে ফেললাম, 'এই তো আমি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দীননাথ নাথ, তুমি একটা গজমূর্খ।'

'যা বলেন।'

'ঠিকই বলছি। ফ্রেড ওয়েনের বাগযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে এখন আমি বলছি নিকোয়া— নামটা মনে রেখো গজমূর্খ— আমার নাম নিকোয়া— এই ছায়াপথেরই এক অঞ্চলে

আমার বাসা। আমার চেহারা দেখলে তোমার গা ঘিনঘিন করবে— তাই দেখালাম না। আমার কথাগুলো তর্জমাযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বলে এইরকম খ্যানখেনে কাঁসি বাজার আওয়াজ হচ্ছে। নইলে জেনো, আমাদের চেহারার মতো গলার স্বরটা খুব একটা খারাপ নয়।'

'যা বলেন।'

'কী যা বলেন যা বলেন করছ, গজমূর্খ। ফ্রেড ওয়েনকে অবিশ্বাস করাটা তোমাকে মানায়নি। কত বড় বৈজ্ঞানিকের সাগরেদি করছ তুমি, সেটা খেয়াল থাকে না কেন?'

চুপ করে রইলাম বেফাঁস কথা বলে ধমক খাওয়ার ভয়ে।

ধাতুতে ধাতু ঠোকাঠুকির গলায় খ্যান খ্যান টং টং শব্দে বলে চলল ভয়াল কণ্ঠস্বর, 'দীননাথ নাথ, ফ্রেড ওয়েনকে আমি পাঠিয়েছি তোমাদের পৃথিবীরই একটা মস্ত মঙ্গল করার জন্যে। এইমাত্র তোমাদের ঘর থেকে পালিয়ে গেল যে, তার সম্বন্ধে সাবধান।'

'কা-কার কথা বলছেন?'

'ন্যাকামো কোরো না। শম্পি ঠাকুরকে ফ্রেড ওয়েন দেখেনি— কিন্তু শম্পি ঠাকুর দূরদর্শন দিয়ে তাকে দেখতে পেয়েই পালিয়েছে। ফ্যাকাল্টি এক্স নিয়ে এত কথা কপচে গেল শুধু তোমাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে।'

'শম্পি ঠাকুর!'

'হ্যাঁ, ভাবছ আমি গ্রহান্তরে বসে জানলাম কী করে শম্পি ঠাকুর লম্বা চওড়া বাত ঝাড়ছিল তোমাদের সামনে। গজমূর্খ দীননাথ নাথ, শম্পি ঠাকুর মানুষ নয়।'

'মানুষ নয়!'

'না। তাই বলে অমানুষ বলতে যা বোঝো, তাও নয়। সে তোমাদের গ্রহের কেউ নয়। ভূত নয়, মানুষ নয়, অমানুষও নয়— সে আমাদের এই গ্রহের প্রাণী।'

'অ্যাঁ!'

'আরে হ্যাঁ। পলাতক প্রাণী। তোমাদের পৃথিবী গ্রহটা গোটা ছায়াপথের মধ্যে হিরের টুকরো বললেই চলে। ঠিক এমন গ্রহ আর কোথাও নেই। সবুজ মণির মতো সুন্দর তোমাদের গ্রহের জঠরে রয়েছে অসীম শক্তির ভাণ্ডার— যার নাম পৃথ্বী-শক্তি— ম্যাগনেটিক সোর্স। এ শক্তি এই ছায়াপথের আর কোনও গ্রহে নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অফুরন্ত এই শক্তির মধ্যে মানুষ হয়েও তোমরা একে কাজে লাগাতে পারছ না। যে ক'জন সে চেষ্টা করার জন্যে, উঠেপড়ে লেগেছেন, তাঁদের সাধনাকেও যথেষ্ট বাগড়া দেওয়া হচ্ছে। মুকাই গেছে তোমাদের এই শক্তি লুঠ করে, সমস্ত ছায়াপথের অধীশ্বর হবে বলে।'

'মুকাই! সে কে?'

'শম্পি ঠাকুর নামে যে তোমাদের কাছে পরিচয় দিয়েছে। যে কোনও জীবের আকার ধারণ করা ওর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। ছায়াপথের অন্যান্য গ্রহবাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাদের সাহায্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বারংবার ফ্লাইং সসার্স পাঠাচ্ছি এই কারণেই। কিন্তু মুকাই চায় তোমাদের পদানত করতে তোমাদেরই শক্তির দৌলতে। তাই সে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে পৃথিবীতে। কিন্তু যখনই আমরা খবর পেলাম, সে তোমাদের জপাতে যাচ্ছে

ছদ্মবেশে— পি কে ম্যান ফ্রেড ওয়েনকে পাঠালাম তার মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু সে বড় ধড়িবাজ— আগেই পালিয়েছে।'

'কিন্তু পৃথিবীর শক্তি লুঠ করবে কী করে?' আমতা আমতা করে বললাম আমি।

'ঘটে বুদ্ধি থাকলে কি আর তা জিজ্ঞেস করতে? বললেও বুঝবে না— তাই বললাম না। শুধু শুনে রাখো, ২১৬১ সালে সৌরজগতের সবক'টা গ্রহ এমন একটা অবস্থানে থাকবে যে পৃথিবীর শক্তি তুঙ্গে পৌঁছবে এবং সবচেয়ে বেশি ঠেলে বেরোবে মামা-ভাগনে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। মুকাই তাই একাই দখল নিতে চায় জায়গাটার।'

'বলছেন কী?'

'তোতলামিতে বেশ রপ্ত হয়েছ দেখছি, গজমূর্খ! যাক, তোমরা সবাই শোনো। আমি নিকোয়া বলছি— ফ্রেড ওয়েনের ঘাড়ের মধ্যে অদৃশ্য তার আমিই বসিয়েছি। আমারই ইচ্ছায় ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র নামে পৃথিবীর বুকে। মেঘের বুকে রঙিন ঝলক তুলি আমি। ফ্লাইং সসার্স উড়ে যায় দিকে দিকে। বাঁকুড়ায় মাইলকয়েক উঁচু একটা মেঘের থাম পাঠাব ১৯৯০ সালের ২৮ জুলাই জয়রামবাটি আর কামারপুকুরের মাঝখানের জল, গাছপালা উড়িয়ে নিয়ে আসার জন্যে। অবিশ্বাসীদের চোখ খুলে দেব সেইদিন। (সত্যিই ২৯ জুলাই অদ্ভুত এই কাণ্ড ঘটেছে বাঁকুড়ায়। খবরের কাগজ দ্রষ্টব্য।) ফ্রেড ওয়েনকে কাছে রাখো— আমার সাহায্য যদি চাও। শম্পি ঠাকুর, মানে, আমাদের মুকাইকে যদি আবার দেখতে পাও— ইলেকট্রিক খাঁচার মধ্যে পুরে রেখো— ওর ক্ষমতার ধার কমে যাবে। যদিও ও আর তোমাদের সামনে শম্পি ঠাকুরের ছদ্মবেশ নিয়ে আসবে না; এই মুহূর্তে একটা সবুজ টিকটিকির রূপ ধরে বাগান থেকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে তোমাদের দিকে।'

শুনেই তো গা ছমছম করে উঠল আমার।

খ্যান খ্যান টং টং কণ্ঠস্বর বললে, 'মাভৈঃ। তোমাদের ক্ষতি করার সাহস ওর হবে না। কারণ ও বুঝতে পেরেছে আমি আছি তোমাদের পেছনে। মামা-ভাগনে পাহাড় নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে— তোমাদের এত বড় শক্তিকেন্দ্র দুষ্ট লোকের হাতে যাক— এটা আমি চাই না— আমাদের গ্রহের কেউ চায় না। তাই গায়ে পড়ে উপদেশ দিচ্ছি। পি কে ম্যানকে বিশ্বাস করো— কেমন? আচ্ছা চলি?'

ঘর নিস্তব্ধ। ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে ফ্রেড ওয়েন। আবার উরু আর ঘাড়ের মাসল থরথরিয়ে কেঁপে উঠল আগের মতো। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। ক্ষণেকের জন্যে চোখ মুদে ফের চোখ মেললেন ভদ্রলোক। নীলকান্ত দুই চোখে দেখলাম মানবিক চাহনি— অপার্থিব চাহনির তিরোধান ঘটেছে।

মৃদু হেসে বললেন পি কে ম্যান, 'শুনলেন সব?'

ভাঙা গলায় বললাম আমি, 'বিলক্ষণ।'

২২. কুমিরছানা লোপাট

দু'হাতে রগ টিপে বসে রইলাম আমি। নরেশ চেয়ে রইল কড়িকাঠের একটা টিকটিকির দিকে। লালুবাবু নতুন সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়তে লাগলেন।

ফ্রেড ওয়েন বিদায় নিয়েছেন। আমাদের বাকরহিত করে বিদায় নিয়েছেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করলাম আমি।

বললাম, 'নরেশ, ব্যাপার যে দেখছি ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠেছে। মামা-ভাগনে পাহাড়ের ওপর শেষ পর্যন্ত ভিনগ্রহীদের নেকনজরও পড়েছে।'

নরেশ স্বভাবসিদ্ধ মৌনতা বজায় রাখল। ও পর্যবেক্ষক, বক্তা নয়।

লালুবাবুর সিগারেটের প্যাকেট ছেঁড়া হয়ে গিয়েছিল, একটা সিগারেট দেশলাইয়ের বাক্সর ওপর ঠুকতে ঠুকতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'খাকিরামবাবার রহস্য নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। তারপর একে একে এলেন দুলিচাঁদ, কানু কর্মকার, শম্পি ঠাকুর, ফ্রেড ওয়েন আর নিকোয়া। নরেশবাবু, দীননাথবাবু, আমরা কি দলবদ্ধভাবে স্বপ্ন দেখছি? না একযোগে সবাই পাগল হয়ে গেলাম?'

দোরগোড়া থেকে এল জবাবটা, 'কুমিরছানাগুলোও কি পাগল হতে আরম্ভ করেছে?'

সচমকে সবাই তাকালাম। চৌকাঠের ফ্রেমে আবির্ভূত হয়েছে কানু কর্মকারের পুরুষালি বপু। বোতাম খোলা ব্লু-টেরিলিন শার্টের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে লোমশ বুক। শ্যামবর্ণ পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে কড়া রোদে। মুখ চোখ তাই যেন ব্রোঞ্জের তৈরি মনে হচ্ছে। দৈনিক গল্পপত্রিকার হিরো যেন।

বললাম সবিস্ময়ে, 'কানুবাবু যে। ধূমকেতুর মতো হঠাৎ?'

কানু কর্মকার দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাদের পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসে পড়লেন। তারপর পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা খবরের কাগজ বের করে বললেন, 'পড়েছেন আজকের কাগজ?'

'কী কাগজ?'

মুচকি হেসে কানু কর্মকার বললে, 'দৈনিক গল্পপত্রিকা।'

'ও কাগজ আমরা কেউ পড়ি না।'

'জানি, কিন্তু আজকের কাগজখানায় খবর আছে, গল্প নেই।'

'আপনিই বলুন না কী খবর।'

'কুমিরছানাগুলো চম্পট দিচ্ছে কেন?'

'কুমিরছানা!' আড়চোখে দেখলাম, ফুকফুক করে শনিগ্রহের রিং তৈরি করছেন লালুবাবু সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে, যেন কিছুই শুনছেন না। কিন্তু কানদুটো যে অতিমাত্রায় প্রখর, তা নকল নির্লিপ্ততা দেখেই মালুম হল।

কানু কর্মকার কাগজের ভাঁজ না খুলে মুখ মুখে যে গল্পখানা ছাড়লেন, তা এই:

রহস্যজনক কাণ্ড ঘটছে সুন্দরবনের কুমির প্রকল্পে।

টুরিস্টরা স্টিমারে করে একদিন গিয়ে দেখলে, ধেড়ে কুমিরগুলো যেমন তেমনি রোদ

পোহাচ্ছে, বাচ্চা কুমির একটাও নেই। রাতারাতি উধাও হয়েছে তারা।

যে অফিসারটি কুমিরদের তত্ত্বাবধান করেন, তিনি তো হতবাক। বন্দুক নিয়ে রাত কাটান তিনি একতলা বাড়ির একটা ঘরে। কর্মচারির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কুমিরদের ছানাগুলো কিলবিল করে সামনের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা খোলা জায়গায়। খাঁচায় রাখা হয়নি ইচ্ছে করেই। পাঁচিল ডিঙিয়ে কুমির ওপরে উঠতে পারে না। তা ছাড়া কুমির চুরিও আজ পর্যন্ত হয়নি। চোরছ্যাঁচোড়ের কথা কেউ কখনও ভাবেনি।

তা সত্ত্বেও রাতারাতি সবক'টা ছানা নিপাত্তা।

খবরের কাগজওলাদের মতে, কুমিররা সুন্দরবনের আহ্বানে জলে ফিরে গেছে। দুষ্ট ব্যক্তিদের মতে, মোটেই তা নয়, কুমিরদের চুরি করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের হাত আছে এর মধ্যে। যে দেশে কুমির নেই, কুমিরছানা চালান হচ্ছে সেই দেশে।

কিন্তু কুমির চুরি কি সম্ভব? তা ছাড়া, একরাতেই ধেড়ে কুমিরদের রেখে দিয়ে কেবল ছানাগুলোকে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কোনও বিশেষ মতলব আছে কি?'

জল্পনাকল্পনার বিস্ফোরণ ঘটল এর ঠিক পরেই। কলকাতা চিড়িয়াখানার কুমিরছানাগুলোও একদিন যেন ডানা মেলে উড়ে গেল পাঁচিলঘেরা অঞ্চল থেকে।

অগত্যা মুখরোচক এই খবর নিয়ে সম্পাদকীয় ফেঁদে বসলেন দৈনিক গল্প পত্রিকার সম্পাদক। কানু কর্মকারের টনক নড়েছে সেই কারণেই।

আমরা যখন হাঁ করে শুনছি কানু কর্মকারের পরম উপাদেয় কাহিনি, ঠিক তখনই কিন্তু কুমিরছানাদের নিয়ে আর এক ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হয়ে চলেছিল একটা ভাঙা বাড়িতে। মাঝে মাঝে তাই আশ্চর্য হয়ে ভাবি, ফ্যাক্ট চিরকালই ফিকশনের চাইতে অনেক চমকপ্রদ— কল্পনার চাইতে অনেক রোমাঞ্চকর হয় সত্যকাহিনি। কুমিরছানাগুলোর অন্তর্ধানরহস্যের সঙ্গে যে মামা-ভাগনে পাহাড়ের নিবিড় জটিল প্রহেলিকার যোগসূত্র থাকতে পারে— সেই মুহূর্তে তা কেউ ভাবতে পারেনি।

কুমিরছানারা সুন্দরবনের প্রকল্প আর চিড়িয়াখানার চৌহদ্দি ছেড়ে কার খপ্পরে গিয়ে পড়েছিল, তা জেনেছিলাম অনেক পরে। পিলে চমকে ওঠার মতো সেই কাহিনিতে এবার আসা যাক।

২৩. ডক্টর ফুঁ

একখানা ঘরের চারদিকে ঠাসা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। একই ঘরের মধ্যে ঠাসা মরা বাদুড়, ইগলের কঙ্কাল, বেজির ছাল, শকুনির মুণ্ডু, মানুষের কঙ্কাল এবং অনেক ইতর প্রাণীর কঙ্কাল। কালো বেড়াল আর নেকড়ের কঙ্কাল পর্যন্ত সাজানো রয়েছে বিরাট টেবিলের ওপর। ঘরের ছাদ থেকে লোহার শেকলে ঝুলছে বড় বড় তামার পাত্র। পাত্রের তলায় আগুন জ্বলছে। রঙবেরঙের তরল পদার্থ ফুটছে পাত্রগুলোয়। রামধনু রঙের ধোঁয়ায় ঘর ভরতি। একটা কাচের বাক্সের মধ্যে একটা ছোট্ট কুমিরছানা। বাক্সের মাথা থেকে একটা পেতলের

পাইপ বেরিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে একটা তরল পদার্থ-বোঝাই ড্রামের মধ্যে দিয়ে। তার পাশেই একটা মস্ত চৌবাচ্চা। জল নেই। তলায় কিলবিল করছে বিস্তর কুমিরছানা।

একজন বেঁটে লোক গায়ে কালো আলখাল্লা চাপিয়ে হেঁট হয়ে চেয়ে রয়েছে কাচের বাক্সের দিকে। কালো আলখাল্লার বুকের কাঠে সোনালি সুতোয় একটা ড্রাগন আঁকা। নাক দিয়ে লাল আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। ঢলঢলে হাতদুটোতেও লিকলিকে ড্রাগনের ছবি।

বেঁটে বক্কেশ্বরের মাথায় একটা কালো ছুঁচোলো টুপি। টুপির গায়েও সুতো দিয়ে আঁকা ড্রাগনের ছবি।

মর্কটাকৃতি মানুষটার গায়ে চামড়া হলুদাভ। পীত মুখের দুটি চোখ যেন নরুন দিয়ে চেরা। ধূর্ত অক্ষিতারকা দুটি কিন্তু আশ্চর্য উজ্জ্বল। বিরাট পাণ্ডিত্য প্রকটিত দুই নয়নমণিকায়।

চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পীতমানবটি মঙ্গোলীয়। অত ড্রাগনপ্রীতি ওই কারণেই।

হঠাৎ নিস্তব্ধ ঘরে কিঁউ কিঁউ করে একটা শব্দ শোনা গেল। রেডিয়োতে যে রকম আওয়াজ শোনা যায়— অবিকল সেই আওয়াজ। আওয়াজটা এস বিশাল টেবিলের তলা থেকে। তাড়াতাড়ি মেঝের ওপর বসে পড়ে একটা রেডিয়ো ট্রান্সমিটার আর রেডিয়ো রিসিভার টেনে বের করল পীতমানব।

নব ঘুরিয়ে সুইচ অন করে দিয়ে বললে মাইক্রোফোনের সামনে, 'হ্যাল্লো... হ্যাল্লো... ড. ফুঁ বলছি।'

যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, 'ড. ফুঁ, আমি এজেন্ট জিরো বলছি।'

'বুঝতে পেরেছি। কী খবর, এজেন্ট জিরো?'

'খবর তো আপনার কাছে। কুমিরছানা চুরি নিয়ে ভীষণ হইচই পড়ে গেছে।'

'তা তো পড়বেই। ওই জন্যেই তো বলেছিলাম, কুমির চুরি করব আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হওয়ার পর— একেবারে শেষ পর্যায়ে। এখন বাছাধনরা যতই হইচই করুক না কেন, ড. ফুঁ-কে আর আটকাতে পারবে না।'

'তা তো বুঝলাম, আপনার তৈরি সৃষ্টি দুটো রেডি তো?'

'বিলক্ষণ রেডি, এজেন্ট জিরো। খাকিরামবাবাকে ভিটেমাটি চাঁটি করার সময় এখন হয়েছে। পুরো বাহিনীটা তৈরি করতে আর ছ'টা মাস সময় যাবে। খুব তাড়াতাড়ি ডানা গজাচ্ছে,' বলে সস্নেহে কাচের বাক্সের মধ্যে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকা কুমিরছানাটার দিকে চেয়ে রইল ড. ফুঁ। ছানাটার শরীরের দু'পাশে কী যেন ঠেলে উঠছে। যেন নতুন মাংসপিণ্ড।

এজেন্ট জিরো বললে, 'খাকিরামবাবার আবিষ্কার তা হলে আপনি আসল কাজে লাগিয়ে ফেললেন?'

'তা আর বলতে। তোমাকে আমি মন্ত্রী বানিয়ে রাখব পৃথিবীটার রাজা হওয়ার পর। তোমার সাহায্য না পেলে খাকিরামের ফর্মুলা তো পেতাম না।'

'কথাটা মনে রাখবেন কিন্তু। কী কষ্টে যে পুরো সিক্রেটটা হাতিয়েছি, তা আমিই জানি। বুড়ো তো সাপের গায়ে ডানা গজিয়েছে, নন্দী আর ভৃঙ্গী বানিয়েছে, আপনি গজাচ্ছেন কুমিরের গায়ে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। ড. ফুঁ, কীরকম দেখতে হয়েছে ডানাদুটো বড় হওয়ার পর?'

‘ভয়াবহ, এজেন্ট জিরো, ভয়াবহ। নেহাত আমি সৃষ্টিকর্তা, তাই ওরা দু’জনে আমাকে সমীহ করে চলছে— কিন্তু আর কাউকে করবে না হে। বড় ভয়ংকর জীব সৃষ্টি করেছি আমি। নাক দিয়ে আগুনের হলকা যখন বেরোয়— দরজা-জানলা সব পুড়িয়ে দেয়।’

‘সাইজ কী রকম হল?’

‘বাচ্চা হাতির মতন। হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে হরমোন সলিউশনটা ইনজেকশন করে দেওয়ার পর। এক একটা উড়ন্ত বিভীষিকা। হাঃ হাঃ হাঃ!’

‘ড. ফুঁঃ, খাকিরামবাবা কিন্তু এখনও কোনও সন্দেহ করেননি। যত সন্দেহ ওই ছোকরা দীননাথ, দুলিচাঁদ, কানু কর্মকারকে।’

‘ওদের নিপাত করব সবার আগে— সামনের পূর্ণিমাতেই। তারপরে জাহান্নমে যাবে খাকিরামবাবার উড়ুক্কু সাপদুটো— নাকের আগুন দিয়ে স্রেফ পুড়িয়ে মারবে চ্যাং আর চুং।’

‘ওদের নাম বুঝি?’

‘হ্যাঁ। চ্যাং আর চুং। চমৎকার নাম, তাই না? ভাগ্যিস বেচারারা পড়েছিল আমার হাতে— তাই তো সরীসৃপ-জন্ম সার্থক হল, ছিল কুমির, বানালাম...’ বলে নাকি সুরে ফের হেসে উঠল পীতমানব।

এজেন্ট জিরো বললে, ‘মতলবটা কিন্তু আমার, তা মানছেন তো?’

‘হাজারবার মানছি, এজেন্ট জিরো। ওই জন্যেই তো বললাম, ওয়ার্ল্ড ডিকটেটর হওয়ার পর, চিন-ভারত-রাশিয়া-আমেরিকা-ইরান-আফ্রিকা-ব্রিটেন-জার্মানিকে পায়ের তলায় আনবার পর, তোমাকে করব আমার রাইট হ্যান্ড। আমার তৈরি উড়ুক্কু বিভীষিকা নিমেষে চরকিপাক দিয়ে আসবে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। ভাগ্যিস খাকিরামবাবার মাথায় প্ল্যানটা এসেছিল—’

এজেন্ট জিরো বলে উঠল, ‘খাকিরামবাবা তো অন্য প্ল্যানের কথা ভেবেছিলেন। সরীসৃপের হার্টে নাকি জন্মগত একটা বাধা আছে। সারা শরীরের অশুদ্ধ রক্তটা হার্টের মধ্যে দিয়ে পুরোপুরি ফুসফুসে গিয়ে ফের বিশুদ্ধ হয়ে শরীরে ফিরে যেতে পারছে না। তাই সাপেরা ঝিমিয়ে থাকে। তাই ওদের নড়াচড়া অত ঢিমেতালে। তাই ওরা শীতে কাবু হয়ে পড়ে। উনি অপারেশন করে হার্টের বাঁধা সরিয়ে দিতেই অদ্ভুত কাণ্ডটা দেখা গেল। বিশুদ্ধ রক্ত শরীরে যেতেই চাঙ্গা হয়ে উঠল নিঝুম সাপদুটো। দেখতে দেখতে দুটো ডানাও বেরিয়ে এল। তারপর ব্রেনের মধ্যে কী সব অপারেশন করে ওদের শোনার ক্ষমতাও দিলেন খাকিরামবাবা— এমন কী মানুষের কথা পর্যন্ত বোঝবার মতন উন্নত ব্রেনের ব্যবস্থাও করে দিলেন। এই পর্যন্ত আপনি জেনেছিলেন আমার মারফত। উনি এর বেশি আর কিছু করতে চাননি। ডানাঅলা সাপ দিয়ে পাহাড় পাহারা দিয়ে সোনার তেল, রুপোর তেল, পাথরের তেল আর নকল মানুষ বানানোর গবেষণা করছেন পৃথিবীর মানুষের মঙ্গলের জন্যে। মামা-ভাগনে পাহাড়ের ম্যাগনেটিক ফোর্সকে কাজে লাগাচ্ছেন অতিমানুষ তৈরির গবেষণায়। আর আপনি...’

এজেন্ট জিরোর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে নাকি সুরে অট্টহেসে বললে পীতমানব,

'আর আমি সেই একই পদ্ধতি আর এক সরীসৃপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পেয়েছি তার চাইতেও আশ্চর্য ফল। কুমিরের গায়ে যখন ডানা বেরোয়, নাক দিয়ে যখন আগুন বেরোয়, নক্ষত্রবেগে যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যায়, তখন তাকে কী বলে, এজেন্ট জিরো?'

'ড্রাগন।'

'হ্যাঁ। আমার তৈরি করা ড্রাগনরা বিশ্ববিজয় করবে। আমি হব ড্রাগন-অধ্যুষিত নয়া পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট। আর তুমি হবে আমার...'

'মন্ত্রী।'

২৪. ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ। মামা-ভাগনে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে পেল্লায় পাথরটার চুড়োয় দাঁড়িয়ে দুটি মূর্তি— খাকিরামবাবা আর মতি পাণ্ডে।

ময়ূরাক্ষী কটন মিল যেদিকে, খাকিরামবাবা একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সেদিকে। মতি বললে, 'কী দেখছেন, বাবা?'

'সাদামতো কীসের ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে না?'

'আজ্ঞে। সার্কাসের তাঁবু।'

'কবে এল?'

'এই তো দিন সাতেক।'

'যাচ্চলে, সার্কাসের তাঁবু এখানে, দুবরাজপুরের ভেতরে নয় কেন?'

'কটন মিলের কুলি মজুরদের সার্কাস দেখাবে বলে।'

'আমার তো অসুবিধে। কী নাম সার্কাসটার?'

'গ্রেট চাইনিজ সার্কাস!'

খাকিরামবাবা যেন চিন্তিত, 'আবার চিনেম্যান! আমার সাধনক্ষেত্রের এত কাছে?'

'কী আর করবেন বলুন। নন্দী-ভৃঙ্গীকে লেলিয়ে দিলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেঁধে যাবে যে।'

'না না, মতি। ও কর্মটি করতে যেয়ো না। তাতে আরও অশান্তি বাড়বে। কিন্তু বড় ভাবনায় ফেললে তো। ক'দিন সার্কাস চলবে খোঁজ নিয়েছ?'

'নিয়েছি। চিনেম্যানগুলো কথাই বোঝে না।'

'ধুত্তোর!'

সার্কাসের তাঁবুর পাশে একটা ছোট্ট তাঁবু। গভীর রাত। ড. ফুঁ দাঁড়িয়ে আছে একটা লোহার খাঁচার সামনে। দুটো বিকট জীব পায়চারি করছে খাঁচার স্বল্প পরিসরে। ড. ফুঁ-এর হাতের হ্যাজাকের আলোয় গনগনে অঙ্গারের মতো জ্বলছে তাদের চোখ। নাকের ফুটো দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সড়াৎ সড়াৎ করে জিভ বেরিয়ে আসছে মাঝে মাঝে। সাপের জিভের মতো জিভটা মাঝখান থেকে চেরা।

সস্নেহ চোখে দুই দুঃস্বপ্নের দিকে তাকিয়ে থেকে খাঁচার মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটির

ডাইনোসরের মতো কাঁটা কাঁটা পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে ড. ফুঁ। অমনি অপরটি চেরা জিভ বের করে আলতো করে বুলিয়ে আদর করল ডক্টরের হাতটাকে। ঈষৎ হাঁ করতেই কাঁচা মাংসের একটা ডেলা পাশের বালতি থেকে তুলে ধারালো দাঁত দিয়ে সাজানো মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করল ড. ফুঁ।

বললে গদগদ কণ্ঠে, 'বাবা চ্যাং, বাবা চুং। আজ রাতেই তোদের মহড়া হবে। সার্কাসের নাম করে তোদের এনেছি কাঠের বাক্সতে ভরে, নইলে কি আনা যেত? সার্কাস শুরু হতে এখনও সাতদিন। এই সাতদিনের মধ্যেই আমার আসল কাজ সারব। পারবি তো?'

চ্যাং আর চুং সড়াৎ সড়াৎ করে জিভ বের করে এমনভাবে ঘাড় নাড়ল, যেন ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলছে।

ড. ফুঁ বললে, 'ব্যস, ব্যস, তোদের ব্রেনের মধ্যে গ্রে ম্যাটার এতখানি বেড়ে গেছে জানতাম না। খাকিরামবাবার সাপদুটোর চেয়ে তোদের ব্রেনের শক্তি বেশি, গায়ের জোরও বেশি, সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল তোদের নাকের আগুন। পারবি তো সাপদুটোকে পুড়িয়ে রোস্ট করতে?'

উত্তরে চ্যাং আর চুং ধকধক করে দু'বার আগুনের হলকা ছাড়ল নাকের ফুটো দিয়ে। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল মাটির ওপর পড়ে থাকা কাঠের বাক্স দুটো।

'থাক থাক বাবা। তাঁবুর মধ্যে খেলা দেখাতে যেয়ো না। লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাবে। সাপদুটোকে মেরে তোদের কাজ হবে ওই খাকিরামবাবাকে খতম করা। ওর ব্রেনটা পেলে অবশ্য আর একটা এক্সপেরিমেন্ট করতাম, তোদের ব্রেনে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতাম কী দাঁড়ায়। কিন্তু জ্যান্ত তো ওকে ধরতে পারি না। অনেক কায়দা জানে। সুযোগ দিবি না, বুঝলি? যেই সাপদুটো পটল তুলবে, খাকিরামবাবা বেরিয়ে আসবে, তোরা সঙ্গে সঙ্গে আগুন দিয়ে ঝলসে কাবাব বানিয়ে ফেলবি। কেমন?'

এবার সড়াৎ সড়াৎ করে লকলকে চেরা জিভ বের করে সায় দিল চ্যাং আর চুং।

ড. ফুঁ ওদের কাঁটা কাঁটা পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'খাকিরামবাবা অক্কা পেলেই মামা-ভাগনে পাহাড় দখলে আসবে আমার। পাহাড়ের তলায় যে বিরাট গহ্বরের পর গহ্বর আছে, সে খবর এ তল্লাটের আর কেউ রাখে না। ওইখানেই থাকবি তোরা। খাঁচায় থাকতে বড় কষ্ট বুঝি তো। হেসে খেলে বেড়াবি। ওই মাঠে গোরু মোষ ভেড়া ছাগল চরতে আসে। ধরে ধরে খাবি। মানুষ পেলেও ছাড়বি না। তবে বাবা, রাতবিরেতে খাবে, দিনের বেলায় একদম বেরোবে না। ক'টা মাস এমনিভাবে থাক, কুমিরছানাগুলোকে এখানে আনি, তোদের দল বাড়ুক। তারপর বিয়ে-থা করে সংসার বাড়িয়ে যাবি। যখন বেশ বাহিনী গড়ে উঠবে, ড্রাগনবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়বি দিগবিজয়ে। একটার পর একটা দেশ দখল করব। হাঃ হাঃ হাঃ!'

সড়াৎ সড়াৎ করে জিভ বের করে সায় দিয়ে গেল চ্যাং আর চুং।

২৫. প্রলয়ংকর মামা-ভাগনে

মামা-ভাগনে পাহাড়ের অদূরে এসে দাঁড়ালাম আমি, কানু কর্মকার, দুলিচাঁদ, নরেশ আর লালুবাবু। রাতদুপুর বললেই চলে। আকাশে চাঁদের মহিমা দেখেও গা ছমছমানি গেল না।

লালুবাবু খাটো গলায় বললেন, 'খাকিরামবাবার চোখ কিন্তু চারদিকে। এগোবেন কী করে?'

আমি বললাম, 'এগোবার চিন্তা পরে। এখন শুধু দূর থেকে দেখতে চাই। ওয়াচ করতে চাই।'

নরেশ কেশে নিয়ে গলা সাফ করে বললে, 'তা করো। ভাল করেই করো।'

ওর গলার স্বরটা অদ্ভুত। অনেক দূরে কী যেন দেখতে দেখতে কথাটা বলেই চেয়েই রইল সেদিকে। আমিও সেদিকে তাকালাম। প্রথমে তেমন কিছু দেখলাম না। ধু ধু মাঠ, দূরে সাদামতো সার্কাসের তাঁবু, বড় বড় গাছ। কানে ভেসে এল একটা অদ্ভুত শনশন শব্দ। বাতাস যেন আলোড়িত হচ্ছে দূরে কোথাও। তার পরেই দেখলাম, গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে দুটো বিরাট বস্তু বায়ুবেগে ধেয়ে গেল মামা-ভাগনে পাহাড়ের দিকে। চাঁদের আলো তাদের গা থেকে ঠিকরে গেল বলেই দেখতে পেলাম এইটুকু, নইলে অতজোরে যাওয়ার জন্যে কিছুই দেখতে পেতাম না। চক্ষের নিমেষে উড়ন্ত বস্তুদুটো হারিয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে।

রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'ওকী! ওকী! ওকী!'

নির্নিমেষে চেয়ে থেকে নরেশ বললে, 'যাও।'

আচমকা প্রচণ্ড ডানা ঝটপটানির আওয়াজ ভেসে এল পাহাড়ের দিক থেকে। সেইসঙ্গে অমানবিক গজরানি। হঠাৎ দপ করে আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল পাহাড়ের পেছন থেকে। যেন পিচকিরি থেকে আগুন বেরোচ্ছে, এমনি আগুন ছিটকে ছিটকে গেল এক একটা পাথরের আড়াল থেকে। দুমদাম গড়গড় শব্দে বিরাট একটা পাথর গড়িয়ে গেল একদম ওপর থেকে নিচের দিকে। একটা চাপা বিস্ফোরণ ভেসে এল মাটির তলা থেকে। পায়ের তলার মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল সেই শব্দে।

তার পরেই দাউদাউ করে আগুন লকলকিয়ে উঠল মামা-ভাগনে পাহাড়ে। এ কীসের আগুন? লেলিহান শিখা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো যেন ভূগর্ভ থেকে ঠিকরে উঠে গেল আকাশের দিকে, মেঘলোকের দিকে। যেন কল্পনাতীত তুবড়ি পুড়ছে মামা-ভাগনে পাহাড়ের কোথাও। আগুনের শোঁ শোঁ শব্দ আর চাপা গুমগুম আওয়াজে গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই একটু আগে দেখা দুটো উড়ন্ত বিভীষিকার একটা ঠিকরে গেল আকাশপানে, আগুনের মধ্যে দিয়ে উলটোপালটা ডিগবাজি খেয়ে খেতে মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে, চাঁদের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা গেল সেই বিভীষিকাকে, যেন কেউ দানবিক হাতে তাকে ছুড়ে ফেলে দিলে আকাশপানে। ডানা ঝটপটানি আর প্রচণ্ড শনশন শব্দে সম্বিৎ ফিরল। পাহাড়ের দিক থেকে আর একটা ভয়াল উড়ুক্কু বিভীষিকা জেট প্লেনের মতো বেগে ধেয়ে

গেল সার্কাসের তাঁবুর দিকে। সারা গায়ে তার আগুন জ্বলছে, দূর থেকেই দেখলাম, সার্কাসের তাঁবুর ওপর আছড়ে পড়ল বস্তুটা, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল অতবড় তাঁবুটা। তারপরেই পর পর কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল তাঁবুর দিক থেকে। আগুন আরও লেলিহান হয়ে উঠল। শোনা গেল বহু মানুষের চিৎকার, জন্তুজানোয়ারের গর্জন।

আমরা থ হয়ে সেদিকে একবার তাকাচ্ছি, আর একবার তাকাচ্ছি মামা-ভাগনে পাহাড়ের প্রলয়ংকর অগ্নিলীলার দিকে, এমন সময় গাছপালার তলা দিয়ে ছুটে আসতে দেখলাম দুটি মূর্তিকে। আগুনের আভায় চিনলাম দু'জনকেই।

প্রথমজন খাকিরামবাবা। পেছনে পাহাড়েশ্বর মন্দিরের সেই পুরুতঠাকুর। খাকিরামবাবা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছেন জ্বলন্ত তাঁবুর দিকে, আর পাগলের মতো চেঁচাচ্ছেন, 'ড. ফুঁ! ড. ফুঁ! আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন!'

পেছন থেকে বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে এসে তাঁর নাগাল ধরে ফেলল পুরুতঠাকুর, ঝাঁপিয়ে পড়ল খাকিরামবাবার ওপর। মাটিতে ফেলে দিয়ে চেপে বসল বুকের ওপর।

ককিয়ে উঠলেন খাকিরামবাবা, 'মতি! তুমি!'

বিকৃতকণ্ঠে পুরুতঠাকুর বললে, 'হ্যাঁ, আমি। উঠতে বসতে দাঁতে পিষেছ আমাকে এতদিন। আমার আধখানা শরীর গড়ে দিয়েছ বলে অহংকারে মটমট করেছ। তোমার ব্রেন আছে ঠিকই। সেই ব্রেনই আমাকে আজ নিয়ে যেতে হবে ড. ফুঁ-এর কাছে।'

'ড. ফুঁকে তুমি চেন?' দম আটকানো স্বরে বললেন খাকিরামবাবা।

'আমি তাঁর রাইট হ্যান্ড, এজেন্ট জিরো আমার নাম, তাঁরই নির্দেশে আমি তোমার সাগরেদি করেছি এতদিন। সাপের গায়ে ডানা গজানোর তোমার সিক্রেট আমিই পাচার করেছি তাঁকে। আমিই তোমার চামচের ওপর নজর রেখেছিলাম এতদিন ধরে। পেছন পেছন গিয়ে তার আস্তানা পর্যন্ত জেনে এসেছি, তাই তো আর দেরি করতে চাই না। তোমার মুণ্ডুটা ড. ফুঁকে উপহার না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

বলেই, একহাতে কোমর থেকে একটা ইয়া লম্বা ছোরা টেনে বের করে মাথার ওপরে তুলল মতি।

সহসা একটা আলোর ঝলক নেমে এল আকাশ থেকে। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার আগে ক্ষণেকের জন্যে দেখলাম, বিশাল একটা ঝকঝকে সাদা বস্তু কখন জানি নিঃশব্দে নেমে এসেছে মাথার ওপর গাছপালার মাথায়, আলোর ঝলক বেরোচ্ছে তারই তলদেশ থেকে।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার পরেই। সেইসঙ্গে জ্ঞানও হারালাম। সবাই, কেউ বাদ গেল না।

২৬. আশ্চর্য উপসংহার

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখলাম, খাকিরামবাবার বুকের ওপর একটা পোড়া দেহ। পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে মতি। খাকিরামবাবা কিন্তু অক্ষত। তবে তখনও অজ্ঞান।

পাশে গালে হাত দিয়ে বসে কানু কর্মকার, নরেশ আর লালুবাবু। দুলিচাঁদের টিকি দেখা যাচ্ছে না আশপাশে।

মাথার ওপর তাকিয়ে দেখলাম, ঝকঝকে সেই বস্তুটাও নিপাত্তা।

মামা-ভাগনে পাহাড়ের আগুন নিভে গেছে। পাহাড় বলে আর তাকে চেনে কার সাধ্য। সমস্ত পাথরগুলো গলে গিয়ে মাটির ওপর একটিমাত্র ঢিবি সৃষ্টি করেছে, সে রকম উচ্চতাও আর নেই, যেন মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে এসেছে।

সার্কাসের তাঁবুর আগুন কিন্তু তখনও জ্বলছে। শোরগোল ভেসে আসছে সেদিক থেকে।

মৃদুকণ্ঠে নরেশ বলল, 'দীননাথ, দুলিচাঁদ জন্মের মতো চলে গেছেন। আর আসবেন না। মামা-ভাগনে পাহাড়ের আগুন যারা নিভিয়েছে, মতিকে পুড়িয়ে মেরে খাকিরামবাবার প্রাণ যারা বাঁচিয়েছে, তারাও আসবে না, এইমাত্র দুলিচাঁদের মুখেই শুনলাম সেই কাহিনি। গ্রহান্তরের বন্ধুরা পৃথিবীগ্রহকে আবার বাঁচিয়ে দিয়ে গেল এক মহাবিপর্যয় থেকে। আর্থ ফোর্স খোঁচা খেয়ে বেরিয়ে এসেছিল, মহাপ্রলয়কে রোধ করে দিয়ে গেল তারা। ড. ফুঁ তাঁবুর মধ্যে পুড়ে ছাই হয়েছে, তার তৈরি দুটো ড্রাগনের একটা পুড়ে ছাই হয়েছে, আর একটা পৃথিবীর স্যাটেলাইট হয়ে গেছে, সেদিক দিয়েও আর ভয় নেই। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ মামা-ভাগনে পাহাড়ের ম্যাগনেটিক ফোর্স থেকে বঞ্চিত হল চিরতরে। শুধু একটা জিনিস বুঝলাম না, অতবড় পাহাড়টা অত পাথর নিয়ে গলে গিয়ে এতটুকু হয়েও তো উঁচু থাকবে, মাটির সঙ্গে মিশে গেল কী করে?'

'মাটির তলায় গহ্বরগুলো ভরাট করে দিয়েছে বলে', এই বলে উঠে বসলেন খাকিরামবাবা। ছলছল করছে তাঁর দুই চক্ষু, 'এক আউন্স বস্তু থেকে যে শক্তি বেরোয়, তা দিয়ে দশ লক্ষ টন পাথর গলিয়ে ফেলা যায়। আর তাই আমার এতদিনকার সাধনা ব্যর্থ হল। সাধনক্ষেত্র মিলিয়ে গেল, নন্দী-ভৃঙ্গী মারা গেল, গেল শুধু ওই বিশ্বাসঘাতক মতির জন্যে। দীননাথ, তুমি এলেই যদি, একটু আগে এলে না কেন?'

উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম খাকিরামবাবার সামনে। চাঁদের আলোয় দেখলাম, চোখের জল উপচে গাল বেয়ে গড়াচ্ছে। বললাম, 'মতি যখনই বলেছে আপনার চামচেকে সে নজরে রেখেছিল, তখনই বুঝেছি, আপনি কে! চামচে আমি একজনেরই। নাম তাঁর প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

বলে, হ্যাঁচকা টান মেরে খসিয়ে আনলাম তাঁর মাথার নকল জটা আর গালের দাড়ি।

'কালো চশমা পরেছিলেন তো এই জন্যেই, পাছে চোখ দেখে চিনে ফেলি, কেমন? কথাও বলেননি, পাছে গলা শুনে ধরে ফেলি? কিন্তু একটু আগেই আপনার চেঁচানি শুনেছি, চোখে চশমাও দেখিনি, তারপর শুনলাম, আপনার চামচে আমি। রাশকেল মতিই তাহলে

সেই রাতে লালুবাবুর বাড়িতে কান পেতেছিল দরজায়? কিন্তু প্রফেসর, এত লুকোচুরির দরকার ছিল কি?'

কানু কর্মকারের দিকে আঙুল তুলে প্রফেসর বললেন, 'ওদের ভয়ে। সাংবাদিক জীবদের আমি যে যমের মতো ভয় করি, দীননাথ। সাধনা পণ্ড করতে ওদের জুড়ি নেই।'

পাশ ফিরে দেখি, ঘাসের ওপর বসেই পকেট থেকে নোটবই আর ডটপেন বের করে ঝড়ের মতো রিপোর্ট লিখে চলেছেন কানু কর্মকার— চাঁদের আলোতেই।

আরব্য আতঙ্ক*

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বৈজ্ঞানিক মানুষ। অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারে ওঁকে প্রথমে টেনে আনেন গুলবাজ চাণক্য চাকলাদার। 'শৈত্য নামক দৈত্য'র রহস্যভেদ করতে গিয়ে প্রফেসর দেখলেন, অবিশ্বাস্য আর অতীব ভয়ংকর এক বিজ্ঞানসাধককে। রক্ত-জল-করা সাধনার বৃত্তান্ত শুনলেন এবং স্বচক্ষে দেখলেন সেই ভীষণ সাধনা আর লোমহর্ষক পরিণতি। সে দৃশ্য ভাবলেও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। এখনও দিচ্ছে।

কণ্টকিত কলেবরে লিখতে বসেছি আর এক আতঙ্ক কাহিনি। এবার আর হিমালয়ের আতঙ্ক নয়—আরব্য আতঙ্ক। আরব্য রজনী পড়ে যারা মুখস্থ করে ফেলেছ, তারা নিশ্চিন্ত মনে এই কাহিনি পড়তে পারো। কেননা, আরব্য রজনী নামক ঢাউস বইটার কোথাও পৈশাচিক এই কাহিনি লেখা হয়নি। জানলে তো লিখবে।

জানত শুধু চাণক্য চাকলাদার। পুরোটা জানতে গেলে কোনকালে পটকে যেত—অদৃশ্য পিশাচ ওর দফারফা করে ছেড়ে দিত। নেহাত প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সঙ্গদান করেছিলেন—অজ্ঞানের অদৃশ্য তিমিরে ঘাপটি মেরে থাকা বিষম বিভীষিকাকে জাগ্রত করে তার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে গেছিলেন, তবেই না হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে—এমন এক পৈশাচিক শক্তির সন্ধান পেয়েছেন— যে শক্তির নামও কখনও শোনেনি এযুগের তাবড় বৈজ্ঞানিকেরা।

তবে হ্যাঁ, বিশ্বের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য বলতে শুরু করেছেন— এই মহা বিশ্বের সব শক্তির সন্ধান এখনও তাঁরা পাননি। কিছু কিছু আঁচ করতে পেরেছেন। যেমন, ডার্ক পার্টিকল। ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে রয়েছে। কিন্তু জিনিসটা আদতে কী, এখনও তা ধরা যায়নি। শুধু কপচানির পর কপচানি, তত্ত্বের পর তত্ত্ব— গালভরা সেইসব বৈজ্ঞানিক কেরদানি-কথার মধ্যে না গিয়ে চলে আসা যাক এই কলসি-কাহিনিতে।

হ্যাঁ, গোটা ব্যাপারটা শুরু একটা কলসিকে নিয়ে। বিরাট কলসি, বিশাল কলসি, বিকট কলসি। সে কলসি যদ্দিন ছিল মাটির তলায়— আরব দেশের এক দেবালয়ের গোপন প্রকোষ্ঠে— লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে— তদ্দিন বিভীষিকা বেরিয়ে আসতে পারেনি— আতঙ্কের পর আতঙ্ক রচনা করতে পারেনি।

বৈজ্ঞানিক সফরের নাম করে অপবৈজ্ঞানিক অভিযানে বেরিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটিয়ে

---

* গোটা ব্যাপারটা একটা কলসিকে নিয়ে। বিরাট কলসি, বিশাল কলসি, বিকট কলসি।

বসলেন এক দুঃসাহসী বঙ্গতনয়। নাম তার পরশমণি তোপদার। তাঁর নামের আগের খেতাবটা আরও কৌতূহলোদ্দীপক। সাইকিক ডিটেকটিভ পরশমণি তোপদার।

চাণক্য চাকলাদারের মস্ত ব্যায়রাম হল, এই অদ্ভুত কিম্ভূত লোকেদের সঙ্গে দহরম মহরম চালিয়ে যাওয়া আর এই পৃথিবীর যেখানে যত অগম্য ভয়াল অঞ্চল আছে, সেইসব জায়গায় যাওয়া এবং মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, আজও এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে দুর্গম দুস্তর মরু কান্তারে লুকিয়ে আছে বিস্তর অজানা আতঙ্ক। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা না করলে চাণক্য চাকলাদারের পেটের ভাত নাকি হজম হয় না। অ্যাডভেঞ্চারের রক্ত নিয়েই ও জন্মেছে, অ্যাডভেঞ্চারের রক্ত নিয়েই ও মরবে— তার আগে দুনিয়াবাসীকে উপহার দিয়ে যাবে রোমাঞ্চলহরী, একটার পর একটা মাথার চুল-খাড়া-করা দম-বন্ধ-করানো কাহিনি।

এই কাহিনি তেমনই এক কাহিনি। আরব্য আতঙ্ক। প্রথমটা শুনেছিলাম চাণক্যর শ্রীমুখে, পরেরটা সাইকিক ডিটেকটিভ পরশমণি তোপদার হাতেনাতে দেখিয়েছে। এই কাহিনি যারা পড়ছ, তাদের নার্ভ যেন শক্ত থাকে। নইলে রাতের ঘুম ছুটে যেতে পারে।

চাণক্য চাকলাদার ওর স্বভাবসিদ্ধ স্টাইলে উটের মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে, আখাম্বা লম্বা অস্থিচর্মসার বিটকেল বপুটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘরে ঢুকতেই শিবনেত্র হয়ে গেলেন প্রফেসর। কড়িকাঠের দিকে নিবিষ্ট মনে চেয়ে রইলেন। যেন টিকটিকি নিরীক্ষণ করছেন।

চাণক্য হল্ট করল ওর সামনেই। সারকাসি কায়দায় বুড়ো আঙুলের মতো মোটা চুরুটটাকে মুখবিবরের বাঁদিক থেকে ডানদিকে গড়িয়ে নিয়ে চলে গেল আশ্চর্য কায়দায়। ফুক ফুক করে যে ধোঁয়ার বলয়গুলো রচনা করে গেল, সেগুলো যখন ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়—আশ্চর্য একটা গন্ধ ভেসে এল নাকে। গন্ধটাকে সুগন্ধ বলব না কুগন্ধ বলব— ঠিক বুঝতে পারছি না। গা গুলোয় না, গা নেতিয়ে আসে— মাথা চনমন করে না, মাথায় ঝিম ধরে।

গন্ধবৈচিত্র্য টনক নড়িয়েছিল খোদ প্রফেসরেরও। কড়িকাঠ নিরীক্ষণ স্থগিত রেখে তিনি দৃষ্টি অবনত করলেন এবং স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন চাণক্যের দিকে।

হাড়গিলে মুখে হাসি গোপন করল চাণক্য। মুখ থেকে চুরুট নামাল। বলল, 'হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে নাকি?'

প্রফেসর শুধু বললেন, 'বিটকেল গন্ধ। গন্ধবিজ্ঞানীরাও এমন গন্ধের নাগাল পাননি আজও।'

'আপনি কি গন্ধবিজ্ঞানী?'

'পাঁচ হাজার সুগন্ধে ফিলটার পেপার ডুবিয়ে নাকের কাছে ধরে বলে দিতে পারি, কোনটা কী গন্ধ। গন্ধ নিয়ে রিসার্চ করেছিলাম। নাক তৈরি হয়ে গেছে।'

'অ!' বলে প্রফেসরের সামনে একটা চেয়ারকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে বসল চাণক্য, 'এই গন্ধ কখনও শোঁকেননি?'

প্রফেসর গুলি গুলি চোখে বললেন, 'আমদানি করলে কোত্থেকে?'

'আরব থেকে।'

বলে, চুরুটের জ্বলন্ত ডগা মেঝেতে ঘষে নিভিয়ে দিয়ে খুব যত্ন করে বুকপকেটে রাখল।

'আরবের কোন মুলুক থেকে?' প্রফেসরের প্রশ্ন।

'আগেকার আরব তো খানখান হয়ে গেছে। এখন যে জায়গাটার নাম হয়েছে ইরান— সেখানে নাসওবা নামে একটা খুদে জায়গা আছে। নাসওবা-র নামও অনেকে জানে না।'

'তুমি জানো?'

'জানতে হয়, জানতে হয়,' রাজশেখর-ল্যাংগুয়েজে জবাব দিল চাণক্য, 'আমাকে জানিয়েছে পরশমণি তোপদার।'

'এটা আবার কী নাম?'

'নামের আবার ওই রকম-কই রকম আছে নাকি? নাম ইজ নাম। পরশমণি তোপদারের বাবা শুদ্ধমণি তোপদার ছেলের নাম দেওয়ার সময়ে মোটেই ভাবেননি—বিরাট একটা শক্তি নিয়ে জন্মেছে তাঁর ছেলে।'

'বিরাট শক্তি!'

'অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ। এক্সট্রাসেনসরি পারসেপশন।'

'গুলগল্পের উপকরণ নিয়ে এসেছ মনে হচ্ছে?'

'আপনার যা অভিরুচি বলে যেতে পারেন। কিন্তু পরশমণি, সন অফ শুদ্ধমণি, বাস্তবিকই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাধর। জীবিকা অর্জন করছে সেই পথেই। আপনার খেতাব প্রফেসর, আমার খেতাব গুলবাজ—'

'গুল-লজিস্ট। গুল-বৈজ্ঞানিক।'

'পরশমণির খেতাব— সাইকিক ডিটেকটিভ।'

এইবার আমি, শ্রীদীননাথ নাথ, নড়ে বসলাম। চাণক্য যখন আসে, জবর খবর নিয়ে আসে। আজ তার ব্যতিক্রম হবে না মনে হচ্ছে।

তাই বললাম, 'প্রশ্ন ছিল, চুরুটের আজব গন্ধটা আমদানি করা হল কোত্থেকে। তুমি বললে ইরানের নাসওবা অঞ্চল থেকে। অতঃপর?'

'গন্ধের আরক পরশমণি আবিষ্কার করেছে,' বিলক্ষণ সাসপেন্স-মাখানো সুরে বললে চাণক্য।

'কীভাবে?' প্রফেসরকে চুপ করিয়ে রাখার জন্যে আমিই প্রশ্নমালা বিছিয়ে গেলাম।

'নাসওবা এখন পরিত্যক্ত অঞ্চল। জায়গায় জায়গায় মাটির ঢিপি— খাঁ খাঁ করছে চারিদিক, পরশমণি সাইকিক প্র্যাকটিস করে আমেরিকায়— পুলিশ যখন নাজেহাল হয় খুনের কিনারা করতে না পেরে— পরশমণি ওর সাইকিক পাওয়ার খাটিয়ে বলে দেয়— কোথায় খুন হয়েছে, কী দিয়ে খুন করা হয়েছে, কে খুন করেছে। কিন্তু এজেন্ট ছড়িয়ে রেখেছে গোটা দুনিয়ায়। কোথাও কোনও উদ্ভট ব্যাপারের সন্ধান পেলেই তল্পিতল্পা নিয়ে দৌড়য় সেখানে। জেনুইন সাইকিক তো—অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপারের সন্ধান ঠিকই পায়—

সেই সঙ্গে পায় জগৎজোড়া পাবলিসিটি— প্র্যাকটিসে যা একান্ত দরকার।'

অমনি বলে উঠলেন প্রফেসর, 'আমি ওর নাম কক্ষনও শুনিনি।'

'কারণ আপনি সাইকিক পাওয়ারে বিশ্বাসী নন— সাইকিক ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন গুলোও উল্টে দেখেন না।'

'অল বোগাস!' প্রফেসরের মন্তব্য।

আমার প্রশ্ন, 'আবিষ্কার করল কী করে?'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল চাণক্য। বললে, 'পরশমণি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠ্যাং ব্যথা করে ফেলল। ওকে ডেকে আনব? ও নিজে বললে কেস আরও জমবে।'

বলেই, বদমেজাজি প্রফেসরের পারমিশন-টারমিশনের তোয়াক্কা না করে হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফিরে এল একটা মর্কট মূর্তিকে সঙ্গে নিয়ে।

তাকে মর্কট বলব, না কর্কট বলব, সেটাও একটা সমস্যা। তার মুখাবয়ব অবিকল শিম্পাঞ্জির মতন। চাপা নাকে বিরাট দুটো ছেঁদা, চোয়াল সামনে ঠেলে বেরিয়ে আছে, করোটি নেই বললেই চলে— যেটুকু দৃশ্যমান, সেখানে চুল একদম নেই— চকচকে টাক।

কর্কটের সঙ্গে সাদৃশ্য তার হাত আর পা নামক চারখানা প্রত্যঙ্গে। কাঁকড়ার দাঁড়ার মতনই মাংসহীন, গাঁটযুক্ত, আর ধড় থেকে এঁকাবেঁকা হয়ে বেরিয়ে আছে। যেহেতু পরে এসেছে বারমুডা আর টি-শার্ট—তাই কাঁকড়ার দাঁড়াসদৃশ প্রত্যঙ্গগুলো প্রকটতর হয়ে চোখের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়েছে। বয়স তার চল্লিশের বেশি কখনও নয়— কিন্তু মনে হয় আরও অনেক।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয় শুনেছি, কিন্তু এই ব্যক্তির নাম কিনা পরশমণি। তাও নাকি অনেক গুণের আধার। আমার তো দেখেই ভিরমি খেতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

পরশমণি অবশ্য সাইকিক। নইলে আমার মনের কথা ধরে ফেলবে কেন?

বললে শিম্পাঞ্জির মতন দাঁত খিঁচিয়ে, 'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনার মনের ছবি। একটা শিম্পাঞ্জি আর একটা কাঁকড়ার ছবি ভাসছে। আমার পূর্বজন্ম নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন, দীননাথবাবু। আপনিই তো দীননাথবাবু, যা একখানা চেহারা বাগিয়েছেন— ভীম আর কুম্ভকর্ণের সন্ধি করলে যা হয়, তাই।'

আমার মুখ-টুখ নিশ্চয় লাল হয়ে গেছিল— কেননা কানের লতি বেশ গরম গরম ঠেকছিল। রাক্ষস-খোক্কসের মতন আমাকে দেখতে? তেড়ে ওঠবার আগেই পরশমণি ঘুরে গেল প্রফেসরের দিকে। সুর পালটে নিয়ে বললে অমায়িক বচনে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই গুণধর পরশমণি তোপদার— জীবন্ত টাচস্টোন— যা ছুঁয়ে ফেলি, তার ভেতর থেকেই আসল মালকড়ি টেনে বের করে ফেলি। এই ধরুন না, ইরানের সেই মরুভূমি সমান জায়গাটার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎই মনে হল, পায়ের তলায় মাটির মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার বছরের পুরোনো একটা মন্দির। আর একটা আশ্চর্য আরক যার গন্ধে মড়াও উঠে বসে। যেমন নড়লেন আপনি— চুরুটের গন্ধে।'

প্রফেসর তাঁর ঝুলে পড়া চোয়ালটাকে যথাস্থানে তুলে এনে বললেন হাঁড়িনিনাদে,— 'বসা হোক।'

আওয়াজ-টাওয়াজ করে একটা চেয়ার টেনে এনে চাণক্য রাখল প্রফেসরের সামনে। বডিটাকে তেউড়ে-মেউড়ে চেয়ারে বসে পড়ল পরশমণি দ্য গ্রেট সাইকিক।

বললেন প্রফেসর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে, 'কে বলেছিল মরুভূমির মতন জায়গা দিয়ে হাঁটতে?'

টাকমাথা খ্যাঁচম্যাচ করে চুলকে (আঙুলে বড় বড় নখ) পরশমণি দ্য সাইকিক বললে— 'খবর আগেই পেয়েছিলাম। এজেন্ট রেখেছি কীসের জন্যে। জায়গাটা নাকি বেজায় রহস্যজনক। অনেক কিংবদন্তি চালু আছে। ভয়ানক ভয়ের জায়গা। কোনও জীবিত প্রাণী টিকতে পারে না। হয় শুকনো হয়ে পড়ে থাকে, নয় পালায়।'

রসকষহীন গলায় প্রফেসর বললেন, 'বুঝেছি।'

পরশমণি হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'কী বুঝেছেন?'

'তোমার চেহারার এই হাল হয়েছে ওখান থেকে ঘুরে আসবার পর থেকেই। শুকনো প্যাঁকাটির মাথায় লাউয়ের খোল। ছ্যাঃ ছ্যাঃ!'

শুনে খুব আহ্লাদ হল আমার। আমাকে ঠুকে কথা বলার উচিত জবাব দিয়েছেন প্রফেসর। যদিও কারও শরীর নিয়ে খোঁটা দেওয়াটা প্রফেসরের কালচারে নেই...

পরশমণি কিন্তু একটুও টসকাল না। শিম্পাঞ্জি-হাসি হেসে টেকো মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'রাইট, রাইট, নির্জলা সত্যি বলেছেন। আপনিও দেখছি সাইকিক। জানলেন কী করে?'

এবার কিন্তু জ্বলে উঠলেন প্রফেসর, 'আরে রাখো তোমার চারশ বিশ কারবার—'

ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভানোর চেষ্টা করলে শিখা যেরকম কেঁপে ওঠে, দুলে ওঠে—ঠিক সেইভাবে পালটে গেল পরশমণির মুখের দাপট। নিভু নিভু হয়েও জেগে রইল দু'চোখের আলো। বরং আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠল...তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠল... ঠিক যেন জাদুকরের একজোড়া সম্মোহনী চোখ...হিপনোটিক।

অমন যে দুঁদে প্রফেসর, তিনিও যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন অদৃশ্য রশ্মিবর্ষণকারী সেই চক্ষুযুগলের দিকে তাকিয়ে। তাকিয়ে ছিলাম আমিও। আমার হল সেই একই দশা। নিমেষে যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। স্পষ্ট মনে হল...আমি আছি, কিন্তু আমি নেই...আমি যেন হু হু করে নেমে যাচ্ছি সামনের ওই অগ্নিময় চক্ষুগহ্বরের মধ্যে দিয়ে...

দেখতে পেলাম এক বিশাল প্রান্তর। লালচে আর ধোঁয়াটে পাথর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে দূর হতে দূরান্তে। জনপ্রাণীহীন প্রান্তরের ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে হেঁটে যাচ্ছে পরশমণি দ্য সাইকিক। পিঠে রুকস্যাক, পরনে বারমুডা আর টি-শার্ট। মাটির দিকে না তাকিয়ে আকাশপানে চেয়ে আছে...আচমকা এক জায়গায় থেমে গেল...চোখ নেমে এল পায়ের তলায় মাটির দিকে...চেয়ে রইল কিছুক্ষণ...জ্বলে উঠল দুই চোখ...পরক্ষণেই নেচে উঠল ধেই ধেই করে...চেহারাটা কিন্তু এখনকার মতন শুঁটকো কর্কটাকৃতি তো নয়! পালটে গেল দৃশ্যপট। নিমেষ মধ্যে। যেন এডিট করা সিনেমার দৃশ্য দেখছি। মাঝখান থেকে খানিকটা ফিল্ম বাদ। হয়ত অত খুঁটিনাটি ঘটনা আমাদের দেখাতে চায় না বলেই বাদ দিয়ে দিয়েছিল পরশমণি দ্য সাইকিক।

দেখলাম, ধু ধু প্রান্তরে সেই জায়গাটায় বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। চারপাশে উঁচু উঁচু মাটির ঢিপি পড়ে আছে। কবর খুঁড়লে যেমন মাটি তুলে চারপাশে জমিয়ে রাখা হয়, ঠিক তেমনিভাবে এখানেও কবর খোঁড়া হয়েছে। মন্দিরের কবর। ঠিক যেন বিশাল একটা কফিন রয়েছে বিরাট গহ্বরের নিচে। লম্বাটে কফিন। তবে, কফিনের মতন ছোট নয়, কফিনের মতন কাঠ দিয়ে তৈরি নয়। পাথরের ছাদ, পাথরের দেওয়াল— কোথাও ফুটোফাটা একদম নেই। এরকম একটা অতিকায় পাথরের বাক্সকে মাটি চাপা দেওয়ার কী মানে, বুঝতে পারলাম না।

আবার ফিল্ম কেটে গেল যেন। এল নতুন দৃশ্য। পরশমণির সাইকিক প্রোজেক্টর দিয়ে ভালভাবেই অতীত দেখিয়ে চলেছে। গড়গড় করে মুখে বলে গেলে এমন দৃশ্য তো দেখতে পেতাম না।

যা বলেছিলাম, পাথরের পেল্লায় বাক্স (অথবা, কফিন) এখন খানখান। ছাদ থেকে পাথরের চাঁই নামিয়ে এনে এনে চারপাশের মাটির ঢিপিগুলোর ওপর জড়ো করা হয়েছে। পাথর-কফিনের গায়ের পাথুরে দেওয়ালকেও খসিয়ে মাটির ঢিপির ওপরে, কি, তার পেছনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে চতুস্পার্শ্বের ঢিপি উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছে— মাঝের গহ্বর গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।

আমি যেন গহ্বরের ওপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আছি। অনেক নীচে রয়েছে কিম্ভূতকিমাকার একটা দেবালয়। তাকে মন্দির, মসজিদ, গির্জের জগাখিচুড়ি বলা যায়।

এইবার রানিং কমেন্টারি শুরু হয়ে গেল কানের কাছে। মন্দ্রমন্থর কণ্ঠস্বরে ধারাবিবরণী দিয়ে চলেছে পরশমণি দ্য সাইকিক— আরবদেশে অতি পুরাকালে নজবাওয়া পুরুতগোষ্ঠী ব্রহ্মাণ্ডের মূল শক্তিভাণ্ডারের চাবিকাঠি হাতে পেয়েছিল, অকল্পনীয় সেই শক্তিকে তারা কুকাজে লাগিয়েছিল। নিজেদের পরাক্রম বৃদ্ধির জন্যে হেন কুকর্ম নেই যা তারা করেনি। তারা এই শক্তির নাম দিয়েছিল কালো বাহিনী। চল্লিশ রকমের অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী ছিল এই বাহিনী। চল্লিশ রকম শক্তি দিয়ে গড়া ভয়াল ভয়ংকর বাহিনী। তাদের চোখে দেখা যায় না। কিন্তু নজবাওয়া গোষ্ঠীদের হুকুমে তারা এই পৃথিবীর যে কোনও প্রাণীর দেহধারণ করতে পারত। কখনও প্রকাণ্ড সাপ, কখনও প্রকাণ্ড বিছে, কখনও অতিকায় মরুসিংহ। কল্পনা যখন উদ্দাম হত শক্তিমত্ত পুরুতগোষ্ঠীর— তখন করালরূপী পৈশাচিক আকৃতি দান করত এই চল্লিশ মহাশক্তিকে। তখন তাদের অজেয় কিছু থাকত না। নিষ্ঠুরতার পরিমাপ করা কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু একটা সময় এল যখন প্রবল গণ অভ্যুত্থান ঘটল এদের বিরুদ্ধে। জনগণেশ যখন মাথাচাড়া দেয়, তখন কদর্যতম কাণ্ডকারখানার খলনায়কেরাও পার পায় না। নজবাওয়া গোষ্ঠীও বুঝল, তারা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কিন্তু চল্লিশ শক্তির কালো বাহিনীর রাশ টেনে রেখেছে তো তারাই— তারা যদি ছাড়া পায়, অতি বড় দুঃস্বপ্নেও যা ভাবা যায় না— তাই ঘটবে। পৃথিবী নরকে পরিণত হবে। চল্লিশ শক্তির পৈশাচিক নৃত্য শুরু হবে অট্ট অট্ট নিনাদে...

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে তাই ওরা অক্ষয় অমর এই মহাশক্তিদের আধারে বন্দি করেছিল— কোন প্রক্রিয়ায়, তা শুধু নজবাওয়া পুরুৎরাই জানে। জগতের এই একটি

মঙ্গলই তারা করে গেছিল নিজেরা লয় পাওয়ার আগে।

সেই আধারকে তারা রেখেছিল নিজেদের সাধনার গর্ভগৃহে— অর্থাৎ পাতালকক্ষে। তাতেও তাদের ভয় যায়নি। গোটা মন্দিরকে পাথর দিয়ে মুড়ে করাল কুটিল কালো শক্তিদের কফিন বানিয়েছিল। তার ওপর মাটি চাপা দিয়েছিল। কিন্তু...

মাটি চাপা দিলেই কি বিভীষিকা-কাহিনি চাপা পড়ে যায়? লোকের মুখেমুখে সেই সব কাহিনি শতনখী আতঙ্ক-কাহিনি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সহস্রনখী কিংবদন্তির আকার ধারণ করে। লক্ষনখী ফিসফিসানিতে পরিণত হয়।

যা রটে, তার কিছু তো বটে। ঠিক তেমনি হয়েছে পরিত্যক্ত এই প্রান্তরে। এখানে মানুষ থাকে না কেন? কারণ অমাবস্যার ঠিক আগের তিন রাত আর পরের তিন রাত চাঁদ যখন নখের ফালির মতন সরু হয়ে থাকে, তখন এইখানে এই মাটির তলা থেকে একটা লোম-খাড়া করা অপার্থিব সুর জাগ্রত হয়— সে সুর কারও কণ্ঠের সুর নয়, কোনও বাদ্যযন্ত্রের বাজনা নয়— মাটি আর বাতাস যেন মিলেমিশে রক্ত-হিম করা সেই সম্মোহনী সুর রচনা করে চলে। মনে হয় যেন কান্নার সুর। মনে হয় যেন, রুদ্ধ কারাগারে অতীতের প্রেতগণ হাহাকার করে চলেছে। অপার্থিব সেই সুরে মাদকতা যেমন আছে, বিষাদ যেমন আছে, ঠিক তেমনি আছে রক্ত শুকিয়ে শরীর জখম করে দেওয়ার ক্ষমতা, মাসের পর মাস সেই করুণ কান্নার সুর কান পেতে যারা শুনে গেছে, তাদের কেউ পাগল হয়ে গেছে, কেউ শুকিয়ে আধখানা হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছে, কেউ অষ্টাবক্র হয়ে শরীর বেঁকিয়ে চুরিয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে রয়েছে।

যেমন হয়েছে আমার অবস্থা। আমি যে আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল, অনেক বেশি সেন্সিটিভ। সাইকিকদের অনেক জ্বালা। ঈশ্বরদত্ত এই ক্ষমতা যে মানুষ পেয়েছে, তার মতন যন্ত্রণা বোধহয় আর কেউ পায়নি।

প্রান্তরের কান্না শুনতেই আমি এসেছিলাম— তখন ভাবিনি এ কান্না কাঁদছে অতীতের চল্লিশ প্রেত— মৎস্যকন্যা সাইরেন যেমন গানের মূর্ছনা শুনিয়ে নাবিকদের পথ ভোলাত— এই কান্নাও তেমনি মেকি কান্না— অবরুদ্ধ কষ্ট নয়, অবরুদ্ধ আক্রোশ—আধার থেকে মুক্তি পাওয়ার ছলনা। এমন নাকি কান্নায় মানুষ যে ভুলে গিয়ে চল্লিশ অশরীরী দুশমনকে মুক্তি দিয়ে ফেলতে পারে— এটা ভেবে নিয়েছিল শক্তিধর সেই পুরুতগোষ্ঠী— চল্লিশ প্রেতকে কবজায় রেখে এরাই একদা নারকীয় দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটিয়েছিল গোটা আরবদেশে— চল্লিশ প্রেত যদি লাগামছাড়া হয়— তা হলে এই সুন্দর সবুজ পৃথিবী যে শ্মশান আর গোরস্থান হয়ে যাবে— তা তারা আঁচ করেছিল। তাই পাতালঘরে বিশেষ আধারে তাদের বন্দি করেও ক্ষান্ত হয়নি— গোটা মন্দিরটাকেই পাথর দিয়ে মুড়ে মাটি চাপা দিয়েছিল। অতীতের প্রেতগণের ছলনার কান্না তা সত্ত্বেও মাটি ফুঁড়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে।

মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে আমার ভেতরের এমন সব কলকবজা নড়ে ওঠে, এমন সব মিটার ঘুরতে থাকে— পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি এইভাবে হেঁটে বলে দিয়েছি পায়ের তলায় কোথায় আছে সোনার খনি, কোথায় আছে পেট্রল— স্যাটেলাইট পরে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

বিজন প্রান্তরে ছমছমে পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে যেন ইলেকট্রিক শক লেগেছিল— দেড় কেজি ওজনের গোটা মস্তিষ্কটা ঝনঝন করে উঠেছিল— পর মুহূর্তেই মনের চোখে ভেসে উঠেছিল অদ্ভুত গড়নের এক দেবালয়— এখন আপনারা যা দেখছেন...আর ভেসে উঠেছিল একটা জিনিস...

একটা কলসি। অতিকায় কলসি। হাইটে প্রায় ছ'ফুট। খুব মোটা পেট— দুদিক থেকে দুজন লোক দাঁড়িয়ে কলসি জড়িয়ে ধরলে শুধু আঙুলে আঙুল ছোঁয়াতে পারবে। সারা গায়ে আরবীয় কারুকাজ— অনেক সাংকেতিক চিহ্ন... আমি তাদের চিনি না...

এই কলসিটা আমাকে ম্যাগনেটের মতন টানছিল। আমি বেশ বুঝছিলাম, আমার পায়ের তলায় অনেক নীচে পাতালে রয়েছে মহাকায় এই কলসি। মুখটা উদরের অনুপাতে বেজায় সরু— কোনও রকমে মুঠো গলানো যায়। নিরেট বস্তু দিয়ে মুখ বন্ধ করা রয়েছে।

স্পষ্ট বুঝলাম, কলসির মধ্যে থেকে অজানা শক্তিপুঞ্জ ওই মুখ দিয়ে সবেগে আসতে চাইছে। কিন্তু অব্যাখ্যাত কারণে, অমিত আর অজ্ঞাত শক্তির অধিকারী হয়েও, কলসি বিদীর্ণ করার শক্তি নেই বদ্ধ সত্তাদের। অথচ, শুধু তাদের অস্তিত্বটুকু উপলব্ধি করেই নামহীন আতঙ্কে আমি শিউরে উঠছি।

আমার শরীরের ক্ষয় শুরু হয়েছিল সেই মুহূর্ত থেকেই। আমার সাইকিক ক্ষমতা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল— বিদেহী ওই সত্তারা আমাকে গ্রাস করে আমার শক্তি লুঠ করতে চায়— নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে চায়।

সতর্ক হয়েছিলাম ওই উপলব্ধির পর থেকেই। তাই আমি অঞ্চল ছেড়ে পিঠটান না দিয়েও এখনও টিকে আছি— তবে বহাল তবিয়তে যে নেই— তা দেখতেই পাচ্ছেন। আমাকে নিঙড়ে নেওয়া হচ্ছে শুধু ওই বুকফাটা হাহাকার শুনিয়ে— যেন লক্ষ লক্ষ শোকাতুর বিদেহী বুক চাপড়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার আবেদন-নিবেদন অনুরোধ-উপরোধ জানিয়ে চলেছে...

কিন্তু আমি মূর্খ নই। সবচেয়ে বড় কথা, আমি সাধারণ মানুষ নই। তাই ওই অছিলা আর অভিনয়ের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কুটিল অভিলাষ আমাকে বিলক্ষণ হুঁশিয়ার করে তুলেছিল।

অথচ আমার কাজ আমাকে করে যেতে হয়েছে। শরীর ক্ষইছে আর অষ্টাবক্র হয়ে যাচ্ছে জেনেও আমি পায়ের তলার মাটি সরিয়ে, পাথর সরিয়ে, নিশ্ছিদ্র মন্দিরের দেওয়াল ফুটো করে, পাতালগর্ভে প্রবেশ করেছি। নরুণ দিয়ে কাটা সরু নখের ফালির মতন চাঁদ যখন দেখা দিয়েছে অমাবস্যার আগের আর পরের তিন রাতে মায়াকান্না শুনেছি।

তারপর ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময় সেই বিরাট কলসিকে দর্শন করেছি।

মন্দ্রমন্থর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হল।

পট পাল্টে গেল। নতুন শট দেখাচ্ছে সাইকিক-প্রোজেক্টর। মন্দিরের গর্ভগৃহে অবস্থান করছি। বিশাল ঘর। একটা ফুটবল মাঠের অর্ধেক বললেই চলে। কড়িকাঠ দোতলা উঁচু। ঘর একদম ফাঁকা। পাথরের দেওয়াল, মেঝে, কড়িকাঠ সব দেখা যাচ্ছে চারখানা হ্যাজাকের জোর আলোয়।

ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছ'ফুট উঁচু একটা দানবিক কলসি।

আমি শ্রীদীননাথ নাথ, অতিমানবিক শক্তির অধিকারী নই। কিম্ভূত কলসির গায়ে বিকট

সাংকেতিক চিহ্নগুলো দেখেই শিহরিত হয়েছিলাম। চোখে ধোঁয়া দেখেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তি তুলে নিয়েছিল পরশমণি দ্য সাইকিক। সম্বিত ফিরে পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম, বিস্ফারিত চোখে তখনও আমার আর প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে আছে পরশমণি— তবে চোখে আর জ্বলছে না পরশপাথর।

সূচ্যগ্র চোখে তাকিয়েছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। যিনি কিনা এ ব্রহ্মাণ্ডের আদি থেকে শেষ পর্যন্ত 'সময়গাড়ি' চেপে টহল দিয়ে এসেও তাজ্জব হননি— সেই তিনি এখন তাঁর দুই চোখে নিবিড়তর বিস্ময় জড়ো করে অপলকে চেয়েছিলেন পরশমণি তোপদারের দিকে।

বললেন গাঢ় কোমল স্বরে, অনেক আহাম্মক বলে বটে, বিজ্ঞান দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না— তা অনস্তিত্ব অর্থহীন, অথবা গঞ্জিকা সেবনের পরিণাম। আমাদের এই আশ্চর্য বন্ধু চাণক্য চাকলাদার মাঝেমধ্যেই এমনি ধরনের কেস এনে হাজির করে আমার সামনে। ওর বিশ্বাস, আমি বিজ্ঞানসাধনা করি বটে, কিন্তু বোকার মতন অজানা রহস্যকে অবৈজ্ঞানিক কখনও বলি না। গতকাল যা রূপকথা আর আষাঢ়ে গল্প ছিল, আজ তা বিজ্ঞানের আওতায় চলে এসেছে। আরও অত্যাশ্চর্য ঘটনার পর ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। লেকচার দিয়ে সব বোঝানো যাবে না। কথায় যা বোঝানো যায় না, কাজে তা বিশ্বাসের মধ্যে এনে ফেলা যায়। মাই ডিয়ার পরশমণি, তুমি কলসির টার্গেট হয়েছ— তা বুঝেছি। ভয়ানক এই কলসির ধারেকাছে গেলে আমার আর আমার প্রিয় চ্যালা দীননাথেরও যে সেই দশা হবে তাও বুঝতে পারছি। পার পাবে না চাণক্য চাকলাদার— যতই বকমবাজ হোক না কেন— তবুও, আমি দেখতে চাই ভয়ংকরদের কারাগার ওই কলসিকে।'

নিমেষে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল পরশমণি দ্য সাইকিক। বলে উঠল গলগল করে, 'কিছু হবে না, স্যার, কিচ্ছু হবে না, আপনাদের কিচ্ছু হবে না— এই তো চাণক্য রয়েছে বহাল তবিয়তে— ওর কিছুই হয়নি— কলসি দেখেছে, কলসি ছুঁয়েছে— কিন্তু কলসির বিভীষিকারা ওকে টার্গেট করেনি— করেছে শুধু আমাকে। কারণটা আমি আঁচ করতে পারছি— আমার এই সাইকিক সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি। আমি যে পূর্বজন্ম মানি—'

'পূর্বজন্ম! কী ছিলে তুমি পূর্বজন্মে? কী করেছিলে?'

'দিব্য চোখে তা দেখতেও পেয়েছি, স্যার।'

'পরশমণি, খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'আজ্ঞে না, সময়গাড়ি যদি আপনি আবিষ্কার করতে পারেন— পূর্বজন্ম-গাড়িও নিশ্চয় একদিন আবিষ্কার করবেন। তখন স্বচক্ষে দেখে আসবেন কী ছিলাম আমি পূর্বজন্মে— আর কী করেছিলাম।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে কোনওদিন ঢোঁক গিলতে দেখিনি। কিন্তু সেদিন ঢোঁক গিললেন। বিড়বিড় করে নিজের মনেই বললেন, 'আইডিয়াটা মন্দ নয়। ফুরসৎ পেলেই

লাগা যাবে। এবার বলো তো চাঁদবদন পরশমণি, কী ছিলে তুমি পূর্বজন্মে? কী করে তা জানতে পারলে?'

জুলজুল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল পরশমণি। কৌশলে প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল দ্বিতীয় প্রশ্নটার, 'কলসি ছুঁয়েই জানতে পেরেছি।'

'বাই টাচ অনলি! শুধু ছুঁয়ে! ওহো, তুমি তো পরশমণি ঠাকুর—'

'ঠাকুর নয়, স্যার— তোপদার।'

'কলসি ছুঁয়েই তুমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করলে?'

'আজ্ঞে।'

'তৃতীয় নয়ন খুলে গেল?'

'আমি যে সাইকিক—'

'ড্যাম ইট।— নিজেকে কী অবস্থায় দেখলে পূর্বজন্মে?'

'ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?'

'নির্ভয়ে...নির্ভয়ে...নির্ভয়ে।'

'কলসির মুখ বন্ধ করছি— আমি! আমি! আমি!'

আমরা এসে গেছি সেই ভুতুড়ে অঞ্চলে। আমি আর প্রফেসর, চাণক্য আর পরশমণি। অমাবস্যার তিনদিন আগেই পৌঁছেছি। তিনরাত ধরে মোহময় সেই মায়াকান্না শুনেছি। আকাশ, বাতাস, মাটি একযোগে যেন অদৃশ্য বেহালার ছড়ি টেনে আশ্চর্য সম্মোহনী সুরলহরী সৃষ্টি করে চলেছে।

স্বকর্ণে না শুনলে প্রত্যয় হবে না। স্বকর্ণে না শুনলে গায়ের লোমখাড়া হবে না, স্বকর্ণে না শুনলে বুকের কলজে বেদনায় মুষড়ে পড়বে না। সুরেলা হাহাকার যেন অশ্রুত আবেদন জানিয়ে গেছে তিন-তিনটে রাত, 'ওরে আয়! ওরে আয়! তোরা আয়। আমাদের মুক্তি দে! কলসির মুখ খুলে দে! আমরা চল্লিশ মহাশক্তি তোদের আমরণ ক্রীতদাস হয়ে থাকব।'

বোতল-ভূতের অলীক গল্প পড়া ছিল, আরব্য রজনীর অলৌকিক কাহিনি গায়ে রোমাঞ্চ জাগায়। কিন্তু কলসী-বিভীষিকাদের না-বলা কাকুতি-মিনতি যে মনের মধ্যে এমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে— তা জানা ছিল না।

আমি তো খেপে গিয়েছিলাম। হাড়গিলে চাণক্যের গায়ে অসুরের শক্তি ছিল বলেই আমাকে ধরে রাখতে পেরেছিল। পরশমণি ওর সাইকিক চোখে তকিয়ে আমার মনের ভেতর পর্যন্ত যেন পুড়িয়ে দিয়ে মুখে বলেছিল, 'ইডিয়ট! ফুল! স্টুপিড! কোথায় খাপ খুলতে এসেছেন? এ যে পলাশির প্রান্তর!'

'ধুত্তোর পলাশি! প্রহেলিকার অবসান ঘটাতে চাই আমি— কলসির মুখ খুলে দেবই— বেরিয়ে যাক বদ্ হাওয়া!'

'গোটা পৃথিবীর হাওয়া বিষিয়ে যাবে।' দাবড়ানি দিয়েছিল চাণক্য।

'এই কান্নার বাজনাও আমি সহ্য করতে পারছি না। কে বাজাচ্ছে, কীভাবে বাজাচ্ছে— কলসির মুখ খুললেই বোঝা যাবে।'

খুব ঠাণ্ডা গলায় আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, দেখব! হ্যাঁ, দেখব। হ্যাঁ, দেখব!'

তারপর দেখলাম সেই কলসি।

সে রাত ছিল অমাবস্যার রাত।

আকাশে বাতাসে ছিল না সেই অপার্থিব কান্না-গান।

চারদিক নিথর, নিস্তব্ধ। নৈঃশব্দ্যের যে একটা বিভীষিকাময় রূপ থাকতে পারে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন উদগ্রীব হয়ে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে, যা কখনও ঘটেনি— সেইরকম একটা ঘটনা দেখবার জন্যে।

আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি পাতালঘরে। বিশাল কলসি মূর্তিমান মৃত্যুর মতন ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। চারদিকে জ্বলছে চারটে হ্যাজাক বাতি।

পরশমণি আর চাণক্য জাপটে ধরে রেখেছে আমাকে— প্রফেসরের আদেশে— আমার স্নায়ুতন্ত্র যে অদৃশ্য বিভীষিকাদের দখলে চলে গেছে— উনি তা বুঝে ফেলেছেন। চারজনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান আমি— তাই আমাকে রুখতে দরকার হয়েছে দুজনের। তা সত্ত্বেও, প্রফেসর মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন— দুই চোখে নরম অনুনয়—যেন নীরবে বলছেন আমাকে সংযত হতে। উনি তো জানেন, আমি খেপে গেলে মত্ত হস্তী, মস্ত দানব। মুখে বলে যা হয় না, চোখ দিয়ে তাই বলে যাচ্ছেন, 'দীননাথ, তিষ্ঠ।'

তাই তিষ্ঠ হয়ে রয়েছি।

উনি পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন বিরাটকায় বিভীষিকার দিকে। ঠিক ছ'ইঞ্চি তফাতে দাঁড়িয়ে চোখ নিয়ে গেলেন সাংকেতিক চিহ্নগুলোর একদম কাছে। দুই হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছেন। অচঞ্চল। ঘর নিস্তব্ধ।

তারপর একটু পাশে সরলেন। দাঁড়ালেন। দেখলেন। আবার পাশে সরলেন। এক পাশেই রয়েছেন। সরে সরে গোটা কলসিকে প্রদক্ষিণ করলেন। আরও হেঁট হলেন। পাশে সরে সরে আবার প্রদক্ষিণ করলেন। আবার হেঁট হলেন। ওঁর চোখ এখন কলসির নীচের দিকে। পাশে সরে সরে কলসি প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর, সটান হয়ে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে যেন কলসির গা ফুঁড়ে সংগীতসুধা বেরিয়ে এল। এই পৃথিবীর কোনও সংগীতবিশারদ এই সুর রচনা করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ আছে। স্বয়ং তানসেন মাটিতে মাথা ঠেকাতেন তনুমন অবশ করা সেই গোঙানি আর কাকুতির বাজনা শুনলে। যেন চোখের জল আর বুকের রক্ত এক হয়ে গিয়ে টস্‌টস্‌ করে ঝরে পড়ছে সংগীতের মধ্যে। অথচ তা সুধাময়। আনন্দময়। কিন্তু অসীম বেদনাবহ। এরকম সুরমিশ্রণ কল্পনাতেও আনা যায় না— অথচ স্বকর্ণে শুনছি...

একটু একটু করে আমি উন্মাদপ্রায় হয়ে যাচ্ছিলাম। পরশমণির চোখের চাহনিও পালটে

যাচ্ছিল...পরে শুনেছিলাম প্রফেসরের মুখে। তাই উনি একমাত্র সহায়, একমাত্র মতিস্থির চাণক্যর দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন...

চাণক্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। পকেট থেকে আরক ভিজানো রুমাল বের করে আমার আর পরশমণির নাকের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই...

জয়পুরে যারা গেছ, তারা নিশ্চয় 'যন্তরমন্তর' দেখেছ। সেখানকার সূর্যঘড়িও দেখেছ। অনেক প্রাচীন প্রাসাদের বাগানেও সূর্যঘড়ি থাকে। সূর্যকিরণের ছায়া সরে সরে যায়—সময় বলে দেওয়া যায়।

কিন্তু চন্দ্রঘড়ি কখনও দেখিনি। নামও কখনও শুনিনি।

দেখলাম জ্ঞান ফিরে আসার পর।

ক্যাম্পখাটে লম্বমান আমি আর পরশমণি। আমাদের সামনেই ক্যাম্প টেবিলে রয়েছে পাথর দিয়ে তৈরি চন্দ্রঘড়ি। জিনিসটার নাম যে চন্দ্রঘড়ি, তা প্রফেসর না বললে জানতেই পারতাম না।

পাশে তাকিয়ে দেখলাম, পরশমণি তখনও বেহুঁশ। মৃতপ্রায়, শ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না— বোঝা যাচ্ছে না।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলেছিলাম, 'বেঁচে আছে তো?'

'বিলকুল', মেজাজ-শরিফ গলায় বলেছিলেন প্রফেসর, 'তবে অন্য লোকে বিচরণ করছে মনে হচ্ছে।'

'কোন লোকে?'

'ডার্ক পার্টিকল ওয়ার্ল্ডে'।

'বুঝলাম না।'

'বৎস দীননাথ, চোখে দেখছ যে দুনিয়া, তার সমান্তরাল আছে আরও অনেক দুনিয়া— চোখে দেখা যায় না। এমনি একটা দুনিয়া কৃষ্ণকায় কণিকা দিয়ে গড়া।'

'অর্থাৎ?'

'কালো কণা। অদৃশ্য কণাকে এ ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যায় বলো? তা বস্তুকণা, না, অবস্তুকণা— তা এখনও জানা যাচ্ছে না। অত রিসার্চের সময় এখন নেই। কলসির বিভীষিকাদের ওই কালো কণাজগৎ থেকে আমদানি করা হয়েছিল— তারা আর ফিরে যেতে রাজি নয়।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

চাণক্য মুখের মধ্যে চুকচুক আওয়াজ করে বললে, 'কলসির গায়ে সাংকেতিক ভাষার মানে বের করে।'

'ও ভাষা উনি জানেন?'

হাসলেন প্রফেসর, 'বুদ্ধু দীননাথ, আরবের প্রাচীন ইন্দ্রজাল বিদ্যা নিয়ে একদা উৎসুক

হয়েছিলাম। অঘটন ঘটাতে পারত সেই মায়াবিদ্যা। পরশমণি বাজে বলেনি। আমি অনেক আগেই ওই ইন্দ্রজালের রহস্যভেদ করতে গিয়ে অন্ধকার জগতের সন্ধান পাই। সাহস করে পণ্ডিতমূর্খ বৈজ্ঞানিকদের তা বলিনি। ঐন্দ্রজালিকদের সাংকেতিক ভাষাও রপ্ত করেছিলাম। কলসির গায়ের ভাষার মর্মার্থ তাই অনুধাবন করতে পেরে এই চন্দ্রঘড়িকে উদ্ধার করেছি ওই মন্দিরের মধ্যে থেকে।'

বলে, টেবিলে বসানো আজব ঘড়িটার দিকে তর্জনী তুলে দেখালেন প্রফেসর।

'এর কাজ কী?' আমার প্রশ্ন।

'ডার্ক ওয়ার্ল্ডের সত্তাদের অভ্যুদয় ঘটানো।'

'কীভাবে?'

'সেটা বলা যাবে না। সাংকেতিক চিহ্নের মধ্যেই প্রক্রিয়া বর্ণনা করা আছে। অমাবস্যার পরের তিন রাতে চাঁদের ক্ষীণ কিরণ পড়ে চন্দ্রঘড়িতে। ডায়ালে আছে নরুণ-চেরা চাঁদ চিহ্ন। আকাশের চাঁদের আলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হয় সেই চাঁদ চিহ্ন— চাঁদ-ঘড়ি ঘুরিয়ে রেখে। তাহলেই ডার্ক-ওয়ার্ল্ডের শক্তি পুঞ্জীভূত হবে এই এলাকায়। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কলসির মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে জগতের আতঙ্কেরা।'

'কী সর্বনাশ!'

অমনি একটা হেঁড়ে গলা বেরিয়ে এল পরশমণির কণ্ঠ চিরে— তার যে জ্ঞান ফিরে এসেছিল, আমরা কেউ বুঝিনি। হেঁড়ে গলা বিষম বিকৃতি-মাখানো স্বরে বললে— 'ঘোরাও, ঘোরাও চন্দ্রঘড়ি— নইলে নেব পরশমণির প্রাণ।'

'দূর হ! দূর হ! দূর হ!' বললেন প্রফেসর তেড়িমেড়ি গলায়।

তিনটে হেঁচকি তুলে স্থির হয়ে গেল পরশমণি। নিষ্প্রাণ।

প্রফেসর তৈরি হয়েই এসেছিলেন।

স্যাটেলাইট ফোনে খবর পাঠালেন। হেলিকপটার উড়ে এল বিজন প্রান্তরে— ভোর হতেই মহাকায় কলসিকে জাল-বন্দি করে ঝুলিয়ে নেওয়া হল হেলিকপটারের তলায়। গেল এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে বিশেষ বিমান কলসি নিয়ে গেল আরব সাগরের ওপরে।

আরব্য আতঙ্ক এখন বিরাজ করছে সাগরের তলদেশে— অটুট অবস্থায়।

অতএব, হে বিশ্ববাসী, তোমরা নিরাপদে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও।
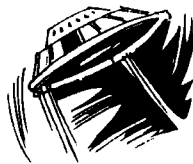
ডলফিনের ডাক

১. কিংবদন্তির কাহিনি

প্রফেসর বললেন, 'দীননাথ, ডলফিনের ডাক শুনেছ?'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে না। মাছ কখনও ডাকে?'

প্রফেসর রাগ করলেন না। অদ্ভুত চাহনি মেলে রইলেন আমার দিকে। খুব আস্তে বললেন, 'ডলফিন মাছ নয়, দীননাথ। তিমি, ডলফিন, শুশুক— এরা কেউই মাছ নয়। স্তন্যপায়ী জীব। কেউ বলে, ডলফিন তিমিদের জাতভাই। আমি বলি, ডলফিন মানুষদের জাতভাই।'

অবাক হলাম, 'মানুষদের?'

'ডাঙার রাজা মানুষ, জলের রাজা ডলফিন। আমার আন্দাজটা আর একটু বেশি। ওরা এ গ্রহের জীব নয়।'

এইবার সিধে হয়ে বসলাম আমি, 'ভিনগ্রহী?'

'মনে হয়।'

এই বলে স্বপ্নালু চোখে প্রফেসর ডলফিনদের সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথা বলে গেছিলেন। জ্ঞানের পিপে তিনি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে গেছিলাম।

এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো স্তন্যপায়ী জীব যারা, তারাই তো নীল তিমি। এক সময়ে এই তিমি মারা হয়েছে এনতার। তিমির তেল থেকে তৈরি হয়েছে সাবান, মারজারিন, রান্নার তেল।

দাঁতালো স্পার্ম তিমিদের জাতভাই বলা হয়েছে শুশুক আর ডলফিনদের। ডলফিনদের পছন্দ একটু উষ্ণ সাগর।

রঙিন মাছের জন্যে যেমন ঘরে ঘরে অ্যাকুয়ারিয়াম, বড়ো বড়ো সাগর, প্রাণীদের জন্যে তেমনি ওস্যানারিয়াম।

এমনি একটা ওস্যানারিয়াম থেকে সদ্য ফিরেছেন প্রফেসর— তাজ্জব হয়ে।

ডলফিনরা তাঁর সঙ্গে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেছে। এমনকী, গান গেয়েও শুনিয়েছে।

শুনেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল আমার, 'আঙুল দিয়ে হারমোনিয়াম বাজায়নি?'

হাসলেন প্রফেসর, 'ঠাট্টা হচ্ছে? ওদের জাতভাই তিমিদের আঙুল থাকে ঠিকই, জন্মাবার সময়ে আর থাকে না। কিন্তু ডলফিনদের আছে বাদুড়দের মতো ক্ষমতা— শরীরের মধ্যেই থাকে 'সোনার' যন্ত্র— হাই ফ্রিকোয়েন্সির শব্দতরঙ্গ ছুড়ে দিয়ে প্রতিধ্বনি ধরে নেওয়ার ক্ষমতা। কতটুকু সময়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে, তার হিসেব করে বুঝে নেয়, শব্দটা ধাক্কা খেয়েছে কতদূরে— যন্ত্রটা রয়েছে ঠিক কোথায়।'

'সোনার?' অবাক হয়ে শুধিয়েছিলাম আমি, 'ডলফিনদের মধ্যে আছে এই সিসটেম?'

'আর সেই জন্যেই ওদেরকে জলের বাদুড়ও বলা যায়।'

কিন্তু থেমে থেমে বলেছিলাম, 'তিমি-রা নাকি অতি প্রাচীনকালে ছিল ডাঙার জীব। ডলফিনরাও কি ছিল ডাঙায়?'

একটু থমকে গেলেন প্রফেসর।

বললেন, 'যদি বলি, সেই ডাঙাটা ছিল অন্য গ্রহে?'

'ঝেড়ে কাশুন, প্রফেসর, ঝেড়ে কাশুন, আমার টেনশন আর বাড়াবেন না।'

কিন্তু নির্দয় প্রফেসর আমার টেনশন বাড়িয়েই গেলেন গুচ্ছের গল্প শুনিয়ে।

সবই অবশ্য সত্যি গল্প।

'দীননাথ, তোমাকে প্রথমে একটু বকেছিলাম, 'ডলফিন-কে মাছ বলায়। তোমার খুব একটা দোষ নেই। কেননা, ডলফিন নামে মাছও যে আছে। কিন্তু তারা স্রেফ মাছ— স্তন্যপায়ী নয়। সমুদ্রের মাছ, নিরক্ষীয় সমুদ্রের মাছ। মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে। ট্রিমেন্ডাস স্পিডে ছুটে গিয়ে উড়ুক্কু মাছকে খপ করে ধরে ফেলে।

'কিন্তু আমি তাদের কথা বলছি না, দীননাথ, গুলিয়ে ফেলো না। আমি বলছি তিমি পরিবারের খুদেদের কথা যারা মাইলের পর মাইল পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় পথহারা জাহাজদের, তারা যে মানুষের কত বড় বন্ধু, পদে পদে তার নজির রেখে যায়। সমুদ্রের অন্য কোনও প্রাণী এমন রোমান্টিক নয়, দীননাথ। দয়া করে ডলফিন মাছেদের সঙ্গে তাদের গুলিয়ে ফেলো না। গ্রিকরা কি সাধে ডলফিনদের সাগর-প্রতীক বলেছে?

'শুশুক আর ডলফিনের তফাতটা কোথায় জেনে রাখো। তবে ভয় পেও না। ডলফিনদের থাকে ধারালো চঞ্চুর মতো নাক— শুশুকদের থাকে না। ল্যাজটাও জলের সঙ্গে সমান্তরাল। তিমি'র মতো, খাড়াই নয়— মাছের মতো। লম্বায় ছ'ফুট থেকে আট ফুট, গায়ের রং কালচে বাদামি, অথবা পিঠ খুব কালো।'

অধীর গলায় বলেছিলাম প্রফেসরকে, 'কিন্তু এত জ্ঞান যে মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে! কেন বললেন, ডলফিন এসেছে অন্য গ্রহ থেকে?'

'আমার বৈজ্ঞানিকী অনুমানের কথাই তোমাকে বলেছি, দীননাথ,' অন্যমনস্ক স্বরে বলে গেলেন প্রফেসর, 'লোকে শুনলে হাসবে, কিন্তু তুমি হাসবে না। ভাববে। ভাবো, দীননাথ, আরও একটু ভাবো। সেই প্রাচীনকাল থেকে কেন বলে আসা হয়েছে, ডলফিনেরা মানুষের বন্ধু? কেন বদ্ধমূল হয়েছিল এই বিশ্বাস? কেন কিংবদন্তিতেও ঠাঁই পেয়েছে ডলফিন? হুদো হুদো গল্প শোনা যায়। বাচ্চাদের পিঠে চাপিয়ে সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ায় ডলফিন?

ডুবন্ত মানুষদের জল থেকে তুলে ফিরিয়ে দিয়ে যায় ডাঙায়? কেন? কেন? কেন? ডাঙার দু'পেয়েদের ওপর জলের ডলফিনদের এত মমত্ব কেন? মায়া-দয়া তো মানুষের সত্তায় থাকে, ডলফিনের সত্তায় এল কেন?'

'তাই তো বটে!' হতভম্ব হয়ে বলেছিলাম আমি, 'এসব তো মানবিক সম্পদ।'

'ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস,' উত্তেজিত হয়ে গেলেন প্রফেসর। 'এই সম্পদ শব্দটা যখন শুনলাম, তখন আর একটা গল্প মনের মধ্যে চলে আসছে। আরিয়ন ছিলেন কিংবদন্তির কবি— খ্রিস্টপূর্ব সাত শতকের নামী গাইয়ে। প্রচুর মণিকাঞ্চন নিয়ে জাহাজে চেপে যাচ্ছিলেন। নাবিকেরা সব কেড়ে নিয়ে তাঁকে ডুবিয়ে মারতে গেছিল। উনি তখন শেষবারের মতো একটা গান গাইতে চেয়েছিলেন। গান শেষ করেই সাগরে লাফিয়ে পড়েছিলেন। কেননা, ওঁর গানের ডাক শুনে একটা ডলফিন এসে গেছিল জাহাজের পাশে। ওঁকে পিঠে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল ডাঙায়। অদ্ভুত! নয় কী?'

গল্পে জমে গিয়ে আমিও বলেছিলাম, 'অদ্ভুত! অদ্ভুত! অদ্ভুত!'

'আবার দ্যাখো,' গল্প-মশগুল প্রফেসর বলে গেছিলেন আপন মনে—'কিংবদন্তিতেই রয়েছে ডলফিনদের আন্দাজি উৎসরহস্য।'

উৎসুক হয়েছিলাম, 'এল কোত্থেকে? এই ডলফিনেরা?'

'সমুদ্রদেবতা পেসিডন-ই নাকি এক জাহাজের নাবিকদের ডলফিন বানিয়ে দিয়েছিলেন— ভূতের ভয়ে বেচারারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেই।'

'কিন্তু,' সসংকোচে বলেছিলাম আমি, 'মায়া-দয়া এইসব দৈবগুণ ডলফিনদের মধ্যে এল কী করে? জীবে দয়া করে যে জন, সেজন সেবিছে ঈশ্বর। জলে ডুবন্ত মানুষদের কেন বাঁচিয়ে দিচ্ছে ডলফিনগণ?'

'জীবে প্রেম করে বলে', অম্লানবদনে বললেন প্রফেসর, 'সব জীবে নয়, শুধু মানুষদের। মাছ ধরে যখন খায়, তখন নৃশংস আমিষাশী— কিন্তু দয়ার সাগর উথলে ওঠে মানুষকে ডুবতে দেখলেই। কেন? দীননাথ? কেন? মানুষের জন্যে প্রাণ কাঁদে কেন ডলফিনদের?'

'সৃষ্টির শুরুতে সৃষ্টিকর্তা হয়তো ডাঙার মানুষ আর জলের মানুষ— এই দু'ধরনের মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন বলে,' থেমে থেমে ঘষেছিলাম আমার জ্ঞান চকমকি।

মাথা নাড়তে নাড়তে প্রফেসর বলেছিলেন, 'তাই কী? তাই কী? তাহলে মাঝেমাঝে ডলফিন-দেবতা হয়ে দেখা দিতে কেন অ্যাপোলো দেবতা? ডলফিন দেবতাসম বলেই কি পোসিডন ডলফিনকে আকাশে তারামণ্ডল করে ঝুলিয়ে দিয়েছেন? নাকি,' একটু যতি দিয়ে বললেন প্রফেসর, 'ওই তারামণ্ডল থেকেই ডলফিনদের আবির্ভাব ধরা'র সমুদ্রে? কী মনে হয়, দীননাথ? যেখানে দেখবে কিংবদন্তি কাহিনি, ঘেঁটে দ্যাখো, ঘেঁটে দ্যাখো, হয়তো পেয়ে যাবে অমূল্য রতন।'

সন্দিগ্ধ স্বরে বললাম, 'সেই গবেষণায় মেতেছেন?'

'ও ইয়েস, ও ইয়েস, ও ইয়েস। জলে অথবা পাতালে ডলফিনকে গাইড করে নিয়ে যাওয়ার বিস্তর আইডিয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল গ্রিকদের মধ্যে, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে। কৃষ্ণসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে গ্রিকদের 'ওলবিয়া' ঘাঁটিতে ডলফিন-প্রতীক

দেখা গেছে মড়াদের হাতে। লিবিয়া থেকে ব্রিটেনে—রোমান-অধ্যুষিত বহু অঞ্চলে পাওয়া গেছে ডলফিন দেবতা, অথবা, দেবতা পরিবৃত ডলফিন। কেন? দীননাথ, কেন?'

মূঢ় ব্যক্তিদের বাচাল হতে নেই। তাই আমি চুপ করে রইলাম।

খই ফুটছে তখন জ্ঞানগর্ভ প্রফেসরের মুখে, 'ধ্রুপদী ডলফিন বিশ্বাস কিন্তু ফিরে ফিরে এসেছে খ্রিস্টীয় যুগে, মিশে গেছে অন্তত একটা খ্রিস্টীয় কিংবদন্তিতে—'

'সেটা কী?'

'শহিদ-সন্ত 'লুসিয়ান অফ অ্যান্টিওক'-এর মৃতদেহ পিঠে করে বয়ে এনেছিল এক ডলফিন— পিছল পিঠে ডেডবডি এতটুকু পিছলে যেতে না দিয়ে।'

'বাঃ!'

প্রফেসর কিন্তু চালিয়ে গেলেন, 'শুধু ভুমধ্যসাগর অঞ্চলেই নয়, দীননাথ—দেশেবিদেশে ছড়িয়ে আছে ডলফিন-প্রশস্তি। এমন বিশ্বমত আছে মানুষের মধ্যে, মরা ডলফিন যে পায়, তার বরাত ফিরে যায়।'

'সৌভাগ্য প্রতীক! যেমন, লক্ষ্মীর ঝাঁপি—'

বলে গেলেন প্রফেসর, 'প্রাচীন বিশ্বাসগুলো যে নিছক বুজরুকি নয়, তার ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া গেছে বিংশ শতাব্দীতে। ডুবন্ত মানুষদের ঠেলেঠেলে এনে ডাঙায় তুলে দিয়েছে ডলফিন। কেন? সাঁতারুদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব জমিয়েছে ডলফিনেরা। কেন? বাচ্চাদের পিঠে তুলে নিয়ে হাওয়া খাইয়েছে ডলফিনেরা। কেন? সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ডলফিনেরা মানুষের ভাষা নকল করতে পারে— এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রশ্নের জবাবও দেয়।'

আর থাকতে পারলাম না, 'ডলফিনদের সঙ্গে আড্ডা! সে তো স্বপ্ন কথা!'

গুম হয়ে গেলেন প্রফেসর। বললেন তারপরে, 'স্বপ্নের মধ্যে থাকে রহস্য, আর রহস্য যেখানে, বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কচর্চা সেখানে। কী বলেছেন আইনস্টাইন?'

হাঁ করেছিলাম। টপ করে মুখ বন্ধ করেই প্রশ্ন ত্যাগ করলাম, 'কী? কী?'

'The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all art and science'.

এতক্ষণ বাংলা জ্ঞানের ঝড় গেছে, এবারে শুরু হল ইংরেজি জ্ঞানের ঝড়।

ঝটপট তাই বলেছিলাম, 'আমি তো যেতেই চাই রহস্য উন্মোচনের ঝটিকা অভিযানে। কোথায় আপনার ওস্যানারিয়াম?'

'মণিপালে।'

২.ডলফিন গবেষণাগারে

মুগ্ধ চোখে চেয়েছিলাম রাম আর সীতা'র দিকে।

ডলফিন রিসার্চ সেন্টার এই নামই দিয়েছে এদেরকে। দু'দুটো ডলফিন। মসৃণ গতিভঙ্গিমায় আসছে আর যাচ্ছে ওস্যানারিয়াম-এর এক দিক থেকে আর এক দিকে। লম্বায় তিরিশ গজ সাগর-আধার। ওরা বারেবারে টহল দিয়ে যাচ্ছে এই তিরিশ গজ জলের মধ্যে। কখনও পাশাপাশি, কখনও ওপর-নীচে। সাত ফুট লম্বা শরীরদুটোকে ঘষটে যাচ্ছে যাতায়াতের সময়ে। লম্বায় সমান মাপের হলেও দেখতে একই রকম নয়। কে রাম, আর কে সীতা— চিনিয়ে দেওয়ার পর আর ভুল হয় না।

গবেষণার আইডিয়া প্রফেসরের। টাকা জুগিয়ে যাচ্ছে একটা মাড়োয়ারি দাতব্য সংস্থা। খুবই নিরালা নির্জন জায়গায়। কোনও প্রচার নেই। উৎসুক পর্যটকদের ভিড় নেই। এমনিতেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পেরিয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোরে টুরিস্ট আসতে চায় না। ম্যাঙ্গালোরের হমপনকট্টা থেকে মণিপাল অনেক ভেতরে। সেইখানেই সৈকত থেকে অনেক দূরে সাগরের মধ্যে গড়ে উঠেছে এই পৃথিবীর আধুনিকতম ডলফিন গবেষণাগার।

সাগরের জল সোজা চলে আসে তিরিশ গজ লম্বা এই চৌবাচ্চায়। তলদেশ সাদা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। একদিকে গ্রিল-গেট। পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। খোলা পথ দিয়ে রাম-সীতা অনায়াসেই বেরিয়ে যেতে পারে সাগরে।

কিন্তু যাচ্ছে না। ওরা স্বাধীন। ইচ্ছে হলে থাকবে। ইচ্ছে না হলে চলে যাবে।

আইডিয়াটা প্রফেসরের, প্রথমদিকে গ্রিল গেট টেনে আটকে রাখা হত ডলফিনদের। তারপর গেট খুলে দিতেন প্রফেসর। পরাধীন যারা, তাদের নিয়ে গবেষণায় যতদূর এগিয়েছিলেন, স্বাধীন ডলফিনদের স্টাডি করে জেনেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। ওরা মানুষকে ভালবাসে। স্বেচ্ছায় আসুক। মানুষকে বুঝুক। মানুষও ওদের বুঝুক।

রাম আর সীতা স্বেচ্ছায় এসেছে। কেউ ওদের নেমন্তন্ন করে আনেনি। আর যাচ্ছে না।

মুগ্ধ চোখে ওদের যখন দেখছি, ওরাও তখন নিশ্চয় আমাকে দেখে যাচ্ছিল। এ রকম আখাম্বা মানুষ বোধহয় জীবনে দেখেনি। দেখুক, দেখুক, তামাম দুনিয়ায় জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এমন ফিগার পাবে কোথায়?

চমকে উঠেছিলাম প্রফেসর পাশে এসে দাঁড়াতেই।

'আঁতকে উঠলে যে!'

'তন্ময় হয়েছিলাম যে!'

'ভাল ভাল ভাল। তন্ময় হয়ে থাকার এমন উপাদান আর পাবে কোথায়? এখনও তো ডলফিন-কথা শোনোনি।'

ঘুরে দাঁড়ালাম প্রফেসরের দিকে, 'কখন শুনব?'

'শুনবে শুনবে দীননাথ। শোনাবার জন্যেই তো এতদূরে তোমাকে নিয়ে এলাম। হাজার হাজার বছর ধরে ডলফিন বলতে সবাই বুঝেছে— মানুষের সাগর-বন্ধু। কিন্তু কেউ জানেনি, ওদের ব্রেনের সাইজ আর মানুষের ব্রেনের সাইজে নেই কোনও তফাত।'

‘মানুষ-মগজ যত বড়, ডলফিন-ব্রেনও তত বড়?’

‘এগজ্যাক্টলি,’ তবে মুচকি হাসলেন প্রফেসর, ‘তোমার ব্রেনটা কিন্তু সৃষ্টি ছাড়া।’

হজম করে গেলাম টিটকিরি। ওটা আমার গা-সওয়া। ব্রেন আমার ছোট হতে পারে, কিন্তু তা নিরেট। আর পাঁচটা বাঙালির মতো ভেজাল মিশানো নয়।

তাই টুক করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কিন্তু ভোক্যাল কর্ড তো নেই মানুষের মতো।’

আমার বই পড়া বিদ্যে জাহির করেছিলাম। ভোক্যাল কর্ড মানে যে স্বরতন্ত্রী অথবা স্বররজ্জু, সেটা শিখে এসেছিলাম বই ঘেঁটে— এই তল্লাটে আসবার আগেই।

অদ্ভুত চোখে চেয়ে থেকে প্রফেসর আমার জ্ঞানের বহরটা বোধহয় মেপে নিলেন।

তারপর যেন এ কে ফরটিসেভেন চালিয়ে গেলেন, ‘না, নেই। তবে, অন্তত ৩২টা শব্দের ভোকাবিউলারি আছে।’

‘ভো...ভো...!’

‘শব্দের ফর্দ।’

‘অ।’

অনুকম্পা মিশানো চোখে কয়েক লহমা তাকিয়ে থেকে বলে গেলেন প্রফেসর, ‘বত্রিশটা সুস্পষ্ট শব্দের মধ্যে আছে ক্লিক, হুইসল, কঁ্যাচকঁ্যাচানি, ঘেউ ঘেউ, ঘ্যানঘ্যানানি, চিঁ চিঁ চিৎকার, গোঙানি। এত শব্দ হয় কী করে জানো? ব্লোহোল দিয়ে বেগে বাতাস বের করে ভালব আর পেটি নাড়িয়ে— দুটোই থাকে ব্লোহোল-এর ঠিক নীচে। আর জেনে রাখো, বৎস, প্রত্যেক ডলফিনের আছে নিজস্ব কণ্ঠস্বর। গুহার মধ্যে বাদুড় যেমন আওয়াজ ছুড়ে দিয়ে প্রতিধ্বনি লুফে নিয়ে পথ চিনে নেয়— বাদুড় স্তন্যপায়ী— সাগরের স্তন্যপায়ী ডলফিনরাও পথ চিনে নেয় একই পন্থায়। প্রশ্ন আছে না কি?’

চিঁ চিঁ করে শুধিয়েছিলাম, ‘এ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট নিশ্চয় হয়েছে?’

‘বিলক্ষণ হয়েছে।’

‘কো-কোথায়?’

‘হাওয়াই-এ। ১৯৫০ সালে। ওস্যানিক ইনস্টিটিউটে। চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ডলফিনদের। ঠিকরে আসা শব্দতরঙ্গ মেপে নিয়ে ঠিক বুঝে নিয়েছে শব্দ ধাক্কা খাচ্ছে কত দূরে, কোন জিনিসে— এমনকি, জিনিসটার সাইজ কী, আর কতখানি মজবুত, তাও ধরে ফেলেছে। দশ ফুট দূরের দুটো গোলকের সিকি ইঞ্চি ছোট-বড় সাইজও ধরে ফেলছে। কীভাবে? শব্দ কীভাবে প্রতিধ্বনি হয়ে জলের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসছে, তা নিখুঁতভাবে মন-মিটারে মেপে নিয়ে।’

‘মন-মিটার! ডলফিনের আবার মন আছে নাকি?’

অপলকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন প্রফেসর। জবাব দিলেন খুব আস্তে, ‘আছে বলেই তো মনে হয়।’

‘মনে হয়! কিন্তু বিশ্বাস না থাকলে আপনার তো কিছু মনে হয় না?’

‘এই গবেষণায় প্রমাণটা পাই, তারপর জবাবটা দেব’, বলেই, কথা ঘুরিয়ে দিলেন প্রফেসর, ‘ওদের শ্রবণশক্তি আশ্চর্য রকমের প্রখর, দীননাথ। পনেরো মাইল দূরের শব্দও

স্পষ্ট শুনতে পায়। সাউন্ড সিগন্যাল শুনেই বুঝে নেয় সঙ্গীরা রয়েছে কোথায়, বিপদ থেকে কেটে বেরিয়ে যেতে হবে কীভাবে, অথবা, দল বেঁধে শিকার ধরতে হবে কীভাবে।'

'ওরা কি দল বেঁধে থাকে?'

'হ্যাঁ, দীননাথ। ওরা সমাজবদ্ধ জীব। প্রায় হাজার জন থাকে এক-এক পাড়ায়। সহজাত অনুভূতি-ইন্সটিংক্ট দিয়ে যোগাযোগ রাখে পাড়ায় পাড়ায়। একজনও যদি ঝামেলায় পড়ে, তাকে ফেলে চম্পট দেয় না কখনও।'

'ঝামেলায় পড়লে চেঁচায় নাকি? জলের মধ্যেও?'

'হুইশল মারে। খুব তীক্ষ্ণ, ছোট্ট একটা শিস। সেই হল ওদের SOS। সিগন্যাল। বিপদসংকেত।'

ঠিক এই সময়ে তীক্ষ্ণ শিস ধ্বনি ভেসে এল সাগর-আধার থেকে।

শিস দিচ্ছে ডলফিন!

আমি চমকে উঠেছিলাম। প্রফেসর হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন—'তোমাকে শুনিয়ে দিল, শিস হয় কীরকম!'

মাথা চুলকে বলেছিলাম, 'তার মানে? আমাদের কথা শুনছে না কি?'

'সমস্ত। তোমাকে ভালবেসেও ফেলেছে। মানুষটা তো ভাল।'

ঠিক এই সময়ে যেন সার্কাস দেখিয়ে গেল দুই ডলফিন। একজন আর একজনকে ঘাড়ে চাপিয়ে তুলে রাখল জলের ওপর। তারপর ঝপ করে ফেলে দিল জলের মধ্যে।

'এটা কী হল?' সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম।

প্রফেসর বললেন, 'দেখিয়ে দিল, বিপদে পড়লে, অক্সিজেনের দরকার হলে, এইভাবেই ওরা স্বজনকে তুলে ধরে জলের ওপর। চারদিন পর্যন্ত রেখে দেয় খোলা বাতাসে।'

'কিন্তু এত মেহনত না করে ডাঙায় এনে ফেলে দিলেই তো হয়?'

'তাও করে— মা ডলফিনেরা। বাচ্চার প্রথম নিশ্বাস যাতে পৃথিবীর বাতাসে হয়, তাই ঠেলে এনে ফেলে ডাঙায়।'

চলে এলাম মূল প্রশ্নে, 'মানুষের ভাষা শেখানোর চেষ্টা হয়নি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম না।

একটু পরে বললেন প্রফেসর, 'এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে দেদার। কয়েকটা মনুষ্য হুকুম চিনেছে। মনুষ্য-হাস্য নকল করেছে। কিন্তু...কিন্তু মনুষ্য-কণ্ঠের জটিলতা রপ্ত করতে পারেনি।'

প্রফেসরের চোখে চোখে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'আপনি? রপ্ত করাতে পারেননি?'

হেসে ফেললেন অদ্ভুতকর্মা বৈজ্ঞানিক। দিলেন ছোট্ট জবাব, 'পেরেছি।'

ঠিক এই সময়ে চমকে উঠলাম সুস্পষ্ট নারীকণ্ঠে খিলখিল হাসি শুনে।

দেখলাম তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে একটা ডলফিন আর হেসে যাচ্ছে মেয়েলি গলায়। যেন, টিটকিরি দিচ্ছে।

খেপে গিয়ে বলেছিলাম, 'মস্করা হচ্ছে!'

মধুর গলার প্রফেসর বলেন, 'তোমাকে দেখে হাসছে সীতা।'

মাথা গরম করে ফেলেছি বুঝে বললেন তারপরেই, 'সত্যিই দীননাথ, তুমি একটা গবেট।

হাসি শুনে রেগে গেলে, এবার ওদের ফাইটিং ক্যাপাসিটি দেখবে? দেখলে চমকে উঠবে।'

'লড়াকু ক্ষমতা?'

'হ্যাঁ, হাঙর ওদের জন্মশত্রু। হাঙর-ডলফিন লড়াই চলেই আসছে সাগরে সাগরে। টিট করে দেয় হিংস্র হাঙরকে। কীভাবে দেখতে চাও।'

'দেখান তো!'

লড়াই দেখতে কার না ভাল লাগে! মজাদার লড়াই হবে নিশ্চয়। স্রেফ গুঁতোগুতি— নয়তো কামড়াকামড়ি। হাত-পা নেই তো কারওর-ই। মানুষ এদিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছে। অন্তত আমি।

কিন্তু হাঙর কোথায়?

চকিত চমক দেখিয়ে বিশাল একটা হাঙর পিছলে ঠিকরে গেল সাগর-আধারের মধ্যে— বলতে গেলে, আমার পায়ের তলা দিয়ে!

ভীষণ চমকে লাফিয়ে পেছিয়ে গেছিলাম!

তারপরেই প্রফেসরের খি-খি হাসি শুনেই বুঝলাম, পায়ের তলায় হাঙর ছিল কোথায়।

ছিল পায়ের তলার মেঝের নীচের গহ্বরে। ধরে এনে সেখানেই রেখে দেওয়া হয়েছিল সামনের গ্রিল-খাঁচার দরজা বন্ধ করে।

এখন নিঃশব্দে সরে গেছে খাঁচার দরজা— পাশের ফোকরে।

আর, পারদগতিতে হিলহিলে কিলবিলে হাঙর ধেয়ে এসেছে চিরশত্রু ডলফিন দেখে।

কিন্তু আশ্চর্য হয়েছিলাম ডলফিনযুগলের যুদ্ধনৈপুণ্য দেখে।

নিমেষে সরে গেছিল সাগর-আধারের একদম অপর প্রান্তে যেখান দিয়ে বেরিয়ে চলে যাওয়া যায় খোলা সমুদ্রে।

কিন্তু যায়নি। ছুঁচোলো লম্বা চঞ্চু বাগিয়ে দূর থেকে নজর রেখে গেছিল হাঙরের দিকে।

হাঙর ল্যাজ ঝাপটাচ্ছে। ডলফিনেরা নিস্পন্দ।

পরক্ষণেই, আচমকা যেন টর্পেডো হয়ে গেল দু'দুটো ডলফিন। উল্কা বেগে ধেয়ে এসে একসঙ্গে ঢুঁ মারল হাঙরের দু'পাশে। বিষম ছটফটিয়ে উঠেই নিস্পন্দ হয়ে গেল খুনে হাঙর। নিষ্প্রাণ নাকি? সরে গেল রাম-সীতা।

'ডেড!' উৎফুল্ল গলায় বললেন প্রফেসর।

'কিন্তু কীভাবে? গায়ে ছেঁদা তো হয়নি। রক্তপাতও হয়নি।'

'ভেতরের দেহযন্ত্র গুঁতিয়ে থ্যাঁতলা করে দিয়েছে যে,' প্রফেসর বিলক্ষণ খুশি, 'আর একটা খেলা দেখবে?' বলেই, সাগর-আধারের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেঁকে বললেন প্রফেসর, 'রাম, সীতা...রাম, সীতা...হাঙরটাকে ডাঙায় তুলে দে।'

মুখের কথা থামতে না থামতেই ওরা ঘটিয়ে দিল সেই অসম্ভব ব্যাপার। যাদের হাত নেই, পা নেই, সেই ডলফিনরা মরা হাঙরকে ডাঙায় তুলে দিল। কী করে?

দূর থেকে তিরবেগে ধেয়ে এসে স্রেফ গুঁতিয়ে— একই সঙ্গে।

জল থেকে ঠিকরে গেল মরা হাঙর। শূন্যপথে এসে পড়ল আমাদের পায়ের কাছে।

আমি স্তম্ভিত।

৩. অতলের লাইফগার্ড

প্রফেসর আমার কাঁধে হাত রেখে, ডলফিনযুগলের দিকে চোখ রেখে আপন মনে বলে গেলেন, 'জলের বন্ধু এই ডলফিনদের নিয়ে মানুষ অবাক হয়েছে যুগে যুগে। ইনটেলিজেন্স, না ইন্সটিংক্ট— বুদ্ধিমত্তা, না সহজাত সংস্কার— কীসের দৌলতে ডলফিনেরা মানুষের বড়ো বন্ধু হয়ে উঠেছে? ১৯৮৯ সালে হাফটাইড উপসাগরে একটা হাঙর খ্যাঁক করে কামড়ে দিয়েছিল এক সাঁতারুকে। নিমেষে একদল ডলফিন তেড়ে এসে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল হাঙরটাকে। ১৯৪৫ সালে ফ্লোরিডার সমুদ্রসৈকতে চোরাস্রোতে ভেসে যাচ্ছিল এক মেমসাহেব— কোত্থেকে একদল ডলফিন এসে, ঠেলে ঠেলে তাকে তুলে দিয়েছিল সৈকতে। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ডলফিন-এক্সপার্ট মিসেস মার্গারেট ক্লিনোভস্কা'র বিশ্বাস ছিল, অন্ধ অনুভূতি দিয়ে ডলফিনেরা সেবা করে মানুষের। আমি তা বিশ্বাস করি না। কেউ যা জানেনি, আমি তা জেনেছি।' ধ্যানমগ্ন প্রফেসরের ধ্যান ভাঙাতে সাহস পাইনি। শুধু চেয়েছিলাম ওঁর দিগন্তসঞ্চারী চোখদুটোর দিকে। যেন, ধ্যানস্থ ঋষি।

অস্ফুট স্বরে স্বগতোক্তি করে গেছিলেন সেই বিজ্ঞানতাপস, 'এই পৃথিবীর সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবদের টেক্কা মেরেছে সাগরের ডলফিনেরা সাঁতারের স্পিডে— ঘণ্টায় ৩৫ মাইল। ভাবা যায়?'

হঠাৎ একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়ে গেল মাথায়, 'এত স্পিড কি ওদের রেশম-মসৃণ চামড়ার জন্যে?'

প্রফেসরের চক্ষুযুগল প্রোজ্জ্বল হল নিমেষে, 'দীননাথ, কে বলে তোমার মাথা মোটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। চামড়া যে তেল মাখানো— তাই পিছলে যায়, হড়কে যায় জল কেটে। এই চামড়ার নকল বানিয়ে এই জন্যেই তো লাগানো হত টর্পেডোতে।'

হাঁ হয়ে গেলাম। টর্পেডোও নকল করেছে ডলফিন চামড়াকে!

টপ করে হাঁ বন্ধ করতে হল প্রফেসরের পরবর্তী বাক্যনিক্ষেপে, 'দীননাথ, খুনে তিমি কিন্তু এই ডলফিনদেরই বৃহত্তম জ্ঞাতিভাই। লম্বায় পাক্কা একত্রিশ ফুট।'

'সাগর বিভীষিকা?'

'একজ্যাক্টলি। সব সাগরেই টহল দিয়ে বেড়ায়। খাদ্যতালিকায় আছে জ্ঞাতিভাই ডলফিনরাও।'

'জ্ঞাতিশত্রু বলুন।'

'তা বটে, তা বটে। মানুষ কিন্তু ডলফিন খায় না— ডলফিনদের কাজে লাগায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে এই ডলফিনরাই ছিল মার্কিন সেনাদের আন্ডারওয়াটার গার্ড।' একটু থামলেন প্রফেসর, 'ডলফিনদের আর কী কী ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, তা আজও মিলিটারি সিক্রেট।'

গলা নামিয়ে বলেছিলাম, 'আপনার কাছে নিশ্চয় নয়?'

চমকে উঠলেন প্রফেসর, 'চুপ! গর্দানের ভয় নেই? মহাকাশ গবেষণায় সময় নষ্ট না করে তাই তো আমি ডলফিন গবেষণা নিয়ে মেতেছি— ডলফিনদের জটিল ভাষার চাবিকাঠি

আবিষ্কার করে ফেলেছি। কী অদ্ভুত ক্ষমতা পেয়েছে জলের এই জীবেরা! আশ্চর্য! আশ্চর্য! সেকেন্ডে দেড় লাখ পর্যন্ত ভাইব্রেশন ধরার ক্ষমতা রাখে— মানুষের কানের আটগুণ বেশি ক্ষমতা!'

ফট করে বলেছিলাম, 'ডলফিন-এর কান মানুষের কানে লাগালে হয় না?'

কটমট করে তাকালেন প্রফেসর, 'স্টুপিড! কান ওদের শুকিয়ে যায়। ওরা শোনে চোয়াল আর গলা দিয়ে।'

থমকে গেলাম। চমকে গেলাম। চোয়াল আর গলা কানের কাজ করে, এই প্রথম শুনলাম।

'শুধু তাই নয়, দীননাথ,' প্রফেসর এখন বিলক্ষণ বাঙ্ময়, 'একই সঙ্গে দুটো কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারে ডলফিন— হুইশল মেরে আর ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ করে। ফিংগারপ্রিন্ট দিয়ে যেমন মানুষ চেনা যায়, ডলফিনদের তেমনি চেনা যায় সিগনেচার-হুইশল দিয়ে। এক-একজনের সিটি মারা এক-এক রকম। আশ্চর্য! আশ্চর্য! স্রষ্টার কী আশ্চর্য সৃষ্টি। ডাঙার মানুষের ফিংগারপ্রিন্ট, জলের ডলফিনদের ভয়েস-প্রিন্ট। কোথায় যেন একটা মিল থেকে গেছে, দীননাথ। তাই না?'

কিছু না বুঝেই ঘাড় নেড়ে গেছিলাম আমি।

৪. ডলফিন! ডলফিন! আজও অচিন তুমি—ধরণীর বিস্ময়!

ঠিক এই সময়ে দেখেছিলাম একটা জল-ট্যাক্সি জল তোলপাড় করে ছুটে আসছে ডলফিন রিসার্চ স্টেশনের দিকে।

দূর থেকে দেখেছিলাম, ভেতরে সটান দেহে দাঁড়িয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা। চোখ ঢাকা কালো চশমায়।

প্রফেসরও চেয়েছিলেন আগুয়ান ওয়াটার-ট্যাক্সির দিকে। মণিপাল পর্যটন দপ্তরের টুরিস্ট-ট্যাক্সি। পর্যটকদের জলবিহারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ডলফিন রিসার্চ স্টেশন তো জনসাধারণের জন্যে নয়।

'কে আসছে, প্রফেসর?'

প্রফেসরের জবাবের মধ্যে উদ্বেগের আভাস পেলাম, 'সেই মাড়োয়ারিদের কেউ।'

'কোন মাড়োয়ারি?'

'বড্ড ভুলে যাও। মাড়োয়ারিদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কৃপায় চলছে এই গবেষণা। কিন্তু আর বেশিদিন চালানো যাবে বলে মনে হয় না। শুনছি, ওরা টাকা দেওয়া বন্ধ করবে। ভস্মে ঘি ঢালছে, রেজাল্ট তো দেখতে পাচ্ছে না। দীননাথ, আমার মনখারাপ সেইজন্যেই। সময়সীমা বেঁধে রিসার্চ হয় না। এদের টাকা আছে, হৃদয় আছে, কিন্তু ধৈর্য নেই।'

ওয়াটার-ট্যাক্সি লেগেছে ডকে। হেঁট হয়ে সেদিকে চেয়ে আছেন প্রফেসর। বিষণ্ণ চোখ।

আমি বললাম, 'মাড়োয়ারি সংগঠনে বোরখাপরা মহিলা থাকে না। প্রফেসর, ইনি অন্য মতলবে আসছেন।'

বোরখা-পরা তালঢ্যাঙা মহিলা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। ঠিক তরতর করে নয়, ডাইনে বাঁয়ে হেলে দুলে। বোরখা এত লম্বা যে পা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

ডেকে উঠেই দাঁড়িয়ে গেলেন প্রফেসরের সামনে। বললেন বিশুদ্ধ বাংলায়—'আপনিই প্রফেসর নাটবল্টু চক্র?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন প্রফেসর।

কালো চশমা এবার ফিরল আমার দিকে, 'ইনি দীননাথ নাথ?'

আশ্চর্য হলাম। আমি তো ঝাঁ করে চলে এসেছি প্রফেসরের সঙ্গে। এই আখাম্বা মহিলা তা জেনে ফেলেছেন!

কিন্তু ভদ্রতা তো দেখাতে হবে। তাই সবিনয়ে বলেছিলাম,'যথার্থ ধরেছেন।'

বলছিলাম, আর চেয়ে চেয়ে ভদ্রমহিলার সাইজটা মাপছিলাম। আমি বিলক্ষণ ঢ্যাঙা, শত্রুরা বলে আমিই নাকি অশ্বত্থামা। কিন্তু এই মহিলা তো দেখছি আমার চেয়েও ঢ্যাঙা। কণ্ঠস্বরটা অদ্ভুত। গলার মধ্যে যেন অর্কেস্ট্রা বাজছে। খটকা লেগেছিল প্রফেসরেরও। সটান শুধোলেন, 'কিন্তু আপনি কে?'

বোরখাবৃতা মহিলা ঐকতান স্বরে বললে,'আমার নাম কুহেলিকা। আমি এসেছি 'বাংলার রহস্য' পত্রিকা থেকে। বিশেষ প্রতিবেদক। এনেছি একটা সুখবর।'

'সুখবর!' প্রফেসর সচকিত হয়েছেন।

'আজ্ঞে,' অর্কেস্ট্রা কণ্ঠস্বরে বলে গেল কুহেলিকা,'আপনি মুষড়ে পড়বেন না। গবেষণা চালিয়ে যান। টাকা বন্ধ হবে না। ট্রাস্ট কমিটি ডিসিশন নিয়েছে।'

'আপনি জানলেন কী করে?' প্রফেসর চমকে উঠেছেন।

'আমরা সাংবাদিক। ঘরের খবর জেনে ফেলি। তাই ছুটে এলাম আপনাকে অভয় দিতে। জয়যুক্ত হোক আপনার ডলফিন গবেষণা— চোখ খুলে যাক পৃথিবীর মানুষের।' একটু থেমে, জলাধারের দিকে কালো চশমা চক্ষু ফিরিয়ে বললে কুহেলিকা জলতরঙ্গ সুরে,'রাম আর সীতা খুব লাফাচ্ছে দেখছি। আমাকে দেখে খুশি হয়েছে।'

সত্যিই, তাই। আচমকা তিড়িং তিড়িং লাফালাফি শুরু করেছে ডলফিনদুটো। এতক্ষণ বিপুল বেগে ছুটোছুটি করছিল তিরিশ গজ লম্বা সাগর-আধারের এদিক থেকে সেদিক পর্যন্ত। এখন বুঝি বিষম উল্লাসে নৃত্য জুড়েছে জল থেকে প্রায় দশ ফুট উঁচুতে ঠিকরে গিয়ে।

সিকিউরিটি অফিসের দিক থেকে গটমট করে এগিয়ে এল সিকিউরিটি ইনচার্জ পিশারোটি। ম্যাঙ্গালোরের মানুষ। খর্বকায়, কিন্তু যেন একটা পরিচ্ছন্ন বুলেট। একদা আর্মিতে কাজ করেছে। চেহারা, চাহনি আর কথায় তার ছাপ আছে।

কিন্তু তার মুখের জিজ্ঞাসা মুখেই থেকে গেল প্রফেসরের কথায়, 'ইনি ম্যাডাম কুহেলিকা। স্পেশ্যাল করেসপন্ডেট অফ বেঙ্গলি পেপার 'বাংলার রহস্য।'

'আই সী,' বলে খট করে বুটের গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে অ্যাবাউট টার্ন নিয়ে অফিসে

ফিরে গেল পিশারোটি। ওর পুরো নাম নাগরাজ পিশারোটি। আচরণটা নাগরাজের মতোই। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণই আলাদা।

চশমাচক্ষু কুহেলিকা নাম্নী অশ্বত্থামা তার দিকেই এতক্ষণ চেয়েছিল। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাচ্ছিল লম্বা বোরখা। ঈষৎ টলছে কেন দেখবার জন্যে পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু ভিক্টোরীয় আমলের গাউনের মতো মেঝে-লুটিয়ে থাকা বোরখার তলদেশ পা ঢেকে রাখায় কিছুই দেখতে পেলাম না।

অর্কেস্ট্রাবাদনে হাসি কীরকম শোনায়, কক্ষনও শুনিনি। এখন শুনলাম। কুহেলিকা বললে, 'আমি নিজেই একটা বিস্ময়, দীননাথবাবু— তাই জলজগতের বিস্ময় আমাকে টেনেছে।'

'জলজগতের অমানবিক বিস্ময়,' রকেট স্পিডে বলে ফেলেছিলাম কথাটা।

কুহেলিকা যেন রাগিণী বাজিয়ে গেল কণ্ঠস্বরে, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই। কে কবে শুনেছে, ডলফিনদের কথা মানুষের ভাষায় শোনা যাচ্ছে? বিশেষ করে, আ মরি বাংলা ভাষায়?'

সচকিত হলেন প্রফেসর, 'আপনি কোত্থেকে জানলেন?'

কুহেলিকা'র সুরেলা অট্টহাসি জলের ওপর দিয়ে নেচে নেচে নৃত্যপর দুই ডলফিনের মাথার ওপর দিয়ে, ধেয়ে গেল খোলা সমুদ্রের দিকে— 'খবরের কাগজের লোকেদের কাছে খবর কানে হেঁটে চলে আসে। রাম আর সীতা এখন নিশ্চয় সুপারসনিক রেঞ্জে কথা বলছে। টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দেবেন, প্রফেসর?'

প্রফেসর চেয়ে রইলেন কালো চশমার দিকে।

তারপর বললেন, 'অনেক খবরই নিয়ে এসেছেন দেখছি। খুবই সিক্রেট। হ্যাঁ, ওরা এখন সেকেন্ডে একশ কুড়ি কিলো সাইকেল স্পিডে কথা বলছে। তবে, ড্যান্সের এই প্যাটার্ন তো আগে দেখিনি। এ যেন মন্দিরে আরতি-নৃত্য।'

বলতে বলতে হেঁট হলেন প্রফেসর। ডেকের ওপরে বাক্স খুলে, ইয়ার ফোন বের করে লাগিয়ে দিলেন জলের হাইড্রোফোনের সঙ্গে।

বললেন, 'আশ্চর্য! জবাব দিচ্ছে না কেন রাম-সীতা!'

সুরেলা হেসে কুহেলিকা বললে, 'আমাকে দেখে আনন্দ হয়েছে। তাই অত নেচে চলেছে। ভাষা ভুলে গেছে।'

'ওরা ডলফিন, কিসসু ভোলে না—মানুষের মতো।' প্রফেসর চটেছেন।

কুহেলিকা কিন্তু অতিশয় অমায়িক, 'তা বটে! তা বটে! আন্তঃনক্ষত্র সভ্যতায় বিস্মৃতির ঠাঁই নেই। সব থাকে রেকর্ডে।'

চমকে উঠলেন প্রফেসর, 'কী...কী বললেন? আন্তঃনক্ষত্র সভ্যতার কথা এখানে আসছে কেন?'

'কারণ,' বললে কুহেলিকা, 'সেটাই আপনার থিয়োরি। স্পেসশিপ পাঠিয়ে গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় যোগাযোগের প্রচেষ্টা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু মন দিয়ে মন ছোঁয়া যায় সহজে— মনের চাইতে দ্রুতগামী এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই।'

প্রফেসর বাকরহিত হয়ে গেলেন। তাঁর রিসার্চের এই সিক্রেট তো আমারও জানা ছিল না। মাঝে মাঝে 'মন' নিয়ে একটু হেঁয়ালি করেছেন, তার বেশি এগোননি।

কিন্তু এই অশ্বত্থামা বোরখাবৃতা ফট করে চলে এসেছে গবেষণার গোড়ার কথায়— মন দিয়ে মন ছোঁয়া।

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বোরখাবৃতা তো যেন আমার মনের নাগালও ধরে ফেলল নিমেষে। আমার দিকে কালো চশমা ফিরিয়ে বললে, 'ভিনগ্রহী সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সঠিক আর সরাসরি, সংক্ষিপ্ত আর চটজলদি ব্যবস্থা— যে ব্যবস্থায় নিপুণ এই জলচর বেদুইন— ইয়ে ডলফিনরা।'

থেমে থেমে বললেন প্রফেসর, 'আপনি অনেক বেশি জেনে ফেলেছেন দেখছি।'

'কারণ আমি আপনার 'মানুষ আর ডলফিন' বইটা পড়ে নিয়েছি। আপনি চান, ডলফিন শিখুক মানুষের ভাষা।'

'হ্যাঁ, চাই,' প্রফেসর গম্ভীর হয়ে গেলেন— হঠাৎ।

'আটকাচ্ছে কোথায়?'

'বোঝার ব্যাপারে। কথা বলা আর কথা বোঝা— এক জিনিস নয়।'

'মন আর বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছে না, এই তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ধরুন, আমি বললাম, রাম, গালফ স্ট্রিম খুব একটা জোরালো সমুদ্রস্রোত নয়। কিন্তু আমার মনের ছাপ ধরতে পারল না রাম। গালফ স্ট্রিম বলতে আমার মনে যে ছবি ফুটে উঠল, তা ওর মনে ফুটল না। আমি 'শক্তিমান' বলতে যদি বোঝাই এই দীননাথকে—তালঢ্যাঙা অসুর—ডলফিন বুঝেছে, সাত ফুট হিলহিলে শরীর নিয়ে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল স্পিডে জল ফুঁড়ে ছুটে যাওয়া। আমার কাছে দীননাথের শক্তির মধ্যে ওজন একটা বিষয়—ডলফিনের কাছে ওজন জিনিসটাই অজানা—চারশ পাউন্ড বডিওয়েটের ভারসাম্য বজায় রাখছে একই ওয়েটের জল সরিয়ে তার মধ্যে ভেসে থেকে। উঁচুতে কিছু তোলা মানে কী, এই ধারণা নেই ডলফিনের। সমুদ্র বলতে যা বুঝি, একটা ডলফিন তা বোঝে না।'

বোরখাবৃতা বললে, 'ডলফিনরাও যে বুঝতে চেষ্টা করছে, তা জানেন কি?'

'মনে তো হয়। কিন্তু প্রমাণ করতে পারছি না। ওদের ইনটেলিজেন্স আছে, কিন্তু মানব-ধীশক্তির মাপকাঠি দিয়ে তা মাপা যাচ্ছে না।'

কুহেলিকা বললে থেমে থেমে, 'ডলফিন ধাঁচে ভাবতে শুরু করলেই মাপতে পারবেন।'

'সে চেষ্টাও করেছি, ম্যাডাম, কিন্তু হালে পানি পাচ্ছি না। ওদের চিন্তাধারা একেবারেই ভিন্ন—'

'ভিনগ্রহী বললে ঠিক বোঝায়, তাই না?'

চমকে উঠলেন প্রফেসর, 'আপনি কি চিন্তা-পাঠক? মন-পঠন বিদ্যায় বিদুষী?'

'মস্তিষ্ক একটা যন্ত্র। এক যন্ত্র থেকে আর এক যন্ত্রে মেসেজ যায় তো? যায়। আপনি মানুষের মগজ থেকে ডলফিনের মগজে মেসেজ পাঠানোর কায়দাটা ধরেও ধরতে পারছেন

না। মন সেই বিদ্যা। এই বিদ্যা প্রয়োগ করুন, মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে, ডলফিন তা বুঝবে—এখন কিন্তু ধরতে পারছে না।'

গুম হয়ে গেলেন প্রফেসর।

তারপর বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে, 'ডলফিন নিয়ে এত পড়াশুনো করেছেন যখন ম্যাডাম কুহেলিকা, তখন নিশ্চয় জানা আছে, ওদের চোয়াল কতখানি লম্বা?'

বোরখা'র মধ্যে দিয়ে দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে কুহেলিকা বললে, 'এই অ্যাত্তো লম্বা।'

'প্রতি জোড়া চোয়ালে দাঁত আছে কতগুলো?'

'অষ্টআশি। ছুরির মতো ধারালো।'

'রাম-এর মতো সাইজের একটা ডলফিনের আন্দাজ ওজন?'

'কয়েক'শ কিলোগ্রাম।'

'অথচ, বিপুল এই ওজন নিয়ে জল কেটে ছুটে যায় যে স্পিডে—'

'মানুষের কাছে তা অবিশ্বাস্য।'

'মানুষের' শব্দটার ওপর অহেতুক জোর দিয়ে গেছিল কুহেলিকা। খট করে মাথায় বেজেছিল আমার। যেন একটা বিজাতীয় শ্লেষ প্রচ্ছন্ন রয়েছে গলার সুরে।

চকিত চাহনি মেলে ধরেই প্রশ্ন-বুলেট নিক্ষেপ করে গেছিলেন প্রফেসর—'জানেন কি, এই সাগর-আধারে যদি নামেন, ওদের সঙ্গে ফক্কুড়ি মারতে যান, একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দুজনের একজন আপনাকে টুঁ মেরে আপনাকে আছড়ে দিতে পারে দেওয়ালে—'

'আমাকে মারবে না—'

'দাঁতে কামড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে চক্ষের পলকে—'

'আমাকে নয়...আমাকে নয়—'

'ল্যাজের এক ঝাপটায় হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে?'

'সে রকম হাড় আমার শরীরে থাকলে তো!' একটু থেমে, কালো চশমা বেঁকিয়ে টিটকিরি সুরে বলে গেল কুহেলিকা, 'এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ ডলফিন মেরে গেছে। দাঁত আর গায়ের জোর খাটিয়ে বদলা কি নিতে পারত না ডলফিনেরা? কিন্তু নেয়নি। আজ পর্যন্ত মানুষের ওপর চড়াও হয়নি কোনও ডলফিন। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে দার্শনিক অ্যারিস্টটল কি সাধে লিখে গেছেন—ডলফিনরা বড়ো শান্তশিষ্ট, বড়ো দয়ালু। মায়া'র চাইতে দয়া কি উঁচু স্তরের সদগুণ নয়?'

চমকিত চোখে চেয়ে রইলেন প্রফেসর, 'অনেক কিছুই জানেন দেখছি।'

'তা জানি,' সশব্দে নিশ্বাস টেনে বললে কুহেলিকা, 'আরও জানি, স্বভাবগতভাবে ডলফিনেরা মানুষ জাতটাকে শ্রেষ্ঠতর জীব বলে মেনে নিয়েছে...ডলফিনদের চেয়ে উঁচু প্রাণী...তাই সেবা করে যায় মানুষকে মুখ বুজে—

ঝটিতি বললেন প্রফেসর, 'কুকুরদের মতো? তারিফ করে, সেবা করে, ভালবাসে?'

ঠিক যেন তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা বাজনা শুনিয়ে হেসে উঠল কুহেলিকা—'বুনো কুকুররা কিন্তু তা করে না। অথচ, বুনো ডলফিনেরা করে। করে না? এই ওস্যানারিয়াম-এর খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে না? রাম আর সীতা দু'জনেই তো বুনো? স্বেচ্ছায় রয়েছে। কেন?'

'হেঁয়ালিটা তো সেইখানেই,' খুব আস্তে বললেন প্রফেসর জলের দিকে তাকিয়ে—যেখানে লাফালাফি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে রাম আর সীতা। উল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে।

অনিমেষে সেই উল্লাস দেখতে দেখতে বুঝি আপন মনেই বলে গেলেন প্রফেসর, 'হেঁয়ালিটা তো সেইখানেই। ওরা খেলতে ভালবাসে, মানুষকে ভালবাসে। ওদের বাগধারা বিষম জটিল, এই গুণগুলো মিলিয়ে দেখলে, মানুষ ওদের নীচের তলায়, ওদের সংস্কৃতিতে লড়াই-লড়াই ব্যাপারটা নেই...মজ্জাগত নয়...যা আছে মানুষের মধ্যে। ওরা যুদ্ধ করে না, খুন করে না, ঘৃণা করে না, নিষ্ঠুর হয় না, সোজা কথায়, মানুষ অনেক সাধনা করে যা হতে চাইছে..যে স্তরে পৌঁছতে চাইছে...ওরা অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে...অন্য পরিবেশে। আমাদের আছে শিল্প-বিজ্ঞান...ওদের নেই। আমরা যন্ত্র চালাতে জানি, ওরা জানে না। তা সত্ত্বেও, আমরা অনেক বেশি জন্তু...ওদের চেয়ে।'

'অমানবিক,' সুস্পষ্ট উচ্চারণে বললে কুহেলিকা, 'ওরা মানুষ নয়...'

'মানুষের ওপরে,' গভীর গম্ভীর গলায় বললেন প্রফেসর। বলেই, দুই চোখ নাচিয়ে ডলফিনযুগলের দিকে তাকিয়ে উদাত্ত স্বরে বলে গেলেন, 'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরা আয়...ঢেউ তুলে তোরা ছুটে আয়...নিয়ে যা এই অমানবিকীকে গভীর জলের তলায়।'

সচমকে তাকালাম কুহেলিকা'র দিকে। দেখলাম, কৌতুকের হাসি ভাসছে তার ঠোঁটের কোণে কোণে।

আর ঠিক তখনই, গোঁত মেরে দুই ডলফিন চলে গেল জলের তলায় রাখা লাউড স্পিকারের সামনে।

৫. ডলফিনের ডাক

প্রফেসর তা দেখলেন। পকেট থেকে বের করলেন কালোজাম সাইজের ছোট্ট একটা মাইক্রোফোন। মুখের সামনে ধরে বলে গেলেন।

'বলো রাম, বলো সীতা,
কে তোমাদের আদি পিতা, আদি মাতা—
এই ধরণীতে।
কুহেলিকা কি তোমাদের কেউ হয়?'

সুবৃহৎ ওস্যানারিয়ামের জলের মধ্যে দিয়ে জলকম্পন সৃষ্টি করে ছুটে গেল সে কথা। লাউড স্পিকারের সামনে ভেসে থেকে যেন তা শুনল রাম আর সীতা। পরক্ষণেই ছিটকে এল জলের ওপর। থর থর করে কেঁপে উঠলো ব্লোহোলের সেন্সিটিভ ঠোঁট আর মাসল—কাঁপিয়ে গেল রাম একাই— প্যাঁক প্যাঁক গলায় বলে গেল মানুষের ভাষা— বঙ্গ ভাষা।

'এসো কুহেলিকা এসো, চলো যাই গহন গভীরে—সাগরতলে।'

পায়ে পায়ে, হেলে দুলে, কুহেলিকা গিয়ে দাঁড়াল জলের পাশে...সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দু'ধাপ...

বলে গেল রাম, 'আমাদের আদি পিতা, আদি মাতা নয় এই পৃথিবীর...বুঝিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে নিকট, চলো যাই জলের তলে।'

জল এখন কুহেলিকা'র কোমর পর্যন্ত। সামনে ভাসছে রাম আর সীতা।

কুহেলিকা বললে, 'রাম...সীতা...কে তোদের আদি পিতা...আদি মাতা?'

'তারা কেউ এ গ্রহের নয়।'

'কারা আমার আদি পিতা? আদি মাতা?'

'তারাও এ গ্রহের নয়।'

'কেন তোরা এখন মানুষের ভাষায় কথা বলছিস?'

'মানুষকে বোঝানোর জন্যে যে— মনের সব কথা মুখের কথা দিয়ে বোঝানো যায় না। আমি পারছি না। কত কথা...কত কথা...'

'তোদের কষ্ট হচ্ছে?'

'হচ্ছে বইকি। সেকেন্ডে চার থেকে দেড়শো কিলো সাইকেল স্পিডে কথা বলি জলের তলায়...কথা বলি গা ছুঁয়ে...কথা বলি শরীরের খেল দেখিয়ে...মানুষ এ বিদ্যে জানে না।'

'জলের তলায় দিকহারা না হয়ে ঠিক জায়গায় চলে যাস কী করে?'

'বহু প্রক্রিয়ার দৌলতে। জলের তাপমাত্রা মেপে, জলের স্বাদ নিয়ে, নক্ষত্রের অবস্থান বুঝে, সূর্য কোথায় আছে দেখে নিয়ে—'

'এই সবই তোদের ব্রেনে একসঙ্গে কাজ করে যায়?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...চকিতে।'

'মন পঠন বিদ্যে? জানিস?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ছায়াপথের ধীমান ভিনগ্রহীদের সঙ্গে এইভাবেই কি কথা বলিস?'

'মন দিয়ে...মন দিয়ে...ওরা খবর নেয়...খবর দেয়...থট রিডিং।'

'তোরা বুঝেছিস, আমি কে?'

'বুঝেছি, কুহেলিকা, বুঝেছি। তুমি এ গ্রহের কেউ নও, তুমি আমাদের মধ্যে আসতে চাও।'

'কেন আসতে চাই?'

'নতুন বার্তা ছড়াবে...খবর...নতুন খবর...তুমি যে খবরের কাগজের লোক।'

'তাহলে আসি?'

'এসো।'

এরপরেই চোখের সামনে যা ঘটে গেল, তা লিখলে প্রত্যয় হবে না কারও। তবুও লিখতে আমাকে হবেই— জাগাতে জগত জনে...

জলমগ্ন সিঁড়ির ধাপ বেয়ে আরও নীচে নেমে গেল কুহেলিকা। বোরখা লেপটে গেল সর্বাঙ্গে। তারপর সাঁতার কেটে বেরিয়ে গেল খোলা গেট দিয়ে। দু'পাশে দুই ডলফিন।

দূর থেকে দেখলাম, মাথার বোরখা সরে গেছে, লম্বা চুল জলে ভাসছে। পায়ের কাছের বোরখাও সরে গেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে মাছের ল্যাজ—একজোড়া—প্রায় মানুষের পায়ের মতো...অনেকগুলো আঙুল। বোরখা সরে গেল হাতের ওপর থেকেও—হাত চালিয়ে সাঁতার কাটার ফলে। হাত তো নয়—ঠিক যেন দুটো পাখনা প্রায় হাতের চেহারা নিয়েছে।

অস্ফুট কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'মৎস্যকন্যা।'

আমি বললাম, 'সমুদ্রপরি।'

পাশাপাশি তিনটে মূর্তি মিলিয়ে গেল দূর দিগন্তে। মাঝে কুহেলিকা— দু'পাশে রাম আর সীতা।

হাঁকডাক শুনে পিশারোটি কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, জানতে পারিনি।

এখন বললে, 'স্যার, সন্দেহ হয়েছিল বলেই এতক্ষণ ধরে খোঁজ নিলাম। 'বাংলার রহস্য' নামে কোনও খবরের কাগজ এই পৃথিবীর কোথাও নেই।'